রাবেতায়ে আলমে ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত
আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি
পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থ

আর রাহীকুল মাখতুম



মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রহ.

দারুল হুদা কুতুবখানা
বাংলাবাজার, ঢাকা

আর রাহীকুল মাখতূম

মূল

মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রহ.

অনুবাদ

মীযান হারুন

সম্পাদনা ও মূল কিতাবের সাথে মিলকরণে

মুয্যাম্মিলুল হক

ফাযেলে দারুল উলূম, দেওবন্দ, ভারত

দারুল হুদা কুতুবখানা
ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৯২২৪০৩৭৬৫, ০১৫৫৮৪৮৬০৩৫

১ম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০ ঈসায়ী
৩১তম মুদ্রণ : মার্চ ২০২৩ ঈসায়ী
১ম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২২ ঈসায়ী

আর রাহীকুল মাখতূম

রচনায় : মাওলানা সফিউর রহমান মোবারকপুরী রহ.

অনুবাদঃ মীযান হারুন

প্রকাশনায়ঃ মুযযাম্মিলুল হক্ব
দারুল হুদা কুতুবখানা, ইসলামী টাওয়ার
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN-978-984-8992-01-2

মূল্য : ৭৭০.০০ টাকা মাত্র

Ar-Rahiqul Makhtum (The Sealed Nectar) : Written by Mawlana Sofiur Rahman Mubarakpuri in Arabic, Rendered into Bangla by Mizan Harun Edited by Muzzammilul Hoq & Published by Muzzammilul Hoq on behalf of Darul Huda Kutubkhana, Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Tk. 770.00 Only

অর্পণ

সবেমাত্র তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম তাঁকে অনেক দিন কাছে পাবো। কিন্তু আমাদের আবেদনের চেয়ে মাওলার আহ্বান তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল। আমাদেরকে তিনি অসহায় করে চলে গেলেন।

মাওলা! যিনি এত দরদ নিয়ে এত তাড়াতাড়িই তোমার প্রেম সরোবরে অবগাহন করতে নেমে গেলেন তাঁকে তুমি ভালো রেখো, সুখে রেখো! তোমার জান্নাতের সুশীতল ছায়ায়, পরম মায়ায় তাকে দেখে রেখো!

মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.-এর অন্যতম খলীফা, বিশিষ্ট দাঈ ও আলেমে দীন

মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

এর ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে এই ক্ষুদ্র নিবেদন॥

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। তাঁকে ও আমাদের সবাইকে কেয়ামতের দিন নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত নসীব করুন।

আমীন॥

গ্রন্থকারের কথা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ.

فَجَعَلَهٗ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا............

লাখো কোটি প্রশংসার পবিত্র উপহার ঐ সুমহান সত্তার কুদরতি কদমের নীচে সবিনয়ে পেশ করছি, যিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠিয়েছেন সত্য ও সঠিক হেদায়াত ও দীন দিয়ে- যাতে তিনি জগতের সকল ধর্মের ওপর সে দীনকে বিজয় দান করেন। যিনি তাকে পাঠিয়েছেন সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা আর ভীতিপ্রদর্শনকারী রূপে। তাঁরই আদেশে মানুষকে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে; সত্য ও সঠিক পথের প্রদীপ্ত আলোকবর্তিকা রূপে। আর যিনি তাঁকে সমৃদ্ধ করেছেন সমূহমহোত্তম আদর্শে, তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, যারা বেশি করে আল্লাহকে ডাকে।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর ও তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম এবং যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর দলে যোগ দিবে তাদের সকলের ওপর রহমত ও অনুগ্রহ নাযিল করুন। তাদের জন্য আপনি আপনার করুণার দরিয়ায় ঢেউ তুলুন। তাদের জীবন-নদী কূলে কূলে ভরিয়ে দিন॥

হামদ ও সালাত বাদ।

গত ১৩৯৬ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মেলন থেকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। বিষয় ছিল- ইতিহাসের পৃথিবী চষে নবী জীবনের ওপর একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত পর্যালোচনা উপস্থাপন। এ ছিল এক পরম আনন্দঘন কাহিনী। হাসি আর উল্লাসের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। ইসলামী দুনিয়ার লেখকদের জন্য এটি ছিল একটি দারুণ উত্তেজনাকর সংবাদ। তাদের ঝিমিয়ে পড়া মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা-ফিকির ও ধ্যান-ধারণায় শাণ দেওয়ার একটি সোনালি সুযোগ। আমি আরও আগে বেড়ে বলব, এটি ছিল এমন এক মূল্যবান ও দামি কাজ- কলমের কালিতে কাগজের পিঠে যার সঠিক চিত্রায়ণ সত্যিই অসম্ভব। কারণ, আমরা যদি সীরাতুন্নাবীর ওপর সূক্ষ্মতার দৃষ্টি বুলাই; যদি নবী জীবনের ওপর ঐতিহাসিক মানসিকতায় চোখ মেলে তাকাই তবে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাব- এই সেই ঝরনাধারা- যেখান থেকে প্রতিনিয়ত উৎসারিত হচ্ছে ইসলামি দুনিয়ার 'আবে হায়াত'। এই সেই গোপন খনি- বিশ্ব মানবতার সৌভাগ্যের চাবি যেখানে লুকিয়ে রাখা আছে।

আমার ভাগ্য ভালো ছিল। আমার খোশনসীব ছিল। সেই বরকতময় প্রতিযোগিতায় অন্য সবার সঙ্গে একটি লেখা নিয়ে আমিও অংশগ্রহণ করলাম। কারণ, যদি বাস্তবতা তলিয়ে দেখা হয়; তবে সেখানে ধরা খাওয়া ছাড়া আমার কোনো গত্যন্তর ছিল না। আমার মতো একটা মানুষ সাইয়েদুল মুরসালীন,

সাইয়েদুল আওয়ালীন ওয়াল আখিরীনের মহা পবিত্র জীবনের ওপর কলম চালাবে-এটা ছিল একটা বড় দুঃসাহস। তারপরেও আমি তাতে সাহস করে পা বাড়ালাম। কারণ, যে চাঁদের আলোতে গোটা পৃথিবী উজ্জ্বল- আমার মনও চাইল তার থেকে একটুখানি আলোর পরশ পেয়ে ধন্য হতে। যাতে সে অনিঃশেষ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে না যায়; নিজের অস্তিত্ব খুইয়ে না বসে; বরং তাঁর একজন খোশনসীব উম্মত হয়ে বেঁচে থাকে। তাঁর উম্মত হয়ে মৃত্যুসুধা পান করে ধন্য হয়; আর কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে তাঁর শাফায়াতের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা পায়।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী থেকে যে সকল রীতি-নীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে আমি স্বাধীন থেকেই কলম চালিয়েছি। এ ক্ষেত্রে আমি সবসময় মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা চালিয়েছি। অতি দীর্ঘ কিংবা সংক্ষেপ করার পরিবর্তে মাঝামাঝি থাকার প্রয়াস পেয়েছি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিহাসের গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে চরম মতানৈক্য। এ সকল ক্ষেত্রের যেখানে কোনো ধরনের মিল-মিছিল অসম্ভব মনে হয়েছে, সেখানে অগ্রাধিকার দানের পন্থা অবলম্বন করেছি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার পরে আমার কাছে যেটা বিশুদ্ধ ও অগ্রাধিকারযোগ্য মনে হয়েছে সেটাই আমি আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। কিন্তু পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দলীল-প্রমাণের দোকান খুলে বসিনি। কারণ সেটা হতো অনর্থক পণ্ডশ্রম।

তবে বর্ণনা গ্রহণ-অগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ইমাম ও বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থেকেছি। এ ক্ষেত্রে তারা যেটাকে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেটাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিয়েছি। কারণ, ভিন্নভাবে এ বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করার জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন; যা আমার মতো স্বল্পায়ু একজন মানুষের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু দলীল প্রমাণ ও অগ্রাধিকারের কারণ আমি উল্লেখ করেছি। উদ্দেশ্য পাঠক যখন কোনো বর্ণনা পড়ে বিস্মিত হয়ে উঠবেন, তখন নিমেষেই যেন তার বিস্ময়ের পিপাসা নিবারিত হয়। কিংবা বিশুদ্ধের পরিবর্তে ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে যখন অবিশুদ্ধ মতটিই জায়গা করে নেয়, তখন তার যেন প্রকৃত ব্যাপার জানা হয়ে যায়। আল্লাহই সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ভালো কাজ করার তাওফীক দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। সম্মানিত আরশের প্রকৃত অধিকারী।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
বেনারস, ভারত

জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া বি.টি.সি.এল কলোনী, বনানী, ঢাকা-১২১৩-এর ভাইস প্রিন্সিপাল ও মুহাদ্দিস মাওলানা মুফতী ওয়াজেদ আলী সাহেবের

অভিমত

বর্তমান যুগে ঈমান নিয়ে মজবুতির সঙ্গে বেঁচে থাকা অনেক কঠিন ও কষ্টকর। শয়তানী শক্তিগুলি মুসলিম উম্মাহকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেছে। আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ যেমনি কঠিন বিভ্রান্তিতে দুর্দিন অতিক্রম করছে, তেমনি জাতীয় অঙ্গনেও আরো কঠিন দুর্দশা বিরাজ করছে। অপরদিকে

ধর্মের নামে অধর্মের

সুন্নাত নামে বিদআতের

বিভিন্ন রুসম-রেওয়াজ পালনের নামে কুসংস্কারে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে গোটা জাতি। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানসহ বিশ্ব-মুসলিম সম্প্রদায়ের নবী-জীবনী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সঠিকভাবে জানা এবং তদানুযায়ী আমলে ব্রতী হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

নবী-জীবনী সঠিকভাবে জানার জন্য রাবেতায়ে আলমে আল ইসলামী (সৌদি আরব) কয়েক বছর আগে আয়োজন করেছিল বিশ্বব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সীরাত গ্রন্থ রচনা প্রতিযোগিতা। আর ঠিক সেই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১১৮ টি দেশের ১১৮২ টি সীরাত গ্রন্থ হতে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল আরবি ভাষায় রচিত বিশ্ব নন্দিত কালজয়ী সীরাত গ্রন্থ **'আর রাহীকুল মাখতূম'**।

বাজারে যদিও এ সময় এর বঙ্গানুবাদ রয়েছে তবুও এই অনুবাদ গ্রন্থটি এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কারণ, মূল কিতাবের সাথে সঙ্গতি রেখে এবং প্রয়োজনের তাগিদে কুরআন ও হাদীসের মূল আরবি ভাষ্য সংযোজন করায় এবং স্থান বিশেষ রেফারেন্স গ্রন্থের ইবারত উল্লেখ করায় এটি সত্যিই এক অনন্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া ভাষার মাধুরী ও আবেগের উচ্ছাস প্রতিফলিত হয়েছে এর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে। তাই এ অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠক চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আশা করি। আমার দেখা মতো এই অনুবাদ গ্রন্থটিকে সচেতন পাঠক ও বিজ্ঞ উলামা সমাজ মূল আরবি কিতাবের সঙ্গে অতি সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতে পাবেন বলে দৃঢ় আশা রাখি।

হালে একটি কথা সবাইকে খুব জোরালোভাবে আওড়াতে দেখা যায়। কথাটি বলেছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ

'এ যুগে যতটা না অস্ত্রের জিহাদের প্রয়োজন
তার চেয়ে বেশি কলমের জিহাদের প্রয়োজন'॥

কিন্তু সে প্রয়োজন পূরণে বাস্তবে আমাদের নেই তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো আয়োজন। তবে প্রয়োজন পূরণে ও কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর মদদকে সম্বল করে কেউ না কেউ তো এগিয়েই যায়। অগ্রবর্তী সেই কাফেলার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে পরম স্নেহভাজন তরুণ লেখক ও অনুবাদক মীযান বিন হারুন। ইতোমধ্যে তার অনূদিত সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর ইংরেজি প্রবন্ধ সংকলনের অনুবাদ গ্রন্থ **'নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন'** ও **'কে সে মুসলমান'** ইত্যাদি পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়েছে। প্রবল আশা এ কিতাবটিও আল্লাহর ফযলে পাঠক মহলে সমাদৃত হবে ইনশা- আল্লাহ। ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ও কাল্পনিক ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্তদের নিকট আরবি, ইংরেজি আর চীনা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের সুমহান আদর্শ ও অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসলামের সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান তুলে ধরার ভবিষ্যৎ মুবারক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আমাদের এ সব আয়োজন। উম্মাহর হিদায়াত কামনায় অনুবাদকের হৃদয়ে যে দরদ জন্ম নিয়েছে আল্লাহ তাআলা যেন তা বাস্তবায়নে সহায় হোন। সেই দুআ পাঠক মহল থেকে কামনা করি। সর্বোপরি স্নেহভাজন অনুবাদক ও তাঁর দীনী ফিকিরের যাবতীয় কর্ম যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন এবং এগুলো আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পেশ করার মতো সম্পদ হয়- সেই প্রত্যাশায়।

(মাওলানা মুফতী ওয়াজেদ আলী)
১৭.০১.১৪৩২ হিজরী
২৪.১২.২০১০ ঈসায়ী
ভাইস প্রিন্সিপাল
জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া
বি.টি.সি.এল কলোনী, বনানী, ঢাকা-১২১৩

অনুবাদকের আরয

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ. وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَجْمَعِيْنَ. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعْوَتِهِمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ.

জীবনের খেলাঘরের একান্ত শৈশবের দিনগুলোতে যখন এই গ্রন্থের অনুবাদককে দুনিয়ার পাঠশালায় ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল তখন পৃথিবীর কারও পক্ষে আজকের এই দিনগুলির ভবিষ্যদ্বাণী করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। আর তাই কর্ম ও কীর্তিতে কেউ মহীয়ান হয়ে উঠলেও এ সব কিছুর প্রকৃত মালিক সে নয়; এই কৃতিত্বের সবটুকুই স্বয়ং তার খালিক ও মালিক মহান আল্লাহ তাআলার জন্য।

অনুবাদকের জীবনেও এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটেনি। তার শৈশব ও কৈশোরের হাসিখুশি আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা সেই দিনগুলোতে পৃথিবীর কোনো জ্যোতিষীর সাধ্য ছিল না, সেই কচি হাত দু'খানির ছোট ছোট রেখাগুলো দেখে বলে দিবে, একদিন এই রেখাগুলোর সুকোমল পরশনে তুলি থেকে যে রঙ ঝরবে তা দিয়ে রচিত হবে সীরাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের এক বর্ণাঢ্য ইতিহাস। তাই সফলতা আর অর্জনের এই পরমক্ষণে সেই মহান মালিকের পদতলে কৃতজ্ঞতা ভরে সে চিরাবনত।

সত্যি কথা বলতে কি, মেধা ও প্রতিভা, যোগ্যতা ও জ্ঞানগত উৎকৃষ্টতা দিয়ে এ সৌভাগ্য কোনোদিনও ওজন করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মানুষের সংখ্যা মোটেও কম নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান আর গবেষণার জগতে যারা পর্বত প্রমাণ পিরামিড রচনা করেছেন, হাজারও নতুন নতুন আর অতিমানবীয় বিষয়ের ওপর শত শত পৃষ্ঠা ধুমিয়ে লিখে গিয়েছেন, কিন্তু সীরাতে রাসূলের ওপর একটি লাইন লেখাও তাদের কপালে জুটেনি। তাই বলা যায়, রাসূলে কারীম সা. এর ওপর কিছু লেখা যোগ্যতা ও প্রতিভা নয়; বরং সাআদত ও সৌভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ছোট বেলা থেকেই কলম আর কাগজের সাথে অনুবাদকের গভীর মিতালী থাকা সত্ত্বেও বয়স ও যোগ্যতার বিবেচনা তাকে কখনোই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের মহান যিন্দিগির ওপর কলম ধরার অনুমতি দিচ্ছিল না। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এটা এমন একটি মিশন, যার জন্য লম্বা প্রস্তুতি আর সুদীর্ঘ আয়োজনের প্রয়োজন হয়। সাবধানে এ পথের দিকে পা বাড়াতে হয়। সবকিছু থাকার পরেও অতি সচেতনতা আর সতর্কতার সঙ্গে থেমে থেমে এ পথ অগ্রসর হতে হয়। যার কোনো কিছুই তখন অনুবাদকের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। বয়সের

বিচারে সে তখনো প্রভাতী-পাখির সঙ্গে কলকাকলিতে ব্যস্ত ছিল। যোগ্যতার মাপকাঠিতে সে ছিল রিক্তহস্ত ও ঝুলিশূন্য। ইলম ও আমলের ময়দানের দৈন্যদশাও তখন তাকে একেবারে ভড়কে দিয়েছিল।

কিন্তু সম্পূর্ণ আল্লাহর অনুগ্রহ আর অনুকম্পার বদৌলতেই সবকিছু যেন কি থেকে কি হয়ে গেল। রবীউল আউয়ালের কোনো এক বিস্মৃত সন্ধ্যায় সে কী যেন লিখতে বসেছিল। আর রমযানের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী চাঁদের রাতে 'দুরূদ শরীফ' এর মাধ্যমে কী যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই ছিল অনুবাদকের কাহিনী। বস্তুত আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতীত এ কাজ তাঁর দ্বারা কোনোদিনও সম্ভব ছিল না।

কেমন ছিলেন আত্মার সেই পরমাত্মীয় সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম? 'আর রাহীকুল মাখতূম' প্রণেতা কি তাঁর জীবন কাহিনী রচনায় পূর্ণ সফল হয়েছেন? তিনি কি সেই মহামানবের জীবনের সবগুলি দিক তাঁর স্বকীয় গৌরব আর উজ্জ্বলতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন? সোজা ভাষায় বলা যায়, মানবীয় চেষ্টায় মোটেও ত্রুটি না করলেও এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সফলতা কেবল তিনি কেন; পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়!

একটি সন্তানের পৃথিবীতে আসার ক্ষেত্রে তার পিতা কিংবা মাতার ভূমিকা ও অবদান কতখানি তা সে পূর্ণরূপে কীভাবে বুঝবে? কারণ, সে তো আগে সেই দিনগুলি নিজের চোখে দেখেনি। কোনোদিন তার এ সম্পর্কে ভাবনারও সুযোগ হয়নি। আর যে মানুষটি গোটা জগৎ সংসারকে ফুটিয়ে তুলেছেন। যিনি গোটা বিশ্ববাগিচা মনের মাধুরি দিয়ে সাঁজিয়ে তাকে আবাদ করেছেন। ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সম্যক উপলব্ধি মাটির মানুষের পক্ষে সম্ভব হবেই বা কী করে? আর তাই বুঝি কবি বলে গিয়েছেন,

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِيْ

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত ইতিহাস লেখা হয়েছে, মানবতার যত জয়গান আর গৌরব-গাঁথা রচিত হয়েছে, সেই সমপরিমাণ যদি কেবল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের ওপর লেখা হয়; তারপরেও বোধ হয় যথেষ্ট হবে না। কারণ, যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টির ওপর গভীর গবেষণা চালানো হয়, যদি খুঁটেনেটে দেখা হয় মানবতার ইতিহাস, তবে বড়

স্পষ্ট হয়েই ধরা দিবে- এই বিশ্বভুবন ও তার সবকিছু মূলত মুস্তফা চরিতের সামান্য এক ঝলক মাত্র।

এ সম্পর্কে অনুবাদকের অনেক কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সময় ও যোগ্যতা, বয়স ও পরিবেশ তাকে এজন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছে। কারণ, তার মতে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিন্দিগির ওপর কিছু লেখার বয়স এখনও তার আসেনি।

পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা গ্রন্থকার রহ. কে হাতে গনা মাত্র কয়েকটি দিনে গ্রন্থটি রচনার কাজ শেষ করতে বাধ্য করেছিল। এভাবে তাই অনেকটা তাড়াহুড়ার মাঝেই তাঁকে কাজটি করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর মদদ ও নুসরত প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে থাকার কারণে তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে করা সত্ত্বেও কাজটি আজ সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনা বলে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত পূর্বসূরীদের অনুসৃত পন্থা অনুকরণ ও প্রাচীন স্টাইল তাকে এক ভিন্ন স্বকীয়তা আনতে না দিলেও বর্ণনার সহজবোধ্যতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা আর শব্দের মধুরিমা সর্বোপরি গ্রন্থের পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ভাষা তাঁকে এক ভিন্ন ও অসামান্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে নিঃসন্দেহে।

মাদরাসার একজন তালিবুল ইলম হওয়ার সুবাদে ক্লাসভিত্তিক পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অথচ অনাস্বাদিতপূর্ব এক তাড়নায় নিতান্ত তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে তাকে কাজটি সারতে হয়েছে। তারপরেও সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেনি। সঠিক জ্ঞানগত দৈন্যের কারণে তার স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই- ভুল ত্রুটি থেকে যেতেই পারে। আর সে জন্য কারও কাছ থেকে যদি সৎপরামর্শ পাওয়া যায় তবে তা সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদ গ্রন্থটি তৈরির পেছনে সকল কৃতজ্ঞতা প্রথমে তার মাওলা মহান আল্লাহ তাআলার জন্য। দ্বিতীয়ত তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য। তৃতীয়ত তার জীবনের একমাত্র পাঠশালা যেখানে আজ সে দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর অতিবাহিত করতে চলেছে- **জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া**, বনানী, ঢাকা- মাদরাসার আসাতিযায়ে কেরাম ও তার পিতা-মাতা এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীর জন্য। বিশেষ করে তার গোটা জীবনের একান্ত মুরব্বী, প্রিয়জন ও পরম সুহৃদ বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক মাওলানা মুফতী ওয়াজেদ আলী দা.বা. কে আল্লাহ তাআলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। কারণ, আজ অনুবাদকের জীবনে যা কিছু অর্জন তার উলেখযোগ্য অংশের উপযুক্ত অধিকারী তিনিই।

এই পরম আনন্দঘন মুহূর্তে আরও অনেক সুহৃদ ও প্রিয়জনদের মুখই অনুবাদকের মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। তন্মধ্যে তার দুই বন্ধুবর যারা এই গ্রন্থ

তৈরির পেছনে অসামান্য কুরবানি করেছেন- তার প্রিয় সহপাঠী মাওলানা মুহাম্মাদ হারুনুর রশীদ ও হাফেজ মাওলানা শফীকুল ইসলাম ভাইয়ের নাম উলেখ করতেই হয়। তাদের পাশাপাশি প্রুফ দেখার কাজে অনুজ প্রতীম মুজাহিদুল ইসলাম অনেক মুজাহাদা করেছে। ওর জীবনেরও স্বপ্ন অনেক। আল্লাহ তাআলা সেই স্বপ্নগুলোসহ ওকে কবুল করে নিন।

আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত- ঠিক যখন অনুবাদকের কানে চারদিক থেকে আযানের আওয়ায ভেসে আসছে। নিশুতি রাতের এই আখেরী প্রহরের মুবারক মুহূর্তে কুদরতে বারী তাআলার নিকট প্রার্থনা- হে আল্লাহ! আমার স্বপ্নপুরুষ, প্রিয় শাইখ ও মুর্শিদ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. কে আপনি ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করুন। সদ্য চলে যাওয়া তাঁর খলীফা মুহতারাম মাওলানা আবু সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর আলী রহ.কে আপনি জান্নাতে তাঁর সঙ্গে মিলিত করুন। তাদের রেখে যাওয়া অপূর্ণ স্বপ্নগুলো আমাদের পূর্ণ ও বাস্তবায়িত করার তাওফীক দান করুন।

দারুল হুদা কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুযযাম্মিলুল হককে আল্লাহ তাআলা উত্তম বদলা দান করুন। পাশাপাশি অনুবাদকের প্রতি যাদের বিন্দু পরিমাণও ইহসান, অনুগ্রহ ও অবদান রয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে স্বীয় ইহসান ও কুরবানির উত্তম বদলা প্রতিদান দিন। আমীন॥

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

বিনয়াবনত
মীযান
২৪.১২.২০১০ ঈসায়ী
জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া
বনানী, ঢাকা-১২১৩
E-mail: Nadwi30@yahoo.com

সম্পাদকের কথা

প্রায় বারো বছর আগের কথা। সেই ২০১০ ইংরেজি সালের আগের কথা। মাওঃ মীযান হারুন কে আমি আর রাহীকুল মাখতূম অনুবাদ করতে বলেছিলাম। তখন তিনি তা অনুবাদ করতে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে আমার পীড়াপীড়িতে তিনি অনুবাদ করতে সম্মত হয়ে অনুবাদ করতে লেগে যান। তিনি যেমন মেধাবী তেমনি ক্ষুরধার অনুবাদক। ভাষা-শৈলী যেমন তাঁর অনুগত তেমনি অনুবাদ যোগ্যতাও তাঁর কর্তলগত। গ্রন্থখানার অনুবাদের কাজ হাতে নিয়ে তিনি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে অনুবাদের কাজ শেষ করে আমাদের হাতে তুলে দেন। তারপর গ্রন্থখানা আমরা ২০১০ সালে পাঠকের হাতে তুলে ধরি। কিন্তু পাঠক হতে সামান্য ভুল-ক্রটির কথা জানিয়ে ফোন আসে। মুদ্রণ জগতে এ ধরনের ভুল-ক্রটি থাকা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যখন মুদ্রণটি হবে প্রথম বার। কেননা, যত্নসহকারে ভুল সংশোধন করলেও ভুল থেকে যায়। সময়ের অভাবে আমরা তা সংশোধন করতে পারিনি। অবশেষে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা এ গ্রন্থের ভুল-ক্রটি সংশোধনের দিকে মনোযোগ দেই। ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আমার মাথায় এ কথাটি আসে যে, ভুল সংশোধনের সাথে সাথে মূল আরবি গ্রন্থের সাথে আমাদের বাংলা সংস্করণটিও মিলিয়ে নেই। যাতে আমাদের বাংলা সংস্করণটিও মূল আরবি গ্রন্থের অনুরূপ হয়। পার্থক্য শুধু ভাষার। আমাদের ছাপানো সংস্করণটি বাংলা। আর মূল গ্রন্থটি আরবি। অবশেষে আমাদের গ্রন্থটির আরবি গ্রন্থের সাথে মিলকরণ শেষ হয়। এজন্যে অনেক সময় লেগেছে।

এ গ্রন্থখানা শ্রেষ্ঠ নবির শ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থ। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অতীব জরুরী আমাদের পিয় নবির শ্রেষ্ঠ সীরাত জানা। যদি আমরা আমাদের নবির জীবনীই না জানি তাহলে আমরা কী জানলাম? এজন্যে প্রত্যেক মুসলমানের কাছে আকুল আবেদন যে, আমরা আমাদের প্রিয় নবির শ্রেষ্ঠ জীবনী নিজে জানি এবং ক্রয় করে বন্ধুকে হাদিয়া দেই। যাতে আমরা তাঁর অনুকরণ করে পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে ধন্য করতে পারি এবং পরকালে আমারা চিরস্থায়ী শান্তির জগৎ জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে পারি।

গ্রন্থখানার ভুল সংশোধন করার পরও সঙ্গত কারণে ভুল থেকে যেতে পারে। যদি কোনো পাঠকের কাছে কোনো ভুল ধরা পড়ে তাহলে পূর্বের মত আবারও আমাদেরকে জানালে আমরা কৃতজ্ঞ হব এবং তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী গ্রন্থের ভুল সংশোধনের সমপরিমাণ সওয়াব পাবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নবির জীবনী গ্রন্থ নিয়ে কাজ করার মধ্যে ইখলাস দান করুন এবং অনুবাদক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আ-মীন! ছুম্মা আ-মীন!!

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ. اَمَّا بَعْدُ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কথা, কাজ, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা মোটকথা যা কিছু তিনি করেছেন (তাঁর বৈশিষ্ট্য ছাড়া) সবকিছু উম্মতের জন্য করণীয়। আর তিনি যা কিছু বর্জণ করেছেন, তা উম্মতের জন্য বর্জণীয়। তাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পরবর্তী যুগের সমস্ত করণীয় ও বর্জণীয়সহ তাঁর জীবন চরিত জানা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা উম্মতকে উদ্দেশ্য করে পবিত্র কুরআনে বলেছেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "নিশ্চিত তোমাদের জন্যে রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে"। সূরা : আহযাব : ২১

এজন্যে উম্মতে মুহাম্মদীর সামনে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধ সীরাত-গ্রন্থ থাকা অতীব প্রয়োজন। এ প্রয়োজন পূরণে উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমগণ যুগে যুগে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ ধারাবাহিকতারই অংশ হিসেবে আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (ভারত) সাহেব 'আর রাহীকুল মাকতুম' নামে নির্ভরযোগ্য একখানা সীরাত-গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থখানা মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। এমনকি সৌদি সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে সীরাত গ্রন্থের উপর প্রতিযোগিতায় উক্ত গ্রন্থের লেখককে প্রথম পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

গ্রন্থখানা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হলেও পাঠকের চাহিদার প্রেক্ষাপটে আমরাও তা প্রকাশ করার প্রেরণা পাই। তাই আমরা মাওলানা মীযানুর রহমানকে গ্রন্থখানা যথাযথ অনুবাদ করার দায়িত্ব দেই, এ গ্রন্থ অনুবাদের জন্য তাকে উপযুক্ত মনে করে। আলহামদুলিল্লাহ, গ্রন্থখানা আমাদের পছন্দমত অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থখানা সকলের নিকট সমাদৃত হবে এবং এর দ্বারা বাংলাভাষী মুসলমান ভাই-বোনেরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাত গ্রন্থের অপুরণ ক্ষুধা মিটাবেন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই আমাদের শত চেষ্টা সত্বেও এ গ্রন্থে ভুল থাকা স্বাভাবিক। যদি কারো চোখে কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে; তাহলে আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে গ্রন্থখানার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের শুকরিয়া আদায় করতঃ আল্লাহর কাছে সকলের নাজাতের দোয়া করি।

বিনীত

প্রকাশক

সূচিপত্র

আরব

বংশ পরিচয়

শুভ জন্ম ও লালন পালন

জন্ম ও নবুওত-পূর্ব চল্লিশ বছর

মক্কী জীবন

নবুওত ও দাওয়াত

নবুওত ও রিসালতের শীতল ছায়ায়

আল্লাহর দিকে দাওয়াতমূলক জিহাদের প্রথম পর্ব

অপ্রকাশ্যে দাওয়াত

আল্লাহর দিকে দাওয়াতমূলক জিহাদের দ্বিতীয় পর্ব
প্রকাশ্যে দাওয়াত

পূর্ণ বয়কট

শোকের বছর

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের তৃতীয় পর্ব

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াতের বিস্তৃতি

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরত

মাদানী জীবন

প্রথম অধ্যায়

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা

গাযওয়ায়ে উহুদ

গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযার পরে সামরিক কর্মকাণ্ড

হুদাইবিয়ার ঘটনা

দ্বিতীয় পর্ব

হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপ

সপ্তম হিজরীর অবশিষ্ট গাযওয়া ও সারিয়াসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়

প্রতিনিধি দলের আগমন

হায়াতে তাইয়্যিবার আখেরী পর্ব
মহান বন্ধু সমীপে যাত্রা

আহলে বাইত

আরব

* মাটি ও মানুষ

* সরকার ও প্রশাসন

* ধর্ম ও সমাজ

আরবের ভৌগোলিক পরিচিতি ও তার প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী

সীরাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত ঐ মহা পয়গামের নাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্ব মানব সমাজের নিকট যা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ, দৃষ্টিভঙ্গি আর আচার-আচরণই যার অন্তর্ভুক্ত। যার দ্বারা তিনি মানব জীবনের মাপকাঠি পাল্টে দিয়েছিলেন। যে পুরনো দাঁড়িপাল্লা দিয়ে জীবনকে এতকাল মাপা হতো তার বদলে তিনি জীবন মাপার নতুন দাঁড়িপাল্লা উপহার দিয়েছিলেন। প্রতিটা খারাপের জায়গায় তিনি ভালোকে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। যার দ্বারা তিনি বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার কারারাজ্য থেকে বের করে আলোর রাজপথে নিয়ে এসেছিলেন। মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে আল্লাহর গোলামির দিকে নিয়ে এসেছিলেন। এভাবে পরিশেষে তিনি বিশ্ব ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিয়েছিলেন। বিশ্বমানবতার জীবনের স্রোতধারা ভিন্ন এক নতুন পথে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

পৃথিবীতে এই পয়গাম আসার আগে তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি কী ছিল এবং তার আসার পরে এর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল- এ দুয়ের মাঝে হিসাবের অঙ্ক বসানো ব্যতিরেকে সেই বর্ণাঢ্য ছবি রঙের তুলিতে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

এ কারণে শুরুতে প্রাক-ইসলামী যুগের আরবীয় জাতিগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ ও জীবনধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ করা প্রয়োজন সে যুগে আরবের সরকার ও প্রশাসন আর গোত্রীয় শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল আর তার রূপরেখাই বা কী ছিল? এর পাশাপাশি তৎকালীন পৃথিবীর আরবীয় মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক অবস্থা কী ছিল এবং তাদের জাতি ও গোষ্ঠী-সম্প্রদায়, তাদের দীন ও ধর্ম, তাদের প্রথা-পার্বণ ও ঐতিহ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করাও প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আমরা একের পরে এক সেগুলোই বর্ণনা করে যাব :

আরবের অবস্থান

আরব শব্দটি কানে পড়লেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে ধূধূ ধূসর বিয়াবান আর দুস্তর মরুসমুদ্রের কথা। জনমানবহীন ঊষর শক্ত মাটির কথা। হাজার হাজার মাইল খুঁজলেও এক ফোঁটা মাটি কিংবা ক্ষুদ্র উদ্ভিদের দেখা যেখানে পাওয়া যায় না। প্রাচীন কাল থেকেই জাযীরাতুল আরব এ নামে পরিচিত হয়ে আসছে। এ মাটির মতো এখানকার মানুষগুলিকেও শুরু থেকে এ নামে ডাকা হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে রয়েছে লোহিত সাগর ও সিনাই উপদ্বীপ; পূর্ব দিকে একে ঘিরে রয়েছে আরব উপসাগর এবং দক্ষিণ ইরাকের কিছু অংশ। দক্ষিণে একে জড়িয়ে ধরেছে ভারত মহাসাগরের আঁচল হয়ে থাকা আরব সাগর। উত্তরে রয়েছে সিরিয়া ও ইরাকের সামান্য অংশ। কিছু সীমানার ব্যাপারে মতানৈক্য অবশ্যই রয়েছে। আর এর আয়তন হচ্ছে দশ থেকে তের লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে জাযীরাতুল আরব পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে আছে। কেননা অভ্যন্তরীণ গঠনের ক্ষেত্রে সে চারদিক থেকে মরুভূমি ও বালুরাশি পরিবেষ্টিত। আর এই অত্যাশ্চর্য ভৌগোলিক গঠনই তাকে এক অজেয় দুর্গ বানিয়ে রেখেছে। সে কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দিন কেউ তাকে দখল করতে পারেনি। তার গলায় ঝুলাতে পারেনি গোলামির জিঞ্জির। আর তাই তো আমরা আরবের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে অতি প্রাচীন কাল থেকেই সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন দেখতে পাই। অথচ, তাদের দুই পাশে ক্ষুধাতুর বাঘের ন্যায় মুখ ব্যাদান করে দাঁড়িয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম দুই পরাশক্তি। তাই পুরোপুরি নিশ্চিতভাবেই বলা যায়; যদি এ অজেয় দুর্গ না থাকত তবে আরবরা কখনোই এই দুই পরাশক্তির আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত না। নিমেষেই এক সময় এর গোলাম হয়ে বসে পড়ত।

বহিরাগত দিক দিয়ে সে প্রাচীন দুনিয়ার পরিচিত সবগুলি মহাদেশের বুকের ওপর আসন গেঁড়ে বসা ছিল। জল ও স্থল উভয় দিক দিয়েই তাদের সঙ্গে তার সরগরম যোগাযোগ ছিল। তার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ছিল অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকার প্রবেশিকা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত ছিল ইউরোপের দুয়ার। তার পূর্ব সীমান্ত আজমের রাজ্যগুলি, মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া আর দূরপ্রাচ্যের (Far East) দিকে বুক খুলে দিয়ে বসেছিল। ঠিক একইভাবে সমুদ্রপথেও পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশের সঙ্গে এর মুলাকাত হতো। কাছে ও দূরের পৃথিবীর প্রত্যেকটি মহাদেশের বড় বড় সামুদ্রিক জাহাজগুলি পাল উড়িয়ে জাযীরাতুল আরবের বন্দরে এসে নঙ্গর করত।

ভৌগোলিক এ সকল সুবিধার বদৌলতে এই জাযীরার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ ছিল পৃথিবীর বহু জাতিগোষ্ঠীর শরণশিবির। ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রাণকেন্দ্র। সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন আর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনিময়ের প্রসিদ্ধ মারকায।

আরবের জাতিগোষ্ঠী

ঐতিহাসিকগণ আরবের জাতিগোষ্ঠীকে বংশানুক্রমিক ধারার ওপর ভিত্তি করে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন।

এক. আরবে বায়িদা (اَلْعَرَبُ الْبَائِدَةُ): এগুলো জাযীরাতুল আরবের সবচেয়ে প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী। বর্তমানে যারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি আজ এগুলির প্রয়োজনীয় ইতিহাসও সবিস্তারে জানা সম্ভব নয়। এগুলি হলো আদ, সামূদ, তাসাম, জাদীস, আমালিক, উমাইম, জুরহুম, হাজূর, ওয়াবার, আবীল, জাসিম, হাযরা মাউত ইত্যাদি।

দুই. আরবে আরিবা (اَلْعَرَبُ الْعَارِبَةُ) : এরা হলো ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতানের বংশধর জাতিগোষ্ঠী। এরা কাহতানী আরব নামেও সবিশেষ পরিচিত।

তিন. আরবে মুস্তারিবা (اَلْعَرَبُ الْمُسْتَعْرَبَةُ): এরা হলো হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর আরব। পাশাপাশি এরা আদনানী আরব নামেও সবিশেষ পরিচিত।

আরবে আরিবা

এরা হলো কাহতানের বংশধর কাহতানী আরব। এদের ক্রমবিকাশ ও পীঠস্থান হলো ইয়েমেন রাজ্য। মূলত সাবা বিন ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতানের সন্তান থেকে এদের বংশধররা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে দুটি জাতিগোষ্ঠী। হিময়ার বিন সাবা ও কাহলান বিন সাবা। অবশিষ্ট এগার কিংবা চৌদ্দটি সম্প্রদায়কে বলা হয় সাবিউন। সাবা ব্যতীত তাদের আর কোনো জাতিগোষ্ঠী নেই।

ক. হিময়ারের প্রসিদ্ধ শাখাসমূহ

এক. কুযাআ: এর থেক বের হয়েছে বাহরা, বালি, কাইন, কালব, উজরা ও ওয়াবারা।

দুই. সাকাসিক: এরা হলো যায়দ বিন ওয়ায়েলা বিন হিময়ারের বংশধর। আর যায়দের উপাধি ছিল সাকাসিক। তবে মনে রাখতে হবে বনু কাহলানের কিন্দার সাকাসিক আর এই সাকাসিকের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

তিন. যায়েদ আল জমহুর: এর থেকে উৎপত্তি হয়েছে হিময়ার আসগার, সাবা আসগার, হাজূর এবং যূ আসবাহ জাতিগোষ্ঠীর।

খ.কাহলানের প্রসিদ্ধ শাখাসমূহ

হামাদান, আলহান, আশআর, তাঈ, মাজহাজ (এর শাখা আনস এবং নাখ'), লাখম (এর শাখা কিন্দা; কিন্দার শাখা বনু মুআবিয়া, ছাকূন ও

সাকাসিক), জুজাম, আমেলা, খাওলান, মাআফির, আনমার (এর শাখা খাসআম, বাজীলা; বাজীলার শাখা আহমাস), আযদ (আযদের শাখা আউস, খাযরাজ, খুযাআ আর জাফনার বংশধররা গাস্‌সানী বংশ নামে পরিচিত সিরিয়ার রাজবংশ)।

বনু কাহলান পরবর্তীতে ইয়েমেন থেকে হিজরত করে গোটা জাযীরাতুল আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বলা হয়ে থাকে, তাদের অধিকাংশ লোক হিজরত করেছিল কুরআনে উল্লিখিত ঐতিহাসিক বন্যার আগভাগেই। এর কারণ ছিল রোমানদের জোর-জুলুম আর চাঁদাবাজির ফলে তাদের ব্যবসা লাটে উঠেছিল। একদিকে তারা সামুদ্রিক ব্যবসা-পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে বসেছিল। অপরদিকে মিসর ও সিরিয়া দখল করে নেওয়ার পর তারা স্থলপথ বিনষ্ট করে দিয়েছিল।

আবার কারও কারও মতে, তারা হিজরত করেছিল বন্যার পরে। কারণ, তখন তাদের ফল-ফসল ও কৃষি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাদের ব্যবসায় টান ধরেছিল। জীবনধারণের সকল উপায় ও উপকরণ হারিয়ে তারা হতচ্ছন্ন হয়ে বসে পড়েছিল। কুরআনে কারীমও এদিকে খানিকটা ইঙ্গিত করে। [সূরা সাবা:১৫-১৯]

আমরা আগে যে সকল কারণ উল্লেখ করেছি এগুলির পরিবর্তে তাদের ও হিময়ারদের মাঝে কোনো সংঘর্ষ ও সংঘাতের পরিণামে যদি তারা নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকে তবে তাতেও বিস্ময়ের আদৌ কিছু থাকবে না। কাহলানের নির্বাসনের পরেও হিময়ারদের সেখানে থেকে যাওয়া অনেকটা সেটাই প্রমাণ করে।

কাহলানের শাখা গোত্রসমূহের হিজরতকারীদেরকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

এক. আযদ

তারা মূলতঃ তাদের সরদার ইমরান বিন আমর মুযাইকিয়ার পরামর্শে হিজরত করেছিল। এরপরে তারা ইয়েমেনের বিভিন্ন শহরে ঘুরছিল এবং তাদের নকীবদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে তারা উত্তর ও পূর্ব দিকে চলে গিয়েছিল। স্বীয় মাতৃভূমি থেকে হিজরতের পরে তারা পরিশেষে যে সকল স্থানে গিয়ে স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করেছিল নিম্নে আমরা সেগুলো উল্লেখ করছিঃ

* ইমরান বিন আমর ওমানে অবতরণ করে। সেখানে সে ও তার বংশধররা স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। তারা হলো ওমানের আযদ বংশ।

* বনু নসর ইবনুল আযদ তাহামাকে বসবাসের জায়গা হিসেবে বেছে নেয়। তারা হলো শানুআর আযদ বংশ।

* সা'লাবা বিন আমর মুযাইকিয়া হিজাযের দিকে চলে যায়। এরপর সা'লাবিয়া ও যী-কারের মাঝামাঝি স্থানে বসবাস শুরু করে। এরপর যখন তাদের

সন্তানরা বড় হয় এবং তাদের কোমর শক্ত হয় তখন তারা মদীনার দিকে চলে যায়। সেখানে অবস্থান করে এবং স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। সা'লাবার কয়েকটি শাখাগোত্র হলোঃ হারেসা বিন সা'লাবার দুই পুত্র আউস ও খাযরাজ ।

*তাদের মধ্য থেকে হারেসা বিন আমর খুযাঈ এবং তার বংশধররা হিজাযের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় তারা মাররুয যাহরানে গিয়ে অবতরণ করে। এরপরে তারা হারাম বিজয় করে মক্কায় স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে। সেখান থেকে বের করে দেয় মক্কার আদি নিবাসী জুরহুমীদেরকে ।

*জাফনা বিন আমর সিরিয়ার দিকে হিজরত করে চলে যায়। সেখানে সে ও তার বংশধররা বসবাস করা শুরু করে। এই জাফনা বিন আমরই হলো গাসসানী বাদশাহদের জনক। তাদেরকে মূলত হিজাযের গাস্সান নামে পরিচিত একটি কূপের দিকে সম্বন্ধ করে গাস্সানী বলা হয়। তারা সিরিয়ায় চলে যাওয়ার আগে সেখানেই সর্বপ্রথম অবতরণ করেছিল।

*বড় বড় এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হিজায ও সিরিয়ায় হিজরত করে এসে পরবর্তী সময়ে মিশেছিল বহু ছোট ছোট গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল কাব বিন আমর, হারেস বিন আমর এবং আউফ বিন আমর।

দুই. লাখম ও জুযাম

তারা পূর্ব ও উত্তরে চলে গিয়েছিল। লাখমীদের মধ্যে একজন ছিল নসর বিন রবীআ। সে ছিল হিরার মুনযিরী সম্রাটদের জনক।

তিন. বনু তাঈ

আযদ বংশ চলে যাওয়ার পরে তারা উত্তর দিকে চলে গিয়েছিল। এরপরে এক সময় এসে আজা ও সালমা নামে পরিচিত দুটি পাহাড়ের নিকটে অবতরণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে সেখানে তারা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল। এ কারণে সেখানকার পাহাড়দুটি আজও তাঈ পাহাড় নামে পরিচিত।

চার. কিন্দা

তারা প্রথমে বাহরাইনে অবতরণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বাহরাইন ছাড়তে বাধ্য হয়ে হাযরামাউতে অবতরণ করে। কিন্তু সেখানেও তাদের ভাগ্যে তা-ই বরণ করতে হয় যা করতে হয়েছিল বাহরাইনে। এরপরে তারা নজদে গিয়ে অবতরণ করে। ধীরে ধীরে সেখানে তারা প্রতিষ্ঠা করে এক বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু সেই সাম্রাজ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। অতি অল্প সময়েই সে তার সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এক সময় হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ লুপ্ত।

সেখানেরই হিময়ারের কুযাআ নামক গোত্রটি-যদিও তার হিময়ারী হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়ে গেছে- ইয়েমেনের দিকে হিজরত করে চলে যায় এবং

ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 'বাদিয়াতুস সামাওয়াহ' তে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে। আর তার কিছু শাখা গোত্র সিরিয়ার সীমান্ত এলাকা এবং হিজাযের উত্তর অঞ্চলে চলে যায় এবং সেই জায়গাকে বেছে নেয় স্থায়ী বাসভূমি হিসেবে[১]।

* আরবে মুস্তা'রিবা

তাদের প্রকৃত পূর্বপুরুষ ছিলেন হযরত ইবরাহীম আ.। তিনি ছিলেন ইরাকের 'উর' নামক শহরের অধিবাসী। এটি ছিল কুফার কাছাকাছি ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ শহরের ও এখানকার অধিবাসী হযরত ইবরাহীম আ. এর পরিবারের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, এ সকল শহরের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা কী ছিল তার বিশাল বিবরণ।

পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা আছে। হযরত ইবরাহীম আ. সেখান থেকে হারান কিংবা হারানের দিকে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে হিজরত করে চলে যান ফিলিস্তিনে। এরপরে ফিলিস্তীনকে তিনি তাঁর দাওয়াতের কেন্দ্র ও মারকায স্বরূপ গ্রহণ করেন। তিনি তার চারপাশ এবং অন্যান্য শহরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে বেড়াতেন। এ ধরনেরই এক সফরে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এক অহঙ্কারী বাদশার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী হযরত সারা রা.। হযরত সারা রা. ছিলেন অনুপম সুন্দরী ও রূপবতী। যালিম সেই বাদশার কুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু হযরত সারা রা. আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করলেন এবং জালেম শাহীর ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ছুঁড়ে মারলেন। তখন সে বুঝতে পারল, হযরত সারা রা. হলেন আল্লাহর কাছে অতিশয় সম্মানিত একজন নেককার নারী। তখন সে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে কিংবা আল্লাহ তাআলার ভয়ে তাকে একজন খাদেমা হাদিয়া দিলো। তিনি ছিলেন হযরত হাজেরা রা.[২]।

---

[১] এ সকল গোত্র ও তাদের হিজরতের বিস্তারিত বিবরণের দেখুনঃ 'নসবু মা'দ ওয়াল ইয়ামানিল কাবীর, জামহারাতুন নসব, আল ইকদুল ফরীদ, কালায়েদুল জিমান, নিহায়াতুল আরব, তারীখে ইবনে খালদুন, সাবায়েকুয যাহব ইত্যাদি বংশধারা সম্পর্কিত গ্রন্থ। বিশেষ করে প্রাক ইসলামী যুগের আরবের ওপর লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীও এ ক্ষেত্রেও খুব সহায়ক হবে। কিন্তু এ সকল হিজরতের সময়কাল সম্পর্কে এ সকল গ্রন্থে রয়েছে চরম মতানৈক্য। যে কারণে এগুলোর ওপর ভর করে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বলা যায় অসম্ভবপ্রায়। তবুও চিন্তা-গবেষণা ও প্রচুর খোঁজাখুঁজির পরে আমাদের কাছে যেটি অগ্রগণ্য মনে হয়েছে আমরা সেটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

[২] কথিত আছে, সে ছিল মিসরের জনৈক ফেরাউন। আর হাজেরা আ. ছিলেন তার ক্রীতদাসী। কিন্তু বিশিষ্ট সীরাত গবেষক আল্লামা সুলাইমান মনসূরপুরী র. তাঁর স্বাধীন হওয়ার মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর মতে হাজেরা ছিলেন সেই ফেরাউনের মেয়ে। তাঁর মতে এটিই ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। (বিস্তারিত দেখুন 'রহমতুল্লিল আলামীন ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪, ৩৬, ৩৭)। অপরদিকে মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন র. সাহাবী আমর ইবনুল আস রা. ও মিসরবাসীদের মধ্যকার একটি আলোচনার কথা তুলে ধরেছেন। যেখানে মিসরবাসী তাঁকে বলেছিলঃ হাজেরা ছিলেন আমাদের একজন বাদশাহর স্ত্রী। কিন্তু হঠাৎ

কিন্তু হযরত সারা রা. খাদেমা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে হাদিয়া দিয়ে দেন[৩]।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর আবাসস্থল ফিলিস্তিনে ফিরে যান। সেখানে আল্লাহ তাআলা তাকে হাজেরার গর্ভে হযরত ইসমাঈল আ. কে দান করেন। কিন্তু এতে হযরত সারা রা. নিজ আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত পান। (কারণ তখনো তিনি কোনো সন্তানের মা হতে পেরেছিলেন না) তাই তিনি হযরত ইবরাহীম আ. কে বাধ্য করেন হযরত হাজেরা ও দুধের শিশু হযরত ইসমাঈল আ.কে দূরে কোথাও পাঠাতে। হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে নিয়ে হিজাযে আসেন। সেখানে আল্লাহর ঘর হারাম শরীফের পাশে তৃণলতা ও উদ্ভিদহীন বিজন মরু উপত্যকায় অবতারণ করেন। কিন্তু আল্লাহর ঘর হারাম শরীফ তখন একটি টিলার ন্যায় সামান্য উঁচু ভূমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। চারপাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢল নেমে আসত এবং তার সঙ্গে মুলাকাত করে ডানে বামে পাশ কেটে ছড়িয়ে পড়ত সবদিকে। হযরত ইবরাহীম আ. তাদেরকে মসজিদের উঁচুতে যমযম কূপের ওপরে একটি গাছের নীচে এনে ছেড়ে দিলেন। গোটা মক্কাতে তখন তৃতীয় কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। এক ফোঁটা পানির লেশমাত্রও ছিল না কোথাও। তিনি তাদেরকে একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং পানি ভরা একটি মশক দিলেন। এরপরে একাকী ফিলিস্তীনের পথে পা বাড়ালেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই পানি এবং পাথেয় ফুরিয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সেখানে উৎসারিত হলো যমযমের কূপ। মাটির বুক চিরে প্রবল বিদ্রোহে বয়ে চলল অশান্ত ঝরনাধারা। তাদের জীবনে তা কিছু দিনের জন্য আবে হায়াতে পরিণত হলো। এরপরে ঘটনার পুরোটা সবারই জানা[৪]।

এরপরে সেখানে ইয়েমেনের একটি কবীলা এসে উপস্থিত হলো। সেটি ছিল দ্বিতীয় জুরহুম কবীলা। তারা হযরত ইসমাঈল আ. এর সম্মানিতা মাতা হাজেরার অনুমতিক্রমে মক্কায় বসবাস শুরু করে। কারও কারও মতে, ইয়েমেন থেকে নয় বরং ইতঃপূর্বে তারা মক্কার আশপাশের পাহাড়ি উপত্যকায় বসবাস করত। কিন্তু ইমাম বুখারীর র. বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তারা ইসমাঈল আ. এর মক্কায় আগমনের পরে এবং তাঁর যৌবনে পদার্পণের আগে

আমাদের ও আইনে শামছের অধিবাসীদের মাঝে যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। সে যুদ্ধে বাদশাহ নিহত হন আর তার স্ত্রী হন বন্দী। আর সেখান থেকেই হাতে হাতে তিনি গিয়ে পৌছেন তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ. এর কাছে। (তারীখে ইবনে খালদূন ২/১/৭৭)।

[৩] মূল কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২১৭, ২৬৩৫, ৩৩৫৭, ৩৩৫৮, ৫০৮৪ ও ৬৯৫০।

[৪] দেখুন সহীহ বুখারী: কিতাবুল আম্বিয়া-হাদীস নং ৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

মক্কায় আগমন করে। তবে ইতঃপূর্বে তারা এই উপত্যকার কোল বেয়ে সফর করে চলে যেত[৫]।

মক্কায় তাদেরকে রেখে আসার পর থেকে হযরত ইবরাহীম মাঝেমধ্যে সেখানে গিয়ে তাদেরকে দেখে আসতেন। মক্কায় তাঁর এই সফর সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই জানা না গেলেও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে আমরা সর্বমোট চার বারের কথা জানতে পারি।

এক. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তিনি হযরত ইবরাহীম আ. কে স্বপ্নে দেখালেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল আ. কে কুরবানী করছেন। এক মুহূর্ত দেরি করলেন না হযরত ইবরাহীম আ.। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে গেলেন আল্লাহর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য।

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥) إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)

যখন তারা উভয় আত্মসমর্পণ করল এবং ইবরাহীম তাকে শুইয়ে দিলো। আর আমি তাকে ডেকে বললাম 'হে ইবরাহীম! তুমি তো তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে দেখালে। নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটি একটি মহা পরীক্ষা। আর আমি তার পরিবর্তে যবাই করার জন্য দিলাম একটি মস্তবড় পশু [সূরা সাফফাত : ১০৩-১০৭]

ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস (Old Testament, Book of Genesis) অধ্যায়ে বলা হয়েছে হযরত ইসমাঈল আ. হযরত ইসহাক আ. এর চেয়ে তের বছরের বড় ছিলেন। আর ঘটনার পূর্বকালীন সময় বুঝাচ্ছে যে এটি ছিল হযরত ইসহাক আ. এর জন্মের আগের ঘটনা। কেননা কুরআনে কারীম হযরত ইসমাঈল আ. এর ঘটনার বিবরণ সম্পন্ন করার পরেই কেবল ইসহাক আ. এর ঘটনার বর্ণনা শুরু করেছে।

আর এই ঘটনার দ্বারা হযরত ইসমাঈল প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হওয়ার আগে সর্বসাকুল্যে একবার হযরত ইবরাহীম আ. এর মক্কায় আগমনের ঘটনা জানা যায়। আর বাকি তিনটি ঘটনা ইমাম বুখারী রহ. সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো:

দুই. হযরত ইসমাঈল আ. ধীরে ধীরে যৌবনে এসে উপস্থিত হলেন এবং বনু জুরহুম থেকে আরবি ভাষা শিখে নিলেন। তারা সবাই তাঁর প্রতি ছিল দারুণ

---

[৫] প্রাগুক্ত হাদীস নং ৩৩৬৪।

খুশি। তাই তারা তাঁর নিকট তাদের গোত্রের একটি মেয়েকে বিবাহ দিয়ে দিলো। এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন হঠাৎ তাঁর মা হযরত হাজেরা রা. চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। ওদিকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মনে স্ত্রী ও সন্তানের স্মৃতি প্রবল ঝড় হয়ে দেখা দিলো। নিমেষেই সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের সঙ্গে দেখা ও মুলাকাত করার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি একদিন এসে উপস্থিত হলেন। ইতোমধ্যেই হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বিবাহের কাজটি সেরে ফেলেছিলেন। কিন্তু মক্কায় এসে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর দেখা পেলেন না। পরক্ষণে তাঁর স্ত্রীর নিকট তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থা জানতে চাইলেন। স্ত্রী তাঁর নিকট দারিদ্রক্লিষ্ট ও দৈন্য-ঘেরা জীবনের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করল। বিদায়ের সময় হযরত ইবরাহীম আ. পুত্রবধূকে বলে এলেন, 'ইসমাঈল এলে বলবে : তাঁর পিতা তাকে ঘরের চৌকাঠটি বদলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন'। হযরত ইসমাঈল আ. এসে যখন সবকিছু শুনলেন তখন তিনি তাঁর পিতার লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার স্থানে নতুন আরেক জনকে বিবাহ করলেন। (সে ছিল মুযায বিন আমরের মেয়ে। আর অধিকাংশের মতে মুযায ছিল কবীলায়ে জুরহুমের সরদার এবং সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ।)

তিন. হযরত ইবরাহীম আ. এরপর তৃতীয় আরেক বার মক্কায় আগমন করেছিলেন। তখন হযরত ইসমাঈল আ. এর ঘরে ছিল দ্বিতীয় স্ত্রী। কিন্তু এবারও ছেলের সঙ্গে পিতার মুলাকাত হলো না। হযরত ইবরাহীম আ. ফিলিস্তিন ফিরে এলেন। ফেরার আগে এবারের পুত্রবধূকে তাদের জীবন ও জীবনের হালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পুত্রবধূ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। তখন তিনি তার কাছে বলে এলেন ইসমাঈল এলে তাকে বলে দিবে, তাঁর পিতা তাকে ঘরের চৌকাঠটি শক্তভাবে ধরে রাখার আদেশ দিয়েছেন।

চার. এরপর ইবরাহীম আ. সর্বশেষ আরেক বার মক্কায় আগমন করেছিলেন। এবারে কলিজার টুকরা সন্তান হযরত ইসমাঈল আ. এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। হযরত ইসমাঈল আ. তখন যমযম কূপের কাছে একটি বিশাল গাছের নীচে বসে তীরের ফলকে শাণ দিচ্ছিলেন। যখন হযরত ইসমাঈল আ. তাকে দেখলেন তখন দ্রুত তাঁর কাছে চলে এলেন। এরপরে একজন পিতা তার সন্তানের সঙ্গে, আর একজন সন্তান তার পিতার সঙ্গে যা করে তারাও তাই করলেন। পিতাপুত্রের এই মুলাকাত ছিল অনেক বছরের কাঙ্খিত স্বপ্নের বাস্তবতা। বয়োবৃদ্ধ ও স্নেহময় এক পিতার পক্ষে তার সন্তানের এত দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ বেদনা আর পরম একনিষ্ঠ ও ভক্তিবর একজন সন্তানের পক্ষে তার বৃদ্ধ পিতার সংসর্গ থেকে এত অধিক সময়ের

বিরহ বেদনা ছিল সত্যিই নিদারুণ যন্ত্রণাময়। এটা মেনে নেওয়া ছিল খুবই কঠিন কাজ। তাদের এ সাক্ষাতেই পিতা পুত্র উভয়ে মিলে কাবা নির্মাণ করলেন। এর ভিত উঁচু করলেন। আর আল্লাহ যেভাবে নির্দেশ দিলেন হযরত ইবরাহীম আ. সেভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে হজ্জে বাইতুল্লাহর ঘোষণা দিলেন[৬]।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইসমাঈল আ. কে মুযাযের মেয়ের গর্ভ থেকে বারোটি ছেলে সন্তান দান করেন। তারা হলো নাবেত বা নাবায়ূত, কায়দার, আদবাঈল, মিশমা', দূমা, মীশা, হাদাদ, তীমা, বাতূর, নাফীস, কায়দুমান।

তাঁর এ বারো ছেলে থেকে বারোটি বংশের শাখা বিস্তৃত হয়। তারা সকলেই দীর্ঘ দিন মক্কায় বসবাস করেছিল। তখন তাদের অধিকাংশরই জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা ছিল ইয়েমেন থেকে সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসা করা। এরপর এ সকল কবীলা জাযীরাতুল আরবের দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে জাযীরার বাইরে চলে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য ছিল তাদের। তারা হারিয়ে যায় কালের অন্ধকার নিশায়। বিলুপ্তির এ রাহুগ্রাস থেকে রক্ষা পায় কেবল নাবেত ও কায়দার।

নাবেতের বংশধর আনবাতদের সভ্যতার বিকাশ ঘটে হিজাযের উত্তরাঞ্চলে। তারা সেখানে একটি শক্তিশালী রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিল। এর রাজধানী শহর ছিল পেট্রা। জর্ডানের দক্ষিণে অবস্থিত এটি ছিল প্রাচীন যুগের একটি প্রসিদ্ধ নগরী। ধীরে ধীরে আশপাশের সকল রাজ্য এই নাবতী রাজ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। সেখানে এমন কেউ ছিল না, যে তার সঙ্গে সম্মুখ সমরে মুকাবেলা করার সাহস রাখে। পরিশেষে রোমানরা তাদের সেই রাজত্বের ইতি ঘটায়।

বংশধারায় বিশেষজ্ঞ অনেক পণ্ডিতের মতে, গাস্‌সানী বংশের রাজন্যবর্গ এবং আউস ও খাযরাজের আনসাররা ছিল নাবেত বিন ইসমাঈল আ. এর বংশধর। তাদের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারী শরীফেও এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বুখারী শরীফে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন 'হযরত ইসমাঈল আ. এর সঙ্গে ইয়েমেনের বংশসূত্রে সম্পর্ক'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক হাদীস দ্বারা তিনি তাঁর মতের সমর্থনে দলীলও পেশ করেছেন। অপরদিকে অপর এক হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থে কাহতানকে নাবেত বিন ইসমাঈলের বংশধর হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন[৭]।

---

[৬] সহীহ বুখারী: কিতাবুল আম্বিয়া-হাদীস নং ৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

[৭] সহীহ বুখারী: কিতাবুল মানাকেব, নিসবাতুল ইয়ামান ইলা ইসমাঈল অধ্যায়-হাদীস নং ৩৫০৭। ফাতহুল বারী ৬/৬২১-৬২৩। আরও দেখুন, কালবীর নসবু মাআদ ওয়াল ইয়ামানিল কাবীর ১/১৩১। তারীখে ইবনে খালদুন ২/১/৪৬, ২/১/ ২৪১,২৪২।

আর কায়দার ইবনে ইসমাঈলের বংশধররা মক্কাতেই বসবাস করতে থাকে। সেখানেই তাদের বংশের বিস্তার ঘটতে থাকে। এক সময় তাদের থেকে উদ্ভব ঘটে আদনানের। এরপরে তার ছেলে মাআদের। মূলতঃ আদনান থেকে শুরু করে আদনানী আরবগণ তাদের বংশধারার পূর্ণ সংরক্ষণ করে। এই আদনানই হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশের একুশতম পুরুষ। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি যখন বংশ গণনা করে আদনান পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন এরপরে আর আগে বাড়তেন না বরং তখন তিনি বলতেন **'বংশ গণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে'**[৮]। কিন্তু একদল উলামায়ে কেরাম এ হাদীসটিকে যঈফ আখ্যায়িত করে আদনানের পরেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ গণনাকে জায়েয মনে করেন। তথাপি এ অংশের বংশ পরম্পরার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এতটা মতানৈক্য দেখা যায় যে, এগুলির মাঝে কোনোভাবেই এতটুকু সামাঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। প্রখ্যাত প্রাজ্ঞপুরুষ আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ সুলাইমান মনসূরপুরী রহ. ইবনে সাআদের বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ঐতিহাসিক তাবারী ও মাসউদীর বর্ণনাও তাই। আর তা হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম আ. পর্যন্ত রয়েছেন মোট চল্লিশ পুরুষ[৯]।

মাআদের বংশধারা তার ছেলে নযর থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত হয়। কারও মতে, নযর ব্যতীত মাআদের আর কোনো ছেলে ছিল না। আর নযরের ছিল চার ছেলে। তার এই চার ছেলে থেকে পরবর্তী সময়ে উদ্ভব ঘটে বিশাল বিশাল চারটি কবীলারঃ ইয়াদ, আনমার, রবীআ ও মুযার। রবীআ ও মুযার গোত্র পরবর্তী সময়ে আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং অসীমতায় রূপ নেয়। রবীআ থেকে জন্ম নেয় জুবাইআ' ও আসাদ। আসাদ থেকে আনযা ও জাদীলা। জাদীলা থেকে জন্ম হয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবীয় অনেকগুলি কবীলার। যেমন. আব্দুল কায়স, নামির, বনু ওয়ায়েল ইত্যাদি। তাদের থেকে বিকাশ ঘটে বনু বকর ও বনু তাগলিবের। বনু বকর থেকে জন্ম নেয় বনু কায়স, বনু শায়বান ও বনু হানীফা ইত্যাদি কবীলা। আর আনযা থেকে উৎসারিত হয় বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহ সঊদের বংশধারা।

মুযার গোত্রগুলি পরবর্তী দুটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। কায়স আয়লান বিন মুযার ও ইলয়াস বিন মুযারের বংশধর। কায়স আয়লানের বংশ থেকে বের

---

[৮] দেখুন, তারীখে তাবারী ২/২৭২-২৭৬।

[৯] ইবনে সাআদের তাবাকাতে কুবরা ১/২৭২,২৭৩। মাসউদীর মুরূজুয যাহাব ২/২৭৩, ২৭৪। তারীখে ইবনে খালদূন ২/২/২৯৮। ফাতহুল বারী ৬/৬২২। রহমাতুল্লিল আলামীন ২/৭,৮,১৪-১৭।

হয় বুন সালিম, বনু হাওয়াযিন, বনু ছাকীফ, বনু সা'সা', বনু গাতফান। বনু গাতফান থেকে জন্ম নেয় আবছ, জুবয়ান, আশজা' ও আ'ছুর ইত্যাদি।

ইলিয়াছ বিন মুযার থেকে জন্ম নেয় তামীম বিন মুররা, হুযাইল বিন মুদরিকা, বনু আসাদ বিন খুযাইমা, কেনানা বিন খুযাইমার বংশধারা। কেনানা থেকে উৎপত্তি হয় কুরাইশ বংশের। তারা হলো ফিহর বিন মালিক বিন নযর বিন কেনানার বংশধর।

কুরাইশরা পরবর্তী সময়ে বিভন্ন কবীলায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হলো জুমাহ, সাহম, আদী, মাখযূম, তায়ম, যুহরা ও কুসাই বিন কিলাবের বংশধর। আর তারা হলো আব্দুদ্দার বিন কুসাই, আসাদ বিন আব্দুল উয্যা বিন কুসাই ও আবদে মানাফ বিন কুসাই।

আবদে মানাফ থেকে আবার চারটি শাখা বের হয়। তারা হলো আবদে শামছ, নওফল, মুত্তালিব, হাশিম। আর এই হাশিমের ঘর থেকে আল্লাহ তাআলা সাইয়েদুনা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিমকে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আ. এর সন্তানগণ থেকে হযরত ইসমাঈল আ. কে মনোনীত করেছিলেন। আর ইসমাঈলের সন্তান থেকে বনু কেনানাকে নির্বাচিত করেছিলেন। বনু কেনানা থেকে বাছাই করেছিলেন কুরাইশকে। আর কুরাইশ থেকে মনোনীত করেছিলেন বনু হাশিমকে। আর বনু হাশিম থেকে পছন্দ করেছিলেন আমাকে**[১০]।

আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **আল্লাহ তাআলা গোটা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করলেন এরপরে আমাকে উত্তম দল ও উত্তম বংশের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এরপরে অনেক কবীলাকে উত্তম সৃষ্টি করলেন আর আমাকে বানালেন সর্বোত্তম কবীলা থেকে। এরপরে অনেক ভালো ঘর তৈরি করলেন আর আমাকে বানালেন সর্বোত্তম ঘর থেকে। সুতরাং, আমি গোটা আরব জাতির মধ্যে মনের দিক দিয়ে এবং বংশের দিক দিয়ে সর্বোত্তম**[১১]।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, **আল্লাহ তাআলা গোটা মাখলুকাতকে সৃষ্টি করলেন এরপরে আমাকে সবচেয়ে উত্তম দলে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে আবার দুই দলে ভাগ করলেন এবং আমাকে উত্তম দলে সৃষ্টি করলেন। এরপরে**

---

[১০] সহীহ মুসলিমঃ কিতাবুল ফাযায়েল- ফযলু নাসাবিন নাবিয়্যী সা. অধ্যায় ৪/১৭৮২ হাদীস নং ১। তিরমিযীঃ কিতাবুল মানাকিব-ফজলুন নাবিয়্যী সা. অধ্যায় ৫/৫৪৪ হাদীস নং ৩৬০৫, একই অর্থে ৩৬০৬।

[১১] তিরমিযীঃ কিতাবুল মানাকিব-ফযলুন নাবিয়্যী সা. অধ্যায় ৫/৫৪৫ হাদীস নং ৩৬০৭, ৩৬০৮।

তাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ করলেন আর আমাকে বানালেন সর্বোত্তম গোত্রে। এরপরে তাদেরকে বিভিন্ন ঘরে ভাগ করে দিলেন আর আমাকে বানালেন সবচেয়ে উত্তম ঘর আর উত্তম মনের অধিকারী।

ধীরে ধীরে আদনানের বংশধরের সংখ্যা যখন বেড়ে চলল তখন একপর্যায়ে তারা বৃষ্টির পানি ও তৃণলতার খোঁজে আরবের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

এর ধারাবাহিকতায় আব্দুল কায়স, বনু বকর বিন ওয়ায়েল এবং বনু তামিমের কতগুলি শাখা হিজরত করে বাহরাইনে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে আবাস গড়ে তোলে।

অপর দিকে বনু হানীফা বিন আলী বিন বকর ইয়ামামার দিকে বের হয়ে চলে যায় এবং হুজ্‌র নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করে। এটা ছিল ইয়ামামার একটি নগর। বনু বকর বিন ওয়ায়েলের সবাই ইয়ামামা থেকে শুরু করে বাহরাইন, কাজেমা উপকূল ও ইরাক উপসাগরীয় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ গোটা এলাকায় পিপীলিকার মতো ছড়িয়ে পড়ে। ইরাকের মরু অঞ্চলের দিকদিগন্ত, উবুল্লা, হীত এর সবগুলি অঞ্চল তাদের দ্বারা ভরে যায়।

বুন তাগলিব ইউফ্রেটিস দ্বীপে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের অনেক শাখা গোত্র বকরে বসবাস করত। আর বনু তামিম বসরার মরু এলাকায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল।

বনু সালিম মদীনার নিকটেই বসবাস শুরু করেছিল। ওয়াদীয়ে কুরা থেকে নিয়ে খাইবর পর্যন্ত একদিকে; অপরদিকে মদীনার পূর্বাঞ্চল থেকে দুই পর্বতের সীমা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে হিরা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল তাদের বংশধররা।

বনু আসাদ তায়মার পূর্ব ও কুফার পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করত। তাদের ও তায়মার মাঝে বনু তাঈ এর ছোট ছোট ঘর বাড়ি ছিল। তাদের ও কুফার মাঝে ছিল পাঁচ দিনের দূরত্ব।

যুবয়ান তায়মা থেকে হূরানের নিকটে বসবাস করত। আর তাহামায় থেকে গিয়েছিল কেনানার শাখা গোত্রগুলি।

এ সকল গোত্রের একে অপরের মাঝে কোনো মিল মিছিলের বাঁধন ছিল না। তারা ছিল শতধাবিচ্ছিন্ন। বহুধাবিভক্ত। কিন্তু এক সময় তাদের মধ্যে আবির্ভাব ঘটে কুসাই বিন কিলাবের। সে তাদেরকে তাদের ইতিহাসে প্রথম বারের মতো ঐক্যের সুতোয় গেঁথে দেয়। তাদের মধ্যে ঐকমত্যের বাজার সরগরম হয়ে ওঠে। বিশ্বের জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের ইয্‌যত ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়[১২]।

---

[১২] বিস্তারিত দেখুন, জামহারাতুন নসব, নসবু মাআদ ওয়াল ইয়ামানিল কাবীর, আনসাবুল কুরাইশিয়্যীন, নেহায়াতুল আর্ব, কালায়েদুল জিমান, সাবায়েকুয যাহাব ইত্যাদি।

আরবের সরকার ও প্রশাসন

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াত ও পয়গামের বিকাশকালে জাযীরাতুল আরবের রাজা-বাদশাগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল:

এক. মুকুটধারী সম্রাট : বাহ্যতঃ তারা মুকুটধারী হলেও প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ছিল না।

দুই. গোত্র ও সম্প্রদায়ের সরদার : মুকুটধারী সম্রাটরা যতটা বৈশিষ্ট্য ও মরতবার অধিকারী ছিল না, তার চেয়ে তাদের প্রতিপত্তি ও বিশেষত্ব একটুকুও কম ছিল না। তাদের সিংহভাগই পুরোপুরি স্বাধীনতা ভোগ করত। আবার কখনো কখনো তাদের কাউকে কোনো মুকুটধারী সম্রাটের অধীনতা মেনে নিতে দেখা যেত।

তৎকালীন আরবের মুকুটধারী সম্রাটরা হলো ইয়েমেন, সিরিয়া ও হীরার সম্রাটগণ। সিরিয়ার সম্রাটগণ ছিল মূলত গাসসানের বংশধর সম্রাট। আর পুরো সিরিয়া না হলেও সিরিয়ার গ্রামীণ এলাকা ছিল তাদের অধীনে। তারা ছাড়া জাযীরাতুল আরবের আর কেউ মুকুটধারী সম্রাট ছিল না। নিম্নে আমরা সে সকল সম্রাট ও সরদারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

ইয়েমেনের সম্রাটগণ

আরবে আরিবার জাতি গোষ্ঠী থেকে ইয়েমেনে যারা সর্বপ্রথম ও প্রাচীন কালে বসবাস করত, তন্মধ্যে একটি হলো কওমে সাবা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত শিলালিপির মাধ্যমে তাদের অবস্থান কাল জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ। তাদের সভ্যতার বিকাশ আর তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তৃতি শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ১১০০ অব্দে।

তাদের সময়কালকে নিম্নোক্ত হিসাবে ভাগ করা যায়:

এক. খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ থেকে ৬২৯ অব্দ

এ সময়ে তাদের রাজ্য মুঈনিয়া রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এটি জাওফ তথা নাজরান ও হাযরা মাউতের মধ্যবর্তী সমভূমিতে বিকাশ লাভ করেছিল। এরপর তাদের রাজ্যের চরম বিস্তৃতি শুরু হয়। পাহাড়ি ঢলের মতো তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিজয়ের দুন্দুভি বাজতে শুরু করে বিকট আওয়াজে আশপাশের প্রতিটি নগরে আর বন্দরে। এমনকি তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি পৌঁছে যায় হিজাযের উত্তরাঞ্চলের উলা ও মাআন এলাকাতেও।

কারও কারও মতে, তাদের উপনিবেশ আরবের বাইরের এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে ব্যবসা ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের মূল ও প্রধান চাবিকাঠি। এরপরে তারা নির্মাণ করে ইতিহাসখ্যাত মাআরিব বাঁধ। ইয়েমেনের ইতিহাসে নামকরা এই মাআরিব বাঁধ তাদের জন্য ছিল এক আসমানি আশীর্বাদ। কারণ এটি তাদের ওপর খুলে দিয়েছিল স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জীবনের প্রয়োজনীয় সকল উপায়-উপকরণের বদ্ধ দুয়ার। حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا (ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল আর তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি) [সূরা ফুরকান : ১৮]

এ সময়ে তাদের সম্রাটদের উপাধি ছিল 'মুকরিবে সাবা'। আর সিরওয়াহ ছিল তাদের রাজধানী শহর। মাআরিব নগরী থেকে ৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং পূর্ব সানা থেকে ১৪২ কিলোমিটার দূরে আজও এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এটি তখন খুরাইবা নামে পরিচিত ছিল। তাদের সম্রাটদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ২২ থেকে ২৬ জন[১৩]।

দুই. খ্রিস্টপূর্ব ৬২০ থেকে ১১৫ অব্দ

এ সময়ে তাদের রাজ্য সাবা রাজ্য নামে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিল। আর তাদের সম্রাটগণ মুকরিব বাদ দিয়ে মুলূকে সাবা তথা সাবার সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেছিল। সিরওয়াহ এর পরিবর্তে এবার তাদের রাজধানী শহর ছিল মাআরিব। পূর্ব সানা শহর থেকে ১৯৬ কিলোমিটার দূরে আজও মাআরিবের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে[১৪]।

তিন. খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ

এ সময়ে তাদের রাজ্য প্রথম হিময়ারী রাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কেননা হিময়ার কবীলা তখন সাবা রাজ্য বিজয় করে তারা দখল করে নিয়েছিল। তাদের সম্রাটগণ 'মুলূকে সাবা ও যী-রিদান' নামে প্রসিদ্ধ। এ সকল সম্রাট মাআরিবের পরিবর্তে রিদানকে তাদের রাজধানী শহর হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আর রিদান পরিচিত ছিল তখন জিফার নামে। ইয়ারিমের কাছাকাছি পাহাড়ে এখনো এ শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এ সময়ে তাদের কপালে অধঃপতনের কালো রেখা বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এক দিকে নাবাতীরা হিজাযের উত্তরাঞ্চলে তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করে চলছিল অপরদিকে মিসর, সিরিয়া ও উত্তর হিজাযে প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরে রোমানরা তাদের সামুদ্রিক ব্যবসায়িক রাস্তাগুলি

---

[১৩] দেখুন আল ইয়ামান আবরাত তারীখ পৃষ্ঠাঃ ৭৭, ৮৩, ১২৪, ১৩০। তারীখুল আরব ক্বলাল ইসলাম পৃষ্ঠাঃ ১০১-১১৩।

[১৪] প্রাগুক্ত।

জয় করে নিয়েছিল। পাশাপাশি তাদের গোত্রগুলি নিজেরা নিজেরা একে অন্যের সঙ্গে অর্থহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল। এ সবকিছুর অনিবার্য ফলাফল ছিল এই যে, তাদের ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়ল। চোখে তারা সর্ষে ফুল দেখতে পেল। এ সকল কারণেই মূলত কাহতানীরা একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। চলে গিয়েছিল একে অন্যকে ছেড়ে দূর-দূরান্তে।

চার. ৩০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইয়েমেনে ইসলামের আগমন পর্যন্ত

এ সময় এ রাজ্য দ্বিতীয় হিময়ারী রাজ্য নামে পরিচিত ছিল। আর তাদের সম্রাটরা পরিচিত ছিল 'মুলূকে সাবা, যী-রিদান, হাযরামাউত এবং ইউমনাত নামে। অস্থিরতা আর অশান্তি হয়ে পড়েছিল রাজ্যের নিত্য সঙ্গী। বিপ্লব, বিদ্রোহ, বিশৃঙ্খলা আর গৃহযুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তার অপরিহার্য অঙ্গ। এ কারণে সে বিদেশি শক্তির লোকমায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। সুযোগ পেয়ে তারাও তাকে এক লোকমায় গিলে নিতে অবহেলা করল না। এভাবে একদিন সে তার বহু কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা হেলায় খেলায় হারিয়ে ফেলেছিল। এ যুগে রোমানরা আদনে প্রবেশ করে ফেলেছিল। তাদের সহায়তায় এবং হামদান ও হিময়ার গোত্রদ্বয়ের মাঝে চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সুযোগ নিয়ে হাবশীরা ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বারের মতো ইয়েমেন দখল করে নিয়েছিল। তাদের এ দখলদারিত্ব এক টানা চলতে থাকে ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এরপরে ইয়েমেন তার স্বাধীনতা ফিরে পায়। কিন্তু ততক্ষণে মাআরিব বাঁধে ছিদ্র দেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে ৪৫০ কিংবা ৪৫১ খ্রিস্টাব্দে সেই প্রবল বন্যা সংঘটিত হলো কুরআনে কারীমে যাকে 'সাইলুল আরিম' বলা হয়েছে। এটা ছিল ইয়েমেনের ইতিহাসে এক চরম দুর্ঘটনা। এতে সেখানকার অঞ্চলগুলো জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন কবীলা ও গোত্র দূর দূরান্তের বিভিন্ন শহর-নগরে চলে গিয়েছিল।

৫২৩ খ্রিস্টাব্দে ইহুদি যুনোয়াস নাজরানের খ্রিস্টানদের ওপর ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ ও শোচনীয় হামলা চালায়। তাদেরকে সে জোরজবরদস্তি করে খ্রিস্টধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করে। যখন তারা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তখন সে তাদের জন্য একটি বিশাল গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে ফেলে পুড়িয়ে মারে। কুরআনে কারীমের সূরা বুরূজের আয়াতগুলো এদিকেই ইঙ্গিত করে। قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (অভিশপ্ত হোক অগ্নিকুণ্ডের অধিবাসীরা) [সূরা বুরূজ : ৪]

আর এতে করে খ্রিস্টানদের মনে প্রতিশোধের আগুন প্রবল উদ্দামে জ্বলে ওঠে। তারা হাবশীদেরকে প্রবল উৎসাহ আর উত্তেজনায় টান টান করে ফেলে। তাদের জন্য তারা সমুদ্র-অভিযান প্রস্তুত করে। এতে করে হাবশা থেকে ৭০

হাজার সেনা অবতরণ করে এবং ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে আরইয়াতের নেতৃত্বে ইয়েমেন দ্বিতীয়বার দখল করে নেয়। আরইয়াত হাবশার বাদশার পক্ষ থেকে সেখানে শাসক হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ৫৪৯ খ্রিস্টাব্দে সে আবরাহা বিন সাবাহ আল আশরম নামে তার সেনাবাহিনীর জনৈক নেতার হাতে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে। এরপরে হাবশার বাদশার মনোরঞ্জন করার মাধ্যমে নিজেকে ইয়েমেনের শাসকের আসনে সমাসীন করে। এই সেই আবরাহা- যে বাইতুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করার মানসে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে মক্কায় আগমন করেছিল। সে ও তার বাহিনী 'আসহাবুল ফীল' তথা হস্তীবাহিনী নামে পরিচিত। হাতির আক্রমণের পরবর্তী সময়ে সানাতে ফিরে আসার পরে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেন। তার পরে ইয়েমেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয় পুত্র ইয়াকসূম। ইয়াকসূমের পরে দ্বিতীয় ছেলে মাসরূক। আবরাহার এই দুই পুত্র ছিল তার চেয়ে আরও বেশি খারাপ। ইয়েমেনবাসীদের ওপর যুলুম নির্যাতনের ক্ষেত্রে; তাদেরকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত আর অপমানিত করার ক্ষেত্রে ছেলেদুটির চরিত্র ছিল তাদের পিতার চেয়ে আরও বেশি খারাপ।

অপরদিকে ইয়েমেনবাসীরা হস্তীবাহিনীর ঘটনার পরে পারস্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। হাবশীদেরকে কঠোর মুকাবেলা করার জন্য তারা দাঁড়িয়ে যায়। তারাই এক পর্যায়ে এসে তাদেরকে ইয়েমেনের মাটি থেকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দেয়। পরিশেষে ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে মা'দিকারিব সাইফ বিন যী ইয়াযিন আল হিময়ারীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন করে। এরপরে তাকে তারা নিজেদের বাদশা বানিয়ে নেয়। মাদিকারিব হাবশীদের একটি দল নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। তারা তার খেদমত করত। তার বাহন নিয়ে চলত। সুতরাং তারা সকলে মিলে এক রাতে তাকে হত্যা করে ফেলে। তার মৃত্যুর সঙ্গে যী-ইয়াযিন বংশ থেকে রাজত্বের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ইয়েমেন পরিণত হয় পারস্যের একটি উপনিবেশে। সেখানে পারস্যের রাজন্যবর্গ একের পরে এক শাসন করতে থাকে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল ওয়াহরায। এরপরে ওয়াহরাযের ছেলে মিরযাবান। এরপরে তার ছেলে তীনজান। তীনজানের পরে তার ছেলে খসরু বিন তীনজান। সবশেষে বাযান। এই বাযান ছিল সর্বশেষ পারস্য শাসনকর্তা। সে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করে। তার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের ওপর পারস্যের প্রভাব প্রতিপত্তির ইতি ঘটে[১৫]।

---

[১৫] বিস্তারিত দেখুন, আল ইয়ামান আবরাত তারীখ পৃষ্ঠাঃ ৭৭-৮৩, ১২৪-১৩০, ১৫৭-১৬১ ইত্যাদি। তারীখে আরযিল কুরআন ১/১৩৩-কিতাবের শেষ পর্যন্ত। তারীখুল আরব ক্বলাল ইসলাম পৃষ্ঠা:১০১-১৫১। কিন্তু এ সকল ঘটনার সময়কাল ও বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের গ্রন্থগুলির মাঝে চরম দ্বৈত পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে কোনো কোনো মুহাক্কিকের মত হলো, 'এগুলি নিছক কল্পকাহিনী'।

হীরার সম্রাটগণ

কূরুশ আল কাবীরের (৫৫৭-৫২৯ খিস্ট পূর্ব) সময় থেকে নিয়ে পারস্যরা ইরাক ও তার আশপাশের রাজ্যগুলি শাসন করত। সেখানে তাদের মুকাবেলা করার মতো কেউ ছিল না। পরিশেষে ৩২৬ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার আল মাকদূনী তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রচণ্ড বীর-বিক্রমের সঙ্গে তাদের সম্রাট দারাকে পরাজিত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। তাদের প্রভাবের কাঁটা উপড়ে দূরে ফেলে দিলো। এতে করে তাদের সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে গেল। এ সকল অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ মুলূকুত-তাওয়ায়েফ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এভাবে ২৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ সকল শাসনকর্তা পৃথক পৃথক হয়ে তাদের শাসনকার্য চালালেন। তাদের শাসনামলেই কাহতানী আরবরা হিজরত করে চলে যায় এবং ইরাকের উর্বর ভূমির কিছু এলাকা দখল করে সেখানে জীবন যাপন করতে থাকে। এরপরে আদনানীদের অনেকেও হিজরত করে সেখানে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাদের সঙ্গে তাদের ঠেলাঠেলি ও প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ইউফ্রেটিস উপদ্বীপের কিছু অংশে গিয়ে তারা সেখানে তাদের স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে।

এ সকল হিজরতকারীর মধ্যে মালিক বিন ফাহম আত- তানূখী সর্ব প্রথম তাদের শাসক নিযুক্ত হয়। সে ছিল কাহতান বংশের। সে বাস করত আনবার কিংবা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায়। তার মৃত্যুর পরে তার ভাই আমর বিন ফাহম তাদের শাসক নিযুক্ত হয়[১৬]। আবার কারও মতে, জাজীমা বিন মালিক বিন ফাহম শাসক নিযুক্ত হয়[১৭]। তার উপাধি ছিল আবরাশ এবং ওয়াজ্জাহ।

পারস্যদের হাতে দ্বিতীয় বার আবার ক্ষমতা ফিরে এল উরদুশির বিন বাবকের যুগে। সে ছিল ইরানের সাসানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ২২৬ খ্রিস্টাব্দে সে এই বংশের রাজত্বের উদ্বোধন করেছিল। সে গোটা পারস্যকে এক পতাকা তলে সমবেত করল। তার রাজত্বের সীমান্তবর্তী আরবদের ওপর সে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল। আর এ কারণে কুযাআরা সিরিয়ার দিকে চলে গেল । কিন্তু হীরা ও আনবারের অধিবাসীরা তার নিকট আত্মসমর্পণ করে বসে পড়ল।

উরদুশিরের রাজত্বকালে হীরা, ইরাকের মরু অঞ্চলের গোটা অধিবাসী এবং জাযীরাতুল আরবের রবীআ ও মুযারের ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করত জাজীমা আল- ওয়াজ্জাহ। উরদুশির সম্ভবত এ কথা বুঝে নিয়েছিল যে, আরবদের ওপর সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় । তেমনিভাবে তার

[১৬] তারীখে তাবারী:২/৫৪০। ইবনে খালদূনও এ মত সমর্থন করেছেন: ২/২/২৩৮। আর জাযীমা ফাহমের পরে শাসক নিযুক্ত হয়। আর সে ছিল তার ভাইপো মালিক ইবনে ফাহম।
[১৭] ইয়াকূবী ১/১৬৯। মাসউদী ২/৯০।

সাম্রাজ্যের সীমান্তকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাও সম্ভব নয় ; তবে তার জন্য কেবল একটি পথই খোলা আছে, আর তা হলো তাদের ওপর তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই এমন কাউকে শাসক বানিয়ে দিতে হবে যার সম্প্রদায় ও কবীলা তাকে সবরকমের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করবে। এতে ফায়েদা হবে এই যে, একদিকে প্রয়োজনের সময় সে রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারবে। অন্যদিকে ইরাকের আরবদেরকে রোমানদের আদলে গড়া সিরিয়ার আরবদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে। তা ছাড়া হীরার শাসকের কাছে সর্বদা পারস্যের সেনাবাহিনীর একটি দল অবস্থান করত। যাতে করে যাযাবর আরবদের কেউ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে নিমেষেই তাকে থামিয়ে দেওয়া যায়। আনুমানিক ২৬৮ খ্রিস্টাব্দে জাজীমার মৃত্যু হয়।

জাজীমার মৃত্যুর পরে আমর বিন আদী বিন নসর আল-লখমী (২৬৮-২৮৮ খ্রি) হীরা ও আনবারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। সে ছিল লুখামী বংশের সর্বপ্রথম শাসক। সে-ই সর্বপ্রথম হীরা শহরকে নিজের বাসস্থান হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তার সময়ে পারস্যের সম্রাট ছিল কিসরা সাবূর বিন উরদুশির। এরপর লখমী শাসকগণ একের পরে এক কিসরা কুবাজ বিন ফিরোযের যুগ পর্যন্ত (৪৪৮-৫৩১খ্রি) হীরার ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন। তার যুগে মাযদাকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সে মানুষকে মুক্তচিন্তা ও স্বেচ্ছাচারিতার দাওয়াত দেয়। কুবায সানন্দে তার ডাকে সাড়া দেয়। প্রজারাও বসে থাকে না। গা ভাসিয়ে দেয় তার আওয়াজের বাঁধ ভাঙা ঢলে। এরপরে কুবায হীরার শাসনকর্তা মুনযির বিন মা-উসসামা (৫১২-৫৫৪ খ্রি) এর কাছে এই ঘৃণিত দর্শন কবুলের দাওয়াত দিয়ে সংবাদ পাঠায়। তিনি আত্মমর্যাদাবোধ আর গাম্ভীর্যভরে তার সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন। কুবায তাকে পদচ্যুত করে। তার জায়গায় হারেস বিন আমর বিন হাজার আল কিন্দীকে হীরার শাসক নিযুক্ত করে। কারণ, সে পরম আগ্রহভরে মাযদাকী মাযহাব গ্রহণের দাওয়াত কবুল করে নিয়েছিল।

কুবাযের পরে পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন কিসরা আন নওশেরওয়া (৫৩১-৫৭৫ খি.)। তিনি এই নতুন মাযহাবকে চরম ঘৃণা করতেন। তিনি মাযদুক ও তার অসংখ্য চাটুকার চামচাকে হত্যা করলেন। মুনযিরকে পুনরায় হীরার শাসকের পদে নিযুক্ত করে হারেস বিন আমরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সে ভয়ে দারে কালব এর দিকে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

মুনযির বিন মা-উসসামা এর পরে তার বংশধরদের মধ্যেই হীরার শাসনকার্য পরিচালনা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে এসে এই ভার পড়ে নুমান বিন মুনযিরের (৫৮৩-৬০৫ খি.)কাঁধে। কিন্তু সম্রাট কিসরা যায়দ বিন আদী আবাদীর পক্ষ

থেকে তার বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপবাদ রটানোর ফলে তার ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হন। এরপরে কিসরা নুমানকে পারস্য দরবারে ডেকে পাঠান। নুমান হীরা থেকে বের হয়ে গোপনে শায়বান বংশের সরদার হানী বিন মাসঊদের নিকট অবতরণ করেন। সেখানে তার নিকট নিজের পরিবার পরিজন আর অর্থ-সম্পদ আমানত রেখে দেন। এরপরে একাকী কিসরার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। কিসরা তাকে কারারুদ্ধ করে রাখেন। দুর্ভাগ্য ছিল তার! শক্ত কারার দুর্লঙ্ঘ্য বেড়ির মধ্যেই গোঙাতে গোঙাতে তার জীবন লীলা সাঙ্গ হয়। এ দিকে হীরার শাসনকার্য তার বদলে ইয়াস বিন কবীসাহ আত তাঈর কাছে অর্পণ করা হয়। তিনি হানী বিন মাসঊদের কাছে নুমানের অর্পিত সবকিছু চেয়ে সংবাদ পাঠান। হানী অহঙ্কারভরে তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ফলাফল দাঁড়ালো ইয়াস অতি অল্প সময়ের মধ্যে পারস্যের সৈন্যসামন্ত ও মিরযাবানের দলকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়। যী কারের কাছে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই হয়। সেখানে বনু শায়বান বিজয় লাভ করে। আর পারস্য বাহিনী বরণ করে চরম পরাজয়ের তিক্ত আস্বাদ। এই সেই অবিস্মরণীয় দিন, পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বারের মতো যেই দিন আরবরা আজমের ওপর বিজয় লাভ করে[১৮]। আর এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্মের পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

ঐতিহাসিকরা এ যুদ্ধের সময় নির্ণয়ের ব্যাপারে চরম মতানৈক্য করেছেন। কারও মতে, এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সামান্য পরবর্তী ঘটনা। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াস বিন কবীসা হীরার শাসক নিযুক্ত হওয়ার আট মাসের মাথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কারও মতে এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত প্রাপ্তির অল্প কিছু দিন আগের ঘটনা। এ মতটিকেই বিশুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী মনে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন এটা ছিল নবুওতের সামান্য কিছু পরের ঘটনা। কারও মতে, এটি হয়েছিল হিজরতের পরে। আবার কেউ বলেন বদর যুদ্ধের পরে। এমন আরও অনেক মতামত রয়েছে।

ইয়াসের পরে পারস্য সম্রাট কিসরা হীরায় একজন পার্সিয়ান হাকীম নিযুক্ত করে। তার নাম ছিল আযাদবিহী বিন মাহবিয়ান বিন মেহরাবিনদাদ। সে ৬১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট সতেরো বছর হীরার শাসনকার্য পরিচালনা করে। এরপরে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হীরার হুকুমত আবারও চলে যায় লখম

[১৮] খলীফা ইবনে খাইয়্যাত তার মুসনাদে (পৃষ্ঠাঃ ২৩) এবং ইবনে সাআদ (৭/৭৭) রাসূল সা. থেকে মারফূ' সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

বংশের হাতে। তাদের মধ্য থেকে নুমান বিন মুনযির মা'রূর উপাধি ধারণ করে হুকুমতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিন্তু তার শাসনকার্যের আট মাস যেতে না যেতেই মুসলমানদের বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে কালিমা খচিত পতাকা উঁচু করে ধরে ঝটিকা বেগে তার ওপর এসে আছড়ে পড়েন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.[১৯]।

সিরিয়ার রাজা বাদশাহগণ

পৃথিবীর দিক দিগন্তে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর হিজরতের জোয়ারে আরবের বুক তখন উথলে উঠছিল। ফুলে উঠছিল বার বার উজান-ভাটির নাটকে। অন্য দশটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাল ঠিক রেখে বনু কুযাআর কয়েকটি শাখা গোত্র সিরিয়ার গ্রামীণ এলাকায় হিজরত করে সেখানে গিয়ে বসবাসের জন্য স্থায়ী আবাস গড়ে তুলল। তারা ছিল বনু সুলাইহ বিন হুলওয়ান গোত্রের লোক। তাদের মধ্য থেকে একটি গোত্র ছিল বনু জাযআম বিন সুলাইহ। তারা জাযাআমাহ নামে পরিচিত ছিল। হিজরত করে সেখানে চলে যাওয়ার পরে রোমানরা তাদেরকে নিজেদের করে নিলো। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল- যাতে করে স্থলভাগের আরবরা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না করতে পারে এবং তাদেরকে যাতে করে পারস্যের বিরুদ্ধে হাতিয়ার স্বরূপ ব্যবহার করা যায়। তাদের মধ্য থেকে একজনকে শাসক বানিয়ে দেওয়া হলো। এরপরে বহু বছর পর্যন্ত তারাই একের পরে এক শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। তাদের শাসকদের মধ্য থেকে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিল যিয়াদ বিন হাবূলা। আর তাদের শাসনকার্যের মেয়াদ ছিল ঈসায়ী দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে নিয়ে সেই শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত। গাস্সানী বংশের আগমনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্তৃত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। তারা জাযাআমাদের কাছ থেকে চরমভাবে প্রতিশোধ নেয় এবং তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদেরকে উজাড় করে ছেড়ে দেয়। তখন রোমান সম্রাট তাদেরকে সিরিয়ার আরবদের ওপর শাসক নিযুক্ত করেন। তাদের প্রধান নগরী আর সবকিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিল বসরা শহর। এভাবে হিজরী ত্রয়োদশ বছর পর্যন্ত গাস্সানীরা রোম সম্রাটদের নিযুক্ত কর্মচারী হয়ে সিরিয়া শাসন করেছিল। পরিশেষে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন খাত্তাব রা. এর যুগে তাদের সর্বশেষ শাসক জাবালা ইবনুল আইহাম ইসলামের সামনে মাথা নত করে আত্মসমর্পণ করে বসে পড়েন[২০]।

---

[১৯] বিস্তারিত দেখুন তাবারী, মাসউদী, ইবনে কুতাইবা, ইবনে খালদূন, বালাযূরী ও ইবনুল আসীর প্রমুখের গ্রন্থে।

[২০] বিস্তারিত দেখুন তাবারী, মাসউদী, ইবনে কুতাইবা, ইবনে খালদূন, বালাযূরী, ইবনুল আসীর প্রমুখের গ্রন্থে।

হিজাযের প্রশাসন

হযরত ইসমাঈল আ. যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মক্কার সরদার এবং বাইতুল্লাহর অভিভাবক। অতঃপর তিনি ১৩৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন[২১]। তাঁর ইন্তেকালের পরে এক ব্যক্তির হাতে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কারও কারও মতে তাঁর দুই ছেলের হাতে অর্পণ করা হয়। প্রথমে নাবেত পরবর্তী কালে কায়দার। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এরপরে মক্কার নেতৃত্ব কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয় তাদের পিতামহ মুজাজ বিন আমর আল জুরহুমীর নিকট। এভাবে জুরহুম বংশ মক্কার অভিভাবক হয়ে বসে। তাদের হাতেই ক্ষমতা পুঞ্জিভূত থাকে পরবর্তী সবক'টি শতাব্দী। জনগণ ইসমাঈল আ. এর বংশধর কাউকে দেখলে সম্মান ও ইয্যত করত। কারণ তাদের বাপ-দাদারাই আল্লাহর পবিত্র এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। তবে সরকার কিংবা প্রশাসনে তাদের দাঁড়ানোর এতটুকু জায়গা ছিল না[২২]।

দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস এভাবেই কেটে যায়। হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধররা পৃথিবীর সব ধরনের আলোচনার মঞ্চ থেকে নির্লিপ্ত থাকে। পরিশেষে বখতেনাসারের আবির্ভাবের আগে বনু জুরহুম চরম দুর্বল হয়ে পড়ে। আর তখন থেকেই বনু আদনানের রাজনৈতিক তারকা মক্কার আকাশের দিগন্ত রেখায় দীপ্তিমান হয়ে চমকাতে থাকে। এটা বোঝা যায় যাতুল ইরাকে আরবদের বিরুদ্ধে বখতেনাসারের যুদ্ধের ইতিহাসের মাধ্যমে। কারণ সে সময়ের আরবদের নেতা জুরহুমী নয়; বরং আদনানী ছিল[২৩]।

বখতেনাসার দ্বিতীয় (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দ) এর যুদ্ধাভিযানের সময়ে বনু আদনান ইয়েমেনের দিকে ভেগে যায়। এ সময়ে বনী ইসরাঈলে নবী ছিলেন হযরত ইরমিয়া আলাইহিস সালাম। তার সঙ্গী বুরখিয়া আদনানের ছেলে মাআদকে নিয়ে এ সময় সিরিয়ার হারানে চলে যান। বুখতেনাসারের যুলুম নির্যাতনের ধারা বন্ধ হলে মাআদ মক্কায় ফিরে এলেন। কিন্তু সেখানে এসে তিনি বনু জুরহুমের কেবল জাওশাম বিন জুলহুমাকেই দেখতে পেলেন। এরপর তিনি তার মেয়ে মুআনাকে বিবাহ করেন এবং তাদের থেকে নাযার নামে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে[২৪]।

---

[২১] সাফরুত তাকবীন ২৫:১৭। তারীখে তাবারী ১/৩১৪। তাঁর অন্য এক বর্ণনা ও ইয়াকূবী (১/২২২) প্রমুখের মতে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন ১৩০ বছর বয়সে।

[২২] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১১১-১১৩। তাছাড়া ইবনে হিশাম ইসমাঈল আ. এর বংশধরের মধ্য থেকে কেবল নাবেতের শাসক হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন।

[২৩] তারীখে তাবারী ১/৫৫৯।

[২৪] তারীখে তাবারী ১/৫৫৯, ৫৬০, ২/২৭১। ফাতহুল বারী ৬/৬২২।

এরপরে মক্কায় জুরহুমের অবস্থার আবারও অবনতি ঘটতে থাকে। তাদের অবস্থা দিনে দিনে আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এ সময়ে তারা মক্কায় আগত অতিথিদের ওপর যুলুম করত। কাবার অর্থ সম্পদকে তারা তাদের জন্য হালাল মনে করত[২৫]। এটা ছিল এমন একটি গর্হিত কাজ আদনানীরা যাকে চরম ঘৃণা করত এবং তারা তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হতো। যখন বনু খুযাআ মাররুয-যাহরানে এসে অবতরণ করল এবং জুরহুমীদের প্রতি আদনানীদের ঘৃণা ও বিরাগ প্রত্যক্ষ করল তখন তারা এই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে লুফে নিলো। তারা আদনানের শাখা বনু বকর বিন আবদে মানাফ বিন কেনানার সহায়তায় জুরহুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এক পর্যায়ে তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দূর দেশে নির্বাসনে পাঠালো এবং ঈসায়ী দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে মক্কার হুকুমতের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করল।

যখন বনু জুরহুম নির্বাসনে যেতে বাধ্য হলো তখন যাওয়ার আগে একটি ঢাকনা দিয়ে যমযমের কূপ বন্ধ করে এর স্থান মিটিয়ে দিলো। আর কিছু জিনিস এর ভেতরে দাফন করে রেখে গেল।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমর বিন হারেস বিন মুজায আল জুরহুমী[২৬] কাবার স্বর্ণ হরিণদুটি[২৭] ও হজরে আসওয়াদ পাথরটি যমযম কূপে দাফন করে দিলো। এরপরে তারা সবাই ইয়েমেনে চলে গেল। মক্কা ও মক্কায় তাদের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করার মুহূর্তটি তাদের জন্য ছিল সত্যিই বড় বেদনাময়। এ সম্পর্কে আমর বলেন,

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا ... أَنِيسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّةَ سَامِرٌ

بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَا ... صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْجُدُودُ الْعَوَاثِرُ[28]

'মনে হয় হিজুন থেকে সাফা পর্যন্ত কোনো সুহৃদ ছিল না।
মনে হয় রাতের বেলার চাঁদের আলোতে মক্কায় গল্প বলার কেউ ছিল না॥
কেন থাকবে না ?

---

[২৫] তারীখে তাবারী ২/২৮৪।

[২৬] ইসমাঈল আ. এর ঘটনায় উল্লিখিত মুজায জুরহুমী আল আকবর আর ইনি ভিন্ন দুই ব্যক্তি।

[২৭] মাসউদী বলেন, প্রথমদিকে পারস্যবাসীরা কাবার প্রতি বিভিন্ন ধন-সম্পদ আর স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি হাদিয়া পাঠাতো। এভাবে এক পর্যায়ে সাসান ইবনে বাবেক দুইটি স্বর্ণ-হরিণ, মূল্যবান মণি-মাণিক্য, স্বর্ণালঙ্কার ও তরবারি ইত্যাদি পাঠালো। কিন্তু আমর তা যমযম কূপে ফেলে দিয়েছিল। বাকি একদল ঐতিহাসিকের মতে, এগুলি ছিল জুরহুম গোত্রের। তারা যখন মক্কায় বসবাস করত তখন এ ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু জুরহুমের খুব একটা ধন সম্পদ ছিল না এ কারণে এটা তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। তবে তার জায়গায় অন্য কেউ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। মুরূজুয যাহাব ১/২৪২,২৪৩।

[২৮] ইবনে হিশাম ১/১১৪,১১৫। তারীখে তাবারী ২/২৮৫।

আমরাই তো ছিলাম তার বাসিন্দা!

কিন্তু যুগের পরিবর্তন আর ভাঙা কপাল আমাদেরকে উজাড় করে ছেড়েছে'॥

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর সময়কাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ২০০০ অব্দ। এ হিসেবে মক্কায় জুরহুমের অবস্থান হয়ে থাকবে একুশ শতাব্দী আর মক্কায় তাদের হুকুমত হয়ে থাকবে প্রায় বিশ শতাব্দী।

বনু খুযাআ মক্কাকে নিজের একচেটে সম্পদে পরিণত করেছিল। এ সম্পদে বনু বকরের কোনো অংশ ছিল না। কিন্তু মুযার গোত্রগুলোর মধ্যে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল :

এক. হাজীদেরকে আরাফা থেকে মুযদালিফায় নিয়ে যাওয়া এবং নফরের দিন (তথা যিলহজের ১৩ তারিখ) তাদেরকে মীনা থেকে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেওয়া। এই ইয্যত ছিল ইলয়াস বিন মুযার এর শাখাগোত্র বনু গাউস বিন মুররাহর ভাগে। তারা নিজেদেরকে সুফাহ বলে ডাকত। এই ইয্যতের অর্থ হলো- নফরের দিন সুফাহদের মধ্য থেকে যতক্ষণ না কমপক্ষে একজন লোক রমী করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কেউ রমী করতে পারত না। এরপরে মানুষ যখন রমী করে শেষ করে মীনা থেকে চলে আসার ইচ্ছা করত তখন সুফাহরা আক্বাবার উভয় পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। নিয়ম ছিল তারা এখান থেকে অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত কেউ যেতে পারবে না। এর পরে এক সময় তারা তাদের ইচ্ছা মতো মানুষের জন্য পথ ছেড়ে দিত। পরবর্তী সময়ে যখন সুফাহদের পতন ঘটল তাদের জায়গা এসে দখল করল তামিমের শাখা বনু সা'দ বিন যায়দ ।

দুই. কুরবানীর দিন সকাল বেলা মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন। আর এটা ছিল বনী আদাওয়ানের অধিকার।

তিন. আশহুরুল হুরুম তথা হারাম সামসমূহ আগ-পরে করা। এটা ছিল বনু কেনানার শাখা বনু ফুকাইম বিন আদীর অধিকার[২৯]।

পবিত্র মক্কার ওপর বনু খুযাআর হুকুমত এভাবে চলতে থাকে একটানা তিন শ' বছর[৩০]। তাদের শাসনামলেই আদনানীরা নজদ এবং ইরাক ও বাহরাইনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কার চারপাশে তখন বাকি রয়ে গিয়েছিল কেবল কুরাইশের কয়েকটি শাখাগোত্র। তারা ছিল হুলূল এবং সির্ম। তা ছাড়া বনু কেনানার কতগুলি বিচ্ছিন্ন ঘর রয়ে গিয়েছিল। তবে মক্কার হুকুমত কিংবা বাইতুল্লাহ শরীফের কোনো ব্যাপারে তাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার ছিল

---

[২৯] ইবনে হিশাম ১/৪৪,১১৯,১২২।

[৩০] ইয়াকূত 'মক্কা' দ্রষ্টব্য। ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩। মাসউদীর মুরূজুয যাহাব ২/৫৮।

না। এভাবেই যখন চলছিল তাদের জীবন গাড়ির চাকা। এক সময় তখন তাদের মধ্যে এসে হাযির হন কুসাই বিন কিলাব[৩১]।

কুসাই সম্পর্কে ইতিহাসে যা পাওয়া যায় তা হলো- তিনি তার মায়ের গর্ভে থাকতেই তার পিতা মারা যায়। তখন তার মা বনু উযরার রবীআ বিন হারামের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরে রবীআ তাকে নিয়ে সিরিয়ায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার নিজের এলাকায় চলে যান। কিন্তু কুসাই যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন সে মক্কায় ফিরে আসেন। তখন মক্কার শাসক ছিল বনু খুযাআর হুলাইল বিন হাবশিয়াহ। কুসাই তখন হুলাইলের নিকট তার মেয়ে হুব্বার বিবাহের প্রস্তাব দেন। হুলাইল এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং মেয়েকে তার নিকট বিবাহ দেন[৩২]। কিন্তু হুলাইল যখন মারা যায় তখন খুযাআ আর কুরাইশের মাঝে দেখা দেয় এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। পরিশেষে কুসাই বিজয় লাভ করে। মক্কা ও বাইতুল্লাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার আধিপত্য।

উল্লিখিত লড়াইয়ের কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তিনটি বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

এক. দিনে দিনে মক্কায় যখন কুসাইয়ের ছেলে সন্তান বৃদ্ধি পায়; তার অর্থ-সম্পদ বেড়ে যায়; তার সম্মান আর ইয্যতের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয় এবং এ অবস্থায় যখন হুলাইলের মৃত্যু হয় তখন কুসাই খুযাআ কিংবা বনু বকরের চেয়ে নিজেকে মক্কা ও হারাম শরীফের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকতর যোগ্য ভাবতে থাকেন। আর কুরাইশরা ছিল ইসমাঈল পরিবারের হর্তাকর্তা ও বিশুদ্ধতার অধিকারী। তখন তিনি কুরাইশ ও বনু কেনানার কতিপয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে খুযাআ ও বনু বকরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বললে তারা তার প্রস্তাব সানন্দচিত্তে মেনে নেয়[৩৩]।

দুই. খুযাআরা মনে করেছিল যে, হুলাইল তার মৃত্যুর পূর্বে কুসাইকে কাবা শরীফ ও মক্কার ওপর নিজের নেতৃত্ব কায়েম করার জন্য ওসিয়ত করে গিয়েছিল। কিন্তু খুযাআরা এটা মেনে নিতে পারছিল না। আর তাই উভয়ের মাঝে জ্বলে ওঠে সংঘাত আর সংঘর্ষের লাল আগুন[৩৪]।

তিন. হুলাইল তার মেয়ে হুব্বার হাতে কাবার হুকুমতের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিল এবং আবু গুবশান৩৫ খুযাঈকে তার উকীল নিযুক্ত করেছিল। তখন

---

[৩১] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১১৭।
[৩২] প্রাগুক্ত ১/১১৭,১১৮।
[৩৩] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১১৭,১১৮। তাবারী ২/২৫৫,২৫৬।
[৩৪] প্রাগুক্ত ১/১১৮। রাওযুল আনফি ১/১৪২।
[৩৫] ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩। রাওযুল আনফি ১/১৪২।

আবু গুবশান হুব্বার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু সে তার মনের নিভৃত কুঠরিতে সযত্নে লালন করত ভিন্ন এক বাসনা। পরবর্তী সময়ে হুলাইল যখন মারা গেল তখন কুসাই তাকে ধোঁকা দিলো এবং তার থেকে কিছু উট কিংবা মদের পেয়ালার বদলে বাইতুল্লাহর নেতৃত্ব কিনে নিলো। কিন্তু খুযাআ এই বেচা-কেনায় সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তাই কুসাইকে তারা কা'বা থেকে সবরকমের বাঁধা দেওয়ার কোশেশ করে যাচ্ছিল। তখন কুসাই কুরাইশ ও বনু কেনানার কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে খুযাআকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার প্রস্তাব করল। তারা আগ্রহের সঙ্গে তার প্রস্তাবকে সমর্থন করল[৩৬]।

যাই হোক। যখন হুলাইলের মৃত্যু হলো এবং সুফাহরা যা করার করল তখন কুসাই কুরাইশ ও কেনানার কিছু ব্যক্তিবর্গ নিয়ে আক্বাবার নিকটে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো। সে তাদের উদ্দেশ্যে বলল : আমরা তোমাদের চেয়ে এই পবিত্র গৃহের অধিক হক্বদার। তখন তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। এক সময় এ যুদ্ধ শেষ হলো কুসাইয়ের চূড়ান্ত বিজয়ের মধ্য দিয়ে। তখন খুযাআ ও বনু বকর কুসাইয়ের কাছ থেকে চলে গেল। কিন্তু কুসাই সামনে বাড়ল এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্ণ ইরাদা করল। এরপরে উভয় দল প্রকাশ্য সমরে একে অন্যের মুখোমুখি হলো। ভীষণ যুদ্ধ হলো। উভয় পক্ষেরই মারা গেল হাজার হাজার যোদ্ধা। এরপরে তারা সন্ধির আবেদন করল। এ উপলক্ষে বনু বকরের ইয়ামুর বিন আউফকে তারা হাকিম নিযুক্ত করল। ইয়ামুর ফয়সালা করল : কুসাই এই কাবা ঘর আর মক্কার হুকুমতের ব্যাপারে খুযাআর চেয়ে অধিক হক্বদার। কুসাই তাদের থেকে যে রক্ত ঝরিয়েছে সবগুলি বাতিল। সেগুলি তার পায়ের কাছে অর্ঘ্য হিসেবে পেশ করা হবে। এর বিপরীতে খুযাআ ও বনু বকর যে রক্ত ঝরিয়েছে তার দিয়ত দিতে হবে। আর কুসাই ও কাবা ঘরের মাঝখানে কোনো বাঁধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। আর সে দিন থেকে ইয়ামুরের নাম হয়েছিল শিদাখ[৩৭] (তথা বাতিলকারী)।

খুযাআ প্রায় তিনশ' বছর কাবা ঘরের ওপর কর্তৃত্ব করেছিল। আর কুসাই কাবা ঘর ও মক্কার ওপর বিজয় লাভ করেছিল ঈসায়ী পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে ৪৪০ খ্রিস্টাব্দে[৩৮]। এভাবে প্রথমে কুসাই এবং শেষে ও চূড়ান্ত পরিণতিতে কুরাইশরা মক্কার ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তির ইমারত নির্মাণ করে।

---

৩৬ তারীখে ইয়াকূবী ১/২৩৯। ফাতহুল বারী ৬/৬৩৪। মাসউদী ২/৫৮।

৩৭ বিস্তারিত দেখুন সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১২৩,১২৪। তারীখে তাবারী ২/২৫৫-২৫৮।

৩৮ ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩। মাসউদী ২/৫৮। কুলবু জাযীরাতিল আরব পৃ:২৩২।

কুসাইকে বানানো হলো এই গৃহের জন্য প্রধান ধর্মীয় নেতা। যেই গৃহে প্রতিদিন জাযীরাতুল আরবের দূর দূরান্ত থেকে আগত লাখো মানুষের ঢল নামত।

কুসাই তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পরে যে সকল কাজ করেছিলেন তন্মধ্যে কিছু হলো : তিনি তার কওমকে মক্কায় একত্র করলেন। এরপর তাদের মাঝে জমি বণ্টন করে দিলেন। এর পাশাপাশি কুরাইশের প্রতিটি কওমকে তাদের আগের মনযিলে অবতারণ করলেন এবং নাসা, সফওয়ান, আদওয়ান ও মুররাহ ইবনে আওফের সন্তানদেরকে তাদের আগের পদে বহাল রাখলেন। কেননা, তিনি এটাকে তার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব মনে করতেন। যার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা তার পক্ষে কখনোই সমীচীন হবে না[৩৯]।

কুসাইয়ের কিছু অমর কীর্তি ও অবদান হলো : তিনি বাইতুল্লাহ শরীফের উত্তর পাশে 'দারুন নদওয়া' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর দরজা রেখেছিলেন সোজা মসজিদের দিকে। এটা ছিল কুরাইশের সভাকক্ষ। এখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত ও নিষ্পত্তি হতো। কুরাইশের ওপর এ গৃহের ছিল বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা, তার পেটে বসেই তাদের যে কোনো দ্বিমত ঐকমত্যে পৌঁছত এবং যে কোনো সমস্যার তারা সুন্দর সমাধান পেত[৪০]।

ওপরন্তু এটা ছাড়াও কুসাইয়ের বিশুদ্ধ নেতৃত্ব আর যোগ্যতার বিশেষ কয়েকটি নিদর্শন ছিল :

এক. দারুন নদওয়ার প্রধান পদের অধিকারী : কুরাইশরা এখানে বসে গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের পরামর্শ করত। এখানে বসেই তারা তাদের মেয়েদেরকে বিবাহ দিত।

দুই. পতাকা : এ ঘরে বসেই তার হাতে কিংবা তার কোনো সন্তানের হাতে যুদ্ধ বা যে কোনো পতাকা বাঁধা হতো।

তিন. নেতৃত্ব : এটা হলো সফরের নেতৃত্ব। মক্কা থেকে ব্যবসা কিংবা যে কোনো উদ্দেশ্যে যে কোনো কাফেলা বের হলে তা বের হতো তার নিজের কিংবা তার সন্তানদের নেতৃত্বে।

চার. কা'বার গিলাফ পরানো : কাবার শরীফের গিলাফ পরানোর অধিকার ছিল একমাত্র তাদের। কাবার দরজা তারা ছাড়া আর কারও খোলার অধিকার ছিল না। এর সঙ্গে সঙ্গে কাবার খেদমত এবং কাবার দরজার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল তাদের অধিকারে।

পাঁচ. হাজীদের পানি পান করানো : তারা যমযমের পানি দিয়ে অনেকগুলো পেয়ালা ও হাউয ভরে রাখত এবং তাতে খেজুর ও কিশমিশ মিশিয়ে মিষ্ট করে

---

[৩৯] ইবনে হিশাম ১/১২৪,১২৫।

[৪০] প্রাগুক্ত ১/১২৫। ইখবারুল কিরাম বিআখবারিল মাসজিদিল হারাম পৃ:১৫২।

রাখত। এরপরে হাজীরা যখন মক্কায় আগমন করত, তখন তারা তা থেকে পানি পান করত।

ছয়. হাজীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা: এটা হলো আতিথেয়তাস্বরূপ তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা। কুসাই এ কারণে কুরাইশদের ওপর কর নির্ধারণ করে দিয়েছিল হজ্জের মৌসুমে তাদের সম্পদ থেকে তা দিতে হতো। এরপরে এর দ্বারা হাজীদের জন্য খাবার তৈরি করা হতো। যার কোনো কিছুর সামর্থ্য কিংবা পাথেয় না থাকত সে এই খাবার খেত[৪১]।

এ সবকিছু ছিল কুসাইয়ের অবদান। তার ছেলেদের মধ্যে আবদে মানাফ তার জীবদ্দশাতেই মানুষের শ্রদ্ধা আর সম্মানের পাত্রে পরিণত হয়েছিল। আব্দুদ্দার ছিল তার বড় ভাই। বলা হয়ে থাকে কুসাই তার উদ্দেশে বলেছিলেন: আমি তোমাকে আমার কওমের সরদার বানাচ্ছি যদিও তারা তোমার চেয়ে সম্ভ্রান্ত। এরপর তাকে তার সঙ্গে কুরাইশের কি কি কল্যাণ জড়িত আছে সবকিছু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিলেন। তার কাছে দারুন নদওয়া, পতাকা, নেতৃত্ব, কাবায় গিলাফ পরানো, হাজীদেরকে পানি পান করানো এবং তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কেউ কোনো দিন কুসাইয়ের বিরোধিতা করত না কিংবা তিনি কোনো কাজ করলে কেউ তার প্রতিবাদ করত না। তার জীবদ্দশায় এবং এমনকি তার মৃত্যুর পরেও তার কাজকে মানুষ ধর্ম মনে করে পরম ভক্তিভরে পালন করত। সুতরাং, তিনি যখন মৃত্যুবরণ করলেন কোনো মতবিরোধ ছাড়াই সকলে তার রেখে যাওয়া অসিয়ত অনুসারে কাজ সম্পাদন করল। কিন্তু গোলমালটা বাঁধল আবদে মানাফের মৃত্যুর পরে। সে যখন মারা গেল তখন তার ছেলেরা চাচা আব্দুদ্দারের ছেলেদের সঙ্গে পদ নিয়ে মারামারি কাটাকাটি শুরু করে দিলো। এভাবে কুরাইশরা দুটি ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে রণ দুন্দুভি বেজে ওঠার উপক্রম হয়। কিন্তু পরক্ষণে তারা উভয় পক্ষ থেকে সন্ধির ডাক দেয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তারা এ সকল পদ তাদের উভয়দলের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নেয়। এ হিসেবে হাজীদেরকে পানি পান করানো, সাহায্য সহযোগিতা প্রদান আর কাফেলার নেতৃত্বদান ইত্যাদি পড়ে বনু আবদে মানাফের ভাগে। আর দারুন নদওয়া, পতাকা আর কা'বায় গিলাফ পরানোর দায়িত্ব-অধিকার চলে যায় বনু আব্দুদ্দারের ভাগে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, দারুন নদওয়া উভয় গোত্রের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরে বনু আবদে মানাফ যা কিছু পেয়েছিল তা

---

[৪১] ইবনে হিশাম ১/১৩০। তারীখে ইয়াকূবী ১/২৪০,২৪১।

নিয়ে নিজেদের মধ্যে লটারি দিলো। লটারিতে পানি পান ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান গিয়ে পড়ল হাশিমের ভাগে আর কাফেলার নেতৃত্ব গিয়ে পড়ল আবদে শামছের ভাগে। এরপরে হাশিম বিন আবদে মানাফই সারা জীবন তাদের গোত্রের দায়িত্ব দুটি পালন করেন। তার মৃত্যুর পরে এ অধিকার লাভ করেন তার ভাই মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ। এরপরে এই দায়িত্ব পান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ। এরপরে পান তার ছেলেরা। ঠিক তখনই ইসলামের উত্থান ঘটে। আর এই দায়িত্ব লাভ করেন আব্বাস রা.।

কারও কারও মতে, কুসাই এ সকল দায় দায়িত্ব নিজ ছেলেদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে যার যার ছেলেরা সেগুলো উল্লিখিত নিয়মে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ[৪২]।

আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি এগুলি ছাড়া কুরাইশদের আরও কিছু বিশেষ পদ ও অধিকার ছিল। সেগুলি তারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা একটি ছোট রাজ্য- বরং আরও বিশুদ্ধভাবে বলা যায় তারা একটি ছোট গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। বর্তমান কালে জাতীয় সংসদে যেমন অধিবেশন ও বৈঠক থাকে সে যুগে তাদেরও তেমন বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ ও বৈঠক ছিল। সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো নিম্নরূপ:

১. ঈছার তথা ভাগ্য বণ্টনের জন্য মূর্তির সামনে স্থাপিত পাত্রগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ। এই যিম্মাদারি ছিল বনু জুমাহর কাঁধে।

২. মূর্তি ও প্রতিমার কাছে যে সকল হাদিয়া ও উপঢৌকন আসত সেগুলো সুবিন্যস্ত ও সাঁজিয়ে রাখা এবং ঝগড়া-বিবাদের সুন্দর সমাধান করা। এই যিম্মাদারি ছিল বনু সাহমের কাঁধে।

৩. মশওরা করা। এটা ছিল বনু আসাদের ভাগে।

৪. আশনাক তথা দিয়ত ও জরিমানা ইত্যাদি সুসম্পন্ন করা। এটা ছিল বনু তায়মের দায়িত্ব।

৫. আল ইকাব তথা জাতীয় পতাকা বহন করা। এটা ছিল বনু উমাইয়্যার অধিকার।

৬. আল কিবাহ তথা সেনাবাহিনীর বিন্যস্তকরণ এবং অশ্ব পরিচালনা। এটা ছিল বনু মাখযূমের অধিকার।

৭. দূতালিকরণ। এটা ছিল বনু আদীর যিম্মাদারি[৪৩]।

---

[৪২] ইবনে হিশাম ১/১২৯-১৩২,১৩৭,১৪২,১৭৮,১৭৯। দেখুন ইয়াকূবী ১/২৪১।

[৪৩] তারীখু আরযিল কুরআন ২.১০৪-১০৬। কথিত আছে, পতাকা বহন করার যিম্মাদারি ছিল বনু আব্দুদ্দারের কাঁধে-যেমনটি আগে বলা হয়েছে। তবে ব্যাপক হর্তাকর্তার মালিক ছিল বনূ উমাইয়্যা।

আরবের নেতা ও শাসকগণ

আমরা ইতঃপূর্বে কাহতানী আর আদনানী আরবের কবীলাগুলোর হিজরতের কথা উল্লেখ করেছি। আমরা আরও বলে এসেছি যে, তারা গোটা আরবকে তাদের মাঝে ভাগ করে নিয়েছিল। এ সকল কবীলার যারা হীরার কাছাকাছি এলাকায় বসবাস করত তারা হীরার আরব শাসকের অধীনে ছিল। আর তাদের মধ্য থেকে যারা সিরিয়ার কাছাকাছি ছিল তারা গাস্‌সানী শাসকদের অধীনে ছিল। তবে এই পরাধীনতা ছিল নামে মাত্র। বাস্তবে এই পরাধীনতার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। আর তাদের বিপরীতে জাযীরাতুল আরবের মরু বিয়াবানের নীচের বালু, ওপরের সূর্য আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকত যে সকল যাযাবর মানুষ; তারা ছিল পুরোপুরি স্বাধীন আর আযাদ ইনসান।

আসল কথা হলো, এই কবীলাগুলি তাদের পছন্দ মতো কাউকে তাদের সরদার ও নেতা বানাত এরপরে সকলে তার অনুসরণ করত। একেকটি কবীলা ছিল একেকটি ছোট ছোট রাজ্য। এর রাজনৈতিক অবকাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দেশের মাটির রক্ষণাবেক্ষণ আর শত্রুকে বিতাড়িত করার মধ্যে খুঁজে পাওয়া পারস্পরিক ফায়েদা অর্জন।

কবীলা ও গোত্রপ্রধানের মর্যাদা ছিল রাজা বাদশাহদের মর্যাদার স্তরে। প্রত্যেকটি কবীলা তার যুদ্ধ-সন্ধি, শান্তি-অশান্তি সবসময় আন্তরিকতার সঙ্গে সরদারের আনুগত্য করত। কোনো সময়ই তার আদেশ থেকে একটুও পিছু হটত না। একজন একনায়কতন্ত্রী শাসকের যতটা প্রভাব আর একচেটে ক্ষমতা থাকে সে সময়ের একটি গোত্রের সরদার কিংবা একটি কবীলাপ্রধানের ততটা ক্ষমতা ছিল। এমনকি যদি তাদের কেউ কখনো কারও ওপর ক্রুদ্ধ হতেন তবে চোখের পলকে হাজার হাজার তরবারি ঝিলিক মেরে উঠত। একটি বারের মতো কারণ জিজ্ঞাসা করার পেছনে পড়ত না। কিন্তু যখন নিজেরা নিজেরা ক্ষমতার জন্য রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মেতে উঠত তখন তা তাদেরকে মানুষের সঙ্গে মুসাহেবি করার দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকত। প্রচুর পরিমাণে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করত। অতিথিদেরকে সম্মান করত; দয়া ও অনুগ্রহের মায়াজাল বিছিয়ে সরলমনা মানুষকে শিকারের ফন্দি আঁটত। বীরত্ব জাহির করত। আত্মমর্যাদাবোধ রক্ষার প্রয়াস পেত। উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষের সম্মান আর শ্রদ্ধা কুড়ানো। আর বিশেষ করে কবিদের প্রিয়ভাজন হওয়া। কেননা, সে যুগে তারাই ছিল একটি জাতির মুখপাত্র। তার নায়ক। এভাবে তারা একে অন্য প্রতিযোগীদেরকে পেছনে ফেলে নিজে সামনে চলে যাওয়ার প্রত্যাশায় দিবানিশি ব্যস্ত ছিল।

দেশের সরদার আর নেতাগণ কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। তারা গনীমতের সম্পদ থেকে মিরবা', সফী, নাশীতাহ এবং ফুযূল ইত্যাদি গ্রহণ করত। কবির ভাষায়:

لَكَ الْمِرْبَاعُ فِيهَا وَالصَّفَايَا ... وَحُكْمُكَ وَالنَّشِيطَةُ وَالْفُضُولُ

'আমাদের মধ্য থেকে তোমার জন্য গনীমতের মালের এক চতুর্থাংশ ও নির্বাচিত সম্পদ এবং ঐ সম্পদ, তোমরা যা বণ্টন করো। আর যা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছার আগেই রাস্তায় ফুরিয়ে যায় এবং যা বণ্টন করার পর বাড়তি থেকে যায়'।

মিরবা' হলো গনীমতের মালের এক চতুর্থাংশ। সফী হলো বণ্টনের পূর্বে গোত্র প্রধান নিজের জন্য যা পছন্দ করে নিয়ে যেতেন। নাশীতাহ বলা হয় গোত্রের মধ্যে গনীমতের মাল নিয়ে আসার আগেই রাস্তায় বসে সরদারকে যা দেওয়া হতো। ফুযূল হলো গনীমতের মাল বণ্টন করার পরে যা অতিরিক্ত থেকে যায় এবং যা আর বণ্টনের সুযোগ থাকে না যেমন উট, ঘোড়া ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অবস্থা

আরবের শাসক ও সরদারদের অবস্থা বর্ণনা করার পরে এখন একত্রে সমগ্র আরবের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করা বিধেয় মনে হচ্ছে। কোনো বাড়াবাড়ি ছাড়াই বলা যায় আরব সীমান্তের অন্যান্য দেশের প্রতিবেশী তিনটি ভূখণ্ডেরই রাজনৈতিক অবস্থা ছিল তখন অধঃপতন আর বিশৃঙ্খলার সর্বশেষ প্রান্তে। এ সকল এলাকার মানুষ রাজা ও প্রজা, শাসক ও শাসিত আর মনিব ও চাকরের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যেখানে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের-বিশেষত যখন তারা বাইরের কেউ হতো- লাভের বাজার ছিল সরগরম সেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর ও জরিমানা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যেত। আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, প্রজাগণ ছিল ক্ষেত-খামারের ন্যায়; যার একমাত্র কাজ ছিল রাষ্ট্রকে চোখ জুড়ানো যতসব ফসল উপহার দেওয়া। আর রাষ্ট্র ছিল ভোগবাদী জীবনের সফল নায়ক; যার কাজই ছিল নিজের সুখ আর আনন্দে, প্রবৃত্তির খোলা ময়দানে, যুলুম আর নির্যাতনের কারাগারে সেগুলি নির্বিচারে উড়িয়ে দেওয়া। সাধারণ মানুষ জাহেলিয়াতের ঘনঘোর অন্ধকারে জীবনের প্রতিটি পদে পদে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল। যুলুম আর নির্যাতনের শিকল তাদের গলায় পড়ে শ্বাসরোধ করার উপক্রম করেছিল। অত্যাচারের কালো মেঘ চতুর্দিক থেকে অক্টোপাসের ন্যায় তাদেরকে ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু তারা এত সব অত্যাচারের প্রতি সামান্য একটু বিড়বিড় কিংবা আহ শব্দটুকু করার অনুমতি পেত না। বরং রঙ বেরঙের লোমহর্ষক এ সব শাস্তি তাদেরকে নিঃশব্দে সয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হতো। সরকার ও প্রশাসন চরম একঘেয়েমির পাঁকে আটকে পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিপীড়িত বনী আদমের অধিকার বেমালিক মালের মতো রাস্তার পাশে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল।

আর এ সকল ভূখণ্ডের পাশে যে সব গোত্র বসবাস করত তারা জীবনের সবচেয়ে বড় দোদুল্যমনায় ভুগছিল। স্বার্থ আর প্রবৃত্তির জোয়ার কখনো তাদেরকে

এ কূলে ঠেলে দিত আবার কখনো অন্য কিছু প্রাপ্তির আশায় তারা ওকূলে ছুটে যেত। কখনো তারা ইরাকে চলে যেত আবার জীবনের নাগরদোলা কখনো তাদেরকে নিয়ে সিরিয়ায় হাযির হতো ।

আর জাযীরাতুল আরবের অভ্যন্তরে বসাবাসরত কবীলাগুলোর জীবন-বৃক্ষ গোড়া থেকে উঠে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বংশীয় কোন্দল তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ধর্মীয় সংঘাত আর সংঘর্ষ তাদের পেশা হয়ে গিয়েছিল। তাদেরই একজনের ভাষায়:

وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ ... غَوَيْتُ، وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ

'আমি তো গাযিয়া কবীলারই এক সদস্য। সে যদি পথচ্যুত হয়ে যায়, তবে আমিও পথচ্যুত হয়ে পড়ব। আর সে যদি সঠিক পথে থাকে তবে আমিও সঠিক পথে থাকব'।

হাজার হাজার মানুষের এই কবীলাগুলোর ভাগ্যে এমন কোনো শাসক মিলছিল না, যে তাদেরকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবে। তাদেরকে এক নয়া যিন্দিগির সবক শিখাবে। বিপদে ও মুসিবতে যার কাছে গিয়ে তারা একটু শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে। অশান্তি আর অস্বস্তির কাদায় আটকে যাওয়া জীবন গাড়ির চাকা যখন থমকে দাঁড়াবে তখন তার ওপর ভরসা করে তারা সামনে এগিয়ে চলার পাথেয় পাবে।

হিজাযের প্রশাসনের দিকে তামাম আরবরা সম্মান আর শ্রদ্ধার চোখে তাকাত। তাকে মনে করত তাদের এ পথের নেতা। তাদের দীন ও ধর্মের অতন্দ্র প্রহরী। সে সকল প্রশাসন বাস্তবে পার্থিব ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব আর ধর্মীয় কর্তৃত্বের মিশ্রণে তৈরী পচা খিচুড়ি ছিল। আরবদের মধ্যে যেখানে ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চলত সেখানে হারাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরকারের ছত্রছায়ায় সবকিছুর সমাধা হতো। পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বাইতুল্লায় আগত অতিথিদের কল্যাণ আর মঙ্গলের ওপর সে তত্ত্বাবধান করত। আর ইবরাহীমী শরিয়তের বিধি-নিষেধের যথাযথ বাস্তবায়ন করত। আমরা আগেই বলে এসেছি এ সকল সরকারের জন্য তৎকালীন সময়ও সেরূপ সভা ও বিভিন্ন অফিসকক্ষ ছিল, যেমন থাকে বর্তমান কালের পার্লামেন্টে। কিন্তু এই সরকার ও প্রশাসন ছিল থুড়থুড়ে বুড়ো ও দুর্বল; চরম দুর্বলতার কারণে সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। উপরন্তু তার ঘাড়ে এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার কারণে তার ঘাড় ভেঙে আর কোমর বেঁকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। হাবশীরা যেদিন আক্রমণ করেছিল বাস্তবতার চেপে রাখা এই গোমর সেদিন ঠিকই ফাঁস হয়ে গিয়েছিল।

আরবের ধর্মীয় অবস্থা

মক্কা মুকাররমায় হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর বংশধারা চালু হওয়ার পর থেকেই আরবের সিংহভাগ লোক দীনে ইবরাহীমীকে তাদের জীবনের সংবিধান বানিয়ে নিয়েছিল। এভাবে তারা এক আল্লাহর ইবাদত করে আসছিল। তাকে এক জেনে আসছিল। হৃদয়ে তাওহীদের দীপশিখা জ্বেলে তারা নিজেদের জীবন আলোকিত করে আসছিল। দীনে হানীফ তথা বিশুদ্ধ ধর্মের নিদর্শনগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনের মঞ্চে সগর্বে নৃত্য করত। এরপরে দিন বাড়তে থাকে। দিনের পরে রাত আসে। রাত গেলে দিন আসে। এভাবে এক সময় তাদেরকে যা কিছু বলা হয়েছিল ধীরে ধীরে তারা তার একটি অংশ ভুলে যায়। কিন্তু তাওহীদের সুনির্মল ধারা আর এই ধর্মের কিছু নিদর্শণ তারপরেও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপরে আসে খুযাআর সরদার আমর বিন লুহাই। ছোট বেলা থেকে আমর বিন লুহাই বেড়ে উঠেছিল একটু ধর্মীয় আবহে; সত্য ও সুন্দর পরিমণ্ডলে। ধর্মের প্রতি আগ্রহভরা পরিবেশে। এ কারণে মানুষ শুরু থেকে তাকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং তার কাছে নতি স্বীকার করে। তাকে মনে করতে থাকে তাদের বিশাল এক আলেম। বিরাট ওলী।

এরপর একদিন সে সিরিয়ায় হিজরত করে। সেখানে সে মানুষদেরকে মূর্তি-পূজায় লিপ্ত দেখতে পায়। এটা তার কাছে বড় ভালো লাগে এবং এটাকে সে হক্ব ও সত্য মনে করে। কেননা, সিরিয়া ছিল অগণিত অসংখ্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আর আসমানি কিতাবের পুণ্যভূমি। তাই সে ফিরে আসার সময় সঙ্গে করে হুবল নামে একটি মূর্তি নিয়ে আসে এবং কা'বার ঠিক মধ্যখানে সেটাকে স্থাপন করে। এরপর সে মক্কাবাসীকে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার প্রতি দাওয়াত দেয়। আর মক্কাবাসীরাও আন্তরিকতার সঙ্গে তার দাওয়াত কবুল করে নেয়। এরপর গোটা হিজাযবাসী মক্কাবাসীদের অনুসরণ করে। কেননা, তারা ছিল বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক; হারাম শরীফের সৌভাগ্যবান অধিবাসী।

হুবল ছিল লাল আকীক পাথরের তৈরী। মানুষের আকৃতিতে গড়া একটি মূর্তি। তার ডান হাত ভাঙা ছিল। কুরাইশরা তাকে সেই অবস্থাতেই পেয়েছিল। এরপর তারা তার জন্য স্বর্ণ দিয়ে একটি হাত নির্মাণ করে। এটাই ছিল আরবের মুশরিকদের সর্বপ্রথম ও প্রাচীন মূর্তি। এই মূর্তিটাকেই তারা সবচেয়ে বেশি পবিত্র জ্ঞান করত[৪৪]।

তাদের আরেকটি পুরনো মূর্তি ছিল মানাত। এটা ছিল হুযাইল ও খুযাআ গোত্রের। এটা লোহিত সাগরের তীরে কুদাইদের কাছে মুশাল্লালে স্থাপিত ছিল।

---

[৪৪] ইবনুল কালবীর কিতাবুল আসনাম পৃষ্ঠা:২৮।

মুশাল্লাল হলো একটি পাহাড়ী উপত্যকা, যার থেকে কুদাইদে অবতরণ করা হতো[৪৫]। এরপর তারা তায়েফ থেকে লাতকে সংগ্রহ করল। এটা ছিল সাকীফের মূর্তি। এটা বর্তমান তায়েফের মসজিদ যেখানে অবস্থিত, তার বাম পাশের মিনারার স্থানে ছিল[৪৬]। এরপর তারা যাতে ইরকের ওপরে সিরিয়ার নাখলা উপত্যকা থেকে উয্যাকে নিয়ে আসে। সে ছিল কুরাইশ, বনু কেনানা ও অন্যান্য অনেক গোত্রের মূর্তি[৪৭]।

উল্লিখিত মূর্তিতিনটি ছিল আরবের সবচেয়ে বড় মূর্তি। এরপরে তাদের মধ্যে শিরকের ঝড় আরও প্রবল বেগে বাহিত হলো। আরবের প্রত্যেকটি ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল মূর্তির তুফান। একটি ভূখণ্ডও রেহাই পাইনি সর্বনাশা এ তুফান থেকে।

কথিত আছে, আমর বিন লুহাই একটি জিন বশীভূত করেছিল। সে তাকে সংবাদ দিলো যে হযরত নূহ আ. এর কওমের মূর্তিপঞ্চ– ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়াউক, নসর- জেদ্দার মাটির নীচে পুঁতে রাখা আছে। এরপর সে জিনের কথা মতো সে স্থানে এসে সেগুলি মাটি খুঁড়ে বের করল। সেগুলিকে নিয়ে এলো তাহামায়। এরপর হজ্জের মৌসুমে যখন চারদিক থেকে বিভিন্ন গোত্রের মানুষ মক্কায় এলো, তখন সে তাদের নিকট সেগুলি দিয়ে দিলো। তারা সেগুলি নিয়ে যার যার অঞ্চলে ফিরে গেল।

ওয়াদ ছিল বনু কালবের মূর্তি। এটাকে নিয়ে তারা ইরাক সংলগ্ন সিরিয়ার দাউমাতুল জান্দালে জারাশ নামক স্থানে স্থাপন করল। আর সুওয়াকে নিয়ে গেল হুযাইল বিন মুদরিকা। এটাকে তারা হিজাযের মক্কার কাছাকাছি উপকূলের দিকে রুহাত নামক স্থানে স্থাপন করল। ইয়াগূস ছিল বনু গুতাইফ বিন বনু মুরাদের মূর্তি। সাবার নিকটে জুরফ নামক স্থানে রাখা হয়েছিল এই মূর্তিটি। ইয়াউক ছিল ইয়েমেনের খাইওয়ান নামক গ্রামে হামদানের মূর্তি। খাইওয়ান হলো হামদানের একটি শাখা গোত্র। নসর ছিল হিময়ারের যুল কিলা' বংশের হিময়ারীদের মূর্তি।[৪৮]

এ সকল মূর্তির জন্য তারা সুন্দর সুন্দর ঘর নির্মাণ করত যেগুলোকে তারা কাবা শরীফের মতো সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। এটার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা দারোয়ান ও পাহারাদার নিযুক্ত করত। এগুলোতে তারা হাদিয়া ও উপঢৌকন পেশ করত যেমন পেশ করত কাবাতে। তবে কাবাকে তারা সেগুলোর চেয়ে বেশি সম্মান করত এবং তাকে সেগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করত[৪৯]।

---

[৪৫] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৬৪৩,১৭৯০,৪৪৯৫,৪৮৬১। ফাতহুল বারী ৩/৪৯৯,৮/৬১৩।

[৪৬] ইবনুল কালবীর কিতাবুল আসনাম পৃষ্ঠা:১৬।

[৪৭] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা:১৮,১৯। ফাতুহুল বারী ৮/৬১৬। তাফসীরে কুরতুবী ১৭/৯৯।

[৪৮] সহীহ বুখারী হাদীস নং৪৯২০। ফাতহুল বারী ৬/৫৪৯, ৮/৬৬৮। মুহাম্মাদ ইবনে হাবীবের মুনমিক পৃষ্ঠা:৩২৭,৩২৮। ইবনুল কালবীর কিতাবুল আসনাম পৃষ্ঠা:৯-১১, ৫৬-৫৮।

[৪৯] ইবনে হিশাম ১/৮৩।

আরবের অন্যান্য কবীলার অবস্থাও ছিল তথৈবচ। তারা তাদের একই পথ ধরে সামনের দিকে চলছিল। তারা হাতে তৈরী প্রতিমাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল এবং সেগুলোর জন্য ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিল। সুতরাং, দাউস, খাসআম এবং বুজাইলা গোত্র মক্কা ও ইয়েমেনের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের জন্মভূমি ইয়েমেনের তাবালায় যুল খুলাসা নামের একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল। বনু তাঈ এবং তাদের আশপাশের গোত্রগুলো তাঈর সালমা এবং আজা নামক দুই পর্বতের মধ্যখানে ফিলস নামক একটি মূর্তি স্থাপন করেছিল। আরেকটি মূর্তিঘর ছিল রিয়াম নামের। এটা ছিল ইয়েমেন ও হিময়ারবাসীদের জন্য সানআতে। বনু তামিমের শাখা বনু রবীআ বিন কা'ব বিন সা'দ ইবনে যায়দ রিযা নামক একটি মূর্তিঘর নির্মাণ করেছিল। আর ওয়ায়েলের দুই পুত্র বনু বকর ও তাগলিব এবং ইয়াদ গোত্র সানদাদে চতুষ্কোণী অনেকগুলো মূর্তিঘর নির্মাণ করেছিল[৫০]।

দাওস কবীলার জন্যও একটি মূর্তি ছিল। এটাকে বলা হতো যুল কাফ্‌ফাইন। তেমনিভাবে কেনানার বংশধর বনু বকর, মালিক ও মালিকানের জন্য সা'দ নামক একটি মূর্তি ছিল। বনু উযরার শামস নামে একটি মূর্তি ছিল[৫১]। বনু খাওলানেরও একটি মূর্তি ছিল। এর নাম ছিল উম্‌ইয়ানিস[৫২]।

এভাবেই মূর্তি ও মূর্তির আস্তানার সংখ্যা বেড়ে চলতে থাকে জাযীরাতুল আরবে। প্রথমে প্রতিটি গোত্রে এবং পরিশেষে প্রতিটি ঘরে মূর্তি ঢুকেই ছাড়ে। মসজিদে হারামকে তারা মূর্তি দিয়ে ভরে ফেলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি কা'বা ঘরের চারপাশে তিন শ' ষাটটি মূর্তি দেখতে পান। সেগুলি তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা আঘাত করেন, আর সেগুলি ভূপাতিত হতে থাকে। এরপর সেগুলি মসজিদ থেকে বের করে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কা'বার অভ্যন্তরেও ছিল মূর্তি ও বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ছবি। তার মধ্যে একটি ছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মূর্তি। আরেকটি ছিল হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর মূর্তি। তাদের উভয়ের হাতে দেখা যাচ্ছিল অনেকগুলি তীর। মক্কা বিজয়ের দিন এগুলিও বাইতুল্লাহর ভেতর থেকে বের করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়[৫৩]।

মানুষ তাদের এই গোমরাহির মধ্যে দিবানিশি ব্যস্ত ছিল। এগুলি যে ভালো নয় কিংবা জ্ঞান ও বোধ সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এগুলি কখনো শোভা পায় না এই বুঝ কোনো দিনও তাদের মনে উদিত হয়নি। এমনকি এ সম্পর্কে হযরত আবু

---

[৫০] ইবনে হিশাম ১/৭৮,৭৯। তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ সূরা নূহ।
[৫১] তারীখে ইয়াকূবী ১/২৫৫।
[৫২] ইবনে হিশাম ১/৮০।
[৫৩] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৬১০,২৪৭৮,৩৩৫১,৩৩৫২,৪২৮৭,৪২৮৮,৪৭২০।

রজা আল উতারেদী রা. বলেন, আমরা সে যুগে পাথরের পূজা করতাম। যখন আমরা আগেরটার চেয়ে একটু ভালো পাথর পেতাম তখন প্রথমটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দ্বিতীয়টাকে গ্রহণ করতাম। আর যখন আমরা কোনো পাথর পেতাম না তখন গুঁড়ো মাটি দিয়ে স্তূপ বানাতাম। এরপর বকরি এনে তার ওপর দুধ দোহন করতাম। শেষে সেটা তওয়াফ করতাম[৫৪]।

সংক্ষেপে বলা যায়ঃ শিরক এবং মূর্তিপূজা ছিল জাহেলী যুগের আরবদের দুটি বৃহৎ ধর্মীয় নিদর্শন। অথচ, তারা মনে করত ˆ, তারা রয়েছে ইবরাহীম আ. এর বিশুদ্ধ দীনের ওপর।

কিন্তু যে শিরক ও মূর্তিপূজা তাদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায়, যখন তারা দেখল যে, ফেরেশতা, নবী-রাসূল এবং আল্লাহ তাআলার মুখলিস মুত্তাকী বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে কাছের মানুষ। তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মান আর সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এর পাশাপাশি যখন তারা তাদের হাতে কিছু মুজিযা ও কারামত দেখতে পায় তখন তারা মনে করতে শুরু করে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন কিছু শক্তি আর ক্ষমতা দিয়েছেন যেগুলি কেবল আল্লাহর সঙ্গেই নির্দিষ্ট। তাদের এই শক্তি ও ক্ষমতার কারণে, আল্লাহর কাছে তাদের ইয্যত ও সম্মানের বদৌলতে তারা তাদেরকে আল্লাহর ও তার সাধারণ বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ও মাধ্যম হওয়ার যোগ্য মনে করে। সুতরাং, তারা ভাবতে শুরু করে যে, কারও জন্য তাদের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর কাছে সরাসরি নিজের প্রয়োজন পেশ করা সমীচীন নয়। কেননা, তারা আল্লাহর কাছে তার জন্য শাফায়াত করবে। আর তাদের ইয্যতের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের শাফায়াত ফিরিয়ে দিবেন না। একইভাবে তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করাও সমীচীন নয়। কেননা তারা তাদের উচ্চ মরতবার কারণে তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।

যখন তাদের মধ্যে এ ধ্যান-ধারণা প্রবল হলো এবং তাদের কলবের মধ্যে এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হলো তখন তারা তাদেরকে আউলিয়া তথা বন্ধুস্বরূপ গ্রহণ করল। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ও তাদের নিজেদের মাঝে ওসীলা বানিয়ে নিলো। নৈকট্য অর্জনের যতগুলি পন্থা রয়েছে সবগুলি দিয়ে তারা তাদের সন্তুষ্টি ও নেকট্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এ কারণে তারা তাদের অধিকাংশরই ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করল। রঙের তুলিতে আঁকা এ সব ছবিতে তাদের আসল আকৃতির কোনো বাস্তবতা ছিল কি না এটা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ এগুলোর কোনোটি তারা বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়েই তৈরি করত। আবার কোনোটি সম্পূর্ণ মস্তিষ্কভিত্তিক

---

[৫৪] সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং ৪৩৭৬।

ধারণার বশবর্তী হয়ে খেয়ালি একটি ছবি তৈরি করে সে ব্যক্তির নামে চালিয়ে দিত। এ সকল ছবি ও ভাস্কর্যকেই বলা হয় আসনাম ।

আবার কখনো কখনো তারা কোনো ভাস্কর্য কিংবা ছবি নির্মাণ করত না। বরং এর বিপরীতে তাদের কবর, মাযার, বসবাসের স্থান কিংবা সামান্য সময়ের জন্য যাত্রা বিরতি করা বিশ্রামের স্থানসমূহকে পবিত্র স্থান জ্ঞান করত। এগুলোতে মানত ও কুরবানী পেশ করত। এখানে এসে ইবাদত বন্দেগী করত। এসকল কবর কিংবা অবস্থান স্থলকে বলা হয় আউসান।

আবার এ সকল মূর্তি ও প্রতিমার ইবাদতের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রচলিত কিছু প্রথা ও ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। এর অধিকাংশই ছিল আমর বিন লুহাইয়ের আবিষ্কার। আর তারা মনে করত যে, আমর বিন লুহাই যা কিছু আবিষ্কার করেছে তর সবগুলোই বিদআতে হাসানা। এগুলো দীনে ইবরাহিমীর কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধন নয়। তাদের সকল ইবাদতের ধরন ছিল অনেকটা এমন:

এক. তারা এগুলির চারপাশে এসে জড়ো হয়ে বসত। আপদে বিপদে তাদের কাছে এসে আশ্রয় নিতো। জোরে জোরে তাদেরকে ডাকত। মুসিবতের সময় তাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা করত। প্রয়োজনের সময় তাদেরকে ডাকত। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, এগুলি আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। তাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি পূর্ণ করবে।

দুই. তারা এগুলির হজ্জ করত এবং এগুলির চারপাশে তওয়াফ করত। তার কাছে এসে বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়াত। মাথা নত করে এগুলির পায়ে সালাম ঠুকত।

তিন. এগুলির পদতলে তারা বিভিন্ন কুরবানী ও নযরানা পেশ করত। এগুলির বেদিতে তারা বিভিন্ন পশু বলি দিত। আবার কখনো অন্য কোথাও কুরবানী করলেও এগুলির নামেই করত।

এই দুই প্রকারের যবাই সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বাণী শুনুনঃ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ আর যা যবাই করা হয় পশুর বেদিতে [সূরা মায়েদা:৩] অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ (তোমরা ঐ জিনিস ভক্ষণ করো না যা আল্লাহর নামে যবাই করা হয়নি) [সূরা আনআম : ১২১]।

চার. এ সকল মূর্তির নৈকট্য লাভের যে সব তরীকা ছিল তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, তারা তাদের পছন্দ মতো এগুলির জন্য তাদের খাদ্য ও পানীয়র একটা অংশ নির্ধারিত করে রেখেছিল। একইভাবে তাদের ক্ষেতের ফসল আর চতুষ্পদ জন্তুর একটা অংশও তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। মজার বিষয় হলো, এ থেকে

তারা একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিল। আবার কখনো কখনো বিভিন্ন কারণে তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত জিনিসকে মূর্তির কাছে নিয়ে যেত কিন্তু মূর্তির জন্য নির্ধারিত জিনিসকে কখনো আল্লাহর কাছে নিয়ে যেত না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. আল্লাহ তাআলা যেই ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটা অংশ নির্ধারণ করে নিয়েছে। সুতরাং, তারা বলে এটা আল্লাহর জন্য -তাদের ধারণা অনুযায়ী- আর এটা আমাদের শরীকদের জন্য। অতঃপর যা তাদের শরীকদের জন্য, তা আল্লাহর অংশের দিকে পৌঁছে না। আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের অংশের দিকে পৌঁছে। এ সকল লোকের ফয়সালা কতই না খারাপ! [সূরা আনআম : ১৩৬]

পাঁচ. তাদের নৈকট্য লাভের আরেকটি তরীকা ছিল কৃষিজাত ফসলাদি আর চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তাদের জন্য মান্নত করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ. মুশরিকরা বলে, এ সকল ফসল ও চতুষ্পদজন্তু হারাম; এগুলি কেবল তারাই খেতে পারবে আমরা যাদেরকে চাই-তাদের ধারণা অনুযায়ী- আর (এগুলি) এমন চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলির পিঠ হারাম করা হয়েছে- (এগুলির ওপর আরোহন করা কিংবা বোঝা বহন করা যাবে না)-আর এমন কিছু চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে, যেগুলোর ওপর তারা আল্লাহর নাম নিত না, তার ওপর মিথ্যা আরোপ করে । [সূরা আনআম : ১৩৮]।

উল্লিখিত প্রাণীগুলোর মধ্যে কতগুলি ছিল বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসিলা এবং হামী। সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব বলেন, বাহীরা বলা হয় ঐ প্রাণীকে যার দুধ মূর্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। সুতরাং, কোনো মানুষ সেগুলির দুধ দোহন করতে পারে না। সায়েবা বলা হয় যেগুলো তাদের উপাস্যদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার ওপর কোনো জিনিস বহন করা হতো না। ওয়াসিলা বলা হয় ঐ জোয়ান উষ্ট্রীকে, যে প্রথম বারই একটি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। এরপর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা জন্ম দেয়। এরপর যদি ধারবাহিক দুই মাদী বাচ্চার মাঝে কোনো পুরুষ বাচ্চা না থাকতো, তবে তাকে তারা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিত। হামী বলা হয় ঐ পুরুষ উটকে যে নির্ধারিত কিছু সংখ্যক (অর্থাৎ দশটি) উটনীর সঙ্গে মিলিত হয়। যখন নির্ধারিত সংখ্যার সঙ্গে তার মিলন শেষ করত তখন তাকে

মূর্তির জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। এভাবে তাকে বোঝা বহন থেকে রেহাই দিতো। কোনো কিছুই তার পিঠে চাপিয়ে দিত না এবং তাকে বলত হামী[৫৫]।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, সায়েবার বাচ্চাকে বাহীরা বলা হয়। আর সায়েবা বলা হয় ঐ উষ্ট্রীকে, যে ধারবাহিকভাবে দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম দেয় যাদের মধ্যে কোনো নর বাচ্চা না থাকে। এ ধরনের উষ্ট্রীকে মুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হতো, এরপর তার পিঠে আর আরোহন করা হতো না, তার পশম কাটা হতো না। একমাত্র বাহিরাগত অতিথি ছাড়া আর কেউ তার দুধ পান করতে পারত না। তারপর সে যে কোনো মাদী বাচ্চা জন্ম দিলে তার কান কেটে দেওয়া হতো। এরপরে তার মায়ের সঙ্গে তাকেও মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার পিঠে আরোহন করা হতো না। তার পশম কাটা হতো না। বাইরের মেহমান ব্যতীত অন্য কেউ তার দুধ পান করতে পারত না। মোটকথা, তার মায়ের বেলায় যা করা হতো তার বেলায়ও তাই করা হতো। এটার নামই বাহীরা আর তার মা হলো সায়েবা।

ওয়াসিলা হলো ঐ বকরি যে পাঁচ গর্ভে মোট দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম দিত এবং এগুলোর মধ্যখানে কোনো নর বাচ্চা হতো না। এ ধরনের বকরীকে এ জন্য ওয়াসিলা বলা হতো যে, সে তার সকল মাদী সন্তান একটিকে অপরটির সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে। এরপরে তার যে বাচ্চাই জন্ম নিত তার মধ্য থেকে কেবল নরগুলিকে খাওয়া হতো। আর মাদীগুলোকে খাওয়া হতো না। তবে যদি কোনো মৃত বাচ্চা জন্ম নিতো তবে তাকে খাওয়ার ব্যাপারে নর-মাদীর মাঝে কোনো ধরনের বাছ-বিচার করা হতো না।

হামী হলো ঐ পুরুষ উট, যার ঔরসে ধারাবাহিক দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করে এবং এগুলোর মাঝে কোনো নর বাচ্চা না থাকে। তখন এর পিঠ মাহফূয তথা সংরক্ষণ করা হতো। তার ওপর কেউ আরোহন করত না। তার পশম কাটা হতো না। উটের সারিতে সহবাসের জন্য তাকে আযাদ ছেড়ে দেওয়া হতো। এ ছাড়া তাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করানো হতো না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ. আল্লাহ তাআলা কোনো বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসিলা কিংবা হামী বানাননি। কিন্তু যারা কাফের তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে। আর তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন। [সূরা মায়েদা:১০৩]

---

[৫৫] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৪৬২৩। ফাতহুল বারী ৮/১২৩। আল ইহসান বিতারতীবি সহীহ ইবনে হিব্বান ৮/৫৩।

আল্লাহ তাআলা আরও নাযিল করেন: وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ আর সে সকল (মুশরিক) লোকেরা বলে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর উদরে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আমাদের পুরুষদের জন্য হালাল আর নারীদের ওপর হারাম। তবে যদি তা মৃত হয় তবে সে ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সবার অংশ রয়েছে। [সূরা আনআম : ১৩৯] এ সকল পশুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আরও অনেকভাবে করা হয়[৫৬]।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব থেকে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, এ সকল চতুষ্পাদ জন্তু ছিল তাগূত তথা মূর্তির জন্য নির্ধারিত। আর বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **'আমি আমর বিন আমের বিন লুহাই আল খুযাঈ কে দেখেছি জাহান্নামের আগুনে সে তার নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলছে'**[৫৭]। কারণ, সে-ই সর্বপ্রথম দীনে ইবরাহীমের মধ্যে তাবদীল তথা পরিবর্তন পরিবর্ধনের বিদআতের সূচনা করেছিল। সে সর্বপ্রথম মূর্তি স্থাপন করেছিল এবং পশুকে সায়েবা তথা মুক্ত করে ছেড়ে দিয়েছিল। বাহীরা বানিয়েছিল। ওয়াসিলা আবিষ্কার করেছিল এবং হামী নির্ধারণ করেছিল[৫৮]।

আরবরা তাদের মূর্তির জন্য এ সকল কাজ করত কেবলই এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে সেগুলি তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করবে এবং তাদেরকে তার কাছে পৌঁছে দিবে। তাদের জন্য তার কাছে সুপারিশ করবে। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ আমরা তো তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। [সূরা যুমার : ৩]

আরও ইরশাদ হয়েছে وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ তারা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে এমন জিনিসের ইবাদত করে যা তাদেরকে কোনো ক্ষতি কিংবা উপকার কোনোটিই

---

[৫৬] ইবনে হিশাম:১/৮৯। দেখুন মুনমিক লি ইবনে হিব্বান পৃষ্ঠা: ৩২৮, ৩২৯।

[৫৭] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১২১২। ফাতহুল বারী ৩/৯৮। হাদীস নং ৩৫২১। ফাতহুল বারী ৬/৬৩৩, হাদীস নং ৪৬২৩। ফাতহুল বারী ৮/১৩২।

[৫৮] হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ইবনে ইসহাক থেকে ফাতহুল বারীর ৬/৬৩৪ পৃষ্ঠায় এমনটিই বর্ণনা করেছেন। একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে ইবনে কালবীর আসনামের ৮ পৃষ্ঠায়, ইবনে হাবীবের মুনমিকের ৩২৮ পৃষ্ঠায়। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা মারফূ সূত্রে ইমাম বুখারী র. রেওয়ায়েত করেছেন। বাকিগুলো ইমাম মুসলিম র. আবু হুরাইরা রা .থেকে আবু সালিহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন ফাতহুল বারী ৮/২৮৫।

করতে পারবে না। আর তারা বলে এগুলি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। [সূরা ইউনুস : ১৮]

এর পাশাপাশি আরবরা তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করত। এটাকে তারা বলত আযলাম। আযলাম বলা হয় পালকবিহীন তীরকে। আর এই আযলাম ছিল তিন প্রকারের:

এক. প্রথম প্রকারের তীর ছিল তিনটি : একটিতে লেখা ছিল 'হাঁ', দ্বিতীয় আরেকটিতে 'না' আর তৃতীয়টিতে কিছুই লেখা ছিল না। তারা সফর, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি যে কাজই করতে যেত, সে কাজেই তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্যের চাকা পরীক্ষা করে নিত। যদি 'হাঁ' লেখা তীর বের হতো, তবে তারা সে কাজটি করত। আর যদি 'না' লেখা তীর বের হতো, তবে ঐ বছর আর সে কাজটি তারা করত না। আর যদি 'গাফাল' তথা শূন্য বের হতো তবে দ্বিতীয় বার আবার নিক্ষেপ করত। এভাবে প্রথম দুটির যে কোনো একটি বের হওয়ার আগ পর্যন্ত চলতে থাকত তীর নিক্ষেপের পালা।

দুই. তীর নিক্ষেপের দ্বিতীয় প্রকার ছিল পানি, রক্তপণ ইত্যাদির ব্যাপারে।

তিন. তৃতীয় প্রকারের তীর ছিল তিনটি: একটিতে লেখা ছিল 'মিনকুম', দ্বিতীয়টিতে লেখা ছিল 'মিন গাইরিকুম' আর তৃতীয়টিতে লেখা ছিল 'মুলসাকুন'। যখন কারও বংশ পরিচয় নিয়ে তারা সন্দেহে পড়ে যেত তখন সকলে মিলে হুবল মূর্তির কাছে চলে যেত। সঙ্গে নিত এক শ' করে দিরহাম ও উট। প্রথমে এগুলো তীরওয়ালার হাতে অর্পণ করত। এরপর তীরগুলো প্রচণ্ডরূপে ঘুরাত। এরপর একটি তীর বের করত। যদি 'মিনকুম' লেখা বের হতো, তবে সে সেই গোত্রের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে স্বীকৃত পেত। আর যদি বের হতো 'মিন গাইরিকুম' তবে সে তাদের মিত্র হিসেবে স্বীকৃতি পেত। আর যদি বের হতো 'মুলসাক' তবে সে নিজের অবস্থার ওপর থাকত। গোত্রের অন্তর্ভুক্তও হতো না; কিংবা তাদের মিত্রও হতো না[৫৯]।

এর কাছাকাছি আরবদের আরেকটি প্রথা ছিল মাইসির তথা জুয়া খেলা এবং জুয়ার জন্য তীর ব্যবহার করা। এই তীরের মাধ্যমে তারা জুয়ায় প্রাপ্ত উটের গোশত নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিত। এর পদ্ধতি ছিল: তারা বাজার থেকে বাকিতে উট কিনে নিয়ে আসত। এরপর এটাকে যবাই করে মোট আটাশ ভাগ কিংবা দশ ভাগ করত। এরপর এগুলোতে তীর নিক্ষেপ করত। কোনো কোনো তীরের গায়ে লেখা থাকত 'রাবেহ' আবার কোনোটির গায়ে লেখা থাকত 'গাফাল'। যার ভাগে 'রাবেহ' লেখা তীর উঠত সে সফল বলে গণ্য হতো এবং উটের গোশতের অংশ নিয়ে যেত।

---

[৫৯] দেখুন ফাতহুল বারী ৮/২৭৭। ইবনে হিশাম ১/১৫২, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

আর যার ভাগে উঠত 'গাফাল' লেখা তীর সে ব্যর্থ হতো এবং তার সব টাকা-পয়সা গচ্চা যেত। উল্টো তাকে জরিমানা দিতে হতো[৬০]।

আরবের মুশরিকরা এগুলোর পাশাপাশি গণক, আররাফ এবং জ্যোতিষীদের কথায় বিশ্বাস করত। কাহেন বা গণক হলো যে ভাবী ঘটনার সংবাদ দিত এবং প্রকৃতির গোপন রহস্য ভাণ্ডার জানার দাবি করত। আবার গণকদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল যে জিন বশীভূত করার দাবি করত। আবার কেউ কেউ প্রাকৃতিক বোধশক্তির মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াবলি অবগত হওয়ার দাবিদার ছিল। আবার কেউ কেউ দাবি করত যে, তার কাছে যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে আসে তবে সে তার কথা, কাজ কিংবা অবস্থার মাধ্যমে কিছু কার্যকারণ ও আলামত দেখে সে জায়গার সবকিছু বলে দিতে পারে। এ ধরনের লোককে বলা হতো আররাফ। এর উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা চুরি হয়ে যাওয়া অর্থ-সম্পদ, চুরির স্থান এবং হারিয়ে যাওয়া পশু ইত্যাদির ঠিকানা বলে দিতে পারে। জ্যোতিষী হলো ঐ সকল লোক যারা আকাশের তারকারাজির দিকে তাকিয়ে এর গতিবিধি এবং সময় ও স্থান বলে দিতে পারে। এর দ্বারা তারা ভবিষ্যতে বিশ্বের বুকে যে সকল ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে তা জানতে পারে[৬১]।

আর জ্যোতিষীদের দেওয়া সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা মূলত ছিল তারকারাজিতে বিশ্বাস করা। আর তাদের তারকারাজিতে বিশ্বাস করার একটি রূপ ছিল 'নাও' তথা বৃষ্টির পূর্বলক্ষণ প্রদর্শনকারী তারকায় বিশ্বাস করা। যেমন তারা বলত: 'নাওয়ের উদয়ে বৃষ্টি নেমেছে'[৬২]।

আরবের মুশরিকদের সামাজিক জীবনের আরেকটি কুসংস্কার ছিল কোনো কিছু থেকে অশুভ লক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণ করা। আরবি ভাষায় একে বলা হতো 'তিয়ারা'। এর রূপরেখা ছিল: আরবরা কোনো পাখি কিংবা হরিণের কাছে এসে তাকে ছেড়ে দিত। যদি সেটা ডান দিকে যেত তবে তারা তাকে শুভ লক্ষণ বিবেচনা করত এবং উদ্দিষ্ট কাজে হাত দিত। আর যদি সেটা বাম দিকে যেত তবে অশুভ বিবেচনা করে সে কাজ থেকে বিরত থাকত। একইভাবে যদি রাস্তা দিয়ে চলার সময় তারা পথিমধ্যে কোনো পাখি কিংবা পশু দেখতে পেত তবে তাকে তারা অশুভ জ্ঞান করত।

এ সকল প্রথার পাশাপাশি মুশরিকদের মধ্যে আরও কিছু প্রথা প্রচলিত ছিল আর তা হলো তারা খরগোশের টাখনু ওপরে ঝুলিয়ে রাখত। কিছু কিছু দিন, মাস, পশু, ঘর ও নারীকে তারা কুলক্ষণে মনে করত। তারা সংক্রামক ব্যাধিতে

---

[৬০] ঐতিহাসিক ইয়াকুবী তাঁর তারীখে ইয়াকুবীর ১ম খণ্ডের ২৫৯ ও ২৬১ পৃষ্ঠায় আংশিক মতানৈক্য সহকারে সবিস্তারে এর ওপর আলোকপাত করেছেন।

[৬১] লিসান ও লুগাতের বিভিন্ন গ্রন্থ।

[৬২] দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ৮৪৬, ১০৩৮, ৪১৪৭, ৭৫০৩। সহীহ মুসলিম ১/৮৩, হাদীস নং ৭১।

বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত মানুষ যখন মারা যায় তখন তার আত্মা যতক্ষণ না তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে না। এ কারণে তার আত্মা পেঁচা হয়ে মরু-বিয়াবানে আর বন-জঙ্গলে নিরন্তর ঘুরতে থাকে। আর সে চিৎকার করে বলতে থাকে 'পানি! পানি!! কিংবা বলতে থাকে 'তোমরা আমাকে পানি দাও'। এরপর যখন তার প্রতিশোধ নেওয়া হয় তখন সে শান্ত হয় এবং তার আত্মা তৃপ্ত হয়[৬৩]।

এই ছিল জাহেলী যুগের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় দুরবস্থা। দীনে ইবরাহীমের প্রাচীন প্রদীপ নিভে গিয়ে তাদের মধ্য থেকে পুরোপুরি বিদায় না নিলেও তার মধ্যে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব অবশিষ্ট ছিল না। সে জ্বলে থেকেও নিষ্প্রভ ছিল। নিভু নিভু করছিল তার প্রাণ-প্রদীপ। আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, এর তওয়াফ করা, হজ্জ ও উমরা করা, আরাফা ও মুযদালিফায় অবস্থান করা, কুরবানীর পশু হাদিয়া দেওয়া-দীনে ইবরাহীমের এই নিদর্শনগুলি তখনও তাদের মধ্যে বাকি ছিল। এভাবে ইবরাহীমী ধর্ম পুরোপুরি ছেড়ে না দিলেও এর মধ্যে তারা কিছু বিদআত ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

*তাদের একটি বিদআত ছিল: আমরা ইবরাহীমের বংশধর ও হারামের পরিবার। বাইতুল্লাহর তত্ত্বাবধায়ক ও মক্কার অধিবাসী। সবকিছুতে আমাদের যতটুকু অধিকার আছে তা অন্য কারও নেই। আমরা যতটা সম্মান আর ইয্যতের অধিকারী অন্য কেউ ততটা সম্মান আর ইয্যতের অধিকারী নয়। আর তারা নিজেদেরকে হুমছ তথা বীর বাহাদুর ও সম্ভ্রান্ত বলে ডাকত। এ কারণে তারা বলত, হারাম থেকে বের হয়ে হিলে যাওয়া আমাদের শানে শোভা পায় না। এ কারণে তারা আরাফায় অবস্থান করত না কিংবা আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করত না বরং তারা প্রত্যাবর্তন করত মুযদালিফা থেকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন: ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ এরপর তোমরা সেখান থেকে ফিরে এসো মানুষেরা যেখান থেকে ফিরে আসে। [সূরা বাকারাহ:১৯৯][৬৪]

*তাদের আরেকটি বিদআত ছিল: তারা আরও বলত যে, হুমসদের (রক্ষণশীল তথা কুরাইশ) জন্য ইহরাম অবস্থায় ঘি কিংবা পনির তৈরি করা শোভনীয় কাজ নয়। ঠিক তেমনিভাবে পশমের ঘর তথা কম্বলের তাঁবুতে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনিভাবে ছায়া গ্রহণের প্রয়োজন হলে চামড়ার তাঁবু ব্যতীত অন্য কোথাও ছায়া গ্রহণ করা সমীচীন নয়[৬৫]।

---

[৬৩] দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫৭৫৭, ৫৭৭০।

[৬৪] ইবনে হিশাম ১/১৯৯। সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৬৬৫, ৫৪২০। আরবিতে তাদেরকে বলা হতো হুমস। কেননা তারা তাদের দীনের রক্ষক ছিল।

[৬৫] প্রাগুক্ত ১/২০২।

*তাদের আরেকটি বিদআত ছিল: তারা বলত হারামের বাইরের অধিবাসীরা যখন হজ্জ কিংবা উমরা করার জন্য হারামে আসে তখন হারামে বসে বাইরে থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা খাবার খাওয়া উচিত নয়[৬৬]।

*তাদের আরেকটি বিদআত ছিল : তারা হারামের বাইরের অধিবাসীদেরকে আদেশ দিয়ে রেখেছিল যে, প্রথম বার তওয়াফ করার সময় তাদেরকে কুরাইশের দেওয়া কাপড় পরেই তওয়াফ করতে হবে। তারা মানুষদের ওপর নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করত। পুরুষরা পুরুষদের তওয়াফের জন্য কাপড় দিত আর নারীরা নারীদের তওয়াফের জন্য কাপড় দিত। আর যদি কুরাইশদের কাছ থেকে কিছু না পেত তবে পুরুষরা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আর নারীরা দিগম্বর বদনে কেবল একখানা উন্মুক্ত বস্ত্রখণ্ড শরীরে কোনো রকম পেঁচিয়ে তওয়াফ করত। আর তারা তওয়াফের সময় নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলো আবৃত্তি করত:

اَلْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... وَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

'আজ একটু অথবা পুরো লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করে দিব।

কিন্তু উন্মুক্ত (সেই স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করাকে) হালাল করব না'॥

এ ধরনের সকল কুসংস্কারের উপসংহার টেনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ হে বনী আদম! প্রত্যেক মসজিদের নিকটে তোমরা তোমাদের সৌন্দর্য গ্রহণ করো [সূরা আরাফ:৩১]

কিন্তু কোনো ইয্‌যতওয়ালা নারী-পুরুষ যদি সেখানে গিয়ে হারামের বাইরে থেকে নিয়ে আসা কাপড় পরেই তওয়াফ করে ফেলত তবে তওয়াফের পরে তাকে সেটা ফেলে দিতে হতো। সে নিজে কিংবা অন্য কেউ সেটা পরতে পারত না।[৬৭]

*তাদের আরেকটি বিদআত ছিল : ইহরাম অবস্থায় তারা তাদের ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকত না। বরং তারা ঘরের পেছন দিকে একটি ছিদ্র করে সেখান দিয়ে ঢুকত এবং বের হতো। তারা এই অর্থহীন কর্মকে নেক ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করত। অথচ কুরআন এসে তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করল ঠিক এভাবে: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ঘরের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করার মধ্যে কোনো নেক নেই বরং নেক রয়েছে যে আল্লাহকে ভয় করে

---

[৬৬] ইবনে হিশাম ১/২০২।

[৬৭] ইবনে হিশাম ১/২০২, ২০৩। সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৬৬৫।

তার জন্য। তোমরা ঘরের সঠিক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো এবং আল্লাহকে ভয় করো! আশা করা যায় তাতে তোমরা সফলকাম হবে। [সূরা বাকারাহ : ১৮৯][৬৮]

শিরক আর মূর্তিপূজা, বিভিন্ন কুসংস্কার আর ভিত্তিহীন বিশ্বাস- এগুলিই ছিল জাযীরাতুল আরবের ধর্মের বাজারের আকর্ষণীয় পণ্য। এ বাজার ছিল সবচেয়ে সরগরম। তবে এগুলি ছাড়াও আরবের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইহুদি, নাসারা, মাজূসী ও সাবেয়ী ধর্ম স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

এবার আমরা এ সকল ধর্মের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব:

ইহুদিধর্ম

জাযীরাতুল আরবে ইহুদি ধর্মকে দুটি পৃথক পৃথক যুগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম যুগ. এটা ছিল ফিলিস্তীনে অসিরীয় ও ব্যবিলিয়নদের বিজয়ের যুগের কাহিনী। তখন তাদের জোর-যুলুম আর কঠোর নিপীড়নের কারণে ইহুদিদের স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে হয়েছিল। সম্রাট বখতেনাসার খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে তাদের শহরগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল। নির্মমভাবে তাদের ইবাদতখানাগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে গিয়েছিল। তখন তাদের একদল মাতৃভূমি ফিলিস্তীনের মাটির মায়া ছেড়ে হিজাযের পথে পা বাড়িয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে এসে এক সময় হিজাযের উত্তরাঞ্চলে এসে ঘর বেঁধেছিল।[৬৯]

দ্বিতীয় যুগ. এটা ছিল ঈসায়ী প্রথম শতাব্দীর কথা। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা কায়সার তীতুস রোমানীর নেতৃত্বে ফিলিস্তীন দখল করে নিয়েছিল। এরপরে সেখানে রোমানরা ইহুদিদের ওপর কঠোর অত্যাচার আর নির্যাতন চালালো। তাদের ইবাদতখানাগুলি নির্মমভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলো। যার ফলে ইহুদিদের কয়েকটি কবীলা ফিলিস্তীন ছেড়ে হিজাযের পানে রওয়ানা হলো। ইয়াসরিব, খাইবর এবং তাইমায় এসে তারা অবস্থান গ্রহণ করল। সেখানকার অঞ্চলগুলি তারা নিজেদের লোক দিয়ে আবাদ করল। বিশাল বিশাল দুর্গ আর ইমারত গড়ে তুলল সেখানে। এ সকল মুহাজিরের মাধ্যমে ইহুদি ধর্ম ধীরে ধীরে এক শ্রেণীর আরবদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় সেটা এতটা কার্যকর আর প্রভাবশীল হয়ে দাঁড়ায় যে, প্রাক-ইসলামী যুগ এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের আরবের রাজনৈতিক ঘটনাবলির ইতিহাসে চোখ বুলালে অনায়াসে এটা উপলব্ধি করা যাবে। যখন ইসলামের আগমন ঘটল তখন আরবের প্রসিদ্ধ ইহুদি কবীলাগুলো ছিল: বনু খাইবর, বনু নজীর, বনু মুস্তালিক, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা। ঐতিহাসিক সামহূদী উল্লেখ করেন, যুগে

---

[৬৮] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৮০৩, ৪৫১২। তাফসীরে ইবনে জারীরের উক্ত আয়াতের তাফসীর। ফাতহুল বারী ৩/৬২১, ৬২২।

[৬৯] কল্বু জাযীরাতিল আরব পৃষ্ঠা ২৫১।

যুগে বিভিন্ন সময়ে ইহুদিদের যে গোষ্ঠীগুলো ইয়াসরিবে অবতরণ করেছিল তাদের সংখ্যা বিশ এর ঊর্ধ্বে ছিল।[৭০]

ইয়েমেনে ইহুদি ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল সেখানকার শাসক তুব্বা আসআদ আবী কারাবের মাধ্যমে। তিনি যুদ্ধ করতে করতে ইয়াসরিবে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এরপরে সেখানে তিনি ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ইয়েমেনে ফিরে আসার সময় বনু কুরাইযা থেকে দুইজন ইহুদি আলেমকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এরপর থেকে ইয়েমেনে ইহুদি ধর্ম বিস্তার লাভ করে। ঝটিকার বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তার প্রতিপত্তি ইয়েমেনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও। আবু কারাবের মৃত্যুর পরে তার ছেলে ইউসুফ যুনোয়াস যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদের ওপর সে ভীষণ হামলা চালায়। তাদেরকে সে ইহুদি ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দেয়। কিন্তু তারা যখন অস্বীকার করে তখন সে মাটি খনন করে বিশাল অগ্নিকুণ্ড জ্বালায়। এরপরে সে গণহারে তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করে আগুনে পুড়িয়ে মারে। পুরুষ-নারী, শিশু-কিশোর, ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ-নির্বিশেষে কেউই তার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ইউসুফ যুনোয়াসের অগ্নিকুণ্ডে নিহত খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল বিশ থেকে চল্লিশ হাজার।[৭১] এই বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিল ৫২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে।[৭২] কুরআনে কারীমের সূরা বুরূজে আল্লাহ তাআলা তাদের কথা উল্লেখ করেন ঠিক এভাবে: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ

(٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

(৭) অভিশপ্ত হয়েছে গর্তওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা; যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল এবং তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। [সূরা বুরূজ:৪-৭]

খ্রিস্টধর্ম

আরবের মাটিতে খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করে প্রধানত হাবশীদের আক্রমণ ও দখল এবং কিছু রোমান খ্রিস্টান মিশনারী দলের মাধ্যমে। হাবশীরা সর্বপ্রথম ৩৪০ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেন দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু এই দখলে তারা তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কারণ দখলের অল্প কয়েকদিন পরেই ৩৭০ থেকে ৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাদেরকে সেখান থেকে কাঁথা-বালিশ সবকিছু গুছিয়ে চলে যেতে

---

[৭০] ওয়াফাউল ওয়াফা ১/১৬৫ এবং প্রাগুক্ত।

[৭১] বিস্তারিত দেখুন ইবনে হিশাম ১/২০-২২, ২৭, ৩১, ৩৫। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে সূরা বুরূজের তাফসীর।

[৭২] আল ইয়ামান আবরাত তারীখি পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৫৯।

হয়েছিল।[৭৩] তল্পী গুছিয়ে চলে গেলেও তারা ইয়েমেনে খ্রিস্টধর্মের বীজ বপন করে যেতে মোটেও ভুল করেনি। তাই তারা সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের দুঃসাহস করে এবং অন্যদেরকেও এ পথে ডাকে। এই দখল চলাকালেই ফাইমুন নামক একজন যাহিদ ও মুস্তাজাবুদ্দাওয়াত লোক নাজরানে যায়। সেখানে গিয়ে সে লোকদেরকে খ্রিস্টধর্মের দাওয়াত দেয়। মানুষ তার সত্যতা ও তার ধর্মের সত্যতার নিদর্শন দেখে তার দাওয়াত কবুল করে নেয় এবং খ্রিস্টধর্মের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়।[৭৪]

এরপরে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে হাবশীরা যখন ইহুদি যালিম শাসক যুনোয়াস কর্তৃক নাজরানের খ্রিস্টান অধিবাসীদেরকে অগ্নিকুণ্ডে পুড়িয়ে মারার এক পাল্টা জবাব স্বরূপ দ্বিতীয়বার ইয়েমেন দখল করে এবং আবরাহা আল আশরাম তাদের নেতৃত্বের লাগাম শক্ত হাতে গুছিয়ে নেয় তখন সে সেখানে চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সক্রিয়তার সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচার শুরু করে। চারদিকে খ্রিস্টধর্মের জয়ধ্বনির এক ঝড় বইয়ে দেয়। অবিরাম উৎসাহের সুরা পান করে সে মদমত্ত হয়ে এক পর্যায়ে ইয়েমেনে একটি কাবাঘর নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে সে আরও সামনে বাড়ে। এক সময় সে চায় আরবের হজ্জ যেন অনুষ্ঠিত হয় ইয়েমেনে। সেখানকার হাজীরা যেন আরবের পরিবর্তে ইয়েমেনের দিকে রুখ করে। এ উদ্দেশ্যে মক্কার বাইতুল্লাহ শরীফ ধ্বংস করে দেওয়ার মনোস্থ করে। আল্লাহ তাকে আর সামনে বাড়ার সুযোগ দেননি। জায়গায় থামিয়ে দিয়েছিলেন। তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহান বরবাদ হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে রোমানদের পাশাপাশি ও কাছাকাছি বসবাস করার কারণে বনু তাঈ, বনু তাগলিব, গাস্‌সানী আরব এবং আরও অনেক আরব কবীলার মধ্যে ইতোমধ্যেই খ্রিস্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। আরও সামনে বেড়ে হীরার একাধিক শাসকবর্গও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছিল।

মাজূসীধর্ম

পারস্যের সীমান্তবর্তী ও কাছাকাছি আরব অঞ্চলগুলোতেই মূলত মাজূসী ধর্মের প্রভাব ছিল। উদাহরণত ইরাক, বাহরাইন (আল-আহসা), হিজর এবং তার পার্শ্ববর্তী আরব উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে মাজূসী ধর্ম তার আসন গেড়ে বসেছিল। তা ছাড়া পারস্যদের ইয়েমেন দখল চলাকালে সেখানকার কিছু লোকও মাজূসী ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল।

---

[৭৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫৮, ১৫৯। তারীখুল আরব ক্বলাল ইসলাম পৃষ্ঠা ১২২, ৪৩২।
[৭৪] বিস্তারিত দেখুন ইবনে হিশাম ১/৩১-৩৪।

সাবেয়ীধর্ম

আকাশের বিস্তৃত বুকে নিরন্তর ভেসে বেড়ানো অসংখ্য তারকারাজি আর গ্রহ নক্ষত্রের সুপ্ত রহস্যের প্রতি হতবাক মানবতার হতবুদ্ধির নীরব আত্মসমর্পণ আর ইবাদতের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর একমাত্র ভিন্নধর্মী এক ধর্মে পরিণত হয়েছে এই সাবেয়ীধর্ম। দিগন্তের সুনীল সমুদ্রে সাঁতরে বেড়ানো অসংখ্য কক্ষপথের বিভিন্ন তারকারাজিতে আর জানা অজানা অগণন নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করে এই ধর্ম। সে জানে, এই তারকারাজি আর নক্ষত্রই হলো পৃথিবীর স্রষ্টা; সবকিছুর পেছনের মূল কার্যকারণ। ইরাক ইত্যাদিতে সাম্প্রতিক সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় এটা ছিল নবী ইবরাহীম আ. এর কালদানী কওমের ধর্ম। প্রাচীনকালে তাদের সঙ্গে সিরিয়া ও ইয়েমেনের অসংখ্য লোকও এই ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। পৃথিবী যখন অনেকটা তরতাজা ও শক্তিশালী ধর্মের শূন্যতায় ভুগছিল সেই সুযোগে তার রাজত্ব ছিল সুদৃঢ়; তার বাজার ছিল গরম। কিন্তু এরপরে যখন একের পরে এক ইহুদিধর্ম এরপরে খ্রিস্টধর্ম ইত্যাদি বিশুদ্ধ ও নিত্য নতুন সত্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটতে থাকে তখন সে তার গৌরব হারিয়ে ফেলে। তার ব্যবসায় ধস নামে। তার এক সময়কার সরগরম বাজার ক্রেতাশূন্য হয়ে পড়ে। এক সময়কার বিস্তৃতির নেশার জ্বলন্ত আগুন ধপ করে নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়। ভাগ্য ভালো তার! এতকিছুর পরেও সে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। তার কিছু অনুসারী মাজুসীদের সঙ্গে মিশে কিংবা তাদের কাছাকাছি অবস্থান করে ইরাক ও আরব উপসাগরের সৈকতে এর মিটমিটে প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে পতনের রাত পেরিয়ে পুনর্জাগরণের নতুন ভোরের অপেক্ষায় আজও দাঁড়িয়ে আছে।[৭৫]

আরবদের ধর্মের এত বৈচিত্রের মধ্যে কিছু ইতর যিন্দীকও ছিল। তারা তাদের এই চরিত্রকে আমদানি করেছিল মূলত হীরা থেকে। কিছু কুরাইশও ভুগছিল সর্বনাশা এই ব্যাধিতে। কারণ ব্যবসায়িক অবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্য পারস্যের সঙ্গে তারা খাতির করতে গিয়েছিল। আর তখনই তাদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল দুরারোগ্য এই ব্যাধি।

ধর্মীয় অবস্থা

যখন ইসলামের আগমন ঘটল তখন আরবদের সর্বসাকুল্যে ধর্ম ছিল এগুলিই। কিন্তু এ ধর্মগুলিকে বার্ধক্য আর বয়সের ব্যাধি পেয়ে বসেছিল। দুর্বলতা আর জীর্ণশীর্ণতায় তাদের কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। এগুলির শরীরের গিরায় গিরায় অধঃপতন আর বিলুপ্তির ব্যারাম হয়েছিল। জং ধরে গিয়েছিল এগুলির

---

[১] তারীখু আরযিল কুরআন ২/১৯৩-২০৮।

অবকাঠামোয়। মক্কার মুশরিকরা দাবি করত, তারা সঠিক দীনে ইবরাহীমীর ওপর রয়েছে। কিন্তু তাদের ভীতরে তলিয়ে দেখলে দেখা যেত শরিয়তে ইবরাহীমীর নীতিমালা থেকে তারা বহু দূরে সরে পড়েছিল। উত্তম আর মহান চরিত্রের যে দীক্ষা এ ধর্ম দিয়েছিল তার প্রতি তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছিল। অন্যায় আর অপরাধের বাজারে ছিল মানুষের উপচে পড়া ভীড়। দিনে দিনে এক সময় তাদের মধ্যে অতি সন্তর্পণে ঢুকে গিয়েছিল পৌত্তলিক জীবনের রূপরেখা আর বৈশিষ্ট্য- এমন সব প্রথা-পার্বণ আর রীতি-নীতি যেগুলোকে প্রাচীন কালের ধর্মীয় কুসংস্কার বলে আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। এগুলি তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক আর ধর্মীয় জীবনকে ভীষণ প্রভাবিত করেছিল।

সঠিক ইহুদিধর্মের স্থানে হিংসা-বিদ্বেষ আর ঈর্ষা-প্রতারণা আর ঠেলাঠেলি জায়গা করে নিয়েছিল। তাদের নেতারা এবং রাষ্ট্র কিংবা গোত্র প্রধানরা আল্লাহর আসন দখল করে বসেছিল। আল্লাহর পরিবর্তে মানুষ তাদেরকে রব বানিয়ে নিয়েছিল। তারা মানুষদেরকে তাদের সকল কাজে শাসাত। এমনকি প্রাণের গুঞ্জন কিংবা ঠোঁটের ফিসফিসানির ব্যাপারে পর্যন্ত তাদেরকে জবাবদিহি করতে হতো। জীবনে তাদের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছিল ধন-সম্পদ আর পদ কামাই করা। এ ক্ষেত্রে ধর্মকে বলি দিতেও তারা তাতে রাযি ছিল। কুফর ও আল্লাহদ্রোহিতার প্রচার প্রসারেও তারা সন্তুষ্ট ছিল। দীনি ইলমের-যা আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে তাদেরকে তা দান করেছেন এবং সবাইকে তার সম্মান করতে নির্দেশ দিয়েছেন- তার প্রতি অমর্যাদাতেও তারা পরিতৃপ্ত ছিল।

খ্রিস্টধর্ম পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিশে খিচুড়ি হয়ে গিয়েছিল। এটা বোঝা ছিল সাধারণ জনগণের পক্ষে ভারি কঠিন কাজ। আল্লাহ আর মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সব আলামত তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের নিজের অনুসারীদের জীবনের ওপর এর বিশুদ্ধ কোনো প্রভাব অবশিষ্ট ছিল না। কারণ, তারা জীবন ধারণের জন্য যে পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল, তা ছিল এ ধর্মের শিক্ষা-দীক্ষা থেকে অনেক দূরে। না তারা এ ধর্মকে একেবারে ছেড়ে দিতে পারছিল। আর না নিজেদের জীবন পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারছিল।

আরবের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জীবন ছিল মুশরিকদের জীবনের মতোই। তাদের সকলের হৃদয় ও মন এক হয়ে গিয়েছিল। একই বিশ্বাসের ধ্বজা নিয়ে তারা মিছিল বের করেছিল। ঐতিহ্য ও প্রথাগত দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি চলে এসেছিল।

জাহেলী আরব সমাজের কয়েকটি চিত্র

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে জাযীরাতুল আরবের রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করার পর আমরা এখন তার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থার প্রতি চোখ বুলাব। দেখব সে যুগে আরবদের জীবনের এ সকল দিকগুলোর হালত কী ছিল; কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?

সামাজিক অবস্থা

জাহেলী যুগের আরব সমাজে বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল। এক স্তরের সঙ্গে অন্য স্তরের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। সুতরাং, আশরাফদের স্তরে নারী পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা উন্নত ও প্রগতিশীল ছিল। নারীও কিছু ইচ্ছা স্বাধীনতা ভোগ করত। তার কথা শোনা ও মানা হতো। তাকে ইয্যত দেওয়া হতো এবং তার সুরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। তার কারণে নাঙ্গা তলোয়ারের ঝিলিক ছুটত। রক্তের দরিয়া বয়ে যেত। যদি কখনো কোনো পুরুষ নিজ বীরত্ব ও মহানুভবতার প্রশংসা করতে চাইত তবে সে সাধারণত নারীদেরকেই সম্বোধন করত। কোনো কোনো সময় শুধু নারীই যদি চাইতো তবে বিবাদমান ও দ্বন্দ্বমুখর বহু জাতিগোষ্ঠীকে সন্ধি ও শান্তির জন্য একত্র করত। আবার কখনো তার মন চাইলে সে-ই তাদের মধ্যে জ্বালিয়ে দিত ভয়াল যুদ্ধের প্রচণ্ড আগুন। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে তা কখনো পুরো কবীলাকেই শেষ করে ফেলত। পুড়িয়ে বিনাশ করে ফেলত সবকিছু। কিন্তু নারীর এতকিছু সত্ত্বেও পুরুষই ছিল পরিবার ও কবীলার দ্ব্যর্থহীন নেতা এবং সেখানে কথা বলার একমাত্র হক্বদার। তার ফয়সালার প্রতি কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করত না। সমাজের এ স্তরের নারী-পুরুষের সম্পর্কের সূত্র ছিল বিবাহ। নারী তার অলী ও অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে নিত। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে উপেক্ষা করে একা একা নিজ পছন্দ মতো কাউকে বেছে নেওয়ার সুযোগ তার ছিল না। যখন এমন ছিল আশরাফদের অবস্থা ঠিক তখনই সমাজের আরেক শ্রেণীর মানুষের অবস্থা এমন ছিল; নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা তাদের মধ্যে এতটা ভয়াল বিস্তৃতি লাভ করেছিল যাকে অশ্লীলতা, খেপামি ও নোংরামী আর ব্যভিচার ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। ইমাম বুখারী রহ. ও অন্যান্যরা হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন,

'জাহেলী আরব সমাজে সর্বমোট চার প্রকারের বিবাহ প্রচলিত ছিল। এক প্রকারের বিবাহ ছিল বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিবাহের মতোই। কোনো পুরুষ অপর পুরুষের নিকট তার মেয়ে কিংবা অন্য কারও বিবাহের প্রস্তাব দিত এরপরে

সে কবুল করে নিলে মোহর আদায় করে তাকে বিবাহ করে নিত। আরেক প্রকারের বিবাহ ছিল: কোনো স্বামী তার স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হতো তখন তাকে বলত তুমি অমুকের কাছে চলে যাও এবং তার থেকে তোমার গর্ভ ভরে নিয়ে এসো! এরপর থেকে সেই পুরুষ তার স্ত্রীর মধ্যে গর্ভ প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আর কখনোই তাকে স্পর্শ করত না। পরবর্তী সময়ে যখন তার গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠত তখন সে মনে চাইলে স্ত্রীর কাছে যেত। এ বিবাহকে গর্ভ ভরার বিবাহ বলা হতো। তারা ঘৃণ্য এ কাজটি করত মূলত উঁচু বংশের সন্তান লাভের প্রত্যাশায়। তৃতীয় আরেক প্রকারের বিবাহ ছিল : দশজনের কম একটি দল এক জায়গায় সমবেত হতো। এরপরে তারা সকলে একে একে তার সঙ্গে সহবাস করত। পরবর্তী সময়ে যখন সে গর্ভবতী হতো এবং সন্তান প্রসব করার পরে কিছু রাত অতিবাহিত হয়ে যেত তখন সে তাদের সকলকে ডাকত। এ ক্ষেত্রে কেউই তার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারত না। এরপরে সে তাদের সকলকে সম্বোধন করে বলত : তোমরা জানো এ তোমাদেরই হাতের কামাই। এখন সে জন্মগ্রহণ করেছে। এখন সে হে অমুক তোমার সন্তান! এ ক্ষেত্রে সে যার নাম মনে চায় তার নাম বলে দিত এবং তাকে তার সন্তান বলে গণ্য করা হতো। সে এটা মেনে নেওয়ার জন্য বাধ্য ছিল। কখনোই এই সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। চতুর্থ আরেক প্রকারের বিবাহ ছিল : অনেক মানুষ একত্র হয়ে একজন নারীর সঙ্গে সহবাস করত। এ ক্ষেত্রে সে নারী কাউকেই তার থেকে বারণ করতে পারত না। আর তারা ছিল দেহ প্রসারিণী। তারা তাদের গৃহের দরজায় পতাকা টানিয়ে রাখত মানুষ সেটা দেখে তাদেরকে চিনতে ও বুঝতে পারত। সুতরাং, যে চাইত সে অনায়াসেই তাদের কাছে গিয়ে প্রবৃত্তির চাহিদা মিটিয়ে আসতে পারত। যখন তাদের কেউ গর্ভবতী হয়ে পড়ত এবং কোনো সন্তান প্রসব করত, তখন যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল, তারা সবাই একত্রিত হতো। এরপর তারা গণকদেরকে ডাকত। তারা এসে নিজেদের ইচ্ছা মতো যার সঙ্গে চাইত এই সন্তানকে মিলিয়ে দিত। তখন থেকে তাকে তারই সন্তান বলে ডাকা হতো। এ ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-স্বাধীনতার কোনো বালাই ছিল না।

আল্লাহ তাআলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাঠালেন তখন তিনি নষ্ট বিবাহের সকল রীতির উন্মুক্ত দুয়ারে কপাট টেনে দিলেন। বিশ্ববাসীকে উপহার দিলেন ইসলামের সুন্দর ও নির্মল বিবাহরীতি। [৭৬]

[৭৬] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫১২৮। সুনানে আবী দাউদ: কিতাবুন নিকাহ; জাহিলী আরবদের বিবাহ রীতি অধ্যায়।

জাহেলী আরবের নারী পুরুষের মিলনের আরেকটি ভিত্তি ছিল নাঙ্গা তরবারি আর বর্শার শাণিত ফলক। অর্থাৎ, বিভিন্ন কবীলার মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই হতো। লড়াইয়ে যে কবীলা জয়ী হতো, সে পরাজিত কবীলার নারীদেরকে ধরে নিয়ে এসে তাদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। কিন্তু এ সকল মহিলাদের বাচ্চাদেরকে সারা জীবন লজ্জা আর শরমের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াতে হতো।

জাহেলী সমাজের মানুষগুলি বিবাহ-শাদির ক্ষেত্রে নির্ধারিত কোনো সীমারেখা মেনে চলত না। সকলেরই ছিল একই হালত। কুরআনে কারীম এসে তাদেরকে চার পর্যন্ত বিবাহের একটি নির্ধারিত সীমারেখা বেঁধে দেয়। তারা দুই সহোদরা বোনকে একসঙ্গে স্ত্রী বানিয়ে রাখত। বাপ-দাদা মারা যাওয়ার কিংবা তালাক দেওয়ার পরে তারা তাদের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করে নিত। এরপর কুরআনে কারীম এসে তাদেরকে এগুলি থেকে নিষেধ করে [সূরা নিসা : ২২-২৩]। তালাক দেওয়া কিংবা ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ছিল পুরুষের হাতে। তালাক এবং রাজাআতের নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা ছিল না। ইসলাম এসে এক নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দেয়।[৭৭]

যিনা ও ব্যভিচার মহামারীর আকার ধারণ করে গোটা জাহেলী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘাতক মরণব্যাধি হয়ে সমাজের প্রতিটি স্তরের শিরায় শিরায় এর জীবাণু ঢুকে গিয়েছিল। সমাজের কোনো একটি স্তর কিংবা বিশেষ কোনো প্রকারের মানুষ এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ ছিল না। তবে হাতে গনা গোটা আরবের কিছু আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নারী-পুরুষ এই ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। স্বাধীন নারীরা দাসীদের তুলনায় ভালো অবস্থানে ছিল। বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছিল দাসীদের ঘাড়ে। মনে হয়, জাহেলী সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই এই খারাপ ও কুকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলাকে কোনো দূষণীয় কিংবা লজ্জাকর কাজ মনে করত না। ইমাম আবূ দাউদ হযরত আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! অমুক আমার ছেলে। কারণ আমি জাহেলী যুগে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **ইসলামে এ ধরনের দাবি দাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জাহেলী যুগের সমাপ্তি ঘটেছে। স্ত্রী কিংবা দাসী যার সন্তানও তার। আর ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে পাথর** [৭৮]। এ

---

[৭৭] সুনানে আবী দাউদ: তিন তালাকের পরে রাজাআত বাতিল অধ্যায়। মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল আল্লাহর বাণী ২২৯ :البقرة – الطلاق مرتان।

[৭৮] আবূ দাউদ: আল ওয়ালাদু লিল ফিরাশি অধ্যায়। মুসনাদে আহমাদ ২/২০৭।

ক্ষেত্রে উম্মে যামআর ছেলে আব্দুর রহমান বিন যামআকে নিয়ে হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবদ বিন যামআর বিবাদের ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।[৭৮]

জাহেলী আরব সমাজে সন্তানের সঙ্গে পিতার সম্পর্কেরও কয়েকটি সূত্র ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এ কথাই বলত:

إِنَّ أَوْلَادَنَا بَيْنَنَا * أَكْبَادُنَا تَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ

আমাদের সন্তান আমাদেরই কলিজা; যারা জমিনের ওপর চলাফেরা করছে।

অন্যদিকে তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা লজ্জা ও খরচের ভয়ে কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলত। [সূরা আনআম : ১৫১, সূরা নাহল : ৫৮, সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১, সূরা তাকভীর ৮]। কিন্তু এটাকে আমরা গোটা আরবে দেদারসে প্রচলিত আরবীয় সামাজিক চরিত্র বলে আখ্যা দিতে পারি না। শত্রু ছিল সর্বদা তাদের মাথার ওপর। এ কারণে অন্য মানুষের সন্তানের যে প্রয়োজন ছিল তাদের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি।

সহোদর ভাই, চাচাতো ভাই কিংবা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সকলের সম্পর্কের বাঁধন ছিল অতিশয় মযবুত। কারণ, মরু আরবের মানুষগুলি এই সাম্প্রদায়িকতার জন্য বেঁচে থাকত। আবার এর জন্যই হাসিমুখে মৃত্যুর সঙ্গে আলিঙ্গন করত। একটা কবীলার মধ্যে সর্বদা ঐকমত্যের প্রাণস্পন্দন শোনা যেত। সম্প্রদায়প্রীতি একে সবসময় দানাপানি দিয়ে পরিপুষ্ট করে তুলত। সামাজিক শৃঙ্খলার মূল ভিত্তি ছিল সম্প্রদায়, জাতি ও গোষ্ঠীপ্রীতি এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাদের মুখে মুখে ছিল একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ : اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য করো চাই সে যালিম হোক বা মাযলূম হোক! উল্লিখিত প্রবাদের শাব্দিক অর্থই তাদের জীবনে প্রয়োগ হতো। এর অর্থের মধ্যে ঐ সংশোধনী তখনো তার ভাগ্যে জুটেনি ইসলাম যে সুন্দর সংশোধনী আর ব্যাখ্যা তাতে নিয়ে এসেছিল। ইসলাম এসে বলল যালিমকে সাহায্য করার অর্থ হলো তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখা। কিন্তু সম্মান আর নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা একই পুরুষ থেকে উৎসারিত শাখা গোত্রগুলির মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধ বিভীষিকার ধোঁয়া তুলত। জ্বালিয়ে দিত রেষ আর দ্বেষের সর্বনাশা সর্বভুক। আউস ও খাযরাজ, আবস ও যুবইয়ান, বনু বকর ও তাগলিব এর প্রথম সারির উদাহরণ।

---

[৭৮] এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০৫৩, ২২১৮, ২৪২১, ২৫৩৩, ২৭৪৫, ৪৩০৩, ৬৭৪৯, ৬৭৬৫, ৬৮২৭, ৭১৮২। ফাতহুল বারী ৪/৩৪২।

অপরদিকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আর কবীলার মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করার মতো ছিল না। সম্প্রীতি আর ভালোবাসার সকল আবহ তাদের মধ্য থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছিল। সৌহার্দের বাঁধন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। মহব্বতের গাছটি গোড়া থেকে উপড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। আল্লাহর দেওয়া শক্তি ও বল এভাবে তারা অর্থহীন অবিরাম সংঘাত আর যুদ্ধে ক্ষয় করে যাচ্ছিল। তবে বিশুদ্ধ ধর্ম আর কুসংস্কারের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন প্রথা আর ঐতিহ্যের যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধা কখনো কখনো পানি ঢেলে সে আগুনের তেয ও হিংস্রতা কমাতে পারত। আবার কখনো কখনো বন্ধুত্ব, মিত্রতা ও তাবেদারি চুক্তি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের বাঁধন গড়ে তুলত। তা ছাড়া হারাম মাসগুলো ছিল তাদের জীবন আর জীবিকা নির্বাহের জন্য আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। এ সময় তারা পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করত। কারণ তারা এ মাসগুলোর প্রতি পূর্ণ ইয্যত ও সম্মান দেখাত।

আবু রাজা উতারেদী বলেন, যখন রজব মাস আসত তখন আমরা বলতাম এ মাস হলো বর্শা ও নেযা উৎপাটনকারী মাস। সুতরাং, আমাদের যত বর্শা ও তীর রয়েছে আমরা সবগুলোর লৌহ ফলক খুলে ফেলতাম এবং রজব মাসে এগুলো সব ছুঁড়ে ফেলতাম।[৮০] অন্যান্য হারাম মাসগুলোতেও আমাদের রীতি ছিল অভিন্ন।[৮১]

সংক্ষেপে, জাহেলী যুগে আরবের সামাজিক জীবন দুর্বলতা আর অজ্ঞতার চূড়ান্ত পরিণতিতে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। জাহেলিয়াত তার ভেতরে মযবুতির সঙ্গে আসন গেড়ে বসেছিল। চতুর্দিকে ছিল মূর্খতা আর কুসংস্কারের ছড়াছড়ি। মানুষ মানুষের পরিবর্তে হাইওয়ান-জানোয়ার আর চুতষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবন যাপন করত। আরবের বাজারে পণ্যের মতো নারীদের বেচা-কেনা হতো। তাদের সঙ্গে কখনো কখনো প্রাণহীন মাটি আর পাথরের মতো ঘৃণ্য আচরণ করা হতো। গোত্র আর গোষ্ঠী সম্পর্কে ফাটল ধরে গিয়েছিল। বরং ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। আর সরকারের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল হতসর্বস্ব প্রজাদের সবকিছু হাতিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের ধনভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ রাখা এবং বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ আর লড়াই পরিচালনা করা।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জাহেলী আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সামাজিক অবস্থার খালাতো ভাইয়ের মতো। সেও তার পেছনে পেছনে অনুসরণ করে চলছিল। আরবদের জীবনধারা আর জীবিকা নির্বাহের পথ ও পদ্ধতির দিকে সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই

[৮০] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৪৩৭৬।
[৮১] ফাতহুল বারী ৮/৯১।

এটা আমাদের সামনে বড় স্পষ্ট হয়েই ধরা দিবে। ব্যবসা ও তেজারত ছিল আরবদের জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আর সফল ব্যবসার জন্য প্রয়োজন যথাযথ শান্তি ও নিরাপত্তা। কিন্তু হারাম মাস ব্যতীত গোটা জাযীরাতুল আরবে খুঁজে পাওয়া যেত না একটু স্বস্তি কিংবা শান্তির ঠিকানা। আর এসব কারণে এ সকল হারাম মাসেই জাযীরাতুল আরবে বসত ইতিহাস খ্যাত উকায, যুল মাজায ও মাজান্না ইত্যাদির মতো প্রসিদ্ধ মেলা।

কারিগরি বিদ্যা আর হস্তশিল্পের পরীক্ষায় আরবদের নাম্বার ছিল শূন্য। তামাম দুনিয়ার পেছনে ছিল তাদের ঘর। কাপড় বুনা, চামড়া দাবাগাতসহ ছেঁড়া-ফাঁড়া যে সকল কারিগরি আর হস্তশিল্প,গোটা আরবে চোখে পড়ত, তা ছিল ইয়েমেন, হীরা আর সিরিয়া সংলগ্ন অঞ্চলগুলোতে। কেবল কৃষিকাজ আর পশুপালনের ক্ষেত্রে জাযীরাতুল আরবের অভ্যন্তরীণ জীবনে কিছুটা বিন্যাসের ছোপ ছিল। আর আরবের অধিকাংশ নারীরাই ছিল সুতা কাটায় ব্যস্ত। কিন্তু সমস্যা ছিল একটাই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা জীবন ধরে যা কিছু তারা কামাই করত যুদ্ধের সময় চরম নির্মমতার সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যেত। দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর নগ্নতার বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠত গোটা আরব সমাজ।

চারিত্রিক অবস্থা

সন্দেহ নেই আরবদের মধ্যে এমন অগণিত অসংখ্য দুশ্চরিত্র আর অনৈতিকতা বিদ্যমান ছিল বিশুদ্ধ বিবেকবোধ আর সুনির্মল মানসিকতা যাকে কোনো দিনও সমর্থন করবে না। কিন্তু এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে এমন কিছু উত্তম ও প্রশংসিত চারিত্রিক গুণও ছিল যা মানবীয় বিবেককে হতবাক করে দেয়। মাটির মানুষকে ঠেলে দেয় বিস্ময়ের রাজ্যে। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো:

মহত্ত্ব ও মহানুভবতা

এটা ছিল তাদের এমন এক বৈশিষ্ট্য, যে ক্ষেত্রে তারা একে অপরের সঙ্গে আগে বাড়ার প্রতিযোগিতা করত। এটার ওপর তারা এতটা গর্ব করত যে, গোটা আরবের শের ও কবিতার প্রায় অর্ধেকটাই তারা এর প্রশংসা আর প্রশস্তির পেছনে ব্যয় করেছে। কেউ কেউ কখনো নিজের কাজের প্রশংসা করত। আবার কেউ কেউ অন্য কারও কীর্তির গুণগাথা গাইত। কখনো কখনো এমন দেখা যেত যে, কেউ চরম দারিদ্র্য আর অভাবে জর্জরিত হয়ে জীবন যাপন করছিল। আর ঠিক তখনই তার কাছে একজন মেহমান এসে উপস্থিত হলো। এ সময় হয়তো তার কাছে তার ও তার পরিবারের জীবন-যাপনের একটি উট ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু তখনো মহত্ত্ব আর মহানুভবতার জোয়ার তাকে আন্দোলিত করে।

তার ভেতরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সে তৎক্ষণাৎ তার কাছে ছুটে যায় এবং তাকে ধরে মেহমানের জন্য যবাই করে দেয়। তাদের মহানুভবতার আরেকটি নিদর্শন ছিল অপরের বড় বড় দিয়ত এবং আর্থিক যিম্মাদারি গ্রহণ। এগুলি দ্বারা তারা মানুষকে ধ্বংস আর রক্তপাত থেকে বাঁচিয়ে রাখত এবং অন্যান্য নেতা ও সরদারদের ওপর গর্বভরে নিজেরা নিজেদের প্রশংসা করত।

তাদের এই মহানুভবতার একটি নিদর্শন ছিল এই যে, তারা মদ্য পান করে গর্ববোধ করত। কিন্তু তাদের গর্বের কারণ এটা ছিল না যে, মদ নিজেই একটি গর্বের বস্তু। বরং এ কারণে যে, এটাও মহানুভবতা ও বদান্যতার একটা পদ্ধতি। এটা পান করে গোটা সম্পদ উড়িয়ে দিলেও মানুষের মনে সামান্য খটকার উদ্রেক হয় না। মূলতঃ এ জন্যই তারা আঙ্গুরের গাছকে করম তথা মহানুভবতা, আর আঙ্গুরকে করমের মেয়ে বলে আখ্যায়িত করত। যদি জাহেলী যুগের কবিদের কাব্যগ্রন্থগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় তবে এই উদারতা আর মহানুভবতার একটি বিশেষ অধ্যায় সেগুলোতে দেখা যাবে। কবি আন্তারা বিন শাদ্দাদ আল আবছী তার একটি মুআল্লাকাতে (প্রাচীন যুগের আরবি কাব্য সংকলন) লেখেন,

وَلَقَدْ شَرِبْتُ مِنَ الْمُدَامَةِ بَعْدَمَا ... رَكَدَ الهواجرُ بالمشوفِ المعلمِ

بزجاجةٍ صفراءَ ذاتَ أسرَّةٍ ... قُرنتْ بأزهرَ في الشِّمالِ مفدَّمِ

فَإِذَا شَرِبْتُ فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ ... مَالِي وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَمِ

وَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا أُقَصِّرُ عَنْ نَدًى ... وَكَمَا عَلِمْتَ شَمَائِلِي وَتَكَرُّمِي

'আমি দুপুরের সূর্য-তাপের প্রচণ্ডতা কমে গেলে একটি কাঁচের সোনালী পাত্র থেকে নেশাকর শরাব পান করেছি।

আর যখন আমি শরাব পান করি তখন আমার সম্পদ উড়িয়ে দিই। কিন্তু আমার ইয্যত ভরপুর থাকে তাতে কোনো চোট লাগে না।

অতঃপর যখন আমার হুঁশ ফিরে আসে তখনও আমি দানের ক্ষেত্রে ত্রুটি করি না। আর আমার চরিত্র সম্পর্কে তোমরা তো কিছুটা হলেও জানো'।

তাদের এই মহানুভবতার আর বদান্যতার আরেকটি ফলাফল ছিল, জুয়া খেলায় মত্ত থাকা। তারা এটাকেও মহানুভবতা আর বদান্যতার পন্থা মনে করত। কেননা, তারা এতে যে লাভ পেত কিংবা লাভকারীদের অংশ থেকে যা কিছু অবশিষ্ট থেকে যেত, তা দিয়ে তারা মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়াত। এ জন্যই তো দেখা যায় যে, কুরআনে কারীম তাদের মদ ও জুয়ার উপকারের কথা অস্বীকার করে না। বরং কুরআনে কারীম তাদের মদ ও জুয়া সম্পর্কে বলে,

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا আর সে দুটোর পাপ সে দুটোর উপকারের চেয়ে বেশি। [সূরা বাকারা : ২১৯]

ওয়াদা পালন

ওয়াদা ছিল তাদের বিবেচনায় ঋণের মতো। এর প্রতি তারা সজাগ দৃষ্টি রাখত। প্রয়োজন হলে ছেলেমেয়ে হত্যা কিংবা ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। এ ক্ষেত্রে হানী বিন মাসউদ আশ শাইবানী, সামাওয়াল বিন আদিয়া এবং হাজিব বিন যারারা আত-তামীমীর ঘটনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট।[৮২]

আত্মমর্যাদাবোধ

এর ফলাফল ছিল তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা, গাইরাত ও গম্ভীরতা বেড়ে যাওয়া। সামান্য কিছুতেই তাদের জ্বলে ওঠা। লাঞ্ছনা কিংবা অপমানের কোনো বাক্য কানে এসে পড়া মাত্রই তারা তরবারি আর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। লাগিয়ে দিত বিভীষণ যুদ্ধের বিভীষিকা। এ ক্ষেত্রে তারা নিজের জানের খতরারও কোনো ভয় পেতনা।

প্রতিজ্ঞায় অনড়তা

তারা যখন কোনো কিছুতে তাদের গর্ব ও ইয্যত দেখার পরে সেটা করার মনোস্থ করত এবং এর ওপর সুদৃঢ় সংকল্প করত তখন অন্য কিছু তাদেরকে সে পথ থেকে ফিরাতে পারত না। বরং তারা সে পথে নিজের জানের ঝুঁকি নিয়ে হলেও অগ্রসর হতো।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

তারা এর যথেষ্ট প্রশংসা করত। কিন্তু তাদের অধিক বীরত্ব ও সাহসিকতা,

---

[৮২] হানীর ঘটনা 'হীরার শাসকগণ' শিরোনামে পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সামাওয়ালের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, কবি ইমরুল কায়স তার কাছে কতগুলো লৌহবর্ম আমানত রেখেছিল। কিন্তু হারিস ইবনে আবী শাম্মার গাস্সানী তার কাছ সেগুলি নিয়ে নিতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন এবং তায়মার তার একটি প্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঘটনাক্রমে তার একটি ছেলে প্রাসাদের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। হারিস তার ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়ে লৌহ বর্ম অনতিবিলম্বে না দিলে ছেলের প্রাণ নাশের হুমকি দিলো। কিন্তু সামাওয়ালের অবিচলতায় তা ফাটল ধরাতে পারল না। এক পর্যায়ে তার চোখের সামনে হারিস তার ছেলেকে হত্যা করে ফেলল।

আর হাজিবের ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মহামারী আর অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি কিসরার নিকট তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবতরণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাদের বিদ্রোহ আর গণ্ডগোল করার দারুণ ভয় ছিল কিসরার মনে। তাই তিনি বন্ধকী প্রদান ছাড়া অনুমতি দিতে রাজি হলেন না। তখন হাজিব কিসরার কাছে তার ধনুক বন্ধক রেখে দেন। মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে হাজিব আপন ওয়াদা পালন করেন। অতঃপর অনাবৃষ্টি শেষ হলে তাঁর কওম নিজ অঞ্চলে ফিরে যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর ছেলে উতারিদ ইবনে হাজিব রা. কিসরার কাছে পিতার বন্ধকী ধনুক ফিরিয়ে আনতে গেলে কিসরা তাকে ফিরিয়ে দেন।

যুদ্ধ আর সংগ্রামের প্রতি অধিক টান ও তৎপরতার কারণে এটা তাদের মধ্যে খুব কমই দেখা যেত।

গ্রামীণ সরলতা আর নগর জীবনের ধাঁধা ও প্রহেলিকা থেকে নির্মলতা

এর ফলাফল ছিল সততা ও আমানতদারি। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা আর গাদ্দারি থেকে দূরাবস্থান।

গোটা বিশ্বের সঙ্গে জাযীরাতুল আরবের যোগাযোগ সুবিধার পাশাপাশি আরবদের মধ্যে নৈতিক আর চারিত্রিক এসব বৈশিষ্ট্য আর গুণের বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গোটা বিশ্ববাসীর মধ্য থেকে একটি ব্যাপক পয়গাম বহনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। তাদেরকে পছন্দ করেছিলেন গোটা বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের জন্য। তাদেরকে বাছাই করেছিলেন বিশ্ব মানব সমাজে এক ব্যাপক সংস্কার আর সংশোধনী আনার জন্য। কেননা, এ সকল আখলাক ও চরিত্রের কোনোটি যদিও কখনো সামাজিক বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিত কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এগুলো ছিল চরিত্রের অমূল্য ভূষণ। এগুলোর সামান্য কিছু সংস্কার ও সংশোধন প্রয়োজন ছিল। এগুলো দিক ও গতির সামান্য একটু পরিবর্তনের প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল। আর ইসলাম এসে তাতে এই সংশোধনই দিয়েছিল।

ওয়াদা পালনের পরে তাদের এ সকল চারিত্রিক গুণের মধ্যে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ ও ব্যাপক উপকারী ছিল সম্ভবত তাদের আত্মমর্যাদাবোধ ও প্রতিজ্ঞায় অনড়তা। কেননা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা মিটিয়ে দিয়ে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে হলে, জোর-যুলুমের জায়গায় আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে, খারাপকে ভালোর দ্বারা বদলাতে হলে এ সকল গুণের কোনো জুড়ি নেই। এই বিশাল শক্তি, সুদৃঢ় সংকল্প আর অনড় প্রতিজ্ঞা ব্যতীত তা সম্ভবও নয়। এগুলি ছাড়াও তাদের চরিত্রে আরও অনেক উত্তম গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমরা আর সে দিকে যেতে ইচ্ছুক নই।

বংশ পরিচয়

শুভ জন্ম ও লালন পালন

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবার ও বংশ

নবীয়ে দোজাহান সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নসবনামা তিন ভাগে বিভক্ত: একটি অংশের বিশুদ্ধতার ওপর সকল ঐতিহাসিক আর সীরাত লেখক সর্বসম্মত। আর সেটা হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিয়ে আদনান পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাপারে ঐতিহাসিক ও সীরাত লেখকদের মধ্যে সীমাতিরিক্ত মতানৈক্য রয়েছে। এটা এমন একটি মত পার্থক্য বিষয়, যার মধ্যে মতৈক্য ও সমতা বিধান সম্ভব নয়। আর সেটা হলো আদনান থেকে শুরু করে হযরত ইবরাহীম আ. পর্যন্ত। এ ব্যাপারে একটি দলের রায় হলো এ ব্যাপারে চুপ থাকাই সমীচীন এবং এটা বর্ণনা করা জায়েয নয়। কিন্তু অপর দলের মতে, এটা বিশুদ্ধ এবং বর্ণনা করাও সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু এরপর তারা নিজেরাও এই সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য ও ইখতেলাফ করেছেন এবং তাদের সর্বমোট মত এ ক্ষেত্রে ত্রিশের কোটা ছাড়িয়ে গেছে। তবে এ ব্যাপারে সকলেরই ঐকমত্য রয়েছে যে, আদনান হলো হযরত ইসমাঈল আ. এর প্রকৃত সন্তান।

তৃতীয় অংশ শুরু হয়েছে হযরত ইবরাহীম আ. থেকে। আর শেষ হয়েছে হযরত আদম আ. পর্যন্ত গিয়ে। এ ক্ষেত্রে সকল তথ্য উপাত্তের মূল ভিত্তিই হলো আহলে কিতাবদের বর্ণনাগুলো। এ ক্ষেত্রে তারা বয়স ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে এতটা তালগোল আর খিচুড়ি পাকিয়েছে যে, সেগুলো ভুল ও অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। আর বাকি ক্ষেত্রে আমাদের চুপ থাকাই সমীচীন।

নীচে আমরা ধারাবাহিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নসবনামার তিনটি অংশই উল্লেখ করে দিচ্ছি:

প্রথম অংশ : মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব-তার নাম শায়বা-বিন হাশিম-তার নাম আমর- বিন আবদে মানাফ-তার নাম মুগীরা-বিন কুসাই-তার নাম যায়দ-বিন কিলাব মুররাহ বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর-তার উপাধি ছিল কুরাইশ এবং তার দিকে সম্বন্ধ করেই তার বংশধরকে কুরাইশ বলা হয়- বিন মালিক বিন নযর-তার নাম কায়স-বিন কিনানা বিন খুযাইমা বিন মুদরিকা-তার নাম আমের-বিন ইলয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মাআদ বিন আদনান। [৮৩]

---

[৮৩] ইবনে হিশাম ১/১,২। তারীখে তাবারী ২/২৩৯-২৭১।

দ্বিতীয় অংশ : আদনান বিন উদাদ বিন হামাইসা' বিন সালামান বিন আউস বিন বূয বিন কিমওয়াল বিন উবাই বিন আওয়াম বিন নাশেদ বিন হেযা বিন বুলদাস বিন ইউদলাফ বিন তাবিখ বিন জাহিম বিন নাহিশ বিন মাখী বিন ঈস বিন আবকর বিন আবীদ বিন দিয়া বিন হামদান বিন সিনবর বিন ইয়ারুবী বিন ইয়াহযুন বিন ইয়ালহুন বিন উরওয়া বিন আয়জ বিন দীশান বিন আয়সার বিন উফনান বিন আয়হাম বিন মুকসির বিন নাহিস বিন যারিহ বিন সামী বিন মুযী বিন আওজা বিন ইরাম বিন কায়দার বিন ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।[৮৪]

তৃতীয় অংশ : ইবরাহীম আ. বিন তারাহ-তার নাম আযর-বিন নাহূর বিন সারূ'-অথবা সারূগ-বিন রাউ বিন ফালাখ বিন আবের বিন শালাখ বিন উরফাখশাদ বিন সাম বিন নূহ আ. বিন লামেক বিন মুত্তাওশালাখ বিন আখনূখ-কারও মতে তিনি আল্লাহর নবী হযরত ইদরীস আ.- বিন ইয়ারদ বিন মাহলাঈল বিন কীনান বিন আনূশ বিন শীস বিন আদম আলাইহিমুস সালাম।[৮৫]

নবী পরিবার

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার তাঁর প্রপিতামহ হাশিম বিন আবদে মানাফের দিকে সম্বন্ধ করে হাশিমী পরিবার নামে খ্যাত ছিল। আমরা এখন হাশিম ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত তার অধস্তন পুরুষদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

এক. হাশিম

আমরা আগেই বলে এসেছি, যখন বনু আবদে মানাফ আর বনু আব্দুদ্দার মক্কা ও বাইতুল্লাহর বিভিন্ন পদ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়ার জন্য সন্ধি করেছিল সেই সন্ধি অনুযায়ী বনু আবদে মানাফ থেকে হাজীদেরকে পানি পান করানো আর সাহায্য সহযোগিতার দায়িত্ব পান হাশিম। হাশিম ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধনকুবের। তিনিই ইতিহাসে সর্বপ্রথম হাজীদেরকে মক্কায় সারীদ তৈরি করে খাইয়ে ছিলেন। তার নাম ছিল আমর। আর হাশিম অর্থ টুকরো টুকরোকারী। যেহেতু তিনি রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সারীদ বানিয়ে হাজীদেরকে খাইয়েছিলেন এ জন্য তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এতদিন পর্যন্ত কুরাইশরা বছরে এক বার

---

[৮৪] ইবনে কালবীর বর্ণনা অনুসারে ইবনে সা'দ এটা তাবাকাতে ইবনে সাদের ১/৫৬, ৫৭ পৃষ্ঠায় এটা উল্লেখ করেছেন। একই সূত্রে তাবারী তারীখে তাবারী ২/২৭২ পৃষ্ঠায় এ কথাই উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বেশ কিছু মতভেদ আর মতানৈক্যের দশা অবগত হওয়ার জন্য দেখুন তারীখে তাবারী ২/২৭১-২৭৬। ফাতহুল বারী ৬/৬২১-৬২৩।

[৮৫] ইবনে হিশাম ২/২-৪। তারীখে তাবারী ২/২৭৬। তবে এ সকল উৎসে নামের উচ্চারণ আর কিছুর উল্লেখ অনুল্লেখের মাঝে মতভেদ রয়েই গেছে।

ব্যবসায়িক সফর করত। তিনি সর্বপ্রথম বছরে দু'টি সফরের সূচনা করেন। একটি গ্রীষ্মকালে এবং অপরটি শীতকালে। কবির ভাষায়:

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ... قَوْمٌ بِمَكَّةَ مُسْنِتِينَ عِجَافِ

سُنَّتْ إِلَيْهِ الرِّحْلَتَانِ كِلَاهُمَا ... سَفَرُ الشِّتَاءِ وَرِحْلَةُ الْأَصْيَافِ [86]

'এই সেই আমর যিনি মহামারী আর মন্বন্তরে জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়া নিজ কওমকে মক্কায় রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাইয়েছেন। যিনি তাদের জন্য গ্রীষ্ম ও শীতকালে দুইটি সফরের রীতি প্রবর্তন করেছেন'।

তার সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারা যায় তা হলো তিনি ব্যবসা করার জন্য একবার সিরিয়ার পথে রওয়ানা করেছিলেন। অতঃপর যখন মদীনায় এসে উপস্থিত হলেন সেখানে বনু আদী বিন নাজ্জারের সালমা বিনতে আমরকে বিবাহ করলেন এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করলেন। এরপরে তিনি আবার সিরিয়ার পথে রওয়ানা হলেন। আর তার স্ত্রী নিজ বাড়িতেই রয়ে গেল। তার স্ত্রীর পেটে ছিল তখন ছেলে আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হাশিম ফিলিস্তীনের গাযা শহরে মৃত্যুবরণ করলেন। আর তার স্ত্রী সালমা ৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মুত্তালিবকে জন্ম দেন। তার নাম রাখেন শাইবা। কারণ জন্মলগ্নেই তার কয়েকটি চুল নাকি সাদা ছিল।[৮৭] আর আরবি ভাষায় সাদাকে বলা হয় শাইবা। এরপরে আব্দুল মুত্তালিব ইয়াসরিবে মাতুলালয়েই লালিত পালিত হন। আর হাশিমের ছিল চার ছেলে ও পাঁচ মেয়ে। ছেলেরা হলো আসাদ, আবু সাইফী, নাজলা ও আব্দুল মুত্তালিব। মেয়েরা হলো শিফা, খালেদা, জয়ীফা', রুকাইয়্যা ও জান্নাহ।[৮৮]

দুই. আব্দুল মুত্তালিব

আমরা ইতঃপূর্বেই জেনেছি যে, হাশিমের পরে কাবার হাজীদেরকে পানি পান, সাহায্য সহযোগিতার যিম্মাদারি চলে যায় তার ভাই মুত্তালিব বিন আবদে মানাফের কাছে। আর তিনি ছিলেন তার কওমের একজন শরীফ লোক। মানুষ তাকে সকল কাজে মান্য করত। বদান্যতা আর দানশীলতার কারণে কুরাইশরা তাকে ফাইয়ায বলে ডাকত। যখন শাইবা-তথা আব্দুল মুত্তালিব- সাত কিংবা আট বছরের কিশোরে পরিণত হলেন তখন চাচা মুত্তালিব তার কথা শুনতে পেলেন। এরপরে মুত্তালিব তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। মদীনায় এসে যখন তাকে দেখতে পেলেন তখন তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি তাকে বুকের সঙ্গে কতক্ষণ চেপে ধরলেন। এরপর তাকে নিজ বাহনের পিঠে উঠিয়ে নিতে

---

৮৬ ইবনে হিশাম ১/১৫৭।
৮৭ ইবনে হিশাম ১/১৩৭।
৮৮ প্রাগুক্ত ১/১০৭।

চাইলে কিশোর শাইবা মায়ের অনুমতি ব্যতীত সেটা করতে অস্বীকার করলেন। সুতরাং মুত্তালিব তার মায়ের কাছে অনুমতি চাই ' কিন্তু শাইবার মা তাতে রাযি হলেন না। মুত্তালিব বললেন সে তো তার পিতার দেশে ও আল্লাহর হারাম শরীফে যাবে তাতে সমস্যা কোথায়? এ কথা শুনে তার মা সম্মত হলেন এবং তাকে সফরের অনুমতি দিয়ে দিলেন। মুত্তালিব তাকে নিজের পেছনে বসিয়ে মক্কায় এসে উপনীত হলেন। মানুষ শাইবাকে মুত্তালিবের গোলাম ভাবল এবং বলল এই হলো আব্দুল মুত্তালিব তথা মুত্তালিবের গোলাম। মুত্তালিব লোকদের উদ্দেশে বললেন তোমাদের সর্বনাশ হোক! সে তো আমার ভাই হাশিমের ছেলে।।

এরপর থেকে শাইবা আব্দুল মুত্তালিব নামে পরিচিতি লাভ করলেন এবং চাচা মুত্তালিবের কাছে থেকেই বড় হতে লাগলেন। পরবর্তী সময়ে মুত্তালিব ইয়েমেনের রিদমান অঞ্চলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পরে মক্কায় তার আসনে সমাসীন হন আব্দুল মুত্তালিব। আব্দুল মুত্তালিব তার পূর্বপুরুষদের অনুকরণে গোত্রের জন্য সবকিছু উজাড় করে খাটতে লাগলেন। এভাবে দেশের জন্য ও কওমের জন্য কাজ করে আব্দুল মুত্তালিব এক সময় সকলের চোখে এতটা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হলেন যা তার পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে ইতঃপূর্বে কেউই অর্জন করতে পারেনি। তার কওমের মানুষরা তাকে পরম ভালোবাসায় বরণ করে নিলো। তার ভয় আর শ্রদ্ধার বিশাল অবয়ব তৈরি হলো কওমের প্রতিটি সদস্যের কলবে। [৮৯]

যখন মুত্তালিব মারা গেলেন তখন নওফল আব্দুল মুত্তালিবের ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্পত্তির ওপর হামলা করে তা লুটপাট করে নিয়ে গেল। আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের কিছু লোকের কাছে তার চাচার বিরুদ্ধে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু তারা বলে দিলো আমরা তোমার ও তোমার চাচার মাঝে নাক গলাতে রাযি নই। এরপর আব্দুল মুত্তালিব ইয়াসরিবের বনু নাজ্জারের তার মামাদের কাছে সাহায্য চেয়ে একটি চিঠি পাঠালেন। সংবাদ পেয়ে তার মামা আবু সাদ বিন আদী ৮০ জন সওয়ার নিয়ে মক্কার আবতায় এসে অবতরণ করলেন। সেখানে আব্দুল মুত্তালিব তার সঙ্গে মুলাকাত করলেন। তিনি মামা আবু সাদকে কিছু সময় বিশ্রাম করার অনুরোধ করলে আবু সাদ বললেন, নওফলের সঙ্গে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত আল্লাহর শপথ আমি বিশ্রাম করব না! এরপর আরও সামনে অগ্রসর হয়ে নওফলের দেখা পেলেন। নওফল তখন কুরাইশ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে হাতীমে বসা ছিল। আবু সাদ তার নাঙ্গা তরবারি নওফলের মাথার ওপর তুলে ধরে বললেন বাইতুল্লাহর রবের শপথ! যদি তুমি আমার ভাগিনার সহায়-সম্পত্তি ফিরিয়ে না দাও তবে আমি তোমার মাথায় এ তরবারি চালিয়েই ছাড়ব। তখন

[৮৯] ইবনে হিশাম ১/১৩৭, ১৩৮। তারীখে তাবারী ২/২৪৭।

নওফল বলল আমি তার সবকিছু ফিরিয়ে দিলাম এবং সে উপস্থিত কুরাইশ নেতাদেরকে এর ওপর সাক্ষী রাখল। এরপর আবু সাদ আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বিশ্রাম নিলেন। তিন দিন তার কাছে অবস্থান করলেন। এরপর উমরা আদায় করে মদীনায় ফিরে এলেন।

এ ঘটনার পরে নওফল বনু হাশিমের বিপক্ষে বনু আবদে শামস বিন আবদে মানাফের সঙ্গে মিত্র চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। আর যখন বনু খুযাআ বনু নাজ্জারকে আব্দুল মুত্তালিবের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখল তখন তারা বলল তোমরা যেমন তাকে জন্ম দিয়েছ ঠিক একইভাবে আমরাও তো তাকে জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তার সাহায্যে আমাদের সর্বাগ্রে এগিয়ে যাওয়া উচিত। আর এটার কারণ ছিল এই যে, আবদে মানাফের মা ছিল বনু খুযাআর মেয়ে। সুতরাং, তারাও দারুন নদওয়াতে এলো এবং বনু আবদে শামস ও নওফলের বিপক্ষে বনু হাশিমের সঙ্গে মিত্রচুক্তিতে আবদ্ধ হলো। এই সেই মিত্রচুক্তি যার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল মক্কা বিজয়। পরবর্তী সময় এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।[১০]

বাইতুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত আব্দুল মুত্তালিবের জীবনের দুটি ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধঃ

যমযম কূপের খনন কার্য ও হস্তীবাহিনীর ঘটনা

প্রথম ঘটনার সার-সংক্ষেপ : এক রাতে আব্দুল মুত্তালিব স্বপ্নে দেখলেন, তাকে যমযম কূপ খননের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যে এর অবস্থান স্থলও বিস্তারিত বলে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি স্বপ্নে পাওয়া নির্দেশ অনুযায়ী মাটি খনন করতে লাগলেন। এক সময় মাটির পেটে ঐ সকল জিনিস গচ্ছিত পেলেন যেগুলি বনু জুরহুম নির্বাসনের সময় এখানে রেখে গিয়েছিল। আর তা ছিল কতগুলি তরবারি, লৌহবর্ম আর দুটি সোনার হরিণ। আব্দুল মুত্তালিব তরবারিগুলি দিয়ে কাবার দরজা বানালেন এবং সোনার হরিণদুটিও রেখে দিলেন কাবার দরজা বরাবর এবং হাজীদের জন্য যমযম কূপ থেকে পানি পান করার ব্যবস্থা করলেন।

যখন মাটি খনন করে যমযম কূপের দেখা মিলল তখন কুরাইশরা আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হলো। তারা তাকে বলল আমাদেরকেও তুমি এর মধ্যে অংশীদার করে নাও। তিনি বললেন আমি সেটা কখনোই পারব না। এ কাজের জন্য আমায় একাকেই মনোনীত করা হয়েছে। কুরাইশরা তাকে সহজে ছাড়ল না। একটা সুরাহার জন্য তারা তাকে সঙ্গে নিয়ে চলল বনু সাআদের এক গণক নারী হুযাইমের কাছে। সে ছিল সিরিয়ার সম্ভ্রান্তদের একজন। পথিমধ্যে

[১০] বিস্তারিত দেখুন তারীখে তাবারী ২/২৪৮-২৫১।

তাদের পানি ফুরিয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা আব্দুল মুত্তালিবকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করালেন অথচ এর বিপরীতে তাদের ওপর এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল না। তখন তারা যমযমের পানির ব্যাপারে আব্দুল মুত্তালিবের বিশেষত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারল এবং মক্কায় ফিরে গেল। ঠিক এ সময়ই আব্দুল মুত্তালিব মানত করল যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাকে দশটি ছেলে দান করেন এবং তারা বড় হয়ে তাকে রক্ষা করার বয়সে উপনীত হয় তবে তাদের একজনকে তিনি কাবার কাছে বলি দিবেন।[৯১]

দ্বিতীয় ঘটনার সার-সংক্ষেপ : হাবশার বাদশা নাজ্জাসীর পক্ষ থেকে ইয়েমেনে তার গভর্নর জেনারেল আবরাহা বিন সাবাহ আল হাবশী। যখন সে আরবদেরকে মক্কার কাবা শরীফে হজ্জ করতে দেখল তখন সে সানাতে একটি বিশাল গির্জা নির্মাণ করল। সে চাইল আরবের হজ্জের পরিবর্তে সানাতে হজ্জ হোক। বনু কেনানার এক ব্যক্তি এ সংবাদ শুনতে পেল। সুতরাং, সে এক রাত্রে সেই গির্জায় ঢুকে তার কেবলার জায়গায় পায়খানা করল। যখন আবরাহা এ খবর জানতে পারল তখন সে ক্রোধে ফেটে পড়ল। দ্বেষের বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল তার শিরায় শিরায়। প্রায় ষাট হাজার সৈন্যের এক বিশাল বহর নিয়ে সে কাবা শরীফ ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য মক্কার পথে পা বাড়াল। নিজের বাহন স্বরূপ সে বেছে নিলো একটি প্রকাণ্ড হাতি। আর পুরো বাহিনীতে মোট হাতির সংখ্যা ছিল নয়টি বা তেরোটি। এভাবে অবিরাম সফর করতে করতে এক সময় সে মুগাম্মাসে গিয়ে পৌঁছল। সে এখানে তার বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করল এবং হাতিগুলোকে তৈরি করল। সবকিছু সম্পন্ন করে এক সময় মক্কায় প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হলো। অতঃপর যখন সে মীনা ও মুযদালিফার মাঝামাঝি মুহাস্‌সার উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছল তখন তার হাতি বসে গেল এবং দক্ষিণে কাবার দিকে এক কদমও অগ্রসর হলো না। অথচ তাকে যখনই পূর্ব, পশ্চিম কিংবা উত্তর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতো সে আগ্রহভরে জোর কদমে সামনে ছুটতে থাকত। আর যখন কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতো তখন সে বসে পড়ত। তারা এ অবস্থার মধ্যে সময় ক্ষেপণ করছিল এমন সময় আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন। তারা তাদের ওপর শক্ত পাথরের ছোট ছোট কঙ্কর নিক্ষেপ করতে লাগল। এক পর্যায়ে তাদেরকে ভক্ষিত তৃণের মতো বানিয়ে দিলো। এই পাখিগুলি ছিল ছোট চড়ুই পাখির মতো আবাবীল পাখি। তাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল তিনটি করে কঙ্কর। একটা ছিল চঞ্চুতে। আর দুটি ছিল দুই পায়ে। কঙ্করগুলি ছিল ছোলার (চনাবুটের) আকারের । এগুলি যার গায়েই লাগত তার গোটা দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলত এবং সে জায়গায় ধ্বংস হয়ে যেত। পাথর লেগে সবাই

---

[৯১] ইবনে হিশাম ১/১৪২-১৪৭।

সেখানে মারা পড়েনি। তারা একে অপরের পিঠের ওপর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে ভাগতে থাকে। প্রতিটি পথে পথে আর প্রতিটি ঘাটে ঘাটে তাদের লাশ পড়তে থাকে। আর আবরাহাকে আল্লাহ তাআলা এমন এক ব্যাধিতে আক্রান্ত করলেন যার কারণে তার আঙ্গুলগুলি পড়ে যেতে লাগল। সে যখন সানায় গিয়ে পৌছল তখন তার অবস্থা সদ্যজাত পাখির বাচ্চার মতো হয়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে তার বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে পড়ল এবং সে মারা গেল।

কুরাইশরা এ সময় বিভিন্ন পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আবরাহা বাহিনীর দুষ্কর্মে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে নিরাপদ ঠিকানা খুঁজছিল। যখন আল্লাহ তাআলা হস্তীবাহিনীকে তার প্রাপ্য শাস্তি দান করলেন, তখন তারা নিরাপদে বাড়িতে ফিরে এলো। [৯২]

এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পঞ্চাশ কিংবা পঞ্চান্ন দিন আগের মুহাররম মাসের ঘটনা। অধিকাংশের মতে শেষোক্ত মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। ঈসায়ী তারিখ ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর শেষ কিংবা মার্চ মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। এটা ছিল মূলত আল্লাহর নবী ও তাঁর ঘরের বিশেষত্ব ছড়িয়ে পড়ার দিনের সূচনা। কেননা, আমরা যদি বাইতুল মুকাদ্দাসের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে আমরা দেখতে পাব আল্লাহর দুশমনরা সর্বমোট দুইবার এই কেবলার ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করেছিল অথচ, তখন এর বাসিন্দারা ছিল মুসলমান। এর মধ্যে বুখতেনাসারের ঘটনা ছিল ৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে। আর রোমানদের ঘটনা ঘটেছিল ৭০ খ্রিস্টাব্দে। অথচ, হাবশার খ্রিস্টানরা কাবার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারেনি। যদিও তখন তারা ছিল মুসলমান আর কাবার অধিবাসীরা ছিল মুশরিক।

আর এ সকল ঘটনা ঘটেছিল এমন কতগুলো স্থানে যেগুলো থেকে তৎকালীন পৃথিবীর গোটা সভ্য দুনিয়ার সিংহভাগ ভূখণ্ডে এর সংবাদ পৌছে যাওয়া সহজ ছিল। যেমন হাবশার সঙ্গে রোমের ছিল শক্তিশালী সম্পর্ক। আর পারস্যরা যুগের পর যুগ তাদেরকে গেলার জন্য হা করে বসে ছিল। রাত-দিন এ আশায় বসেছিল যে, রোমান ও তার মিত্রদের ওপর আকাশ থেকে নেমে আসুক কোনো আপদ! এ কারণে এ ঘটনার পরে পারস্যরা দৌড়ে এলো ইয়েমেনে। মনে রাখতে হবে এই দুই রাজ্যই ছিল তৎকালীন সভ্য দুনিয়ার দুই মোড়ল। এভাবে এ ঘটনাটি গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো এবং তাদেরকে বাইতুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়ে দিলো। এটা গোটা পৃথিবীকে জানিয়ে দিলো যে, এই সে ঘর, আল্লাহ পাক যাকে সম্মান ও পবিত্রতার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং, এ অবস্থায়

---

[৯২] ইবনে হিশাম ১/৪৩-৫৬। আর তাফসীরের গ্রন্থসমূহে সূরা ফীলের তাফসীর।

এখানকার কেউ যদি নবুওতের দাবি করেন তবে সেটা তো হুবহু এ সকল ঘটনার চাহিদার পরিপূরক হবে। আর এটা হবে ঐ হিকমতে এলাহিয়ার প্রকাশ্য তাফসীর, যা প্রচ্ছন্ন ছিল ইয়েমেনবাসীদের বিপক্ষে মক্কার মুশরিকদের আল্লাহ কর্তৃক নসুরতের মধ্যে। আর এ নসুরত ছিল এমন এক তরীকায়, বস্তুবাদী দুনিয়া যার সামনে অচল, নিতান্তই অসহায়।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল দশ জন ছেলে। তারা হলো হারিস, যুবায়ের, আবু তালিব, আব্দুল্লাহ, হামযা, আবু লাহাব, গায়দাক, মুকাওইম, যিরার ও আব্বাস। আবার কারও কারও মতে, আব্দুল মুত্তালিবের ছেলের সংখ্যা এগারো জন। এ হিসেবে তার নাম হলো কুষাম। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তারা ছিল তেরো জন। এ হিসেবে বাকি দুজনের নাম হলো আব্দুল কা'বা ও হাজল। কেউ কেউ বলেন মুকাওয়িমেরই আরেক নাম ছিল আব্দুল কা'বা। আর গায়দাকের আরেক নাম ছিল হাজল এবং তার কুষাম নামে কোনো ছেলে ছিল না।

আব্দুল মুত্তালিবের মেয়ে ছিল সর্বমোট ছয় জন। তারা হলেনঃ উম্মে হাকীম- তিনি ছিলেন বায়জা নামে পরিচিত-, বাররা, আতেকা, সাফিয়্যা, আরওয়া এবং উমাইমা।[৯৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহ

আব্দুল্লাহ ছিলেন ফাতেমা বিনতে আমর বিন আয়েয বিন ইমরান বিন মাখযূম বিন ইয়াকাযা বিন মুররাহর সন্তান। তিনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে খুবসুরত, সর্বাপেক্ষা পবিত্র, তার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। আর তিনি ছিলেন যবীহ। এর পেছনে যে ইতিহাস ছিল তা হলোঃ আব্দুল মুত্তালিবের যখন দশ জন সন্তান পূর্ণ হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে তারা সবাই তখন তাকে হেফাযতের যোগ্য হয়েছে তখন তাদেরকে তিনি তার মান্নত সম্পর্কে অবগত করলেন। তারা আব্দুল মুত্তালিবের মান্নতের কথা শুনে বিনাবাক্যে আনুগত্য ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। বলা হয়ে থাকে, এরপর তিনি তার সন্তানদের মধ্যে কাকে যবাই করবেন তা নির্ধারণের জন্য লটারি করলেন। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ছিলেন তার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাই তিনি বললেন : হে আল্লাহ! সে, না কি একশ' উট? এরপর তার ও একশ' উটের মাঝে লটারি দেওয়া হলো। লটারিতে একশ' উটের নাম উঠল।[৯৪]

কারও কারও মতে, তিনি ভাগ্য নির্ধারণের তীরে তাদের সকলের নাম লিখলেন। এরপরে সেগুলো হুবলের তত্ত্বাবধায়কের কাছে অর্পণ করলেন। তিনি

---

[৯৩] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১০৮, ১০৯। তালকীহে ফুহুমুল আহলিল আসারি পৃষ্ঠাঃ৮, ৯।
[৯৪] তারীখে তাবারী ২/২৩৯।

সেগুলো ঘুরিয়ে তার মধ্যে একটি তীর উঠালেন। তাতে লেখা ছিল আব্দুল্লাহর নাম। এরপর আব্দুল মুত্তালিব যবাই করার জন্য তাকে ও একটি ধারালো ছুরি নিয়ে ছুটে চললেন কাবার দিকে। কিন্তু কুরাইশরা তাকে বারণ করল। বিশেষ করে বনু মাখযুমের তার মামার গোষ্ঠী ও তার ভাই আবু তালিব তার পথ আগলে দাঁড়াল। আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে বললেন, কিন্তু আমার এখন কী করার আছে? তারা তাকে বলল কোনো গণকের কাছে গিয়ে এর সমাধান জিজ্ঞাসা করুন। তিনি তাই করলেন। গণক তাকে বলল এক পাশে আব্দুল্লাহ আরেক পাশে দশটি উট দিয়ে প্রথমে লটারি করবেন। লটারিতে যদি আব্দুল্লাহর নাম ওঠে তবে দশটি উট বাড়িয়ে দিয়ে আবার লটারি করবেন। এভাবে চলতে থাকবে এবং যখন লটারিতে উটের নাম আসবে তখন উট যবাই করে ফেলবেন। আব্দুল মুত্তালিব ফিরে এলেন। ফিরে এসে তার কথা মতো দশটি উট ও আব্দুল্লাহর মাঝে লটারি দেওয়া হলো। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠল। এভাবে একের পর এক লটারি দেওয়া হতে থাকে আর প্রত্যেকবার লটারিতে আব্দুল্লাহর নামই উঠতে থাকে। অবশেষে যখন একশ উট পূর্ণ হলো তখন লটারিতে উটের নাম উঠল। সুতরাং একশ উট যবাই করা হলো। মানুষ, পশুপাখির জন্য সেগুলোর গোশত উন্মুক্ত রেখে দেওয়া হলো। ইতঃপূর্বে কুরাইশে ও আরবে প্রচলিত দিয়ত তথা রক্তপণের পরিমাণ ছিল দশটি উট। এখন থেকে তা বাড়িয়ে একশ'র পর্যায়ে উন্নীত করা হলো। ইসলামও এসে এটাকে স্বীকৃতি দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **আমি দুই যবীহের সন্তান** তথা ইসমাঈল আ. ও তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ।[৯৫]

আব্দুল মুত্তালিব ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য ওহাব বিন আবদে মানাফ বিন যুহরা বিন কিলাবের মেয়ে আমিনাকে পুত্রবধূ রূপে মনোনীত করলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন কুরাইশদের মধ্যে বংশ ও মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। আর তাঁর পিতা ছিলেন বংশ ও শারাফতের দিক দিয়ে বনু যুহরার সরদার। সুতরাং, তিনি আব্দুল্লাহকে তার সঙ্গে বিবাহ করালেন। মক্কাতেই ঘর বেঁধে এই নতুন দম্পতির এক নব জীবনের অভিষেক হলো। কিছুদিন পরে আব্দুল মুত্তালিব তাকে খেজুর আনার জন্য মদীনায় পাঠালেন। ভাগ্যের লেখন অনুসারে তিনি সেখানেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন সফরের ইতি টানলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। এরপর একটি কুরাইশী কাফেলার সঙ্গে করে সিরিয়া থেকে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। কাফেলা যখন মদীনায় অবতরণ করল তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে অসুস্থতা বেড়ে চলে এবং কয়েকদিন পরে এখানেই জীবন খেলাঘরের ছোট্ট মঞ্চটির ওপর সমাপ্তির পর্দা টেনে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। মদীনার নাবেগা জু'দীর মাটিতে তাকে

[৯৫] ইবনে হিশাম ১/১৫১-১৫৫। তারীখে তাবারী ২/২৪৬। রওযুল আনফু ১/১৮৪।

সমাহিত করা হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তাঁর এই মৃত্যু ছিল নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্মের আগের ঘটনা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মত এটাই। আবার কারও কারও মতে আব্দুল্লাহ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের দুই মাস কিংবা আরও অধিক সময় পরে ইন্তেকাল করেন। যখন তাঁর ইন্তেকালের এই সংবাদ মক্কায় গিয়ে পৌছল আমিনা শোকে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন।

বিরহ-বেদনার চাপা কান্না তাঁর কণ্ঠ হতে ভেসে এলো মর্সিয়ারূপে ঠিক এভাবে:

عَفَا جَانِبُ الْبَطْحَاءِ مِنِ ابْنِ هَاشِمٍ ... وَجَاوَرَ لَحْدًا خَارِجًا فِي الْغَمَاغِمِ

دَعَتْهُ الْمَنَايَا دَعْوَةً فَأَجَابَهَا ... وَمَا تَرَكَتْ فِي النَّاسِ مِثْلَ ابْنِ هَاشِمِ

عَشِيَّةَ رَاحُوا يَحْمِلُونَ سَرِيرَهُ ... تَعَاوَرَهُ أَصْحَابُهُ فِي التَّزَاحُمِ

فَإِنْ يَكُ غَالَتْهُ الْمَنَايَا وَرَيْبُهَا ... فَقَدْ كَانَ مِعْطَاءً كَثِيرَ التَّرَاحُمِ

[৯৬]'বাতহার কোল হাশিমের ছেলে থেকে বড় শূন্য হয়ে গেল।

শত শোরগোল আর হৈ-চৈ এর মধ্যে তিনি একটি গোরে শান্তির বিছানায় ঘুমিয়ে গেলেন।

মৃত্যু তাকে একটি ডাক দিয়েছে; আর তিনি সঙ্গেই সঙ্গেই সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন! অথচ, এই মৃত্যু মানুষের মাঝে ইবনে হিশামের মতো আর কাউকে রেখে যায়নি!!

(কত আফসোসের সন্ধ্যা ছিল সেটি!) যখন তাঁর স্বজনরা একের পর এক তাঁর খাট বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল।

যদিও মৃত্যু তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে (কিন্তু তাঁর কীর্তি বিলুপ্ত করতে পারবে না) তিনি বড় দানবীর ও দয়াপরবশ ছিলেন'।

ইন্তেকালের সময় আব্দুল্লাহ যে সহায়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন সর্বসাকুল্যে তা ছিল পাঁচটি উট, বকরির একটি পাল, একটি হাবশী দাসী; তার নাম ছিল বারাকা আর কুনিয়ত ছিল উম্মে আয়মন। তিনি ছিলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেমা। জন্মের পর তার কোলেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন।[৯৭]

[৯৬] তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ১/১০০।
[৯৭] সহীহ মুসলিম ৩/১৩৯২। হাদীস নং ১৭৭১।

জন্ম ও নবুওত-পূর্ব চল্লিশ বছর

জন্ম

সাইয়েদুল মুরসালীন নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বনু হাশিম গোত্রে হস্তীবাহিনীর ঘটনার প্রথম বছর রবীউল আউয়াল মাসের নয় তারিখ সোমবার ভোরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৯৮] এটা ছিল পারস্য সম্রাট কিসরা নওশেরওয়াঁর সিংহাসনে অভিষেকের চল্লিশতম বছর। ঈসায়ী তারিখ ছিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের বিশ কিংবা বাইশে এপ্রিল। এটা বিশিষ্ট আলেমে দীন ও মুহাক্কিক মুহাম্মাদ সুলাইমান মানসূরপুরী র. এর গবেষণালব্ধ ফসল। [৯৯]

ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত মাতা বলেন, আমি যখন তাকে প্রসব করি তখন আমার পেটের ভেতর থেকে এমন একটি আলোর ছটার বিচ্ছুরণ হয় যার দ্বারা সিরিয়ার বড় বড় প্রাসাদগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আহমদ ও দারেমী থেকেও এর কাছাকাছি বর্ণনা পাওয়া যায়।[১০০]

বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শুভ জন্মের সময় আরও অনেক আশ্চর্য ও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল যেগুলোকে তাঁর নবুওত ও রিসালতের চিরন্তন সাক্ষী বলা যেতে পারে। পারস্য সম্রাট কিসরার প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ভেঙে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। মাজূসীরা হাজার হাজার বছর ধরে যে আগুনের পূজা করত তা নিভে গিয়েছিল। সাওয়া হ্রদ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং তার আশপাশের গির্জাগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এগুলো তাবারী ও বাইহাকীর বর্ণনা।[১০১] কিন্তু এগুলোর কোনো বর্ণনাসূত্র নেই। সে সকল জাতির ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজেও এর কোনো অস্তিত্ব বের করা যায়নি। অথচ, এ সকল ঘটনা সে সকল জাতির ইতিহাসের সর্বাগ্রে স্থান পাওয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখন আমিনা তাঁর দাদার কাছে পৌত্রের শুভ জন্মের সংবাদ পাঠালেন। আব্দুল মুত্তালিব যার পর

---

[৯৮] দেখুন মাহমূদ পাশা ফালাকী প্রণীত নাতাইজুল আফহাম ফী তাকওয়ীমিল আরবি ক্বলাল ইসলাম পৃষ্ঠা ২৮-৩৫। বৈরূত।

[৯৯] পুরনো খ্রিস্ট ক্যালেন্ডার অনুসারে ২০ শে এপ্রিল আর নতুন গননা অনুযায়ী ২২ শে এপ্রিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৩৮, ৩৯; ২/৩৬০, ৩৬১।

[১০০] মুসনাদে আহমদ ৪/১২৭, ১২৮, ১৮৫। ৫/২৬২। সুনানে দারেমী ১/৯। ইবনে সা'দ ১/১০২।

[১০১] দেখুন ইমাম বাইহাক্বী র. এর দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ১/১২৬, ১২৭। তারীখে তাবারী ২/১৬৬, ১৬৭। আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ২/২৬৮, ২৬৯।

নেই খুশি হয়ে ছুটে এলেন এবং আদরের পৌত্রকে নিয়ে কাবায় দাখিল হলেন। আল্লাহকে ডাকলেন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।[১০২] আর পৌত্রের নাম রাখলেন মুহাম্মাদ। ইতঃপূর্বে আরবে কোনো দিন কারও নাম মুহাম্মাদ রাখা হয়েছিল না। এরপরে আরবের প্রথা অনুযায়ী জন্মের সপ্তম দিনে তাকে খতনা করানো হয়।[১০৩]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজ মায়ের দুধ পান করলেন।[১০৪] এরপর সর্বপ্রথম তাকে আবু লাহাবের বাদী সুওয়াইবা দুধ পান করান। এ সময় সুওয়াইবার কোলেও বাচ্চা ছিল। আর তার নাম ছিল মাসরূহ। সুওয়াইবা এর আগে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবকে দুধ পান করিয়েছিলেন। এরপর করিয়েছিলেন আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমীকে।[১০৫]

বনু সাদে

তৎকালীন সময় নগরবাসী আরবদের নিয়ম ছিল, কোনো বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর গ্রামীণ এলাকার ধাত্রী খুঁজে বাচ্চাকে তার হাতে সমর্পণ করত। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে বাচ্চার প্রবৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন সুন্দর হয়, তার শরীর শক্ত ও মজবুত হয়। তার কোষ ও গঠন সুসংহত হয় এবং ছোটবেলাতেই যেন বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখা হয়ে যায়। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যও আব্দুল মুত্তালিব ধাত্রীর খোঁজ নিলেন। বনু সাদ বিন বকর কবীলার হালীমা বিনতে আবু যুয়াইব আব্দুল্লাহ বিন হারেস নামের এক ধাত্রী মহিলা ও একই কবীলার তার স্বামী হারিস বিন আব্দুল উয্যা-তার কুনিয়ত ছিল আবু কাবশা-রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দুধ পান করানো ও লালন পালনের যিম্মাদারি গ্রহণ করেন।

এই পরিবারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই বোন ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন হারিস, আনীসা বিনতে হারিস এবং হুযাফা বা জুযামা বিনতে হারিস-তিনি শীমা নামে অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ছোট বেলায় কোলে নিয়ে ঘুরতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান

---

[১০২] ইবনে হিশাম ১/১৫৯, ১৬০। তারীখে তাবারী ২/২/১৫৬, ১৫৭। ইবনে সা'দ ১/১০৩।

[১০৩] কারও কারও মতে, তিনি খতনাকৃত অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন- তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. বলেন, এ মতের সমর্থনে নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীস নেই। দেখুন যাদুল মাআদ ১/১৮।

[১০৪] ইত্তেহাফুল ওয়ালা ১/৫৭।

[১০৫] সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৬৪৫, ৫১০০, ৫১০১, ৫১০৬, ৫১০৭, ৫৩৭২। তারীখে তাবারী ২/১৫৮। তবে তাঁর সনদ প্রশ্নসাপেক্ষ। আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ১/১৫৭।

বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবও রা. হযরত হালীমা রা. এর সূত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই ছিলেন। তা ছাড়া নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবও রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধভাই ছিলেন। কারণ হামযা রা. কেও ছোট বেলায় বনু সাদ বিন বকরের এক মহিলার কাছে দুধ পান করতে দেওয়া হয়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতা হালীমার কাছে থাকাকালে একদিন সেই মহিলা তাকে দুধ পান করান। এভাবে হামযা রা. দুই দিক দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধভাই ছিলেন। প্রথমত সুওয়াইবার দিক দিয়ে আর দ্বিতীয়ত বনু সাদের সেই মহিলার দিক দিয়ে। [১০৬]

এ সময় হযরত হালীমা সা'দিয়া রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন এমন বরকত প্রকাশিত হতে দেখলেন যা দেখে তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠেই শুনুন এর বিস্তারিত বিবরণ:

ইবনে ইসহাক বলেন, হালীমা রা. বর্ণনা করেন, 'সে বার তিনি তার স্বামী ও কোলের দুধের বাচ্চাকে নিয়ে বনু সাদ বিন বকরের মহিলার সঙ্গে দুগ্ধপায়ী শিশুর খোঁজে বেরিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এটা ছিল চরম দুর্ভিক্ষের বছর। আমাদের তখন কিছুই ছিল না। তিনি বলেন, আমি একটি সাদা গাধীর ওপর সওয়ার ছিলাম। আমাদের কাছে একটি উষ্ট্রীও ছিল। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তাতে এক ফোঁটা দুধও ছিল না। আমার বাচ্চা রাতভর ক্ষুধায় চিৎকার করত যার কারণে আমরা রাতে ঘুমাতে পারতাম না। না আমার স্তনে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ ছিল, আর না আমাদের উষ্ট্রীতে তার পেট ভরার মতো কিছু ছিল । কিন্তু আমরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেইনি। আমরা এই কঠিন দুর্ভিক্ষের মধ্যেও বৃষ্টির আশা করতাম। বিপদের এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও মুক্তির আলোর স্বপ্ন দেখতাম। এ সব কিছু ভেবে চিন্তে আমি আমার গাধীর ওপর সওয়ার হয়েছিলাম। কিন্ত সেটা দুর্বলতা আর জীর্ণতার কারণে এতটা ধীরগতিসম্পন্ন ছিল যে, অন্য সকলের জন্য আমরা বড় মুসিবত হয়ে দেখা দিলাম। এভাবে আমরা যে কোনো ভাবে দুগ্ধপায়ী শিশুর তালাশে মক্কায় পৌছে গেলাম। আমাদের যে মহিলার কাছেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অর্পণ করা হয়েছিল সে-ই তাকে নিতে অস্বীকার করল। কেননা, আমরা সকলেই শিশুর পিতা থেকে ভালো কিছু পাওয়ার প্রত্যাশী ছিলাম। সে কারণে আমরা ভেবেছিলাম তার মা আর দাদা কী-ই বা দিবে! এ কারণে কেউ-ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গ্রহণ করল না। অপরদিকে আমি ছাড়া

[১০৬] যাদুল মাআদ ১/১৯।

কাকতালীয়ভাবে আমার সঙ্গে যে সকল মহিলা এসেছিল তারা সকলেই একটি করে শিশু নিয়ে নিয়েছিল। বাকি ছিলাম কেবল আমিই। পরিশেষে যখন আমরা ফিরে যাওয়ার সংকল্প করলাম, তখন আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ! এভাবে খালি হাতে আমার সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যেতে আমি একটুও পছন্দ করি না। নিদেনপক্ষে চলো আমরা গিয়ে সেই ইয়াতীম শিশুটিকে নিয়ে আসি। আমার স্বামী বলল, কোনো ক্ষতি নেই! যাও তুমি বাচ্চাটিকে নিয়ে এসো। হতে পারে আল্লাহ তার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক বরকত রেখে দিয়েছেন। হযরত হালীমা রা. বলেন, এরপরে আমি গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম। যখন আমি তাকে আমার কোলে রাখলাম তখন আমার স্তন দুধে ভরে গেল। সে পরম তৃপ্তিভরে আমার দুধ পান করল। তার সঙ্গে তার দুধভাইও তৃপ্তির সঙ্গে পান করল। এরপর তারা উভয় পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ, ইতঃপূর্বে আমরা তাকে নিয়ে ঘুমাতে পারিনি। ইতিমধ্যে আমার স্বামী উষ্ট্রির কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার ওলান দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সুতরাং, তা থেকে তিনি ও আমি আমরা উভয়ই তৃপ্তি সহকারে পান করলাম। আমাদের পেট ভরে গেল। আমরাও সে রাতে মনভরে শান্তিতে ঘুমিয়ে নিলাম। হযরত হালীমা রা. বলেন, সকালে আমার স্বামী আমাকে বললেন, হালীমা! আল্লাহর শপথ! তু৷ একটি বরকতময় বাচ্চা নিয়ে এসেছো! আমি তাকে বললাম, আমারও মনের ধারণা তাই। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা বের হলাম। আমি তাকে নিয়ে আমার দুর্বল গাধীটির ওপর সওয়ার হলাম। আল্লাহর কসম! সে এতো জোরে জোরে পদ সঞ্চালন করতে লাগল যে, আমার সঙ্গীদের লাল উটও এতো জোরে চলতে পারছিল না। এক পর্যায়ে আমার সঙ্গীরা আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, হে আবূ যুওয়াইবের মেয়ে ব্যাপার কী! আমাদের ওপর একটু রহম করো! এটা কি তোমার সেই গাধীটি নয়? যার ওপর সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে। আমি তাদেরকে বললাম, হা আল্লাহর শপথ! এটাই সেই গাধী! তারা বলল, নিশ্চয়ই এটার কোনো বিশেষত্ব রয়েছে।

তিনি বলেন, এরপরে আমরা বনু সাদে আমাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গোটা পৃথিবীতে তখন আমাদের জমিনের চেয়ে ঊষর কোনো জমিন আমার জানা ছিল না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন আমাদের বকরিগুলো বাড়িতে ফিরে আসত তখন আমরা সেগুলোর পেট দেখতাম ভরে আছে। সেগুলোর ওলানও দুধে ভরে আছে। এরপর আমরা সেগুলো থেকে দুধ দোহন করে পান করতাম। অথচ আমাদের আশপাশের অন্য কোনো মানুষের কপালে এক ফোঁটা দুধও জুটত না। এ কারণে আমার কওমের প্রতিবেশীরা তাদের রাখালদেরকে বলে দিয়েছিল তোমাদের সর্বনাশ হোক! আবু যুওয়াইবের মেয়ে হালীমার রাখাল যেখানে তার বকরি নিয়ে বিচরণ করে তোমরা সেখানে বিচরণ করতে পারো না?

কিন্তু তাদের এত সব তদবীরের পরেও সন্ধ্যাবেলা তাদের বকরিগুলি খালি পেটে ও শূন্য ওলানে বাড়ি ফিরে যেত আর আমার বকরিগুলি ফিরে আসত ভরা পেটে ও পূর্ণ ওলানে। এভাবে আমরা দিনের পর দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত আর রহমতের প্রবৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করে আসতে লাগলাম। ইতোমধ্যে শিশু মুহাম্মাদের বয়স দুই বছর পূর্ণ হলো। আমি তাকে দুধ ছাড়ালাম। তার শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন এতটা প্রগতিশীল ছিল যে অন্য কারও বেলায় তা চোখে পড়ে না। দুই বছর পূর্ণ হতে না হতেই সে একটি হৃষ্টপুষ্ট বালকে পরিণত হলো।

হযরত হালীমা রা. বলেন, এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী আমরা তাকে নিয়ে তার মায়ের কাছে মক্কায় এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমরা তার বরকত দেখে মনের মণিকোঠায় সে আমাদের কাছে আরও কিছুদিন থাক এই প্রত্যাশা লালন করছিলাম। এ কারণে আমরা তার মায়ের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে আমরা আরও বললাম, আপনি আপনার ছেলেকে বড় হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের কাছে রেখে দিন। কারণ, আমি তার ব্যাপারে মক্কার মহামারীর ভয় করছি। তিনি বলেন, এভাবে আমরা তাকে তার মায়ের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়েই তবে ঘরের পথে পা বাড়ালাম। [১০৭]

বক্ষ বিদারণ

এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু সাদে ফিরে এলেন। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য অনুযায়ী এর কয়েক মাস পরেই তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনা ঘটেছিল।[১০৮] কিন্তু বিশিষ্ট মুহাক্কিকদের সর্বসম্মতিক্রম মত অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটেছিল, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের চতুর্থ বছরে।[১০৯] ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা করছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর কাছে এলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ধরে শুইয়ে দিলেন। এরপর জিবরাঈল আ. তাঁর মুবারক বক্ষ বিদীর্ণ করে সেখান থেকে তাঁর কলব বের করলেন। তা থেকে একটা রক্তপিণ্ডও বের করলেন। অতঃপর বললেন, এটা আপনার শরীরে

---

[১০৭] ইবনে হিশাম ১/১৬২-১৬৪। তারীখে তাবারী ২/১৫৮, ১৫৯। ইবনে হিব্বান প্রণীত আল ইহসান ৮/৮২-৮৪। ইবনে সা'দ ১/১১১। তবে তাদের সবাই সামান্য কিছু শব্দের ব্যতিক্রম সহকারে ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

[১০৮] সীরাতে ইবনে হিশাম ১/১৬৪, ১৬৫। তারীখে তাবারী ৬/১৬০।

[১০৯] দেখুন ইবনে সা'দ ১/১১২। মাসউদীর মুরুজুয যাহাব ২/২৮১। আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ১/১৬১, ১৬২। আব্বাস রা. সূত্রে তিনি এটাকে জন্মের পঞ্চম বছরের ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ১/১৬২। ইবনে ইসহাকের বক্তব্য কিঞ্চিৎ সাংঘর্ষিক মনে হয়। কারণ মাত্র দু'বছর শেষে তৃতীয় বছরের অভিষেকে থাকা একটা শিশু বাচ্চার পক্ষে বকরী চরানো অসম্ভবই বটে।

শয়তানের অংশ। এরপর একটি স্বর্ণের পাত্রে যমযমের পানি দিয়ে কলবটিকে তিনি ধুয়ে নিলেন। অতঃপর সেটাকে তার জায়গায় রেখে আবার আগের মতো শরীর মিলিয়ে দিলেন এবং তাকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এদিকে তাঁর খেলার সাথী বালকগুলি দৌড়ে তাঁর দুধ মা হালীমার কাছে এসে বলল মুহাম্মাদকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে। এরপরে তারা সবাই তাকে দেখতে পেল। ততক্ষণে তার চেহারার রঙ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বুকে সেই সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।[১১০]

মমতাময়ী মায়ের কোলে

এ ঘটনার পরে হালীমা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার মমতাময়ী মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন। এরপরে তিনি ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর মায়ের কাছেই লালিত পালিত হন।

একদিন হঠাৎ আমিনার রা. মনে অপার্থিব মুসাফির স্বামীর স্মৃতি ঝড় হয়ে আঘাত হানে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন ইয়াসরিবে তাঁর কবর যিয়ারতের জন্য যাবেন। সুতরাং ইয়াতীম শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খাদেমা উম্মে আয়মন আর তার অভিভাবক আব্দুল মুত্তালিবকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার সুদূরে মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হন। সেখানে এক মাস অবস্থান করে আবার মক্কায় ফেরার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমশ অসুস্থতার মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। এভাবে একদিন মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি আবওয়া নামক স্থানে মৃত্যুসুধা পান করেন।[১১১]

মেহেরবান পিতামহের কাছে

মায়ের ইন্তেকালের পরে আব্দুল মুত্তালিব তাকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে পুত্র-বিয়োগ-বিরহ-বেদনা বিশাল তরঙ্গের আকার ধারণ করে আছড়ে পড়ছিল তার হৃদয় নদের দুই কূলে। এতে করে ইয়াতীম পৌত্রের প্রতি তার স্নেহ আর দরদ জোয়ারের পানির মতো বাড়তে থাকে। সে পৌত্র এখন নতুন করে এমন এক আঘাত পেয়েছে যা অতীত আঘাতের শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতে আবার দগদগে ঘা সৃষ্টি করে। এভাবে ধীরে ধীরে দাদা আব্দুল মুত্তালিব পৌত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এতটা মেহেরবান ও দুর্বল হয়ে পড়েন যা নিজের কোনো সন্তানের প্রতিও হননি। সুতরাং, ভাগ্যের লেখন তাকে বিজন মরুর যেই অজানা প্রান্তে একাকী ফেলে দিয়েছিল তিনি তাকে সেখানে একাকী

---

[১১০] সহীহ মুসলিম: কিতাবুল ঈমান। ইসরা অধ্যায় ১/১৪৭। হাদীস নং ২৬১।

[১১১] দেখুন ইবনে হিশাম ১/১৬৮। তালকীহুল ফুহূম পৃষ্ঠা ৭।

ছেড়ে দেননি। সেখানে তিনি তার সঙ্গ দিলেন। এমনকি নিজ সন্তানদের ওপরও তাকে সবকিছুতে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, কাবার ছায়ায় আব্দুল মুত্তালিবের জন্য একটি আসন পাতা হতো। সেখানে তার ছেলেরা সেই আসনের চারপাশে বসে থাকত। তার সম্মানে কেউ-ই সে আসনে বসত না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এসে বসে পড়তেন। যখন তার চাচারা তাকে পেছনে নিয়ে আসতে চাইতেন আব্দুল মুত্তালিব তাদেরকে বলতেন, আমার পৌত্রকে ছেড়ে দাও! আল্লাহর কসম! তার ভেতরে আমি এক আশ্চর্য বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। এরপরে তাকে নিজের সঙ্গে সেই আসনে বসাতেন। তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন। তিনি যা করতেন তা দেখে আব্দুল মুত্তালিব পরম আনন্দবোধ করতেন।[১১২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন আট বছর দুই মাস দশদিন হলো তখন তাঁর মেহেরবান পিতামহ আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার পৌত্রের লালন পালনের যিম্মাদারি অর্পণ করে যান তার পিতা আব্দুল্লাহর সহোদর ভাই ও তার প্রতি যথেষ্ট স্নেহময় চাচা আবু তালিবের হাতে।[১১৩]

স্নেহময় চাচার কাছে

আবু তালিব স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। তাকে নিজের সন্তানদের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। বরং তাদের চেয়েও অগ্রাধিকার দিলেন। তাকে বিশেষ ইয্যত-সম্মান আর স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। এভাবে জীবনের প্রায় চল্লিশটি বছরেরও অধিক সময় তাঁর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রইলেন। তাঁর জীবন ও সবকিছুর ওপর সুরক্ষার চাদর টেনে রাখলেন সবসময়। তাঁর কারণে মানুষের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ আর মামলা মুকাদ্দমায় লিপ্ত হলেন। তাঁর যে সময় যা কিছু প্রয়োজন হলো সবকিছু মিটিয়ে গেলেন। আমরা এর প্রত্যেকটি যথাযথ স্থানে বর্ণনা করব ইনশা আল্লাহ।

তাঁর চেহারার ওসিলা দিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনা

ইবনে আসাকির জালহুমা বিন উরফুতা সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার মক্কায় এলাম। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ড দাহে তখন গোটা মক্কা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তখন কুরাইশরা আবু তালিবের কাছে এসে বলল আবু তালিব! সমস্ত উপত্যকা দুর্ভিক্ষের দাহে শেষ হয়ে গেছে। জমি জমা সবকিছু উষর

---

[১১২] ইবনে হিশাম ১/১৬৮।

[১১৩] ইবনে হিশাম ১/১৬৯। তালকীহুল ফুহূম পৃষ্ঠা ৭।

হয়ে পড়েছে। দয়া করে কাবায় যাও! আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করো!! আবু তালিব বালক মুহাম্মাদকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। তিনি ছিলেন তখন ছায়াঢাকা দিনমণি। থেকে থেকে তা থেকে বারিবাহী মেঘের বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। তাঁর চারপাশে আরও অনেক শিশু ছোটাছুটি করছিল। আবু তালিব তাকে ধরে তাঁর পিঠকে কাবার দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। শিশু মুহাম্মাদ তখন তাঁর আঙ্গুল ধরে রেখেছিলেন। ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা আকাশে তিল পরিমাণ মেঘও ছিল না। কিন্তু দেখতে না দেখতেই চতুর্দিক থেকে মেঘ এসে ভরে গেল। শুরু হলো তুমুল বৃষ্টিপাত। মক্কার পাহাড়ী উপত্যকাগুলোতে ঢল নামল। শহর ও গ্রামীণ পরিবেশ বৃষ্টির স্নিগ্ধ পরশে এসে সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। এ দিকে ইঙ্গিত করেই পরবর্তী সময়ে আবু তালিব একদিন বলেছিলেন:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ..... ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ[114]

'তিনি খুবসুরত পুরুষ; তাঁর চেহারা দ্বারা বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়; ইয়াতীমদের আশ্রয়স্থল ও বিধবাদের মুহাফিয'।

পাদ্রি বাহীরা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন বারো বছর-কারও কারও মতে বারো বছর দুই মাস দশদিন-[১১৫] পূর্ণ হলো তখন আবু তালিব তাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলেন। চলতে চলতে এক সময় গিয়ে বসরায় উপনীত হলেন। বসরা হলো সিরিয়ার একটি স্থান এবং হুরানের প্রধান নগরী ও রাজধানী শহর। সে সময়ে এ শহর রোমানদের অধীনে থাকা আরবীয় অঞ্চলগুলোর প্রাণকেন্দ্র ও মারকায ছিল। সেই শহরে সে সময়ে জারজীস নামে একজন পাদ্রি বাস করতেন। তিনি মানুষের নিকট বাহীরা নামে পরিচিত ছিলেন। যখন আবু তালিবের কাফেলা এসে সেখানে অবতরণ করল তখন পাদ্রি বাহীরা আবু তালিবের কাছে ছুটে এলেন। অথচ ইতঃপূর্বে তিনি কখনোই এমনভাবে মানুষের নিকট বের হতেন না। তিনি যেতে যেতে সকলের মধ্যখানে চলে গেলেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত মুবারক ধরে বললেন তিনি হলেন গোটা বিশ্ব জগতের সরদার। তিনি হলেন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার রাসূল। তাকে আল্লাহ পাক গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তখন তাকে আবূ তালিব ও কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বললেন আপনি এগুলি কীভাবে জানতে পেরেছেন? উত্তরে

[১১৪] শাইখ আব্দুল্লাহ প্রণীত 'মুখতাসারুস সীরাহ' পৃষ্ঠা ১৫, ১৬। তাবরানী সূত্রে হাইসামী মাজমাউস যাওয়ায়েদে 'আলামাতুল নবুওয়াতি' পর্বে এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন ৮/২২২।

[১১৫] তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারি গ্রন্থে ইবনুল জাওযী র. উল্লিখিত মতামত পোষণ করেছেন। পৃষ্ঠা ৭।

তিনি বললেন : যখন আপনারা আক্বাবার কাছাকাছি চলে এসেছিলেন তখন সেখানে এমন কোনো বৃক্ষ-লতা কিংবা পাথর ইত্যাদি ছিল না যেগুলি মাথা নত করে সালাম ঠুকেনি। আর আমি জানি গাছ আর পাথর নবী ছাড়া আর কাউকে সিজদা করে না। আর আমি তাকে চিনতে পেরেছি, তাঁর কাঁধের মধ্যখানে আপেলের মতো মোহরে নবুওত দেখে। তা ছাড়া আমাদের কিতাবের মধ্যেও আমরা তার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর তিনি তাদের মেহমানদারি করালেন এবং আবু তালিবকে বললেন মুহাম্মাদকে সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে মক্কায় পাঠিয়ে দিতে। হতে পারে সেখানকার রোমান ও খ্রিস্টানরা তাকে হত্যা কিংবা কোনো ক্ষতি করে ফেলবে। সুতরাং, আবু তালিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কয়েকজন কিশোরের সঙ্গে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।[১১৬]

ফিজার যুদ্ধ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন বিশ বছর তখন উকায মেলায় কুরাইশ -তাদের সঙ্গে ছিল কেনানা- ও কায়স আয়লানের মাঝে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। ইতিহাসে এটা ফিজার যুদ্ধ নামে পরিচিত।[১১৭] যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, বনু কেনানার বাররাজ নামের এক ব্যক্তি কায়স আয়লানের তিন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। যখন উকায মেলায় এ সংবাদ পৌঁছল উভয় পক্ষ প্রচণ্ড যুদ্ধের সীমাহীন উত্তেজনায় মেতে উঠল। এ যুদ্ধে কুরাইশ ও বনু কেনানার সরদার ছিল হরব বিন উমাইয়্যা। কারণ সে বয়স ও শারাফাত উভয় দিক দিয়েই

---

[১১৬] দেখুন জামেউত তিরমিযী ৫/৫৫০, ৫৫১, হাদীস নং ৩৬২০। তারীখে তাবারী ২/২৭৮, ২৭৯। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১১/৪৮৯, হাদীস নং ১১৭৮২। বাইহাকী প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ২/২৪,২৫। আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ৬/১৭০। আর এটাই শক্তিশালী সনদ-সমর্থিত বক্তব্য। অপর এক বর্ণনায় আছে, আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সা. এর সঙ্গে বিলাল রা. কে পাঠিয়ে দেন। এটা একশ ভাগ ভুল- তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা বিলাল রা. তখন সম্ভবত দুনিয়াতেই ছিলেন না। আর থাকলেও সে বয়সে তাঁর আবু তালিব ও আবু বকর রা. এর সঙ্গে থাকার প্রশ্নও তো ওঠে না। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. যাদুল মাআদে এ মতামত পেশ করেছেন ১/১৭। এ ঘটনা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সনদ নড়বড়ে। ইবনে ইসহাক কোনো সনদ ছাড়াই এটা বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে বর্ণনা করেছেন ইবনে হিশাম ১/১৮০-১৮৩। তাবারী ২/২৭৭। আবু নাঈম প্রণীত বাইহাক্বী।

[১১৭] এ দুই দলের মধ্যে মোট চারটি ফিজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। প্রথম তিনটি কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই সন্ধির মাধ্যমে শেষ হয়েছিল। কেনানার জনৈক ব্যক্তির কাছে বনু কায়সের এক ব্যক্তির পাওনা ছিল। কিন্তু সে তার পাওনা নিয়ে টালবাহানা করছিল। দুই. এক কেনানী উকায বাজারে গর্ব আর বড়াই করেছিল। তিন. মক্কার কয়েকটি বখাটে যুবক কায়সের এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে উৎকট ফাযলামীর চেষ্টা করছিল। আর কিতাবে উল্লিখিত এটা হলো ফিজারুল বারায। বিস্তারিত দেখুন মুনমিক ফী আখবারি কুরাইশ পৃষ্ঠা ১৬০-১৬৪। ইবনুল আসীর প্রণীত কামিল ১/৪৬৭। আর তিনি প্রথম তিনটিকে একটি হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। দিনের শুরুভাগে যুদ্ধের পাল্লা ভারী ছিল বনু কায়সের দিকেই। এর বিপরীতে বনু কেনানা হয়ে পড়েছিল কোণঠাসা। কিন্তু দিনের মধ্যভাগে যুদ্ধের পাল্লা হেলে পড়ার উপক্রম হলো বনু কেনানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন কুরাইশের পক্ষ থেকে সন্ধির রব উঠালো। সন্ধির শর্ত দেওয়া হলো উভয় পক্ষের নিহতদের সংখ্যা হিসাব করা হবে। এরপর যে পক্ষের নিহতের সংখ্যা বেশি হবে অপর পক্ষ থেকে সেই বেশিটুকুর দিয়ত নেওয়া হবে। এভাবে সন্ধির মধ্য দিয়ে রক্তক্ষয়ী এক লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটল। তাদের দুশমনি আর শত্রুতার দিন শেষ হয়ে এলো। আরবিতে ফিজার অর্থ হলো লঙ্ঘন করা। যেহেতু এই যুদ্ধে হারাম মাসের সম্মান ও ইয্যতকে লঙ্ঘণ করা হয়েছিল, সে কারণে একে হারবুল ফিজার বলে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর চাচাদেরকে তীর কুড়িয়ে দিয়েছিলেন। [১১৮]

হিলফুল ফুযূল

এই যুদ্ধের পরপরই আরবের কুরাইশের কয়েকটি গোত্র যথা বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ বিন আব্দুল উয্যা, যুহরা বিন কিলাব ও তাইম ইবনে মুররা যুল কা'দ মাসে হিলফুল ফুযূল গঠনের প্রস্তাব দেয়। এরপর তারা সকলেই এ লক্ষ্যে তাদের বয়োবৃদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত সরদার আব্দুল্লাহ বিন জুদআন তাইমীর ঘরে সমবেত হয়। তারা হিলফুল ফুযূল গঠন করে এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করে যে, গোটা মক্কায় যে কোনো মযলুমের পাশে গিয়ে তারা দাঁড়াবে। আর যে অন্যের ওপর যুলুম করবে তার কাছ থেকে যুলুমের দায় আদায় করে ছাড়বে। রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মৈত্রীচুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন। রিসালতের মহা সম্মানে ভূষিত হওয়ার পরে একদিন তিনি বলেছিলেন, **'আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের ঘরে আমি এমন একটি মৈত্রীচুক্তির মধ্যে শরীক ছিলাম যে এর বিনিময়ে আমি লাল উটও গ্রহণ করা পছন্দ করতাম না। যদি ইসলাম আসার পরেও এমন কোনো চুক্তিতে আমাকে ডাকা হতো তবে আমি সে ডাকে সাড়া দিতাম'**। [১১৯]

এই মৈত্রীচুক্তির প্রাণ জাহেলিয়াতের হিংসা-বিদ্বেষ আর আত্মম্ভরিতার দাউ দাউ আগুনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িকতা আর জাত্যভিমান যে

---

[১১৮] ইবনে হিশাম ১/১৮৪-১৮৭। মুনমিক ফী আখবারি কুরাইশ পৃষ্ঠা ১৬৪-১৮৫। ইবনুল আসীর প্রণীত আল কামিল ১/৪৬৮-৪৭২। তারা বলেছেন, এটা ছিল শাওয়াল মাসের ঘটনা। কিন্তু সেটা বিশুদ্ধ নয়। কেননা শাওয়াল হারাম মাসের অন্তর্ভুক্ত কোনো মাস নয়। আর উকায মেলাও ছিল হারামের বাইরে। তাহলে আর এ যুদ্ধে লঙ্ঘিত হওয়ার মতো হারাম থাকেই বা আর কী? তা ছাড়া প্রতি বছর উকায বেলা বসত গিয়ে শাওয়াল মাস শেষে যুল কা'দ মাসের গোড়ার দিকে।

[১১৯] ইবনে হিশাম ১/১৫৪, ১৫৫।

আগুন আরবীয় দুনিয়ার সর্বত্র উস্কে দিয়েছিল। এই মৈত্রীচুক্তির পেছনে সক্রিয় কারণ সম্পর্কে বলা হয়: যুবায়দ গোত্রের এক ব্যক্তি কিছু পণ্য নিয়ে মক্কায় এলো। আস বিন ওয়ায়েল সাহমী তার থেকে তা কিনে নিলো। কিন্তু তাকে সে বিনিময় দিতে টাল বাহানা শুরু করল। সে তার মিত্র কবীলা আব্দুদ্দার, মাখযূম, জুমাহ্, সাহম, আদীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। কিন্তু তারা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। এরপর সে আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করল। সুউচ্চ নিনাদে সে কয়েকটি কবিতায় তার দুঃখ আর কষ্টের অন্ধকার দাস্তান বলে চলল। তার আওয়াজ শুনে যুবাইর বিন আব্দুল মুত্তালিব সামনে এসে বলল কী ব্যাপার! কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসছে না কেন ? এরপর পেছনে উল্লিখিত গোত্রগুলি হিলফুল ফুযূল গঠনের ওপর ঐকমত্যে পৌঁছে। চুক্তি গঠনের পরে তারা আস বিন ওয়ায়েলের কাছে আসে এবং তার কাছ থেকে যুবায়দীর অধিকার আদায় করে নেয়। [১২০]

কষ্টে ভরা জীবন

যৌবনের শুরুভাগে রাসূলে আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কোনো নির্ধারিত কাজের পেছনে সময় ব্যয় করার কথা জানা যায় না। তবে অনেক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় যে, তিনি বকরি চরাতেন। তিনি বকরি চরাতেন বনি সাদে।[১২১] তাছাড়া মক্কাতেও কয়েক কিরাতের বিনিময়ে তিনি বকরি চরাতেন।[১২২] তবে বোঝা যায় যখন তিনি পূর্ণ যৌবনে প্রবেশ করলেন তখন রাখালির পরিবর্তে ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করা শুরু করলেন। এ কারণে বর্ণনা পাওয়া যায় তিনি সায়েব বিন আবী সায়েবের সঙ্গে ব্যবসা করতেন। এ হিসেবে তিনি ছিলেন তার উত্তম শরীক। কোনো মারামারি ছিল না, কোনো ঝগড়া বিবাদ ছিল না। মক্কা বিজয়ের দিন যখন সায়েব তাঁর কাছে এলো তিনি তাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং বললেন, **স্বাগতম আমার ভাই! সুস্বাগতম আমার সঙ্গী।**[১২৩]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন পঁচিশ বছর হলো তখন তিনি হযরত খাদীজা রা. এর সম্পদ নিয়ে বাণিজ্য করতে সিরিয়ার পথে যাত্রা করলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ

---

[১২০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১২৬-১২৮। যুবাইরী প্রণীত নসবু কুরাইশ পৃষ্ঠা ২৯১।

[১২১] ইবনে হিশাম ১/১৬৬।

[১২২] সহীহ্ বুখারী: কিতাবুল ইজারাত অধ্যায়: কীরাতের বিনিময়ে বকরী চরানো অধ্যায়। হাদীস নং ২২৬২।

[১২৩] সুনানে আবী দাউদ ২/৬১১। সুনানে ইবনে মাজাহ ২/৭৬৮, হাদীস নং ২২৮৭। মুসনাদে আহমদ ৩/৪২৫।

রা. ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনকুবের ব্যক্তির স্ত্রী। তিনি বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে বাণিজ্য করতেন এবং মুযারাবার সূত্রে একটি বিশেষ অংশ তার জন্য শুরুতেই নির্ধারিত করে নিতেন। কুরাইশরা ছিল ব্যাবসায়িক সম্প্রদায়। যখন তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সততা, আমানতদারি আর উত্তম চরিত্র মাধুরী সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এরপর তার কাছে স্বীয় বাণিজ্যের মাল নিয়ে সিরিয়ায় যাত্রার প্রস্তাব করলেন। পাশাপাশি অন্য মানুষকে তিনি যা দেন তার চেয়ে বেশি অংশ দেওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। সঙ্গে দিলেন তাঁর গোলাম মাইসারাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁর পণ্য নিয়ে তিনি রওয়ানা হলেন। মাইসারাকে সঙ্গে নিয়ে একসময় এসে সিরিয়ায় পৌঁছে গেলেন।[১২৪]

খাদীজার সঙ্গে বিবাহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়া থেকে এক সময় মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে হযরত খাদীজা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে আমানত আর বরকতের এমন সব গুণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ইতঃপূর্বে পৃথিবীর কারও মধ্যে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেননি। তা ছাড়া তার গোলাম মাইসারা উত্তম চরিত্র মাধুরী, উন্নত চিন্তা-ফিকির, সত্য বাক্যালাপ আর বিশ্বস্ত জীবন পদ্ধতির যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলি সিরিয়ার সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ চালনার পরতে পরতে প্রত্যক্ষ করেছিল সে সমস্ত তাকে অবগত করল। এতে উত্তরঙ্গ সমুদ্রের সুবিশাল ঊর্মিমালার মধ্যে শরণহীন অভাগার মতো খুঁজতে খুঁজতে এক সময় তাঁর সৌভাগ্যের চাঁদ অন্ধকার আকাশের জানালা খুলে উঁকি দিলো। তিনি সে আলোতে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য হাতের নাগালেই পেয়ে গেলেন। মক্কার বড় বড় নেতা ও সরদারগণ হযরত খাদীজা রা. কে পাণিগ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু তিনি কারও প্রস্তাবকেই গ্রহণ করেননি। এরপরে তিনি তাঁর মনের মণিকোঠায় লুকায়িত কথাগুলো তার সুহৃদ নাফীসা বিনতে মুনাব্বিহের কাছে খুলে বললেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাকে খাদীজার বিবাহ সম্পর্কে মনের কথাগুলো তুলে ধরলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে সম্মত হলেন এবং স্বীয় চাচাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা সবাই মিলে হযরত খাদীজা রা. এর চাচার নিকট গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করলেন। এরপর বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিবাহের অনুষ্ঠানে বনু হাশিম ও মুযার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এটা ছিল রাসূলে কারীম

[১২৪] ইবনে হিশাম ১/১৮৭, ১৮৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সিরিয়া থেকে ফিরে আসার দুই মাস পরের ঘটনা[১২৫]। বিবাহে হযরত খাদীজা রা. এর মোহর ধার্য করা হয়েছিল বিশটি উট। তখন হযরত খাদীজা রা. এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সম্ভ্রান্ত বংশ, অতুল বিত্ত বিভব আর সুন্দর বিবেক বোধের দিক দিয়ে তখন তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী। তিনিই সেই সৌভাগ্যবান নারী যিনি সর্বপ্রথম নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি।

কেবল হযরত ইবরাহীম রা. ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল সন্তানই ছিলেন তাঁর গর্ভের। সর্বপ্রথম সন্তান ছিলেন কাসেম- আর তার নামেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুনিয়ত (উপনাম) ছিল আবুল কাসেম। এরপর যয়নব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং আব্দুল্লাহ রা.। আব্দুল্লাহর উপাধি ছিল তায়্যিব এবং তাহির। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল ছেলে শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর মেয়েরা সবাই বড় হয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তবে কেবল হযরত ফাতেমা রা. ছাড়া আর সকলেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেছিলেন। হযরত ফাতেমা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের ছয় মাস পরে এই ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়ে পিতার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।[১২৬]

কাবা নির্মাণ ও সমস্যার সমাধান

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর হলো তখন কুরাইশরা কাবা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলো। এর কারণ হলোঃ কাবা তখন কেবল মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে চার দেওয়ালে বেষ্টিত একটি ঘরের মতো ছিল। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর যুগ থেকেই এর উচ্চতা ছিল নয় হাত। এর ওপরে কোনো ছাদ ছিল না। এ স্বর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল কতগুলি দুঃসাহসী চোর। তারা তার ভেতরে যে সকল সোনা-রূপা আর মূল্যবান জওহর ছিল সেগুলো সব চুরি করে নিয়ে গেল। তা ছাড়া এটা নির্মাণ করা হয়েছিল সেদিন থেকে শত শত বছর আগে। সে কারণে যুগে যুগে বিপদ আর আপদের

---

[১২৫] ঐতিহাসিক মাসউদী রাসূলে কারীম সা. এর সিরিয়া গমন কালকে ফিজার যুদ্ধের চার বছর নয় মাস ছয় দিন পরের ঘটনা বলে অভিমত পেশ করেছেন। আর খাদীজার সঙ্গে বিবাহের সময় কাল বলেছেন সিরিয়া যাত্রার দুই মাস চব্বিশ দিন পরে ঘটনা। দেখুন মুরূজুয যাহাব ২/২৭৮।

[১২৬] ইবনে হিশাম ১/১৮৯-১৯১। ফাতহুল বারী ৭/১০৫। তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৭।

বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছিল তার ওপর দিয়ে। এতে তার প্রাণের রস শুকিয়ে গিয়েছিল। রোদ আর তৃষ্ণায় এর দেয়ালগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। সে বছরই এক বিশাল তুফান মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিলো। তীব্র বেগে ভয়াল রূপ ধারণ করে সে ছুটে আসছিল তার দিকে। এ কারণে কাবা ঘর যে কোনো সময় ধসে পড়ার ভয় তীব্র আকার ধারণ করছিল। এ কারণে কুরাইশরা তার মর্যাদা ও অবস্থান ধরে রাখার জন্য তাকে নির্মাণ করতে বাধ্য হলো। তারা এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হলো যে, প্রত্যেককে কেবল পবিত্র ও হালাল বস্তুই কাবা নির্মাণের জন্য দিবে। এ কারণে তারা কেউ পতিতা বৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের টাকা-পয়সা কিংবা কারও ওপর যুলুম করে নেওয়া অর্থ-সম্পদ এ কাজে ব্যবহার হতে দিবে না।

নতুন করে কাবার অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পুরনো অবকাঠামো ভেঙে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ ভাঙার কাজ নিজের হাতে শুরু করতে কেউই সাহস পাচ্ছিল না। পরিশেষে ওলীদ বিন মুগীরা মাখযূমী এ কাজ শুরু করল। সে একটি কোদাল নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বলল: হে আল্লাহ! আমরা কেবল সৎ উদ্দেশ্যেই এ কাজে হাত দিচ্ছি। এরপর সে দুই কর্ণারে আঘাত হানল। মানুষ যখন অযাচিত কিছু ঘটতে দেখল না তখন পরের দিন এর ভাঙার কাজে সবাই তার সঙ্গে শরীক হলো। এভাবে ভাঙতে ভাঙতে তারা এক সময় মাকামে ইবরাহীম পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এরপর তারা নির্মাণের কাজ শুরু করল। কাজের শৃঙ্খলার জন্য কাবাকে তারা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিলো এবং প্রত্যেক গোত্রকে এক ভাগ করে দিয়ে দিলো। প্রত্যেক গোত্র যার যার অংশের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ ক্ষেত্রে গোটা স্থাপত্য নির্মাণের কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন রোমান স্থাপত্যশিল্পী। তার নাম ছিল বাকূম। যখন নির্মাণ কার্য হজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) পর্যন্ত পৌঁছল, তখন তারা এই বিশাল সৌভাগ্য যে যার ভাগে বাগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করল। তাদের সুনীল আকাশে দেখা দিলো বিশৃঙ্খলার কালো মেঘের ঘনঘটা। টানা চার কিংবা পাঁচ দিন চলল তাদের দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ। ধীরে ধীরে তা আরও ভয়াল রূপ ধারণ করল। কিছুক্ষণের জন্য মনে হচ্ছিল হারামেও এবার বুঝি রক্তের দরিয়া বয়ে যাবে। সংঘাত আর সংঘর্ষের তীব্র আগুন গ্রাস করে নিবে বাইতুল্লাহ স্নেহঘেরা মাটিকে। ভাগ্য তাদের পক্ষে ছিল। সে কারণে আবু উমাইয়্যা বিন মুগীরা মাখযূমী তাদের পথ আগলে দাঁড়াল। সে তাদের কাছে প্রস্তাব করল যে, সেই ব্যক্তি এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত দিবে যে আগামীকাল সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহর এই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে। তারা সবাই তার প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিলো। আল্লাহ তাআলার স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নেওয়ার

ইচ্ছা ছিল। তাই তিনিই সর্বপ্রথম সে দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন তারা তাঁকে দেখতে পেল সবাই গুণগুণিয়ে বলতে লাগল তিনি মুহাম্মাদ। তিনি পরম বিশ্বস্ত। তিনি যে ফয়সালাই করবেন আমরা তা সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে রাযি আছি। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তারা তাকে ঘটনা খুলে বলল। তিনি একটি চাদর চাইলেন এবং হজরে আসওয়াদকে সেই চাদরের মধ্যে রাখলেন। এরপরে তিনি বিবাদমান গোষ্ঠীগুলোর সরদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডেকে সকলকে চাদরের একেক প্রান্তে ধরতে বললেন। তারপর সবাইকে উঠাতে বললেন। যখন সবাই ধরাধরি করে নির্ধারিত জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন দস্ত মুবারকে তা উঠিয়ে যথাযথ স্থানে স্থাপন করে দিলেন। এটা ছিল একটি চূড়ান্ত ফয়সালা। তাঁর এই অকল্পিতপূর্ব ফয়সালায় সবাই সন্তুষ্ট ছিল।

নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে কা'বা ঘরের কাছে এসে কুরাইশদের পবিত্র ও হালাল পয়সা ফুরিয়ে গেল। এ কারণে তারা উত্তর দিক দিয়ে ছয় হাত পরিমাণ জায়গা কাবা ঘরের বাইরে রেখে দিলো। আজ সে জায়গাটুকুকে হিজর ও হাতীম বলা হয়। কুরাইশরা কাবার দরজাকে মাটি থেকে উঁচু করে দিলো। উদ্দেশ্য ছিল যাতে তার ভেতরে কেবল তারাই প্রবেশ করতে পারে যাদেরকে তারা অনুমতি দিবে। যখন কা'বার অবকাঠামোর উচ্চতা পনেরো হাতে গিয়ে পৌঁছল তখন তারা এর ওপর ছয়টি পিলার দিয়ে একটি ছাদ নির্মাণ করে দিলো।

নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পরে কাবা প্রায় একটা চতুষ্কোণী কাঠামোর রূপ ধারণ করল। এর উচ্চতা হলো পনেরো মিটার। যে দেয়ালে হজরে আসওয়াদ স্থাপিত সে দেয়াল ও তার বিপরীত পাশের দেয়াল অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল হলো দশ মিটার। মাতাফ থেকে হজরে আসওয়াদ রাখার জায়গার উচ্চতা গিয়ে পৌঁছল দেড় মিটারে। যেই দেয়ালে দরজা কাটা হলো সেই দেয়াল ও তার বিপরীত পাশের দেয়াল হলো বারো মিটার। ভূমি থেকে দরজার উচ্চতা হলো দুই মিটার। কাবার ঠিক নীচ থেকে চারপাশে ঘেরাও করা যে জায়গাটি রয়েছে তার নাম হলো শাযূরান। এর মধ্যভাগের উচ্চতা হলো পঁচিশ সেন্টিমিটার আর প্রস্থ হলো ত্রিশ মিটার। এটি মূলত বাইতুল্লাহরই একটি অংশ ছিল কিন্তু কুরাইশরা এটাকে বাইরে রেখে দিয়েছিল।[১২৭]

[১২৭] কাবা নির্মাণের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ইবনে হিশাম ২/১৯২-১৯৭। তারীখে তাবারী ২/২৮৯। সহীহ বুখারীঃ মক্কা ও তাঁর স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায় ১/২১৫।

নবুওত-পূর্ব সংক্ষিপ্ত জীবন

গোটা বিশ্ব মানবতার প্রতিটি স্তরের মানুষের মধ্যে যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে এর সবগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্রের মধ্যে। তিনি ছিলেন সুস্থ চিন্তা ভাবনা আর সরল দৃষ্টিভঙ্গির এক সমুন্নত আলোর মিনার। সুন্দর বুদ্ধিমত্তা, মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা আর উপায় ও উপকরণের দ্বায়িত্বশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি তার প্রলম্বিত নিশ্চুপ থাকার দ্বারা ধারাবাহিক ভাবনা, ফিকিরের পেছনে পূর্ণ মনোযোগী হওয়া আর সত্যকে রক্ষার কাজে সহায়তা নিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন উর্বর বুদ্ধিমত্তা আর বিশুদ্ধ বিচক্ষণতার দ্বারা পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে জীবনের ডাইরির পৃষ্ঠাগুলো অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি মানুষের কর্ম তৎপরতা ও লোকদের অবস্থার পূর্ণ নিরীক্ষণ করেছিলেন। এভাবে সে যুগে যত কুসংস্কার বাসা বেঁধেছিল তিনি তা ঘৃর্ণা করতেন এবং নিজেও তা থেকে দূরে থাকতেন। এরপর নিজের ও তাদের কাজকর্মের পূর্ণ বিচক্ষণতার সঙ্গে তাদের মধ্যে জীবন সফরের প্রতিটি মনযিল পাড়ি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে যে ভালো কাজটি হতো তাতে তিনি অংশ নিতেন[১২৮] আর এর বিপরীতে কোনো খারাপ কাজ হলে তিনি তাঁর চিরাচরিত ঠিকানা ঘর কিংবা মনের নির্জনতাকে ইখতেয়ার করতেন। তিনি মদ্যপান করতেন না। মূর্তির বেদিতে বলিকৃত পশুর গোশত খেতেন না। মূর্তির পায়ের কাছে জড়ো হয়ে কোনো ধরনের কোনো অনুষ্ঠান করতেন না। বরং তিনি তাঁর জীবনের প্রথম দিন থেকে শুরু করেই এই মিথ্যা ও বাতিল মাবুদগুলোকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন। এমনকি গোটা পৃথিবীতে তাঁর কাছে এর চেয়ে অধিকতর ঘৃণিত বস্তু দ্বিতীয়টি আর ছিল না। লাত ও উয্যার নামে শপথ খাওয়ার কথাও তিনি শুনতে পারতেন না।[১২৯]

সন্দেহ নেই তকদীর সর্বদাই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর হেফাযত ও সুরক্ষার নিশ্ছিদ্র চাদর ছড়িয়ে রেখেছিল। সুতরাং, যখন পার্থিব কোনো ভোগ বিলাসের বাসনা হৃদয়ে আন্দোলন আর আলোড়নের ঝড় বইয়ে দিত, যখন অপছন্দীয় কোনো কাজের অনুসরণের মধ্যে হৃদয়ে তৃপ্তি খুঁজে পাওয়া শুরু করত। ঠিক তখনই স্বীয় মালিকের পূর্ণ মনোযোগ আর দৃষ্টি তাঁর ও সেগুলোর মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[১২৮] যেমন জাহিলী যুগে কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত, রাসূলে কারীম সা. নিজেও জাহেলী যুগে আশুরার রোযা রাখতেন। দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০০২। ফাতহুল বারী ৪/২৮৭।

[১২৯] দেখুন ইবনে হিশাম ১/১২৮। তারীখে তাবারী ২/১৬১। তাহযীবে তারীখে দিমাশ্‌ক ১/৩৭৩, ৩৭৬।

সাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহেলিয়াতের যুগে মানুষ যা কিছু করত, আমি জীবনে কেবল দুই বার সেগুলি করার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার আল্লাহ তাআলা আমার ও সেগুলোর মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর আমি নবুওত ও রিসালত পাওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো দিনও এ ধরনের কোনো কাজ দ্বিতীয় বার করার ইচ্ছা করিনি। সেই ঘটনাদুটো ছিল : মক্কার পাহাড়ে যে বালকটি আমার সঙ্গে বকরি চরাত, এক রাতে আমি তাকে বললাম : তুমি আমার বকরিগুলো একটু দেখে রেখো! আমি মক্কায় গিয়ে সকলের সঙ্গে একটু গল্প করে আসি! সে বলল : ঠিক আছে তা-ই হবে। এরপর আমি সে উদ্দেশ্যে সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। আমি যখন মক্কার শেষ প্রান্তের একটি ঘরের কাছে এসে উপনীত হলাম, তখন আমার কানে বাঁশি ও বাজনার আওয়াজ ভেসে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কিসের আওয়াজ? তারা বলল : অমুকের সঙ্গে অমুকের বিবাহ। আমি শোনার জন্য বসে গেলাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার চোখে নিদ্রার পর্দা ফেলে দিলেন এবং আমি ঘুমিয়ে গেলাম। ভোরের সূর্যের তাপ শরীরে এসে লাগলে আমার ঘুম ভাঙে। আমি আমার সাথীর কাছে ফিরে গিয়ে সবকিছু তাকে খুলে বলি। এরপর অন্য এক রাতেও তাকে আমি একই প্রস্তাব করি। এ উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করি। এর ফলাফলও হয় প্রথম রাতের মতোই। ...এরপর আর কোনোদিনও আমি আমার মনে এ ধরনের আশা স্থান দেইনি।[১৩০]

ইমাম বুখারী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তখন কাবার নির্মাণ কাজ চলছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আব্বাসের সঙ্গে পাথর এনে দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। তখন হযরত আব্বাস রা. তাকে বললেন, তোমার লুঙ্গিটা কাঁধের ওপর রেখে দাও এতে পাথরের আঘাত ও ব্যথা লাগবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর চোখদুটি বড় বড় হয়ে আসমানের দিকে উঠে গেল। এরপর তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে হুঁশ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার লুঙ্গি কোথায়! আমার লুঙ্গি কোথায়? বলতে লাগলেন। এরপর তাকে লুঙ্গি পরিয়ে দেওয়া হলো। অন্য এক বর্ণনায় আছে, এরপর আর কোনো দিনও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সতর দেখা যায়নি।[১৩১]

---

[১৩০] হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন তাবারী র. ২/২৭৯ প্রমুখ। মুহাদ্দিস ইমাম হাকিম ও যাহাবী র. এটাকে বিশুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর বিপরীতে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে আল্লামা ইবনে কাসীর র. ২/২৮৭ এটাকে যঈফ বলেছেন।

[১৩১] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৫৮২। ফাতহুল বারী ৩/৫১৩, হাদীস নং ৩৫২৯, ৭/১৮০। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৩/৫১৭। মুসনাদে আহমদ ৩/২৯৫, ৩১০, ৩৩৩, ৩৮০।

উত্তম চরিত্র মাধুর্য, মহান গুণাবলি আর বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কওমের এক সম্মানজনক আসনের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং, তিনি ছিলেন তাঁর কওমের মধ্যে সবচেয়ে বড় পৌরুষদীপ্ত মানুষ। তাঁর চরিত্র তাদের সকলের চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল। তাঁর মরতবা সকলের চেয়ে বড় ছিল। তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা সকলের চেয়ে বিশাল ছিল। তাদের সবার মধ্যে তাঁর কথাই ছিল সর্বাধিক সত্য। তাঁর স্বভাবই ছিল সবচেয়ে পেলব ও কোমল। তাঁর হৃদয়ই ছিল অধিক পবিত্র। ভালো কাজে তাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক মহান ছিলেন। আমলের দিক দিয়ে তিনিই সর্বাধিক পূত ও পুণ্যবান ছিলেন। তিনিই সর্বাধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী ছিলেন। তিনিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমানতদার ছিলেন। এমনকি এই মহান আমানতদারির কারণে তাঁর কওম তাকে আমীন বলে ডাকত। কারণ তাঁর মধ্যেই এমন সব মহান গুণ আর বৈশিষ্ট্যের মেলা বসেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক ব্যক্তির মধ্যে তা অতীতে কোনো দিনও দেখা যায়নি। আর ভবিষ্যতেও কোনো দিন যাবে না। উম্মুল মুমিনীন খাদীজার রা. ভাষায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ঠিক এমন: তিনি অসহায় মানুষের খরচ বহন করতেন। সর্বহারার জন্য জীবিকা উপার্জন করে দিতেন। মেহমানের যথাযথ আতিথেয়তার ব্যবস্থা করতেন এবং আসমান থেকে যে সকল মুসিবত আসত তাতে সাহায্য করতেন।[১৩২]

---

[১৩২] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩।

নবীজীর জীবন : রিসালত ও দাওয়াত

মক্কী জীবন

নবুওত ও দাওয়াত

মক্কী জীবন

নবুওত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জীবনধারা দুটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দিকে প্রবাহিত হয়। যার একটির সঙ্গে অন্যটিকে কোনো দিক দিয়েই তুলনা করা যায় না। আর তা হলো :

এক. মক্কী জীবন। এর সময়কাল ছিল প্রায় তেরো বছর।

দুই. মাদানী জীবন। এর সময়কাল ছিল পূর্ণ দশ বছর।

এরপর উল্লিখিত উভয় জীবনই কতকগুলো মনযিলে বিভক্ত হয়েছিল যার একটি অপরটি থেকে ভিন্ন। পাঠকের সামনে বিষয়টি তখনই বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিবে যখন তিনি ঐ পরিস্থিতি আর আবহের দিকে সূক্ষ্ম ও সন্ধানী দৃষ্টি বুলাবেন যেই পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এই উভয় জীবনেই দাওয়াতী কার্যক্রম চলছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী জীবনকে তিনটি মনযিল তথা স্তরে ভাগ করা যায়:

এক. গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা। এর সময়কাল ছিল তিন বছর।

দুই. মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রকাশ্যে দাওয়াতী মিশন পরিচালনার ঘোষণা । এর মুদ্দত ছিল নবুওতের চতুর্থ বছর থেকে শুরু করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরত করে চলে যাওয়া পর্যন্ত।

তিন. মক্কার বাইরে দীনের দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার। নবুওতের দশম বছরের শেষভাগ থেকে শুরু করে ইন্তেকাল পর্যন্ত গোটা মাদানী জীবনে অব্যাহত থাকে এ দাওয়াত।

মাদানী জীবনের বিস্তারিত বিবরণ আমরা যথাস্থানেই দিব ইনশাআল্লাহ।

নবুওত ও রিসালতের শীতল ছায়ায়

হেরা গুহায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স তখন চল্লিশের কোঠা ছুঁই ছুঁই করছিল। আপন কওমের জীবন আর জিন্দিগি নিয়ে প্রচণ্ড পেরেশানি তাঁর পেশানিতে বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ওদিকে তাঁর অতীতের চিন্তা ভাবনা তাঁর মাঝে ও তাঁর কওমের মাঝে মনস্তাত্ত্বিক ফারাক আর পার্থক্যের পরিমাণ দিন দিন আরও বাড়িয়ে চলছিল। নির্জনতা আর নিঃসঙ্গতা তাঁর কাছে বড় ভালো লাগিয়ে তুলেছিল। এ কারণে তিনি প্রায়ই সামান্য ছাতু আর পানি নিয়ে মক্কা থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে জাবালে নূরের হেরা গুহায় চলে যেতেন। এটি ছিল একটি ছোট ও সংকীর্ণ গুহা। লম্বায় এটি ছিল চার হাত। চওড়ায় ছিল পৌনে দুই হাত। সেখানে গিয়ে পুরো রমযান মাস অবস্থান করতেন। দিন রাত কাটিয়ে দিতেন আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ শক্তির ধ্যান মগ্নতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর মনে একটুখানি শান্তি ছিল না। তাঁর মন ছিল সদা চঞ্চল, উদ্বিগ্ন, উদ্বেলিত। কারণ তিনি তাঁর কওমকে শিরকের ধ্বংসাত্মক মদ গিলে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। তিনি দেখছিলেন তাঁর কওমের কপালে বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে শিরকের অশ্লীল ছবি। এগুলো দেখে দেখে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনে স্পষ্ট কোনো রাস্তাও তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর কওমের শিরকের অভিশাপ-শৃঙ্খল থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখছিলেন; কিন্তু নিজেও জানতেন না কী সেই মুক্তির পথ ? কোথায় তার ঠিকানা? এভাবে তিনি জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁক অতিক্রম করছিলেন । তাঁর সামনে তখন এমন কোনো পথ খোলা ছিল না যে পথে গিয়ে তিনি তাঁর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য খুঁজে পাবেন কিংবা পাবেন একটুখানি শান্তির ঠিকানা।

সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত থেকে তাঁর এই গুহা-জীবন বেছে নেওয়াও ছিল মূলতঃ আল্লাহ তাআলারই একটি কর্মকুশলতা। কারণ, এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁকে পার্থিব জীবনের অসার মায়াজাল থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। সামাজিক জীবনের চেচামেচি, হুলস্থুল হল্লা, ঝঞ্ঝা আর ঝামেলার বাজার থেকে দূরে রেখেছিলেন, জীবনের ছোট ছোট আশা আর অভিলাষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে তাকে বসিয়ে রেখেছিলেন। কারণ, এটা ছিল ঐ সুবিশাল কাজের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতির এক বৃহত্তম নিদর্শণ যার জন্য পৃথিবী অধীর আগ্রহে বসে অপেক্ষা করছিল। যাতে তিনি এই বিশাল আমানত নিজে কাঁধে তুলে নিতে পারেন এবং গোটা পৃথিবীর চেহারাটা নিমেষে পাল্টে দিতে পারেন। পারেন ইতিহাসের গতি ও স্রোতধারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে। আল্লাহ তাআলা তাকে রিসালতের দায়িত্ব

প্রদান করার তিন বছর আগ থেকেই এই নির্জনতার কঠোর প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছিলেন। কখনো কখনো দীর্ঘ এক মাসও চলে যেত এই নির্জন ও নিঃসঙ্গ অবস্থায়। তিনি এ সময় পৃথিবীর মুক্ত আত্মার সঙ্গে খোলা আকাশে ঘুরে বেড়াতেন। এই আত্মার পেছনে লুক্কায়িত এক অদৃশ্য জগত আবিষ্কারের চিন্তা ভাবনা করতেন। যাতে করে আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্রই সেই জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্বিঘ্নে নিজ কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। [১৩৩]

ওহী নিয়ে জীবরাঈল আ. এর অবতরণ

এভাবে একদিন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হলো। তিনি সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন জীবনের কামালত আর পূর্ণতার সানুদেশে। কারও কারও মতে এটাই হলো সকল রাসূলের রিসালতের বসন্ত। সুতরাং, এখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতের ঝিকিমিকি দিগন্ত রেখায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। দিকে দিকে থেকে থেকে বিভিন্ন তারার ঝলকানি চোখে পড়ল। তন্মধ্যে কিছু হলো: মক্কার একটি পাথর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে বিভিন্ন সত্য স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। রাতে তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন দিনে তা সুবহে সাদিকের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় সামনে চলে আসত। এভাবেই চলে গেল ছয়টি মাস। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতের গোটা মুদ্দত ছিল তেইশ বছর। সে হিসেবে এ সকল স্বপ্ন নবুওতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেরা গুহায় নিঃসঙ্গতার টানা তৃতীয় বছর চলছিল। তখন ছিল রমযান মাস। আল্লাহর দয়ার দরিয়ায় বিশ্ব মানবতার প্রতি অনুগ্রহের ঢেউ উঠল। ক্রমশঃ এটি রূপ নিল বিশাল তুফানে। তাঁর মহা অনুগ্রহের বিশাল তুফানগুলো সুবিশাল পাহাড়ের রূপ ধারণ করে আছড়ে পড়তে লাগল কূলে কূলে। তিনি আর দেরি করতে পারলেন না। তাঁর কুদরতি মন ব্যাকুল হয়ে উঠল বনী আদমকে সেই দয়ার দরিয়ার শীতল পানিতে অবগাহন করাতে। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওতের দ্বারা ধন্য করলেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম কে তাঁর কাছে পাঠালেন পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত দিয়ে। [১৩৪]

---

[১৩৩] মূল ঘটনা দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩। ইবনে হিশাম ১/২৩৫, ২৩৬। পাশাপাশি অন্যান্য তাফসীর, হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলি দেখুন। কথিত আছে, আব্দুল মুত্তালিব সর্বপ্রথম হেরা গুহায় ইবাদত করেছিলেন। যখন রমযান মাস চলে আসত তিনি সেই গুহায় চলে যেতেন এবং পুরো মাস জুড়ে মিসকীনদেরকে খাবার খাওয়াতেন। ইবনুল আসীর প্রণীত কামিল ১/৫৫৩।

[১৩৪] হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, বাইহাক্বীর রেওয়ায়েত অনুসারে স্বপ্ন দেখার মুদ্দত ছিল ছয় মাস। এ হিসাব অনুসারে স্বপ্নের মাধ্যমে নবুওতের উদ্বোধন হয়েছিল রাসূলের জন্মের মাস তথা রবীউল আউয়ালে।

বিভিন্ন দলীল-প্রমাণ আর আলামত ইত্যাদি দেখলে আমাদের সেই সুমহান দিনটি নির্ধারণে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। আর সেটা ছিল সোমবার। রমযান মাসের একুশ তারিখের রাত মোতাবেক ৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট। চান্দ্র বর্ষ হিসেবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল তখন চল্লিশ বছর ছয় মাস বারো দিন। আর সৌর বর্ষ হিসেবে তার বয়স ছিল উনচল্লিশ বছর তিন মাস বিশ দিন। [১৩৫]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতী যিন্দিগির উদ্বোধন কীভাবে হয়েছিল চলুন আমরা সেই কাহিনী শুনে নিই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.এর মুখে। আমাদের মনে রাখতে হবে এটা ছিল সেই কাহিনীর সূচনা যার দ্বারা কুফর ও গোমরাহীর ঘোর অন্ধকার রাতের রাহুগ্রাস থেকে পৃথিবী মুক্তি পেয়েছিল

যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিল। আর জাগ্রত অবস্থায় ওহীর সূচনা হয়েছিল রমযান মাসে। ফাতহুল বারী ১/২৭।

১৩৫ রাসূলে কারীম সা. কে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন্ মাসে নবুওতের মহা ধনে ধন্য করেছিলেন এবং ওহী অবতীর্ণ করা শুরু করেছিলেন। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মাঝে চরম মতবিরোধ রয়েছে। বিশাল এক জামাআতের মতে এটা ছিল রবীউল আউয়াল মাস। অন্যদের মতে, রমযান মাস। কারও কারও মতে, রজব মাস। কিন্তু আমরা রমযান মাসকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন আল্লাহ তাআলার বাণীর সমর্থন থাকার সুবাদেঃ البقرة ١٨٥ – شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن। আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, إنا أنزلناه في ليلة القدر – القدر ١। আর লাইলাতুল ক্বদর রমযান মাসে হওয়া সুবিদিত। আর আল্লাহ তাআলার এ বাণীর উদ্দেশ্যও তাই- إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين – الدخان ٣। তা ছাড়া রাসূলে কারীম সা. হেরা গুহায় যেতেন বরাবর রমযান মাসে। আর প্রসিদ্ধ মতে, জিবরাঈল আ. রমযান মাসে অবতরণ করেছিলেন।

রমযান মাস সিদ্ধান্ত হওয়ার পর ঐতিহাসিকদের মাঝে আবারও বিবাদ শুরু হয়ে যায়। শুরু হয় প্রচণ্ড গণ্ডগোল। এ ক্ষেত্রে মতবিরোধের বিষয় হলো- সেটা ছিল কোন্ তারিখ? কারও মতে, সাত তারিখ, কারও মতে, সতেরো তারিখ। কারও মতে, আঠারো তারিখ। ইবনে ইসহাক প্রমুখের মতে, আঠারো রমযান। কিন্তু আমরা এখানে ইবনে ইসহাকের বিপরীতে একুশ তারিখের রাতকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো, সচরাচর সকল কিংবা সিংহভাগ ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলে কারীম সা. এর জন্ম হয়েছিল ছিল সোমবার। আবু কাতাদা রা. থেকে এর সমর্থনে একটি হাদীসও রয়েছে, রাসূলে কারীম সা. কে সোমবার রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন, এ দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর এ দিনেই আমি নবুওত পেয়েছি কিংবা আমার ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। (সহীহ মুসলিম ১/৩৬৮। মুসনাদে আহমাদ ৫/২৯৭, ২৯৯, বাইহাক্বী ৪/২৮৬, ৩০০। হাকিম ২/২-৬) আর হিসাব অনুযায়ী সেই বছরের রমযান মাসে সোম বারের দিনগুলি ছিল সাত তারিখ, চৌদ্দ তারিখ, একুশ ও আটাশ তারিখ। আর একাধিক বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, শবে ক্বদর রমযান মাসের শেষ দশকের যে কোনো বেজোড় রাতে লুক্কায়িত রয়েছে। আর এ রাতগুলোর মাঝেই এটা আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা যখন আল্লাহর বাণী, إنا أنزلناه في ليلة القدر (আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে), রাসূলে কারীম সা. এর সোম বার জন্ম সম্পর্কিত আবু কাতাদা রা. এর হাদীস এবং ঐ বছরের রমযান মাসে সোমবার কেবল সাত, চৌদ্দ, একুশ ও আঠারো তারিখ হওয়ার দিকগুলোকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেখব, তখন আমাদের সামনে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, রাসূলে কারীম সা. নবুওতের মহা ধনে ধন্য হয়েছিল একুশে রমযান রাতে।

। এর সৌভাগ্যের পূবাকাশে উদিত হয়েছিল ঈমান ও হেদায়েতের সোনালি সূর্য। এটা সেই কাহিনী যা জীবন নদের গতি ও স্রোতধারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের দিকরোখ উলোট পালট করে দিয়েছিল। হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন:

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ওহীর সূচনা হয়েছিল ঘুমের ঘোরে সত্য স্বপ্ন দেখার মধ্য দিয়ে। সুতরাং, ঘুমের মধ্যে তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন দিনে তা ভোরের আলোর ন্যায় সত্য হয়ে প্রকাশ পেত। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিঃসঙ্গতা বড় ভালো লাগতে শুরু করল। সে কারণে তিনি একাকী হেরা গুহার নির্জনতায় চলে যেতেন। টানা কয়েকদিন সেখানে আল্লাহর ইবাদত করতেন। এ জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য কিছু পাথেয় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। তারপর খাদীজার নিকট ফিরে আসতেন। আর তিনি আবারও আগের মতো কিছু পাথেয় যোগাড় করে দিতেন। এভাবেই একদিন হেরা গুহায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সত্যের আগমন ঘটল। তাঁর নিকট এক ফেরেশতা এসে তাকে বললেন : আপনি পড়ুন! তিনি বললেন: আমি তো পড়তে জানি না। তিনি বলেন, এরপর ফেরেশতা আমাকে তাঁর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে ধরে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : পড়ুন! আমি বললাম : আমি তো পড়তে জানি না। তিনি বলেন: ফেরেশতা আমাকে আবারও তাঁর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: আমি তো পড়তে জানি না। তিনি বলেন : এরপর ফেরেশতা তৃতীয় বার আমাকে তাঁর বুকের সঙ্গে লাগিয়ে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে তিনি পড়তে লাগলেন: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) আপনি পড়ুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। আপনি পড়ুন আপনার পালনকর্তা মহান.........। [সূরা আলাক : ১-৫]।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলো নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর বুকের স্পন্দন তখনো থামেনি। তিনি সোজা খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের কাছে চলে গেলেন। তাকে বললেন : খাদীজা ! আমাকে চাদর

দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিকে ঢেকে দাও!! তাঁরা তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে রাসূলের ভীতি দূরীভূত হলো। এরপর তিনি খাদীজাকে বলতে লাগলেন : এ আমার কী হয়ে গেল! আমি বিপদের আশঙ্কা করছি। খাদীজা রা. তাকে বললেন : তা কখনোই হতে পারে না। আল্লাহর শপথ! তিনি কোনো দিনও আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় মানুষের খরচ বহন করেন। গরীবদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করেন। মেহমানের মেহমানদারি করেন। আল্লাহ প্রদত্ত মুসীবতে মানুষকে সাহায্য করেন।

এরপরে খাদীজা রা. তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা বিন নওফল ইবনে আসাদ বিন আব্দুল উয্যার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে এলেন। তিনি জাহেলী যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় কিতাব লিখতেন। ইঞ্জীলের এক বৃহৎ অংশ তিনি ইবরানী ভাষায় লিখেছিলেন। তিনি ছিলেন অন্ধ বয়োবৃদ্ধ একজন লোক। খাদীজা রা. তাকে বললেন : ভাইজান! আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন! ওয়ারাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন : ভাতিজা আমার! তুমি কি দেখ? এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন সবকিছু তার কাছে খুলে বললেন। সবকিছু শুনে ওয়ারাকা তাকে লক্ষ্য করে বললেন :এই সেই দূত, যাকে আল্লাহ তাআলা নবী মূসা আ. এর নিকটও পাঠিয়েছিলেন। হায় আমি যদি সে সময় একজন যুবক হতাম! হায় আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন : তারা কি আমাকে বের করে দিবে? ওয়ারাকা বললেন : হাঁ। তুমি যে পয়গাম নিয়ে এসেছ, যখনই কোনো ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে তার বিরুদ্ধে মানুষ শত্রুতা আর বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়েছে। যদি আমি সে দিন বেঁচে থাকি তবে আমি তোমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। কিন্তু কিছুদিন পরেই ওয়ারাকার জীবন প্রদীপ নিভে গেল। এদিকে ওহী আগমনের ধারাও বন্ধ হয়ে গেল। [১৩৬]

ওহী বন্ধের সময়কাল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কতদিন ওহী আসা বন্ধ ছিল এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন। তবে তার মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো, রাসূলের নিকট ওহী বন্ধের সময়কাল ছিল হাতে গনা কয়েকটি দিন মাত্র। ইবনে আব্বাস থেকে ইবনে সাদের বর্ণনা এ

[১৩৬] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩। ইমাম বুখারী র. সামান্য কিছুর শব্দভেদে এ হাদীসটি কিতাবুত তাফসীর এবং তা'বীরুর রুইয়া পর্বে ৩৩৯২, ৪৯৫৩, ৪৯৫৫-৪৯৫৭, ৪৯৮২ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুসলিম র. এটা কিতাবুল ঈমানের ২৫২ নং হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

বক্তব্যকেই সমর্থন করে।[১৩৭] আর ওহী বন্ধের মুদ্দত তিন বছর বা দুই বছর কিংবা ছয় মাস হিসেবে যে কথা লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে তা কোনোভাবেই বিশুদ্ধ ও নির্ভুল নয়।

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আর সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর গভীর নজর বুলিয়ে আমি চরম বিস্মিত হয়েছি। আমি এমন এক তথ্য পেয়েছি যা সাধারণত কারও লেখাতে পাওয়া যাবে না। আর তা হলোঃ বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি বছর রমযান মাস কাটাতেন হেরা গুহায়। আর নবুওতের পূর্বে এমন হয়েছিল সর্বমোট তিনটি বছর। এ হিসেবে নবুওত প্রাপ্তি ছিল সেই তিন বছরের তৃতীয় বছর। আর যখন রমযান মাস শেষ হতো তখন তাঁর অবস্থানও শেষ হতো। এরপর শাওয়ালের প্রথম তারিখ সকাল বেলা তিনি বাড়িতে ফিরে আসতেন।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, ওহী বন্ধের মুদ্দত শেষ হওয়ার পরে সর্বপ্রথম যখন ওহী নাযিল হয়েছিল তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরা গুহা থেকে এক মাস অবস্থান শেষে বাড়ি ফিরে আসছিলেন।

আমি বলতে চাই, ওহীর মুদ্দত শেষ হওয়ার পরে সর্বপ্রথম এই ওহীটি নাযিল হয়েছিল ঐ বছরের শাওয়ালের প্রথম তারিখ যে বছরের রমযানে তিনি নবুওত ও রিসালতের ধনে ধন্য হয়েছিলেন। কারণ, এটাই ছিল তাঁর হেরা গুহায় বসবাসের সর্বশেষ দিন। আর এখন এটা প্রমাণিত যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ওহীর সূচনা হয়েছিল একুশে রমযানের শুক্রবার রাতে। সুতরাং, ওহী বন্ধের মুদ্দত ছিল মাত্র দশদিন। এরপরে দ্বিতীয় বার তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়েছিল নবুওতের প্রথম বর্ষের পয়লা শাওয়াল বৃহস্পতিবার ভোর বেলা। আর সম্ভবত এ কারণেই প্রতি বছর রমযানের শেষ দশদিন মসজিদে ইতেকাফ ও নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে কাটানোর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শাওয়ালের প্রথম দিনকে ঘোষণা করা হয়েছে ঈদ তথা আনন্দ আর খুশির দিন হিসেবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ওহী বন্ধ থাকার এ দিনগুলোতে কষ্ট আর পেরেশানির প্রাবল্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুঁকড়ে উঠেছিলেন। হতবিহ্বলতা আর হতাশা ছিল তাঁর এ দিনগুলোর নিত্য সঙ্গী। ইমাম বুখারী র. 'কিতাবুত তা'বীর' এ বর্ণনা করেন, 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহী বন্ধের এ দিনগুলোতে এতটা চিন্তিত আর পেরেশান ছিলেন যে, কখনো কখনো পাহাড়ের

---

[১৩৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১/১৯৬।

চূড়া থেকে আত্মহত্যার জন্য দৌড়ে যেতেন। সুতরাং, যখনই এমন করার জন্য তিনি পর্বতের শিখর দেশে পৌঁছে যেতেন তখন জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করতেন। অনন্তর তাকে বলতেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল! এতে তাঁর প্রাণের ধুকধুকানি কিছুটা হলেও স্তিমিত হতো। তাঁর মন কিছুটা হলেও প্রশান্তির পরশ পেত। এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে যেতেন। এরপরে যখন ওহী বন্ধের মুদ্দত আরও প্রলম্বিত হতো আবারও তিনি তেমন করার জন্য বের হতেন। পর্বতের গা বেয়ে বেয়ে যখন সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছে যেতেন তখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর সামনে আত্মপ্রকাশ করে আগের মতো কথা বলতেন।[১৩৮]

ওহী নিয়ে দ্বিতীয় বার জিবরাঈল আ. এর অবতরণ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী র. লেখেন, 'কয়েকদিন ওহী এ কারণে বন্ধ রাখা হয়েছিল যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভয় পেয়েছিলেন তা কেটে যায় এবং তাঁর মধ্যে দ্বিতীয় বার ওহী প্রাপ্তির শওক ও যওক পয়দা হয়।[১৩৯] অনন্তর যখন এটা তাঁর হাসিল হয়ে গেল আর তিনি ওহী অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকতে লাগলেন আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বিতীয় বার ওহী অবতীর্ণ করার মাধ্যমে মহীয়ান করে তোলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

'দীর্ঘ এক মাস হেরা গুহায় অবস্থান করার পরে সেখান থেকে নেমে ফিরতি পথে যখন আমি পার্বত্য উপত্যকা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন কী যেন হঠাৎ আমাকে ডাক দিলো। আমি আমার ডান দিকে তাকালাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। এবার আমি বাম দিকে তাকালাম কিন্তু অনুরূপ শূন্য দেখলাম। এবার সামনে তাকালাম তারপরে পেছনে তাকালাম কিন্তু কোথাও কিছুই আমার নজরে পড়ল না। এরপরে যখন আমি আমার মাথা সামান্যটুকু উঁচু করলাম তখন ভীতিকর কিছু দেখতে পেলাম। দেখলাম হেরা গুহায় আমার কাছে যে ফেরেশতা এসেছিলেন তিনি আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান সমান একটি বিশাল কুরসীতে উপবিষ্ট। আমি চমকে গিয়ে ভয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি দৌড়ে খাদীজার কাছে এসে বললাম 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও! আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও!! আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দাও!! তিনি বলেন, এরপরে তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো এবং আমার ওপর ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিলো। পরক্ষণেই অবতীর্ণ হলো يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢)

১৩৮ সহীহ বুখারী হাদীস নং ৬৯৮২।
১৩৯ ফাতহুল বারী ১/২৭।

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) হে চাদরওয়ালা আপনি উঠে দাঁড়ান! ....এটা ছিল নামায ফরয হওয়ার আগের ঘটনা। এরপরে ওহীর ময়দান গরম হয়ে উঠল। চলতে থাকল অব্যাহত ভাবে। [১৪০]

এই আয়াতগুলোই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতের মৌলিক নীতিমালা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত লাভের পরে ওহী বন্ধ থাকার দিনগুলো শেষ হতেই এগুলো নাযিল হয়েছিল। এ সকল আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর দুটি যিম্মাদারি অর্পণের কথা আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি এগুলোর পরিণতি ও ফলাফলের কথাও বলে দেওয়া হয়েছে।

এক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার যিম্মাদারি দেওয়া হলো। আর এটা বোঝা যায় قُمْ فَأَنْذِرْ এর মাধ্যমে। কেননা তার অর্থ হলো মানুষ যদি ভ্রষ্টতা ও গোমরাহি থেকে, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত থেকে, তাঁর সত্তা ও গুণাবলি, অধিকার ও কাজের ক্ষেত্রে অন্যকে শরীক করা থেকে ফিরে না আসে তবে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে ভীতি প্রদর্শন করুন।

দুই. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর নিজের জীবনেও আল্লাহ তাআলার নিদের্শনাবলি বাস্তবায়নের এবং সেগুলো জীবনের পদে পদে আঁকড়ে থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো। যাতে তিনি আল্লাহর রেযামন্দি হাসিল করতে পারেন এবং সমস্ত মুমিনের জন্য পরিণত হতে পারেন মহোত্তম আদর্শে। অবশিষ্ট আয়াতগুলোতে এ কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ এর অর্থ হলো আপনি কেবল তাকেই সুমহান জানুন! তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করেন না। এরপর وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য হলো শরীর ও কাপড়কে পবিত্র করা। কেননা, যে আল্লাহর নামের তাকবীর বলবে এবং তার রবের সামনে দাঁড়াবে সে কখনোই অশুচি আর অপবিত্র হতে পারে না। সুতরাং, আয়াতে বাহ্যিক পবিত্রতার ওপরই যখন এতটা জোর দেওয়া হয়েছে সেখানে শিরক, আখলাক ও আমালের পবিত্রতার ওপর নিঃসন্দেহে আরও বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। এরপর وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْএর অর্থ হলো আল্লাহর অসন্তোষ ও আযাব উদ্রেককর কারণ থেকে

---

১৪০ সহীহ বুখারী: সূরা মুদ্দাসসিরের তাফসীর। প্রথম ও পরবর্তী অধ্যায়, ৮/৪৪৫-৪৪৭। সহীহ মুসলিমের কিতাবুল ঈমানে এমন বর্ণনা রয়েছে ১/১৪৪, হাদীস নং ২৫৭।

দূরে থাকুন! আর এটা সম্ভব একমাত্র তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর নাফারমানি পরিত্যাগ করার মাধ্যমে। আর وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ এর অর্থ হলো : কারও প্রতি এমন কোনো অনুগ্রহ করেন না, যার দ্বারা আপনি মানুষের কাছ থেকে পারিশ্রমিক কিংবা পার্থিব জীবনে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশা করবেন।

সর্বশেষ আয়াতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঐ বালা মুসিবত থেকে সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর কওমের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর পতিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যখন তিনি তাদের মুখালাফাত করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাদেরকে তার শাস্তি ও ফয়সালা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করলেন। এ কারণে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ।

এরপর এ সকল আয়াতগুলোর ভূমিকা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই মহান কাজের জন্য বেছে নিয়ে এবং ঘুম, খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম থেকে জিহাদ ও কষ্ট-সংগ্রামের প্রতি তাকে ঠেলে দিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে যেন ঘোষণা দিয়েছে : يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) । যেন বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি তার নিজের জন্য বেঁচে থাকে জীবনে সে-ই না কেবল আরাম চোখে দেখতে পারে। একটুখানি প্রশান্তির কথা ভাবতে পারে। কিন্তু আপনার মতো যার কাঁধে যিম্মাদারির এক বিশাল বোঝা সে কীভাবে ঘুমাবে? সে কীভাবে একটু সময় আরাম করবে! তুলতুলে নরম বিছানার অন্বেষা কিংবা সুখঘন জীবনধারার আকাঙ্খা সে কীভাবে করবে! যে মহান দায়িত্ব আপনার অপেক্ষায় বসে আছে সেগুলো পালন করার ব্যাপারে সজাগ হয়ে উঠুন! যেই সুবিশাল বোঝা আপনার কাঁধে এসে পড়বে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। কষ্ট-ক্লেশ ও ক্লান্তির জন্য তাকলীফ ও শ্রান্তির জন্য প্রস্তুত হোন। আপনি দাঁড়িয়ে যান। কারণ ঘুম আর বিশ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে। জীবনের ছুটির দিনগুলো ফুরিয়ে গেছে। এখন শুধু রাতের পর রাত বিনিদ্র কাটাতে হবে। একের পর এক জিহাদী অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। তাই আপনি উঠুন! তার জন্য প্রস্তুতি নিন!

সন্দেহ নেই, এগুলো ছিল এমন কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়ানক বাক্য যেগুলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বাহিনীকে প্রশান্ত ঘরের তুলতুলে বিছানার পেলবতা থেকে নামিয়ে তুফান আর দমকা হাওয়ায় ভরা উত্তাল সমুদ্রে ছুঁড়ে মেরেছিল। তাদেরকে অবতারণ করিয়েছিল জীবনের বাস্তব ময়দানে-যেখানে গলাগলি করছিল দ্বন্দ্ব আর সংঘাত। হৈ-হুল্লোড় আর চেঁচামেচি।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। সেই যে একদিন দাঁড়ালেন তারপর থেকে আর কোনো দিনও একটু সময় বসার ফুরসত পেলেন না। সামান্য একটু আরাম কিংবা কোথাও একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেলেন না। তিনি নিজের জন্য কিংবা নিজের পরিবারের জন্য একটা দিন বেঁচে থাকেননি। আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে একবার যে দাঁড়ালেন তারপর আর বসার কথা ভুলে গেলেন। তাঁর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও ভারী বোঝা। এটা ছিল ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় আমানতের বোঝা, গোটা মানবতার বোঝা, গোটা আকীদার বোঝা, জীবনের বিভিন্ন ময়দানে জিহাদ আর সংগ্রামের বোঝা। বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ঘরের বাইরে থেকে দ্বন্দ্বমুখর জীবনের তপ্ত রণাঙ্গনে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। সেই গুরুগম্ভীর নিনাদ শোনার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই প্রলম্বিত সময়ে অন্য কোনো কাজ তাঁর সামনে এসে এ কাজকে ব্যহত করেনি। এর পেছনে সয়ে গেছেন হাজারো কষ্ট ও মুসিবত। আল্লাহ তাআলা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং গোটা মানব জাতির পক্ষ থেকে উত্তম জাযা দান করুন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওতী জীবনের সুদীর্ঘ সময় যে সকল প্রলম্বিত লড়াই আর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, তারই একটি সরল অথচ সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকে যাওয়ার চেষ্টা করব আমরা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে :

ওহীর প্রকারভেদ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনভোর যুদ্ধ-জিহাদ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা এখন ওহীর প্রকারভেদ ও তার স্তর বিন্যাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা বলব। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র.ওহীর স্তর বিন্যাস করেছেন ঠিক এভাবে :

প্রথম স্তর : সত্য স্বপ্ন। আর এটা ছিল তাঁর প্রতি ওহীর সূচনা।

দ্বিতীয় স্তর : সাক্ষাৎ ব্যতীতই ফেরেশতা তাঁর অন্তরে যা কিছু ঢেলে দিতেন। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, রূহুল কুদস আমার মনে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো আত্মাই তার রিযিক পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত মরবে না। সুতরাং, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে অন্বেষণ করো। রিযিক আসতে বিলম্ব করার কারণে তোমরা কখনোই তা অন্যায়ভাবে তালাশ করো না। কেননা, আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমেই আসতে পারে।

তৃতীয় স্তর : কখনো কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করতেন। এরপর তাকে সম্বোধন করে কথা বলতেন। তিনি তার থেকে সেগুলো মুখস্থ করে নিতেন। এ অবস্থায় অনেক সময় সাহাবায়ে কেরাম

তাঁকে দেখতে পেতেন।

চতুর্থ স্তর : ঘণ্টার আওয়াজের ন্যায় তার নিকট ওহী আসত। এটা ছিল আল্লাহর নবীর জন্য সবচেয়ে কঠিন আর কষ্টসাধ্য মুহূর্ত। এ প্রকারের ওহী অবতরণে ফেরেশতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে পুরো মিশে যেতেন এমনকি কনকনে শীতের মধ্যেও রাসূলের কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা ঝরতে থাকত। আর যদি তিনি কোনো সওয়ারীর পিঠে থাকতেন তবে সেটি বসে যেত। একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আ .ইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন সাবেতের রাণের ওপর মাথা রেখে শোয়া ছিলেন। এমতাবস্থায় ওহী এে । তাঁর মনে হচ্ছিল যেন তাঁর রাণ গলে শেষ হয়ে যাবে।

পঞ্চম স্তর : তিনি ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখতে পেতেন। সুতরাং এ অবস্থায় তিনি যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করতেন। এ অবস্থায় ওহী অবর্তীর্ণ হয়েছিল সর্বমোট দুই বার। সূরা নাজমে এর উল্লেখ রয়েছে।

ষষ্ঠ স্তর : সরাসরি আল্লাহ তাআলা মিরাজের রজনীতে যা কিছু স্বীয় বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ইত্যাদি।

সপ্তম স্তরঃ কোনো ফেরেশতার সাহায্য ও মাধ্যম ব্যতিরেকেই আল্লাহর সঙ্গে কথপোকথন করা। যেমনটি হয়েছিল হযরত মূসা বিন ইমরানের ক্ষেত্রে। হযরত মূসা আ. সম্পর্কে এ ঘটনা কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আর আমাদের নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় মিরাজ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস দ্বারা।

কেউ কেউ অষ্টম আরেকটি স্তরের কথাও বলেছেন। আর তা হলো কোনো পর্দা ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা। তবে এ ব্যাপারে উলামায়ে মুতাক্বাদ্দিমীন ও মুতাআখ্খিরীনের মাঝে রয়েছে চরম মতানৈক্য।[১৪১]

[১৪১] দেখুন যাদুল মাআদ ১/১৮।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতমূলক জিহাদের প্রথম পর্ব
অপ্রকাশ্যে দাওয়াত

অপ্রকাশ্যে দাওয়াতের তিন বছর

সূরা মুদ্দাস্‌সিরের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতী কার্যক্রমের উদ্বোধন করলেন। কিন্তু তৎকালীন আরবের পরিবেশ পরিস্থিতি একটু তলিয়ে দেখুন! আরবরা ছিল তখন একটা হিংস্র বর্বর জাতি। দীন ও ধর্ম বলতে তারা কেবল মূর্তি ও প্রতিমা পূজাকেই বুঝত। তাদের কাছে এর বিশুদ্ধতার দলীল ছিল একটিই- তাদের বাপ দাদাদের কাছ থেকে মিরাস সূত্রে তারা এটা পেয়েছিল। আত্মগর্ব আর অহঙ্কার ছিল আরবীয় চরিত্রের প্রধান ভূষণ। এটাকেই তারা উত্তম চরিত্রের মৌলিক শর্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তরবারি ছিল তাদের সকল সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি। যে কোনো তালা খোলার প্রয়োজন হলেই তারা এই চাবির রাজাকে ব্যবহার করত। তা ছাড়া তারা গোটা জাযীরাতুল আরবের ধর্মীয় নেতৃত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছিল। তার প্রধান মারকায দখল করে রেখেছিল। তারা তার অস্তিত্ব রক্ষণাবেক্ষণের ওপর নেগাহবান ছিল। সুতরাং, সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির দাবিই এটা ছিল যে, নতুন এই দাওয়াতী কাজের ধারা লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপনে গোপনেই শুরু করা হবে। যাতে করে এটা মক্কাবাসীদের ওপর বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে দেখা না দেয়।

ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক

মানব প্রকৃতির দাবি ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই নতুন দাওয়াতী পয়গামের কার্যক্রম সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ, পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছেই তুলে ধরা হবে। এ কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকলেন। যার মধ্যেই তিনি কোনো শুভ লক্ষণ দেখতে পেলেন তার কাছেই তাঁর দাওয়াতের কথা তুলে ধরলেন। তবে এটা ছিল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ যাদেরকে তিনি সত্য ও বাস্তবতাকে ভালোবাসত বলে জানতেন। আর তারাও তাকে সত্য ও শুচিতার আদর্শ বলে জানত। সুতরাং, তাদের মধ্য থেকে ঐ সকল লোক-যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানুভবতার ব্যাপারে এবং তাঁর সংবাদ সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো দিনও সন্দেহ কিংবা সংশয়ের দোলাচলে পড়েননি-তারা তাঁর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'অগ্রগামী প্রথম দল' হিসেবে ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করে নিলেন। আর তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ, তাঁর ক্রীতদাস

যায়দ বিন হারেসা বিন শুরাহবীল কালবী,[১৪২] তাঁর চাচাতো ভাই আলী ইবনে আবী তালিব-তিনি তখন একজন বালক ছিলেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিলেন-এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক রা.। এই মহাপ্রাণগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের প্রথম দিনই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

অনন্তর আবু বকর রা. দাওয়াতের কাজে পূর্ণরূপে নিজেকে নিবেদিত করেন। তিনি ছিলেন মানুষের মহব্বত ও ভালোবাসার প্রিয়পাত্র। তাঁর আখলাক আর চরিত্র ছিল উন্নত, মহান। তাঁর ইলম ও প্রজ্ঞা, বাণিজ্য কুশলতা আর হুসনে মুআমালাতের কারণে কওমের লোকেরা যে কোনো প্রয়োজনে তাঁর কাছে ছুটে আসত। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে হৃদয় দিয়ে তাকে ভালোবাসত। তাঁর কওমের যারা তাঁর ওপর পরম আস্থাশীল ছিল, যারা সময়ে সময়ে তাঁর কাছে ছুটে আসত তিনি তাদেরকে ইসলামের পথে ডাকলেন। তাঁর এই দাওয়াতী মেহনতে ইসলাম গ্রহণ করলেন উসমান বিন আফ্ফান আমউবী, যুবায়ের বিন আওয়্যাম আসাদী, আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস যাহরিয়ান ও তালহা বিন উবাইদুল্লাহ তায়মী রা.। দুনিয়ার সকল মানুষের আগে ইসলাম গ্রহণকারী উল্লিখিত আটটি মহাপ্রাণই ছিলেন ইসলামের প্রথম কাফেলা। ইসলাম-রবির প্রথম আলোর ছটা।

এরপর তাদের একই পথ ধরে এগুলেন বনু হারিস বিন ফিহরের আমীনুল উম্মাহ আবু উবাইদা আমির বিন জাররাহ রা.,[১৪৩] আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযূমী, তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামা, আরকাম বিন আবু আরকাম মাখযূমী, উসমান বিন মাজঊন জুমহী, তাঁর দুই ভাই কুদামা ও আব্দুল্লাহ, উবাইদা বিন হারিস ইবনে মুত্তালিব বিন আবদে মানাফ, সাঈদ বিন যায়েদ আদাবী, তাঁর স্ত্রী উমর বিন খাত্তাবের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব বিন আরত তাইমী, জাফর বিন আবু তালিব, তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স, খালিদ বিন সাঈদ বিন আস উমাবী, তাঁর স্ত্রী আমিনা বিনতে খালফ, অনন্তর তাঁর ভাই আমর বিন সাঈদ বিন আস, হাতিব বিন হারিস জুমহী, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুজাল্লিল ও তাঁর ভাই খাত্তাব বিন হারিস, তাঁর স্ত্রী ফুকাইহা বিনতে ইয়াসার, তাঁর ভাই মা'মার বিন হারিস, মুত্তালিব বিন আযহার যুহরী, তাঁর স্ত্রী রমলা বিনতে আবু আউফ, নুআইম

---

[১৪২] তিনি বন্দী ও গোলাম হয়ে এসেছিলেন। খাদীজা রা. ছিলেন প্রথমে তাঁর মালিকা। এরপর তিনি রাসূলে কারীম সা. এর হাতে তাকে দান করে দেন। তাঁর পিতা ও চাচা তাকে আত্মীয় স্বজনের কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য এলে তিনি তাদের ওপর আল্লাহর রাসূল কে প্রাধান্য দেন। রাসূলে কারীম সা. তখন তাকে আরবের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এ কারণে বলা হতো যায়দ বিন মুহাম্মাদ। পরে ইসলাম এসে পালক পুত্রের প্রথা বাতিল ঘোষণা করে। তিনি অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তিনিই ছিলেই সেই বাহিনীর সিপাহসালার।

[১৪৩] তাকে এ উপাধিতে ভূষিত করার কারণ দেখুন সহীহ বুখারীঃ মানাকিবে আবী উদাইদা ইবনুল জাররাহ রা. ১/৫৩০।

বিন আব্দুল্লাহ বিন নুহাম আদাবী রা.। তারা সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের বিভিন্ন শাখা গোত্র ও কবীলার অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামের এই প্রথম কাফেলায় কুরাইশ ছাড়া অন্যান্য গোত্রের ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ হুজালী, মাসঊদ বিন রবীআ ক্বারী, আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ আসাদী ও তার ভাই আবু আহমাদ বিন জাহাশ, বেলাল ইবনে রাবাহ হাবশী, সুহাইব বিন সিনান রূমী, আম্মার বিন ইয়াসির আনাসী ও তার ভাই ইয়াসির, তার মা সুমাইয়্যা, ও আমির বিন ফুহাইরা রা.।

ওপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা ব্যতীত নারীদের মধ্য থেকে ইসলামের প্রাথমিক কাফেলায় ছিলেন উম্মে আয়মন বারাকাহ হাবশিয়্যা, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মে ফযল লুবাবা কুবরা বিনতে হারিস হিলালিয়্যা ও আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রা.।[১৪৪]

এই মহাপ্রাণ মানুষগুলো ইতিহাসে 'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক' নামে প্রসিদ্ধ। ইতিহাস ও সীরাতগ্রন্থগুলো অধ্যয়ন ও গবেষণা করে দেখা যায়, এ ধরনের মহাপ্রাণের সংখ্যা ছিল নারী-পুরুষ সব মিলিয়ে ২৩০ জন। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে, তারা কি প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, না ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ার পরে?

নামায

ইসলামের সকল হুকুম-আহক্বামের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের ব্যাপারে নির্দেশ এসেছিল। হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, ইসরা ও মিরাজের পূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম নামায পড়তেন-এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। কিন্তু মতানৈক্য যে জায়গাটিতে তা হলো-পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে অন্য কোনো নামায ফরয হয়েছিল কি না। কারও কারও মতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে প্রতিদিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে একটি বিশেষ নামায ফরয ছিল। অপরদিকে হারিস বিন আবু উসামা ইবনে লাহীয়ার সূত্রে যায়দ বিন হারিসা থেকে বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ওহী নাযিল হলো তখন হযরত জিবরাঈল আ. তাঁর নিকট আগমন করলেন। তারপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অজু শিক্ষা দিলেন। যখন তিনি উযূ করে শেষ করলেন তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। ইবনে মাজাহ থেকেও এর কাছাকাছি রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। বারা ইবনে আযিব এবং ইবনে আব্বাস রা. থেকেও এ ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এর পাশাপাশি ইবনে আব্বাসের হাদীসে পাওয়া যায়: এটা ছিল প্রাথমিক সময়ে অবতীর্ণ ফরয নামাযের একটি।[১৪৫]

---

[১৪৪] বিস্তারিত দেখুন সীরাতে ইবনে হিশাম ১/২৪৫-২৬২।

[১৪৫] শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত 'মুখতাসারুস সীরাহ' পৃষ্ঠা ৮৮।

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, যখন নামাযের সময় হতো তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নির্জন পাহাড়ের গুহায় চলে যেতেন এবং সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায আদায় করতেন। একদিন আবু তালিব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী রা. কে নামায আদায় করতে দেখলেন। এরপরে তাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বললেন। যখন তিনি মূল বিষয়টি বুঝতে পারলেন তখন তাদেরকে এ কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। [১৪৬]

এ সময় মুমিনগণ কেবল এই ইবাদত করতেই আদিষ্ট হয়েছিলেন। নামায ব্যতীত এ সময়ে তাদের জন্য অন্য কোনো ইবাদত কিংবা বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অনবরত অবতীর্ণ ওহী তাদের নিকট তাওহীদের বিভিন্ন দিক ও রূপরেখা তুলে ধরছিল। আত্মশুদ্ধির প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করছিল। মহোত্তম চরিত্র-মাধুর্যের প্রতি তাদেরকে প্রলুব্ধ করে তুলছিল। তাদের সামনে জান্নাত আর জাহান্নামের কথা এমনভাবে তুলে ধরছিল, যেন জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের খোলা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। তাদেরকে এমন সুন্দর ও অমূল্য উপদেশমালা দিয়ে যাচ্ছিল, যা তাদের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ারকে খুলে দিত। তাদের প্রাণে সতেজতা আর আত্মায় পুষ্টি যোগাত। তৎকালীন যেই মানব সমাজে তারা বাস করতেন সেখান থেকে ভিন্ন এক দুনিয়ায় তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছিল। এ ছিল এক নতুন দুনিয়া। ইতঃপূর্বে পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে যার কোনো ঠিকানা ছিল না।

এভাবেই কেটে গেল তিনটি বছর। কিন্তু দাওয়াতের কার্যক্রম তখনো ব্যক্তি সীমাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। আরবের সভা-সমিতি আর হাট-বাজারে তখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতকে প্রকাশ্যে তুলে ধরেননি। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর কথা জেনে গিয়েছিল। মক্কার প্রতিটি অলি গলিতে আর পথে প্রান্তরে ইসলামের আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছিল। তা মানুষের কথা-বার্তা আর আলোচনা-পর্যালোচনার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু কেউ কেউ কখনো কখনো তার চরম বিরোধিতা করেছিল। কোনো কোনো মুমিনের ওপর তারা সীমালঙ্ঘন আর বাড়াবাড়ি করছিল। এ সবকিছুর পরও এ ব্যাপারে তখনও তারা ততটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কারণ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো তাদের ধর্মের পথে না কোনো দিন বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আর না তাদের সে ব্যাপারে কোনো দিন কোনো মতামত কিংবা মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন ।

---

[১৪৬] ইবনে হিশাম ১/২৪৭। মুসনাদে আবূ দাউদ ত্বায়ালেসীর ২৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে হাদীস রয়েছে।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতমূলক জিহাদের দ্বিতীয় পর্ব
প্রকাশ্যে দাওয়াত

প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার প্রাথমিক ঘোষণা

ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে যখন মুসলমানদের একটি দল গঠিত হলো এবং রিসালতের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলো তখন আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রকাশ্যে দাওয়াতী মিশন পরিচালনার এবং ভালোর দ্বারা খারাপের মুকাবেলা করার নির্দেশ দিয়ে ওহী নাযিল করেন।

এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (আর আপনি ভীতিপ্রদর্শন করুন আপনার নিকটাত্মীয় স্বজনদেরকে)। [সূরা শুআরা:২১৪]। এটি হলো সূরা শুআরার আয়াত। এই সূরায় বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সকলের আগে এসেছে নবী মূসা আ. এর কাহিনী। এটি শুরু হয়েছে নবুওত দিয়ে আর শেষ হয়েছে বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত দিয়ে। সঙ্গে রয়েছে ফেরাউন ও তার কওম থেকে তাদের মুক্তি এবং ফেরাউন ও তার কওমের ভরাডুবির কাহিনী। মোটকথা, ফেরাউন ও তার কওমের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত প্রচার করতে গিয়ে নবী মূসা আ. যে সকল মনযিলে উপনীত হয়েছিলেন এর সবগুলোই এই কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রকাশ্যে দীনি দাওয়াতের কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি অতীত যুগের এ সকল কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ এ জন্যই দেওয়া হয়েছে, যাতে করে এগুলো তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ চালাতে গিয়ে যে সকল জোর-জুলুম আর অত্যাচারের সম্মুখীন হবেন সেগুলোর উপমা ও দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে এবং গোড়া থেকেই তারা তাদের কাজের ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন থাকেন।

অন্য দিক দিয়ে এই সূরাটি আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণকে যারা মিথ্যাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের চরম পরিণতির কথাও আমাদেরকে বলে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ এ ক্ষেত্রে কওমে নূহ, আদ, সামূদ, কওমে ইবরাহীম, কওমে লূত এবং আসহাবুল আইকার কথা উল্লেখ করা যায়। এর কারণ হলো-যাতে করে ভবিষ্যতে যারা তাদেরকে আত্মম্ভরিতার বলে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে ও তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করবে তারা আগ থেকেই জেনে নেয় তাদের কুকীর্তির ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা। সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন এটাও বুঝে নেয় যে, যদি

তাদের কুকর্মের এই স্রোতধারা অব্যাহত গতিতেই চলতে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কত ভয়াল তরীকায় পাকড়াও করবেন। আর মুমিনগণও যেন উপলব্ধি করে যে, উত্তম পরিণতি বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নয়; বরং তাদের জন্য।

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দাওয়াত

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু হাশিম গোত্রের নিজ আত্মীয়-স্বজনকে এক জায়গায় ডাকলেন। সুতরাং, তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে সাড়া দিয়ে এক জায়গায় একত্রিত হলো। বনু মুত্তালিব বিন আবদে মানাফের একটি দলও ছিল তাদের সঙ্গে। তারা ছিল পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের উদ্দেশে কথা বলার ইচ্ছা করলেন তখন আবু লাহাব তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতে লাগল: এরা তোমার চাচা ও চাচাতো ভাইদের বংশ। সুতরাং, তুমি ভণিতার আশ্রয় না নিয়ে যা বলার সরাসরি বলে ফেলো। গোটা আরবের তামাম কবীলার মুকাবিলা করার ক্ষমতা তোমার কওমের নেই। আর তোমার হাত ধরার ব্যাপারে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশি হক্বদার। সুতরাং, তখন তোমার চাচাতো ভাইয়েরাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যদি তুমি তোমার পথেই হাঁটতে থাকো তবে তাদের জন্য তোমাকে দমনের পথ বের করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। কুরাইশের কবীলাগুলো তোমার ওপর আক্রমণ করবে। আর এ ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে আরবের তামাম কবীলা। আর তখন আমার জানা থাকবে না গোটা বিশ্বে তোমার চেয়ে আগে বেড়ে নিজ বাপ-দাদার বংশের ধ্বংস আর বিলুপ্তির জন্য অন্য কেউ এত দাপাদাপি করেছে কি না! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নীরবতা অবলম্বন করলেন। তাঁর যবান মুবারক থেকে একটি কথাও বের হলো না।

এরপর দ্বিতীয় আরেকদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করলেন। তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমি তাঁর প্রশংসা করি আর তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাকে আমি বিশ্বাস করি আর তাঁর ওপর ভরসা করি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই, এক আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর তিনি বললেন, কোনো কওমের অগ্রদূত কিংবা প্রতিনিধির জন্য সেই কওমের সঙ্গে মিথ্যা কিংবা প্রতারণা করার নিয়ম নেই। আর আল্লাহ তো ঐ মহান সত্তা; যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি বিশেষভাবে তোমাদের নিকট আর ব্যাপকভাবে গোটা দুনিয়াবাসীর নিকট আল্লাহর রাসূল স্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহর কসম! তোমরা যেভাবে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ো ঠিক সেভাবে একদিন মৃতুর কোলেও ঢলে পড়বে। আবার ঘুম থেকে তোমরা যেমন জেগে ওঠো ঠিক তেমনিভাবে কবর

থেকে তোমরা একদিন পুনরুত্থিত হবে। তখন তোমাদের পৃথিবীতে যা কিছু করতে এর সবকিছুর হিসাব দিতে হবে। হয়তো চিরকাল জান্নাতে থাকবে নয়তো জাহান্নামে।

তখন আবু তালিব বলে উঠল, আমরা তোমাকে সাহায্য করতে কতটা ভালোবাসি, তোমার কথা ও উপদেশ আমরা মেনে নিতে কতটা আগ্রহবোধ করি এবং আমরা তোমার কথা ও অদৃশ্য সংবাদ কতটা সত্যায়ন করি এ ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। এই তোমার বাপ-দাদার বংশধর। আর আমিও তাদেরই একজন। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, তোমার ইচ্ছা ও ইরাদার পূর্ণতার ক্ষেত্রে আমার অবস্থান সবার আগে। সুতরাং, তোমার পথে তুমি অব্যাহত গতিতে সামনে বাড়তে থাকো। আল্লাহর কসম! আমি সব সময় তোমার পাশে থাকবো। পৃথিবীর সকল বিপদ-আপদ থেকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তোমার সুরক্ষা আমি নিশ্চিত করব। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মকে ছেড়ে দিতে আমার মন কখনোই সায় দিবে না।

তার এ কথা শুনে আবু লাহাব বলল, আল্লাহর শপথ! এটা একটা ইতরামি বটে! অন্য কেউ তাঁর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার আগে বেলা থাকতে তোমরাই পরিয়ে দাও।

আবু তালিব তাকে বলল, যতদিন হায়াত আছে ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই তাঁর যথাযথ হেফাযত করে যাব।[১৪৭]

সাফা পাহাড়ে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর রবের দিকে দাওয়াতী মিশনের ক্ষেত্রে আবু তালিবের পক্ষ থেকে হেফাযত ও হেমায়াতের নিশ্চয়তা পেলেন তখন একদিন সাফা পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তিনি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন সাফা পাহাড়ের শানুদেশের সবচেয়ে উঁচু পাথরের ওপর। মেঘছোঁয়া এই শূন্যতার উদার বুকে এরপরে তিনি ছড়িয়ে দিলেন তাঁর গুরুগম্ভীর ঘোষণা: ইয়া সাবাহাহ! (জাহেলী যুগের আরবরা কোনো শত্রু সেনার উপস্থিতি কিংবা বিভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বুঝাতে চাইলে পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে এই বাক্য উচ্চারণ করত)।

এরপর তিনি কুরাইশের সকল শাখা-গোত্রকে ডাকতে শুরু করলেন। প্রত্যেকটি শাখা গোত্রের নাম ধরে ধরে আহ্বান করতে লাগলেন। হে বনু ফিহির! হে বনু আদী! হে বনু অমুক! হে বনু অমুক! হে বনু আবদে মানাফ! হে বনু আব্দুল মুত্তালিব!

---

[১৪৭] ইবনুল আসীর প্রণীত 'কামিল' ১/৫৮৪,৫৮৫।

যখন মানুষের কানে গিয়ে এ আওয়াজ পড়ল তখন পরস্পর বলাবলি করতে লাগল এ আওয়াজ কার? অন্যরা বলল মুহাম্মাদের। নামটি শুনতেই তারা দলে দলে বেরিয়ে পড়ল। এমনকি কেউ কেউ নিজে উপস্থিত হতে না পেরে ব্যাপারটি জানার জন্য দূত পাঠিয়ে দিলো। এক সময় কুরাইশরা সবাই এলো। সঙ্গে এলো আবু লাহাবও।

যখন সবাই একত্র হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলের উদ্দেশে বলতে লাগলেন:

'আমি যদি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেই যে, এই পাহাড়ী উপত্যকার পাদদেশে একদল ঘোড়সওয়ার শত্রুসেনা তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে তবে তোমরা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

সবাই একবাক্যে বলল, হাঁ। কারণ আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি! সত্য বৈ আপনি কখনো মিথ্যা বলেননি!!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'আমি তোমাদের জন্য আসন্ন এক ভয়ঙ্কর শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকারী। আমার ও তোমাদের উপমা হলো ঐ ব্যক্তি মত, যে শত্রুকে দেখে তার কওমের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ছুটে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে বুঝতে পারল তার কওমকে গিয়ে সতর্ক করার আগেই দুশমনের বাহিনী তাদের ওপর হামলা করে বসবে। তাই সে এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে তার কওমকে ডাকতে লাগল 'ইয়া সাবাহাহ' বলে।**

এরপর তিনি তাদেরকে সত্যের পথে ডাকলেন। আল্লাহর আযাব থেকে তাদেরকে ভয় দেখালেন। ব্যাপকভাবে সকলকে উদ্দেশ করে যেমন বললেন, তেমনিভাবে বিশেষ ভাবে নাম ধরে ধরেও অনেককে সম্বোধন করলেন:

হে কুরাইশ বংশ! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহর থেকে আমি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি কোনোটিই করার ক্ষমতা রাখি না। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীতে আমি তোমাদের কিছুই করতে পারব না।

হে বনু কা'ব বিন লুয়াই! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কেননা, আমি তোমাদের লাভ-ক্ষতি কোনোটিই করতে পারব না।

হে বনু মুররাহ বিন কা'ব! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

হে বনু কুসাই! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা, আমি তোমাদের লাভ কিংবা ক্ষতি কোনোটিই করতে পারব না।

হে বনূ আবদে মানাফের গোষ্ঠী! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা, আমি আল্লাহর থেকে তোমাদের উপকার কিংবা অপকার

কোনোটিই করতে সক্ষম নই। আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

হে বনু আবদে শামছ! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ।

হে বনু হাশিম! নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।

হে বনু আবদিল মুত্তালিব! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। কেননা, আমি তোমাদের লাভ ক্ষতি কোনোটিই করতে পারব না। আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্য কোনোই কাজে আসব না। তোমরা আমার কাছে আমার ধন সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

হে আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না।

হে রাসূলের ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আমি তোমার জন্য কিছুই করতে সক্ষম নই।

হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার সহায় সম্পত্তি থেকে যা মন চায় তুমি চেয়ে নাও। কিন্তু নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কেননা, আমি তোমার উপকার অপকার কোনোটিই করতে পারব না। আল্লাহর কাছে তোমার জন্য আমার কিছুই করার অধিকার নেই। তবে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের বাঁধন রয়েছে সে কারণে আমি সে বাঁধন স্নেহ আর ভালোবাসার শীতল রসে সতত অভিষিক্ত রাখি।

উপস্থিত লোকগুলো তখন ভড়কে উঠেছিল। এ ঘোষণা শেষ হওয়ার পরে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কোনো টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত তাদের কারও মুখে শোনা গেল না। একটি জবাবও কেউ দিলো না। কিন্তু আবু লাহাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বেয়াদবি করল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, তোমার সমস্ত দিন ধ্বংস হোক! এ জন্যই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছিলে? আল্লাহ তাআলা তার কথার প্রতিউত্তরে আয়াত নাযিল করলেন: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ধ্বংস হয়েছে আবু লাহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও .. .. । [সূরা মাসাদ]।[১৪৮]

জাবালে সাফার গুরুশিখরে দাঁড়িয়ে সমুন্নত আকাশের উদার বক্ষে দুই হাত প্রসারিত করে অভ্রভেদী এই মহানাদ ছিল তাওহীদের পয়গাম মানুষের কাছে

[১৪৮] সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৭৫৩, ৩৫২৫-৪৭৭১। ফাতহুল বারী ৫/৪৪৯, ৬/৬৩৭, ৮/৩৬০। সহীহ মুসলিম ১/১১৪। জামেউত তিরমিযী: সূরা শুআরার তাফসীর ৫/৩১৬, ৩১৭, হাদীস নং ৩১৮৪-৩১৮৬ ইত্যাদি।

পৌঁছে দেওয়ার চরম ও পরম সীমান্ত। কেননা তিনি এভাবে তাঁর নিকটাত্মীয়দের কাছে এই শাশ্বত সত্য বিষয়টি বড় স্পষ্ট করে তুলেছিলেন যে, তাঁর আনীত এই পয়গামের সত্যায়নই হলো তাঁর ও তাদের মাঝে সম্পর্কের আত্মা ও প্রাণ; ভালোবাসার সেতু বন্ধন ধরে রাখার মূল চাবিকাঠি। সুতরাং, যদি এর সত্যায়নই না হয় তবে তাদের সকল সম্পর্ক প্রাণহীন লাশ হয়ে পড়বে। তিনি তাদেরকে আরও জানান দিয়ে দিলেন যে, আরব জাতি এতদিন পর্যন্ত আত্মীয়তা আর গোষ্ঠী সম্পর্কের যে বাঁধন ধরে রেখেছিল এতক্ষণে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই ঘোষণার তেযে গলে শেষ হয়ে গেছে।

মক্কার অলিতে গলিতে আর পর্বতের গিরি-কন্দরে তখনো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল এ আওয়াজ; ঠিক এমন সময় অবতীর্ণ হয় আল্লাহর বাণী : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ. আপনাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনি তাই-ই প্রকাশ করুন! আর মুশরিকদের থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। [সূরা হজর : ৯৪]

এরপর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার প্রতিটি-সভা সমিতি আর হাট-বাজারে মানুষকে প্রকাশ্যে বুলন্দ কণ্ঠে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন। তাদেরকে আল্লাহর কালাম পাঠ করে শুনাতে লাগলেন। তাদেরকে বুঝাতে লাগলেন হুবহু ঐ ভাষায় যে ভাষায় তাঁর আগের আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণ নিজ নিজ কওমের মানুষগুলিকে বুঝিয়ে ছিলেন: فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। [সূরা আরাফ : ৫৯] তাদের চোখের সামনে আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে কাবার খোলা আঙিনায় নামায আদায় শুরু করলেন।

দিন দিন তাঁর এ দাওয়াত আরও ব্যাপকতা লাভ করতে লাগল। মানুষ একের পর এক দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগল। মক্কার অলিতে গলিতে হেদায়াতের এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। মক্কাবাসীদের দিল দরিয়ায় প্রচণ্ড এক তুফান এলো। পাহাড় সমান ঊর্মিমালা আছড়ে পড়তে লাগল এর কূলে কূলে। হাজার হাজার বছর ধরে এক ফোঁটা পানি বঞ্চিত আরব মরুতে এবার বয়ে চলল হেদায়াতের এক উত্তরঙ্গ সালসাবিল। ছলছল উচ্ছল তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। পঙ্গপালের মতো মাওলা-পাগল মানুষগুলো উন্মাদ হয়ে এসে পড়তে লাগল তার গায়ে। একই পরিবারের যারা ঈমান আনল আর যারা ঈমান আনল না তাদের মাঝে রাতারাতি গড়ে উঠল এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। শুরু হলো হিংসা বিদ্বেষ

আর রেষারেষি। কুরাইশরা রাগে আর ক্রোধে বিড়বিড় করতে লাগল। তাদের চোখের সামনে হরদম সর্ষে ফুল ফুটতে লাগল। চোখে দেখল তারা অনিঃশেষ অন্ধকার।

দাওয়াত শোনা থেকে হাজীদেরকে নিবৃত্ত রাখার জন্য পরামর্শ-সভা

প্রকাশ্যে দাওয়াতী কার্যক্রমের শাশ্বত এই ধারা তখন দিনরাত পুরোদমে চলছিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েম মাস যেতে না যেতেই মক্কায় হজ্জের মৌসুম কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। আর ঠিক তখনই কুরাইশ কাফেরদের হতাশা আর বঞ্চনা ঘেরা অন্ধকার হৃদয়াকাশের এক কোণে নতুন আশার নতুন চাঁদের এক নতুন ঝিলিক দেখা গেল। তারা আগ থেকেই জানত, এখন গোটা দুনিয়ার মানুষ তাদের কাছে আসবে। হয়তো মুহাম্মাদের কথাও শুনবে। তাই এমন কোনো রাস্তা বের করা এখন সময়ের দাবি ও অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যার মাধ্যমে মক্কায় আগত সকল হাজীকে মুহাম্মাদের দাওয়াত ও তাঁর আহ্বান শোনা থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তের জন্য তারা ওলীদ বিন মুগীরার কাছে এসে উপস্থিত হলো। ওলীদ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের সকলে মিলে সর্বসম্মতিতে একটি সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হতে হবে। নতুবা তোমরা নিজেরাই যদি পরস্পরবিরোধী কথা বলো তবে তোমাদের কথা বলারই কোনো সুযোগ থাকবে না। উপস্থিত সকলে বলল, তবে আপনিই বলা শুরু করুন! আমাদের জন্য এমন একটি সিদ্ধান্ত দিন, যা হবে আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত এবং আমরা যা মেনে নিতে পারি। কিন্তু ওলীদ বলল, বরং তোমরাই বলো। আমি বসে বসে তোমাদের কথা শুনি। তারা বলল আমরা তাকে জ্যোতিষী বলব। সে বলল, আল্লাহর শপথ! সে কোনো দিনও জ্যোতিষী হতে পারে না। জ্যোতিষীদের বিড়বিড় মন্ত্র কিংবা ছন্দবদ্ধ কবিতার কোনো ছত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার ভেতরে পাওয়া যাবে না। তারা বলল, তবে আমরা তাকে পাগল বলব। ওলীদ বলল, সে পাগলও নয়। পাগলদের আমি খুব ভালো করেই চিনি। তাদের পাগলামি, উল্টা-সিধা চলাফেরা আর অনর্থক বকবকানি আমি অনেক শুনেছি। এবার তারা বলল, তবে আমরা তাকে কবি বলব। সে বলল, মুহাম্মাদ কবিও নন। জীবনে বহু কবিতা দেখেছি। কবিতার যত ঢঙ আর রঙ রয়েছে সবগুলো উপভোগ করেছি। কিন্তু সে যা বলে তার একটি লাইনও কবিতা নয়। তারা বলল, তবে তাকে বলা যায় যাদুকর। ওলীদ বলল, সে জাদুকরও নয়। কারণ আমি বহু জাদুকর আর তাদের জাদু দেখেছি। সে জাদুকরদের মতো ঝাড়-ফূঁক করে না কিংবা গিরা লাগায় না। তখন তারা অনেকটা কৌতূহলী হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তবে আমরা তাকে কী বলব? ওলীদ বলল, আল্লাহর শপথ! তাঁর

কথায় রয়েছে এক পরম মিষ্টতা। তাঁর গোড়ায় রয়েছে এক প্রচণ্ড শক্তি ও মজবুতি। আর তাঁর শাখা-প্রশাখায় রয়েছে ফুল আর ফলের ছড়াছড়ি। তোমরা এগুলির মধ্য থেকে তাকে যা-ই বলো মানুষ নিশ্চিত বুঝে ফেলবে এটা একেবার ঝুঁট ও মিথ্যা। তবে তোমরা তাকে যাদুকর বলে কিছুটা সুবিধা করতে পারো। তোমরা তাঁর সম্পর্কে মানুষকে বলতে পারো, সে একজন যাদুকর। সে যাদু নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। তাঁর এই যাদুময়ী কথার মাধ্যমে সে স্বামী-স্ত্রী আর মাতা-পিতা, ভাই-বোন আর আত্মীয়-স্বজনের মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দেয়। বিভেদের আগুন উস্কে দেয়। সুতরাং, তোমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকো!!![১৪৯]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, ওলীদ যখন তাদের সকল প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল তখন তারা তাকে বলল, তবে এবার আপনি আপনার মতামত পেশ করুন। ওলীদ তাদেরকে বলল, আমাকে কিছু সময় সুযোগ দাও। এ নিয়ে আমাকে খানিকটা ভেবে দেখতে হবে। এরপরে ওলীদ ডুবে গেল চিন্তার অকূল পাথারে। বিষয়টি কোনো একটা কূল কিনারা করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল। এক সময় পেয়ে গেল কাঙ্খিত মতামত। ইতঃপূর্বে আমরা তা উল্লেখ করেছি। এই ওলীদ সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের সূরা মুদ্দাসসিরের ১১ থেকে ২৬ পর্যন্ত মোট ষোলটি আয়াত নাযিল করেন। তার চিন্তা-ফিকির আর সন্ধানী মানসিকতার বিশ্লেষণ দেন মহান আল্লাহ তাআলা ঠিক এভাবে : إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. সে চিন্তা করেছে এবং মনস্থির করেছে, ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে, আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনস্থির করেছে। সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহঙ্কার করেছে। এরপর বলেছেঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। [সূরা মুদ্দাসসির]

কাফেরদের সভায় যখন এ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো তখন সবাই এর বাস্তবায়নে কোমর বেঁধে নামল। হাজীরা যখন হজ্জের মৌসুমে মক্কায় আসতে লাগল তখন তারা তাদের পথের গোড়ায় গোড়ায় আসন পেতে বসে পড়ল। যে কেউ তাদের পাশ দিয়ে গমন করত তারা তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

---

[১৪৯] ইবনে হিশাম ১/২৭১। বাইহাকী ও আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে সতর্ক করে দিত এবং তাদেরকে তার কথা মনে করিয়ে দিত।[১৫০]

অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে দাওয়াতী কাজের ধারা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উকায, মাজান্না ও যুল মাজায বাজারে তাওহীদের দোকান খুলেছিলেন। হরদম মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে চলছিলেন। আর আবু লাহাব তাঁর পেছনে পেছনে বলে যাচ্ছিল, তোমরা তাঁর অনুসরণ করো না। কেননা সে একটা মিথ্যুক, ধর্মত্যাগী।[১৫১]

এর ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মানুষ নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। কিন্তু তাদের মনের দিগন্তে বার বার উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতের দাবির কথা। এভাবে গোটা আরবের বিস্তৃত অঞ্চলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা ছড়িয়ে পড়ল।

দাওয়াত বন্ধের বিভিন্ন ফন্দি

কুরাইশরা যখন দেখল যে, হজ্জের সময় তাদের পাকানো কৌশল বিশেষ কোনো কাজে আসেনি তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতকে তার শৈশবেই গলা টিপে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে লাগল। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করছি:

এক. ঠাট্টা-বিদ্রূপ, খেল-তামাশা ও মশকরা

তারা মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও মানহানির নিমিত্ত, তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ফতুর করে দেওয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে এ সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করে। অশ্লীল গালি-গালাজের পাহাড় রচনা করে। কখনো তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পাগল বলে ডাকে। وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ. তারা বলল: হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। [সূরা হিজর : ৬] আবার কখনো তাকে জাদুকর ও মিথ্যুক সাব্যস্ত করে। وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক

---

[১৫০] ইবনে হিশাম ১/২৭১।

[১৫১] মুসনাদে আহমদ ৩/৪৯২, ৪/৩৪১। দেখুন আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৭৫। কানযুল উম্মাল ১২/৪৪৯, ৪৫০।

মিথ্যাচারী যাদুকর। [সূরা সোয়াদ :.৪]। চলতি পথে তাদের কারও সঙ্গে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ হতো তাদের চেহারা থেকে বিদ্বেষ আর প্রতিশোধের জ্বলন্ত আগুনের উদ্ভট ধূম্রকুণ্ডলী বের হতে দেখা যেত। তাঁর আগে পিছে তাদের হরহামেশা এমন অবাধ যাতায়াতের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। وَإِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ. কাফেররা যখন কুরআন শোনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল। [সূরা ক্বলম:৫১]। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো মজলিসে বসা থাকতেন আর তাঁর চারপাশে তাঁর পার্থিব যিন্দিগির হতদরিদ্র ও গরিব সাহাবায়ে কেরাম গোল হয়ে নির্বাক ও নির্বিকার বদনে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন তখন তারা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করত। তারা বলত : أَهٰؤُلَاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا তাঁর সঙ্গী হলো এমন সব লোক, যাদেরকে আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন? [সূরা আনআম : ৫৩] আল্লাহ তাআলা বলেন, أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِيْنَ, আল্লাহ্ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত নন? সূরা আনআম:৫৩)। তাদের এই জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْا إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَضَالُّوْنَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حَافِظِيْنَ (٣٣) যারা অপরাধী তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত। এবং তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পর চোখ টিপে ইশারা করত। তারা যখন তাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত : নিশ্চয়ই এরা বিভ্রান্ত। অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি। [সূরা আত তাতফীফ : ২৯-৩৩]

দিনে দিনে তাদের ঠাট্টা-মশকরা আর উপেক্ষার মাত্রা বেড়েই চলছিল। এতদিন ধরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু মুখ বুঁজে সহ্য করে আসছিলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয়ে গিয়ে আঘাত হানে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ আমি জানি যে, আপনি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। [সূরা হিজর:৯৭]। এরপরে আল্লাহ তাআলা তাকে

সান্ত্বনা দিলেন এবং তাঁর হৃদয় থেকে হতাশা দূর করার ব্যবস্থা করলেন ঠিক এভাবে: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (٩٩) অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে। [সূরা হিজর ৯৭-৯৯]। তা ছাড়া আল্লাহ পাক আগেই তাঁর হাবীবকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, তিনি ঠাট্টা ও বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর জন্য যথেষ্ট হবেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ (٩٥) اَلَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٩٦) বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতি সত্বর তারা জেনে নেবে। [সূরা হিজর : ৯৫-৯৬]। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ধৈর্য ধরতে বললেন এবং তাকে আরও জানিয়ে দিলেন যে, কাফের মুশরিকদের এ সকল কাজ অতিশীঘ্রই ভারী বোঝা হয়ে তাদের ঘাড়েই চেপে বসবে। ইরশাদ হচ্ছে, وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِئُوْنَ. নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। [সূরা আনআম : ১০]

দুই. সন্দেহ-সংশয় ও গণমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

তারা আরও সামনে এগুলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও নও মুসলিম সাহাবায়ে কেরামকে হতাশ করার জন্য, তাদের সামনের রাস্তা অন্ধকার করার জন্য তারা নিত্য নতুন অনেক ফন্দি আঁটল। ধীরে ধীরে আরব সমাজে এগুলোর ভীড় এত পরিমাণ বেড়ে গেল যে, মানুষের জন্য তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা কিংবা ফিকির করার কোনো ফুরসতই রইল না। যেমন তারা কুরআন সম্পর্কে বলত أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ অলীক স্বপ্ন [সূরা আম্বিয়া:৫] যা মুহাম্মাদ রাতের বেলায় ঘুমের ঘোরে দেখে আর দিনে তা মানুষের নিকট ওহী বলে চালিয়ে দেয়। তারা আরও বলত, بَلِ افْتَرَاهُ না; বরং এটা মুহাম্মাদের নিজের রচনা। তারা বলত, إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ তাকে তো একজন মানুষ শিক্ষা দেয়। তারা আরও বলত وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا إِفْكُ نِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُوْنَ কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে

وَقَالُوٓا۟ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. সাহায্য করেছে। [সূরা ফুরক্বান : ৪]। তারা বলে, এগুলো তো প্রাচীনকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে লিখিয়ে দেওয়া হয়। [সূরা ফুরক্বান : ৫]

আবার মাঝেমধ্যে তারা বলত জ্যোতিষী ও গণকদের কাছে যেমন জিন ও শয়তান আসা যাওয়া করে ঠিক তাঁর কাছেও জিন কিংবা শয়তান আসা যাওয়া করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এই অচিন্তিত দাবিকে অসার সাব্যস্ত করে বলেন, هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢), আমি কি আপনাকে বলব? কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহ্গারের উপর। [সূরা শুআরা:২২১-২২২]।

অর্থাৎ, শয়তান তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক পাপাচারী, ফাসিক, যালিম ও মিথ্যুকের ওপর। অথচ, তোমরা কোনো দিনও আমাকে মিথ্যা বলতে দেখনি। কখনো আমার মধ্যে তোমরা পাপাচার খুঁজে পাওনি। তাহলে কুরআনে কারীমকে তোমরা কীভাবে শয়তানের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলার দুঃসাহস দেখাও?

কখনো কখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তারা বলত, তাঁর ভেতরে এক ধরনের পাগলামি রয়েছে। সে তাঁর মনে মনে বিভিন্ন কথা ও বক্তব্য সাজায়। পরবর্তী সময়ে সেগুলোকে কবিদের মতো চমৎকার ছন্দবদ্ধ ও অনিন্দ্যসুন্দর অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কাব্যমালায় গেঁথে গণমানুষের সামনে পেশ করে। সুতরাং, সে একজন কবি। আর যা কিছু সে বলে তা সব কবিতা। আল্লাহ তাআলা তাদের বক্তব্য ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করে কুরআনে কারীমে ঘোষণা করেন, وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফেরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। [সূরা শুআরা : ২২৪-২২৬]। এ ছিল কবিদের তিনটি গুণ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন ও চরিত্রে যে গুণগুলির অস্তিত্ব থাকার কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং, যারা তাঁর পথ অনুসরণ করে তারা হেদায়াত ও সুপথপ্রাপ্ত মুমিন। আল্লাহভীরু আল্লাহওয়ালা মুসলমান। কথায় ও কাজে, ভাবে ও বচনে, চলনে ও বলনে, আচার ও আচরণে তথা সর্বক্ষেত্রে সৎ ও সত্য পথের পথিক। জীবনের কোনো ময়দানেই জাহালত ও গোমরাহী তাদের কর্ম ও কীর্তির শুভ্রতা আর ঔজ্জ্বল্যের ওপর কলঙ্কের ছোপ লেপন করতে পারেনি। কবিরা যেমন উদভ্রান্ত হয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় জটবদ্ধ চুল আর চিলের চোখ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তেমন কোনো দিনই করেননি। এর বিপরীতে তিনি মানুষকে এক মালিক, এক দীন আর এক পথের দিকে ডাকেন। তিনি যা করতেন কেবল তা-ই বলতেন। আর কেবল তা-ই করতেন যা তিনি বলতেন। সুতরাং, কোথায় তিনি ও তাঁর বাণী? আর কোথায় কবি ও কবির কবিতা।

এভাবে ইতর ও বোকা কাফেররা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুরআনে কারীম আর ইসলামের চারপাশে সন্দেহ আর সংশয়ের যে আবর্জনার স্তূপই ফেলতে চেয়েছে আল্লাহ তাআলা সেগুলো অতি সুন্দর ও চমৎকারভাবে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার কৌশলে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন।

তবে তাদের সন্দেহের সিংহভাগ আবর্তিত হতো তাওহীদকে ঘিরে। এরপরের স্থানে ছিল রিসালতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এরপরে ছিল মরণের পরে পুনরুত্থান আর কেয়ামত দিবসের হাশর-নাশর। এ ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম সর্বপ্রথম তাওহীদকে ঘিরে তাদের যত সন্দেহ আর সংশয়ের জঞ্জাল ছিল সুন্দরভাবে সেগুলো বিদূরিত করে দিয়েছে। বরং আগে বেড়ে আরও এমন কিছু বস্তু পেশ করেছে যার মাধ্যমে এটি সর্বদিক দিয়ে বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তাদের মিথ্যা ও প্রাণহীন পাথুরে উপাস্যদের এমন কতগুলি স্থানে হাত দিয়েছে, যে স্থানগুলি তাদের কাছে ফুঁটো প্রমাণিত হয়েছে। সেখানে তাদের কাছে কেবল শূন্যতাই প্রকাশ পেয়েছে। এ ছিল এমন এক তদন্ত বিশ্বের কোনো আদালতে কোনো অপরাধীর মামলায় এত সুষ্ঠ ও সুন্দর তদন্ত কোনো দিনও হয়নি। মূলত এর সবকিছুই ছিল তাদের হিংসা ও বিদ্বেষ, দুশমনি ও দ্বেষের ফলাফল; যা তাদেরকে লাঞ্ছনার এই ভাগাড়ে এনে ফেলে দিয়েছিল।

আর রিসালতে মুহাম্মাদীকে ঘিরে তাদের সকল সন্দেহ আর সংশয়ের রূপরেখা ছিল এই যে, তারা মনে করত নবুওত ও রিসালাতের পদমর্যাদা কোনো মানুষকে দেওয়া হতে তা অনেক উর্ধ্বে ও বড়। এ কারণে যদিও তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সততা ও সত্যতা, আমানতদারি আর তাকওয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত ছিল তারপরেও তারা এ ব্যাপারে তাকে সত্যায়ন করতে পারেনি। তাদের কথা ছিল একটিই- কোনো মানুষের পক্ষে রাসূল হওয়া সম্ভব নয়। তেমনিভাবে কোনো রাসূলের পক্ষেও মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কার সুনীল দিগন্তে তাঁর নবুওত ও রিসালতের ঘোষণা ছড়িয়ে দিলেন তখন তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। বিস্ময়ে তারা দিনের আকাশে রাতের তারা দেখতে লাগল। তারা বলল, مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ এ কেমন রাসূল যে, খাদ্য আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? [সূরা ফুরক্বান:৭]। তারা আরও বলল,

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ। অথচ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি [সূরা আনআম:৯১]। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের যুক্তি খণ্ডন করলেন নিম্নোক্ত ভাষায়: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِلنَّاسِ আপনি জিজ্ঞাসা করুন ঐ কিতাব কে নাযিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হোদায়াত। [সূরা আনআম:৯১]। আর তারা এ কথা স্বীকার করত যে, মূসা আ. ছিলেন একজন মানুষ। আল্লাহ তাআলা তাদের এ ধারণাকে খণ্ডন করলেন এ কথা বলে যে, পৃথিবীতে যে নবী কিংবা রাসূলই আগমন করেছেন নিজের কওম তাকে তাঁর রিসালতকে অস্বীকার করেছে ঠিক এভাবে: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا তোমরা তো আমাদেরই মতো মানুষ [সূরা ইবরাহীম:১০]। আর তখন রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরা তো তোমাদের মতোই মানুষ! কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান অনুগ্রহ দান করেন [সূরা ইবরাহীম : ১১]। সুতরাং এ কথা এখন প্রমাণিত হয়ে গেল, নবী ও রাসূলগণ কেবল মানুষই হয়ে থাকেন। বাশারিয়্যাত তথা মনুষ্যত্ব আর রিসালতের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই।

আর যেহেতু তারা হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল ও মূসা আ. এর নবুওত ও রিসালতকে স্বীকার করে নিয়েছিল আর তারা এটাও জানত ও মানত যে, তারা ছিলেন মানুষ। সুতরাং নতুনভাবে এই সন্দেহকে পুঁজি করে তাদের খামখেয়ালি বেশিদিন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। সুতরাং, এরপর তারা বলতে লাগল, এই ইয়াতীম ও মিসকীন লোকটি ব্যতীত আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালতের দায়িত্বভার অর্পণ করার অন্য কাউকে পেলেন না। মক্কা ও তায়েফের রাঘব মোড়লদেরকে বাদ দিয়ে এই মিসকীনকে রাসূল হিসেবে নির্বাচিত করে আল্লাহর কাজ নেই। وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ তারা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? [সূরা যুখরুফ : ৩১]। আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে বলেন, أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? [সূরা যুখরুফ : ৩২]। অর্থাৎ ওহী রিসালত এগুলি আল্লাহর বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। اللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ আল্লাহ এ বিষয়ে সুপারিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। [সূরা আনআম : ১২৪]

এরপর তারা আরেক সন্দেহের ফন্দি আঁটতে লাগল। তারা বলতে লাগল, পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের রাসূল তথা প্রতিনিধি ও দূতদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখ-তারা যখন রাস্তা দিয়ে চলে তখন চারপাশ থেকে তাদেরকে ঘিরে থাকে খাদেম ও সেবকের বিশাল একটি জামাত। পৃথিবীর সকল চাকচিক্য আর জাঁকজমকের বাহারী চানক্যে তারা সবসময় মত্ত থাকে। জীবন সফরের প্রয়োজনীয় সকল আসবাব দরজা খুলে ডালি মেলে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু মুহাম্মাদের অবস্থা দেখ! সে আল্লাহর রসূল ও দূত হওয়ার দাবি করে। অথচ এক সামান্য জীবিকা নির্বাহ আর এক লোকমা খাদ্যের জন্য তাকে বাজারের অলিতে গলিতে পথে পথে ঘুরতে হয়! لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا (٧) أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُوْرًا (٨) তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহার করতেন? যালিমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। [সূরা ফুরক্বান:৭-৮]

আল্লাহ তাআলা তাদের এই সন্দেহের অপনোদন করলেন ঠিক এভাবে: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার একজন রাসূল। তাঁর কাজই হলো প্রত্যেক ছোট ও বড়, দুর্বল ও শক্তিশালী, শরীফ ও তরীফ, স্বাধীন ও পরাধীন, আযাদ ও গোলাম, এক কথায় দুনিয়ার প্রত্যেকটি ইনসানের কাছে আল্লাহর রিসালত পৌঁছে দেওয়া ও তাঁর পয়গাম তাকে শুনিয়ে দেওয়া। সুতরাং তিনিও যদি দুনিয়া সর্বস্ব বড় বড় রাজা বাদশাদের প্রতিনিধিদের ন্যায় দুনিয়া পাগল হয়ে যান। তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকে খাদেম ও নওকরের দল। আশ্চর্য জাঁকজমক আর নিত্য নতুন ঘটা তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে যায় তবে তো তার কাছে ফকির-মিসকীন ও দুর্বল শ্রেণির মানুষ আসতে পারবে না। তারা তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না। অথচ, দুনিয়াতে এ ধরনের মানুষের সংখ্যাই বেশি। সুতরাং, সিংহভাগ দুনিয়াবাসীই যখন পয়গামে মুহাম্মাদী আর রিসালতে মুস্তফা থেকে বঞ্চিত থাকে তবে এই পয়গাম আর রিসালতের আসল উদ্দেশ্যই তো ফউত হয়ে যায়। সুতরাং, যে দাওয়াত মানুষের ফায়েদা আর উপকারের জন্য এসেছিল তার দ্বারা তা-ই যদি হাসিল না হয় তবে তার আসার কী প্রয়োজন ছিল?

আর তারা যে মৃত্যুর পরে কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করত এর ওপর তাদের দলীল ও যুক্তি ছিল তাদের বিস্ময়, কৌতূহল আর মানসিক দূর

ভাবাপন্নতা। তারা বলত أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? [সূরা সাফফাত:১৬-১৭]

তারা আরও বলত ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ এ প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। [সূরা ক্বাফ : ৩] তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে বেড়াত, هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচিছন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উন্মাদ [সূরা সাবা:৭-৮]

তাদেরই একজনের বক্তব্য হলো:

أَمُوتُ ثُمَّ بَعْثٌ ثُمَّ حَشْرٌ * حَدِيثُ خُرَافَةٍ يَا أُمَّ عَمْرٍو

'শুনেছো! প্রথমে মৃত্যু তার পরে পুনরুত্থান তার পরে হাশর !!
হে আবু আমর! এ তো বড়ই কুসংস্কার আর রূপকথার কাহিনী'॥

আল্লাহ তাআলা তাদের এ সংশয়ের অপনোদন করেছেন জগত ও জগতের বস্তুনিচয় তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেছেন দেখো! পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত কিছুই না ঘটে যাচ্ছে! এখানে যালিম তার যুলুমের সাজা পাওয়া ব্যতীতই মারা যাচ্ছে। ওখানে মযলুম তার হক্ব আদায় করার আগেই মৃত্যুর পেয়ালায় ঠোঁট লাগাচ্ছে। এখানে সৎকর্মশীল ও মুহসিন বান্দা তার ইহসান ও সৎকর্মের প্রতিদান পাওয়ার আগেই মৃত্যু সুধা পান করছে। এখানে পাপাচারী ও অপরাধী তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করার আগেই অক্কা পাচ্ছে। সুতরাং, এখন যদি মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় কোনো জীবন না থাকে; না থাকে এই হাশর ও নাশর তবে তো উভয় দলই সমান হয়ে যাবে। বরং যালিম ও অপরাধী মযলুম ও সৎকর্মশীলদের তুলনায় সৌভাগ্যবান প্রমাণিত হবে। স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন হাবা-বোবা লোকও এই বৈপরীত্য আর শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। সুতরাং, গোটা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির ব্যবস্থা এ ধরনের একটা বিশৃঙ্খল দর্শনের ওপর থাকবে তা কোনোদিন কল্পনাও করা যায় না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (٣٦) আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?

তোমাদের কি হলো ? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? [সূরা ক্বলম:৩৫-৩৬] তিনি আরও বলেন, أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ. আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দিব? না আল্লাহভীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দিব? তিনি আরও বলে, أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوْا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ. যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দিব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ!

আল্লাহ তাআলা তাদের এই মানসিক দূর ভাবাপন্নতা খারিজ করে দিয়ে বলেন, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا তোমরা কি সৃষ্টির দিক দিয়ে বেশী কঠিন না আকাশ? যা তিনি বানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. তারা কি দেখেনি যে, ঐ আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন –এবং এগুলোর সৃষ্টিতে তিনি অক্ষম হননি– মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। [সূরা আহকাফ : ৩৩] আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الأُوْلَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা অবশ্যই অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না কেন?

এর পাশাপাশি তিনি মানুষের নিকট এমন একটি যুক্তি তুলে ধরেছেন যা মানুষের বিবেক বোধ কর্তৃক স্বীকৃত। আর তা হলো পুনরায় সৃষ্টি করা أَهْوَنُ عَلَيْهِ তার জন্য আরও বেশি সহজ [সূরা রূম : ২৭] তিনি আরও বলেন, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। [সূরা আম্বিয়া : ১০৪]

তিনি আরও ইরশাদ করেন, أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? [সূরা ক্বাফ : ১৫]

এভাবে কাফেররা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যে সন্দেহ কিংবা সংশয়ের জালেই আটকে ফেলতে চেয়েছিল আল্লাহ তাআলা তাকে সেগুলো থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখেন। তার ওপর তারা যে প্রশ্নই উত্থাপন করেছিল আল্লাহ তাআলা তার পক্ষ থেকে তাদেরকে এমন সুন্দর উত্তর দান করেন, যা বিবেক-বোধ সম্পন্ন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারে। কিন্তু তারা ছিল উদ্ধত ও অহঙ্কারী। তারা ভূপৃষ্ঠে দম্ভ ভরে চলত। সৃষ্টির ওপর তারা নিজেদের মতামত ও ফয়সালাই চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করত। এভাবে তারা তাদের অবাধ্যতার অন্ধকার গলিতেই উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকে।

তিন. কুরআন শোনার ক্ষেত্রে আড়াল হয়ে দাঁড়ানো। রূপকথার বানোয়াট গল্পের মাধ্যমে কুরআনের বিরোধিতা করা।

মক্কার মুশরিকরা গণমানসে এ ধরনের সন্দেহ-সংশয় জন্ম দেওয়ার পাশাপাশি মানুষকে যে কোনোভাবেই হোক কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও ইসলামের কথা শোনা থেকে বারণ করত। বরং এ ক্ষেত্রে তারা বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত। সুতরাং, তারা মানুষকে এ ধরনের জায়গা থেকে তাড়িয়ে দিত। যখন তারা দেখত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতি নিতে কিংবা নামায আদায় করতে বা অথবা কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত করতে তখন সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধানোর সর্বাত্মক প্রয়াস পেত। অর্থহীন হৈ-হুল্লোড় করত। হাততালি দিত। অট্ট হাসির উদারতার মধ্যে রিসালতের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ. আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃতিতে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। [সূরা হা-মীম-সিজদা : ২৬]

এ কারণে নবুওতের পঞ্চম বর্ষের শেষ মাথায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সভা-সমিতি কিংবা সম্মেলনে কোনো দিন কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে পারেননি। আর তাও ছিল কাকতালীয়ভাবে। তেলাওয়াত শুরুর আগে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছা-অভিলাষ টের পেয়েছিল না। আর তাই অনেকটা হঠাৎ করেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে কুরাইশের এক নেতা নজর বিন হারিস হীরায় গেল। সেখানে গিয়ে সে পারস্য সম্রাটদের কিচ্ছা-কাহিনী, রুস্তম ও ইস্ফানদিয়ারের গল্প-ঘটনা ইত্যাদি শিখে মক্কায় ফিরে এলো। এরপর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর শাস্তি থেকে ভীতিপ্রদর্শন করার জন্য কোনো মজলিসে বসতেন সেও গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে বসে পড়ত এবং উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বলা শুরু করত: হে কুরাইশ! আল্লাহর কসম নিশ্চয়ই তাঁর কিচ্ছা কহিনীর চেয়ে আমার কিচ্ছা কাহিনীগুলো অনেক সুন্দর। এরপর সে পারস্য ও রোম সম্রাট আর ইস্ফানদিয়ারের গল্প কাহিনী বলা শুরু করত। কিছুক্ষণ পরে সে বলে উঠত: এখন তোমরাই বলো মুহাম্মাদের গল্প কাহিনী কী করে আমার চেয়ে সুন্দর হবে।[১৫২]

যুলুম-নির্যাতন শুরু

নবুওতের চতুর্থ বছরের গোড়ার দিকে ইসলাম যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন কুরাইশরা তার উদ্যমতাকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য, তার গতিকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ল। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের সাধ্যমতো যতগুলো পন্থা ও পদ্ধতি পারছিল একের পর এক নির্বিঘ্নে ব্যবহার করে যাচ্ছিল। এভাবেই কেটে গেল বহু দিন। বহু মাস। কুরাইশ কাফের ও মুশরিকরা তাদের পূর্বের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। তখনো শুরু হয়েছিল না যুলুম ও নির্যাতনের পালা। কিন্তু যখন তারা গভীরভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল যে, কিশোর বয়সেই ইসলামের মধ্যে যে শক্তি আর তেয রয়েছে তাতে ভরা যৌবনে এ সকল পন্থা ও পদ্ধতিতে তার সঙ্গে কখনোই কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না, তখন তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল। পরামর্শে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো মানবাধিকারবিরোধী এক সিদ্ধান্ত- মুসলমানদের ওপর এবার চাপিয়ে দিতে হবে অত্যাচার আর নির্যাতনের এক অন্ধকার কালো রাত্র। নতুন এই দীন থেকে তাদেরকে যে কোনো মূল্যেই ফিরিয়ে আনতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুরাইশের প্রত্যেক রাঘব বোয়ালই তার কওমের যে ব্যক্তি ইসলামে দাখিল হয়েছে তার ওপর চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানো শুরু করল। প্রত্যেক মনিবই তার যে গোলাম ইসলামের পথ বেছে নিয়েছিল তার ওপর ভেঙে ফেলেছিল জোর-জুলুমের পাহাড়; তাকে ঘিরে ফেলেছিল মার-পিট আর জোর-জবরস্তির অন্ধকার।

কাফের-মুশরিকদের বড় বড় মাথা আর গোত্র প্রধানগুলিই যখন যুলুম আর নির্যাতনের ঘৃণ্য এ পথে ধাবিত হয়েছিল তখন তাদের চাটুকার আর চামচাগুলিও যে এ পথ অবলম্বন করে তাদের আঁচল জড়িয়ে ধরার জন্য পিছু ধরবে এটা কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না; বরং প্রকৃতির চাহিদাই এমনটি হওয়ার কথা বলে দিচ্ছিল। সুতরাং, পদলেহী এই ছুঁচোগুলিও তাদের পথ ধরে হাঁটতে লাগল।

---

[১৫২] ইবনে হিশাম এর সার সংক্ষেপ ১/২৯৯, ৩০০, ৩৮৫।

তারা মুসলমানদের জীবনে বিশেষ করে সহায় সম্বলহীন গরিব মুসলমানদের জীবনে এমন ব্যাপক ও বিশাল সর্বনাশ ডেকে এনেছিল যা শুনলে গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যায়। হৃদয় ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সুনির্মল ও সুকোমল আত্মার গহীন থেকে বেদনার প্রচণ্ড ধাক্কায় বের হয় গগণবিদারী আর্তনাদ! আহ!!

যখন শরীফ ও গণমান্য কারও ইসলাম গ্রহণের কথা আবু জাহলের কানে গিয়ে পৌঁছত তখন সে তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করত। তার ধন ও সম্পদ আর ইয্যত ও সম্মানের বিশাল ক্ষতি করার হুমকি-ধমকি দিত। আর যদি সে দুর্বল হতো তবে চোখ কান বন্ধ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। সেখানে কায়েম হতো হৃদয় বিদারক মারপিটের এক অসভ্য দৃশ্য।[১৫৩]

যখন উসমান রা. ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের ভেতর পেঁচিয়ে ধরে নীচের দিক দিয়ে তাঁর চোখে মুখে ধোঁয়া দিত।[১৫৪]

যখন মুসআব বিন উমাইরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ তার মায়ের কানে গিয়ে পৌঁছল তখন তিনি তার খাবার-দাবারের দুয়ার বন্ধ করে দিলেন। এক পর্যায়ে তাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন। সারা জীবন যে মানুষটি সুখ আর আড়ম্বরতার দরিয়ায় পাল তুলে এক কূল থেকে অন্য কূলে সহজেই দারিদ্র্যের সমস্ত তুফান কেটে চলেছেন, আজ তার জীবনে নেমে এলো দারিদ্র্যের এক ঘনঘোর অন্ধকার রাত। দারিদ্র্যের পাহাড়সম ঊর্মিমালায় বিধ্বস্ত হবার ভয়ে উত্তরঙ্গ দরিয়ার মাঝে আজ তার জীবন তরী নিরন্তর শঙ্কিত। তার আত্মা থরথর কম্পিত।[১৫৫]

সুহাইব বিন সিনান রূমী রা. কে এতটা শাস্তি দেওয়া হতো যে, প্রায় সময়ই তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন এবং মুখে কী বলতেন তা নিজেও জানতেন না।[১৫৬]

বেলাল রা. ছিলেন উমাইয়্যা বিন খলফ জুমহীর গোলাম। উমাইয়্যা তাঁর গলায় রশি লাগিয়ে এলাকার ইতর ছেলেদের হাতে তুলে দিত। তারা তাঁর রশি ধরে টেনে মক্কার চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরত। এভাবে তাঁর গলায় রশির দাগ পড়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মুখ থেকে বের হতো কেবল আহাদ আহাদ!!! এতে উমাইয়্যা আরও ক্রুদ্ধ হতো এবং তাকে নিদারুণ প্রহার করতে শুরু করত। তাকে ক্ষুধার্ত রাখত। দুপুরের প্রচণ্ড দাহ আর কাঠফাটা রোদে তাকে মরুভূমিতে বসিয়ে রাখত। এর চেয়েও আরও হৃদয়বিদারক ইতিহাস ছিল, মক্কার মরুবিয়াবানে দুপুর বেলায় তপ্ত বালুরাশিতে তাকে চিত করে শুইয়ে রাখা হতো। এরপর এক বিশাল পাথর তাঁর বুকের ওপর রেখে তাকে চাপা দেওয়া হতো। তারপর উমাইয়্যা তাকে

---

১৫৩ ইবনে হিশাম ১/৩২০।
১৫৪ রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৫৭।
১৫৫ উসদুল গাবা ৪/৪০৬। তালকীহে ফুহূমিল আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৬০।
১৫৬ ইসাবা ৩, ৪/২৫৫। ইবনে সা'দ ৩/২৪৮।

বলত, আল্লাহর কসম! হয়তো তুমি এভাবে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে, নতুবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে এবং লাত ও উয্‌যার ইবাদত করবে। তখন বেলাল রা. সে অবস্থাতেই বলতেন আহাদ! আহাদ!! তিনি আরও বলনেন, যদি তোমাদের জন্য এর চেয়েও আরও ক্রোধোদ্রেককর কোনো শব্দ আমার জানা থাকত তবে আমি তা-ই বলতাম। এ অবস্থায় একদিন হযরত আবু বকর রা. তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাকে এ অবস্থায় দেখে একটি কালো গোলাম কিংবা দুই শ' বা দুই শ' আশি দিরহাম দিয়ে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন।[১৫৭]

আম্মার বিন ইয়াসির রা. ছিলেন বনু মাখযুমের গোলাম। তিনি ও তাঁর পিতা-মাতা গোড়াতেই ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সুতরাং, দুপুরের প্রচণ্ড রোদের তাপে মরুর বালুরাশি যখন খই হয়ে ফুটত, তখন মুশরিকরা বিশেষ করে আবু জাহল প্রস্তরময় জমিনের দিকে চলে যেত এবং তাদেরকে যেভাবে পারত শাস্তি দিত। একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন তাদের এই শাস্তি আর দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন তখন বললেন, হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, তোমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ইয়াসির এভাবে শাস্তি পেয়ে পেয়ে মারা গেলেন। আর আম্মারের মাতা সুমাইয়্যার লজ্জাস্থানে আবু জাহল বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করে দেয়। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ রমণী। তিনি ছিলেন আবু হুযাইফা বিন মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন মাখযূম এর দাসী। তার পিতার নাম ছিল খাইয়্যাত। তিনি ছিলেন অনেক দুর্বল ও বৃদ্ধ। কখনো কখনো রোদে পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া হতো। আবার কখনো কখনো তার বুকের ওপর বিশাল পাথর চাপিয়ে দেওয়া হতো। কোনো কোনো সময় তাকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো। এতে তিনি হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। আর মুশরিকরা তাকে বলত, তুমি যতক্ষণ না মুহাম্মাদকে গালি দিবে কিংবা লাত ও উয্‌যার প্রশংসা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে ছাড়ব না। বাধ্য হয়ে তিনি তাদের কথায় সম্মত হলেন। এরপর কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে দৌড়ে এলেন। আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন: যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। [সূরা নাহল : ১০৬] [১৫৮]

---

[১৫৭] ইবনে হিশাম ১/৩১৭, ৩১৮। তালকীহে ফুহূমিল আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৬১। তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা নাহলের ১০৬ নং আয়াতের তাফসীর [২/৬৪৮]

[১৫৮] ইবনে হিশাম ১/৩১৯, ৩২০। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৩/২৪৮, ২৪৯.........তাফসীরে ইবনে কাসীর প্রাগুক্ত। দেখুন দুররুল মানসূরে উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর।

আবু ফুকাইহা ছিলেন বনু আবদ্দুদ্দার এর গোলাম। তার নাম ছিল আফলাহ। মূলতঃ তিনি ছিলেন আযদ কবীলার লোক। দিনের মধ্যভাগে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পায়ে লৌহ শিকল পরিয়ে মরুভূমির বালুর মধ্য নিয়ে তাকে ফেলে রাখা হতো। এরপর তাঁর পিঠের ওপর রেখে দেওয়া হতো এক বিশাল জগদ্দল পাথর; যাতে তিনি একটুকুও নড়াচড়া করতে না পারেন। এতে তিনি বার বার হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। এভাবেই নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল শাস্তির ধারা; পরিশেষে তিনি যখন হাবশায় দ্বিতীয় হিজরতের সময় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন, তখন অত্যাচারের এ ধারা বন্ধ হয়েছিল। একবার মুশরিকরা তাঁর পা বেঁধে দিলো। এরপর তাকে মরুভূমিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে বালুর ওপর ফেলে এত জোরে তার গলা চেপে ধরা হল যে, তারা তাকে মৃত মনে করল। আবু বকর একদিন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তার এই দৈন্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন।[১৫৯]

খাব্বাব বিন আরত রা. ছিলেন উম্মে আনমার বিনতে সিবা' আল খুযাইয়্যার গোলাম। পেশায় তিনি ছিলেন একজন কামার। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর মনিবা তাকে আগুনের ছেঁকা দিয়ে শাস্তি দিতে লাগল। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অস্বীকার করার জন্য তাঁর মনীবা লৌহ শলাকা আগুনে গরম করে এনে কখনো তাঁর পিঠে আবার কখনো তাঁর মাথায় লাগিয়ে দিত। কিন্তু এটা আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান আর আত্মসমর্পণকে বরং বাড়িয়েই চলল। মুশরিকরাও তাকে কোথাও পেলে শাস্তি দিত। কখনো তারা তার ঘাড় চেপে ধরত। আবার কখনো চুল টানাটানি করত। কখনো আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুইয়ে দিয়ে চেপে তার সঙ্গে ধরে রাখত। ফলে আগুনের তাপে এক সময় শরীর থেকে পানি বের হয়ে সে আগুনকে নিভিয়ে ফেলত।

যিন্নীরা নামী এক রোমক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এক পর্যায়ে তার চোখেও ভীষণ আঘাত করা হয় ফলে সে অন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর তাকে বলা হয়, লাত এবং উয্যা তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েই এ মুসিবত দিয়েছে। সে বলল, আল্লাহর কসম! তারা আমাকে কোনো মুসিবতে আক্রান্ত করার ক্ষমতাও রাখে না। এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে; তিনি যদি চান তবে তা ভালো হয়ে যাবে। পরের দিন আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তার চোখ ভালো হয়ে গেল। কুরাইশরা বলল এটাও মুহাম্মাদের একটা জাদু।[১৬০]

বনু যুহরার দাসী উম্মে উবাইসও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে যে মুশরিকই তাকে পেত কঠোর শাস্তি দিত। বিশেষকরে তার মনিব আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগূসের তো এ ক্ষেত্রে

---

[১৫৯] উসদুল গাবা ৫/২৪৮। ইসাবা ৭, ৮/১৫২ ইত্যাদি।
[১৬০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬। ইবনে হিশাম ১/৩১৮।

কোনো জুড়িই ছিল না। সে ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানের দুশমনদের এবং তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা বিদ্রূপকারীদের অন্যতম।[১৬১]

বনু আদী গোত্রের উমর বিন মুমিলের দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে উমর বিন খাত্তাব-তখন তিনি শিরকের ওপর ছিলেন-তাকে শাস্তি দিতেন। তাকে মারতে মারতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। এরপরে ডেকে বলতেন, আমি ক্লান্ত হয়ে তোমাকে মারা বন্ধ করেছি; অন্য কোনো কারণে নয়। দাসীও তাকে বলত, আপনার পালনকর্তাও আপনার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করবেন![১৬২]

দাসীদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিণতিতে ভয়াবহ নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন নাহদিয়া ও তার মেয়ে। মা ও মেয়ে উভয়ই বনু আব্দুদ্দারের এক মহিলার দাসী ছিলেন।[১৬৩]

আর ইসলাম গ্রহণ করার কারণে দাসদের মধ্যে হতে যাদেরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আমের বিন ফুহাইরা রা। নির্যাতনের প্রচণ্ডতায় তিনি কখনো কখনো হুঁশ হারিয়ে ফেলতেন। নিজের অজ্ঞাতেই মুখে কী যেন বিড়বিড় করতেন।[১৬৪]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. এ সকল দাস-দাসীকে কিনে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা একদিন তাকে লক্ষ্য করে বললেন, খুঁজে খুঁজে শুধু দুর্বল ও জীর্ণশীর্ণ দাসদাসীগুলোকেই আযাদ করে যাচ্ছ। শক্তিশালী ও বীর-স্বভাবীদেরকে আযাদ করো তবে তারা তোমার হেফাযতের কাজে আসবে। আবু বকর তার পিতাকে জবাবে বললেন, কিন্তু আব্বাজান! আমি তো কেবল আমার মালিককে খুশি করার জন্য এদেরকে আযাদ করে যাচ্ছি। এতে আল্লাহ তাআলা আবু বকরের প্রশংসা আর তাঁর শত্রুদের নিন্দায় এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (١٦) অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা লাইল:১৪-১৬] সে ছিল উমাইয়্যা বিন খলফ ও তাঁর অনুসারীরা। وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (٢٠) وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (٢١)

---

[১৬১] ইসাবা ৭, ৮/২৫৮।
[১৬২] ইবনে হিশাম ১/৩১৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬।
[১৬৩] ইবনে হিশাম ১/৩১৮, ৩১৯।
[১৬৪] ইবনে সা'দ ৩/২৪৮।

এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহভীরু ব্যক্তিকে, যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তাঁর উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তাঁর মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে। [সূরা লাইল : ১৭-২১] আর তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।[১৬৫]

কাফের-মুশরিকদের যুলুম ও অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজেও। একবার নওফল বিন খুওয়াইলিদ আদাবী তাকে ও তালহা বিন উবাইদুল্লাহকে নামায ও দীন থেকে বিমুখ করার জন্য এক রশিতে বাঁধলেন। কিন্তু তাদের দুজনের কেউ-ই তার ডাকে সাড়া দেননি। পরবর্তী সময়ে সে যখন তাদেরকে বন্ধনমুক্ত হয়ে নামাযে দাঁড়ানো দেখতে পেল তখন যার পর নেই বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে গেল। এ ঘটনার পর থেকে তাদের দুজনের নাম হয়ে গেল 'দুই সঙ্গী'। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে নওফলের জায়গায় তালহার ভাই উসমান বিন উবাইদুল্লাহর কথা বলা হয়েছে।[১৬৬]

মোটকথা, মুশরিকরা যখনই কারও ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পেত সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। অত্যাচার আর নির্যাতনের তুফান বয়ে যেত তার ওপর দিয়ে। গরিব ও দুর্বল মুসলমান-বিশেষকরে ক্রীত দাস-দাসীর ক্ষেত্রে তাদের এ ময়দান ছিল আরও পরিষ্কার; আর নির্ঝঞ্ঝাট ও ঝামেলামুক্ত। কেননা গোটা পৃথিবীতে তাদের তো এমন কেউ ছিল না এ নির্যাতন ও নিষ্পেষণের কারণে যার পেশানিতে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে বিরাগ আর বিরক্তির নিদর্শন। যে তাদের সুরক্ষা ও হেফাযতের এতটুকু নিশ্চয়তা দিবে। বরং সমাজের মাথা ও মোড়লরাই সময়ে সুযোগে মুসলমানদের ওপর যুলুম নির্যাতনের গুরুদায়িত্ব (!) পালন করত। উস্কে দিত এ পথে পদলেহী চাটুকারদেরকে। কিন্তু শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ক্ষেত্রে এটা ভারি কঠিন ছিল। কেননা, কওমের সকল মানুষ তাদের প্রতি ইয্যত ও সম্মান দেখাত; তাদের হেফাযত ও সুরক্ষার ব্যাপারে সর্বদা চোখ কান খোলা রাখত। এ কারণে কওমের একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গই চারদিকে লক্ষ্য রেখে সময় সুযোগ বুঝে তাদেরকে কিছু বলার দুঃসাহস দেখাত। অন্যরা এ ক্ষেত্রে কোনোদিন ভাগ্য পরীক্ষারও সুযোগ পেত না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে মুশরিকদের ভূমিকা

মনে রাখতে হবে, অন্য সবার বিপরীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পরম বিচক্ষণ, ধীমান ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের

[১৬৫] ইবনে হিশাম ১/৩১৮, ৩১৯। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ৮/২৫৬। তাফসীরের বিভিন্ন কিতাব।
[১৬৬] উসদুল গাবা ২/৪৬৮।

অধিকারী। দোস্ত কিংবা দুশমন কওমের সকলের চোখেই তিনি ছিলেন সম্মানিত ও শ্রদ্ধার পাত্র। এ কারণে কেবল সম্মান আর শ্রদ্ধা নিয়েই তার মতো মানুষের মুখামুখি হওয়া শোভা পায়। আর তার বিপরীতে অসৎ কোনো পন্থা কিংবা উদ্দেশ্য হাসিল করার প্লান-পরিকল্পনার দুঃসাহস কেবল আহম্মক আর বোকাদের ক্ষেত্রেই মানায়। এত কিছু ছাড়াও তিনি ছিলেন চাচা আবু তালিবের পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে। আর আবু তালিব ছিলেন মক্কায় হাতে গনা কয়েকজনের একজন। ব্যক্তিত্বের ময়দানে তিনি যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও মহান; ঠিক তেমনি সমাজের সব শ্রেণির মানুষের মধ্যেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ও মহান বলে বিবেচিত। সুতরাং আবু তালিবের তত্ত্বাবধানের নিশ্ছিদ্র জাল ছিন্ন করা কিংবা তাঁর সুরক্ষাকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেওয়ার সাহস মক্কার কারও ছিল না। এ সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর চোখ বুলিয়ে কুরাইশরা স্বস্তি পাচ্ছিল না। তারা কেবল উঠবোস করছিল। এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় চলচ্চিত্তে ছোটাছুটি করছিল। তাই তারা তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাচীন গলি থেকে একটু বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা চাচ্ছিল এবার বুঝে-শুনে কিছু করতে। পরিশেষে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বড় অভিভাবক ও যিম্মাদার চাচা আবু তালিবের সঙ্গে কথা-বার্তা ও আলাপ-আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের ঠিকই মনে ছিল, আবু তালিবের সঙ্গে তাদের এই আলোচনা হতে হবে নরম গরমের সমাহার। সেখানে যেমন থাকবে কিছু বুদ্ধিমত্তা আর বিচক্ষণতার ছড়াছড়ি। পাশাপাশি সেখানে থাকবে কিছু হুমকি-ধমকিও। এর ফলাফল দাঁড়াবে সুন্দর-হয়তো আবু তালিব তাদের প্রস্তাব মেনে নেবে। হতে পারে তাদের মতে সে ঐকমত্য পোষণ করবে।

আবু তালিবের নিকট কুরাইশ প্রতিনিধি

ইবনে ইসহাক বলেন, কুরাইশের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবু তালিবের নিকটে গেল। তারা আবু তালিবকে বলল, তোমার ভাতিজা আমাদের উপাস্যদের গালমন্দ করেছে; আমাদের দীনের সমালোচনা করেছে; আমাদের বোধ ও বিশ্বাসকে বেকুবি ও নাদানি বলে আখ্যা দিয়েছে; আমাদের বাপ-দাদাদেরকে গোমরাহ সাব্যস্ত করেছে। সুতরাং, হয়তো তুমি এখন তাকে এ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখবে, নতুবা আমাদের ও তাঁর মাঝখান থেকে তুমি সরে যাবে। কেননা আমাদের মতো তুমিও তাঁর দীন থেকে ভিন্ন একটি দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা তার জন্য তোমাকেই যথেষ্ট মনে করি। আবু তালিব তাদের সঙ্গে বিনম্র ভাষায় কথা বললেন এবং অতিসুন্দরভাবে তাদের প্রত্যেকটি কথার জবাব দিলেন। তারা তার কথার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে সে বারের মতো ফিরে গেল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দীন মানুষের সামনে পেশ করে তাদেরকে দিবানিশি সে পথে ডাকতে লাগলেন।[১৬৭] এদিকে কুরাইশরা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখতে পেল যে, তিনি নির্বিকার হয়ে আপন কাজে রত আছেন; মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে চলছেন তখন তারা আর বেশিদিন ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারল না। নিজেরা তাঁর ব্যাপারে অধিকহারে আলাপ আলোচনা করে যেতে থাকল। বিরাগ আর অসন্তোষে প্রত্যেকটা মুশরিক বিড়বিড় করতে লাগল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো আবারও আবু তালিবের কাছে যেতে হবে। তবে এ যাওয়া আগের বার যাওয়ার মতো নয়; বরং এটা হবে আগের চেয়ে একটু গরমভাবে। একটু বেশি ঠেলা মেরে।

কুরাইশের পক্ষ থেকে আবু তালিবকে হুমকি-ধমকি

কুরাইশের বড় বড় নেতা আবার আবু তালিবের নিকট আগমন করল। তারা তাকে লক্ষ্য করে শান্তভাবে বলল, আপনি আমাদের মধ্যে একজন বয়োবৃদ্ধ, সম্ভ্রান্ত আর সম্মানিত ব্যক্তি। আপনাকে আমরা আগে এক বার এসে আপনার ভাতিজাকে নিষেধ করতে বলেছিলাম কিন্তু আপনি তা করেননি। আল্লাহর কসম! আমাদের বাপ-দাদাদেরকে গালি দেওয়া হবে; আমাদের বোধ ও বিশ্বাসকে বোকামি ও বেকুবি সাব্যস্ত করা হবে, আর আমাদের উপাস্যদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হবে, আর আমরা বসে বসে মুখ বুঁজে তা সহ্য করব এমনটি কোনো দিনও হতে পারে না। আমরা আবারও বলছি, তুমি তাকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে রেখো। নতুবা আমরা তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিরুদ্ধেও যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবো। আমাদের এ লড়াই চলবে ততক্ষণ- যতক্ষণ না আমাদের দুই দলের কোনো দল হালাক ও ধ্বংস হয়ে যায়।

কুরাইশের পক্ষ থেকে এই চরম হুমকি-ধমকিতে আবু তালিব কিছুটা বিব্রত ও হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডেকে পাঠালেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলে আবু তালিব তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার প্রাণপ্রতীম ভাতিজা! তোমার কওম আমার নিকট এসে এমন এমন বলে গেছে। সুতরাং, তুমি আমাকে ও তোমার নিজের আত্মাকে বাঁচতে দাও। তুমি আমার মাথার ওপর এমন কোনো বোঝা চাপিয়ে দিও না যা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। আবু তালিবের কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন, তার চাচা তাকে একরকম লাঞ্ছিত করেছেন। কুরাইশদের ধমক খেয়ে তাঁর প্রতি চাচার

[১৬৭] ইবনে হিশাম ১/২৬৫।

সাহায্য সহযোগিতার প্রসারিত হাত অনেকটা ছোট ও খাটো হয়ে গেছে। এরপর তিনি বললে, 'হে আমার চাচা! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্যকে এনে রেখে দেয়, আর আমার বাম হাতে চন্দ্রকে এনে দেয় এবং এর বিনিময়ে তারা চায়, আমি এ কাজ ছেড়ে দিই তবে আমি তা কখনোই ছাড়ব না। যতক্ষণ না আল্লাহ এ দীনকে বিজয় দান করেন কিংবা আমি এ পথে আমার জীবন বিলিয়ে দিই। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যত হলেন। আবু তালিব পেছনের দিক থেকে তাকে ডাক দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু তালিবের দিকে ঘুরে দাঁড়ালে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, হে আমার ভাতিজা! তবে যাও এবার তোমার কথাই হবে। যা তোমার মন চায় তা-ই বলে বেড়াও। আল্লাহর কসম! আমি কোনো দিনও কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্যদের হাতে তোমাকে অর্পণ করব না।[১৬৮] এরপর তিনি দু'টি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলেন:

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوْا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ ... حَتّٰى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِيْنًا

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ ... وَابْشِرْ وَقِرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوْنًا

'আল্লাহর কসম! আমি যতক্ষণ পর্যন্ত মাটির অভ্যন্তরে দাফন হয়ে না যাব; ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সবাই মিলেও তোমার একটি পশমও স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি তোমার দাওয়াত মানুষের কাছে তুলে ধরো। এ ক্ষেত্রে তোমাকে কারও কিছু বলার ক্ষমতা নেই। এভাবে তুমি তোমার নিজের পথে চলে পরম তৃপ্তি লাভ করো। সুখী হও।'

আবু তালিব আবারও কুরাইশের মুখামুখি

কুরাইশরা যখন দেখল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন দাওয়াতী কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তারা বুঝতে পারল, আবু তালিব তাঁর ভাতিজাকে অপমান করতে কখনোই রাযি নয়। বরং সে এখন তার জন্য তাদের সঙ্গে দুশমনি ও শত্রুতার আগুন জ্বালাতেও পূর্ণ প্রস্তুত আছে। তাই তারা ওলীদ বিন মুগীরার ছেলে আম্মারাকে নিয়ে আবু তালিবের কাছে গেল। তারা তাকে বলল, আবু তালিব! সে কুরাইশের সবচেয়ে সুন্দর ও বিচক্ষণ তরুণ। আপনি তাকে নিয়ে নিন! তার রক্তপণ ও সাহায্য সহযোগিতা-সবকিছুর অধিকারী হবেন আপনি। সুতরাং, আপনি তাকে আপনার ছেলে বানিয়ে নিন! বিনিময়ে আপনার ভাতিজাকে আমাদের হাতে অর্পণ করুন; যে আপনার দীন ও

[১৬৮] ইবনে হিশাম ১/১৬৫, ১৬৬।

আপনার বাপ-দাদার দীনের বিরোধিতা করেছে। যে আপনার কওমের মধ্যে বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর দাঁড় করিয়েছে। যে তাদের সকল বোধ ও বিশ্বাসকে চরম বেকুবি বলে আখ্যা দিয়েছে। আমরা নিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলব। সুতরাং, একটি জানের বদলে আরেকটি জানের বিনিময় হয়ে যাবে। আবু তালিব বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা আমাকে কত খারাপ প্রস্তাবই না দিচ্ছ! তোমরা কি এটাই চাচ্ছ না যে, তোমরা তোমাদের সন্তানকে আমার হাতে অর্পণ করবে এবং আমি তাকে ভালো ভালো খাইয়ে মোটা তাজা ও পরিপুষ্ট করে গড়ে তুলব। আর এর বিপরীতে আমি তোমাদের নিকট আমার সন্তানকে অর্পণ করব এবং তোমরা তাকে হত্যা করবে? আল্লাহর কসম! তোমাদের মনের এ আশা কখনোই পূর্ণ হবে না। মুতঈম বিন আদী বিন নওফল ইবনে আবদে মানাফ বলল, আবু তালিব! আল্লাহর কসম!! তোমার কওম তোমার প্রতি ইনসাফই করতে চেয়েছে এবং যা তোমার অপছন্দ তা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছে কিন্তু তুমি দেখছি তাদের সে সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছ! জবাবে আবু তালিব বলল, তোমরা কখনোই আমার প্রতি ইনসাফ করতে চাওনি। বরং এর বিপরীতে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে চেয়েছ। তোমরা চেয়েছ আমার মুখালিফ কওমের সঙ্গে মিত্রতা কায়েম করে তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে এবং তোমরাও তাদের পিছু নিতে। ঠিক আছে যাও! যা তোমাদের মন চায় করো গে। [১৬৯]

যখন কুরাইশদের সকল আলোচনা-পর্যালোচনা আর প্রস্তাবনা ব্যর্থ হলো। যখন তারা আবু তালিবকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতী কার্যকক্রমের পথে বাঁধা ও প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে অসফল প্রমাণিত হলো তখন তারা এমন এক পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো দুর্নাম আর বদনামীর ভয়ে যে পথ আর পন্থা থেকে তারা এতদিন দূরে দূরে ছিল। আর তা ছিল স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্তার ওপর যুলুম ও নির্যাতনের পথ।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যুলুম-নির্যাতন শুরু

ভূপৃষ্ঠের বুকে ইসলামের দাওয়াতের যে দিন সর্বপ্রথম উদ্বোধন হয়েছিল সে দিন থেকে শুরু করে কুরাইশরা তাদের মনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা লালন করত এখন তা হিংসা আর বিদ্বেষের অনলে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আত্মম্ভরী আর দাম্ভিক এ সকল

[১৬৯] ইবনে হিশাম ১/২৬৬, ২৬৭।

ঘাড়তেড়াদের জন্য এখন আর এক মুহূর্ত বসে থেকে সেই দীনের বিস্তৃতি আর বিজয়ের দৃশ্য দেখা সহ্য হচ্ছিল না। এতদিন পর্যন্ত এ পথে তাদের হাতিয়ার ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-মশকরা আর খেল-তামাশা। এগুলি এখন মজাহীন ও পুরনো খেলায় রূপ নিয়েছিল। এবার তারা হাত বাড়ালো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যুলুম-নির্যাতনের প্রতি। এ ক্ষেত্রে কেবল তাদের সামনের কাতারেই নয়; বরং তাদের ইমাম ছিল আবু লাহাব। তার পেছনেই কুরাইশের মুশরিকরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ইকতেদা করেছিল। তবে আবু লাহাবের পূর্ববর্তী জীবনের ইতিহাস দেখলে এতে খুব আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকে না। কেননা, আবু লাহাব ছিল বনু হাশিমের একজন প্রথম সারির নেতা। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা যা ভয় করবে সে তা ভয় করবে না। তা ছাড়া প্রথম দিন থেকেই সে ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু; জানের দুশমন। ইসলামের জন্মের দিন থেকে শুরু করেই সে তার সঙ্গে শত্রুর ভূমিকা পালন করে আসছিল। কুরাইশরা যে বিষয়ে তখনো চিন্তা ভাবনা আর ফিকিরের স্তরে ছিল তখনো সে তাদের থেকে বহু সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। বনু হাশিমের মজলিসে তার ভূমিকা কী ছিল আমরা ইতঃপূর্বে পাঠকবর্গের সামনে তা তুলে ধরেছি। আমরা এও দেখিয়েছি সাফা পাহাড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সর্বপ্রথম তাঁর দাওয়াতী কাজের উদ্বোধন করেছিলেন সে দিন তাঁর সঙ্গে সে কীরূপ আচরণ করেছিল!

অপরদিকে আবু লাহাব তার দুই পুত্র উতবা ও উতাইবাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুই কন্যা রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুমের সঙ্গে বিবাহ করিয়ে ছিল। আর এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতের আগের ঘটনা। পরবর্তী সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওতের অলঙ্কারে ভূষিত হলেন তখন আবু লাহাব তার পুত্রদ্বয়কে তাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দেওয়ার ওপর পীড়াপীড়ি ও জোর জবরদস্তি চালাতে থাকে। পরিশেষে বাধ্য হয়ে তারা তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়।[১৭০]

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয় তখন আবু লাহাব এতে চরম আনন্দ আর হর্ষোৎফুল্লে উচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। সে দৌড়ে যায় মুশরিকদেরকে এই সুসংবাদ শুনাতে যে, মুহাম্মাদ নির্বংশ হয়ে পড়েছে।[১৭১]

---

[১৭০] কাতাদা সূত্রে তাবরানী এটা বর্ণনা করেছেন। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী কুরাইশের কিছু লোকও এ ব্যাপারে দৌড়ঝাঁপ করে। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৬৫২।

[১৭১] আতা সূত্রে বর্নিত। দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা কাওসারের ব্যাখ্যা ৪/৫৯৫।

আমরা আগেই বলে এসেছি যে, শুরু থেকেই আবু লাহাব সবসময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছু লেগে থাকত। তার উদ্দেশ্য ছিল হজ্জের মৌসুমে ও হাটে বাজারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মানুষের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরবেন তখন সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তারিক বিন আব্দুল্লাহর মুহারিবীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কেবল মিথ্যা প্রতিপন্ন করেই সে ক্ষান্ত ছিল না; বরং সময়ে সুযোগে সে তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করে ফেলত।[১৭২]

অপরদিকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল উরওয়া বিনতে হরব বিন উমাইয়্যাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে শত্রুতা ও দুশমনির ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে কম ছিল না। সে ছিল আবু সুফিয়ান রা. এর বোন। সে দূর থেকে কাঁটা বহন করে এনে রাতের বেলায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চলার পথে এবং দরজার সামনে রেখে দিত। তার মুখের ভাষা ও বচন ছিল প্রচণ্ড তেযী আর ধারালো। কুচক্রান্ত আর মিথ্যামিথ্যি ছিল তার চরিত্রের অনন্য ভূষণ। ফেতনার আগুন জ্বালাতে সে ছিল দারুণ সিদ্ধহস্ত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে চারদিকে দুশমনি আর রেষ ও বিদ্বেষের দাবানল ছড়াতে তার কোনো জুড়ি ছিল না গোটা আরবে। আর এ সকল কারণেই কুরআনে কারীমে সে 'লাকড়ী বহনকারিনী' আখ্যা লাভ করেছে।

সে যখন তার স্বামী আবু লাহাব আর তার নিজের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে জানতে পারল তখন সে দরগাহে নবুওতে ছুটে-এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কাবার কাছে মসজিদের ভেতরে বসা ছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. আর তার হাতে ছিল এক মুঠো পাথর। যখন সে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টিশক্তির সীমানা থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উঠিয়ে নিলেন। ফলে সে কেবল আবু বকর রা. কে সেখানে দেখতে পেল। সে আবু বকর রা. কে জিজ্ঞাসা করল, আবু বকর! তোমার সঙ্গী কোথায়? আমি খবর পেয়েছি, সে নাকি কবিতায় আমার নিন্দা-ভর্ৎসনা করে। আল্লাহর কসম! তাকে এখানে পেলে এ পাথরগুলো আমি তাঁর মুখে ছুঁড়ে মারতাম। নিশ্চয়ই আমি তো একজন কবি। এরপর সে আবৃত্তি করল : আমরা সেই নিন্দিতের অবাধ্যতা করছি। তার সবকিছু আমরা অস্বীকার করেছি। তার দীনকে আমরা দূরে ছুঁড়ে ফেলেছি।

---

[১৭২] কানযুল উম্মাল ১২/৪৪৯।

এরপর সে ফিরে এলো। আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে দেখেননি যখন সে আপনাকে দেখছিল? তিনি জবাব দিলেন, **সে আমাকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ তাআলা আমাকে তার দৃষ্টিসীমা থেকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।** [১৭৩]

আবু বকর বায্যারও এ ঘটনাটি রেওয়ায়েত করেছেন। আর তাতে বলা হয়েছে, সে যখন আবু বকর রা. এর কাছে গেল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল আবু বকর! তোমার সঙ্গী তার কবিতায় আমাদের নিন্দা করেছে। আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে কখনো কবিতা পাঠ করেন না। তাতে নিন্দা কিংবা অনিন্দার আশ্রয় নেন না। সে বলল, তুমি তো তাকে সত্যায়ন করো।[১৭৪]

মনে রাখা উচিত আবু লাহাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কত কিছু করেছিল। অথচ, সে ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা ও প্রতিবেশী। তার ঘর ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরের সঙ্গে একেবারে লাগানো। তাঁর অন্যান্য প্রতিবেশীর অবস্থাও ছিল একই রকম। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গৃহের অভ্যন্তরে এসে কষ্ট দিত।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, যারা গৃহের অভ্যন্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দিত তারা ছিল আবু লাহাব, হাকাম ইবনে আবুল আস বিন উমাইয়্যা, উকবা বিন আবী মুঈত, আদী বিন হামরা ছাক্বাফী, ইবনুল আসদা হুযালী প্রমুখ। তারা সকলেই ছিল তাঁর প্রতিবেশী। হাকাম বিন আবুল আস ব্যতীত তাদের কারোরোই ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হয়নি।[১৭৫] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়তেন তখন তারা বকরির নাড়ি-ভুঁড়ি তার ওপর চাপিয়ে দিত। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একটি ঘর বানিয়ে তাতে নামায পড়তেন। সুতরাং, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

---

[১৭৩] দেখুন সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৩৫, ৩৩৬। কুরাইশরা হিংসা ও বিদ্বেষ ভরে রাসূলে কারীম সা. এর নাম দিয়েছিল 'নিন্দিত'। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাদের এ গালির পাল্টা জবাব দিয়েছেন। ইমাম বুখারী প্রণীত তারীখ ১/১। সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বুখারী ৭/১৬২। মুসনাদে আহমদ ২/২৪৪, ৩৪০, ৩৬৯।

[১৭৪] মুসতাদারাকে হাকীমে ২/৩৬১ এ রেওয়ায়েত করেছেন। এটা আরও বর্ণিত আছে, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১১/৪৯৮, হাদীস নং ১১৮১৭। মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৪/২৪৬, হাদীস নং ২৩৫৮। আবু নাঈম ইস্পাহানী প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ পৃষ্ঠা ৭১, হাদীস নং ৫৪। তাবরানী, ইবনে আবী হাতিম প্রমুখ নিজ নিজ কিতাবে কিছুটা-মতভেদ সহকারে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

[১৭৫] তিনি ছিলেন উমাইয়্যা খলীফা মারওয়ানের পিতা।

ওপর যখনই সেগুলি নিক্ষেপ করা হতো তিনি লাকড়ি দিয়ে তা বাইরে বের করতেন আর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, **হে বনু আবদে মানাফ! এটা কোন ধরনের সৌজন্যবোধ! অতঃপর তা রাস্তায় নিক্ষেপ করতেন।**[১৭৬]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে উকবা বিন আবী মুঈতের দুর্ভাগ্য আর দুষ্কর্মের পরিধি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর নিকটে বসে নামায আদায় করতেন আর আবু জাহল ও তার সঙ্গীরা পাশে বসা থাকত। তখন তারা একে অপরকে বলত, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যায় তখন তোমদের মধ্যে কে পারবে উটের ভুঁড়ি এনে তার মাথায় চাপিয়ে দিতে? এতে করে তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি দুর্ভাগা উকবা বিন আবী মুঈত[১৭৭] লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যেত এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সুযোগের অপেক্ষা করত। পরিশেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদায় যেতেন তখন সে তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে পিঠের ওপর সেগুলি চাপিয়ে দিত। আমি দূর থেকে সবকিছু কেবল দেখেই চলতাম। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! তখন আমার যদি তাকে হেফাযত করার শক্তি থাকত! তিনি বলেন, এরপর তারা সকলে হাসাহাসি শুরু করত এবং একে অপরের বিরুদ্ধে গর্ব ও অহঙ্কার করা শুরু করে দিত। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো সিজদায় পড়ে থাকতেন। তার তখনো মাথা উঠানোর ক্ষমতা ছিল না। পরিশেষে যখন ফাতেমা রা. এসে পিঠের ওপর থেকে সেগুলি সরিয়ে ফেলতেন তখন তিনি মাথা উঠাতেন। এরপরে তিনবার বলতেন, হে আল্লাহ! কুরাইশের বিরুদ্ধে আমি তোমার কাছে নালিশ করছি। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের বিরুদ্ধে বদ দুআ করতেন তখন তা তাদের কাছে ভারি খারাপ লাগত। তিনি বলেন : কেননা, তাদের বিশ্বাস ছিল এ শহরে যে দুআই করা হবে তা কবুল করা হবে। এরপরে তিনি নাম ধরে ধরে বদ দুআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ ! আমি আবু জাহল, উতবা বিন রবীআ, শায়বা বিন রবীআ, ওলীদ বিন উতবা, উমাইয়্যা বিন খলফ ও উকবা বিন আবী মুঈত প্রমুখের বিরুদ্ধে তোমার আদালতে মামলা দায়ের করছি। তিনি সপ্তম আরেক জনের নাম মুখে নিয়েছিলেন কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি। আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বদ দুআয় মুখে যাদের নাম

---

[১৭৬] ইবনে হিশাম ১/৪১৬।
[১৭৭] সহীহ বুখারী ১/৫৪৩।

নিয়েছিলেন আমি বদর রণাঙ্গনে তাদের সকলের নির্মম মৃত্যুর দৃশ্য নিজ চোখে দেখেছি।[১৭৮]

উমাইয়্যা বিন খলফ যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখত তখন তাঁর সামনে ও পেছনে সে তাকে নিন্দা করত। এরপর তার ব্যাপারে নাযিল হলো وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ধ্বংস হোক প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে সামনে ও পেছনে নিন্দা করে। [সূরা হুমাযাহ্]

ইবনে হিশাম বলেন, হুমাযা হলো ঐ ব্যক্তি যে প্রকাশ্যে মানুষের নিন্দা ও গালি-গালাজ করে। আর লুমাযা হলো ঐ ব্যক্তি যে গোপনে মানুষের নিন্দা করে ও কষ্ট দেয়।[১৭৯]

উমাইয়্যা বিন খলফের ভাই উবাই বিন খলফ আর উকবা বিন আবী মুঈত ছিল একে অন্যের প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধু। একবার উকবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে গিয়ে তাঁর কথা শুনলে উবাই তাকে চরম নিন্দা ও ভর্ৎসনা করে। উবাই তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকের ওপর থুথু নিক্ষেপের অনুরোধ জানায়। বন্ধু উবাইয়ের কথা মতো উকবা তাই করে। স্বয়ং উবাইও একবার একটি পুরনো হাড় ভেঙে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে বাতাসে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়।[১৮০]

আখনাস বিন শরীকও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভারি কষ্ট দিত। কুরআনে কারীমে তার বিশেষ নয়টি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারাই তার কাজকর্ম আর চারিত্রিক অবস্থা সহজে অনুমান করা যায়। সেগুলি হলো: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (١٠) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (١١) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (١٢) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ (١٣) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করেন না। যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফেরে। যে ভাল কাজে বাঁধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাপিষ্ঠ, কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত; [সূরা ক্বলম : ১০-১৩]

আবু জাহল মাঝেমধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনে যেত। কিন্তু এগুলোতে

---

[১৭৮] সহীহ বুখারীঃ উযূ পর্ব। 'মুসল্লীর শরীরে ময়লা কিংবা নাপাকী পতিত হলে করণীয়' অধ্যায় ১/৩৭, হাদীস নং ২৪০, ৫২০, ২৯৩৪, ৩১৮৫, ৩৮৫৪, ৩৯৬০। সপ্তম জন ছিলেন আম্মারা ইবনুল ওয়ালীদ, এটা স্পষ্ট রয়েছে ৫২০ নং হাদীসে।

[১৭৯] ইবনে হিশাম ১/৩৫৬, ৩৫৭।

[১৮০] ইবনে হিশাম ১/৩৬১, ৩৬২।

সে ঈমান আনত না কিংবা এগুলোর অনুসরণ-অনুকরণও করত না। এর থেকে সে শিক্ষা-দীক্ষা নিত না কিংবা তার হৃদয়ে সামান্য ভয়ের উদ্রেক হতো না। সে কখনো কথার দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দিত। কখনো আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দিত। আবার এটা নিয়ে সে অহঙ্কার করে বেড়াত। নিজের কুকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তার চোখ প্রশান্তি পেত এবং সে এটা নিয়ে চরম গর্ব কুড়াত। মনে হতে সে উল্লেখযোগ্য কিছু একটা করেছে। অথচ, হাকীকতে পুরোটাই ফাঁকা ও শূন্য। তার ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; [সূরা ক্বিয়ামাহ:৩১] সে তার জীবনে প্রথম যে দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হারাম শরীফে নামায পড়তে দেখেছিল সে দিন থেকেই তাকে বাঁধা দেওয়া শুরু করেছিল। একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আবু জাহল তাঁর পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সে তাকে বলল, মুহাম্মাদ! তোমাকে কি আমি নামায পড়তে নিষেধ করিনি? এরপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ধমক দিলো। রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন। তখন আবু জাহল বলল, মুহাম্মাদ! তোমার কী আছে? কী নিয়ে তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ? অথচ দেখো! এই মক্কা উপত্যকায় আমার মজলিস আর সমাবেশই সবচেয়ে বড়; সবচেয়ে জনসমাগমপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা তার জবাব দিলেন নিম্নোক্ত ভাষায় : فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (১৮) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক। আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। [সূরা আলাক : ১৭-১৮][১৮১]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘাড় ধরে তাকে ঘুরাতে ঘুরাতে বললেন, أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (٣٤) ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (৩৫) তোর দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ। অতঃপর তোর দুর্ভোগের ওপর দুর্ভোগ। [সূরা কিয়ামাহ : ৩৪-৩৫]

তখন আল্লাহর এই দুশমন বলল, মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম! তুমি ও তোমার পালনকর্তা আমার কিছুই করতে পারবে না। আমি মক্কার দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যারা চলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইয্যতের অধিকারী।[১৮২]

[১৮১] ইবনে জারীর, ইমাম তিরমিযীর রেওয়ায়েতেও এটা পাওয়া যায়।
[১৮২] দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৪৭৭। দুররুল মানসূর ৬/৪৭৮ ইত্যাদি।

বস্তুত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ধমকের পরেও আবু জাহল তার গোমরাহী ও জাহালতির মত্ততা থেকে সুস্থ ও সঠিক জীবনে ফিরে আসার ছিল না; ভ্রষ্টতার শরাব গিলে বছরের পর বছর মাতাল হয়ে থাকা এই মূর্খ সরদার হুঁশ ফিরে পাওয়ার ছিল না। বরং এতে তার জীবনের দুর্ভোগ আরও বেড়ে যায়। তার জীবনে নেমে আসে আরও অন্ধকার। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে ইমাম মুসলিম র. বর্ণনা করেন, আবু জাহল একবার মুশরিক সরদারদেরকে সমবেত করে বলল, আপনাদের সামনেই কি মুহাম্মাদ তার মাথা মাটিতে মিশিয়ে সিজদা করে? তারা বলল হাঁ। আবু জাহল বলল, লাত ও উয্যার কসম! আমি যদি তাকে এ অবস্থায় পাই তবে তার ঘাড় আমি মটকে দিব। তার চেহারা মাটির সঙ্গে আলিঙ্গন করাব। এরপরে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাকে নামায পড়তে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভেতরের পশুটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। জিঘাংসার প্রচ্ছন্ন অনল তার ভেতর ফুঁড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। সে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাড় পদদলিত করার অসদুদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলো। কিন্তু মানুষ হঠাৎ দেখতে পেল সে পেছনের দিকে ফিরে আসছে এবং তার দুই হাত দ্বারা কোনো কিছু থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। তারা বলল, কী হলো আবুল হাকাম! সে বলল, আমি যখন তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন দেখলাম তার আর আমার মাঝে এক অগ্নিকুণ্ডের পরিখা, কিছু ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **যদি সে আমার নিকটবর্তী হতো তবে ফেরেশতারা তার একটা একটা অঙ্গ করে ছিড়ে ফেলত।**[১৮৩]

এই ছিল সেই অত্যাচার ও অনাচার, বঞ্চনা ও গঞ্জনার সুদীর্ঘ ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত চিত্র; আজ থেকে শত শত বছর আগে ইসলামের শৈশবের দিনগুলোতে মক্কার নও মুসলিমরা যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী মুশরিকদের হাতে যা সহ্য করেছিল। অথচ, সেই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর পরিবারভুক্ত ও তার হারামের উপযুক্ত অধিবাসী মনে করত।

সুতরাং, শঙ্কা আর সংকট ঘেরা এই পরিস্থিতি আর সময়ের দাবি এটাই ছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন এমন একটি শক্তিশালী ও সুসংহত পথ অবলম্বন করবেন, যে পথে নির্যাতিত মুসলমানরা মুক্তি পাবে। যে পথে আসবে বিপদ সংকুল আঁধার রাতের পরে নয়া যিন্দিগির এক আলোর ভোর। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এমন দুইটি সুচিন্তিত ও বিজ্ঞোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী সময় দাওয়াতের পথ

---

[১৮৩] সহীহ মুসলিমঃ মুনাফিকদের গুণাবলী এবং তাদের বিধি-বিধান পর্ব, ৪/২১৫৪, হাদীস নং ৩৮।

সুগম আর প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেগুলির বিশাল প্রভাব ছিল। পদক্ষেপ দুটি নিম্নরূপ–

এক. দারুল আরকাম তথা আরকাম বিন আবুল আরকাম মাখযূমীর ঘরকে দাওয়াতের মারকায ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে গ্রহণ।

দুই. নির্যাতিত ও কষ্ট পীড়িত মুসলমানদেরকে হাবশার দিকে হিজরতের আদেশ দান।

দারুল আরকাম

এ ঘরটি ছিল সাফা পাহাড়ের পাদদেশে। বিরুদ্ধবাদীদের রক্ষচক্ষুর সীমানা থেকে অনেক দূরে। তুলনামূলক অনেকটা নিরাপদ ভেবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘরটিকে মুসলমানদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হওয়ার কেন্দ্র স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। এখানে বসে তিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতেন; তাদের আত্মাকে বিশুদ্ধ আর শুচিশুভ্র করে তুলতেন। তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আর হিকমত শিক্ষা দিতেন। এ ঘরটি বেছে নেওয়ার পেছনে আরও কিছু উদ্দেশ্য কাজ করছিল। আর তা ছিল মুসলমানরা এখানে যেন তাদের ইবাদত ও বন্দেগী আর ঈমান ও আমল ধারাবাহিকভাবে নিরাপদে চালিয়ে যেতে পারেন। আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা সুন্দরভাবে হাতে পেয়ে যান। আর যারা ইসলামে দাখিল হতে চান তারা স্বাধীনভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যান। জন মানবহীন এ পার্বত্য প্রান্তরে বিরুদ্ধবাদীরা যেন তাদের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে; শহরের অভ্যন্তরের প্রতিটি অলিতে গলিতে যাদের দাপাদাপি আর মাতামাতিতে ঘর থেকে বের হওয়াও কঠিন ছিল।

সন্দেহ নেই, যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে নিয়ে প্রকাশ্যে কোথাও সমবেত হতেন তবে মুশরিকরা তাদের থলিতে যা কিছু ছিল সবকিছু ব্যয় করে শতভাগ চেষ্টা চালাত মুসলমানদের ও তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াতে। তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা, সামর্থ্য আর কঠোরতা সবকিছুর বিনিময়ে হলেও মুসলমানদেরকে আত্মশুদ্ধি করতে কিংবা কিতাব ও হিকমত শিক্ষার মহা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস পেত। এ পথ ধরেই দুই দলের মধ্যে হয়তো কখনো ঠেলাঠেলি লেগে যেত। হয়তো তারা জড়িয়ে যেত রক্তক্ষয়ী লড়াই আর সংঘাতে। ফলে অকালে ঝরে পড়ত লাখো-কোটি বনী আদমের মূল্যবান প্রাণ-পুষ্প। বরং বলা যায় এমনটি হয়েও ছিল। যেমন ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন পার্বত্য উপত্যকায় গিয়ে সমবেত হতেন। অতঃপর তারা সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে নামায

পড়তেন। কুরাইশ কাফেরদের একটি দল একদিন তাদেরকে দেখে ফেলে। ফলে তারা তাদেরকে গালি দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. তাদের একজনকে আঘাত করেন। ফলে তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। আর এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রক্ত ঝরানোর কাহিনী।[১৮৪]

সবারই জানা আছে, যদি ইসলাম ও মুসলমানরা তখন কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন এবং তাদের মধ্যে মাঝেমধ্যে কোথাও কোথাও দৈবাৎ ঘটে যাওয়া ঠেলাঠেলি আর ঠোকাঠুকি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকত তবে তাতে প্রথম দলই ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হতো। পরিণতিতে একসময় মুসলমানরা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যেত। হারিয়ে যেত জীবনের খেলাঘর থেকে। সুতরাং, প্রজ্ঞা আর বুদ্ধিবৃত্তির চাহিদা ছিল এটাই যে, তখন নীরবতা ও নির্জনতা অবলম্বন করা হোক। গোপনীয়তাই তাদের এখনকার সাময়িক সঙ্গী হোক। এ কারণে সিংহভাগ সাহাবায়ে কেরামই তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা, ইবাদতের কথা এবং তাদের সকলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা গোপন রাখত। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্লাটফরমে দাঁড়ানো। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকে কাফের মুশরিকদের সভা সমিতিতে উচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের আযান দিতেন। খোলাখুলি ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে ইসলাম ও ইবাদতের দিকে ডাকতেন। পৃথিবীর কোনো কিছুই তাকে এ পথ থেকে কোনোদিন একটি মুহূর্তের জন্যও ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ শেষ করে তিনি আবার সেই পাহাড়ী পথ ধরতেন যে পথের প্রান্তে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকত দারুল আরকাম। কারণ তার দিনরাতের স্বপ্ন ছিল মুসলমানদের কল্যাণ ও মঙ্গল; ইসলামের বিজয় ও সফলতা।

হাবশায় প্রথম হিজরত

ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফের মুশরিকদের বিরোধিতা শুরু হয়েছিল নবুওতের চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি কিংবা শেষের দিকে। প্রথমে বিরোধ আর বিদ্রোহের এ আগুন জ্বলেছিল সামান্য মোম কিংবা প্রদীপের আগুনের মতো করে। কিন্তু দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস নিরবচ্ছিন্ন জ্বলার পরে এ আগুন ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। পরিশেষে নবুওতের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময় এটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। যৌবনের মদমত্ততায় দুনিয়ার বুকে সে কায়েম করল আখেরাতের কারখানার জীবন্ত জাহান্নাম। সুতরাং, মুসলমানদের জন্য মক্কা তখন আর নিরাপদ শহর ছিল না। তারা যন্ত্রণার এই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড

---

[১৮৪] ইবনে হিশাম ১/২৬৩।

থেকে নাজাতের জটিল মাসআলার সমাধানের বিভিন্ন সুরত আবিষ্কার করার ফিকিরে নিমগ্ন ছিল। আর ঠিক এ সময়ই নাজাত আর মুক্তির নতুন ভোরের ঘোষণা নিয়ে অবতীর্ণ হলো সূরা যুমার। এ সূরায় মুসলমানদেরকে জন্মভূমি ছেড়ে পরদেশে হিজরত করার পথ দেখিয়ে দেওয়া হলো। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো 'আল্লাহর জমিন মোটেও সংকীর্ণ নয়। لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। [সূরা যুমার : ১০]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতঃপূর্বেই এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, হাবশার বাদশা আসহামা নাজ্জাসী হলেন একজন আদিল ও ইনসাফগার বাদশা। তিনি আরও জানতে পেরেছিলেন যে, তার রাজ্যে কেউ কারও ওপর একটুকুও যুলুম করতে পারে না। তাই তিনি মুসলমানদেরকে তাদের দীন ও ধর্মকে, ঈমান ও ইবাদতকে বুকে আগলে নিয়ে হাবশার পথে হিজরত করার নির্দেশ দান করেন।[১৮৫]

নবুওতের পঞ্চম বছর রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম দলটি স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে হাবশার পথে হিজরত করে। এই দলের মোট সদস্য ছিল বারো জন পুরুষ আর চার জন মহিলা। তাদের নেতা ছিলেন হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রা.। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেয়ে রুকাইয়্যা রা.। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছেন, হযরত ইবরাহীম আ. ও লূত আ. এর পরে তারাই প্রথম দম্পতি যে দম্পতি আল্লাহর পথে হিজরত করেছিল।

কুরাইশরা যাতে তাদের এ সংবাদ জানতে না পারে এ জন্য দিনের আলোতে কোথাও লুকিয়ে থেকে রাতের আঁধারে তারা রাস্তায় নেমে পড়ে সামনের নতুন কোনো মনযিলের দিকে রওয়ানা হতেন। তাদের গন্তব্য ছিল লোহিত সাগরের সাঈবা বন্দর। ভাগ্য তাদের ভালো ছিল। বন্দরে পৌঁছে তারা হাবশাগামী দু'টি জাহাজ ঘাটে নঙ্গর করা দেখতে পেলেন। সামান্য কিছু সময় পরেই জাহাজ দুটি পাল উড়িয়ে তাদেরকে নিয়ে যাত্রা করল হাবশার পথে। লোহিত সাগরের উত্তাল বুকের অশান্ত ঊর্মীমালার সঙ্গে খেলে খেলে হেলেদুলে জাহাজ এগিয়ে চলল সামনের দিকে। ইতোমধ্যে কুরাইশরা তাদের গোপন সংবাদ জেনে গেল। হাবশাগামী মুহাজিরদের পশ্চাদ্ধাবনে তারা লোকও পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু ততক্ষণে

---

[১৮৫] দেখুন, বাইহাক্বী প্রণীত সুনানুল কুবরা ৯/৯।

জাহাজ তাদেরকে নিয়ে গেছে অনেক দূরে; দৃষ্টিসীমার বাইরে। বন্দর থেকে দূরে বহুদূরে আকাশ আর সাগর তরঙ্গের ছেলে খেলা আর গলাগলি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না পশ্চাদ্ধাবনকারী কুরাইশ বাহিনীর। অপরদিকে মুসলমানরা হাবশায় গিয়ে পৌঁছে প্রশান্তি আর নিরাপত্তার নিঃশ্বাস ফেললেন। খুঁজে পেলেন একটু শান্তি আর সুখের ঠিকানা।[১৮৬]

মুসলমানদের সঙ্গে মুশরিকদের সিজদা ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন

এ বছরই রমযান মাসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হারাম শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে ছিল কুরাইশের এক বিশাল জনসমাবেশ। তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ আর কওমের সরদাররাও সেখানে উপস্থিত ছিল। তিনি তাদের জনসমাবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকস্মিক কুরআনে কারীমের সূরা নজম তেলাওয়াত করা শুরু করলেন। ঐ সকল কাফেররা ইতঃপূর্বে কোনো দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনেছিল না। কেননা, তাদের নিজেদের অর্থহীন আলাপচারিতা আর গাল-গল্প থেকে বিরত থেকে এদিকে তারা কোনো দিনও মুখ ফেরানেরা সুযোগ পায়নি। তারা একে অপরকে বলত: لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ. আর কাফেররা বলে, তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হও। [সূরা হা-মীম-সিজদা : ২৬] কিন্তু যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ তাদের মাঝে উদিত হয়ে এটা তেলাওয়াত করতে লাগলেন আর তাদের কর্ণকুহরে এক অশ্রুতপূর্ব সুরের ঝঙ্কার আর ছন্দ তালের মাতন পতিত হলো তখন তাদের অনুভূতিতে আন্দোলন আর আলোড়নের ঝড় এলো। এ ছিল এমন এক ঝঙ্কার; কুরাইশরা তাদের জনমেও কোনো দিন যা শুনেনি। তাই তা তাদের মনের দরিয়ায় এক জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো। প্লাবিত করল হৃদয়ের সকল অনুভব আর অনুভূতি। পার্থিব দুনিয়া থেকে তারা সম্পূর্ণ বেখবর হয়ে মনোজগতের এক নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করল। এতদিনকার জীবন আর জগতের সবকিছু তারা ভুলে গেল। ক্ষণিকের মধ্যে নতুন কিছুর প্রত্যাশায় তাদের হৃদয় ও মন বেকারার ও উতলা হয়ে উঠল। পরিশেষে সূরার শেষ প্রান্তে এসে যখন তিনি অনুভব আর অনুভূতির দরিয়ায় জোয়ার জাগানিয়া আল্লাহর এই হুকুম তেলাওয়াত করলেন, فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا "সুতরাং তোমরা তার জন্য সেজদা করো আর কেবল তাঁরই ইবাদত করো"- এবং তিনি নিজেও সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন তখন

---

[১৮৬] যাদুল মাআদ ১/২৪।

কাফেরদের কেউ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। লুটিয়ে পড়ল তৃষ্ণার্ত প্রাণে নিজের প্রকৃত স্রষ্টার গৌরব আর মহিমাময় পদতলে। এত বেকারারি আর ভালোবাসা নিয়ে জীবনের কোনো দিন যা তারা করেনি। সত্য কথা কি-হক্ক আর হক্কানিয়্যাতের শাশ্বত জয়গান তখন মিথ্যা গর্ব-অহঙ্কার আর অর্থহীন দম্ভের পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিল। যার কারণে তাদের গোমর ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। তখন কেউই নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। লুটিয়ে পড়েছিল সৃষ্টিগত দুর্বলতার আবেদনে স্রষ্টার পায়ে।[১৮৭]

কিন্তু পরে যখন তাদের হুঁশ ফিরে এলো। যখন তারা দেখতে পেল, আল্লাহর কালামের দুর্লভ শক্তি আর অজেয় ক্ষমতা তাদের হৃদয় আর মনের লাগাম হাতে তুলে নিয়েছে। যার টুঁটি চেপে ধরতে তাদের এত বছরের তাকলীফ ও মেহনত চলছে, শেষ পর্যন্ত তার সামনেই তাদের সকলের উন্নত শির অবনত হয়ে গেছে। তখন তাদের ওপর লজ্জা আর অপমানের দুয়ার খুলে গেল। বুদ্ধি-বিলোপের পাগলা ঘোড়া তাদের মাথায় সওয়ার হয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটতে লাগল। যে সকল মুশরিকরা এ সমাবেশে উপস্থিত ছিল না চতুর্দিক থেকে তারা তাদের ওপর নিন্দা আর তিরষ্কারের বিষবাণ নিক্ষেপ করতে লাগল তখন তারা নতুন করে ভাবনা শুরু করল। উপায়ান্তর না দেখে তারা এর সকল দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে। তারা সর্বত্র এ মিথ্যা রটিয়ে দিলো যে, নবী কারীম তাদের মূর্তির প্রশংসা ও জয়গান গেয়েছেন। এতকাল ধরে যা তারা দাবি করে আসছিল এক্ষণে তিনি তার সাফাই গেয়েছেন। তিনি নিজ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَى، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى 'এগুলি সম্মান ও ইয্‌যতওয়ালা বড় বড় দেবতা; নিঃসন্দেহে তাদের সুপারিশ গৃহীত হবে'।

কিন্তু ইতিহাসে এটা কাফির চরিত্রের কোনো বিস্ময়কর ঘটনা ছিল না। কারণ মুসলমানদের সঙ্গে ধোঁকা ও কপটতা, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা আর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত ছিল তাদের জাতীয় চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে মিথ্যাকে তারা ভালোবাসত হৃদয় দিয়ে। মুনাফেকি করত তারা পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠার (?) সঙ্গে। সুতরাং, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর তাদের এ খোলামেলা অপবাদ আশ্চর্যের কিছু ছিল না।

একে একে এ সংবাদ হাবশার মুহাজিরদের কাছে গিয়েও পৌছল। কিন্তু এ সংবাদের পেটের বদলে পিঠই তাদের ভাগ্যে জুটল। মক্কায় ঠিক যেমন ঘটেছিল

---

১৮৭ ইমাম বুখারী র. ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে এ সিজদার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেখুন 'সিজদাতুন নাজমি' অধ্যায় ও সুজূদিল মুসলিমীনা ওয়াল মুশরিকীন অধ্যায়, ১/১৪৬। আরও দেখুন 'মক্কায় রাসূলে কারীম সা. ও সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের থেকে যার মুখামুখি হয়েছেন' অধ্যায়, ১/৫৪৩।

তারা ঠিক এর উল্টাটি জানতে পারল। তারা খবর পেল কুরাইশের সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং তারা না ভেবে-চিন্তেই ঐ বছর শাওয়াল মাসেই মক্কায় ফিরতি পথ ধরল। মক্কার কাছাকাছি এসে যখন প্রকৃত বিষয় তারা ঠাওর করতে পারল অনেকে সেখান থেকেই আবার হাবশায় চলে গেল। বাকিরা লুকিয়ে লুকিয়ে কিংবা কুরাইশের কারও ছত্রছায়ায় মক্কায় প্রবেশ করল।[১৮৮]

মুহাজির ও মুসলমাদের ওপর কুরাইশের পক্ষ থেকে যলুম আর নির্যাতনের মাত্রা এবার আরও বেড়ে গেল। এখন সেই অত্যাচার আর নির্যাতনের মিছিলে তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও শরিক হলো। কেননা, হাবশার বাদশা নাজ্জাসী মুসলমানদের সঙ্গে যে ভালো ও মহান আচরণ করেছিলেন তা কুরাইশদের হৃদয়ে এক বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। দিবানিশি তারা এতে হিংসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিল। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে দ্বিতীয় বার হাবশার পথে হিজরত ব্যতীত আর কোনো উপায়ন্তর খুঁজে পেলেন না।

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

মুসলমানরা দ্বিতীয় বার হাবশার পথে হিজরতের প্রস্তুতি নিলো। তবে তাদের দ্বিতীয় বার এই হিজরত ছিল প্রথম বারের চেয়ে আরও বেশি ব্যাপক; আরও বেশি কষ্টসাধ্য ও বিপদসংকুল। কারণ, কুরাইশরা এবার তাদের হিজরতের কথা জেনে গিয়েছিল এবং তাদেরকে পথিমধ্যে বাঁধা দেওয়ার বিষয়টিও চূড়ান্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করছিল। আর আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য ছিল তাদের কদমে কদমে। ফলে কাফেররা তাদের নাগাল পাওয়ার আগেই তারা নিরাপদে নাজ্জাসীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

এবারের হিজরতে মুহাজিরদের সংখ্যা ছিল ৮২ বা ৮৩ জন পুরুষ আর ১৮ কিংবা ১৯ জন নারী। আম্মার বিন ইয়াসির রা. হিজরত করেছিলেন কি না এ ব্যাপারে ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।[১৮৯]

হাবশার মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশের ধারাবাহিক ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা নিজেদের জন্য ও নিজেদের দীনের জন্য হাবশাকে সুন্দর ও নিরাপদ একটি দুর্গ হিসেবে পেয়ে যাবে মুশরিকদের পক্ষে কখনোই এটি কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিল না। তাই তারা প্রচণ্ড হিংসার আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তারা তাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী দুজন তথা আমর

[১৮৮] ইবনে হিশাম ১/৩৬৪। যাদুল মাআদ ১/২৪, ২/৪৪।
[১৮৯] দেখুন যাদুল মাআদ ১/২৪।

বিন আস আর আব্দুল্লাহ বিন আবী রবীআ-তখনো তারা মুসলমান হয়নি- কে বাদশা নাজ্জাসী ও তার সভাষদদের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকন আর হাদিয়া-তোহফা দিয়ে পাঠিয়ে দিলো।

তারা প্রথমে বাদশার সভাষদদের কাছে গিয়ে কুরাইশের দেওয়া হাদিয়া-তোহফা পেশ করতে বলল। এরপর বাদশা নাজ্জাসীর নিকট কী কী বলে মুসলমানদেরকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে তা শিখিয়ে দিলো। যখন তাদের নিজেদের ভেতরকার শলা-পরামর্শ সম্পন্ন হলো তখন তারা সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাজ্জাসীর দরবারে এসে হাজির হলো। তার দরবারে কুরাইশের পাঠানো উপঢৌকন পেশ করে বলতে লাগল:

মহামান্য সম্রাট! আমাদের কিছু বেকুব নওজোয়ান আপনার রাজ্যে পালিয়ে এসে আস্তানা গেড়েছে। তারা তাদের কওমের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আপনার ধর্ম গ্রহণ করা থেকেও বিরত থেকেছে। এর বিপরীতে তারা একটি নতুন দীন আবিষ্কার করেছে। আপনি কিংবা আমরা তথা আমাদের কেউই যে দীন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে কোনো দিন কিছু শুনিনি। কিছু জানিনি। তাই এখন তাদের কবীলার সরদার ও আত্মীয়-স্বজনরা আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। উদ্দেশ্য-আপনি এদেরকে ধরে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। কেননা তারাই এদের ব্যাপারে অধিকতর নেগাহবান; এদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা সম্পর্কে অধিকতর পরিজ্ঞাত।

সভাষদগণও তাদের দুজনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠল, বাদশাহ মহামান্য! তারা দুজন সম্পূর্ণ সত্যবাদী। আপনি ঐ সকল বেকুবকে ধরে তাদের হাতে তুলে দিন। তারা তাদেরকে নিজ জাতি ও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

কিন্তু বাদশাহ নাজ্জাসী ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, বিষয়টির সুষ্ঠ তদন্ত আর উভয় পক্ষের কথা শোনা ব্যতীত ভালো-মন্দ কোনো ফয়সালা দেওয়া যাবে না। তাই তিনি মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে হাযির হলো। আসার আগেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল, বাঁচা মরা যা-ই কিছু হোক সৎ আর সত্যের পথেই তারা অটল ও অবিচল থাকবে। অতঃপর বাদশা নাজ্জাসী তাদেরকে বললেন, সেটা কোন্ ধর্ম যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের কওমের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ? যা হাতে পেয়ে তোমরা না তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম আর না আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেছো! যার মাধ্যমে তোমরা আমাদের ব্যবসা লাটে উঠিয়েছ!!

জাফর বিন আবু তালিব সকলের পক্ষ থেকে সামনে এগিয়ে তাদের নতুন এই দীনের রূপরেখা আর জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা তুলে ধরলেন। অতি সুন্দর ও

কোমলতার সঙ্গে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সম্রাট নাজ্জাসীর কর্ণ কুহরে পতিত হতে লাগল নও মুসলিম জাফর বিন আবী তালিবের বক্তব্য:

মহামান্য সম্রাট! আমরা জাহেলী যুগের জাহেল মানুষ ছিলাম। আমরা মূর্তি-পূজা করতাম আর মৃত জন্তু জানোয়ার ভক্ষণ করতাম! দুনিয়ার সকল অশ্লীলতার আমরা ছিলাম গুরুঠাকুর! আমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করতাম। আমাদের শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে চিবিয়ে খাচ্ছিল। পৃথিবীতে এমন কোনো দুষ্কর্ম ছিল না যা আমরা করতাম না। এমন সময় মহামহিম আল্লাহ তাআলা ঠিক আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁর বংশ পরম্পরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর সততা, তাঁর আমানতদারি, তাঁর পবিত্রতা আর তাঁর চরিত্রের শুচিশুভ্রতা সম্পর্কে আমরা পরিপূর্ণ পরিজ্ঞাত। তিনি এসে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তিনি আমাদেরকে তাওহীদের দীক্ষা দিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন যেন আমরা আল্লাহকে এক জানি। তাঁর ইবাদত-বন্দেগি করি। এতদিন আমরা আর আমাদের বাপ-দাদারা তাকে ছেড়ে যে পাথরের পূজা করতাম; মূর্তির বন্দনা গাইতাম তা যেন ছেড়ে দিই। তিনি আমাদেরকে আদেশ দিলেন যেন আমরা সর্বদা সত্য কথা বলি; মানুষের রাখা আমানত আদায় করে দিই; আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি; প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি; সব ধরনের রক্তপাত আর হারাম থেকে বেঁচে থাকি। তিনি আমাদেরকে আরও নির্দেশ করলেন, যেন কোনো দিন আমরা অশ্লীলতায় জড়িয়ে না-পড়ি; যেন মিথ্যা কথা কোনো দিন না বলি; অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষণ না করি; সতী-সাধ্বী নারীর ওপর মিথ্যা অপবাদের কলঙ্ক কালিমা চাপিয়ে না দিই। তিনি আমাদেরকে আরও বললেন, যেন আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করি; তাঁর সঙ্গে অন্য কিছু শরিক না করি। তিনি আমাদেরকে নামায, রোযা আর যাকাতের-এভাবে ইসলামের কয়েকটি বিধি বিধানের কথা তিনি বললেন- নির্দেশ দিলেন। সুতরাং, আমরা তাকে সত্যায়ন করলাম। তার ওপর আমরা ঈমান আনলাম। আল্লাহর যে দীন আর বিধান তিনি নিয়ে এলেন সে ক্ষেত্রে আমরা তার ইত্তেবা ও অনুসরণ করলাম। আমরা এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলাম। এখন আর আমরা তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করি না। তিনি আমাদের ওপর যা কিছু হারাম করলেন আমরা সেগুলো হারাম বলে জানতে লাগলাম। তিনি আমাদের জন্য যা কিছু হালাল করলেন আমরা সেগুলোকে হারাম বলে জানতে লাগলাম। আর এ কারণে আমাদের কওম আর কবীলার লোকগুলি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসল। তারা আমাদের ওপর সীমালঙ্ঘন করল। তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন যুলুম আর নির্যাতনের পাহাড় ভেঙে ফেলল। তারা চাইল আমরা যেন এক

আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে আবার ফিরে যাই মূর্তি-পূজার সেই ঘনঘোর অন্ধকারে; যে অন্ধকার থেকে তার বদৌলতে আমরা নাজাত পেয়েছিলাম। যেই অন্ধকার কারারাজ্য থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা এক নওল আলোর দুনিয়ার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে ডাকল যেন আমরা আগে যে সকল ঘৃণিত ও বাজে বস্তু হালাল মনে করতাম এখন আবার সেগুলো হালাল মনে করি। এরপরে যখন তারা আমাদের ওপর জোর জবরদস্তি চালাতে লাগল; যখন আমাদের ওপর বিভিন্ন যুলুম আর নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখল; আমাদের দীন আর আমাদের নিজেদের মাঝে তারা প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল তখন আমরা আমাদের নিজেদের ও নিজেদের বাপ-দাদার ভিটে-মাটি ত্যাগ করে আপনার এ দূর দেশে পাড়ি জমালাম। অন্য সবাইকে রেখে আমরা আপনাকে বেছে নিলাম। আপনার কাছে আসাকেই আমরা পছন্দ করলাম। তাই হে মহামান্য বাদশাহ! আমাদের আশা; আপনার কাছে আমরা কখনোই যুলুম আর নির্যাতনের শিকার হব না।

সম্রাট নাজ্জাসী তাকে বললেন, তোমাদের নবী আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমাদের কাছে কি তার কোনো কিছু আছে? জাফর রা. তাকে হাঁ সূচক জবাব দিলেন। অতঃপর নাজ্জাসী বললেন, তবে আমার সামনে তা পাঠ করো। জাফর রা. তখন সূরা মারইয়ামের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত তার সামনে তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর কসম! নাজ্জাসী তার চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলেন না। তার চোখ বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল। চোখের পানিতে ঘন শ্মশ্রু অভিষিক্ত হয়ে উঠল। সভাষদগণও এতটা কাঁদলেন যে, তাদের হাতে থাকা কিতাব ভিজে গেল। নাজ্জাসী তাদেরকে বললেন, খোদার কসম! এতো হুবহু সেই জিনিস যা নিয়ে এসেছিলেন হযরত ঈসা আ.। হযরত ঈসার পয়গাম আর এ পয়গাম তো এক অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত। সুতরাং, তোমরা উভয়ে চলে যাও! আল্লাহর কসম! তাদেরকে আমি কোনো দিনও তোমাদের হাতে তুলে দেব না।

সুতরাং, আমর বিন আস আর আব্দুল্লাহ বিন রবীআ বাদশার দরবার থেকে বের হয়ে এলো। বের হওয়ার সময় আমর বিন আস আব্দুল্লাহ বিন রবীআ কে বলল, আল্লাহর কসম! আগামী কাল বাদশার নিকট তাদের এমন কিছু দিক তুলে ধরব যার মাধ্যমে তাদের গোড়া কেটে দিব। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন রবীআ তাকে বাঁধা দিয়ে বলল, এমনটি করো না! কারণ যদিও তারা আমাদের বিরোধিতা করেছে তবুও তো তারা আমাদের আত্মীয়-স্বজন আর কওমের লোক। কিন্তু আমর নিজ রায়ের ওপর অনড় রইল।

পরের দিন আমর বাদশাহ নাজ্জাসীকে লক্ষ্য করে বলল, মহামান্য! তারা ঈসা ইবনে মারইয়ামের ব্যাপারে বড় জঘন্য কথা বলে। তার এ কথা শুনে

নাজ্জাসী ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে মুসলিম মুহাজিরদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য লোক পাঠালেন। তারা এ খবর পেয়ে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সুদৃঢ় সংকল্প করলেন যে, যা-ই হোক হক্ব আর হক্বানিয়্যাতের ওপর আমাদের অটল থাকতেই হবে। সুতরাং, তারা যখন বাদশার দরবারে হাযির হলেন বাদশাহ তাদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। হযরত জাফর রা. তাকে উত্তর দিলেন আমরা এ ব্যাপারে সেই বিশ্বাস রাখি আমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তা হলো হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম হলেন আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর রূহ ও তাঁর পবিত্র কথামালা যা তিনি নিষ্পাপ কুমারী মারইয়ামের গর্ভাশয়ে ফুঁকে দিয়েছিলেন।

তখন নাজ্জাসী জমিন থেকে একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা যা কিছু বলেছ তার আগে বেড়ে ঈসা ইবনে মারইয়াম এ কাষ্ঠখণ্ডটির মতোও ছিলেন না। তার এ কথা শুনে সভাষদগণ গলা ঝারা দিলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদিও তোমরা গলা ঝাড়া দিচ্ছ কিন্তু সত্য ব্যাপার তা-ই ছিল।

অতঃপর তিনি মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা আমার এ রাজ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে থাকবেন। যে আপনাদেরকে গালি দিবে তার ওপর জরিমানা ধার্য করা হবে। আপনাদের কাউকে কষ্ট দেওয়ার বিনিময়ে আমার জন্য স্বর্ণের পাহাড় হবে এটা আমার কোনো দিনের কামনা নয়।

এরপর তিনি তার চারপাশে যারা বসা ছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ লোক দুটির দেওয়া সমস্ত হাদিয়া তোহফা ফেরত দিয়ে দাও! কেননা, তা আমার কোনো প্রয়োজন নেই! আল্লাহর কসম! তিনি যখন আমার রাজ্য আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি আমার কাছ থেকে কোনো ঘুষ নেননি; সুতরাং আমি কি আজ তাঁর পথে ঘুষ নিতে পারি? তিনি আমার ক্ষেত্রে কোনো মানুষের কথা শুনেননি। সুতরাং, আমি কি তাঁর পথে মানুষের কথা শুনতে যাব?

এ ঘটনার বর্ণনাকারী উম্মে সালামা রা. বলেন, অতঃপর তারা দুজন ভগ্ন হৃদয়ে যা কিছু নিয়ে এসেছিল সবকিছু নিয়ে নাজ্জাসীর দরবার থেকে বেরিয়ে এলো। ওদিকে আমরা নাজ্জাসীর সুন্দর রাজ্যে সুন্দর মানুষের সঙ্গে সুখ আর শান্তিতে সুন্দর জীবন যাপন করতে লাগলাম।[১৯০]

এই হলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। কোনো বর্ণনা মতে আমর বিন আসকে পাঠানো হয়েছিল বদর যুদ্ধের পরে। আবার কেউ কেউ এই উভয় বর্ণনার মাঝে

---

[১৯০] ইবনে হিশাম ১/৩৩৪-৩৩৮।

এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, তাকে মোট দুই বার পাঠানো হয়েছিল। তবে সে ক্ষেত্রে তারা দ্বিতীয় বার পাঠানোর ঘটনায় বাদশা নাজ্জাসী আর তাদের মাঝে হুবহু সেই কথপোকথন সওয়াল-জওয়াব তুলে ধরা হয়েছে যা ইবনে ইসহাক এখানে রেওয়ায়েত করেছেন। আর ঘটনায় বর্ণিত সুওয়ালগুলোর দ্বারাও বোঝা যায় এটা ছিল প্রথম বারের কথা। তাই গ্রহণযোগ্য মত হলো মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা মুশরিকদের তরফ থেকে একবারই চালানো হয়েছিল। আর তা ছিল হিজরতের অব্যবহিত পরের ঘটনা।

অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি ও স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার অপচেষ্টা

যখন মুশরিকদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্র একের পর এক টানা ব্যর্থতার পরিচয় দিলো। যখন তারা হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে ফিরিয়ে আনার বিভিন্ন ফন্দি এঁটেও প্রাপ্তির খাতায় শেষ পর্যন্ত শূন্য পেল। যখন ভাগ্য তাদেরকে তাদের জীবনের পদে পদে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাল। তখন তারা রাগ আর ক্রোধে ফেটে পড়ল। জিঘাংসার প্রবল নেশা তাদের মধ্যে ভয়াল হিংস্র রূপ ধারণ করল। তারা মক্কায় থেকে যাওয়া মুসলমানদের ওপর পাহাড় হয়ে ভেঙে পড়ল। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে তারা দুশমনির বাহু প্রসারিত করল। তাদের কর্মপন্থা আর বিভিন্ন পদক্ষেপের দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিন্দিগির উপসংহার টানতে চাচ্ছিল। মুসলমানদের শেষ দেখে নেওয়ার আকাঙ্খা তাদের দেহ ও মনে বড় প্রবল আকার ধারণ করছিল। কারণ তারা ভেবে নিয়েছিল, এর মাধ্যমে তারা খুব সহজে ঐ ফেতনার মূলোৎপাটন করতে পারবে, যা তাদের যিন্দিগির ফুলের বিছানাকে কাঁটায় কাঁটায় ভরিয়ে দিয়েছে।

অপরদিকে যে সকল মুসলমান মক্কায় রয়ে গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। তাদের কেউ কেউ নিজেই শরীফ ও সম্মানিত ছিল। আবার কেউ কেউ বড় কোনো নেতা কিংবা সরদারের আশ্রয়ে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ইসলামকে যথাসাধ্য লুকিয়ে রাখতেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের চোখ থেকে দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। তবে ভাগ্যে লেখা থাকলে ফেরানোর সাধ্য কার! এত কিছুর পরেও তারা কাফের মুশরিকদের জুলুম ও অত্যাচার থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা আর মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করতে পারলেন না।

অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি প্রকাশ্যে বিরুদ্ধবাদীদের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন ও আল্লাহর ইবাদত করতেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় তরীকাতেই

মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকতেন। এ ক্ষেত্রে পৃথিবীর কেউ তাকে বারণ করার মতো ছিল না। কেউ তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর মতো ছিল না। কারণ, এটা ছিল আল্লাহর পয়গামের তাবলীগের একটি অংশ; আর এটির উদ্বোধন হয়েছিল সে দিন, যে দিন নাযিল হয়েছিল আল্লাহর বাণী: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) আপনাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনি তাই-ই প্রকাশ করুন ! আর মুশরিকদের থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। [সূরা হিজর:৯৪] এ কারণে তারা যখনই চাইত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথে বাধা পয়ে দাঁড়াতে পারত। তাদের বাহ্যিক কাজ-কর্ম আর মনের গহীনে লুক্কায়িত অভ্যন্তরীণ ইচ্ছা আর অভিরুচির পথে যে বিষয়গুলি প্রাচীর হয়ে দাঁড়াত তা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মান ও মর্যাদা, তাঁর শুচিতা ও শ্লীলতা। আবু তালিবের যিম্মাদারি আর সম্মান। পরোক্ষ নিন্দাভীতি আর তাদের বিরুদ্ধে বনু হাশিমের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। এভাবে বাহ্যিক দিক দিয়ে এগুলির কিছু একটা প্রভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে তাদের কাঙ্খিত স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে এগুলির এতটুকু প্রভাবও ছিল না। হাকীকতে তারা এগুলোকে জড় পদার্থ ও অর্থহীন বলে গণ্য করত। জীবনের রণোন্মাদ উন্মাতাল ময়দানে যার কোনো মূল্য নেই। কারণ সেদিন থেকে এগুলি তাদের নিকট হালকা আর মূল্যহীন হতে শুরু করেছিল যে দিন তারা অনুভব করতে পেরেছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের সামনে তাদের ঐতিহ্যবাহী পৌত্তলিক অবকাঠামো আর দীনি ফাযলামির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

উল্লিখিত বক্তব্যের সবচেয়ে বড় দলীল হলো এ সীরাতের গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান এ সময়কার ঘটনাবলি।

এক. একদিন আবু লাহাবের ছেলে উতাইবা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলো। এরপরে সে বলল আমি وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ....ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى এর সঙ্গে কুফরি করি। এ কথা বলে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর চড়াও হলো। তার জামা মুবারক ছিঁড়ে ফেলল। তাঁর চেহারা মুবারকে থুথু নিক্ষেপ করেছিল কিন্তু থুথু গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চন্দ্র বদনে পতিত হয়নি। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বদ দুআ করলেন এবং বললেন, **হে আল্লাহ! তোমার একটি কুকুরকে তার ওপর লেলিয়ে দাও!**

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআ মঞ্জুর হলো। কারণ, এরপর উতাইবা কুরাইশের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ার পথে রওয়ানা

হলো। পথিমধ্যে যখন তারা এক রাতে সিরিয়ার যারকা নামক স্থানে এসে যাত্রা বিরতি করল তখন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে সিংহ এসে ঘিরে ধরল। তখন উতাইবা বলতে লাগল: হায় আমার ধ্বংস! আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই এখন সে আমাকে খেয়ে ফেলবে। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য এই বদ দুআই করেছিল। হায় দুর্ভাগ্য! আমি আজ সিরিয়ায় সে মক্কায়। আর সেই মক্কায় বসেই সে আমাকে মেরে ফেলল। সে কারণে তারা সবাই তাকে সকলের মধ্যখানে রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু রাতে সিংহটি এসে সকলকে টপকিয়ে মাঝখান থেকে তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে গেল।[১৯১]

দুই. একদা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন উকবা বিন আবী মুঈত এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘাড় মুবারক পা দিয়ে চেপে ধরল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এতটা আঘাত পেয়েছিলেন যে, তার দুই চোখ কোটর থেকে বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।[১৯২]

তিন. এ সকল ধূর্ত ও কুচক্রী পৌত্তলিক গোষ্ঠী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার পরিকল্পনা করারও দুঃসাহস দেখিয়েছিল। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, একবার মক্কার মুশরিকরা সবাই কাবার হাতীমে সমবেত হয়েছিল। আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কথায় কথায় এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসঙ্গ চলে এলো। তারা বলল, এ লোকটির ব্যাপারে আমরা যতটা সবর করেছি দুনিয়ার কারও জন্য এতটা সবর করিনি। এক গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ ব্যাপারেও আমরা তাকে কিছুই বলিনি। তারা ইত্যকার আলোচনায় লিপ্ত ছিল ঠিক এমন সময় সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদয় ঘটল। কিন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দিক ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা গিয়ে হজরে আসওয়াদ চুমু খেলেন। এরপর তাদের চারদিকে ঘুরে বাইতুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে লাগলেন। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একটা কটু কথা বলে খোঁচা মারল। আমি রাসূলের চেহারা মুবারকে এর চিহ্ন দেখতে পেলাম। এরপর দ্বিতীয় বার যখন তিনি তাওয়াফ করে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তারা আবারও তাকে খোঁচা মারল। আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চোখে মুখে এর আলামত খুঁজে পেলাম। এরপরে তৃতীয়বারও একই কাহিনী

---

[১৯১] দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ২/৫৮৫। শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত 'মুখতাসারুস সীরাহ' পৃষ্ঠা ১৩৫।
[১৯২] মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ১১৩।

ঘটল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থমকে দাঁড়ালেন। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, **হে কুরাইশ ! তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? ঐ সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে রয়েছে আমার জীবন, আমি তোমাদের নিকট সর্বনাশ হয়ে এসেছি।**

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা তাদের কর্ণকুহরের পর্দা ভেদ করে কলবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। গোটা সভায় নেমে এলো সুনসান নীরবতা। যেন সকলের মাথার ওপর পাখি চেপে বসেছে। এমনকি তাদের মধ্য থেকে যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বেশি বিরোধী ও তার ওপর সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিল সে দারুণ নম্র ও বিনয়মাখা কণ্ঠে বলল, হে আবুল কাসিম! তুমি ফিরে যাও! আল্লাহর কসম! মূর্খতা আর বোকামি কখনোই তোমাকে স্পর্শ করতে পারেনি'।

পরের দিন সবাই আবার তার ব্যাপারে আলোচনার জন্য সমবেত হলো। ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে উদিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তারা সকলে মিলে চোখের পলকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চতুর্দিক থেকে তাকে বনের হিংস্র পশুর মতো ঘিরে ধরল প্রেতাত্মারা। তাদের মধ্যে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গলার চাদর ধরে টানাটানি করতে। ওদিকে হযরত আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেফাযতের কাজে লেগে গেলেন। তিনি কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন আমার রব একজন। এরপরে তারা সবাই ফিরে গেল। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আক্রমণের এমন নজিরবিহীন ঘটনা আমি এর আগে পরে কোনো দিন প্রত্যক্ষ করিনি।[১৯৩]

আসমা বিনতে আবু বকর রা. রেওয়ায়েত করেন, একদা হযরত আবু বকরের কাছে এ আওয়ায এসে পৌঁছল যে, তোমার সঙ্গীর প্রাণ রক্ষা করো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে গেলেন। তার মাথায় তখন চারটি বেণি ছিল। তিনি এ কথা বলতে বলতে বের হয়েছিলেন 'তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন, আমার রব একজন'?[১৯৪]

তার এ কথা শুনে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ছেড়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি যখন ফিরে এলেন তখন আমরা তার

---

১৯৩ ইবনে হিশাম ১/২৮৯, ২৯০।
১৯৪ সহীহ বুখারী: 'মক্কাতে রাসূলে কারীম সা. ও সাহাবায়ে মুশরিকদের পক্ষ থেকে যা কিছুর সম্মুখীন হয়েছেন' অধ্যায় ১/৫৪৪।

মাথার যেখানেই হাত রাখতাম আমাদের আঙ্গুলের স্পর্শে সেখানের চুল উঠে আসত। [১৯৫]

হামযা রা. এর ইসলাম গ্রহণ

এভাবে যখন যুলুম আর অত্যাচার, দুশমনি আর রেষারেষির কালো মেঘের ঘনঘটায় ছেয়ে গিয়েছিল গোটা গগণমণ্ডল। ইসলামের উদীয়মান আকাশের বুক ভরে গিয়েছিল হিংসা ও দ্বেষের তমসায়। হতাশা আর দুঃখবাদের প্রতিপত্তির মুখে দূর দিগন্তে হারিয়ে গিয়েছিল মিটিমিটি জ্বলে থাকা মিষ্টি আশার তারাগুলো। ঠিক তখনই অন্ধকার দিগন্তের এক কোণে খেলে গেল নতুন বিদ্যুৎ-বিভা-তরঙ্গ। নিরাশার তমোময় আকাশের আঁধার-ঘেরা বুক ছিন্ন করে উঁকি দিলো নতুন আশার রাঙা সূর্য। এ আলোয় আঁধারের ভাগাড়ে পড়ে থাকা ইসলামের পথ আবার আলোকিত হয়ে উঠল। সে পথে হেঁটে হেঁটে হেরার রাজ তোরণে এসে উপনীত হলো সত্য সন্ধানী এক নতুন মুসাফির। ইসলামের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ হযরত আমীরে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.। এটা ছিল নবুওতের ষষ্ঠ বছরের শেষের দিকের ঘটনা। বিশুদ্ধ মতে মাসটি ছিল যিলহজ্জ।

ইসলাম গ্রহণের পটভূমি: একদিন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে আবু জাহল যাচ্ছিল। যাওয়ার সময় সে তার অভ্যাস মতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অনর্থক কষ্ট দিয়ে গেল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব, নির্বাক। তার এ অত্যাচারের একটুকু প্রতিবাদ তিনি করলেন না। সুযোগ পেয়ে আবু জাহল আরও সামনে বাড়ার দুঃসাহস দেখালো। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথায় পাথর দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল নবীয়ে দোজাহানের শির মুবারক থেকে। এরপরে সে কাবার কাছে কুরাইশের একটি মজলিসে চলে গেল। সাফা পাহাড়ের ওপরে বাস করত আব্দুল্লাহ বিন জুদআনের একজন দাসী। সে দূর থেকে এ ঘটনা দেখছিল। হযরত হামযা রা. তীর-ধনুক গুছিয়ে শিকার থেকে বাড়ির পথ ধরে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে সেই দাসী আবু জাহলের কুকর্মের কথা সবিস্তারে তার কাছে খুলে বলল। গোসসা আর ক্রোধে হামযা রা. অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের আত্মাভিমানী, বিচক্ষণ আর প্রচণ্ড ক্ষমতাধর যুবক। তাই নিজেকে আর মানিয়ে রাখতে পারলেন না। ছুটে চললেন আবু জাহলের কাছে। কাউকে সঙ্গে নিলেন না। মনে মনে ঠিক করলেন দেখা মাত্রই এক আঘাতে তার কেল্লা ফতে করতে হবে। মসজিদে হারামে ঢুকে তার মাথার কাছে গিয়ে

---

[১৯৫] শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত 'মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ১১৩।

বললেন, হে নির্লজ্জ বায়ুত্যাগী! আমি আমার ভাতিজার ধর্মের ওপর থাকা সত্ত্বেও তাকে তুমি গালি দিচ্ছ। এরপর তাকে হাতের ধনুক দ্বারা সজোরে আঘাত করলেন। তার মাথায় কয়েক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হলো। এতে আবু জাহলের গোত্র বনু মাখযূম আর হামযার গোত্র বনু হাশিম পরস্পরের বিরুদ্ধে নিমেষেই কৃপাণপাণি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তাদের বাঁধ সাধল আবু জাহল। সে বলল: আবু আম্মারাকে তোমরা কিছু বলো না; কারণ, আমিই আগে তার ভাতিজাকে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করেছি। [১৯৬]

হামযার ইসলাম ছিল প্রথমত এক ব্যক্তির দম্ভ আর জাত্যভিমানের ফলাফল; যে তার প্রিয় কাউকে লাঞ্ছিত কিংবা বঞ্চিত হওয়ার কথা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য তার হৃদয় আর মনের দুয়ার খুলে দেন। তিনি তখন তাকে আঁকড়ে ধরেন পরম মজবুতির সঙ্গে। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমান জাতির বহু উপকার সাধন করেছিলেন।

উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ

নৈরাশ্য আর নৈরাজ্যের আঁধারে ডুবে থাকা ইসলামের আকাশে তখন আরেকটি রাঙা সূর্য উঁকি দিলো। দিগন্তের বিস্তৃত কোলে নতুন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ ঢেউ খেলে গেল। তবে এ বিদ্যুতের আভা ছিল আগের চেয়ে ঢের বেশি; এ সূর্য ছিল আগের সূর্যের চেয়ে অনেক প্রদীপ্ত। আর তা ছিল হযরত উমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ। তিনি হিজরতের ষষ্ঠ বছরের যুলহজ্জ মাসে ইসলাম কবুল করেন।[১৯৭] এটা ছিল হযরত হামযা রা. এর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরের ঘটনা। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইসলামের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন। যেমন ইমাম তিরমিযী র. ইবন উমর রা. থেকে, তাবারানী ইবনে মাসউদ ও আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **হে আল্লাহ! উমর বিন খাত্তাব ও আবু জাহল বিন হিশামের মধ্য যে আপনার কাছে অধিক প্রিয় তার দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী ও গৌরবোজ্জ্বল করুন**। আর আল্লাহর কাছে তাদের দুজনের মধ্যে অধিকতর পছন্দনীয় ছিলেন উমর রা.।[১৯৮]

হযরত উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েত ও বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তার হৃদয়ে ইসলামের অবতরণ ছিল ক্রমধারা অনুসারে। কিন্তু সে ঘটনার সারাংশ বর্ণনার আগে আমরা দৃষ্টি দিব তাঁর অনুভব আর অনুভূতি; তাঁর হৃদয়ের আকুতি আর কাকুতির দিকে।

---

[১৯৬] ইবনে হিশাম ১/২৯১, ২৯২।
[১৯৭] ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ১১।
[১৯৮] তিরমিযীঃ মানাকিব অধ্যায়- মানাকিবে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ৫/৫৭৬, হাদীস নং ৩৬৮১।

শাণিত মেজায আর প্রচণ্ড বীক্রমের অধিকারী হিসেবে গোটা আরবেই হযরত উমর রা. এর খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি ছিল। দীর্ঘকাল মুসলমানরা তার দ্বারাই বহু অত্যাচার আর নির্যাতন ভোগ করছিল। মনে হয় হযরত উমরের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে দ্বিমুখী অনুভব ও অনুভূতি গলাগলি করে পাশাপাশি হাঁটছিল। যার ফলে দেখা যায় একদিকে তিনি যেমন নিজ বাপ দাদার মনগড়া আবিষ্কার করা দীন-ধর্মের বড় ইয্যত করতেন এবং এর দ্বারা প্রেরণা ও চেতনাদীপ্ত ছিলেন। অপরদিকে ঈমান ও আকীদা আর দীন ও ধর্মের পথে মুসলমানদের পাহাড়সম অবিচলতা ও লৌহ প্রাচীরসম দৃঢ়তা দেখে, এ সকল পথ বেয়ে আসা সকল মুসিবতে তাদের অম্লান বদন আর হাসিমাখা মুখ দেখে পরম তৃপ্তি বোধ করতেন। এরপর তার মধ্যে স্বাভাবিক এক চেতনা আর সন্দেহ ও সংশয় দানা বেঁধে উঠতে লাগল যে, ইসলাম যে পথের দিকে আহ্বান করে সম্ভবত সে পথ অন্য যে কোনো পথ আর পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি ভালো ও সুন্দর। ধীরে ধীরে এর মাত্রা আরও বেড়ে চলল। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হলো যে, এখনই তার বুক ফেটে যাবে। উদগীরিত হবে প্রচণ্ড লাভাস্রোত। বয়ে চলবে গোটা দুনিয়ার প্রত্যেকটি অলিতে-গলিতে।

হযরত উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে যে সকল রেওয়ায়েত ও বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে মূল নির্যাসটুকু নিম্নে তুলে ধরা হলো: একদিন তাকে ঘরের বাইরে রাত যাপন করতে হয়। সুতরাং, তিনি হারাম শরীফে চলে আসেন এবং কাবা ঘরের পর্দার মধ্যে ঢুকে পড়েন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বীয় প্রভুর ইবাদত ও তাঁর বন্দেগির নিস্তরঙ্গ সাগরে ডুবে ছিলেন। তিনি নামাযে সূরা আল-হাক্কাহ তেলাওয়াত করতে লাগলেন। উমর রা. কাছে এসে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। এর সুন্দর গঠন, অনন্য গাঁথুনি আর সুষ্ঠু বিন্যাস উমরের কাছে বড় ভালো লেগে গেল। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বলতে লাগলাম আল্লাহর কসম! এ তো একজন কবি; যেমনটি কুরাইশরা বলে থাকে। কিন্তু ঠিক তখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস করো। [সূরা হাক্কাহ : ৪০-৪১]

উমর রা. বলেন, এরপর আমি মনে মনে বললাম; তাহলে তিনি একজন গণক; কিন্তু ইত্যবসরে তিনি তেলাওয়াত করতে লাগলেন : وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٣) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা

নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। [সূরা হাক্কাহ : ৪২-৪৩] এভাবে তিনি সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন। তিনি বলেন, সে দিন ইসলাম কেমন যেন আমার মনের গহীনের একটু জায়গা দখল করে নিয়েছিল। [১৯৯]

এটা ছিল তার মনের মণিকোঠায় ইসলামের প্রতি অনুরাগ আর আকর্ষণের সর্বপ্রথম বীজ বপন। কিন্তু বহু বছর ধরে যেহেতু সেখানে জাহেলী প্রবণতা, ঐতিহ্যগত সাম্প্রদায়িকতা আর বাপ দাদার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করার গোঁড়া মানসিকতা রাজত্ব করছিল, সে কারণে তা নতুন এই বাস্তবতার ঘাড়ের ওপর উঠে টুঁটি টিপে ধরার হুমকি ধমকি দিচ্ছিল। পুরনো সে প্রকাণ্ড বৃক্ষের আড়ালে নতুন এই ছোট্ট বীজ চাপা পড়ে গিয়েছিল। সে কারণে এ বৃক্ষের আড়ালে যে কী দামী বীজ বপন করা হয়েছিল তা তার অজ্ঞাতেই থেকে গেল। ফলাফলে ইসলামের বিরুদ্ধে তার লম্ফ-ঝম্ফ আর আস্ফালন তখনো চলছিল পুরোদমে; পরিপূর্ণ উদ্দামে।

তারপর দিনে দিনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি শত্রুতা ও তার প্রকৃতির তড়িৎ মানসিকতা তাকে ঠেলে দিলো এক অনাস্বাদিতপূর্ব অভিজ্ঞতার দুনিয়ার দিকে। তাই তিনি একদিন নাঙা তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার জন্য বের হলেন। পথিমধ্যে নুআইম বিন আব্দুল্লাহ নুহাম আদাবী[২০০] এবং বনু যুহরা[২০১] কিংবা বনু মাখুযূমের[২০২] এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। নুআইম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন উমর! কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর দিলেন মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য যাচ্ছি। নুআইম তাকে বললেন, মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য যাচ্ছ; বনু হাশিম আর বনু যুহরার কথা কি তুমি ভুলে গিয়েছ নাকি? উমর তাকে বললেন, আমার তো মনে হয় তুমিও ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছ এবং বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মাদের ধর্মে দাখিল হয়েছ। নুআইম বললেন, তবে আশ্চর্য কোনো কাহিনী শুনবে না ? তোমার বোন ও ভগ্নিপতিও তো ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে! তোমার ধর্মকে

---

[১৯৯] ইবুনল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৬। আতা ও মুজাহিদ সূত্রে ইবনে ইসহাকের বক্তব্য এর অনেকটা কাছাকাছি। তথাপি ঘটনার শেষ প্রান্তে উভয়ের মাঝে খানিকটা বেশকম রয়েছে। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৩৪৬-৩৪৮। জাবের সূত্রে ইবনুল জাওযীর রেওয়ায়েত অনেকটা এমনই। সেখানেও শেষের দিকে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। দেখুন ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ১০।

[২০০] এটা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৩৪৪।

[২০১] এটা আনাস বিন মালিক রা. এর বর্ণনা। দেখুন তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ১০।

[২০২] এটা ইবনে আব্বাস রা. এর বর্ণনা। দেখুন শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ১০২।

ছেড়ে দিয়ে মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। উমর রাগে ক্রোধে উন্মাতাল হয়ে বোনের বাড়ির দিকে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখতে পেলেন খাব্বাব বিন আরতকে। তার সঙ্গে ছিল সূরা ৯৮ লেখা একটি সহীফা। তিনি তাদেরকে এ সূরা শিক্ষা দিচ্ছিলেন। (অনেক আগ থেকেই হযরত খাব্বাব রা. তাদের বাড়িতে এসে তাদেরকে কুরআনে কারীম শিক্ষা দিতেন)। যখন খাব্বাব রা. উমরের উপস্থিতি টের পেলেন ঘরের এক কোণে সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়লেন। উমরের বোন ফাতিমা রা. সহীফাখানা এক জায়গায় গোপন করে ফেললেন। কিন্তু উমর রা. শুরুতেই যখন তাদের ঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন তখন খাব্বাবের তেলাওয়াত শুনে নিয়েছিলেন। তাই তিনি ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কী তেলাওয়াত করছিলে? তারা দুজনে উত্তর দিলেন আমরা নিজেরা পরস্পরে কথা বলছিলাম। উমর বললেন, আমি শুনেছি তোমরা নাকি স্বধর্ম ত্যাগ করেছ? তখন উমরের ভগ্নিপতি বললেন, উমর! হক্ব আর সত্য যদি থাকে অন্য ধর্মে তবে তাতে দোষ কী? ভগ্নিপতির এ কথা শুনে উমর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে খুব মারধর করলেন। ফাতিমা তখন ছুটে এসে উমরকে স্বীয় স্বামীর ওপর থেকে সরিয়ে দিলেন। আর তখন তাকেও হাত দিয়ে এমন একটা ছিটা মারলেন যে, তার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল। আর ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি তাকে এতটা জোরে আঘাত করলেন যে, তিনি রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় উমরের বোন ফাতিমা রাগে আর ক্রোধে কঠিন নারীমূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন উমর! যদি তোমার ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে হক্ব আর সত্য থেকে থাকে তবে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

বোনের এ কথা শুনে উমরের ওপর বেদনা আর অনুশোচনার কালো মেঘ ছেয়ে গেল। বোন আর ভগ্নিপতিকে রক্তাক্ত দেখে তিনি ভারি লজ্জিত হলেন। তারপর বোনকে বললেন, তোমরা যে কিতাবটি পড়ছিলে তা নিয়ে এসো তো আমি একটু পড়ে দেখব! ফাতিমা বললেন, আপনি অপবিত্র। আর এ কিতাব পবিত্ররা ব্যতীত অন্য কেউ ধরতে পারে না। সুতরাং, আগে গোসল করে নিন। বোনের কথা মতো উমর গোসল করে নিলেন। এরপর কিতাব হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। এটা পড়ে তিনি বললেন, বাহ! কি সুন্দর পবিত্র আর সুনির্মল নাম! এরপর সূরা ত্বহা'র শুরু থেকে إِنَّنِي أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤) (আমিই আল্লাহ; আমি ব্যতীত আর কোনো

ইলাহ নেই। সুতরাং, তোমরা আমারই ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে তোমরা নামায কায়েম করো) এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন বলে উঠলেন কত সুন্দর আর সুমহান কালাম! তোমরা আমাকে মুহাম্মাদের নিকট নিয়ে চলো!

ঘরের এক কোণে লুকিয়ে থাকা হযরত খাব্বাব রা. যখন উমরের এ কথা শুনতে পেলেন তখন তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। উমরের কাছে এসে তিনি বললেন উমর! সুসংবাদ গ্রহণ করো। আমার মনে হয় বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দুআ করেছিলেন তা তোমার জন্য কবুল হয়েছে। কারণ, দুআয় তিনি বলেছিলেন اَللّٰهُمَّ أَعِزِّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ. (হে আল্লাহ! তুমি উমর বিন খাত্তাব কিংবা আবু জাহল বিন হিশাম-এ দুজনের কারও মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করো)। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারুল আরকামে রয়েছেন।

উমর রা. নাঙা তলোয়ার হাতে নিয়ে দারুল আরকামের দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দরজার কড়া নাড়লেন। এক ব্যক্তি দরজার ভেতর থেকে উমরকে নাঙা তলোয়ার হাতে দরজার সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পেল। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সংবাদ জানাল। তিনি কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সকলকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। হামযা রা. তাদেরকে বললেন, তোমাদের কী হয়েছে? অন্যরা বলল উমর এসেছে। তিনি কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলেন উমর এসেছে? যাও তোমরা তার জন্য দরজা খুলে দাও; যদি সে কোনে সদিচ্ছা ও সদুদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তো ভালো কথা। আর যদি কোনো দুরভিসন্ধি কিংবা অসদুদ্দেশ্যে এসে থাকে তবে তার তলোয়ার দিয়েই আমরা তাকে হত্যা করব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ভেতরেই ছিলেন। তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। ওহী নাযিল শেষ হলে তিনি সে কক্ষ থেকে বের হয়ে অন্য একটি কক্ষে উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি তার তলোয়ার পরনের জামা একসঙ্গে ধরে তাকে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উমর! ওলীদ বিন মুগীরাকে আল্লাহ তাআলা যে শাস্তি ও অভিশাপ দিয়েছেন তোমাকেও তা দেওয়ার আগ পর্যন্ত কি তুমি বিরত হবে না? হে আল্লাহ! এই খাত্তাবের ছেলে উমর আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হে আল্লাহ, তুমি খাত্তাবের ছেলে উমরকে দিয়ে ইসলামকে সম্মানিত ও শক্তিশালী করো!। উমর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল। এভাবে উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এতটা উচ্চ নাদে তাকবীর দিলেন যে, দূরের

মসজিদুল হারামের লোকেরাও সে তাকবীর শুনতে পেল।[২০৩]

হযরত উমর রা. এতটা বীরত্ব আর বিক্রমের অধিকারী ছিলেন যে, গোটা মক্কায় তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো দুঃসাহস কারও ছিল না। সেই উমর রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন মুশরিকদের মধ্যে এক তুমুল হৈ চৈ আর হাঙ্গামা শুরু হলো। তারা এটাকে তাদের অপমান আর যিল্লতির দিনের উদ্বোধন হিসেবে ধরে নিলো। এভাবে উমরের ইসলাম যেখানে মুশরিকদের জন্য ছিল লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার নিদর্শন সেখানে তা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ছিল ইয্যত, সম্মান আর হাসি-খুশি ভরা নতুন যুগের দ্বার-উন্মোচন।

ইবনে ইসহাক স্বীয় সনদে উমর থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, যখন আমি মুসলমান হলাম তখন সর্বপ্রথম মনে মনে ফিকির করতে লাগলাম, মক্কায় কোন ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বড় দুশমন ও জানের শত্রু? আমার মনই বলে দিলো সে হলো আবু জাহল। এরপরে আমি তার ঘরে ছুটে গিয়ে দরজায় সুউচ্চ নাদে হাঁক ছাড়লাম। দরজা খুলে সে বের হলো। আমাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার উমর! কী মনে করে? আমি বললাম, আমি তোমাকে জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ঈমান নিয়ে এসেছি। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি তার সবকিছু সত্যায়ন করেছি। উমর রা. বলেন, আবু জাহল আমার কথা পুরোপুরি শোনার আগেই আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো। সর্বশেষে মুখে বলল, আল্লাহ তোর মন্দ করুন! তুই যা কিছু নিয়ে এসেছিস সেগুলিও মন্দ করুন।[২০৪]

ইবনুল জাওযী রহ. উল্লেখ করেন, উমর রা. বলেন : যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করত তখন কাফের মুশরিকরা তার পিছু লাগত। তারা তাকে মারধর করত। সেও তাদেরকে মারধর করত। সুতরাং, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন সোজা চলে এলাম আমার মামা আসী বিন হাশিমের কাছে। তাকে আমি জানালাম আমার ইসলাম গ্রহণের কথা। তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকলেন। তিনি বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পরে কুরাইশের এক বিশাল নেতার কাছে গেলাম-সম্ভবত সে আবু জাহল হবে-এবং তাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম কিন্তু তিনিও কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে গেলেন।[২০৫]

ইবনে ইসহাক রহ. নাফে থেকে আর নাফে' ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : উমর বিন খাত্তাব যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন

---

২০৩ তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৭, ১০, ১১। ইবনে হিশাম ১/৩৪৩-৩৪৬।
২০৪ ইবনে হিশাম ১/৩৪০, ৩৫০।
২০৫ ইবনে হিশাম ১/৩৪৯, ৩৫০।

কাফেররা এ সংবাদ জানতে পারল না। তখন তিনি বললেন, মক্কার কে আছে কথায় অত্যধিক পটু? তারা বলল জামীল বিন মা'মার জুমহী। তিনি তার খোঁজে বের হলেন। আমিও তার সঙ্গে থেকে সবকিছু দেখতে ও শুনতে লাগলাম। তিনি তার কাছে এসে বললেন জামীল! আমি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছি। তিনি বলেন আল্লাহর কসম! সে তার কথার কোনো জবাব দিলো না। বরং সোজা চলে গেল মসজিদুল হারামের দিকে এবং দরায গলায় ডাক দিলো হে কুরাইশ সম্প্রদায়! ইবনে খাত্তাবের ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে। উমর তার পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি ধর্ম ত্যাগ করিনি বরং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি আর তাঁর রাসূলকে সত্যায়ন করেছি। এ কথা বলতে না বলতেই তারা সবাই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা সকলে তার মুকাবেলা করছিল আর তিনিও একাই তাদের মুকাবেলা করে যাচ্ছিলেন। এভাবে দ্বিপ্রহরের সময় হয়ে গেল। তখন উমর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। আর তারা তার মাথার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি তাদেরকে বলছিলেন তোমাদের যা মনে চায় তোমরা করতে পারো। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, যদি আমাদের মাত্র তিন শ' জন লোক থাকত তবে মক্কায় হয়তো তোমরা থাকতে নয় তো আমরা থাকতাম।[২০৬]

এরপর মুশরিকরা তাকে হত্যা করার জন্য তাঁর ঘরের ওপর গিয়ে হামলা করে। ইমাম বুখারী র. আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন, উমর তখন ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরে বসা ছিলেন। তখন আমরের ছেলে আস বিন ওয়ায়েল সাহমী তার নিকটে এলো। তার পরনে ছিল ইয়েমেনী চাদর আর রেশমের মোটা কাপড়। সে ছিল বনু সাহম গোত্রের। আর বনু সাহম জাহেলী যুগে আমাদের মিত্র ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল কী ব্যাপার! তোমার কী হয়েছে? উমর রা. উত্তর দিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তোমার কওম আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। সে বলল, তারা তা কখনোই পারবে না। তিনি বলেন, আসের এ কথা বলার পরেই আমি কিছুটা স্বস্তি বোধ করেছিলাম। এরপর সে আমার কাছ থেকে চলে গেল। সে তার গোত্রকে পাহাড়ী ঢলের মতো ছুটে আসতে দেখতে পেল। সুতরাং, তাদেরকে সে জিজ্ঞাসা করল তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা উত্তর দিলো খাত্তাবের ছেলে বেদীন হয়ে গেছে। অনন্তর সে বলল তোমরা তার কাছে যাবে না। আসের এ কথা শুনে মানুষ চলে গেল।[২০৭] ইবনে ইসহাকের এক রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, তিনি বলেন আল্লাহর কসম! তারা সকলে যেন একটি

---

[২০৬] ইবনে হিব্বান প্রণীত ইহসান ৯/১৬। ইবনে হিশাম ১/৩৪৮, ৩৪৯। ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৮। তাবারানীর মুজামুল আওসাতে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় ২/১৭২, হাদীস নং ১৩১৫।

[২০৭] সহীহ বুখারী, 'উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর ইসলাম গ্রহণ' অধ্যায়, ১/৫৪৫।

চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল এরপর সে চাদরটি হঠাৎ টান দিয়ে সকলের ওপর থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়।[২০৮]

এগুলি ছিল উমরের ইসলাম গ্রহণের প্রতি মুশরিকদের মনোভাব ও মনোভঙ্গি। এবার চলুন উমরের ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানদের মধ্যে কী বিপ্লব এসেছিল তা দেখে নিই। মুজাহিদ র. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি উমর বিন খাত্তাব রা. কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন আপনাকে ফারুক বলা হয়? তিনি জবাবে বললেন, আমার তিন দিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত হামযা রা.। (এরপর তিনি তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী সবিস্তারে বললেন-যা আমরা আগেই উল্লেখ করে এসেছি)। তিন দিন পরে আমি ইসলাম গ্রহণ করেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল! বাঁচি কিংবা মরি আমরা কি হক্বের ওপর নই? তিনি বললেন, **কেন নও? ঐ সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! বাঁচো কিংবা মরো উভয় হালতেই তোমরা হক্বের ওপর রয়েছ।** তিনি বলেন, তখন আমি বললাম তবে এত লুকোচুরি কেন? হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে যিনি সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম! আমরা বের হবোই। এরপর আমরা দুটি কাতার দিয়ে বের হলাম। এক কাতারে ছিলেন হামযা রা. আর আরেক কাতারে ছিলাম আমি। আমাদের চলার পথে ভীষণ পদাঘাতে ধুলি ঝড় সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে আমরা মসজিদুল হারামে চলে গেলাম। কুরাইশরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আমাকে ও হামযাকে কৌতূহল ভরে দেখছিল। আমাদেরকে মুসলমানদের মধ্যে দেখে তাদের হৃদয় বিষাদের কালো মেঘে এতটা ছেয়ে গেল, যা ইতঃপূর্বে কোনো দিন হয়নি। আর সেদিন রাসূলে কারীম সা. আমাকে **'ফারূক'** নামে অভিহিত করেন। [২০৯]

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, উমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের আগে আমরা কাবার কাছে কোনো দিনও নামায আদায় করতে পারিনি।[২১০]

সুহাইব বিন সিনান রা. বলেন, যখন উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন থেকেই তা চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ল। তিনি প্রকাশ্যে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগলেন। আমরা বাইতুল্লাহর চারপাশে জড়ো হলাম। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। যারা আমাদের ওপর একদা যুলুম করেছিল, আমরা তার প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম। তাদের দেনা-পাওনা কিছুটা হলেও শোধ করলাম।[২১১]

---

[২০৮] ইবনে হিশাম ১/৩৪৯।

[২০৯] ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৬,৭।

[২১০] শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ১০৩।

[২১১] ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ১৩।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন, উমর রা. যে দিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সে দিন ইয্যত ও সম্মান আমাদের সবসময়ের সঙ্গী ছিল। [২১২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কুরাইশের প্রতিনিধি

হযরত হামযা রা .ও উমর বিন খাত্তাব রা.- এ দুই মহান বীরের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম ও মুসনমানদের ভাগ্যাকাশে হতাশা আর নৈরাশ্যের যে প্রবল ঘনঘটা বিদ্যমান ছিল তা কাটতে শুরু করল। তাদের চোখের সামনের মেঘ দূরীভূত হয়ে রাস্তা পরিষ্কার হতে লাগল। অপরদিকে এতে মুশরিকদের টনক নড়ল। মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের মদ খেয়ে মাতাল ও বুঁদ হয়ে থাকা মুশরিক গোষ্ঠীর হুঁশ ফিরে এলা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের সঙ্গে তাদের মুআমালাত ও আচার আচরণ সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হলো। ইসলাম থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করার নতুন এক পথ আবিষ্কার করল । যুলুম ও নির্যাতনের পরিবর্তে এ পথে ছিল পারস্পরিক সমঝোতা আর মূল্যবান হাদিয়া তোহফার চানক্যের প্রলুব্ধি। কিন্ত এ সকল হতদরিদ্রের এ খবর ছিল না যে, গোটা পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহর দীন ও তাঁর দাওয়াতের সামনে এর সবকিছুর একটা ক্ষুদ্র মশার ডানা পরিমাণ মূল্যও নেই। সুতরাং, তাদের সকল প্লান-পরিকল্পনা বরবাদ হয়ে গেল। আশার নদে ব্যর্থতার বালুচর জেগে উঠল।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, মুহাম্মাদ বিন কাব কুরযী থেকে ইয়াযীদ বিন যিয়াদ আমার কাছে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি উতবা বিন রবীআ একদিন কুরাইশের এক মজলিসে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা কি চাও না আমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলি; তাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিয়ে দেখি সেগুলি সে গ্রহণ করে কি না। যদি এমন হয় তবে সে যা চায় আমরা তাকে দিয়ে দিব । বিনিময়ে সে শুধু আমাদের ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদুল হারামে একাকী বসে ছিলেন। আর এটা ছিল সে সময়কার ঘটনা যখন হযরত হামযা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুশরিকরা রুদ্র ও বিষভরা চোখে দেখছিল দিনে দিনে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির দৃশ্য। তখন তারা বলল কেন নয়? আবুল ওলীদ! তুমি যাও। গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলো।

উকবা তাদের কথা মতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একেবারে কাছে গেল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একেবার

---

[২১২] সহীহ বুখারী: 'উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ' অধ্যায় ১/৫৪৫।

পাশে বসে তাকে বলল, ভাতিজা! আমাদের বংশের মধ্যে তোমার জন্য একটি উচ্চ আসন বরাদ্দ আছে। সবার চোখে তোমার একটি বিশেষ ইয্যত ও সম্মান আছে। এসব তো তুমি জানই। কিন্তু তুমি তোমার কওমের নিকট একটি ভীষণ ভয়ঙ্কর বালা নিয়ে এসেছ। এর দ্বারা তুমি তাদের একতার বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছ। তুমি তাদেরকে বোকা ও নির্বোধ সাব্যস্ত করেছ। তাদের দীন-ধর্ম আর উপাস্যদের নিন্দা ও সমালোচনা করেছ। তাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের যারা চলে গেছে তাদেরকে কাফের ফতোয়া দিয়েছ। সুতরাং, ভেবে দেখো আমি তোমার নিকট এখন কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। এগুলির যেটা ইচ্ছা হয় তুমি গ্রহণ করে নিতে পারো, আর যেটা ইচ্ছা হয় প্রত্যাখ্যান করতে পারো। তিনি বলেন, উতবার এ সকল কথার জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু এতটুকুই বললেন, 'আবুল ওলীদ! আপনি বলে যান। আপনার কথা আমি শুনব'।

তখন সে বলল, ভাতিজা! তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ এর বিনিময়ে যদি তোমার অর্থ-সম্পদ কামানোর অভিরুচি থাকে তবে বলো; আমরা আমাদের সকল সহায়-সম্পত্তি এনে তোমার পায়ের সামনে ঢেলে দিই আর তুমি তখন গোটা আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিটিতে পরিণত হয়ে যাও। আর যদি তুমি নেতৃত্ব চাও তবে বলো; আমরা তোমাকে আমাদের নেতা বানিয়ে নিব। তখন একটি কাজও আমরা তোমার অনুমতি ছাড়া করব না। আর যদি তুমি রাজত্ব চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাব। আর যদি তোমার কাছে যা আসে তা জিন-ভূত হয়ে থাকে যাদেরকে তুমি চোখে দেখতে পাও কিন্তু তাদের মুকাবেলা করার ক্ষমতা রাখ না তবে বলো; আমরা তোমার জন্য ভালো হাকীম-কবিরাজ তালাশ করি। আমরা আমাদের ধন-সম্পদ থেকে এর সকল খরচ বহন করি এবং এভাবে তোমাকে এক সময় সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলি। কেননা, কখনো কখনো জিন-ভূত মানুষের ওপর সওয়ার হয় এবং তখন তাকে এর চিকিৎসা করাতে হয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতক্ষণ উতবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সে যখন কথা শেষ করল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল হাঁ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে এখন আমার কথা শুনুন! সে বলল হাঁ। তুমি বলো। তখন তিনি বলতে লাগলেন :

حم (١) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٣) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٤) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ......

হা-মীম। এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা এমন একটি কিতাব, যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবি কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। তারা বলে আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদের কে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত.. .. .[সূরা হা-মীম-সিজদা : ১-৪]

এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন আর উতবা তা বসে বসে শুনছিল। উতবা তার পিঠের নীচে দুই হাত রেখে হেলান দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দিয়ে রেখেছিল। আয়াতের পর আয়াত তেলাওয়াত করে করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন একটি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেন তখন তিনি সিজদা করলেন। এরপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আবুল ওলীদ! যা শোনার তা তো শুনলেনই। এবার আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন গিয়ে!

উতবা কোনো কথা না বলে তার সঙ্গীদের নিকট চলে গেল। তাকে আসতে দেখেই তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি! আবুল ওলীদ যেই চেহারা নিয়ে তোমাদের কাছ থেকে তাঁর কাছে গিয়েছিল সেই চেহারা নিয়ে সে ফিরেনি। উতবা তাদের মজলিসে গিয়ে বসে পড়ল। অন্যদিকে সবাই তার কথা শোনার জন্য চরম উদগ্রীব ছিল। তাই তারাই আগে জিজ্ঞাসা করল কী ব্যাপার আবুল ওলীদ! কী হয়েছে? সে বলল, আমি আজ মুহাম্মাদের কাছে এমন কিছু কথা শুনে এসেছি; খোদার কসম! আমার জনমেও আমি কোথাও তা শুনিনি! আল্লাহর কসম! সেগুলি কবিতা নয়; জাদু নয়; অতীতিন্দ্রয়বাদী মন্ত্রণাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমার আমার কথা মানো এবং তাঁর ব্যাপারটি আমার হাতে ছেড়ে দাও। তাঁর ও তাঁর কাজের মাঝের প্রাচীর তোমরা তুলে নাও। তাকে তাঁর ইচ্ছা মতো ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আমি আজ যা তাঁর কাছে শুনেছি তা একদিন বিশাল ইনকিলাবের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। যদি আরবের অন্যান্য সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে তবে তো তোমরা তাতে জড়ানো ব্যতিরেকেই উদ্দেশ্য হাসিল করে ফেলবে। আর যদি সে আরবদের ওপর বিজয়ী হয় তবে তাঁর রাজত্ব তো প্রকারান্তরে তোমাদেরই রাজত্ব। তাঁর ইয্যত তো তোমাদেরই ইয্যত। তখন তোমরা তাঁর দ্বারা পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান জাতিতে পরিণত হবে।

উতবার কথা শেষ না হতেই তারা বলে উঠল, আবুল ওলীদ! আল্লাহর কসম! সে তোমাকেও তাঁর কথার দ্বারা জাদু করে ফেলেছে!

উতবা বলল, তাঁর ব্যাপারে আমার মত এটাই। এখন তোমরা কী করবে বা না করবে সে ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই;বরং তোমরাই সেটা ভেবে দেখো।[২১৩]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, উতবা মনোযোগ দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তেলাওয়াত শুনছিল। অতঃপর যখন তিনি فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) (অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত) এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন উতবা বলে উঠল ব্যস! ব্যস হয়েছে। এরপর সে তার হাত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখের ওপর রেখে দিলো। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলল। কারণ তার ভয় ছিল- না জানি স্বয়ং তার ওপরই এ আপদ এসে পড়ে কি না। এরপর সে তার কওমের কাছে গিয়ে যা বলার তা বলল।[২১৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কুরাইশ নেতাদের আলোচনা

উতবার প্রস্তাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে সম্ভবত কুরাইশরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল না। কেননা, সরাসরি ও স্পষ্টভাবে তা গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান কোনোটিই বুঝাচ্ছিল না। বরং হয়েছিল কি- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সে সকল প্রস্তাবের বিপরীতে পবিত্র কুরআনে কারীম থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন। উতবা তার অর্থও ভালোভাবে না বুঝে যে মুখে এসেছিল সে মুখ নিয়েই ফিরে গিয়েছিল। এ কারণে কুরাইশের নেতা ও সরদারগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে তারা পরিবেশ-পরিস্থিতি সবকিছু নিরীক্ষণ করল। এরপরে একদিন সূর্যাস্তের পরে কাবার চত্বরে সবাই এসে সমবেত হলো এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সেখানে ডেকে পাঠাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ডাকার খবর পেয়ে মনের গহীনে লুক্কায়িত এক বুক সুপ্ত আশা নিয়ে দ্রুত ছুটে এলেন তাদের কাছে। অতঃপর যখন তাদের কাছে এসে বসলেন তারা হুবহু তাই বলল যা ইতঃপূর্বে বলেছিল উতবা। উতবা

[২১৩] ইবনে হিশাম ১/২৯৩, ২৯৪।
[২১৪] ইবনে কাসীর ৪/৯৫, ৯৬। উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর।

তাঁর কাছে যে সকল প্রস্তাব পেশ করেছিল তারাও তাকে সে সকল প্রস্তাবে রাযি হওয়ার আমন্ত্রণ জানাল। সম্ভবত তারা মনে করেছিল যে, ইতিপূর্বে উতবা যেহেতু একাকী তাঁর কাছে এ সকল প্রস্তাব পেশ করেছে এ কারণে সে তার একার কথার ওপর পুরোপুরি ভরসা করতে পারেনি; কিন্তু এবার যখন তাদের নেতৃস্থানীয় সকলে মিলে তাঁর কাছে সেই প্রস্তাবগুলি দিবে তখন সে বিশ্বাস করবে এবং তাদের দাবি-দাওয়া মেনে নিবে। কিন্তু তাদের আশায় 'গুড়েবালি'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'তোমরা যা বলছ এর কোনো কিছুই আমার সঙ্গে নেই। আমি তোমাদের কাছে যা কিছু নিয়ে এসেছি তা দ্বারা তোমাদের ধন-সম্পদ, ইয্যত-সম্মান কিংবা রাজত্ব এর কোনোটিই লাভের প্রত্যাশা করি না। বরং আল্লাহ তাআলা আমাকে তোমাদের নিকট রাসূল স্বরূপ পাঠিয়েছেন। আমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন আর তোমাদের জন্য আমাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক হতে নির্দেশ দিয়েছেন । সুতরাং তোমাদের নিকট আমি আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের সর্বপ্রকারের কল্যাণ কামনা করেছি। এখন যদি তোমরা আমি য়া কিছু নিয়ে এসেছি তা কবুল করে নাও তবে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টিই সফল। আর যদি তোমরা প্রত্যাখ্যান করো তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো সুস্পষ্ট ফয়সালা আসার আগ পর্যন্ত আমি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকব।

এরপর তারা দ্বিতীয় দফায় প্রস্তাব তুলে ধরল। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাঁর রবের নিকট দুআ করতে বলল, যেন তিনি মক্কা থেকে বড় বড় পাহাড়গুলি দূরে সরিয়ে ফেলেন; তাদের জন্য এ শহরকে বিস্তৃত করেন; তাতে নহর প্রবাহিত করেন এবং তাদের মৃতদেরকে-বিশেষ করে কুসাই বিন কিলাবকে- জীবিত করে দেন। তারা জীবিত হয়ে যদি তাকে সত্যায়ন করে তবে জীবিতরাও তাঁর ওপর ঈমান আনবে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আগের জবাবই দিলেন।

এরপর তারা তৃতীয় দফায় প্রস্তাব তুলে ধরল। তারা তাকে তাঁর রবের নিকট দুআ করতে বলল, যেন তিনি তাঁর সত্যায়নে আকাশ থেকে একজন ফেরেশতা পাঠান। যার কাছে আমরা আপনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে পারব। আর তাকে দুআ করতে বলল যেন তিনি তাঁর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্যের বিস্তৃত উদ্যান, বিশাল ভাণ্ডার আর বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে একই জবাব দিলেন।

এরপর তারা চতুর্থ দফায় প্রস্তাব তুলে ধরল। তারা তাঁর কাছে শাস্তি চাইল; যেন তিনি তাদের ওপর আকাশের একটি টুকরো ফেলে দেন। যেমনটি তিনি বলেন এবং যার ভীতি তিনি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি তাদের জবাবে বলে

দিলেন এটা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ যদি চান তবে করতে পারেন। তখন তারা বলল, আপনার পালনকর্তা কি আগে জানতেন না আমরা আপনার সঙ্গে অতি শীঘ্রই বৈঠক করব। আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন বস্তু তলব করব; যাতে করে তিনি আগেই আপনাকে ঐ সকল জিনিস শিখিয়ে দিতেন যেগুলি নিয়ে আপনাকে এখন আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি। তা ছাড়া আমরা যদি আপনার কথা না মানি তবে তিনি আমাদের সঙ্গে কী করবেন?

পরিশেষে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভীষণ হুমকি-ধমকি দিলো। তারা বলল, আপনি আমাদের সঙ্গে যা কিছু করেছেন আল্লাহর কসম আমরা আপনাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না আমাদের দু'দলের কোনো একদল হালাক হয়ে যায়। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মজলিস ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে গেলেন নিজ বাড়িতে। কারণ, তিনি আসার সময় তাদেরকে নিয়ে স্বপ্নের যে সুন্দর জাল বুনেছিলেন এক্ষণে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। [২১৫]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হত্যার ওপর আবু জাহলের দৃঢ় সংকল্প

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে ভগ্নমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন তখন আবু জাহল অহঙ্কারে ফেটে পড়ল। দম্ভ আর আত্মম্ভরিতা দুই কূল ছাপিয়ে তার কণ্ঠে বজ্র নিনাদ হয়ে ঝরলঃ হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে, আমাদের দীন-ধর্মের কুৎসা ও নিন্দা করা, আমাদের বাপ-দাদাদের গালি-গালাজ করা, আমাদের বোধ ও বিবেককে নাদানি ও বেকুবি সাব্যস্ত করা আর আমাদের উপাস্যদের নিয়ে ঠাট্টা করা মুহাম্মাদ কখনোই পরিত্যাগ করবে না। আমি আল্লাহর কাছে অঙ্গীকার করছি, তাঁর জন্য এমন একটি পাথর প্রস্তুত করে আমি বসে থাকব যা ওঠানো ভারি মুশকিল হবে। এরপর সে যখন সিজদায় যাবে তাঁর দিকে সেটা ছুঁড়ে মেরে তার মাথা ভেঙে চুরমার করে ফেলব। এরপর তোমরা আমাকে অন্যের হাতে ছেড়ে দাও বা রক্ষা করো সেটা তোমাদের ব্যাপার! এরপর বনু আবদে মানাফ যা চায় করুক গে! উপস্থিত মুশরিকরা বলল, আল্লাহর কসম! কারও হাতেই আমরা তোমাকে সোপর্দ করব না। তোমার যা মনের খাহেশ করে যাও!

যখন ভোর হলো আবু জাহল পূর্বের কথা অনুযায়ী একটি ভারী পাথর প্রস্তুত করল। এরপরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপেক্ষায় বসে

---

[২১৫] ইবনে ইসহাক ১/২৯৫-২৯৮। ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির ও ইবনে আবী হাতিম থেকেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় (দুররুল মানসূর ৪/৩৬৫, ৩৬৬)

রইল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন। এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইতোমধ্যে কুরাইশরাও সকাল সকাল তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে আবু জাহল কী করে তা দেখার জন্য প্রাণপণ উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। অনন্তর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিজদায় গেলেন তখন সে পাথরটি হাতে নিলো। ধীরে ধীরে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এক পর্যায়ে যখন সে তাঁর একেবারে কাছে চলে গেল তখন অকস্মাৎ পেছনের দিকে দৌড় দিলো। তার চেহারা আর শরীরের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেল। তার চেহারায় ফুটে উঠল প্রচণ্ড ভীতি আর শঙ্কার স্পষ্ট আলামত। তার হাত শুকিয়ে গেল। হাতের পাথরটি মাটিতে পড়ে গেল ধপাস করে। কুরাইশের কয়েকজন তার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, কী হে আবুল হাকাম! কী হলো তোমার? সে বলল, গত রাতে আমি তোমাদেরকে আমার যে প্লান-পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম তা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছিলাম আর তখনই ঘটে গেল এ ঘটনা। আমি যখন ভারী পাথরটি নিয়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম তখন তাঁর ও আমার মাঝে এমন এক বিশাল উট প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল যেমন বিশাল উট আমি জনমেও দেখিনি। তার সুবিশাল মাথা, মোটা ঘাড় আর লম্বা লম্বা দাঁত আমি কখনো কোনো উটের দেখিনি। আমার মনে হলো সে বুঝি পলকেই আমাকে গিলে ফেলবে।

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, আমি শুনেছি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল আ.। সে যদি অগ্রসর হতো তবে তিনি নিশ্চয়ই তাকে ধরে ফেলতেন।** [২১৬]

দর কষাকষি ও মুসাহেবি

যখন কুরাইশের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলাফল ছিল বিরাট একটা শূন্য; প্রলোভন ও প্রলুব্ধি, হুমকি ও ধমকি ইত্যাদি তাদের সবকিছু ফাও গেল। তখন তাদের হৃদয় এক নতুন আগ্রহ আর এক নতুন দুনিয়ার দিকে যাত্রা করতে উদ্যোগী হলো। তারা চাইল মুহাম্মাদের সঙ্গে এমন একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যার মাধ্যমে তারা এই মহা মুসিবত থেকে রক্ষা পেতে পারে । অপরদিকে তাদের মনও এ কথা শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারছিল না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাতিল ও ভ্রান্ত পথে রয়েছেন। বরং এ ব্যাপারে তারা - যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন, لَفِيْ شَكٍّ مُرِيْبٍ তার বিভ্রান্তিকর সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। সুতরাং, তারা মনে মনে ভেবে নিলো, কিছু কিছু ধর্মীয়

---

[২১৬] ইবনে হিশাম ১/২৯৮, ২৯৯।

বিধানাবলির ক্ষেত্রে মুহাম্মাদের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা করতে হবে। তাঁর সঙ্গে রাস্তা ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারা তাদের কিছু কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধান ছেড়ে দিবে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও তার ধর্ম থেকে সামান্য একটু এক পাশে চলে আসতে বলবে। তাদের ধারণা ছিল এই যে, যদি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হক্ব আর হক্কানিয়্যাতের ওপর থেকে থাকেন তবে তারাও এভাবে তার একটু ভাগ পাবে।

ইবনে ইসহাক রহ. এর নিজস্ব সনদে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা শরীফ তওয়াফ করছিলেন। ঠিক এমন সময় আসওয়াদ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন আসাদ বিন আব্দুল উয্যা, ওলীদ বিন মুগীরা, উমাইয়্যা বিনতে খালফ এবং আস বিন ওয়ায়েল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথে এসে দাঁড়াল। তারা সকলে ছিল তাদের কওমের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ও সম্মানিত প্রাণ। তারা বলল, মুহাম্মাদ! আসুন, আপনি যার ইবাদত করেন আমরা তাঁর ইবাদত করব আর আমরা যার ইবাদত করি আপনিও তাঁর ইবাদত করবেন। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমরা উভয়ে সমানভাবে শরীক থাকব। এখন যদি আপনার মাবুদ আমাদের মাবুদের থেকে ভালো ও উত্তম হয়ে থাকে তবে তো তার কিছু বরকত আমরাও পেয়ে গেলাম। আর যদি আমাদের মাবুদ আপনার মাবুদের থেকে ভালো ও উত্তম হয় তবে আপনিও তার থেকে আপনার বরকতের হিস্যাটুকু নিয়ে নিলেন। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে নাযিল করলেন: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) সম্পূর্ণ সুরাটি।[২১৭]

আবদু বিন হুমাইদ প্রমুখ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি যদি বরকতের জন্য আমাদের মাবুদগুলিকে স্পর্শ করেন তবে আমরা আপনার মাবুদের ইবাদত করব। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) গোটা সূরাটি।[২১৮]

ইবনে জারীর রহ. প্রমুখ ইবনে আব্বাস রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন, কুরাইশরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রস্তাব দিয়েছিল আপনি এক বছর আমাদের মাবুদের ইবাদত করবেন আমরাও এক বছর আপনার মাবুদের ইবাদত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন : قُلْ

---

[২১৭] ইবনে হিশাম ৩৬২।

[২১৮] দুররুল মানসূর ৬/৬৯২।

أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? [সূরা যুমার:৬৪][২১৯]

এভাবে যখন আল্লাহ তাআলা দৃঢ় ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুশরিকদের হাস্যকর প্রস্তাবগুলি হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন তারপরও কুরাইশরা হাল ছাড়ল না; বরং তারা এবার আরও নীচে নেমে গেল। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আপনি আপনার আনীত শিক্ষামালার মধ্যে একটু গরমিল ও পরিবর্তন আনুন তবেই আমরা আপনার দীনকে গ্রহণ করব। সুতরাং, তারা বলল ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ (এ কুরআন ব্যতীত অন্য একটি কুরআন নিয়ে আসুন কিংবা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করুন) কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এ প্রস্তাবের পথও বন্ধ করে দিলেন। তিনি আয়াত নাযিল করলেন قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥) তাহলে বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই আনুগত্য করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নাফরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি [সূরা ইউনুস:১৫] এবং আল্লাহ তাআলা এ কাজের ভীতি ও শঙ্কা সম্পর্কে তাকে সচেতন করে দিলেন নিম্নোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা : وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥) তারা তো আপনাকে হটিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্যে তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সম্বন্ধযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। [সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৩-৭৫]

[২১৯] তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী।

মুশরিকদের পেরেশানী গভীর চিন্তা ভাবনা ও ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ

মুশরিকরা যখন এ সকল প্রস্তাবনা, আলাপ-আলোচনা আর নতি স্বীকারের ক্ষেত্রেও ব্যর্থ হলো তখন তাদের সামনের পথ ঘনঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল। সে পথে চলা এখন পুরোপুরি কঠিন কিংবা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তারা তাদের কর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে হতবিহ্বল ও পেরেশান হয়ে পড়ল। অসফলতার বাউরি বাতাস তাদের পেশানিতে ক্লান্তির ছাপ ফেলে গেল। এমতাবস্থায় ত্রাণকর্তা ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো তাদের এক নেতা নজর বিন হারিস। সে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম! তোমরা জাতীয় আর ধর্মীয় জীবনের এমন এক বাঁকে দাঁড়িয়ে আছ এখন পর্যন্ত যেখানে তোমরা সামনে চলার পথ বের করতে পারোনি! সুস্থ চিন্তা ও বিবেকের সাহায্যে তোমরা তোমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে সফলতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দাওনি। মুহাম্মদ তো তোমাদেরই বংশের একটি ছেলে। সে যখন তরতাজা এক নওজোয়ান ছিল তখন তোমরা সবার চেয়ে তাকেই বেশি ভালোবাসতে। তোমরা তাঁর কথাকেই সর্বাধিক সত্য মনে করতে। তাকেই সবচেয়ে বড় আমানতদার মনে করতে। কিন্তু যখন তোমরা তাকে যৌবনে মঞ্চ থেকে বার্ধক্যের মঞ্চের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলে; যখন তার ভেতরে পট পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ আভাস টের পেলে এবং যখন সে যা নিয়ে আসার তা নিয়ে এলো তখন তোমরা তাকে জাদুকর বলতে শুরু করলে। আল্লাহর কসম! সে জাদুকর নয়। কারণ, আমি বহু জাদুকর আর তাদের জাদু দেখেছি। সে জাদুকরদের মতো ঝাড়-ফুঁক করে না কিংবা গিরা লাগায় না। এরপর তোমরা তাকে জ্যোতিষী বলেছ। আল্লাহর শপথ! সে কোনো দিনও জ্যোতিষী হতে পারে না। জ্যোতিষীদের বিড়বিড় মন্ত্র কিংবা ছন্দবদ্ধ কবিতা আমি দেখেছি। তার ভেতরে কোনো দিনও আমি তা খুঁজে পাইনি। এরপর তোমরা তাকে কবি বলেছ। আল্লাহর কসম! সে কবিও নয়। জীবনে বহু কবিতা দেখেছি। কবিতার যত ঢঙ আর রঙ রয়েছে সবগুলো উপভোগ করেছি। কিন্তু সে যা বলে তার একটি লাইনও কবিতা নয়। তারপর তোমরা তাকে পাগল বলেছ। আল্লাহর কসম! সে পাগলও নয়। পাগলদের আমি খুব ভালো করেই চিনি। তাদের পাগলামি, উল্টা-সিধা চলাফেরা আর অনর্থক বকবকানি আমি অনেক শুনেছি। সুতরাং, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এখন তোমরাই ভেবে দেখো তোমাদের কী করা উচিত। আল্লাহর কসম! সে তোমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছে।

যখন তারা সকল চ্যালেঞ্জের মুখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইস্পাত-কঠিন অবিচলতা আর দৃঢ়তা প্রত্যক্ষ করল; যখন তারা দেখতে পেল কীভাবে তিনি তাদের চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবগুলি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান

করেছেন; কীভাবে জীবনের প্রত্যেকটি মঞ্চে তিনি অটল ও অবিচল থেকে স্বীয় মিশনের প্রতি যত্নবান থেকেছেন; এর পাশাপাশি কী পরিমাণ সততা, পবিত্রতা আর মহোত্তম চরিত্র-মাধুরীর অপূর্ব শোভায় তাঁর গোটা অস্তিত্ব সতত শোভিত থেকেছে; তখন তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে তাদের শঙ্কা আরও বেড়ে গেল। সুতরাং, তারা সিদ্ধান্ত নিলো ইহুদিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া দরকার; একটি সুস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা একান্ত প্রয়োজন। সে মোতাবেক তারা তাদের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পুরুষ নযর বিন হারিসের সঙ্গে এক জন বা দু'জন লোক সহকারে মদীনার ইহুদিদের কাছে পাঠিয়ে দিলো। যখন তারা এসে সব ঘটনা ইহুদিদের নিকট খুলে বলল তখন ইহুদি পণ্ডিতরা তাদেরকে বলল, তোমরা তাকে তিনটি প্রশ্ন করবে। যদি সে সত্য সত্য সেগুলোর উত্তর বলে দিতে পারে তবে সে সত্য ও প্রেরিত নবী। আর যদি সে এগুলির উত্তর না দিতে পারে তবে সে একজন মিথ্যুক, প্রতারক ও ভণ্ড।

এক. প্রাচীন যুগের ঐ সকল যুবক কারা ছিল যারা জনপদ ও লোকালয় ছেড়ে নির্জন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ঘটনা কী ছিল? কেননা তাদের একটি বড় আশ্চর্যজন ঘটনা রয়েছে।

দুই. ঐ ব্যক্তি কে ছিল যে গোটা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত সফর করেছিল। তার ঘটনা কী ছিল?

তিন. রূহ কী? হাকীকতে এটা কেমন?

যখন তারা মক্কায় এসে উপস্থিত হলো তখন গর্বভরে বলতে লাগল এবার আমরা আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে চলমান দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অবশ্যই করব। এরপর সকলকে তারা পুরো কাহিনী সবিস্তারে খুলে বলল। অনন্তর তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে প্রশ্ন তিনটি উত্থাপন করল। এর কিছুদিন পরেই অবতীর্ণ হলো সূরা কাহফ। এতে ঐ সকল যুবকের কাহিনী সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। আর তারা ছিল আসহাবে কাহফ। বিশ্ব পর্যটক ঐ ব্যক্তির ঘটনাও এতে স্থান পেয়েছে যিনি গোটা দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত সফর করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন বাদশা যুল কারনাইন। আর রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে সূরা বনী ইসরাঈলে।

তখন কুরাইশের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপূর্ণ হক্ব ও সত্যের ওপর রয়েছেন। কিন্তু এটা যালিমদের কেবল কুফরীকেই বাড়িয়ে দিলো। [২২০]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের মুকাবেলায় কুরাইশরা কী কী অস্ত্র আর হাতিয়ার নিয়ে জীবনের ময়দানে নেমে এসেছিলে এই

---

২২০ ইবনে হিশাম ১/২৯৯-৩০১।

ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। জাহালত কীভাবে এবং কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে এই নতুন তুফানের সামনে বালির বাঁধ নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছিল তার একটি ছোট ছবি। আর এর প্রত্যেকটিই তারা ধারাবাহিকভাবেই করে যাচ্ছিল। এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে; এক পর্যায় থেকে আরেক পর্যায়ে ওঠানামা করছিল তাদের পদক্ষেপ। কখনো কঠোরতা থেকে নম্রতার দিকে; আবার কখনো নম্রতা থেকে কঠোরতার দিকে যাচ্ছিল। কখনো ঝগড়া ও বিবাদ ছেড়ে সমঝোতা ও বোঝাপড়ার দিকে উঠছিল আবার কখনো বোঝাপড়া থেকে বিবাদের পথ ধরছিল। কখনো হুমকি-ধমকি বাদ দিয়ে নরমভাবে প্রলুব্ধি ও লালসার পথে ডাকছিল আবার কখনো নরম ও কোমলতার পথ ছেড়ে দিয়ে হুমকি-ধমকি মারছিল। এক সময় উত্তেজিত হয়ে উঠত আবার আরেক সময় গলে যেত। এই বিবাদে লিপ্ত হতো আবার ঐ তোষামোদির পথ ধরত। এই রণোন্মাদ হয়ে সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ত আবার ঐ পিছু হটে মুসাহেবি শুরু করত। এখন ভয়-ভীতি দেখাত তো একটু পরে লোভ ও লালসার দোকান খুলে বসত। যেন একবার ভয়ে ভয়ে এক কদম সামনে বাড়ত আবার হাঁক শুনে দুই কদম পিছিয়ে যেত। কোনো এক জায়গায় কখনোই তারা স্থির ছিল না। সামনে যেমন বাড়তে রাজি ছিল না ঠিক তেমনি ময়দানে পিঠ দেখিয়ে ভেগে যাওয়ার পক্ষেও তারা ছিল না। তবে তাদের এ সবকিছুর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল দাওয়াতের আওয়াযকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়া। এর কণ্ঠ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করে ফেলা। এর প্রদীপ্ত দীপশিখা জনমের জন্য নিভিয়ে ফেলা। মূর্তি পূজার বাজারে কুফরীর সওদা জনপ্রিয় করে তোলা। কিন্তু তারা তাদের সাধ্যমতো সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরেও; তাদের তূণের সকল তীর নিক্ষেপের পরেও ব্যর্থতাই তাদের কপালের লিখন ছিল। সকল হাতিয়ার হাতে নেওয়ার পরেও তারা যেন হাতিয়ার ছাড়া ছিল। সবকিছু করার পরেও তারা যেন কিছুই করেনি। এখন তাদের সামনে রাস্তা ছিল একটিই। এখন তাদের হাতে হাতিয়ার ছিল একটিই। আর তা হলো লড়াই ও তলোয়ার। কিন্তু লড়াই তো কেবল আগুনই বৃদ্ধি করতে পারে। তলোয়ার তো কেবল রক্তের বন্যাই বইয়ে দিতে পারে। পারে গণহত্যার জোয়ার আনতে। পারে কেবল ব্যর্থতা আর অসফলতার ঘনঘোর অন্ধকারের রাতকে আরও দীর্ঘায়িত করতে।

আবু তালিব ও তার আত্মীয়-স্বজনের ভূমিকা

আবু তালিব যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে এক ভয়াল পরিস্থিতির মুখামুখি হলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন, কুরাইশরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার জন্য তাকে তাদের হাতে সমর্পণের দাবি নিয়ে তাঁর দরজায় হাঁক ছাড়ছে। পরবর্তী সময় যখন দেখলেন, তাদের চলন-বলন আর কথা-কার্য সবকিছু থেকেই যেন রাসূলের প্রতি

বিদ্বেষ আর জিঘাংসার আগুন ঠিকরে পড়ছে। উদাহরণত উকবা বিন আবু মুঈত, আবু জাহল বিন হিকাম, উমর বিন খাত্তাব প্রমুখের পদক্ষেপ ও কর্মধারা তাকে উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তিনি দেরি না করে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে এক জায়গায় সমবেত করলেন। তাদেরকে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ হেফাযতের প্রতি আহ্বান করলেন। আরবীয় গোত্র আর সাম্প্রদায়িক দাবির ভিত্তিতে মুসলমান-কাফের-নির্বিশেষে উল্লিখিত কবীলাদ্বয়ের সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিলো। কাবার সন্নিকটে তারা সকলেই এর ওপর একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। একমাত্র ব্যক্তি আবু তালিবের ভাই আবু লাহবই ছিল তাদের বাইরে। কুরাইশের সঙ্গে গলাগলি বেঁধে সে নিজ কওম ও কওমের মানুষের সঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিল।[২২১]

[২২১] ইবনে হিশাম ১/২৬৯।

পূর্ণ বয়কট

যুলুম ও নির্যাতনের প্রতিশ্রুতি

যখন মুশরিকদের সকল কলা-কৌশল ব্যর্থ হলো তখন তাদের বিহ্বলতা আর ব্যকুলতা আরও বেড়ে গেল। তাদের কপালে চিন্তার রেখা বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। অপরদিকে তারা বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিবকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেফাযত ও সুরক্ষার ব্যাপারে কোমর বাঁধা দেখতে পেল। তারা দেখতে পেল যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। এরপর তারা সকলে মুহাস্‌সাব উপত্যকায় বনু কেনানার সঙ্গে সমবেত হলো। সেখানে তারা পরস্পরে অঙ্গীকার করল যে, তারা আজ থেকে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না। তাদের সঙ্গে কোনো লেনদেন কিংবা ক্রয়বিক্রয় করবে না। তাদের সঙ্গে কোনো মজলিসে একত্রে বসবে না। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে না। তাদের ঘরে ঢুকবে না। এমনকি তাদের সঙ্গে কথাও বলবে না। আর এগুলি ততদিন পর্যন্ত বলবৎ রাখবে যতদিন পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া না হবে। মুশরিকরা এ বয়কটের শর্তগুলি নিয়ে একটি চুক্তিনামা লিখল। চুক্তিনামায় এ অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, বনু হাশিম যতদিন পর্যন্ত তাকে আমাদের কাছে অর্পণ না করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোনো সন্ধি কিংবা মৈত্রিচুক্তি গ্রহণ করা যাবে না।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে চুক্তিনামাটি লিখেছিল মনসূর বিন ইকরামা বিন আমের বিন হাশিম। আবার কারও কারও মতে, নযর বিন হারিস। তবে বিশুদ্ধ মতে এটা লিখেছিল বাগীয বিন আমের বিন হাশিম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য বদদুআ করেছিলেন। ফলে চিরদিনের জন্য আল্লাহ তাআলা তার হাত অবশ করে দিয়েছিলেন।[২২২]

অঙ্গীকার পর্ব শেষ হলে চুক্তিনামাটি কাবার দেয়ালে টানিয়ে দেওয়া হলো। ফলাফলে কেবল আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিবের মুসলমান-কাফের-নির্বিশেষে সকলে শিয়া'বে আবু তালিবে বন্দী হয়ে পড়ল। এটি ছিল

---

[২২২] দেখুন সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ৩/৫২৯, হাদীস নং ১৫৮৯, ১৫৯০, ৩৮৮২, ৪২৮৪, ৪২৮৫, ৭৪৭৯। যাদুল মাআদ ২/৪৬।

নবুওতের সপ্তম বছরের মুহাররম মাসের চাঁদনী রাতের ঘটনা। এভাবে যখন নতুন বছরের নতুন মাসের মাথার ওপর সৌভাগ্যের নতুন চাঁদ উঁকি দিলো ঠিক তখনই বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিবের ভাগ্যাকাশ থেকে মিটিমিটি জ্বলে থাকা চাঁদ আর তারাগুলি ডুবে গিয়ে তাকে রাজ্যের অন্ধকারে ভরিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে এই বয়কটের সময়কাল সম্পর্কে অন্যান্য মতামতও পাওয়া যায়।

শিয়াবে আবু তালিবে তিন বছর

শিয়াবে আবু তালিবে কিছুদিন যেতে না যেতেই বন্দীরা বেহাল দশায় পড়ে গেল। তাদের জীবনে নেমে এলো ভয়াবহ সংকীর্ণতা আর হতবিহ্বলতা। বাইরের সকল সাহায্য সহযোগিতা থেকে তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়ল। যেন এক সংকীর্ণ অন্ধকার কুঠরিতে কোনো বনী আদমকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আর সে দিনে দিনে সেখানে পচে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকেই যে খাদ্য সামগ্রীই মক্কায় আসত চোখের পলকে তা শেষ হয়ে যেত। মক্কার ভেতরে প্রবেশের আগেই মুশরিকরা দৌড়ে গিয়ে সব কিনে ফেলত। এভাবে তাদের জীবন-যুদ্ধের ময়দান ক্রমশ সরগরম হয়ে উঠতে থাকে। জীবন আর যিন্দিগি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। মানুষের খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে গাছের পাতা আর চামড়া খেয়ে এগিয়ে চলতে লাগল তাদের জীবন গাড়ির চাকা। এভাবে পাশবিক জীবনের এক আনাড়ি ময়দানে চলতে থাকল জীবনের এক নতুন প্রতিযোগিতা। শিয়াবে আবু তালিবের পাশের পথ ধরে যারা চলত ভেতরের ক্ষুধার্ত শিশু ও নারীদের হাউমাউ আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠত সে সকল পথিকের অন্তরাত্মা। হৃদয়ের একেবারে গহীন থেকে যন্ত্রণার আগুন 'আহ' হয়ে বের হতো। বাইরের দুনিয়া থেকে কোনো কিছু তাদের কাছে পৌঁছাতে হলে তার একমাত্র মাধ্যম ছিল গোপন ও লুকানো পথ অবলম্বন করা। প্রয়োজনীয় বস্তু সামগ্রী কেনার জন্য তাদের বাইরে আসার সুযোগ ছিল না। কেবল হারাম মাসগুলিতেই তারা এর জন্য বাইরে বের হওয়ার অনুমতি পেত। সেই দিনগুলিতে তারা সাধারণত মক্কার বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন কাফেলার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনে রাখত। মক্কার মুশরিকদের কাছে কোনো কিছুর জন্য তারা না গেলেও মুশরিকরা বিক্রেতাদেরকে তাদের পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বলত যাতে করে এই হতদরিদ্র ও নিপীড়িত মানুষগুলি কিছু কিনতে না পারে। যাতে এভাবেই এক সময় নিভে যায় জীবন সাগরে মহা প্রলয়ের তাণ্ডবে নিভু নিভু জ্বলে থাকা তাদের জীবনের দীপশিখা।

হাকীম বিন হিযাম রা. মাঝে মধ্যে তার ফুফু খাদীজা রা. এর জন্য গম ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। একদিন পথে আবু জাহলের সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে বারণ করল। এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয়ে গেল; কিন্তু আবুল

বাখতারি এসে তাদেরকে থামিয়ে দিলেন এবং হিযামকে সেগুলো দিয়ে খাদীজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আর এদিকে আবু তালিব তখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও পেরেশানিতে জর্জরিত ছিলেন। এ কারণে রাতে শোয়ার সময় সবাই যখন নিজ নিজ বিছানায় চলে যেত তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও আপন বিছানায় শুয়ে পড়ার নির্দেশ দিতেন। এরপর লোকজন যখন ঘুমিয়ে পড়ত তখন তিনি কাছের কোনো আত্মীয়কে রাসূলের বিছানায় শুইয়ে দিতেন আর তার বিছানায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে শুইয়ে দিতেন। যাতে করে তাকে হত্যার সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়।

প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সকল মুসলমানগণ শিয়াবে আবু তালিবের বন্দিদশার বাইরে চলে আসতেন। মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন; তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকতেন। এর কারণে আবু লাহাব কী করত পেছনে আমরা সে কাহিনী বলে এসেছি।

চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলা হল

এভাবেই কেটে গেল দুই কিংবা তিনটি বছর । বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিবের ওপর তখনো চলছিল চরম অন্যায় আর পাশব যুলুম ও অত্যাচার। অবশেষে নবুওতের দশম বছর মুহাররম মাসে[২২৩] এই অন্যায় চুক্তি পত্র ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কারণ, কুরাইশরা শুরু থেকেই বয়কটের এই চুক্তিনামা নিয়ে দুটি ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। আর তাই যারা এর বিরুদ্ধে ছিল তারা হরহামেশা এই অমানবিকতার উপসংহার টানার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এর পেছনে মূল নিয়ামক ছিল বনু আমের বিন লুওয়াই এর হিশাম বিন আমর। সে রাতের গভীর অন্ধকারে বনু হাশিমের জন্য খাবার-দাবার নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শিয়াবে আবু তালিবে যেত। সে সম্পূর্ণই এই অমানবিক চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল। এ কারণে সে এর একটা অবসান ঘটানোর জন্য সর্বপ্রথম যুহাইর বিন আবী উমাইয়্যা মাখযূমীর নিকটে গেল। আর তার মা ছিল আয়েকা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তার কাছে গিয়ে সে বলল, যুহাইর! তোমার মামারা কী অবস্থায় দিন গোযরান করছে তা তো তুমি জানোই; সুতরাং এ অবস্থায় উন্নত মানের খাবার-

---

২২৩ এর প্রমাণ হলো, আবু তালিব এ বয়কট চুক্তি ভঙের ছয় মাস পরে ইন্তেকাল করেছিলেন। আর বিশুদ্ধ মতে আবু তালিবের ইন্তেকাল হয়েছিল রজব মাসে। আর যাদের বক্তব্য যে আবু তালিব রমযান মাসে ইন্তেকাল করেছেন। তাদের বক্তব্য তিনি এ বয়কট চুক্তি ভঙের আট মাস ও দিন কয়েক পরে ইন্তেকাল করেছিলেন।

দাবার আর বিলাস-ব্যসনের মধ্যে তুমি কি সুখের ঠিকানা খুঁজে পেতে পারো? যুহাইর বলল, কিন্তু তুমিই বলো! আমি একাকী কী-ই বা করতে পারি? যদি আমার সঙ্গে অন্য কেউ থাকত তবে আমি সেই চুক্তিপত্রটি ভেঙে ছাড়তাম। হিশাম বলল আরেকজন তো আছেই। সে জিজ্ঞাসা করল কে? হিশাম বলল আমি। যুহাইর তাকে বলল আমাদের তৃতীয় আরেকজন প্রয়োজন!

এরপর সে মুতঈম বিন আদীর নিকটে গেল। সে তাকে সর্বপ্রথম আবদে মানাফ এর দুই ছেলে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবে সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। এরপর এই যুলুম ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে কুরাইশের পক্ষাবলম্বন করার কারণে সে তাকে নিন্দা ও তিরষ্কার করল। মুতঈম তাকে বলল, কিন্তু বলো তো আমি একা কী করব? হিকাম বলল দ্বিতীয় আরেক জন রয়েছে। মুতঈম জিজ্ঞাসা করল সে কে? হিকাম বলল আমি। সে বলল তবে তৃতীয় আরেক জন পাও কি না একটু খুঁজে দেখো। হিকাম বলল পেয়েছি। মুতঈম তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। হিকাম বলল যুহাইর বিন আবী উমাইয়্যা। মুতঈম বলল চতুর্থ আরেক জন দেখো পাও কি না!

এরপরে হিকাম আবু বাখতারী বিন হিশামের কাছে গেল। এরপরে মুতঈমকে যা বলেছিল তাকেও ঠিক তাই বলল। সবকিছু শুনে আবুল বাখতারী বলল এ ক্ষেত্রে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসার মতো কেউ আছে কি? হিকাম জানালো আছে! সে তার নাম ঠিকানা জানতে চাইল। হিকাম বলল যুহাইর বিন আবী উমাইয়্যা, মুতঈম বিন আদী আর আমি। সে বলল পঞ্চম আরও একজন আমাদের দলে নেওয়ার চেষ্টা চালাও!

এরপর হিকাম যামআ বিন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব বিন আসাদের কাছে গেল। সে তাদের সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক আর অধিকারের কথা মনে করিয়ে দিলো। সবকিছু শোনার পরে যামআ বলল: তুমি আমাকে যে পথে ডাকছ অন্য কেউ এ পথে আছে কি? সে বলল হাঁ। এরপর তার কাছে বাকী চারজনের কথা খুলে বলল। তারা সকলে হাজূন নামক স্থানে সমবেত হলো এবং চুক্তিনামা ভেঙে ফেলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। যুহাইর বলল, আমিই তোমাদের সকলের আগে শুরু করব অর্থাৎ আমি সর্বপ্রথম কথা বলব।

সকাল বেলা তারা সবাই প্রতিদিনের অভ্যাস অনুযায়ী তাদের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলো। যুহাইরও একজোড়া কাপড় পরে উপস্থিত হলো। প্রথমে সে বাইতুল্লাহর চারপাশে সাত বার তওয়াফ করল এরপর উপস্থিত লোকদের কাছে গেল। সকলকে সম্বোধন করে বলল, হে মক্কাবাসী! আমরা সুস্বাদু খাবার খাচ্ছি; দামি পোশাক পরিধান করছি আর বনু হাশিম দিনে দিনে ধ্বংসের অতল গহ্বরে

তলিয়ে যাচ্ছে। এ কতই না সুন্দর ইতিহাস (?)! কতই না সুখকর কাহিনী (?)! তাদের কাছে কোনো কিছু বিক্রি করা হয় না আবার তাদের কোনো জিনিসও ক্রয় করা হয় না। আল্লাহর কসম! যতক্ষণ না এই বৈষম্য, অন্যায় আর যুলুমের চুক্তিপত্র ছিঁড়ে ফেলা না হবে ততক্ষণ আমি বসব না।

মসজিদুল হারামের এক পাশ থেকে আবু জাহল সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহর কসম! এই চুক্তিনামা ছেঁড়া হবে না।

যামআ বিন আসওয়াদ বলে উঠল, সে নয়; আল্লাহর কসম! তুমি তার চেয়েও বড় মিথ্যুক! যখন এই চুক্তিনামা লেখা হয়েছিল তখনো আমরা এ ব্যাপারে রাযি ছিলাম না।

আবুল বুখতারি বলল, যামআ সত্য বলেছে। এই চুক্তিনামায় যা কিছু লেখা আছে আমরা তার সঙ্গে এক মত নই। আমরা সেগুলি স্বীকার করি না।

মুতঈম বিন আদী বলল, তোমরা দুজনই সত্য বলেছ। এর বিপরীত যে কিছু বলেছে সে মিথ্যুক ও প্রতারক। আমরা তা থেকে এবং যা কিছু তাতে লেখা রয়েছে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্ত থাকার দাবি করছি।

হিশাম বিন আমরও একই কথা বলল।

সবশেষে আবু জাহল বলল, এই কাজটি আজ থেকে বহু দিন আগে এক চাঁদনী রাতে করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে এই জায়গা ছাড়া অন্য এক জায়গায় পরামর্শ করা হয়েছিল।

আবু তালিব মুসজিদুল হারামের এক পাশে বসে সবকিছু দেখে যাচ্ছিল। তাদের কাছে তার আসার কারণ হলো আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চুক্তিনামার ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাতে একটি কীট পাঠিয়ে দিয়েছেন যে সেই চুক্তিনামায় লিখিত কেবল আল্লাহ তাআলার নামটি ব্যতীত অন্যায় আর অত্যাচারমূলক সকল শর্ত খেয়ে ফেলেছে। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচাকে এ ব্যাপারে অবহিত করলেন। তাই তিনি কুরাইশের নিকট বের হয়ে বলতে লাগলেন তার ভাতিজা তাকে এমন এমন সংবাদ দিয়েছে। যদি তাঁর কথা মিথ্যা হয় তবে আমরা তোমাদের ও তাঁর মাঝ থেকে সরে যাবে। আর যদি তাঁর কথা সত্য হয় তবে তোমরা আমাদের ওপর যুলুম ও অত্যাচার থেকে বিরত থাকবে। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলো।

আবু জাহল ও তাদের মাঝে কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে মুতঈম চুক্তিনামাটি ছিঁড়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। তখন সে দেখতে পেল কেবল بِاسْمِكَ اَللّٰهُمَّ আর জায়গায় জায়গায় উল্লিখিত اللّٰه ছাড়া আর সবকিছু পোকায় খেয়ে ফেলেছে।

অতঃপর চুক্তিনামাটি ছিঁড়ে ফেলা হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ বেদনাভরা দীর্ঘ তিন বছরের কারা জীবন শেষ করে মুক্তির অনাবিল স্বাদ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বস্তুত এটি ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত ও রিসালতের সত্যতার এক বড় ও স্পষ্ট দলীল। কিন্তু কাফেরদের অবস্থা তো আল্লাহর ভাষায় 'যখন তারা কোনো নিদর্শন দেখে তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো খোলামেলা জাদু'! সুতরাং তারা এ বিশাল নিদর্শনটির প্রতিও চোখ তুলে তাকায়নি। উল্টো এটি তাদের কুফরীর মাত্রাকেই বৃদ্ধি করেছে। তাদের হিংসা আর বিদ্বেষের অনলে ঘি ঢেলেছে।[২২৪]

আবু তালিবের নিকট কুরাইশের সর্বশেষ প্রতিনিধি

শিয়াবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার নিজের মতো করে কাজ শুরু করলেন। কুরাইশরা যদিও তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতা আর বিভেদের ধারা অব্যাহত রাখেনি; কিন্তু মুসলমানদের ওপর তাদের নিগ্রহ ও নিষ্পেষণ আর আল্লাহর পথে বাঁধা দেওয়ার ধারা একটুকু সময়ের জন্যও ব্যাহত হয়নি। এভাবে তারাও তাদের চিরাচরিত ধারায় কাজ করে যাচ্ছিল। অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আবু তালিবও তাঁর জনম ভরের ফিতরাতের ডাকে সাড়া দিয়ে স্বীয় ভাতিজাকে সব রকমের রক্তচক্ষু থেকে স্বীয় আঁচলে পেঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যাশায় চিরজাগ্রত ছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই তাঁর জীবনের আশিটি বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। জীবন যুদ্ধের নিরন্তর আবাহনী আর বছরের পর বছর ধরে একটানা চলে আসা বিভিন্ন দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনা তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। বিশেষ করে এক নাগাড়ে তিন তিনটি বছর শিয়াবে আবি তালিবের সংকীর্ণ বধ্যভূমিতে আটকে থাকার দরুন তার জীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। কোমর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। জীবন গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করেছিল। চাকা ছুটে গিয়ে রাস্তার পাশে পড়বে পড়বে বলে মনে হচ্ছিল। এমতাবস্থায় শিয়াবে আবি তালিবের বন্দীদশা থেকে শুভমুক্তির কয়েক মাস যেতে না যেতেই বড় ধরনের রোগ-ব্যাধি চারদিক থেকে যমের মতো তাকে আঁকড়ে ধরল। নানা ব্যাথা আর বেদনায় তিনি কুঁকড়ে উঠতে লাগলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মুশরিকদের হৃদয়ে এক নতুন ও অজ্ঞাত শঙ্কা দানা বেঁধে উঠল। আর তা হলো যদি আবু তালিবের মৃত্যুর পরে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কিছু করে তবে গোটা আরবে তাদের দুর্নাম

[২২৪] আমর বিক্ষিপ্ত এ সকল বর্ণনা সংগ্রহ করেছি সহীহ বুখারীর 'মক্কায় রাসূলের অবতরণ'১/২১৬, তাকাসুমুল মুশরিকীনা আলান নাবিয়্যী অধ্যায় ১/৫৪৮ অধ্যায়, যাদুল মাআদ ২/৪৬, ইবনে হিশাম ১/৩৫০, ৩৫১, ৩৭৪-৩৭৭ ইত্যাদি থেকে।

ছড়িয়ে পড়বে যে, আবু তালিবের জীবদ্দশায় কিছু করতে না পেরে তাঁর মৃত্যুর পরে এখন তার ভাতিজার সঙ্গে অসদাচরণ করছে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিলো শেষবারের মতো আবু তালিবের সামনে বসেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গে মত বিনিময় করা হবে। সেখানে তাকে এমন কিছু দেওয়ার প্রস্তাব করতে হবে কুরাইশরা ইতঃপূর্বে তাকে যা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়নি। এরপর তারা একটি প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। আর এটাই ছিল তাদের পক্ষ থেকে পাঠানো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সর্বশেষ প্রতিনিধিদল।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ বলেন, যখন আবু তালিবের অসুস্থতা ক্রমশ বাড়তে লাগল এবং কুরাইশের নিকট তাঁর অসুস্থতার এ খবর গিয়ে পৌঁছল তখন তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, হামযা ও উমর ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কুরাইশের প্রত্যেকটি কবীলাতে মুহাম্মাদের নতুন দীনের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তাই চলো এখন আমরা আবু তালিবের কাছে যাই। তাকে অনুরোধ করি তিনি যেন আপন ভাতিজাকে দমিয়ে রাখেন। পাশাপাশি তার ব্যাপারে আমাদের থেকেও একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। কারণ, আল্লাহর শপথ! আমাদের মনে শঙ্কা জেগে ওঠে যে, আরবের কবীলাগুলি আমাদের বশীভূত হয়ে বসে থাকবে না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, কারণ আমাদের ভয় হয়, যদি এই বুড়ো মারা যায় আর এরপর তাঁর ভাতিজার কিছু হয় তবে গোটা আরব আমাদেরকে থুথু দিবে। তারা গলা টেনে টেনে বলবে, দেখো! এতদিন তাঁর চাচা জীবিত ছিল বলে তাকে কিছুই করার সাহস পায়নি। আর আজ যখন তাঁর চাচা পৃথিবী থেকে চলে গেছে তখন তাঁর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো শুরু করেছে।

এভাবে অনেক কিছু ভেবে চিন্তে তারা আবু তালিবের কাছে এলো। তাঁর সঙ্গে তারা বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করল। আবু তালিবের নিকট এবারের প্রতিনিধি দলে এসেছিল কুরাইশের বড় বড় মাথাগুলি: উতবা বিন রবীআ, শাইবা বিন রবীআ, আবু জাহল বিন হিশাম, উমাইয়্যা বিন খলফ, আবু সুফিয়ান বিন হারব প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। সংখ্যায় তারা ছিল প্রায় পঁচিশ জন। তারা আবু তালিবের কাছে এসে বলল আবু তালিব! আপনি ভালো করেই জানেন, আমাদের মধ্যে আপনার অবস্থান কোথায়! আপনি এটাও জানেন, মৃত্যু এখন আপনার চোখের সামনে নৃত্য করছে। তাই আমরা আজ আপনাকে নিয়ে ভীত ও শঙ্কিত। তা ছাড়া আমাদের আপনার ভাতিজার মাঝে কী সম্পর্ক ও সমস্যা চলছে সে সম্পর্কেও আপনি অবগত। সুতরাং, তাকে আপনি ডাকুন। ডেকে তাঁর ব্যাপারে আমাদের কাছ থেকে কিছু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিন এবং তাঁর কাছ থেকেও আমাদের

ব্যাপারে কিছু অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিন যে, সে আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। আর আমরাও তাঁর ব্যাপারে নাক গলাব না। সে আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ওপর ছেড়ে দিবে আর আমরাও তাকে তাঁর ধর্মের ওপর ছেড়ে দিব। এরপর আবু তালিব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ডেকে পাঠালেন। তিনি উপস্থিত হলে তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ভাতিজা! এরা হলো তোমার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। এরা এসেছে তোমার সঙ্গে কিছু ওয়াদা ও অঙ্গীকার বিনিময়ের জন্য। এরপর আবু তালিব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সবকিছু খুলে বললেন। কেউ কারও ব্যাপারে মাথা না ঘামানোর যে প্রস্তাব মুশরিকদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সবিস্তারে তার কাছে তুলে ধরলেন। সবকিছু শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি আপনাদের সামনে এমন একটি কথা কি বলব না? যা বলার মাধ্যমে আপনারা গোটা আরবের বাদশা হয়ে যাবেন আর তামাম অনারব আপনাদের পদচুম্বন করবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আবু তালিবকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তাদেরকে এমন একটি কালিমার ওপর দেখতে চাই, যার মাধ্যমে গোটা আরব তাদের সামনে মাথা নত করে দিবে আর তামাম অনারব কবীলা তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করবে। অন্য এক বর্ণনানুযায়ী তিনি বললেন, চাচা! আমি কি তাদেরকে ঐ জিনিসের দিকে ডাকব না? যা তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর হবে। আবু তালিব বললেন, তুমি তাদেরকে কোন জিনিসের দিকে ডাকো? তিনি বললেন, আমি তাদেরকে এমন এক কালিমার দিকে ডাকি, যা বললে গোটা আরব তাদের সামনে নতি স্বীকার করবে আর তামাম অনারবের তারা মালিক হয়ে যাবে। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, আপনারা কেবল একটি কথা মেনে নিন এর মাধ্যমে আপনারা গোটা আরবের মালিক হয়ে যাবেন আর গোটা আজম আপনাদের পায়ে মাথা ঠুকে সালাম করবে। যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বক্তব্য শুনতে পেল তখন তারা মনে মনে ভাবল এ ধরনের বিশাল কল্যাণকর একটি প্রস্তাব কীভাবে তারা প্রত্যখ্যান করবে? অনন্তর আবু জাহল জিজ্ঞাসা করল, সেটা কী? তোমার বাপের কসম! শুধু একটা নয়; এ ধরনের দশটি কথাও যদি তুমি আমাদেরকে বলো তবে আমরা সানন্দে মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা সবাই বলো আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর কোনে মাবুদ নেই এবং তিনি ব্যতীত অন্যদের ইবাদত করা থেকে বিরত থাকো!

এ কথা শুনে তারা সবাই হাততালি দিলো। এরপরে বলল, মুহাম্মাদ! তুমি কি বহু ইলাহকে এক ইলাহায় পরিণত করতে চাচ্ছ? বড়ই আশ্চর্য লাগে তোমার

কাজ কারবার!

এরপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, আল্লাহর কসম! এই লোক তোমরা যা চাচ্ছ তা তোমাদেরকে কখনোই দিতে পারবে না। সুতরাং, তোমরা সকলেই ফিরে যাও! যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও তার মাঝে ফয়সালা না করবেন ততদিন পর্যন্ত তোমরা তোমাদের বাপ দাদার ধর্মের ওপর দৃঢ় পা থাকো! এরপর সকলে নিজ নিজ পথে চলে গেল।

তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (٢) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (٣) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٤) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (٥) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (٦) مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (٧)

সোয়াদ। শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের, বরং যারা কাফের, তারা অহঙ্কার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের আগে আমি কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি, অতঃপর তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে কিন্তু তাদের নিষ্কৃতি লাভের সময় ছিল না। তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাকো। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। আমরা সাবেক ধর্মে এ ধরনের কথা শুনিনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। [সূরা সোয়াদ : ১-৭] [২২৫]

[২২৫] ইবনে হিশাম ১/৪১৭-৪১৯। আরও দেখুন তিরমিযী ৫/৩৪১, হাদীস নং ৩২৩২। মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৪/৪৫৬, হাদীস নং ২৫৮৩। তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী।

শোকের বছর

আবু তালিবের ইন্তেকাল

ধীরে ধীরে আবু তালিবের অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। একদিন এ অসুস্থতাই মৃত্যুর পয়গাম হয়ে তাঁর দরজায় হানা দিলো। দুঃখঘন এ ঘটনাটি ঘটেছিল শিয়াবে আবু তালিব থেকে মুক্তি পাওয়ার ছয় মাস পর দশম হিজরী সনের রজব মাসে।[২২৬] এভাবে এক বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই আরেক বন্দীদশার মামলায় তাকে ফেঁসে যেতে হয়েছিল। কারও কারও মতে তাঁর ইন্তেকালের সময়কাল ছিল হযরত খাদীজা রা. এর মৃত্যুর তিন দিন আগে একই বছরের রমযান মাসে।

সহীহ বুখারীতে মুসায়্যাব রা. থেকে বর্ণিত, যখন আবু তালিব মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় কাতরাচ্ছিলেন তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিকটে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি আবু জাহলকেও আবু তালিবের শয্যাপাশে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি প্রাণপ্রিয় চাচা আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান! আপনি শুধু একবার বলুন لا إله إلا الله (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই) কারণ এটি এমন একটি কালিমা কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশের জন্য আমার প্রয়োজন হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিয়র থেকে আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়্যা বলে উঠল, আবু তালিব! জীবনের এ বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে কি তুমি তবে আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাবে? এভাবে তারা তাকে বলেই যেতে থাকল। অবশেষে আবু তালিবের মুখ থেকে জীবনের সর্বশেষ যে কথাটি বের হয়েছিল তা হলো: 'আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের ওপর'। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমাকে নিষেধ করার আগ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হলো مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী। [সূরা তাওবাহ : ১১৩] আরও অবতীর্ণ হলো إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ আপনি যাকে চান তাকেই হেদায়াত দান করতে পারবেন না [সূরা কাছাছ : ৫৬][২২৭]

---

২২৬ শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ১১১।

২২৭ সহীহ বুখারী: আবু তালিবের ঘটনা অধ্যায় ১/৫৪৮।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হেফাযত ও সুরক্ষা, মহব্বাত ও ভালোবাসা আবু তালিবের হৃদয় আর মনের কতখানি জায়গা দখল করে নিয়েছিল তা বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন ততদিন ছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অহঙ্কারী আর একঘেয়ে মুশরিকদের আক্রমণ থেকে রক্ষার এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। এতকিছুর পরেও আবু তালিবের কপালে ইসলাম ও তাওহীদের সুমিষ্ট শরাব জুটেনি; আর তাইতো সফলতার ঘাটে এসেও সবকিছু নিয়ে তাঁর জীবন তরীর ভরাডুবি ঘটে।

সহীহ বুখারীতে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি আপনার চাচা আবু তালিবের জন্য কী করেছেন? অথচ, তিনি তার জীবদ্দশায় আপনার জীবনের সবসময়ের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন? তিনি বললেন, **তিনি এখন জাহান্নামের সবচেয়ে ওপরের স্তরে রয়েছেন। যদি আমি না থাকতাম তবে তাঁর স্থান হতো জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে।** [২২৮]

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি (এটা ছিল এমন একটি সময় যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তার চাচা আবু তালিবের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছিল) তিনি বলেন, **কেয়ামতের দিন হয়তো তার ব্যাপারে আমার শাফায়াত কবুল করা হবে অতঃপর জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা ও লঘু শাস্তির স্থানে তাকে রাখা হবে। অর্থাৎ তাঁর পায়ের টাখনু (গিরা) পর্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকবে।** [২২৯]

আল্লাহর পথে খাদীজা রা.

আবু তালিবের মৃত্যুর দুই মাস কিংবা তিন দিন পরে উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা রা. ইন্তেকাল করেন। আর এটা ছিল নবুওতের দশম বছরের রমযান মাসের ঘটনা। বিশুদ্ধ মতে তখন তাঁর বয়স ছিল পয়ষট্টি বছর। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর।[২৩০]

প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে হযরত খাদীজা রা. ছিলেন আল্লাহ তাআলার এক মহান নেয়ামত। এ ছিল এমন এক নেয়ামত যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর ভোগ করেছিলেন। দুঃখ আর পেরেশানির রাজ্যের অন্ধকার যখন

[২২৮] প্রাগুক্ত।
[২২৯] প্রাগুক্ত।
[২৩০] ইবনুল জাওযী প্রণীত তালকীহ পৃষ্ঠা ৭।

চারদিক থেকে তাকে গিলে ফেলার উপক্রম করত ঠিক তখনই তিনি সে অন্ধকারের মধ্যে আলো হয়ে দেখা দিতেন। পরিবেশ আর পরিস্থিতি যখন তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত তখন তিনি সান্ত্বনা আর স্বস্তির প্রতীক হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। গোটা পৃথিবীব্যাপী নবুওত আর রিসালত পৌঁছে দেওয়ার যে গুরুদায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রেরিত হয়েছেন জীবনের পদে পদে সে ক্ষেত্রে তাকে তিনি সাহায্য করতেন। জিহাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গিন সময়েও ছায়া হয়ে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর কাছে থাকতেন। জান ও মাল দিয়ে তাকে সাহায্য করতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই খাদীজা রা. এর স্মৃতিচারণ করতেন এভাবে: **যখন গোটা পৃথিবীর মানুষ আমাকে অস্বীকার করেছিল ঠিক সেই মুহূর্তে সে আমাকে বিশ্বাস করেছিল। যখন সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন সে-ই আমাকে সত্যায়ন করেছিল। যখন গোটা মানবতা আমাকে বঞ্চিত করার প্রয়াসে রত ছিল সে-ই মুহূর্তে সে আমাকে বিত্ত-বিভবের মধ্যে অংশীদার করেছিল। যেখানে আল্লাহ তাআলা অন্য সবার গর্ভের সন্তান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন সেখানে কেবল তাঁরই গর্ভ থেকে আমাকে আমার সকল সন্তান দান করেছেন।** [২৩১]

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত জিবরাঈল আ. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে তাকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই হযরত খাদীজা রা. আসছেন। তাঁর সঙ্গে একটি পাত্রে তরকারি কিংবা খাদ্য অথবা পানীয় রয়েছে। সুতরাং তিনি যখন আপনার কাছে এসে পৌঁছবেন তখন আপনি তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবেন এবং জান্নাতে তাকে একটি মোতির ঘরের সুসংবাদ দেবেন; যাতে কোনো হৈ চৈ থাকবে না। থাকবে না অর্থহীন শোরগোল ও হৈ হুল্লোড়।[২৩২]

বেদনার পাহাড় পড়ল ভেঙে

হাতে গনা মাত্র কয়েক দিনের ভেতরেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে ঘটে গিয়েছিল এই দুটি দুর্ঘটনা। এর আঘাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হৃদয় রাজ্যে সাজানো অনুভব আর অনুভূতির সুবিন্যস্ত তন্ত্রীগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। যন্ত্রণার ধর-পাকড়ে তাঁর বুকের ভেতরে কাঁপনের মিছিল বের হতে থাকে। কেননা, আবু তালিবের মৃত্যুর পরে তারা তাকে বিভিন্ন নিপীড়ন আর যন্ত্রণা দেওয়ার দুঃসাহস দেখায়। এতে তাঁর পেশানির ওপর পেরেশানির স্তূপ পড়ে যায়। অন্ধকারের ওপর আবার রাজ্যের

[২৩১] মুসনাদে আহমাদ ৬/১১৮।
[২৩২] সহীহ বুখারী: খাদীজার সঙ্গে রাসূলের বিবাহ ও তাঁর ফযীলত ১/৫৩৯।

অন্ধকারের মেলা বসতে শুরু করে। এতে করে এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কাবাসীদের থেকে নিরাশ ও নীরব হয়ে যান। এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে বুকের মধ্যে নতুন আশার ঘর বেঁধে যাত্রা করেন তায়েফের পথে। তাঁর স্বপ্ন-তায়েফবাসীরা বুঝি তাঁর ডাকে সাড়া দিবে; এরপর হয়তো তারা তাঁর কওমের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। হয়তো দুশমনের হাত থেকে রক্ষার সুরক্ষিত দুর্গ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভাগ্য এখানেও তাঁর সঙ্গে ছিল না। পুরো তায়েফ চষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে এমন কাউকে পেলেন না, যে তাকে আশ্রয় দান করবে। যে তাঁর প্রতি বাড়িয়ে দেবে একটুখানি সাহায্যের হাত। বরং উল্টো তারা তাকে অনির্বচনীয় কষ্ট দিলো। তারা তাঁর ওপর এতটা যুলুম আর নির্যাতন করল যতটা তাঁর নিজের কওম কোনো দিন করেনি ।

মক্কার জমিন যেমনিভাবে দিনে দিনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সংকীর্ণ আর সংকুচিত হয়ে আসছিল ঠিক তেমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম আর নও মুসলিমদের জন্যও সংকীর্ণ আর সংকুচিত হয়ে আসছিল। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. মক্কা ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরত করে চলে যাওয়ার মনোস্থ করতে বাধ্য হন। এ উদ্দেশ্যে হাবশা যাওয়ার জন্য তিনি মক্কা থেকে বের হয়ে বারকুল গিমাদ পর্যন্ত পৌছে যান। সেখান থেকে ইবনুদ্দাগানাহ তাকে নিজের নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীতে করে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।[২৩৩]

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন আবু তালিবের ইন্তেকাল হলো তখন কুরাইশরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর এতটা যুলুম আর নির্যাতন চালানোর দুঃসাহস দেখাল আবু তালিবের জীবদ্দশায় যা কোনো দিনও পারা যায়নি। এমনকি কুরাইশের এক আহম্মক তাঁর চলার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তাঁর মাথায় মাটি ছিটিয়ে দেয়। তিনি মাথায় সে মাটি নিয়েই বাড়ি চলে যান। তখন তাঁর এক মেয়ে মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন আর কাঁদছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলছিলেন, **প্রিয় মেয়ে আমার! কেঁদো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার পিতার সঙ্গে রয়েছেন**। তিনি বলেন, এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি কথা আমাকে খুব বেশি বলতেন-**আবু তালিবের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত কুরাইশরা আমার সঙ্গে এমন কোনো আচরণ করেনি যা আমার কাছে ভালো কিংবা শোভনীয় মনে হয় না।**[২৩৪]

---

২৩৩ বিস্তারিত দেখুন সহীহ বুখারী ১/৫৫২, ৫৫৩। ইবনে হিশাম ১/৩৭২-৩৭৪।

২৩৪ ইবনে হিশাম ১/৪১৬।

এ বছরটিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনে একের পর এক যুলুম ও যন্ত্রণার ঝড় বয়ে যাওয়ার কারণে এটি ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল হুযন' তথা শোকের বছর হিসেবে পরিচিত। এ নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

হযরত সাওদা রা. এর সঙ্গে বিবাহ

এই বছরই তথা নবুওতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাওদা বিনতে যামআ রা. কে বিবাহ করেছিলেন। তিনি আগেভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বিতীয় বার হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরদের একজন ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন তখন সুকরান বিন আমর। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করে তার সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। কোনো কোনো বর্ণনায় মক্কায় ফিরে আসার পরে ইন্তেকাল করেছিলেন। যখন ইদ্দত শেষ করলেন তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন এবং বিবাহ করে নিলেন। হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকালের পরে তাকেই রাসূলে কারীম সা সর্বপ্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। জীবনের শেষ দিকে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার রাত যাপনের পালা হযরত আয়েশা রা. কে দান করেছিলেন।[২৩৫]

ধৈর্য আর অবিচলতার মূল চালিকাশক্তি

সীরাতে রাসূলের সরল ও সোজা পথে হেঁটে হেঁটে এ বাঁকে এসেই শান্ত মন অশান্ত হয়ে ওঠে। সুস্থির বিবেকবোধ অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে। পাঠকের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন তারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে: কী ছিল সেই মৌলিক চালিকাশক্তিগুলো যা মুসলমানদেরকে উপনীত করেছিল সফলতা আর প্রাপ্তিতে সমৃদ্ধ এ নতুন দুনিয়ার নতুন সমুদ্র সৈকতে? ইস্তেকামাত আর অবিচলতার বিস্ময় জাগানিয়া সর্বোচ্চ এ শিখরে? কীভাবে মুসলমানরা এ সকল পাশব যুলুম আর নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করেছেন; যে যুলুম আর নির্যাতনের কাহিনী শুনলে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়; প্রাণ ধুকধুক করে ওঠে; দেহ ও মন রহস্যের এক মায়াজালে জড়িয়ে যায়। বুকের স্পন্দন অব্যাহতভাবে বেড়ে যায়। যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনের দরিয়ায় উতাল পাতাল দু একটা ছোট বড় ঢেউ তোড়জোড় করতে থাকে এ কারণে আমরা এদিকে সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত থাকছি।

এক. আল্লাহর ওপর ঈমান

এর সর্বপ্রথম ও প্রধান চালিকাশক্তি ছিল একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ মারেফাত। কারণ মজবুত ও সুদৃঢ় ঈমান যখন হৃদয়ের মাধুরী দিয়ে

---

[২৩৫] তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ১০।

আত্মার মধ্যে লীন করে দেওয়া হয় তখন তা আর টলটলায়মান থাকে না। এটা তখন পাহাড়ের রূপ ধারণ করে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আর যোগ্যতা ব্যয় করে হলেও যাকে আপন জায়গা থেকে চুল পরিমাণ নড়ানো সম্ভব হয় না। আর তখন পাহাড় সমান সুদৃঢ় ঈমান ও মজবুত ইয়াকীনওয়ালার কাছে পৃথিবীর সকল ভোগবাদ আর বিলাস-ব্যসন পরিণত হয় অর্থহীন দৌড়-ঝাঁপে। দুনিয়ার আসবাব আর জাগতিক সকল সহায়-সম্পত্তি চাই তার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন যখন সে তার ঈমানের পাল্লায় রেখে ওযন করে তখন সেগুলি তার নিকট বাঁধভাঙা স্রোতের ওপর ভাসমান শৈবাল কিংবা বেওয়ারিশ খড়-কুটার চেয়ে এতটুকু বেশি মূল্য রাখে না; যেই স্রোতের প্রচণ্ড বহমানতা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অজানা গন্তব্যে। প্লাবিত করে দেশ ও জনপদ; ভেঙে চুরমার করে দেয় বড় বড় অজেয় দুর্গ আর দুর্ভেদ্য কেল্লার সারিতে। সুতরাং, সে ঈমানের মধ্যে যে স্বাদ আর মিষ্টতা খুঁজে পায় তা তাকে এই রঙিন দুনিয়ার যাবতীয় আসবাব থেকে বেনিয়ায করে দেয়। সে ঈমানের মধ্যে তরতাজা জীবন আর যিন্দিগির সে আস্বাদ খুঁজে পায় যা তাকে বাসি দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে তোলে। সে তার মজবুত ইয়াকীনের মধ্যে যে মাধুরী মাখা হাসি আর উল্লাসের মেলা প্রত্যক্ষ করে জগতের কোনো বাজার কিংবা মেলায় সে তা প্রত্যক্ষ করে না। فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। [সূরা রা'দ :১৭]

এটি ছিল সকল চালিকাশক্তির উৎস মূল; এর থেকেই পরবর্তী সময়ে উৎসারিত হয়েছে অনড়তা আর অবিচলতার বিভিন্ন স্রোতধারা। আর সেগুলো ছিল:

দুই. হৃদয়কাড়া নেতৃত্ব

ইসলামী উম্মাহর সর্বোচ্চ নেতা বরং গোটা মানব জাতির সর্বোচ্চ ও সর্বপ্রধান নেতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরিত্র-মাধুর্যের উৎকৃষ্টতা, আত্মার পরিপূর্ণতা, শ্রেষ্ঠতম আখলাক, মহোত্তম গুণাবলি আর সুমহান বৈশিষ্ট্যাবলির এমন বিশাল বড় ভাণ্ডারের মালিক ছিলেন, যা কখনো ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। এ কারণে লাখো কোটি বনী আদমের দিল ও দেমাগ তাঁর প্রতি আশেক ছিল; লাখো কোটি মানবাত্মা তাঁর ইশকের বেদিতে বলি হতে সদা প্রস্তুত ছিল। কামাল আর জামালের সে মহান দুই শোভায় তিনি শোভিত ছিলেন পৃথিবীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত অন্য কোনো মানুষের কপালে তা জুটেনি। শারাফাত ও কারামাত, ফযল ও শ্রেষ্ঠত্বের যে উচ্চাসনে তিনি আসীন ছিলেন তা অন্য কারও জন্য কল্পনা করাও সম্ভব নয়। পবিত্রতা ও শুচি-শুভ্রতা,

সততা ও আমানতদারির মহান অলঙ্কারে তার গোটা সত্তা ছিল সদা অলঙ্কৃত। এক কথায় ভালো আর মহান বলতে যা কিছু বোঝায় এর সকল ক্ষেত্রেই তাঁর ইমাম হওয়ার ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধব আর কাছের মানুষ তো দূরের কথা তাঁর জানের দুশমন আর শত্রুরাও কোনো দিন সন্দেহ পোষণ করেনি। যে কথাই তার মুখ দিয়ে বের হতো তারা নির্বিঘ্নে ও নির্দ্বিধায় তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিত; হৃদয় ও মন দিয়ে গ্রহণ করে নিত।

একদিন কুরাইশের তিন ব্যক্তি লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনছিল। পরে যখন একে অপরের কথা জেনে ফেলে তখন তাদের একজন আবু জাহলকে জিজ্ঞাসা করল মুহাম্মাদের কণ্ঠে যা কিছু শুনেছ এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী? আবু জাহল বলল আমি কী শুনেছি? আসল কথা হলো যুগ যুগ ধরে আমরা আর বনু আবদে মানাফ সম্মান আর ইয্যতের জন্য লড়াই করে আসছি। তারা যখন ভুখাদেরকে খাওয়াত তখন আমরাও খাওয়াতাম। তারা যখন বাহনহীনদেরকে বাহন দান করত তখন আমরাও দান করতাম। তারা যখন মানুষকে বিভিন্ন হাদিয়া তোহফা দিত তখন আমরাও দিতাম। এভাবে সকল ক্ষেত্রে তারা আর আমরা পাশাপাশি চলছিলাম। জীবন যুদ্ধের ময়দানে আমরা প্রতিযোগিতায় ধাবমান দু'টি লাগামহীন অশ্বের মতো দৌড়াচ্ছিলাম। ঠিক তখনই তারা দাবি করে বসল, আমাদের মধ্যে রয়েছেন এমন একজন নবী; আসমান থেকে যার ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। সুতরাং আমরা এখন ভাবনায় পড়ে গেলাম, কী করে তাদের ধরা-ছোঁয়া পাওয়া যায়? আল্লাহর কসম! আমরা কখনোই তাঁর ওপর ঈমান আনব না। তাকে কখনো সত্যায়নও করব না।[২৩৬]

এ কারণে আবু জাহল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলত মুহাম্মাদ! আমরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি না বরং তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ সেগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। [সূরা আনআম:৩৩][২৩৭]

একদিন কাফেররা পরপর তিনবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিন্দা করল। তৃতীয় বার তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি তোমাদের কাছে সর্বনাশ হয়ে এসেছি।

তাঁর এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটি তাদের মনের গভীরে আঘাত হানল। অবস্থা এমন হলো এতদিন তাদের মধ্যে থেকে যে তাঁর সর্বাধিক দুশমন ছিল আজ সে তাঁর

---

[২৩৬] ইবনে হিশাম ১/৩১৬।

[২৩৭] তিরমিযী-সূরা আনআমের তাফসীর ৫/২৪৩, হাদীস নং ৩০৬৪।

সবচেয়ে কাছের মানুষে পরিণত হয়ে গেল এবং তাকে রাযি খুশি করার পেছনে লেগে গেল।

একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে সিজদায় পড়ে গেলেন তখন কাফেররা তাঁর ওপর উটের নাড়ি-ভুঁড়ি চাপিয়ে দিলো। তিনি তাদের জন্য বদ দুআ করলেন। তাদের মুখের হাসি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অসহনীয় পেরেশানি আর অস্থিরতা তাদের ঘাড়ে চেপে বসল। তাদের ইয়াকীন হলো-এবার তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

একবার তিনি উতবা বিন আবু লাহাবের ওপর বদ দুআ করলেন। এরপর থেকেই তার মনে সেই বদ দুআর প্রতিফলনের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল। শেষমেশ বাঘ যখন একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল তখন সে বলল আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ মক্কায় বসেই আমাকে হত্যা করে ফেলল।

উবাই বিন কা'ব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন বরং আমি তোমাকে হত্যা করব ইনশা-আল্লাহ! উহুদের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘাড়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করলেন। আঘাতের পরিমাণ খুব বড় ছিল না। কিন্তু উবাই বলছিল, মুহাম্মাদ আমাকে মক্কায় বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করব। আল্লাহর কসম! যদি সে আমার ওপর থুথুও নিক্ষেপ করে তবে তা আমাকে হত্যা করে ফেলবে[২৩৮]। (বিস্তারিত বিবরণ পরে আসবে ইনশাআল্লাহ)

সাদ বিন মুআয মক্কায় বসে উমাইয়্যা বিন খলফকে বলেছিলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই মুসলমানগণ একদিন তোমাকে হত্যা করবে। তখন সে প্রচণ্ড ভয় পেল। ওয়াদা করল জীবনে কোনো দিন মক্কা থেকে বের হবে না। বদর যুদ্ধের দিন যখন আবু জাহলের চাপাচাপিতে সে আর মক্কায় বসে থাকতে পারল না তখন একটি দামি ও তেজি ঘোড়া কিনল যাতে করে যে কোনো মুহূর্তে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে আসা যায়। তার স্ত্রী তাকে বলল, আবু সফওয়ান! আপনি আপনার মদীনার ভ্রাতার কথা ভুলে গেছেন? সে বলল, কখনোই না। আল্লাহর কসম! আমি এই সামান্য পথই তাদের সঙ্গে যাবো।[২৩৯]

এই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুশমনদের বিশ্বাস ও অবস্থা। এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম ও বন্ধু-বান্ধব আর কাছের মানুষদের অবস্থা। তিনি

---

[২৩৮] ইবনে হিশাম ২/৮৪।

[২৩৯] সহীহ বুখারী ২/৫৬৩।

ছিলেন তাদের প্রাণ ও আত্মা। তাদের হৃদয় আর মনের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের সকল সাধ আর সাধনার লক্ষ্যস্থল। সত্য ও সুনির্মল ভালোবাসার প্রভাবে তারা হরদম তাঁর নিকট ঠিক সেভাবে ছুটে যেত যেভাবে প্রচুর উদ্দামে উথলে ওঠা জলরাশি নিম্ন ভূমির দিকে ছুটে যায়। সত্য সন্ধানী সেই মানুষগুলোর হৃদয় ও মন তার কাছে ঠিক সেভাবে দৌড়ে যেত যেভাবে লোহা চুম্বকের দিকে দৌড়ে যায়। কবির ভাষায়:

فَصُورَتُهُ هَيُولَى كُلِّ جِسْمٍ ... وَمِغْنَاطِيسُ أَفْئِدَةِ الرِّجَالِ

'তাঁর সুরত সকল মানবীয় আত্মার জন্য অস্তিত্ব স্বরূপ ছিল। আর তাঁর অস্তিত্ব সকল হৃদয়ের চুম্বক ছিল'।

পরিশেষে এ নিরেট ভালোবাসা আর সুন্দর প্রাণোৎসর্গের স্পৃহার প্রভাব এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মুসলমানগণ নিজেদের জান কুরবান করে দিতে রাযি ছিলেন কিন্তু এর বিপরীতে তার দেহ মুবারকে একটুখানি নখের আচড় কিংবা কাঁটার খোঁচা লাগাও তাঁদের পছন্দ ছিল না।

একদিন আবু বকর বিন আবু কুহাফা রা. এর ওপর মক্কায় চরম নির্যাতন চালানো হলো। প্রচণ্ডরূপে তাকে মারধর করা হলো। উতবা বিন রবীআ তাঁর কাছে এসে জুতো দিয়ে খুব পিটালো। আর এর জন্য নির্বাচন করল তাঁর চেহারাকে। সে আবু বকরের পেটের ওপর লাফিয়ে উঠে বসল। অবস্থা এমন হলো কোথায় তাঁর নাক আর কোথায় তাঁর চেহারা সব ঠিকানাহীন হয়ে গেল। পরিশেষে বনু তামীম আবু বকরকে একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে বাড়িতে পৌছে দিয়ে গেল। তাঁর অনিবার্য মৃত্যুর ব্যাপারে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দিনের শেষে তাঁর মুখ দিয়ে সর্বপ্রথম যে কথাটি বের হলো তা ছিল 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কী অবস্থা'? উপস্থিত সবাই তাকে গালমন্দ ও তিরস্কার করল। এরপর সবাই তার মা উম্মুল খায়েরকে লক্ষ্য করে বলল, সে চরম ক্ষুধার্ত; তাকে কিছু পানাহার করিয়ে নাও। যখন সবাই চলে গেল তখন তাঁর মা তাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মাকে বলতে লাগলেন 'আল্লাহর রাসূলের অবস্থা কী'? তাঁর মা বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার সাথীর ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তিনি বললেন, আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের কাছে গিয়ে আল্লাহর রাসূলের কথা জিজ্ঞাসা করুন। তাঁর মা ঘর থেকে বের হয়ে সোজা উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের কাছে চলে এলেন এবং তাকে বললেন, আবু বকর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করেছে। তিনি বললেন আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ কিংবা আবু বকর এদের কাউকেই চিনি না। তবে আপনি যদি রাযি

থাকেন তবে আমি আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের কাছে যেতে চাই। তিনি বললেন চলো! তারা উভয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। উম্মে জামীল আবু বকরকে প্রচণ্ড আহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর কসম! যারা তাঁর এ অবস্থা করেছে তারা নিঃসন্দেহে ফাসেক ও যালিম। আমি চাই আল্লাহ তাদের থেকে তোমার এ প্রতিশোধ নিবেন। আবু বকর রা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহর রাসূলের কী অবস্থা? উম্মে জামীল বললেন, তোমার মা তো সবকিছু শুনে ফেলবেন। আবু বকর রা. বললেন, আপনি ডানে বামে না তাকিয়ে বলুন। সকল দায় দায়িত্ব আমার কাঁধে। উম্মে জামীল বললেন তিনি সুস্থ ও সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। আবু বকর রা. বললেন, তিনি এই মুহূর্তে কোথায় আছেন? উম্মে জামীল বললেন দারুল আরকামে। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কোনো খাবার কিংবা পানি ছুঁয়েও দেখব না। তারা কিছু প্রহর অপেক্ষা করলেন। এরপরে যখন চারদিক অন্ধকার হয়ে এলো। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা কমে গেল। সকল মানুষ যে যার ঘরে চলে গেল তারা দু'জনে তাকে নিয়ে বের হলেন। তিনি তাদের দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে দারুল আরকামে দরগাহে রিসালতে উপস্থিত হলেন।[২৪০]

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রেম আর বিসর্জনের এমন বহু আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করব। বিশেষ করে উহুদের রণাঙ্গনে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে নবী প্রেমে আত্মবিসর্জনের যে দৃশ্য বড় প্রকট হয়ে ওঠে গোটা পৃথিবীর অন্য কোথাও সাচ্চা নবী প্রেমের এমন নজির খুব একটা পাওয়া যায় না। হযরত খুবাইব রা. প্রমুখ কুরবানী আর ত্যাগের যে বিশাল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীর সামগ্রিক ইতিহাসেও তা বড়ই দুর্লভ।

তিন. দায়িত্ববোধ

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাযিআল্লাহু আনহুমদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা তাদের ঐ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতেন যে বিশাল দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের প্রভু কর্তৃক মানুষের কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ এমন এক দায়িত্ব ও কর্তব্য যেখানে ফাঁক-ফোঁকর তালাশ করার একটুকুও সুযোগ নেই। আর এ কারণেই এ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যতটা আপদ বিপদের সম্মুখীন হতে হয় একে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার মাধ্যমে আরও বেশি জ্বালা ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এর ফলাফল হয় তখন আরও খারাপ। একইভাবে এই গুরুদায়িত্ব থেকে ভেগে যাওয়ার পরে তাদেরকে তথা গোটা বিশ্ব মানবতাকে ক্ষয়-ক্ষতি আর অধঃপতনের যে ঝাড় পেয়ে বসে সে ঝড়ের তাণ্ডবকে

---

[২৪০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩০।

এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে কষ্ট আর তাকলীফের মুখামুখি হতে হয় তার সঙ্গে এক পাল্লায় ওযন করা যাবে না।

চার. আখেরাতের ওপর ঈমান

আখেরাতের ওপর ঈমান ও বিশ্বাস তাদের এই দায়িত্ববোধকে আরও মযবুত ও শক্তিশালী করে তুলত। এ কারণে তাদের প্রত্যেকেই নিজের মনের মণিকোঠায় এই দৃঢ় ইয়াকীন ও বিশ্বাস লালন করতেন যে, তাকে একদিন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। সে দিন তাকে তার মালিকের নিকট ছোট-বড়, হালকা-ভারী সবধরনের গোনাহের হিসাব দিতে হবে। সুতরাং, এরপর হয়তো তাকে যেতে হবে চিরস্থায়ী শান্তি আর সুখের দিকে; নয়তো তাকে যেতে হবে জাহান্নামের অনিঃশেষ আযাব আর শাস্তির দিকে। এ কারণে ভয় আর আশার মধ্য দিয়েই তাদের দিন গুযরান হতো। একদিকে তারা তাদের মালিকের রহমতের আশা করত অপরদিকে তাঁর আযাবের ভয় পেত। কুরআনে কারীমের ভাষায় তারা ছিল, وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ ﴿٦٠﴾ (এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে) [সূরা মুমিনুন:৬০] তারা জানত, এই দুনিয়া তার সকল আসবাব আর বিলাস-ব্যসন নিয়েও আখেরাতের পাশে মশার একটি ডানা পরিমাণও মূল্য রাখে না। এভাবে যখন দুনিয়ার হাকীকত তাদের চোখের সামনে পুরোপুরি খুলে গিয়েছিল তখন এর কষ্ট ও মসিবত, আপদ ও বিপদ সবকিছু বরদাশত করা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে কোনো দিন তারা এর প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সময়টুকুটও পেতেন না।

পাঁচ. কুরআনুল কারীম

এ সকল কঠিন সংকটময় আর চরম প্রতিকূল মুহূর্তে দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত এক নাগাড়ে নাযিল হয়ে যাচ্ছিল পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত; বস্তুত প্রাণস্পন্দন জাগানিয়া এ সকল সূরা আর আয়াত ইসলামের মূলনীতির-যাকে কেন্দ্রবিন্দু করে ইসলামের দাওয়াত আবর্তিত হয়-সত্যতার দলীল হওয়ার ভূমিকা পালন করত। মুসলমানদেরকে সর্বশক্তিমান ও মহা ক্ষমতাধর আল্লাহর শক্তির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত; যার ওপর ভিত্তি করে নতুন যুগের এই নতুন পৃথিবীতে একটি নতুন সমাজ-আর সেটা হবে মূলত স্বপ্নের সেই ইসলামী সমাজ। এটি মুসলমানদের অনুভব আর অনুভূতিতে সবর আর ধৈর্যের জোয়ার সৃষ্টি করত। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উদাহরণ আর দৃষ্টান্ত পেশ করত। তাদের সামনে সবকিছু পুরোপুরি স্পষ্ট করে তুলে ধরত ঠিক এভাবে: أَمْ

حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনি ভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহ্‌র সাহায্যে একান্তই নিকটবর্তী [সূরা বাক্বারাহ : ২১৪]

আরও ইরশাদ হচ্ছিল, الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা ঈমান আনলাম এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নিবেন মিথ্যুকদেরকে। [সূরা আনকাবূত:১-৩]

পাশাপাশি এগুলো কাফের ও বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের সিদ্ধান্তকর ও নিষ্পত্তিমূলক জবাব দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের ঘাড় ধরে চোখে আঙ্গুল দিয়ে একটি একটি করে সবকিছু ধরিয়ে দিচ্ছিল যাতে করে এ ক্ষেত্রে তাদের কোনো হীলা-বাহানা বাকি না থাকে। এরপর এগুলি একেবার স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দিত, যদি তারা তাদের একঘেয়েমির ওপর অটল ও অবিচল থাকে তবে অতি শীঘ্রই তা তাদের জন্য খারাপ পরিণতি বয়ে নিয়ে আসবে। এ জন্য এগুলি তাদেরকে পৃথিবীর প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস মনে করিয়ে দিত। যাতে দোস্ত ও দুশমনের ব্যাপারে আল্লাহর চিরাচরিত গৃহীত নীতি সম্পর্কে মালুমাত হাসিল হয়ে যায়। আরেক বার এগুলি তাদের গায়ে সান্ত্বনার পরশ বুলিয়ে দিত। তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করত। যেই স্পষ্ট ভ্রান্তি আর গোমরাহীর কসাইখানায় পড়ে দিবানিশি তারা মৃত্যু-ভীতিতে হাউমাউ করে যাচ্ছে সেখান থেকে তাদের চির মুক্তির আলোর ভোরের স্বপ্ন দেখাত।

এই ছিল কাফের ও মুশরিকদের দিক। মুসলমানদের দিক ছিল এ ক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন। কুরআন মুসলমানদেরকে এই নশ্বর জগত ছেড়ে ভিন্ন এক নতুন জগতের দিকে নিয়ে যেত। সেখানে সৃষ্টির পরতে পরতে রেখে দেওয়া অপার নির্মাণ কুশলতা, তাঁর রবের সৌন্দর্য ও তাঁর ইলাহের পূর্ণাঙ্গতা, দয়া ও অনুগ্রহের

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বোপরি সন্তুষ্টি আর রেযওয়ানের এমন এক বর্ণাঢ্য চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরত যা তাদের হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলত; তাদের দেহমনকে মোহাবিষ্ট করে তুলত; সে দিকে তাদেরকে এমনভাবে দৌড়ে যাওয়ার আবাহনী দিত পৃথিবীর কোনো শক্তিরই যা থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল না।

আর এ সকল আয়াতের আঁচলের মধ্যে মুখলিস মুসলমানদের জন্য শান্তি ও সুখের এই পয়গাম ছিল যে, মৃত্যুর পরে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত ও জান্নাতের শাশ্বত নেয়ামতের কথা। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি [সূরা তাওবাহ : ২২] পাশাপাশি এগুলোতে তাদের শত্রু জালেম কাফেরদের চিত্রও অঙ্কিত হয়েছিল। সেখানে তাদেরকে দেখানো হয়েছিল যে, মৃত্যুর পরে একদিন তাদেরকে তাদের রবের নিকট হাজির করা হবে। এরপর তাদেরকে তাদের পার্থিব জীবনের কুকর্মের দরুন শক্তহাতে পাকড়াও করা হবে। এরপর 'তাদেরকে মুখের উপর টেনে-হিঁচড়ে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবেঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর'। [সূরা ক্বামার : ৪৮]

সফলতার সুসংবাদ

এ সবকিছুর পাশাপাশি ইসলামে নব দীক্ষিত মুসলমানরা যেদিন সর্বপ্রথম ঈমানের কন্টকাকীর্ণ ও শ্বাপদসংকুল পথ মাড়াতে শুরু করেছিল সে দিন থেকেই তারা একটি কথা খুব ভালোভাবেই মনে রেখে ছিল যে, ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়া মানেই নিজেদের ওপর যুলুম ও অত্যাচারের অন্ধকার রাত টেনে আনা নয়; বরং ইসলাম যে দিন পৃথিবীর আলো বাতাসে সর্বপ্রথম চোখ মেলে চেয়েছিল সে দিন থেকেই এর একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব সভ্যতায় জাহেলিয়াতের মঞ্চে সমাপ্তির পর্দা টেনে দেওয়া; এর অন্যায় ও অনাচারমূলক সমাজ ব্যবস্থাকে কাফনের কাপড় পরিয়ে চিরদিনের জন্য মাটির নীচে দাফন করে দেওয়া। তখন এর স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়াবে যে, গোটা পৃথিবীতে এক লা শরীক ইলাহের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। গোটা বিশ্বের রাষ্ট্র আর শাসননীতির বাগডোর তাঁর হাতে চলে আসবে। আর তখন গোটা মানব জাতি আর মানব সভ্যতা বিশ্ব মালিক আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে না খেয়ে দৌড়তে থাকবে। মানুষ মানুষের গোলামির অভিশপ্ত 'শৃঙ্খল' থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর গোলামির 'শৃঙ্খলা'র মধ্যে ঢুকবে।

এভাবে কুরআনে কারীম থেকে থেকে বিভিন্ন সুসংবাদের বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে থাকে। কখনো সে সরাসরি এগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরত আবার কখনো দূর থেকে ইশারা-ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিত। সুতরাং, ঐ চরম কঠিন আর সংকটঘেরা মুহূর্তগুলি-যা মুসলমানদের জন্য বিস্তীর্ণ দুনিয়ার প্রশস্ত প্রান্তরকে একেবারে সংকীর্ণ করে ফেলেছিল; যা তাদের গলা টিপে ধরে হত্যা করে ফেলতে এবং সুযোগে যে কোনো সময় তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরের জন্য সমূলে মুছে ফেলতে উদ্যত ছিল-সেই মুহূর্তগুলিতে কুরআনে কারীমের ঐ সকল আয়াত নাযিল হতো, যাতে পূর্ব যুগের আম্বিয়ায়ে কেরাম আর তাদের উম্মতের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির বিশ্লেষণ থাকত; যাতে ঐ সকল ঘটনার পরিপূর্ণ বিবরণ থাকত, যা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী উম্মতের ইতরমার্কা মানুষগুলি ঘটিয়েছিল। এ আয়াতগুলোতে ঐ সকল অবস্থার বিস্তৃত আলোচনা বিদ্যমান ছিল, যা তৎকালীন মক্কার মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে চলমান অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যেত। এরপর কুরআনে কারীম আরও সামনে অগ্রসর হলো। সে সকল অবস্থার পরিণামে কীভাবে কাফের ও যালিমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং কীভাবে আল্লাহ-পাগল একনিষ্ঠ তাঁর প্রেমিক হৃদয়গুলো গোটা পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করেছিল সেগুলি সে খোলাখুলি আলোচনা করত। এভাবে এ সকল ঘটনা বর্ণনা করার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকতো যে, আগের যুগের কাফের মুশরিকদের মতো ভবিষ্যতে মক্কাবাসীদের পরাজয়ও অনিবার্য; তাদের বাজার বসে যাওয়াও সুনিশ্চিত; আর এর বিপরীতে ইসলামের দাওয়াত আর মুসলমানদের ভবিষ্যত আকাশ উজ্জ্বল ও দীপ্তিময়। বিজয় আর সফলতর আলোকমালায় সদা আলোকিত।

এ সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই মুসলমানদের বিজয়ের স্পষ্ট সুসংবাদ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল কুরআনে কারীমের অগণিত অসংখ্য আয়াত। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ (١٧٢) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ (١٧٥) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ (١٧٧) আমার প্রেরিত বান্দাগণের ব্যাপারে আমার এই বাক্য সত্য হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর আমার বাহিনীই হয় বিজয়ী। অতএব আপনি কিছুকালের জন্যে তাদেরকে উপেক্ষা করুন। এবং তাদেরকে দেখতে থাকুন। শীঘ্রই তারাও এর পরিণাম দেখে নিবে। আমার আযাব কি তারা দ্রুত কামনা করে? অতঃপর যখন তাদের আঙিনায়

আযাব নাযিল হবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। [সূরা সাফ্‌ফাত:১৭১-১৭৭]

তিনি আরও ইরশাদ করেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। [সূরা ক্বামার:৪৫]।

তিনি আরও বলেন, جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ সেখানে বহু বাহিনীর মধ্যে যে কোনো বাহিনী পরাজিত হবে। [সূরা সোয়াদ : ১১]

যে সকল মুসলমান হাবশায় হিজরত করে চলে গিয়েছিলেন তাদের শানে অবতীর্ণ হলো وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহর জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দিব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্ব বৃহৎ; হায়! যদি তারা জানত। [সূরা নাহল:৪১]

তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইউসুফ আ. এর ঘটনা জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা সেই ঘটনার আঁচলে জড়িয়ে এ কথাও বলে দিলেন, لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সূরা ইউসুফ:৭] এর মধ্য দিয়ে বুঝানো হয়েছে, এ ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্নকারী মক্কাবাসীরাও ইউসুফ আ. এর ভাইদের মতো অচিরেই ব্যর্থ ও অসফল প্রমাণিত হবে। তাদের সকল কৌশল পণ্ডশ্রমে প্ররিণত হবে। ইউসুফ ভ্রাতাগণ যেভাবে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিয়েছিল এবার তাদের মাথা নত করে দেওয়ার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।

রাসূলদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (١٣) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤) কাফেররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল: আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দিব। তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। [সূরা ইবরাহীম : ১৩-১৪]

তৎকালীন দুই পরাশক্তি রোম আর পারস্যের মাঝে যখনই যুদ্ধের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। তখন কাফেররা চলে যেত পারস্যের পক্ষে; কারণ তারাও ছিল তাদের মতো মুশরিক। অপরদিকে মুসলমানরা চলে যেত রোমানদের পক্ষে; কারণ তাদের মতো তারাও আল্লাহতে ঈমান এনেছিল; তার প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরাম, ওহী, কিতাব আর কেয়ামত দিবসে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বরাবরই রোমের বিপক্ষে পারস্যের পাল্লা ভারী ছিল। তারা তাদের ওপর ধারাবাহিক বিজয় অর্জন করে যাচ্ছিল। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই রোমানরা ইরানিদের ওপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু তিনি শুধু এই একটি সুসংবাদের ওপরই ক্ষান্তি দিলেন না; এর পাশাপাশি আরও একটি বিজয়ের সুসংবাদ ঘোষণা দিলেন আর এটা ছিল কাফেরদের বিরুদ্ধে মুমিন মুসলমানদের বিজয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে.. .. [সূরা রূম:৪-৫]

সময়ে সময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মুমিনদেরকে এ ধরনের সুসংবাদ শুনাতেন। এ কারণে যখন হজ্জের মৌসুম চলে আসত; যখন আরবে উকায, যুল মাজায আর মাজান্না মেলা বসত তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শুধু জান্নাতের সুসংবাদই দিতেন না; বরং সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাদেরকে বলতেন, হে **লোকসকল! তোমরা বলো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তবে তোমরা সফলকাম হতে পারবে। তোমরা তার মাধ্যমে গোটা আরবের মালিক বনে যাবে। আজমের তামাম কবীলা তোমাদের পদচুম্বন করবে। অতঃপর যখন তোমরা মারা যাবে তখন জান্নাতেও রাজার আসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করবে।** [২৪১]

আমরা আগেই বলে এসেছি, যখন উতবা বিন রবীআ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জাগতিক লালসার ফাঁদে জড়িয়ে ফেলার জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তখন তিনি তাকে কী জবাব দিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলে এসেছি, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জবাব শুনে উতবার মনে কী পরিমাণে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, পরিশেষে বিজয় তাঁরই পদচুম্বন করবে।

একইভাবে কুরাইশের সর্বশেষ প্রতিনিধিদল যখন কিছু প্রস্তাব নিয়ে আবু তালিবের নিকট এসেছিল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কী জবাব দিয়েছিলেন তাও আমরা বলে এসেছি। তিনি তাদেরকে

---

[২৪১] ইবনে সা'দ ১/২১৬।

স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলেন যে, কেবল একটি কথাই তিনি তাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। এটা এমন একটি কথা, যা বললে গোটা আরব তাদের পদচুম্বন করবে; তারা আজমেরও মালিক হয়ে যাবে।

খাব্বাব বিন আরত রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে হাযির হলাম। তিনি তখন কাবার ছায়ায় চাদর দ্বারা বালিশ বানিয়ে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এদিকে আমরা প্রতিনিয়ত মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন যুলুম ও নির্যাতন সয়ে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আপনি কেন আল্লাহর কাছে দুআ করছেন না? তিনি তখন উঠে বসলেন। গোসসা আর ক্রোধে তার চেহারা পাকা ডালিমের মতো লালবর্ণ ধারণ করেছিল। তিনি বললেন, **'এ যুগে ঈমানের জন্য তো কিছুই করতে হয় না। অথচ, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের যারা মুসলমান ছিলেন লোহার চিরুনি দিয়ে হাড় থেকে তাদের গোশত আঁচড়ে আলাদা করা হতো। তবুও তারা তাদের ঈমান থেকে এক চুল পরিমাণও হেলে যেতেন না। আল্লাহ তাআলা এ দীনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করবেন। একটি সময় এমন আসবে যখন একজন পথচারী সানা থেকে হাযরামউতে সফর করবে কিন্তু এ দীর্ঘ পথে সে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পাবে না'**। বর্ণনাকারী আরেকটু বাড়িয়ে বলেছেন, **'তবে বকরির ওপর বাঘের ভয় রয়ে যাবে'**। [২৪২]আরেক বর্ণনায় রয়েছে, **'কিন্তু তোমরা খুবই ত্বড়িৎপ্রিয়'**।[২৪৩]

কিন্তু এ সকল সুসংবাদ গোপন কিংবা লুকনো ছিল না; বরং এগুলো খোলাখুলি, স্পষ্ট ও সকলের জানাশোনা। যেমন মুসলমানরা এ সম্পর্কে জানতেন তেমনিভাবে কাফেররাও জানত। এমনকি যখন আসওয়াদ বিন মুত্তালিব ও তার সাথী-সঙ্গীরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখত তখন তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত এবং বলত, 'ঐ দেখো! দুনিয়ার বড় বড় ভাবী রাজা-বাদশারা যাচ্ছেন; নিকট ভবিষ্যতে উনারা কিসরা ও কায়সারের উত্তরাধিকারী বনবেন'। এরপর তারা শিষ বাজাত ও হাততালি দিত।[২৪৪]

এভাবে যখন একদিকে দুনিয়ার যিন্দিগিতে এক সুন্দর ও সুনির্মল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছিল, অপরদিকে আখেরাতের যিন্দিগিতে জান্নাত লাভের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আশা সতত তাদের হৃদয়ে বিরাজমান ছিল। তখন স্বাভাবিকভাবেই সাহাবায়ে কেরাম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, দশদিক থেকে অব্যাহতভাবে ধেয়ে আসা আপদ-বিপদের যে ঝড়ের তাণ্ডব দেখা যাচ্ছে, যুলুম আর নির্যাতনের যে অন্ধকার চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ধরেছে

---

[২৪২] সহীহ বুখারী ১/৫৪৩।

[২৪৩] প্রাগুক্ত ১/৫১০।

[২৪৪] আস সীরাতুল হালবিয়্যা ১/৫১১, ৫১২।

প্রকৃতপক্ষে তা গ্রীষ্মের এক টুকরো মেঘ; সামান্য সময় পরেই যা দূরের দিগন্ত রেখায় মিলিয়ে যাবে।

এর পাশাপাশি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈমানের সুমিষ্ট শরাব পিইয়ে তাদের হৃদয় ও মন মাতাল করে রাখতেন। কুরআন ও হিকমত শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের অন্তরাত্মাকে বিশুদ্ধ করতেন। তাদেরকে সূক্ষ্ম ও সুগভীর তরবিয়াত দান করতেন। তাদেরকে রূহের উন্নতি, কলবের বিশুদ্ধি আর চরিত্রের পরিশুদ্ধির প্রতি ডাক দিতেন। তাদেরকে বলে দিতেন বস্তুবাদের কর্তৃত্বের দুনিয়া থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত ও স্বাধীন রাখতে। শক্ত হাতে কুপ্রবৃত্তির টুঁটি চেপে ধরতে। আকাশ আর মাটির রবের দিকে দৌড়ে যেতে। তিনি তাদের অন্তরে ঈমানের দীপ শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। দিনে দিনে তা গোটা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে রৌশন করেছিল। তাদেরকে অন্ধকারের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে সুনির্মল আলোর ভোরের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করতে বলতেন। তাদের ভেতরে মানুষের প্রতি ক্ষমা আর অনুগ্রহের মেযাজ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এভাবে দীন ও ধর্মের মধ্যে তাদের গভীরতা ও মযবুতি বেড়ে গিয়েছিল। প্রবৃত্তির চাহিদা আর কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকা তাদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রেযামন্দি ও সন্তুষ্টির পথে কুরবানীর দৃঢ় চেতনা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জান্নাতের প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। ইলম ও বিজ্ঞানের প্রতি তাদের মনে এক নেশা সৃষ্টি হয়েছিল। দীন ও ধর্মের জ্ঞান-বিজ্ঞানে তারা বিদগ্ধ ও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। নিজের মন ও আত্মার হিসাব নেওয়া তাদের ফিতরাত ও স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অনুভব ও অনুভূতির পরাজিত স্তূপের ওপর তারা জয়ের নিশান উড়িয়ে দিয়েছিল। সব ধরনের ঝড় ও ঝঞ্ঝা হাতে ঠেলে তার বাঁক ঘুরিয়ে দেওয়ার ওপর সক্ষমতা অর্জন করেছিল। সর্বোপরি নিজের মান ও ইয্যত, সবর ও ইফ্ফত নিয়ে তারা নতুন করে বাঁচতে শিখেছিলেন।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের তৃতীয় পর্ব

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াতের বিস্তৃতি

তায়েফের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নবুওতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে (মোতাবেক ঈসায়ী ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের মে'র শেষ কিংবা জুনের শুরুলগ্নে) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে তায়েফের দূরত্ব প্রায় ষাট মাইল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ে হেঁটেই সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসা রা.। তায়েফের পথে তারা যতগুলো কওমের পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকলেন কিন্তু একজনও সাড়া দিলো না।

তায়েফে পৌঁছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম বনু সাকীফের নেতৃস্থানীয় তিন ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা হলো আমর বিন উমাইর সাকাফীর তিন ছেলে আবদে ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। তিনি তাদের কাছে গিয়ে ইসলামের কথা তুলে ধরলেন এবং তাদেরকে ঈমানের পথে আহ্বান করলেন। তাদের কাছ থেকে ইসলামের পক্ষে নুসরত ও সাহায্য সহযোগিতা চাইলেন। তাদের এক জন বলল, যদি আল্লাহ তোমাকে নবী বানান তবে সে কাবার গিলাফ ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। দ্বিতীয় জন বলল, আল্লাহ কি নবী বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাননি? তৃতীয় ও সর্বশেষ জন বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চাই না। কারণ যদি তুমি নবী হয়ে থাকো তবে তোমার কথা অমান্য করা জীবনের জন্য বড় ভয় আর খতরার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি তুমি নবী না হয়ে ভণ্ড হয়ে থাকো তবে তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার মর্যাদার জন্য শোভনীয় নয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, ঠিক আছে; তোমাদের যা মন চায় তাই করো। কিন্তু আমার ব্যাপারটি নিজেদের কাছেই গোপন রাখো।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফবাসীদের মধ্যে দশ দিন অবস্থান করলেন। এ দিনগুলিতে তিনি তাদের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে তাদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করলেন। কিন্তু তারা বলল, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এর ওপরই তারা ক্ষান্তি দিলো না। শহরের ইতর সব ছেলে-পেলেকে তার পেছনে কুকুরের মতো লেলিয়ে দিলো।

তিনি যখন শহর থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সেই ইতর ছেলে-পেলে আর গোলামগুলি তাঁর পিছু নিয়ে তাকে বিভিন্ন অশ্লীল গালমন্দ আর চেঁচামেচি করতে লাগল। তাদের আওয়ায পেয়ে সবাই সমবেত হলো। এরপর তারা দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর পাথর মারতে শুরু করল। সেই সঙ্গে শুরু হলো কটু-ভাষা-বর্ষণ। কটু ভাষায় তাঁর হৃদয় না ভাঙলেও কঠিন পাথরের কঠোর আঘাতে মানবীয় পা মুবারক ঠিকই ফেটে গেল। পায়ে পরিহিত জুতোদুটি তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠল। যায়েদ বিন হারিসা রা. তাকে পাথর বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার সকল পন্থা ও প্রচেষ্টা ব্যয় করে যাচ্ছিলেন আর এতে করে তাঁর মাথায়ও গভীর যখমের সৃষ্টি হলো। এভাবে পাথর বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াতে দৌড়াতে তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে রবীআর দুই ছেলে উতবা ও শাইবার আঙ্গুর বাগানের দেয়ালের নীচে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তখন তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে হতভাগাগুলি ফিরে গেল। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। যখন সেখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন ঠিক তখনই তার মুখ থেকে বাক হয়ে অসাধারণ শব্দমালার গাঁথুনিতে বেরিয়ে এলো সীরাতে নববীর প্রসিদ্ধ সেই দুআখানি; যে দুআখানিতে নবীজীর যে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল; তাঁর হৃদয় আর মন যে হতাশা আর দুঃখের নীল দরিয়ায় ডুবে গিয়ে হা হুতাশ করছিল সে দৃশ্য বড়ই মূর্তিমান হয়ে ওঠে। স্পষ্টভাবে দেখা যায় যখন তাদের একজন লোকও তাঁর ওপর ঈমান আনল না তখন তিনি হৃদয়ে কত বড় ব্যথা আর চোট পেয়েছিলেন। তিনি দুআ করছিলেন:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّيْ. إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يتجهمني؟ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِيْ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَى غَضَبٍ فَلَا أُبَالِيْ وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ أَوْسَعُ لِيْ. أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ. لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার শক্তির দুর্বলতা, পাথেয়ের স্বল্পতা আর মানুষের চোখে আমার সম্মানহীনতার অভিযোগ পেশ করছি। হে সর্বোচ্চ দাতা-দয়ালু! তুমি দুর্বল ও কমযোরদের প্রতিপালক। তুমি আমারও রব ও

প্রতিপালক। সুতরাং তুমি কার হাতে আমাকে তুলে দিয়েছ? তুমি কি কোনো অপরিচিতের হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়েছ যে আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে? না কি কোনো দুশমনের হাতে অর্পণ করেছ যাকে আমার মালিক বানিয়ে দিয়েছ? যদি আমার ওপর তোমার কোনো ক্রোধ না থাকে তবে আমি এ সবের কোনো পরোয়া করি না। কিন্তু তোমার ক্ষমাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রশস্ততা। আমার ওপর তোমার ক্রোধ অবতীর্ণ হবে কিংবা গোস্বার অসন্তোষের অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হবে তা থেকে আমি তোমার চেহারার ঐ নূরের আশ্রয় চাচ্ছি যার দ্বারা সকল অন্ধকার আলোকিত হয়ে গেছে। যার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজের সমাধান হয়েছে। তোমার সন্তোষই আমার হৃদয়ের একান্ত তামান্না; যাতে করে তুমি আমার ওপর রাযি-খুশি হয়ে যাও। তুমি ব্যতীত আর কোনো শক্তি কিংবা ক্ষমতা নেই'।

যখন উতবা ও শাইবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখল তখন তাদের মনের দরিয়ায় অনুগ্রহ আর অনুকম্পার তুফান উঠল। তারা তাদের গোলামকে ডেকে বলল, এক ছড়া আঙ্গুর নিয়ে ঐ লোকটিকে দাও। সুতরাং, সে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আঙুর নিয়ে হাযির হলো তখন তিনি বিসমিল্লাহ বলে সেদিকে হাত প্রসারিত করলেন এরপর খেলেন। সে ছিল একজন খ্রিস্টান গোলাম। তার নাম ছিল আদ্দাস।

আদ্দাস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে বিসমিল্লাহ শুনে বলতে লাগল, এই একই ধরনের শব্দ এখানকার অধিবাসীরাও বলে থাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কোন্ দেশের অধিবাসী? তোমার ধর্ম কী? সে বলল আমি খ্রিস্টান। নিনাওয়া হলো আমার জন্মভূমি। এবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তো দেখছি সৎকর্মশীল ইউনুস বিন মাত্তার দেশের মানুষ। লোকটি অবাক হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করল আপনি ইউনুস বিন মাত্তাকে কীভাবে চেনেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি আমার ভাই; তিনি একজন নবী ছিলেন আর আমিও একজন নবী। আদ্দাস তখন আবেগাপ্লুত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথা ও হাত-পা মুবারকে চুমু খেতে লাগল।

উতবা ও শাইবা একে অপরকে বলল, সে তো আমাদের গোলামের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। এরপরে আদ্দাস যখন তাদের নিকট এলো তখন তারা তাকে বলল, কী ব্যাপার! লোকটি কে? সে বলল, মনিব! এ ব্যক্তির চেয়ে গোটা পৃথিবীতে উত্তম আর কিছু নেই। এইমাত্র তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলেছেন যা গোটা পৃথিবীর কুল মাখলুকাতের মধ্যে কেবল আম্বিয়ায়ে

কেরামই জানেন। তারা বলল, সর্বনাশ হোক তোর! কখনো সে যেন তোকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। কারণ তোর ধর্ম তাঁর ধর্মের চেয়ে শতগুণে ভালো। [২৪৫]

দেয়ালের নীচ থেকে বের হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পথ ধরলেন। তাঁর হৃদয়াকাশ তখন হতাশার কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। হাজারো স্বপ্ন আর সাধের সূর্যটা অস্তপাটে বিদায়ের হাতছানি দিচ্ছে। আশার প্রদীপগুলো একে একে সব নিভে গেছে। তাঁর হৃদয়টা ভেঙে চৈত্রের দুপুরের মাটির মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আশার বীণার তন্ত্রীগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে। এভাবে তিনি যখন করনুল মানাযিল নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন জিবরাঈল আ. পাহাড়ের ফেরেশতাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সামনে আভির্ভূত হলেন। এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন! গোটা মক্কাবাসীকে আবু কুবাইস ও কুআইকিয়ান পাহাড়ের মাঝে ফেলে এক চাপ দিয়ে শেষ করে দিই।

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে উরওয়া বিন যুবাইর এর সূত্রে রেওয়ায়েত করেন, আয়েশা রা. তাকে বলেছেন যে, তিনি একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন, উহুদ যুদ্ধের দিনের চেয়েও কোনো কঠিন দিন কি জীবনে কখনো আপনার ওপর দিয়ে গেছে? তিনি জবাবে বললেন, **তোমার কওমের কাছ থেকে আমি যা পাওয়ার তা তো পেয়েছিই। কিন্তু তার চেয়েও আমার জীবনের কঠিন অভিজ্ঞতা হাসিল হয়েছে আকাবার দিন। যে দিন আমি আবদে কুলালের ছেলে আবদে ইয়ালীলের কাছে নিজেকে পেশ করেছিলাম। কিন্তু সে আমার ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি চিন্তা ও পেরেশানির চোটে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। অনন্তর দীর্ঘ সময় পরে করনুল মানাযিলে আমি আমার নিজেকে আবিষ্কার করলাম। আমি মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম একখণ্ড মেঘ তার স্নেহের আঁচলে জড়িয়ে ধরে আমাকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম জিবরাঈল আ. দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে কী জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা সবকিছু শুনেছেন। এ কারণে আল্লাহ পাক আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনি যা মন চায় তাই করতে পারেন। পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিলেন। এরপরে বললেন, মুহাম্মাদ! আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই নির্দেশ দিন। আপনি যদি চান তবে আমি তাদেরকে আবু কুবাইস ও কুআইকিয়ানকে একসঙ্গে চাপা দিয়ে শেষ করে দিবো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, না। তাদেরকে মারবেন না।**

---

[২৪৫] ইবনে হিশাম ১/৪১৯-৪২১।

আমার একান্ত আশা; হয়তো আল্লাহ পাক তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন অগণিত অসংখ্য মানুষ পাঠাবেন যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে। যারা তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না।[২৪৬]

পাহাড়ের ফেরেশতার প্রশ্নের জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উত্তর শুনলেই বোঝা যায় কতটা বিশাল ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন নবীজী আমার! তাঁর আখলাক-চরিত্র ছিল কতটা মহান! এমন এক গভীর দরিয়া যার কূল-কিনারা ও গভীরতা দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুঁশ ফিরে এলো। সাত আকাশের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য যে গায়েবী সাহায্য পাঠালেন তাঁর হৃদয় কিছুটা শান্ত হলো। তৃষ্ণার্ত হৃদয় শীতল পানি পিয়ে কিছুটা তৃপ্তি অনুভব করল। এরপর তিনি মক্কার পথ ধরে নাখলা উপত্যকায় গিয়ে পৌছলেন। সেখানে তিনি কয়েক দিন অবস্থান করলেন। কারণ গাছপালা ও পানির সুবিধার্থে সেখানে থাকার মতো দুটি স্থান বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো সাইলুল কাবীর ও যায়মা। কিন্তু সে দুটি স্থানের কোনটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবস্থান করেছিলেন আমরা কোনোভাবেই তার কোনো হদিস পাইনি।

এই নাখলা উপত্যকায় অবস্থান কালেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিন জাতির একটি দল উপস্থিত হয়েছিল।[২৪৭] কুরআনে কারীমের দুই জায়গায় এর বর্ণনা পাওয়া যায়। এক. সূরা আহক্বাফে আল্লাহ ইরশাদ করেন, وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল, তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের

---

[২৪৬] সহীহ বুখারী: সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, হাদীস নং ৩২৩১, ৭৩৮৯। ফাতহুল বারী ৬/৩৬০, মুসলিম ২/১০৯।

[২৪৭] সহীহ বুখারী: নামায পর্ব: ফজরের নামাযে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া অধ্যায়, ১/১৯৫।

সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মূসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহবানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গোনাহ মার্জনা করবেন। [সূরা আহক্বাফ:২৯-৩১]

সূরা জিনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢) বলুন: আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে: আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না। [সূরা জিন:১-২]

এ সকল আয়াতের সামনে-পেছনে পাঠ করলে এবং পাশাপাশি এর তাফসীরে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা অধ্যয়ন করলে যে ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে তা হলো জিনরা যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল এবং কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনছিল তখনো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। পরবর্তী সময় যখন আল্লাহ পাক এ সকল আয়াতের মাধ্যমে তাকে বিষয়টি অবগত করলেন কেবল তখনই তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পারলেন। আর এটা ছিল তাদের সর্বপ্রথম উপস্থিতি । বিভিন্ন বর্ণনার ওপর বিশ্লেষণ চালালে বোঝা যায় এর পরেও তারা একাধিকবার দরগাহে রিসালতে আগমন করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহর গায়েবী খাজানা থেকে প্রদত্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আরেকটি বিশাল নুসরত; যার খবর একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কারোরোই জানা নেই। তা ছাড়া জিনদের উপস্থিতি সম্পর্কে অবতীর্ণ এ আয়াতগুলোর আঁচলে জড়ানো এই সুসংবাদও বিদ্যমান ছিল যে, অতি শীঘ্রই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ দাওয়াতী অভিযান সফলতার মুখ দেখবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি কিংবা ক্ষমতারই সাহস নেই, তার মাঝে ও তাঁর জন্য অপেক্ষমান সফলতার মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।

আল্লাহর ঘোষণা: وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ

ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [সূরা আহক্বাফ : ৩২]

তিনি আরও ঘোষণা করেন وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাকে অপারগ করতে পারব না। [সূরা জিন : ১২]

তায়েফ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসার পর থেকে আজ অবধি চিন্তা, পেরেশানি আর হতাশার যে কোলো মেঘ তাকে ঘিরে রেখেছিল এ সকল সুসংবাদ আর নুসরতের সামনে সেগুলো ধীরে ধীরে কেটে যেতে শুরু করল। সুতরাং, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপরে মক্কায় ফিরে আসার দৃঢ় সংকল্প করলেন। তিনি মনে মনে শপথ করলেন, মক্কায় গিয়ে ইসলাম প্রচার আর রিসালতের পয়গাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। আবার নতুন তেযে, নতুন উদ্যমে আর নতুন সংকল্পে স্বীয় মিশনকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

কিন্তু তখন যায়েদ বিন হারিসা রা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কুরাইশরা আপনাকে যেখান থেকে বের করে দিয়েছেন সেখানে আবার কীরূপে আপনি ফিরে যাবেন? তিনি বললেন, **"যায়েদ! তুমি তো দেখেই চলছ কীভাবে আল্লাহ পাক পদে পদে আমাদের জন্য সকল সমস্যার সমাধানের রাস্তা খুলে দিচ্ছেন। সামনেও আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে তার দীনকে সাহায্য করবেন। তার নবীকে সকলের ওপর বিজয় দান করবেন"**।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলতে শুরু করলেন এবং মক্কার কাছাকাছি এসে গারে হেরায় গিয়ে অবস্থান করলেন। তখন এক ব্যক্তিকে আখনাস বিন শারীকের নিকট নিরাপত্তার জন্য পাঠালেন। সে বলল, আমি তো তাদের মিত্র। সুতরাং, মিত্র হয়ে আমি আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারি না। এরপর তাকে সুহাইল বিন আমরের কাছে পাঠালেন। সুহাইল বলল, বনু আমের বনু কা'বের বিরুদ্ধে কাউকে নিরাপত্তা দিতে পারে না। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুতঈম বিন আদীর নিকট পাঠালেন। মুতঈম বলল, হাঁ! আমি তাকে নিরাপত্তা দিব। এরপর তিনি অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তার বংশধর ও স্বগোত্রের মানুষকে এক জায়গায় সমবেত করে বললেন, তোমরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বাইতুল্লাহর চারপাশে বসে থাকো। কেননা, আমি মুহাম্মাদকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কায় প্রবেশের জন্য সংবাদ দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ বিন হারিসা রা. কে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে মসজিদুল হারামে চলে এলেন। এরপর মুতঈম বিন আদী তার সওয়ারীর ওপর দাঁড়িয়ে সুউচ্চ স্বরে ঘোষণা দিলো, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মাদকে নিরাপত্তা দিয়েছি। সুতরাং, আগের মতো তোমরা কেউ তাকে জ্বালাতন করতে এসো না। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা হজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে সেটাকে চুম্বন করলেন। এরপর বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করলেন। অতঃপর দুই রাকাআত নামায পড়ে নিজ ঘরে ফিরে এলেন। তিনি ঘরে ঢোকার আগ পর্যন্ত মুতঈম বিন আদী ও তার ছেলেরা অস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছিল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়, আবু জাহল মুতঈমকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছ, না কি তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছ? সে বলল, বরং আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। তখন আবু জাহলও বলল, ঠিক আছে। তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।[২৪৮]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মুতঈমের এই বিশাল অবদানের কথা সারা জীবন মনে রেখেছিলেন। আর এ কারণেই তো বদর বন্দীদের ব্যাপারে বলেছিলেন, **যদি মুতঈম বিন আদী আজ জীবিত থাকত আর এই নাপাক ও গান্ধাগুলির ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলত তবে আমি তার খাতিরে এদের সকলকে মুক্ত করে দিতাম।** [২৪৯]

বিভিন্ন কবীলা আর ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের প্রতি আহ্বান

নবুওতের দশম বছরের যুল কা'দ মোতাবেক ঈসায়ী ৬১৯ সালের জুনের শেষ কিংবা জুলাইয়ের শুরুভাগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ফিরে এলেন। এবার তাঁর সামনে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল-বিভিন্ন কবীলা আর ব্যক্তিবর্গকে ইসলামের দিকে নতুন করে আহ্বান করা। তা ছাড়া হজ্জের মৌসুমও কাছাকাছি এসে পড়েছিল। বিশ্বের দূর দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটে চড়ে বিভিন্ন দেশ ও ভূখণ্ডের মানুষ মক্কায় এসে ভিড় জমাতে শুরু করেছিল। তাদেরও লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল হজ্জের ফরয আদায় করা; নিজেদের উপকার করা এবং নির্ধারিত কিছু দিনে আল্লাহর নাম স্মরণ করা। সুতরাং, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ স্বর্ণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন। নবুওতের চতুর্থ বছর থেকে এ মিশন যেভাবে চালিয়ে এসেছেন ঠিক তার ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক

---

[২৪৮] ইবনে হিশাম ১/৩৮১। যাদুল মাআদ ২/৪৬, ৪৭।

[২৪৯] সহীহ বুখারী ২/৫৭৩।

কবীলার কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের সামনে ইসলামের রূপরেখা তুলে ধরে তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে লাগলেন। পাশাপাশি এর মধ্যে আরও কিছুর সংযোজনা ঘটেছিল। আর তা হলো এই বছর নবুওতের দশম বছর থেকে তিনি নিজ মিশনকে সঠিকভাবে আদায় করার লক্ষ্যে তাদের কাছে সাহায্য-সহযোগিতা ও আশ্রয় প্রার্থনা করতে শুরু করেছিলেন।

যে সকল কবীলাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল :

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল কবীলার কাছে এসে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন এবং নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিম্নোক্ত নামগুলো ইতিহাস আমাদেরকে বলে দেয়ঃ বনু আমের বিন সা'সা', মুহারিব বিন খাসফা, ফাযারা, গাস্‌সান, মুররা, হানীফা, সুলাইম, আবস, বনু নসর, বনু বাক্কা, কিন্দা, কালব, হারিস ইবনে কা'ব, উযরা ও হাযারিমা ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের কেউই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে সাড়া দেয়নি।[২৫০]

উল্লেখ্য, ইমাম যুহরী রহ. যে সকল কবীলার নাম ওপরে উল্লেখ করেছেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলের নিকট কোনো একটি বছরে কিংবা একটি মৌসুমে ইসলামকে পেশ করেননি; বরং এর সময়কাল ছিল নবুওতের চতুর্থ বছর থেকে শুরু করে হিজরত-পূর্বের সর্বশেষ হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত। বাকি নির্দিষ্ট কোনো বছরে নির্দিষ্ট কোনো কওমের কাছে ইসলামের রূপ-রেখা উপস্থাপনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বেশির চে' বেশি এতটুকু বলা যায় যে, নবুওতের দশম বছরেই এর সিংহভাগ সম্পন্ন হয়েছিল।

এ সকল কবীলার কাছে কীভাবে ইসলামকে পেশ করা হয়েছিল আর তারাও বা কীভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিল ইবনে ইসহাক রহ. এ প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। আমরা নিম্নে এর মোটামুটি একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করছিঃ

এক. বনু কালবঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কালবের একটি শাখাগোত্র বনু আব্দুল্লাহর কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকলেন এবং নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এমনকি তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন যে, হে বনু আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদের পূর্বপুরুষের জন্য কত সুন্দর একটি নাম মনোনীত করেছেন! কিন্তু তারা তার কথা মেনে নিতে মোটেও রাযি ছিল না।

---

[২৫০] ইবনে সা'দ ১/২১৬।

দুই. বনু হানীফা: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একেবারে তাদের বাড়িতে এসে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ডাকলেন। তাদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। কিন্তু তারা এতটা খারাপ ও মন্দ পন্থায় রাসূলের এ আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আরবের আর কোনো গোত্র যে পন্থা অবলম্বন করেনি।

তিন. বনু আমের বিন সা'সা': রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এসে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করলেন এবং নিজেকে তাদের সামনে পেশ করলেন। তখন তাদের জনৈক বাহীরা বিন ফিরাস দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহর কসম! এমন এক যুবককে যদি আমি বাগে নিয়ে নিতে পারি তবে গোটা আরবকে আমি সহজেই গিলে খেতে পারব। অতঃপর সে বলল, মনে করো আমরা তোমার কথা মেনে তোমাকে অনুসরণ করলাম। কিন্তু পরবর্তী সময় যদি তোমার বিরুদ্ধবাদীরা তোমার ওপর জয়ী ও প্রবল হয়ে যায়; তখন আমাদের অবস্থা কী হবে? তা একটু বলো তো দেখি! তিনি বললেন, **এ সব তো আল্লাহর হাতে; তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করেন**। সে তাকে বলল, তুমি কি চাচ্ছ তোমার জন্য আমরা আরবদের ছুরির নীচে বলি হয়ে যাই? এরপর যদি আল্লাহ পাক তোমাকে বিজয় দান করেন তখন অন্যরা তাতে এসে ভাগ বসাবে তাই না? এমন ধর্ম আমাদের কোনো দরকার নেই! মোটকথা এভাবে তারা প্রত্যাখ্যান করল।

পরবর্তী সময় যখন বনু আমের হজ্জ শেষে ফিরে এলো, তখন তাদের বয়োবৃদ্ধ সরদার-যে বার্ধক্যের কারণে সে মৌসুমে তাদের সঙ্গে হজ্জে যেতে পারেনি-তার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলল। তারা তাকে বলল, কুরাইশের বনু আব্দুল মুত্তালিবের এক যুবক আমাদের কাছে আসে। তার ধারণায় সে নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছে। সে আমাদেরকে তাঁর হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি আহ্বান করে। আমাদেরকে সে আরও বলে যেন তাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসি। তখন বয়োবৃদ্ধ সরদার মাথায় হাত রেখে বলে উঠল : বনু আমের! এখন তাকে হত্যা করার কোনো উপায় আছে কি? হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সে যুবককে হাতকড়া পরানোর কোনো পথ আছে কি? আল্লাহর কসম! আজ পর্যন্ত ইসমাঈলী বংশের কেউ নবুওতের (মিথ্যা) দাবি করেনি! নিশ্চয়ই তাঁর বক্তব্য সত্য!! কিন্তু তোমরা তখন কতটা বেকুব হয়ে গিয়েছিলে আমার তো তা-ই বুঝে আসে না।[২৫১]

মক্কার বাইরের মুমিনগণ

যেভাবে বিভিন্ন কওম আর কবীলাকে রাসূলে কারীম ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছিলেন একইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি আর স্বতন্ত্র সত্তাকেও তিনি ইসলামের পথে

---

[২৫১] ইবনে হিশাম ১/৪২৪, ৪২৫।

ডেকেছিলেন। তাদের কারও কারও কাছ থেকে তিনি ইতিবাচক সাড়াও পেয়েছিলেন। হজ্জের মৌসুম খতম হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তারা তাঁর ওপর ঈমান নিয়ে এসেছিলেন। নীচে তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করা হলো:

এক. সুয়াইদ বিন সামিত রা.

ইয়াসরিবের অধিবাসী সুয়াইদ বিন সামিত রা. ছিলেন আরবের খ্যাতিমান কবিদের একজন। কামালাত ও শারাফাত আর কবিত্ব ও বংশ কৌলিন্যের কারণে তার কওম তাকে 'কামিল' বলে ডাকত। তিনি হজ্জ কিংবা উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছিলেন। এখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো; তিনি তাকে ইসলামের পথে ডাকলেন। তিনি বললেন, আমার কাছে যা আছে তোমার কাছে সম্ভবত তা-ই আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **তোমার কাছে কী আছে?** তিনি বললেন, লুকমানের হিকমত ও জ্ঞান-বিজ্ঞান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আমাকে একটু শুনাও দেখি!** অতঃপর তার কাছে যা কিছু ছিল তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তা তুলে ধরলেন। তিনি তাকে বললেন, **নিঃসন্দেহে এটা সুন্দর কথা! কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে তা এর চেয়েও অনেক উত্তম। তা হলো কুরআনে কারীম; যা আল্লাহ তাআলা আমার ওপর অবতীর্ণ করেছেন। তা হিদায়াত ও নূর।** এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করতে লাগলেন। তাকে ইসলামের পথে ডাকলেন। এতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, নিঃসন্দেহে এটা সুন্দর কথা! কিন্তু মদীনায় এসে উপস্থিত হতে না হতেই বুআস যুদ্ধের সামান্য আগে আউস ও খাজরাযের মধ্যে চলমান সংঘাতে তিনি নিহত হলেন।[২৫২] অধিকাংশ সীরাত প্রণেতার মতে, তিনি নবুওতের একাদশ বছরের শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

দুই. ইয়াস বিন মাআয রা.

তিনি ছিলেন ইয়াসরিবের অধিবাসী এক অল্পবয়সী যুবক। আউসের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তিনি মক্কায় এসেছিলেন। আর তারা এসেছিল খাজরাযের বিপক্ষে কুরাইশের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। এটা ছিল বুআস যুদ্ধের ঠিক আগ মুহূর্তে নবুওতের দশম বছরের গোড়ার দিকের ঘটনা। যখন ইয়াসরিবের দুই গোত্রের মাঝে যুদ্ধের আগুন উপচে পড়া পাতিলের মতো উথলে উঠছিল। ভীম রণ-দুন্দুভিতে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আর আউসের লোকসংখ্যা ছিল খাযরাজের চেয়ে কম। যাই হোক রাসূলে কারীম

---

[২৫২] ইবনে হিশাম ১/৪২৫-৪২৭। ইসতীয়াব ২/৬৭৭। উসদুল গাবা ২/৩৩৭।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের আগমনের সংবাদ জানতে পারলেন সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তাদের একেবারে কাছে এসে বসে বলতে লাগলেন, যদি তোমরা যার জন্য এসেছ তার চেয়ে আরও ভালো কিছু পেয়ে যাও তবে কী করবে? তারা বলল সেটা কী? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছেন যেন আমি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করি; আর যেন তাদেরকে বলে দিই তারা যেন আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে। তিনি আমার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

এরপর তিনি তাদের নিকট ইসলাম তুলে ধরলেন। তাদেরকে এর যাবতীয় রূপ-রেখা বাতলে দিলেন এবং তাদের সামনে কুরআনে কারীম থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তখন ইয়াস বিন মাআয রা. বললেন, হে আমার কওম! আল্লাহর কসম! তোমরা যার জন্য এসেছ তার চেয়ে এটা শতগুণে ভালো। তখন সেই প্রতিনিধিদলের মধ্য থেকে আবুল হায়সার আনাস বিন রাফে' এক মুষ্টি মাটি নিয়ে ইয়াসের মুখের নিক্ষেপ করল এবং বলল, তুই ভাগ এখান থেকে! আমার জীবনের কসম আমরা তো ভিন্ন এক উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। ইয়াস নীরবতা অবলম্বন করলেন আর রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কিছু না বলে মজলিস ছেড়ে চলে গেলেন। আর তারাও কুরাইশের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করতে ব্যর্থতার পয়গাম নিয়ে মদীনার পথ ধরল। ইয়াসরিবে ফিরে যাওয়ার অল্প কিছুদিন পরেই ইয়াস রা. মারা গেলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কেবল তাসবীহ-তাহলীল পড়তেন। থেকে থেকে আল্লাহর প্রশংসায় গুনগুনিয়ে উঠতেন। তাই আর কারও কোনো সন্দেহ রইল না যে, ইয়াস রা. মুসলমান হয়েই মৃত্যুর পেয়ালায় মুখ লাগিয়েছেন।[২৫৩]

আবু যর গিফারী রা.

তিনি ইয়াসরিবের কাছাকাছি অঞ্চলেই বসবাস করতেন। সে কারণে সুয়াইদ বিন সামিত ও ইয়াস বিন মাআয রা. এর মাধ্যমে যখন মদীনাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের খবর ছড়িয়ে পড়ল, তখন সম্ভবত আবু যরের কানে গিয়েও পড়েছিল। আর এটাই পরবর্তী সময়ে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ওসীলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, আবু যর গিফারী রা. বলেন, আমি ছিলাম গিফার গোত্রের একজন সদস্য। একদিন আমরা শুনতে পেলাম মক্কায় এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি

---

২৫৩ ইবনে হিশাম ১/৪২৭, ৪২৮। মুসনাদে আহমদ ৫/৪২৭।

করেন। তখন আমি আমার ভাইকে বললাম আপনি লোকটির কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে আসুন! আমার ভাই চলে গেলেন। কিছুদিন পর তিনি স্বাভাবিকভাবেই ফিরে এলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের জন্য কী সংবাদ নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এমন এক লোককে সেখানে পেয়েছি, যিনি সব সময় ভালো কাজের আদেশ দেন। মন্দ ও খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করেন। তখন আমি তাকে বললাম এটা কি কোনো পূর্ণাঙ্গ সংবাদ? তখন আমিই একটি মশক আর একটি লাঠি নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলাম। মক্কায় পৌঁছে আমি কাউকেই চিনতে পারছিলাম না। আবার কারও কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও মন চাচ্ছিল না। তাই এভাবেই যমযমের পানি পান করে মসজিদুল হারামেই দিন কাটাতে লাগলাম। তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী রা. আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনাকে দেখে বিদেশি মুসাফির মনে হচ্ছে? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম হাঁ। আমি বিদেশি। তিনি বলেন, তখন হযরত আলী রা. আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছেন না, আর আমিও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করছি না। পরের দিন সকাল সকাল আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য মসজিদে ছুটে এলাম। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমাকে কেউই কিছু বলতে পারল না। তিনি বলেন, সেদিনও হযরত আলী রা. আমার পাশ দিয়ে গমন করলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এখানে পরিচিত জনের খোঁজ এখনো পেয়েছি কি না? আমি বললাম না। তিনি বললেন তাহলে আমার বাড়িতে চলুন! তারপরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এবার বলুন : আপনার লক্ষ্য কী? আপনি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? আমি তাকে বললাম, যদি কাউকে না বলেন তবে বলতে পারি। তিনি বললেন ঠিক আছে কাউকে বলব না। তখন আমি তাকে বললাম, আমি আমার নিজ এলাকায় বসে শুনতে পেয়েছি এখানে এমন একজন লোক বের হয়েছেন, যিনি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করেন। তখন আমি আমার ভাইকে তাঁর অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করি; কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিতে পারেননি। তাই আমি নিজেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য চলে আসি।

তখন হযরত আলী রা. বললেন, মা শা আল্লাহ! আপনি সঠিক স্থানেই চলে এসেছেন। আমার সঙ্গে চলুন; আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি। আমি যেদিকে যাব আপনিও সেদিকেই যাবেন তবে পথিমধ্যে যদি শঙ্কাজনক কাউকে দেখি তবে আমি জুতো ঠিক করার জন্য দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে যাব আর আপনি পথ ধরে সামনে চলতে থাকবেন। এভাবে তিনি চলতে লাগলেন আর আমিও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলাম। চলতে চলতে এক সময় তিনি ও আমি একটি ঘরে রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি তাকে বললাম, আপনি আমার সামনে ইসলামকে তুলে ধরুন! তখন তিনি আমার সামনে সবিস্তারে ইসলাম তুলে ধরলেন। তখন আমি সেই জায়গায় বসেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, **আবু যর! বিষয়টি কারও কাছে না বলে গোপন রেখেই নিজের এলাকায় চলে যাও। পরবর্তী সময় যখন আমাদের বিজয়ের সংবাদ তোমার কানে গিয়ে পড়বে তখন তুমি আবার আমার কাছে চলে আসবে।**

আমি বললাম, ঐ সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আমি অবশ্যই অবশ্যই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে আমার ঈমানের ঘোষণা দিব। তখন আমি মসজিদুল হারামে চলে এলাম। এসে দেখলাম সেখানে কুরাইশরা বসে আছে। আমি বললাম হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা সকলে বলে উঠল 'এই ধর্মত্যাগীটিকে ধরে ফেল'। তারা সকলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এমনভাবে সকলে প্রহার করতে লাগল যে, আমি মৃত্যুর উপক্রম হলাম। তখন হযরত আব্বাস রা. আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, সর্বনাশ হোক তোমাদের! তোমরা গিফার গোত্রের একলোককে হত্যার জন্য উদ্যত হয়েছ! অথচ তোমাদের ব্যবসা করতে আসা-যাওয়ার জন্য গিফারের ধূলি মাড়ানো ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই। তখন তারা আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সকাল হলে আমি আবার মসজিদুল হারামের চলে এলাম। এরপর গতকাল যা বলেছিলাম আবারও তা বললাম। তখন তারা গতকাল আমার সঙ্গে যে আচরণ করেছিল আজও তাই করল। গতকালের মতো আজও ইবনে আব্বাস রা. এসে আমাকে রেহাই দিলেন। গতকাল তাদেরকে যা বলেছিলেন আজও তা-ই বললেন। [২৫৪]

চার. তোফায়েল বিন আমর দাউসী রা.

দাউস গোত্রের সরদার হযরত তোফায়েল বিন আমর দাউসী রা. ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ; একজন বিচক্ষণ ও ধীমান কবি। ইয়েমেনের বিস্তীর্ণ কয়েকটি অঞ্চল জুড়ে এ গোত্র একটি রাজ্য কিংবা উপরাজ্যের রূপ ধারণ করে ছিল। তিনি নবুওতের একাদশ বছর মক্কায় আগমন করেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় তাঁর উপস্থিতির আগভাগেই উষ্ণ সংবর্ধনা দেওয়ার কাজটি সেরে ফেলে। তারা তার জন্য তাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা আর সম্মান দেখায়। এরপর সকলে মিলে তাকে বলে, তোফায়েল! আপনি আমাদের শহরে এসেছেন। আমাদের মধ্যে আপনি

---

[২৫৪] সহীহ বুখারীঃ যমযম অধ্যায় ১/৪৯৯, ৫০০। আবু যর রা এর ইসলাম গ্রহণ ১/৫৪৪, ৫৪৫।

এই যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছেন, সে আমাদের জীবন-সংসার কী এক মায়াজালে পেঁচিয়ে বড় কঠিন করে ফেলেছে। আমাদের ঐক্যের সকল রজ্জুকে সে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। সে আমাদের সাঁজানো গুছানো সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে। তাঁর সকল কথাবার্তা যাদুর মতো। সে ছেলে ও পিতার মাঝে, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে, ভাই ও বোনের মাঝে বিরোধের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা ভয় পাচ্ছি আপনার নিজের ও আপনার কওমেরও না জানি আমাদের দশা হয়! তাই সাবধান! আপনি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। তাঁর কোনো কথাও আপনি শুনতে যাবেন না।

তোফায়েল রা. বলেন, আল্লাহর কসম! তারা আমার সঙ্গে এত পীড়াপীড়ি আর জোরাজুরি করতে লাগল যে, আমি মনে মনে আমার ইচ্ছা দৃঢ় করে ফেললাম যে, তার কোনো কথা-ই আমি শুনব না কিংবা তাকে কিছু বলতেও যাব না। এমনকি ভোরে যখন আমি মসজিদুল হারামে গেলাম, তখন কানের ভেতরে তুলা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। কারণ, আমার মনে প্রচণ্ড ভীতি কাজ করছিল, না জানি তার কোনো কথা বেখেয়ালে হলেও আমার কর্ণকুহরে ঢুকে যায়!

তিনি বলেন ভোরে যখন আমি মসজিদুল হারামে গেলাম তখন আমি তাকে কাবার নিকট নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় পেলাম। আমি তাঁর একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল আমি তাঁর কিছু কথা শুনে নিই তাই তার কয়েকটি কথা শুনলাম। তার সে কথাগুলি সত্যিই ছিল বড় মধুর! তখন আমি মনে মনে বললাম, হায় আফসোস! আমি আরবের এত বড় একজন বিচক্ষণ কবি! আর আমি কিনা বুঝব না-কোনটি ভালো আর কোনটা মন্দ? তবে এ লোকটির কথা শুনতে সমস্যা কোথায়? যদি তাঁর কথা ভালো হয় তবে আমি গ্রহণ করব। আর যদি মন্দ হয় তবে দূরে ছুঁড়ে ফেলব। এর কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়িতে চলে যাচ্ছিলেন তখন আমিও তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। অতঃপর যখন তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন আমিও তার পেছনে পেছনে প্রবেশ করলাম। এরপর আমি একে একে তাকে সকল ঘটনা খুলে বললাম। সর্বপ্রথম তাকে আমার মক্কায় আগমনের কাহিনী বললাম। এরপর মানুষের ভয় দেখানো,কানের মধ্যে তুলা দেওয়া এবং পরিশেষে তাঁর কণ্ঠে কিছু শুনে ফেলার কাহিনীও খুলে বললাম। অনন্তর তাকে আমি বললাম, আপনি আমার কাছে ইসলাম তুলে ধরুন! তিনি আমার কাছে ইসলামকে তুলে ধরলেন। আমার সামনে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে শুনালেন। আল্লাহর কসম! আমি আমার যিন্দিগিতেও কভু এর চেয়ে সুন্দর ও সুমধুর কোনো কথা শুনিনি। এর চেয়ে অধিক ভারসাম্যপূর্ণ আর কিছু দেখিনি। তাই আমি ইসলাম কবুল করে নিলাম এবং সত্য সাক্ষ্য দিলাম। সর্বশেষে তাকে বললাম, আমাকে আমার কওমের লোকেরা মেনে চলে। আর

আমি এখন তাদের কাছেই ফিরে যাব; গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। তাই আপনি দুআ করুন যেন আল্লাহ তাআলা আমার জন্য একটি আলামত তৈরি করে দেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করলেন।

তাঁর আলামত ছিল এই যে, তিনি যখন তার কওমের কাছাকাছি গেলেন তখন আল্লাহ তাআলা তার চেহারায় বাতির মতো একটি নূর সৃষ্টি করে দিলেন। তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমার চেহারা ব্যতীত অন্য কোথাও এটি দিয়ে দিন! কারণ আমার ভয় হয়, আমার কওমের লোকেরা দেখলে এটাকে একটি ব্যাধি সাব্যস্ত করবে। তখন নূরটি তার বগলে চলে গেল। এরপর তিনি তার মাতা-পিতাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছিলেন আর তাই তারাও অতি স্বাভাবিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। কওমের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। খন্দক যুদ্ধের পর তিনি তাঁর কওমের ৭০/৮০টি পরিবার নিয়ে রাসূলের দরবারে এসে উপস্থিত হন।[২৫৫] এভাবে ইসলামের পথে তিনি অনেক বালা মুসিবত আর পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সর্বশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদী মৃত্যুর রঙিন বিছানায় চিরদিনের জন্য গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।[২৫৬]

পাঁচ. যিমাদ আযদী রা.

তিনি ইয়েমেনের আযদে শানুআ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন ছিল তাঁর পেশা। একবার যে কোনো কাজে তিনি মক্কায় এলেন। এসেই সেখানের বেকুবদেরকে বলতে শুনলেন, নিশ্চয় মুহাম্মাদ একটা বদ্ধ পাগল। তিনি বলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যদি আমি তাঁর কাছে যাই হতে পারে আমার এত বছরের অভিজ্ঞতার ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তাকে আমি ভালো করতে পারব। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাতে তাকে বললেন, মুহাম্মাদ! আমি মানুষকে ঝাড়-ফুঁক করি। তোমার কি ঝাড়-ফুঁকের প্রয়োজন আছে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য; আমি কেবল তাঁরই প্রশংসা করি আর তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তিনি যাকে হেদায়াতের পথ দেখান তাকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা কারও নেই; আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে হেদায়াত**

---

[২৫৫] বরং হুদাইবিয়ার পরে। তিনি যখন মদীনায় আসেন রাসূলে কারীম সা. তখন খায়বরে ছিলেন। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৩৮৫।

[২৫৬] ইবনে হিশাম ১/৩৮২-৩৮৫।

দেওয়ার শক্তি কারও নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। হামদ ও সালাতের পর। ... . ।

তিনি বললেন, আপনি সেই কথাগুলো আবার বলুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে উল্লিখিত দুআটি তিন বার পাঠ করলেন। তিনি বললেন, জীবনে আমি বহু জ্যোতিষী, যাদুকর ও কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার কথার মতো কথা কোনো দিনও শুনিনি। এগুলো তো আমার হৃদয় সমুদ্রের একেবারে গভীরে চলে গেছে। সেখানে সৃষ্টি করেছে এক নতুন তুফান; এ তুফান যখন জেগে উঠবে; যখন ছুটবে রেগেমেগে কূলের দিকে তখন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সাগর পারে দাঁড়ানো অনুভব আর অনুভূতির সবকিছু। আপনার হাত বাড়িয়ে দিন আমি আপনার হাতে বাইআত হবো। এরপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বাইয়াত হয়ে গেলেন।[২৫৭]

ইয়াসরিবের ছয়টি ভাগ্যবান আত্মা

নবুওতের একাদশ বছর মোতাবেক খৃষ্টাব্দ ৬২০ সালের জুলাই মাসে হজ্জের মৌসুমে ইসলামী দাওয়াতের ভাগ্যে কতগুলি উর্বর ও ফলপ্রদ বীজ জুটে যায়। কয়েক দিন যেতে না যেতেই সেগুলি পরিণত হয় সুবিশাল মহীরুহে। এর পত্র-পল্লব আর ডাল-পালায় ভরে ওঠে আশপাশের আকাশী নগর। শত যুলুম ও অত্যাচারের রুদ্র মারমূর্তি থেকে মুসলমানগণ এর সবুজ ছায়ার মায়ায় সুরক্ষার এক অসামান্য দৃষ্টিনন্দন দুর্গ গড়ে তোলে। এভাবে সকল ঘটনা এক খাত থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে যায়।

যেহেতু দিনের বেলায় দাওয়াতী কাজে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় বাঁধা দান করা কাফেরদের চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল এ কারণে হিকমতে নবুওতের চাহিদা ছিল এটাই যে, রাতের ঘনঘোর অন্ধকারে দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যাওয়া হোক। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলায় দাওয়াতী কাজ চালাতেন। যাতে তার মাঝে ও মক্কার মুশরিকদের মাঝে কোনো প্রাচীর না থাকে।

এক রাতে তিনি বের হলেন। তার সঙ্গে ছিলেন আবু বকর ও আলী রা.। যেতে যেতে যুহল ও শায়বান বিন সা'লাবার এলাকার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং তাদের সঙ্গে ইসলামের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা-পর্যালোচনা করেন। আবু বকর ও বনু যুহলের এক ব্যক্তির মাঝে সুন্দর কিছু সওয়াল-জবাব বিনিময় হয়।

---

[২৫৭] মুসলিম: জুমুআ পর্ব, নামায ও খুতবা হালকা করণের অধ্যায় হাদীস নং ৪৬ (৮৬৮)।

বনু শায়বানও আশানুরূপ ও সাড়া জাগানিয়া জবাব দেয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য তারা কিছুদিন সময় নেয়।[২৫৮]

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মীনার ঘাঁটির পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেন। হঠাৎ তিনি কিছু মানুষের কথা-বার্তার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদেরকে খোঁজ করতে লাগলেন। পেয়েও গেলেন ইয়াসরিবের খাজরায গোত্রের ছয়জন উচ্ছ্বসিত অরুণ প্রাণের তরুণকে। তারা ছিলেনঃ

এক. আসআদ বিন যুরারা (বনু নাজ্জার গোত্র)

দুই. আউফ বিন হারিস বিন রেফাআ বিন আফরা (বনু নাজ্জার গোত্র)

তিন. রাফি' বিন মালিক বিন আজলান (বনু যুরাইক গোত্র)

চার. কুতবা বিন আমের বিন হাদীদা (বনু সালামা গোত্র)

পাঁচ. উকবা বিন আমের বিন নাবী (বনু হারাম বিন কা'ব গোত্র)

ছয়. জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রিয়াব (বনু আবীদ বিন গনম গোত্র)

ইয়াসরিববাসীদের ভাগ্য বড় ভালো ছিল। কারণ, তারা তাদের মিত্র মদীনার ইহুদিদের কাছ থেকে শুনেছিল যে, বর্তমান কালে আল্লাহর একজন নবী আসার কথা রয়েছে এবং তিনি অতি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছেন। সুতরাং, তিনি আত্মপ্রকাশ করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তাঁর সঙ্গে মিলে আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবে যুদ্ধ করব যেভাবে করা হয়েছিল আদ ও ইরাম জাতির বিরুদ্ধে।[২৫৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন তোমরা কারা? তারা বলল আমরা ইয়াসরিবের কবীলায়ে খাযরাজের একটি দল। তিনি বললেন, ইহুদিদের সঙ্গে কি তোমাদের মিত্রতা আছে? তারা হাঁ সূচক জবাব দিলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আমার সঙ্গে বসে কিছু কথা বলবে? তারা বলল কেন নয়? নিশ্চয়ই বলব। এরপর তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এক মজলিসে মিলিত হলো। সেখানে তিনি তাদের সামনে ইসলাম ও দাওয়াতের হাকীকত সবিস্তারে তুলে ধরলেন। তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। তাদের সামনে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করলেন। তখন তারা একজন অপরজনকে বলতে লাগল, হে আমার কওম, তোমরা জেনে রাখো! নিঃসন্দেহে ইনিই সেই নবী ইহুদিরা তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সুতরাং, এবার তারা যেন তাঁর ব্যাপারে তোমাদের আগে

[২৫৮] দেখুন শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ১৫০-১৫২।
[২৫৯] যাদুল মাআদ ২/৫০। ইবনে হিশাম ৪২৯, ৫৪১।

যেতে না পারে। তখন তারা তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য দৌড়ে গেল। কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিলম্ব ব্যতিরেকেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিলো।

এ সকল লোক ছিল ইয়াসরিবের জ্ঞানী ও গুণী সম্প্রদায়। সবেমাত্র শেষ হওয়া বছরের পর বছর চলে আসা গৃহযুদ্ধ তাদের সবকিছু শেষ করে দিয়েছিল। এর ধূম্রকুণ্ডলী এখনো সেখানের গোটা পরিমণ্ডলে ঘনঘোর অন্ধকারের আস্তরণ তৈরি করে রেখেছিল। তাই তাদের মনের আকাশে আশার এক নতুন তারার উদয় ঘটল। তাদের অন্তর তাদের কানে কানে বলে দিলো তাঁর দাওয়াতই হবে তাদের গৃহযুদ্ধ বন্ধের মূল চাবিকাঠি। তখন তারা বলল আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যে দুশমনি, রেষারেষি আর দ্বন্দ্ব-কলহ রয়েছে পৃথিবীর আর কোনো কওমের মধ্যে তা এতটা নেই। কিন্তু আমরা এখন আশাবাদী আল্লাহ তাআলা হয়তো আপনার মাধ্যমে তাদের সকলকে এক পতাকাতলে সমবেত করবেন। সুতরাং, আমরা তাদের নিকট যাবো। তাদেরকে আপনার ও আপনার কাজের প্রতি আহ্বান করব। আপনার আনীত যে দীনের দাওয়াতে আমরা সাড়া দিয়েছি সে দীন তাদের নিকটও পেশ করব। যদি তারাও আপনার সঙ্গে এসে মিলে যায় তবে গোটা পৃথিবীতে তখন আপনার চেয়ে বড় ইয্যতওয়ালা আর কেউই থাকবে না।

যখন এ সকল লোক তাওহীদের কেতন উড়িয়ে মদীনায় ফিরে গেল তখন ইসলামের পয়গামকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে গেল। গোটা মদীনার প্রত্যেক আনসারের ঘরে ও বাড়িতেই আল্লাহর রাসূলের আলোচনা শুরু হলো।[২৬০]

হযরত আয়েশা রা. এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহঃ

এই বছর তথা নবুওতের একাদশ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। এর তিন বছর পর হিজরী প্রথম সনের শাওয়াল মাসে মদীনায় বসে তাকে উঠিয়ে নিলেন। আর তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।[২৬১]

---

[২৬০] ইবনে হিশাম ১/৪২৮-৪৩০।
[২৬১] তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ১০। সহীহ বুখারী ১/৫৫১।

ইসরা ও মি'রাজ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চড়াই-উতরাই ভরা শ্বাপদসংকুল এ পথে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলেন। এক বার আকাশ ভরা স্বপ্ন নিয়ে সামনে দৌড়ে যাচ্ছিলেন আরেক বার জীবন যুদ্ধে বাস্তবতার প্রচণ্ড ঝড়ের মুখোমুখি হয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন। ইসলামের তরণী আরব সাগরের তরঙ্গোদ্বেল বুকে কখনো পাল তুলে হেলে দুলে চলছিল আবার পরক্ষণেই মাতাল সমুদ্রের তুফানের কোলে পড়ে গন্তব্য ছেড়ে কাত হয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল। কিন্তু আশার পাল্লা-ই যখন ভারী ছিল; অসফলতার বদলে সফলতার গতি ও মাত্রা বেশি ছিল; আশার তারাগুলি সুদূর দিগন্তে ঝিকিমিকি করতে শুরু করেছিল; ঠিক তখনই রিসালতের জীবনে ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা ঘটেছিল।

ঐতিহাসিকগণ ইসরা ও মি'রাজের তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চরম মতানৈক্যের জন্ম দিয়েছেন:

এক. কারও কারও মতে, ইসরার ঘটনা সে বছরই ঘটেছিল যে বছর আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবুওতের ধনে ধন্য করেছিলেন। তাবারী র. এ মত গ্রহণ করেছেন।

দুই. কারও কারও মতে এটি ছিল তাঁর নবুওত লাভের পাঁচ বছর পরের ঘটনা। নববী র. ও কুরতুবী এ বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তিন. কেউ কেউ বলেন, ইসরা ও মি'রাজ হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের ২৭ শা রজব দিবাগত রাতে।

চার. কারও মতে, হিজরতের ছয় মাস আগে তথা নবুওতের দ্বাদশ বছরের রমযান মাসে।

পাঁচ. কেউ বলেন, হিজরতের এক বছর দুই মাস আগে তথা নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের মুহাররম মাসে।

ছয়. কারও বক্তব্য হলো, হিজরতের এক বছর আগে তথা নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের রবীউল আউয়াল মাসে।

কিন্তু উল্লিখিত ছয়টি বক্তব্যের মধ্য থেকে প্রথম তিনটি কখনোই বিশুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, হযরত খাদীজা রা. এর ইন্তেকাল হয়েছিল নবুওতের দশম বছরের রমযান মাসে। আর এটা সর্বসম্মত যে, হযরত খাদীজা রা. এর ওফাত হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আগে। এ ব্যাপারেও কোনো মতানৈক্য নেই যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছিল ইসরার রাতে। পরবর্তী তথা শেষ

তিনটির কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার যথাযথ কোনো কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। তবে এটা তো সুনিশ্চিত যে, সূরা বনী ইসরাঈলের আগপরের আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাঁড়িয়ে ছিলেন মক্কী জীবনের বেলাভূমিতে ঠিক তখনই সংঘটিত হয়েছিল ইসরার ঘটনা।

হাদীসের ইমামগণ তাদের গ্রন্থসমূহে সবিস্তারে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি:

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা স্বশরীরের হয়েছিল। তিনি একটি বোরাকে আরোহণ করে জিবরাঈল আ. এর সঙ্গে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আক্বসায় (বাইতুল মুকাদ্দাস) চলে আসেন। অতঃপর সেখানে অবতরণ করে। বোরাকটি বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজার কপাটের সঙ্গে বেঁধে সকল নবী ও রাসূলের ইমাম হয়ে নামাজ আদায় করেন।

এরপর সে রাতেই বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে হযরত জিবরাঈল আ. এর সঙ্গে তাকে দুনিয়ার আকাশে ওঠানো হয়। জিবরাঈল আ. দরজা খুলতে বললে আকাশের দরজা খুলে গেল। তারা সেখানে গোটা মানব জাতির পিতা হযরত আদম আ. কে দেখতে পেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে হযরত আদম আ. এর ডান পাশে দুনিয়ার সকল ভাগ্যবান আর বাম পাশে সকল হতভাগাকে দেখিয়ে দিলেন।

এরপর তাকে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হলে তারা সেখানে ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়্যা এবং ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. কে দেখতে পান। তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদেরকে সালাম করেন। তারাও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন।

এরপর তাকে তৃতীয় আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইউসুফ আ. কে দেখতে পান। তিনি তাকে সালাম দিলেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দিলেন।

অতঃপর তাকে চতুর্থ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি ইদরীস আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন।

এরপর তাকে পঞ্চম আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি হারূন বিন ইমরান আ. কে দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন।

এরপর তাকে ষষ্ঠ আকাশে ওঠানো হয় এবং সেখানে তিনি মূসা বিন ইমরান আ. এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান এবং তার নবুওতের স্বীকৃতি দেন। কিন্তু যখন তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন মূসা আ. কাঁদতে শুরু করলেন। তাকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি কাঁদছি এ কারণে যে, আমার কত পরে এক যুবককে নবী করে পাঠানো হলো অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত অধিকসংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অতঃপর তাকে সপ্তম আকাশে ওঠানো হয়। তিনি সেখানে ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সালাম দেন। তিনিও সালামের উত্তর দিয়ে তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর নবুওতের স্বীকৃতি দেন।

এরপরে তাকে সিদরাতুল মুনতাহায় ওঠানো হয়। সেখানে তিনি তার ফলগুলো আরবের হিজর এলাকার মটকার মত এবং তার পত্র-পল্লবগুলো হাতির কানের মতো দেখতে পান। তাকে স্বর্ণের পঙ্গপাল, বর্ণাঢ্য নূর ও বিচিত্র রঙ একযোগে ঘিরে ফেলে। তখন তার রূপ-রেখা পরিবর্তন হয়ে যায়। আল্লাহর কোনো মাখলুকই তার সেই অপরূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্যের খানিকটা বিবরণ দিতেও সক্ষম নয়। এরপর তার সামনে বাইতুল মা'মূর তুলে ধরা হল। সেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে; আর একবার যে প্রবেশ করে কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় বার প্রবেশের অনুমতি ও সুযোগ পায় না। এরপর তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। তিনি তাতে অমূল্য মণি-মাণিক্যের বিভিন্ন জাল ছড়ানো ছিটানো দেখতে পান। তার মাটিতে মেশকের পুরু আস্তরণ দেখতে পান। এরপরে তাকে আরও ওপরে এমন এক স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ভাগ্য লিপিকর কলমের ঠকঠক আওয়ায শোনা যাচ্ছিল।

এরপর তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাধর, গোটা জগৎ সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তাআলার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে অগ্রসর হন। একসময় তাঁর একেবারে কাছে থেকে কাছে চলে যান; যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর তাঁর মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র দুই ধনুকের

কিংবা তার চেয়েও কম। এরপর তিনি আপন বান্দার ওপর যা ওহী করার ওহী করেন এবং তাঁর ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। এরপর তিনি ফিরতি পথ ধরেন। পথিমধ্যে হযরত মূসা আ. এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কীসের আদেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এত ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না। আপনি আপনার প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং স্বীয় উম্মতের ওপর তাঁর হুকুম হালকা করার জন্য আবেদন করুন। এরপর তিনি জিবরাঈল আ. এর দিকে চোখ তুলে তাকালেন। যেন তিনি তার কাছে পরামর্শ চাইলেন। জিবরাঈল আ. তাঁকে এটাই বুঝালেন যে হ্যাঁ, যদি চান করতে পারেন। এরপর তিনি আবার তাকে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে আল্লাহর কাছে ছুটে চলেন। তিনি তখন তাঁর স্থানে অবস্থান করছিলেন (বুখারীর সূত্রে বর্ণিত)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীচের দিকে অবতরণ করে আবার হযরত মূসা আ. এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাকে সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন : আপনি আবার আপনার রবের নিকট ফিরে গিয়ে আরও হালকা করে দেওয়ার অনুরোধ করেন! এভাবে একদিকে তিনি একবার আল্লাহর কাছে আরেকবার মূসা আ. কাছে আসা যাওয়া করতে থাকেন। আর অপরদিকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযও কমতে কমতে পাঁচ ওয়াক্তে এসে পৌঁছে। এরপরও যখন মূসা আ. তাকে আল্লাহর কাছে গিয়ে হালকা করার অনুরোধ করার পরামর্শ দিলেন তখন তিনি মূসা আ. কে বললেন, এ **বিষয়টি নিয়ে আমার রবের কাছে যেতে এখন আমার লজ্জা করে। আমি বরং এতেই তুষ্ট রয়েছি এবং মাথা পেতে মেনে নিয়েছি।** পরক্ষণেই মহাশূন্যের বিশালতায় এক গুরুগম্ভীর ঘোষণা শোনা গেলঃ আমি আমার ফরয নির্ধারণ করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের থেকে হালকা করে দিলাম'।[২৬২]

এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আল্লাহকে দেখার ব্যাপারে যে মতানৈক্য রয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া র. এর মতামত উল্লেখ করেছেন। যার সার নির্যাস হলোঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মানবচক্ষু দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে দেখা কোনো ভাবেই প্রমাণিত নয়। রাসূলের একজন সাহাবী থেকেও এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। আর ইবনে আব্বাস রা. থেকে সাধারণভাবে দেখা আর অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখা সম্পর্কে যে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় তার প্রথমটি দ্বিতীয়টির বিপরীত ও বিরোধী নয়।

[২৬২] যাদুল মাআদ ২/৪৭, ৪৮।

এরপর ইবনুল কাইয়্যিম র. লেখেন, কুরআনে কারীমের সূরা নাজম-এ উল্লিখিত আয়াত ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (এরপরে আরও কাছে এলেন এবং ঝুঁকে গেলেন) আর ইসরার ঘটনা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে 'নিকটবর্তী' হওয়ার কথা এক ও অভিন্ন নয়। কারণ, সূরা নাজমে উল্লিখিত আয়াতটি হযরত জিবরাঈল আ. সম্পর্কে; সেখানকার কাজের কর্তাও হলেন তিনি। হযরত আয়েশা আর ইবনে মাসউদ রা. এর বক্তব্য এটাই; ঘটনার আগ-পরের বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত সত্যও তাই। আর ইসরা সম্পর্কিত হাদীসে যে নিকটবর্তী হওয়া ও ঝুঁকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কেই। আর সূরা নাজমে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনাই নেই। বরং সেখানে যে বলা হয়েছে وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣) عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ (١٤) (তাকে আরেক বার দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে) স্পষ্টই তিনি হযরত জিবরাঈল আ.। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মোট দুই বার দেখেছেন: একবার পৃথিবীতে; আরেকবার সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[২৬৩]

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্ষ বিদারণের ঘটনাও ঘটেছিল। যাই হোক এই গুরুত্বপূর্ণ আসমানী সফরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক দুর্লভ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্ময়কর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন; আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে যা কোনো দিনও সম্ভব হয়ে উঠেনি।

- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দুধ ও শরাবের পেয়ালা পেশ করা হয় । তিনি দুটির মধ্য থেকে দুধের পেয়ালা বেছে নেন। তখন তাকে বলা হয় আপনাকে ফিতরাতের রাস্তা বলে দেওয়া হয়েছে কিংবা আপনি ফিতরাত পেয়ে গেছেন। মনে রাখবেন! আজ যদি আপনি শরাবের পেয়ালা বেছে নিতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ত।

- তিনি সিদরাতুল মুনতাহার গোড়া থেকে চারটি নহর উৎসারিত হতে দেখেন। তন্মধ্যে দুটি যাহেরী (বর্হিগমনকারী) নহর আর বাকি দুটি বাতেনী (অভ্যন্তরীন)। যাহেরী নহরদুটি হলো নীল ও ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী। আর বাতেনী নহরদুটি হলো জান্নাতের দুটি নহর। নীল ও ফোরাত নদী দেখানোর মধ্যে সম্ভবত ইঙ্গিত ছিল, ভবিষ্যতে ইসলাম এদুয়ের অববাহিকায় বিস্তৃতি লাভ করবে এবং এখানে দৃঢ় আসন পেতে বসবে।

---

[২৬৩] প্রাগুক্ত ২/৪৭, ৪৮। আরও দেখুন সহীহ বুখারী ১/৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৭১, ৪৮১, ৫৪৮-৫৫০, ২/৬৮৪। সহীহ মুসলিম ১/৯১-৯৬।

• তিনি জাহান্নামের দারোয়ান ফেরেশতা মালিক আ. কে দেখতে পান। তিনি তখন সুস্মিত ছিলেন না। আর তাঁর চেহারায়ও এক ফোঁটা হাসি কিংবা আনন্দের লক্ষণ শোভা পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল তিনি কখনো হাসেন না। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত ও জাহান্নাম দুটিকেই পরিদর্শন করলেন।

• জাহান্নামে তিনি যারা ইয়াতীমের অর্থ-সম্পদ যুলুম ও অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তাদেরকে দেখতে পান। তাদের ঠোঁট ছিল উটের ঠোঁটের ন্যায়। আর তাদের মুখ দিয়ে প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় জ্বলন্ত অঙ্গার ঢুকাচ্ছিল আর এগুলি তাদের পেছনের রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে সুদখোরদেরকেও দেখলেন। তাদের উদর ছিল সুবিশাল; যার কারণে তারা তাদের জায়গা থেকে নড়াচড়া করতে সক্ষম ছিল না। আর ফেরাউনের দলবলকে যখনই জাহান্নামের আগুনে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হতো তখন তারা তাদের পাশ দিয়ে যেত এবং যাওয়ার সময় তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে যেত।

• তিনি সেখানে ব্যভিচারীদেরকেও দেখলেন। তাদের সামনে ছিল মোটা ও সুস্বাদু গোশত আর তাদের পাশে রাখা ছিল পচা ও দুর্গন্ধময় গোশত। কিন্তু তারা সামনে রাখা সুস্বাদু ও তরতাজা গোশত ছেড়ে পাশের পচা ও গান্ধা গোশত খেয়ে যাচ্ছিল।

• তিনি সেখানে ঐ সকল নারীকে দেখলেন যারা নিজেদের স্বামীর ওপর অন্য কারও সন্তান যোগ করত। (অর্থাৎ যারা গোপনে পরপুরুষের সঙ্গে মেলা-মেশা করে গর্ভধারণ করে বাচ্চা প্রসব করত কিন্তু তার স্বামীও জানত না যে, এ বাচ্চা তার নয়)। তাদেরকে দেখলেন তাদের স্তনে বাঁকা কাঁটা ঢুকিয়ে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

• তিনি আসা যাওয়ার মধ্যে মক্কাবাসীদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা দেখতে পেলেন। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সে হারানো উটের ঠিকানা বলে দিয়েছিলেন। কাফেলার সবাই তখন ঘুমিয়ে ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঢেকে রাখা একটি পাত্র থেকে পানি পান করেছিলেন। এরপর পুনরায় পানির পাত্রটিকে ঢেকেই রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখন ইসরা ও মি'রাজের রাত ভোর হলো তখন তাঁর দাবির সত্যায়নের ক্ষেত্রে এগুলি দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ কাজ করেছিল।[২৬৪]

---

[২৬৪] প্রাগুক্ত। ইবনে হিশাম ১/৩৯৭, ৪০২-৪০৬।

ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, রাতের আঁধার কেটে গিয়ে যখন ভোরের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তমসাঘন রাতের কোলে ঘটে যাওয়া অশ্রুতপূর্ব মানবীয় শারাফাতের এক দুর্লভ কাহিনী মক্কাবাসীদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তাদেরকে খুলে বললেন ভরা নিশির গর্ভে আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কত বড় বড় নিদর্শনাবলি পরিদর্শন করিয়েছেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রতি তাদের মিথ্যায়নই বেড়ে গেল। তাদের ভেতরে তাকে আরও বেশি কষ্ট দেওয়া ও ক্ষতি করার মানস জেগে উঠল। তারা তাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরতে বলল। আল্লাহ তাআলা তখন তাঁর সামনে পুরো বাইতুল মুকাদ্দাসকে তুলে ধরলেন এবং তিনি তাকে নিজ চোখে দেখতে লাগলেন। সুতরাং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদেরকে একে একে তার নিদর্শন ও গুণাবলি বলে দিতে লাগলেন। কাফেররা তাঁর একটি কথায়ও দ্বিরুক্তি প্রকাশ করতে সক্ষম হলো না। তিনি তাঁর আসা যাওয়ার মধ্যে তাদের যে কাফেলাটিকে দেখেছেন সে সম্পর্কেও অবহিত করলেন। তিনি তাদেরকে সে কাফেলার মক্কায় এসে উপস্থিত হওয়ার নির্ধারিত একটি সময়ও বেঁধে দিলেন। সে কাফেলার সামনে যে উটটি চলছিল তারও কিছু লক্ষণ ও আলামত বলে দিলেন। পরবর্তী সময়ে সবকিছু হুবহু তা-ই দেখা গিয়েছিল যেমন তিনি বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে তাদের পলায়নই বৃদ্ধি পেল। আর যালিমরা কুফরী ব্যতীত সবকিছু অস্বীকার করল।[২৬৫]

কথিত আছে, যখন সকল মানুষ ইসরা ও মি'রাজের এ ঘটনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. বিনাবাক্যে একে সত্যায়ন করেছিলেন। আর তখন তাকে 'সিদ্দীক' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।[২৬৬]

এই বিশেষ আসমানী সফরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হিকমত ও কারণ ছিল আল্লাহ তাআলার বাণী لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا (যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই) এর সফল বাস্তবায়ন। আর এটা আম্বিয়ায়ে কেরামের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে চলে আসা আল্লাহর রীতি ও নীতি। যেমন তিনি ইবরাহীম আ. সম্পর্কে ইরশাদ করেন, وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِينَ. আমি এরূপ ভাবেই ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম-যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় [সূরা আনআম:৭৫]

---

[২৬৫] যাদুল মাআদ ১/৪৮। আরও দেখুন সহীহ বুখারী ২/৬৮৪। সহীহ মুসলিম ১/৯৬। ইবনে হিশাম ১/৪০২, ৪০৩।

[২৬৬] ইবনে হিশাম ১/৩৯৯।

তেমনিভাবে মূসা আ. সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى এটা এ জন্য যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই [সূরা তোয়াহা : ২৩]

পাশাপাশি এই বিশেষ সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও কুরআনে কারীমে বলে দেওয়া হয়েছে ঠিক এভাবে: وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায় । এভাবে আল্লাহর কুদরতের অপার নিদর্শনাবলির পরিদর্শন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের ইলমের সঙ্গে যোগ হয় তখন আল্লাহর ওপর তাদের এমন নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়ে যায়, যা পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। আর এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, কানে শোনা চোখে দেখার মতো নয়। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর রাস্তায় যতটা কুরবানী করতে পারেন; যতটা কষ্ট ও মুসিবত ভোগ করতে পারেন পৃথিবীর অন্য কোনো বনী আদম তা পারে না। আর তখন পুরো দুনিয়ার সকল শক্তি ও ক্ষমতা তাদের কাছে একটি মশার ডানার মতো দুর্বল ও তুচ্ছ মনে হয়। যে কারণে তাদের পক্ষ থেকে আসা সম্ভাব্য যুলুম ও নির্যাতন আর কষ্ট ও তাকলীফের প্রতি তারা কোনো দিনও ভ্রুক্ষেপ করেন না।

এই সফরের পরতে পরতে যে সকল হিকমত ও সুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সেগুলো আলোচনার স্থান নয়; বরং সেগুলোর জন্য রয়েছে শরীয়তের গোপন তত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থ। তবে আমাদের চোখের সামনে অনেক সাধারণ ও সরল বাস্তবতাও এমন রয়েছে, যা এই মুবারক সফরের ঝরনাধারা থেকে উৎসারিত হয়; এরপর তা বহমান প্রচণ্ড স্রোতধারায় পরিণত হয়; সমান তালে আর প্রবল বেগ ও আবেগ নিয়ে ছুটে চলে সীরাতে নববীর পুষ্পোদ্যানের দিকে। এখানে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি:

বিচক্ষণ পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন আল্লাহ তাআলা কুরআনের কারীমে সূরা বনী ইসরাঈলের কেবল একটি আয়াতেই ইসরার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি ইহুদি জাতির অন্যায় ও অপরাধ আর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এরপর তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নিশ্চয়ই এই কুরআন কেবল ঐ পথেরই দিশা দেয়, যা সত্য ও সঠিক। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে কখনো কখনো পাঠক এ আয়াতদুটির মাঝে বৈসাদৃশ্য দেখতে পাবেন। হয়তো তার মনে হবে এদুটির মাঝে কোনো মেলবন্ধন নেই। অথচ বাস্তবতা কিন্তু মোটেও এমন নয়। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর বর্ণনার এ নতুন ঢঙ আর রঙের মাধ্যমে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইসরা হয়েছে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে। আর ইহুদি জাতি নিকট ভবিষ্যতে খুব তাড়াতাড়িই

বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের আসন হারিয়ে ফেলবে। ছিটকে পড়বে সভ্যতার প্রশস্ত রাজপথ থেকে। কেননা, তারা এমন সব জঘন্য অন্যায় আর অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে তারা এ আসনে অধিষ্ঠিত থাকার সব রকমের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন সক্রিয়ভাবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এ আসনে অভিষেক হবে তাঁর প্রিয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। দীনে ইবরাহীমের প্রধান উভয় কেন্দ্রের চাবিই আল্লাহ তাআলা এখন তাঁর হাতে তুলে দিবেন। সুতরাং এখন এক নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন হবে। এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে। যে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক নেতৃত্বেরও পট পরিবর্তন হবে। হাত বদল হয়ে এক জাতি থেকে তা অন্য জাতির কাছে চলে যাবে। কারণ, এর নেতৃত্ব ও কর্তত্ব ছিল এমন একটি জাতির হাতে; বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানতের দ্বারা যে জাতি তার ইতিহাস ভরে রেখেছিল। যে জাতির প্রতিটি কদমে কদমে গাদ্দারি আর ধোঁকাবাজির ছাপ ছিল। সুতরাং, এ বিশাল গুরুত্বপূর্ণ আমানত আর তাদের হাতে থাকতে পারে না; বরং তা চলে যাবে এমন এক জাতির কাছে ভালো আর কল্যাণে উথলে ওঠা সমুদ্রে যে জাতি সর্বদা সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। যে জাতির প্রতিটি অঙ্গ থেকে খায়র আর বরকতের সুমিষ্ট রসধারা চুইয়ে পড়ছিল। যে জাতির নবীর কাছে আজও সেই কুরআনে কারীমের ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল যেই কুরআনে কারীম সরল ও সত্য পথের দিশারী।

কিন্তু নেতৃত্বের সিংহাসনে এখন যে জাতির অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর রাসূল তো আজও মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে আর গিরি-কন্দরে পথহারা পথিকের ন্যায় মানুষের দ্বারে দ্বারে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিলেন। সুতরাং, কীভাবে আসবে নেতৃত্বের সেই পরিবর্তন? কী হবে তার রূপরেখা? আর এটা সম্ভবও বা কীরূপে? এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে আরেকটি বাস্তবতা মেলে ও তুলে ধরে। আর তা হলো, এতদিন ধরে এ জাতির যে যুগ চলে আসছিল এখন সে যুগের পতন ঘটতে যাচ্ছে। এ জাতির এখন খোলস বদল ঘটবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম যুগের যবনিকাপাত ঘটেছে। এখন বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এসে হাযির হবে আরেকটি নতুন যুগ। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে শোনা যাবে এক নয়া অধ্যায়ের আগমনী বার্তা। এটা হবে এমন এক নতুন যুগ; এমন এক নয়া অধ্যায়, যা তার আকার ও আদলে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুরনো যুগ আর প্রাচীন অধ্যায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যার স্রোতধারা ভিন্ন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হবে। এ কারণেই তো এ সময়কার কিছু আয়াতে আমরা দেখতে পাই মুশরিকদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট কণ্ঠের ধমক। ইরশাদ হয়েছে: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

(১৭) وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করি অতঃপর তারা পাপাচারে মেতে ওঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর উপর আদেশ অবধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে সমূলে ধ্বংস করে দিই। নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট। [সূরা বনী ইসরাঈল : ১৬-১৭]

এর পাশাপাশি এ সময়কার বহু আয়াতে মুসলমানদের জন্য তাদের সভ্যতার মৌলিক রূপ-রেখা আর মূলনীতিগুলি বাতলে দেওয়া হয়; যার ওপর গড়ে উঠতে যাচ্ছে নতুন ইসলামী সভ্যতার গগণচুম্বী ইমারত। যেন তারা আল্লাহর দুনিয়ার এমন কোনো ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে জীবনের সব দিক তাদের আয়ত্তাধীন রয়েছে। যেখানে তাদের সকলের মিলনে এমন একটি মেলবন্ধন কায়েম হয়েছে, যা তাকে এক নতুন সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুর মর্যাদা দান করেছে। সুতরাং এর মধ্যেই ইঙ্গিত ছিল যে, অতি শীঘ্রই তিনি এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল আর মজবুত শরণশিবির পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে বসে তাঁর সকল কাজ সুস্থির ও সুসম্পন্ন হবে। যা পরিণত হবে বিস্তীর্ণ দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার প্রধান মারকায। এটাই ছিল এ মুবারক সফরের পেছনে লুক্কায়িত সুপ্ত রহস্য! আমাদের আলোচনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই আমরা এখানে এ সম্পর্কে আলোচনা করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আর এমন কিছু হিকমত আর সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের কারণেই মনে হয় ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল আক্বাবার প্রথম বাইআতের সামান্য আগে কিংবা আক্বাবার দুই বাইআতের মধ্যবর্তী সময়ে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আক্বাবার প্রথম বাইআত

আমরা আগেই বলে এসেছি, নবুওতের একাদশ বছরের হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্য থেকে ছয়জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাঁর রিসালতকে নিজ নিজ কওমের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওয়াদা করেছিল।

এর ফলাফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, পরের বছর তথা নবুওতের দ্বাদশ বছর মোতাবেক ঈসায়ী ৬২১ সালের জুলাই মাসে হজ্জের মৌসুমে ইয়াসরিব থেকে বারো জন লোক মক্কায় আগমন করেন। তাদের মধ্য থেকে পাঁচজন ছিলেন এমন যারা গত বছর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাদের ষষ্ঠ জন জাবের বিন আব্দুল্লাহ বিন রেয়াব এ বছর উপস্থিত ছিলেন না। নতুন করে যারা এসেছিলেন তারা হলেন:

এক. বনু নাজ্জার গোত্রের আফরার ছেলে মুআয বিন হারিস রা.

দুই. বনু যুরাইকের যাকওয়ান বিন আব্দুল কায়স

তিন. বনু গনমের ওবাদা বিন সামিত আনসারী

চার. বনু গনমের মিত্র গোত্রের ইয়াযীদ বিন ছা'লাবা

পাঁচ. বনু সালিমের আব্বাস বিন ওবাদা বিন নাজলা

ছয়. বনু আব্দুল আশহালের আবুল হাইছাম বিন তায়্যাহান

সাত. বনু আমর বিন আওফের উয়াইম বিন সায়িদা

উল্লিখিত ব্যক্তিদের কেবল শেষোক্ত দুই জন ছিলেন আউস গোত্রের আর অবশিষ্ট সবাই ছিলেন খাযরাজের।[২৬৭]

তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মীনার নিকটবর্তী একটি ঘাঁটিতে সাক্ষাৎ করেন। এরপরে তাঁর হাতে ঠিক সে সকল বিষয়ের ওপর বাইয়াত হন, যে সকল বিষয়ের ওপর হুদাইবিয়ার পরে মক্কা বিজয়ের সময় নারীরা বাইয়াত হয়েছিল।

উবাদা বিন সামিত রা. থেকে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **তোমরা আমার হাতে এ বিষয়ে বাইয়াত হও যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছু শরীক করবে না। তোমরা চুরি করবে না। ব্যভিচার করবে না। নিজেদের সন্তানদেরকে তোমরা হত্যা করবে না। অযথা তোমরা কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ লাগাবে না। সৎ কাজে আমার**

---

২৬৭ ইবনে হিশাম ১/৪৩১-৪৩৩।

অবাধ্য হবে না। সুতরাং, তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এসব অঙ্গীকার পূর্ণ করবে তার পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর তাআলার কাছে। আর যে এগুলোর কোনোটিতে খেয়ানত করবে এবং তাকে দুনিয়াতে সে কারণে শাস্তি দেওয়া হবে তবে এটা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি কেউ খেয়ানত করে এবং আল্লাহ তাআলা সেটা লুকিয়ে রাখেন তবে সেটা আল্লাহর ব্যাপার; চাইলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন আবার চাইলে মাফও করে দিতে পারেন। উবাদা রা. বলেন, এরপর আমি বা আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত হই।[২৬৮]

মদীনায় ইসলামের অগ্রদূত

বাইয়াত পূর্ণ হওয়ার পাশাপাশি যখন হজ্জের মৌসুমও শেষ হয়ে গেল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এ সকল বাইআতগ্রহণকারী সাহাবীর সঙ্গে ইয়াসরিবে ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম দূত প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সেখানে তাদেরকে ইসলামী শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন। তাদেরকে দীনি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে গভীর প্রাজ্ঞ করে তুলবেন এবং এখনো যারা পৌত্তলিকতা ও শিরকের অন্ধকার কারায় হা-হুতাশ করে মরছে তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরবেন। এ উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের প্রথমিক সারি থেকে একজন প্রাণোদ্দীপ্ত নওজোয়ানকে বেছে নিলেন। আর তিনি ছিলেন মুসআব বিন উমাইর আবদারী রা.।

ঈর্ষণীয় সাফল্য

মুসআব বিন উমাইর রা. ইয়াসরিবে গিয়ে আসআদ বিন যুরারা রা. এর গৃহে অবতরণ করলেন। এরপরে উভয়ে মিলে পরম আবেগ আর উৎসাহের সঙ্গে ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলামের প্রচার-প্রসারের কাজ চালাতে লাগলেন। ইয়াসরিবের মানুষের কাছে মুসআব বিন উমাইর রা. পরিচিত ছিলেন 'ক্বারী' হিসেবে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাঁর সফলতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো: আসআদ বিন যুরারা রা. একদিন তাকে নিয়ে বনু আব্দুল আশহাল ও বনু যফরের মহল্লায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে তারা বনু যফরের একটি বাগানে মারাক নামক একটি কূপের পাশে বিশ্রামের জন্য বসে পড়লেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে মুসলমানদের এক বিরাট সমাবেশ কায়েম হয়ে গেল। কিন্তু বনু আব্দুল আশহালের দুই সরদার সাদ বিন মুআয ও উসাইদ বিন হুযাইর তখনও শিরকের অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন। যখন এ সংবাদ তাদের কানে গেল তখন সাদ বিন

---

২৬৮ সহীহ বুখারী: ঈমানের আলামত আনসারদের প্রেম ১/৭, আনসার প্রতিনিধি অধ্যায় ১/৫৫০,৫৫১, উল্লিখিত বর্ণনা এ অধ্যায় থেকে অবচয়িত।

মুআয উসাইদকে বললেন, আমাদের সরল সাধারণ মানুষগুলিকে বেকুব বানানোর জন্য এখানে যে ধূর্তদুটির আগমন ঘটেছে জলদি তাদের কাছে গিয়ে বড় করে একটা ধমক লাগান। ভবিষ্যতে আবার তাদেরকে আমাদের মহল্লায় আসতে নিষেধ করে দিন। আসআদ বিন যুরারা হলো আমার খালাতো ভাই; সে যদি না থাকত তবে আপনার বদলে আমিই সেখানে যেতাম।

উসাইদ তখন হাতিয়ার কাঁধে তুলে তাদের কাছে ছুটে গেলেন। আসআদ বিন যুরারা রা. তাকে দেখা মাত্রই মুসআব রা. কে বললেন, ঐ যে তাদের কওমের সরদার আপনার নিকট আসছেন। সুতরাং, তাঁর সঙ্গে আপনি সততা ও সত্যতা অবলম্বন করুন! মুসআব রা. বললেন, যদি তিনি বসেন তবেই আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলব। উসাইদ এসেই তাদেরকে গালিগালাজ করতে লাগলেন। অতঃপর বললেন তোমরা এখানে কেন এসেছ? তোমরা আমাদের দুর্বল ও কমযোরদেরকে বোকা বানানোর জন্য এসেছ? যদি নিজেদের জীবনের প্রতি মনে সামান্য মায়া ও দরদও থাকে তবে তাড়াতাড়ি এখান থেকে ভাগো! তখন মুসআব রা. তাকে বললেন, দয়া করে একটু বসে আমার কথা শুনুন! যদি ভালো লাগে তাহলে গ্রহণ করবেন আর যদি ভালো না লাগে তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। তখন তিনি বললেন তুমি ঠিক কথাই বলেছ। এরপরে তিনি কাঁধ থেকে হাতিয়ার নামিয়ে মুসআব বিন উমাইর রা. এর পাশে বসে গেলেন। হযরত মুসআব বিন উমাইর রা. এবার তার সামনে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করলেন। তাঁর সামনে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! তিনি কিছু বলার আগেই আমি তাঁর চেহারায় ইসলামের ঝিলিমিলি ফুটে উঠতে দেখেছিলাম! যেন তা তাঁর চেহারায় বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি করে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, বাহ কী অপরূপ! কী সুন্দর!! আপনারা যখন এ দীনে কাউকে দীক্ষিত করার ইচ্ছা করেন তখন আপনারা কী করেন?

তারা বললেন, আপনি প্রথমে গোসল করে নিন। আপনার পরনের পোশাক পবিত্র করে নিন। এরপরে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিন। পরক্ষণে দুই রাকাআত নামায আদায় করুন!

তাদের কথা অনুযায়ী উসাইদ দাঁড়িয়ে গিয়ে প্রথমে গোসল করে নিলেন। কাপড় পবিত্র করে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে সাক্ষ্য দিলেন। তারপর দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। অতঃপর বললেন, আমার পেছনে আরেক এমন ব্যক্তি রয়েছেন তিনি যদি আপনাদের অনুসরণ করেন তবে তাঁর কওমের আর কেউ বাকি থাকবে না। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে তাঁর ঠিকানা বলে দিব-আর তিনি হলেন সাদ বিন মুআয। এরপরে তিনি তাঁর হাতিয়ার নিয়ে সাদ বিন মুআযের কাছে চলে গেলেন। তিনি তখন তাঁর কওমের লোকের সঙ্গে এক জনসমাবেশের মধ্যে ছিলেন। সাদ

তাকে দেখেই বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! উসাইদ যেই চেহারা নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিল সেই চেহারা নিয়ে ফিরে আসেনি।

এরপর উসাইদ রা. যখন সমাবেশের পাশে এসে দাঁড়ালেন তখন সাদ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো কী হয়েছে? তিনি বললেন আমি তাদের উভয়ের সঙ্গেই কথা বলেছি। আল্লাহর কসম! আমি তাদের কারও মধ্যে কোনো খারাবি দেখতে পাইনি। আমি তাদেরকে নিষেধ করে দিয়েছিলাম কিন্তু তারা বলল, আপনি যা চান তা-ই হবে।

আমি আরও জানতে পেরেছি যে, বনু হারিসার লোকজন আসআদ বিন যুরারাকে হত্যা করার জন্য গিয়েছিল। তার কারণ ছিল, তারা জানতে পেরেছে যে, আসআদ হলো আপনার খালাতো ভাই। এভাবে তারা আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। সাদ এ কথা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে তিনি পলকে দাঁড়িয়ে যান। হাতিয়ার নিয়ে দৌড়ে যান তাদের কাছে। যখন তিনি কাছে গিয়ে তাদেরকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত বসা পেলেন তখন বুঝতে পারলেন যে, উসাইদেরও অভিরুচি এই ছিল যে, আমি নিজেই এসে তাদের কথা শুনি। তখন তিনি তাদেরকে বিভিন্ন গালমন্দ করতে লাগলেন। এরপর আসআদ বিন যুরারা রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম হে আবু উমামা! যদি আমার আর তোমার মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন না থাকত তবে আমার থেকে তার আশা কোনো দিনও করতে পারতে না। তোমরা আমাদের এলাকায় এসে এমন এমন কাজ করে যাচ্ছ যা কোনো দিনও আমরা সহ্য করতে পারব না।

এদিকে আসআদ বিন যুরারা রা. মুসআব বিন উমাইর রা. কে প্রথমেই বলে দিয়েছিলেন, আল্লাহর কসম! আপনার কাছে এখন এমন এক ব্যক্তি এসেছেন, যিনি তাঁর কওমের সরদার; যার পেছনে তাঁর কওম ছায়ার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। যদি তিনি আপনার অনুগত হন, তবে তাঁর কওমের একটি লোকও তা থেকে পেছনে বসে থাকবে না। তখন মুসআব বিন উমাইর রা. সাদ বিন মুআযকে লক্ষ্য করে বললেন, আমার পাশে বসে দুটি কথা শুনুন! যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে গ্রহণ করবেন, নচেৎ আপনার যা পছন্দ নয়, তা আমরা আপনার কাছে বলব না। সাদ বললেন : ঠিক আছে বলুন! এরপর তিনি হাতিয়ার রেখে তাঁর পাশে বসে গেলেন।

মুসআব বিন উমাইর রা. তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন। এরপর কুরআনে কারীমের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর কসম! তিনি কথা বলার আগেই আমরা তাঁর চেহারায় ঈমানের ঝিলিক প্রত্যক্ষ করছিলাম। তাতে হেদায়াতের দমকা হাওয়ার পরশ অনুভব করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন আপনারা যখন কাউকে ধর্মে দাখিল করতে চান তখন কী কী করে থাকেন? তারা বললেন, আপনি প্রথমে গোসল করে নিন। এরপর কাপড় পবিত্র করে নিয়ে হক্বের সাক্ষ্য দিন। অনন্তর দুই রাকাআত নামায আদায় করেন।

সাদ বিন মুআয রা. ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। এরপর তারা যা কিছু বলেছিলেন তা করলেন।

সবকিছু সেরে হাতিয়ার কাঁধে নিয়ে সাদ বিন মুআয রা. তার কওমের লোকদের কাছে ফিরে গেলেন। তারা তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠল আল্লাহর কসম! তিনি যেই চেহারা নিয়ে গিয়েছিলেন সেই চেহারা নিয়ে ফিরে আসেননি।

তিনি সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বনু আব্দুল আশহাল! তোমরা তোমাদের অভ্যন্তরে আমার কাজ-কর্ম কোন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করো? উপস্থিত সকলে বলল, আপনি আমাদের সরদার; আমাদের সকলের চেয়ে সর্বাপেক্ষা বেশি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। আমাদের সকলের মান্যগণ্য অগ্রদূত। তিনি বললেন, শুনে রাখো! যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের ওপর ঈমান আনবে ততক্ষণ তোমাদের নারী-পুরুষের সঙ্গে আমার কোনো ধরনের কথাবার্তা বলা হারাম। তাঁর এ কথা এতটা প্রভাব ফেলল আর ফলপ্রসূ হল যে, দিনের শেষে সন্ধ্যা নামার আগেই সে কওমের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নিলো। একমাত্র উসাইরিম ছাড়া পুরো কওমে অমুসলিম বলতে কেউ বাকি রইল না। আর উসাইরিমের ইসলাম গ্রহণ উহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। পরিশেষে সেদিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করে জিহাদের অগ্নিভরা তপ্ত রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং মৃত্যুর সুপেয় পেয়ালায় অধর রেখে শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেন। আল্লাহর কুদরতি কদমে একটি বারের জন্য মাথা রেখে সিজদা করার সুযোগ পেলেন না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বললেন, **সে কম পরিশ্রমে বেশি পারিশ্রমিক পেয়ে গেল।**

অপরদিকে মুসআব বিন উমাইর রা. আসআদ বিন যুরারা রা. এর ঘরে বসেই মানুষদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হলো যে, গোটা ইয়াসরিবে এমন কোনো আনসারীর ঘর ছিল না, যে ঘরে একাধিক সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষ পাওয়া যেত না। কেবল বনু উমাইয়্যা বিন যায়েদ, খাতমা ও ওয়ায়েল ছিল এর ব্যতিক্রম। তাদের মধ্যে মান্যগণ্য ছিলেন কবি কায়স বিন আসলাত। তিনি হিজরী পঞ্চম সালের গাযওয়ায়ে খন্দক পর্যন্ত তাঁর কওমের লোকদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখেন।

পরের বছর তথা নবুওতের ত্রয়োদশ বছরের হজ্জের মৌসুম আসার আগেই মুসআব বিন উমাইর রা. মক্কায় রাসূলে কারীম সা এর নিকট ফিরে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাকে এই সুবিশাল বিজয় সফলতার সুসংবাদ দেওয়া। ইয়াসরিবের কওমগুলির অবস্থা তাঁর সামনে তুলে ধরা এবং তাদের মধ্যে কল্যাণ ও মঙ্গল আর শক্তি ও সামর্থ্যের যে বিশাল ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া।[২৬৯]

---

[২৬৯] ইবনে হিশাম ১/৪৩৫-৪৩৮, ২/৯০। যাদুল মাআদ ২/৫১।

আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াত

নবুওতের ত্রয়োদশ বছর মোতাবেক ঈসায়ী ৬২২ সালের জুন মাসে হজ্জের মৌসুমে আহলে ইয়াসরিবের মধ্য থেকে সত্তরের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি মুসলমান হজ্জ আদায়ের নিমিত্ত মক্কায় আগমন করেন। তারা তাদের কওমের মুশরিক হাজীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এসেছিলেন। ইয়াসরিবের অভ্যন্তরে কিংবা মক্কায় আসার পথেই তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন আর কত কাল আমরা আল্লাহর রাসূলকে মক্কার পাহাড়-পর্বতে আর গিরি-কন্দরে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় গলা ধাক্কা খেতে দিব?

মক্কায় পৌঁছার পরে তাদের মাঝে আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাঝে গোপনে কথা-বার্তা আর যোগাযোগ চলতে লাগল। এরই সূত্র ধরে উভয় পক্ষ একমত হলেন যে, আইয়্যামে তাশরীকের মাঝখানের দিন তথা ১২ যিলহজ্জ মীনার জামরায়ে উলা যেখানে অবস্থিত সেখানকার আকাবার কাছে পাহাড়ী ঘাঁটিতে মিলিত হবেন। আর তাদের এ মিলন হবে গভীর রাতে; যখন চারদিকে থাকবে রাজ্যের অন্ধকার।

চলুন আমরা এই ঐতিহাসিক মিলনের কাহিনী আনসারদের একজন নেতার মুখে শুনি! কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে এটা ছিল সেই ঐতিহাসিক মিলন ও ইজতেমা যা পৌত্তলিকতা আর ইসলামের মাঝের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-কালের স্রোতের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কাব বিন মালিক আনসারী রা. বলেন, আমরা হজ্জের জন্য মক্কায় গেলাম। সেখানে আমরা রাসূলে কারীম সা এর সঙ্গে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝখানের দিন আক্বাবার কাছের পাহাড়ী ঘাঁটিতে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলাম। যে দিন আমাদের হজ্জের কার্যক্রম শেষ হলো সে দিন রাতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আমাদের মিলিত হওয়ার কথা ছিল। আর আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের কওমের এক সরদার ও শরীফ লোক-আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম। কেবল তাকেই আমরা আমাদের সঙ্গে নিলাম; নচেৎ আমাদের মধ্যে যারা মুশরিক ছিল তাদের কাছ থেকে আমরা ব্যাপারটি সম্পূর্ণ চেপে গেলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বললাম এবং তাকে বললাম, আবু জাবের! আপনি আমাদের একজন সরদার! আমাদের ভেতরে অন্যতম শরীফ লোক। আমরা তাই কোনো দিনও চাই না যে, আগামী কাল আপনি জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হন! এরপর আমরা তাকে ইসলামের দিকে ডাকলাম। আক্বাবার কাছের ঘাঁটিতে আঁধার রাতের কোলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আমাদের মিলন হওয়ার কথা বললাম।

কাব রা. বলেন, তখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমাদের সঙ্গে আক্বাবায় সমবেত হন এবং পরিশেষে নকীব নিযুক্ত হন।

কা'ব রা. বলেন, সে রাতে আমাদের কওমের সকলে যে যার তাঁবুতে শুয়ে পড়লাম। অতঃপর যখন রাতের প্রথম প্রহর শেষ হলো তখন আমরা উঠে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে প্রতিশ্রুত সময়ে ও স্থানে মিলিত হওয়া জন্য প্রস্তুত হলাম। ছোট্ট চড়ুই পাখি আপন নীড় থেকে যেমন অতি সন্তর্পণে চুপটি মেরে বেরিয়ে আসে ঠিক তেমন আমরাও আমাদের তাঁবুগুলো থেকে সতর্ক পদক্ষেপে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। এভাবে চলতে চলতে আমরা আক্বাবার কাছাকাছি প্রতিশ্রুত ঘাঁটিতে গিয়ে সমবেত হলাম। সংখ্যায় আমরা ছিলাম তেয়াত্তর জন পুরুষ আর দু'জন নারী। তারা ছিলেন বনু মাযেন বিন নাজ্জারের নুসাইবা বিনতে কাব তথা উম্মে উমারা আর বনু সালামার আসমা বিনতে আমরা তথা উম্মে মানী'।

এরপর আমরা সবাই মিলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সামান্য কিছুক্ষণ পরেই তাঁর আগমন ঘটল। সঙ্গে ছিলেন চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব। যদিও তখনও তিনি বাপ-দাদার ধর্মের ওপর ছিলেন কিন্তু আপন ভাতিজার প্রতি তাঁর মুহাব্বাত ও ভালোবাসার টান তাকে এখানে নিয়ে এলো-উদ্দেশ্য ছিল ভাতিজার জীবনের অতিগুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়গুলোতে তাঁর সঙ্গ দিবেন এবং চোখ কান খোলা রেখে সব কাজ করবেন। তিনিই সর্বপ্রথম কথাবার্তা শুরু করেছিলেন।[২৭০]

কথপোকথন শুরু : আব্বাস রা. বলে দিলেন দায়িত্বের ভয়াবহতা

যখন সকলে মজলিসে সুস্থির ও সুন্দরভাবে বসে গেলেন তখন ধর্মীয় ও সামরিক মৈত্রী গড়ে তোলার ব্যাপারে কথোপকথন শুরু হলো। সর্বপ্রথম কথা বলা শুরু করলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব। তার কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের সামনে সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা এই মৈত্রী চুক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে কী কী গুরুত্বদায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চেপে বসবে? আর তাতে বিপদের পরিমাণ ও ভয়াবহতা কতটা বেড়ে যাবে। তাই তিনি বললেন,

' হে খাযরাজ সম্প্রদায়! (উল্লেখ্য আরবরা মদীনার আনসারদের আউস ও খাযরাজ উভয়কে গোত্রকেই খাযরাজ বলে ডাকত ।) আমাদের মধ্যে মুহাম্মাদের অবস্থান কোথায় তা তোমরা ভালো করেই জানো। আমাদের মধ্য থেকে যারা আমাদের মতো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তাদের থেকে আমরা তাকে মাহফূয

---

[২৭০] ইবনে হিশাম ১/৪৪০, ৪৪১।

রেখেছি। সুতরাং, তিনি ইয্যতের সঙ্গে নির্বিঘ্নে নিজ শহরে জীবন যাপন করে যাচ্ছেন। কিন্তু এখন তিনি তোমাদের কাছে যাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সুতরাং, তোমরা ভালো করে ভেবে দেখো! যদি তোমরা তার সঙ্গে কৃত ওয়াদা একশ' তে একশ' পূরণ করতে পারো এবং তাকে দুশমনের সব ধরনের দুশমনি থেকে হেফাযত করতে পারো তবে তোমরা তাকে নিয়ে যেতে পারো। আর যদি তোমরা মনে করো যে, নিজ ভিটে-মাটি সবকিছু ত্যাগ করে তোমাদের কাছে চলে যাওয়ার পরে তোমরা তাকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিবে কিংবা তাকে অপমান করবে তবে তা এখনই বলে দাও! তাকে নিয়ে যাওয়ার মনোবাঞ্ছা পরিত্যাগ করো। কেননা তিনি তাঁর কওমের মধ্যে ইজ্জত ও হেফাযতের সঙ্গেই বেঁচে আছেন।

কা'ব রা. বলেন, আমরা তাকে বললাম, আপনার বক্তব্য আমরা শুনেছি। সুতরাং, হে আল্লাহর রাসূল! এখন আপনি কথা বলুন! আপনার যা পছন্দ আপনার নিজের জন্য আর আপনার রবের জন্য গ্রহণ করুন।[২৭১]

আনসারদের এ জবাব দ্বারা বোঝা যায় এ বিশাল গুরুদায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কতটা বীরত্ব ও সাহসিকতা, সুদৃঢ় সংকল্প আর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বক্তব্য পেশ করলেন এবং এভাবে বাইয়াত গ্রহণ সম্পন্ন হলো।

বাইয়াতের শর্তাবলী

ইমাম আহমদ র. জাবের রা. থেকে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। জাবের রা. বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীসের ওপর বাইয়াত হব? তিনি বললেন,

অলসতা উদ্দামতা সর্বাবস্থায় তাঁর কথা শুনবে ও মান্য করবে।

সচ্ছলতা অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।

সৎকাজের আদেশ দিবে আর অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে।

আল্লাহর পথে দাঁড়াবে; এ ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না।

আমি যখন তোমাদের মাঝে আসব তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। যা থেকে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের পরিবার পরিজন ও স্ত্রী-পুত্রকে হেফাযত করো আমাকেও তা থেকে হেফাযত করবে। আর তোমরা জান্নাত লাভ করবে।[২৭২]

---

[২৭১] ইবনে হিশাম ১/৪৪১, ৪৪২।

[২৭২] হাসান সূত্রে ইমাম আহমদ র. এর বর্ণনা ৩/৩২২। বাইহাক্বী র. সংকলিত সুনানে কুবরা ৯/৯। হাকিম ও ইবনে হিব্বান এটাকে সহীহ বলেছেন। এ ধরনের একটি বর্ণনা ইবনে ইসহাক উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখানে আরেকটি শর্ত অতিরিক্ত আছে আর তা হলো- কোনো ব্যাপারে তার যোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাদ করবে না। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৪৫৪।

হযরত কা'ব রা. থেকে ইবনে ইসহাক যে রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন তাতে কেবল শেষোক্ত শর্তটিরই উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে উল্লেখ করা হয়: কা'ব রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কথা বলা শুরু করলেন। তিনি সর্বপ্রথম কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করেন। এরপর তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন। ইসলামের প্রতি তাদেরকে প্রেরণাদীপ্ত করে তুললেন। অতঃপর তাদের উদ্দেশে বললেন, **'আমি তোমাদেরকে এর ওপর বাইয়াত করছি যে, তোমরা আমাকে তা থেকে রক্ষা করবে যা থেকে তোমরা নিজেদের স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানদেরকে রক্ষা করো'**। তখন বারা বিন মা'রূর রা. তার হাত ধরে বললেন, হাঁ! ঐ আল্লাহর শপথ যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন আমরা নিজেদের সন্তানদেরকে যা থেকে রক্ষা করি আপনাকেও তার সবকিছু থেকে রক্ষা করব। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! জন্ম সূত্রেই আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ সমর-জয়ী জাতি; তীর আর তরবারি আমাদের হাতের নিত্যদিনের খেলনা। বংশ পরম্পরায় পাওয়া এ আমাদের সহজাত উত্তরাধিকার।

বারার কথা থামিয়ে দিয়ে আবুল হাইসাম বিন তাইহান রা. বলে ওঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ও কিছু লোকের (তথা ইহুদি) মাঝে মৈত্রী বন্ধন রয়েছে; কিন্তু এখন কেবল আপনার জন্যই আমরা সে বন্ধন ছিন্ন করতে যাচ্ছি। এখন কথা হলো আমরা আমাদের এ বন্ধন কাটার পরে আল্লাহ তাআলা যখন আপনাকে বিজয় দান করবেন তখন আপনি কি আমাদেরকে ফেলে আপনার স্বজাতির কাছে চলে যাবেন?

মুচকি হাসির এক অপূর্ব ঝিলিক খেলে গেল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী বদনে। তার পবিত্র যবান থেকে বেরিয়ে এলো **'তোমাদের রক্তই আমার রক্ত; তোমাদের সর্বনাশই আমার সর্বনাশ। আমি তোমাদের একজন আর তোমরাও আমার একজন। তোমরা যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। আর তোমরা যার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করবে আমিও তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করবো'**। [২৭৩]

যখন বাইয়াতের শর্তাবলির ব্যাপারে কথা চূড়ান্ত হলো; উপস্থিত মুসলমানরা বাইয়াত করার ব্যাপারে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন নুবওতের একাদশ ও দ্বাদশ বছরে হজ্জের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কাফেলার দুই সদস্য দাঁড়ালেন। তারা ধারাবাহিকভাবে একজনের পর অপর জন উঠলেন। উদ্দেশ্য ছিল স্বীয় কওমকে এই সুবিশাল দায়িত্বের খতরা আর ভয়াবহতা সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ ও সচেতন করে তোলা। তাদেরকে বলে দেওয়া, বাইয়াত করলে পূর্ণ কানখাড়া আর

---

[২৭৩] ইবনে হিশাম ১/৪৪২।

জাগ্রত হৃদয় নিয়েই করো। পরবর্তী সময়ে এর ফলে তোমাদেরকে জান আর মালের যে কুরবানী দিতে হবে তা গোড়াতেই মনে রেখো এবং এর জন্য প্রস্তুত থেকো।

ইবনে ইসহাক বলেন, যখন তারা বাইয়াত হওয়ার ওপর সর্বসম্মতি প্রকাশ করল তখন আব্বাস বিন উবাদা বিন নাজলা উপস্থিত সবার উদ্দেশে বললেন, তোমরা কি জানো এই মানুষটির হাতে তোমরা কীসের ওপর বাইয়াত হতে যাচ্ছ? তারা বলল, হাঁ! আমরা ভালোভাবেই জানি। তিনি বললেন, তোমরা এর মাধ্যমে গোটা দুনিয়ার লাল আর কালো মানুষগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছ। এখন গভীরভাবে ভেবে দেখো, যদি অবস্থা এমন হয় যে, যদি তোমাদের অর্থ-সম্পদ সবকিছু হালাক হয়ে যায়, আর তোমাদের কওমের বড় বড় নেতা ও সরদারদের মাথা কাটা যায়; তবে কি তোমরা তাকে দুশমনের হাতে তুলে দিবে? যদি তাই হয় তবে এখনোই বলে দাও। কারণ, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা এমন করো তবে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানই খোয়া যাবে। তোমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে লাঞ্ছনা আর যিল্লতির পাহাড়। আর যদি তোমরা এমন মনে করো যে,সহায় সম্পদ আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হারিয়েও তোমরা তাঁর সঙ্গে তোমাদের কৃত ওয়াদা ও প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারবে তবে আল্লাহর কসম! তাতেই রয়েছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের ফালাহ ও সফলতা।

তারা বললেন, আমরা ধন-সম্পদের আপদ সহ্য করে আর আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে হারিয়েও তাকে ধরে রাখতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল! এ প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে এর বদৌলতে আমাদের জন্য কী থাকবে? তিনি বললেন, জান্নাত। তখন তাঁরা বললেন, আপনি আপনার হাত বাড়িয়ে দিন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁরা তাঁর হাত ধরে বাইয়াত হলেন। [২৭৪]

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, তখন আমরা বাইয়াতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে বাইয়াত হলেন বয়সে সর্বকনিষ্ঠ আসআদ বিন যুরারা রা.। এরপর তিনি বললেন, হে আহলে ইয়াসরিব! একটু দাঁড়াও। তিনি যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবী-এটা জেনেই তো আমরা শত শত মাইল পথের চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে তাঁর দরবারে এসে হাযির হয়েছি। আর আজ আমরা যে তাকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি এর অর্থ হলো গোটা আরবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা দেওয়া।

---

[২৭৪] ইবনে হিশাম ১/৪৪৬।

তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বলির পাঁঠায় পরিণত করা। আর রক্তঝরা তরবারি নিত্য দিনের হাতের সঙ্গীতে পরিণত করা। সুতরাং, এসব কিছুর ওপর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারো তবে তোমরা বাইয়াত হয়ে যাও। এর প্রতিদান তোমরা তোমাদের রবের কাছে পাবে। আর যদি তোমরা এ ক্ষেত্রে একটুকুও ভীতির শিকার হও তবে সাবধান! তোমরা এখনই এ থেকে পিছু হটে যাও। তখন আল্লাহর কাছে কারণ দর্শানো অধিকতর যুক্তিযুক্ত হবে।[২৭৫]

বাইয়াত সম্পাদন

বাইয়াতের শর্তাবলি স্বীকার করে নেওয়ার পরে যখন উপস্থিত সকলে তাদের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতা আর পূর্ণ অবগতি লাভ করলেন তখন মুসাফাহার মাধ্যমে বাইয়াত সম্পাদনের পালা শুরু হলো। জাবের রা. বলেন, আসআদ বিন যুরারা রা. এর কথা শেষ হলে তারা বলল, আসআদ! ঠিক আছে এবার তোমার হাত সরিয়ে ফেলো! আল্লাহর কসম! আমরা এই বাইয়াত কখনো ছেড়ে দিতে পারব না কিংবা এটা ভঙ্গ করতেও পারব না। [২৭৬]

তখন আসআদ বিন যুরারা রা. বুঝতে পারলেন এ পথে কতটা কুরবানী আর ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্য তার কওম কতখানি প্রস্তুত আছে। আর যেহেতু তিনি হযরত মুসআব বিন উমাইর রা. এর দাওয়াতী কাজের সব সময়ের সঙ্গী ছিলেন, এ কারণে এ বাইয়াতে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। ইবনে ইসহাক বলেন, বনু নাজ্জারের লোকজন মনে করেন, আবু উমামা আসআদ বিন যুরারা রা.ই সর্বপ্রথম রাসূলের হাতে হাত রেখে বাইয়াত হয়েছিলেন।[২৭৭] এরপরে আম ও ব্যাপক বাইয়াত শুরু হয়। জাবের রা. বলেন, অতঃপর আমরা একজনের পর একজন দাঁড়াচ্ছিলাম আর আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাইয়াত নিচ্ছিলেন এবং এর বিনিময়ে তিনি আমাদেরকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন।[২৭৮]

আমাদের সঙ্গে যে দু'জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন তারাও বাইয়াত হলেন। তবে তাদের এ বাইয়াত ছিল মুখে মুখে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দিন গাইরে মাহরাম কোনো মহিলার সঙ্গে মুসাফাহা করেননি।[২৭৯]

---

[২৭৫] জাবের রা. এর হাদীস সূত্রে মুসনাদে আহমদ ৩/৩২২। বাইহাক্বীর সুনানে কুবরা ৯/৯।

[২৭৬] প্রাগুক্ত।

[২৭৭] ইবনে ইসহাক বলেন, আর বনু আব্দুল আশহালের লোকেরা মনে করে, তিনি ছিলেন আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান। আর কা'ব বিন মালিকের মতে, তিনি ছিলেন বারা বিন মা'রূর। (ইবনে হিশাম ১/৪৪৭)। আমি বলব, সম্ভবত তারা রাসূল সা. ও তাদের মাঝের কথাকে বাইয়াত ভেবে নিয়েছেন। নতুবা বাইয়াতের ক্ষেত্রে সকলের আগে ছিলেন তখন আসআদ বিন যুরারা রা.। আল্লাহই ভালো জানেন।

[২৭৮] মুসনাদে ইমাম আহমদ ৩/৩২২।

[২৭৯] দেখুন সহীহ মুসলিম: মহিলাদের বাইয়াত করার পদ্ধতি অধ্যায় ২/১৩১।

ইতিহাসের নকীব যারা

বাইয়াত গ্রহণের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত মুসলমানদের মধ্য থেকে বারো জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বাছাই করে তাদেরকে তাদের কওমের নকীব বানাতে চাইলেন। যারা বাইয়াতের শর্ত অনুযায়ী দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে তাদের কওমের যিম্মাদার ও দায়িত্বশীল হবেন। তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যিম্মাদারি পালনের জন্য বারো জন নকীব বাছাই করে তোমরা আমার নিকট পেশ করো।

উপস্থিত লোকেরা তখনই বারো জন নকীব মনোনীত করলেন। তাদের মধ্য থেকে নয় জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের আর বাকি তিনজন ছিলেন আউসের। নিম্নে তাদের নাম উল্লেখ করা হলো:

খাযরাজের নকীবগণ

১. আসআদ বিন যুরারা বিন আদাস
২. সাদ বিন রবী' বিন আমর
৩. আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা বিন সালাবা
৪. রাফে' বিন মালেক বিন আজলান
৫. বারা বিন মা'রূর বিন সখর
৬. আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম
৭. উবাদা বিন সামিত বিন কায়স
৮. সাদ বিন উবাদা বিন দুলাইম
৯. মুনযির বিন আমর বিন খুনাইস

আউসের নকীবগণ

১. উসাইদ বিন হুযাইর বিন সিমাক
২. সাদ বিন খাইসামা বিন হারিস
৩. রেফাআ বিন আব্দুর মুনযির বিন যুবাইর[২৮০]

এভাবে যখন নকীব বাছাইয়ের পর্ব শেষ হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন এই ভিন্নধর্মী যিম্মাদারি ও দায়িত্ব পালনের ওপর তাদের কাছ থেকে পুনরায় প্রতিশ্রুতি নিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, **তোমরা তোমাদের কওমের যিম্মাদার ও অভিভাবক। যেমন ছিলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের হাওয়ারীগণ। ঠিক আমিও আমার কওম তথা মুসলমানদের**

---

[২৮০] কারও কারও মতে যুবাইর নয়; যুনাইর। আবার কেউ রেফায়ার জায়গায় আবুল হাইসাম ইবনে তাইহানের নাম উল্লেখ করেছেন।

যিম্মাদার ও অভিভাবক। তখন তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন।[২৮১]

শয়তান তাদের চুক্তির কথা সবাইকে জানিয়ে দিলো

চুক্তি পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর উপস্থিত সকলে যখন ফিরে যেতে উদ্যত হল, ঠিক সেই মুহূর্তে শয়তান তাদের এই চুক্তির কথা প্রকাশ করে দিলো। যেহেতু একেবারে শেষ মুহূর্তে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল এবং সেই অবস্থায় এই ঘাঁটির মধ্যেই তাদের টুঁটি টিপে হত্যা করার জন্য গোপনে গোপনে তা কুরাইশ নেতাদের কাছে পৌছে দেওয়া অনেকটা অসম্ভব ছিল, তাই সে একটি পর্বত শিখরে আরোহণ করে অভ্রভেদী নিনাদে-যা কোনোদিনও কেউ শুনেনি-ঘোষণা দিলো 'হে গৃহের অধিবাসীরা! তোমাদের লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ধর্মত্যাগীরা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। তোমাদের কি সে ব্যাপারে খবর আছে? তারা তো তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'এ হলো এই ঘাঁটির শয়তান আযেব। হে আল্লাহর দুশমন! আমি অতি শীঘ্রই তোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি'**। এরপরে তিনি সবাইকে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।[২৮২]

কুরাইশের মুকাবিলার জন্য আনসারদের প্রস্তুতি

শয়তানের এই ঘোষণা শুনে আব্বাস বিন উবাদা বিন নাজলা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যিসত্যিই প্রেরণ করেছেন, যদি আপনার সম্মতি থাকে তবে আগামীকালই আমরা মীনাবাসীদের ওপর আমাদের তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন নির্দেশ দেননি; বরং তোমরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যাও!** এরপর তারা যে যার তাঁবুতে ফিরে গিয়ে শীতল বিছানায় জাগর-ক্লান্ত বদনখানি এলিয়ে দিয়ে ঘুমের সাগরে ডুব দিলেন। ঘুমালেন ভোর পর্যন্ত।[২৮৩]

ইয়াসরিবের নেতাদের কাছে কুরাইশের অভিযোগ

নিভৃত রাতের আঁধারে ঘটে যাওয়া এ ঘটনা যখন কুরাইশের কানে গিয়ে পড়ল তখন তাদের মধ্যে একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। পেরেশানি আর দুশ্চিন্তার পাগলা ঘোড়া তাদের ঘাড়ে সওয়ার হলো। কারণ তারা ষোল আনাই উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এই বাইয়াতের পরিণাম কী হবে? তাদের জান ও মালের

---

[২৮১] ইবনে হিশাম ১/৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৬।
[২৮২] ইবনে হিশাম ১/৪৪৭। যাদুল মাআদ ২/৫১।
[২৮৩] ইবনে হিশাম ১/৪৪৮।

বিরুদ্ধে নিকট ভবিষ্যতে এটা কত বড় খতরা ও ভয়ঙ্কর ঝড় হয়ে দেখা দিবে? এ কারণে সকাল হতে না হতেই মক্কার নেতৃস্থানীয় আর বড় বড় দাগী অপরাধীর একটি বিশাল প্রতিনিধি দল ইয়াসরিবের পথে রওয়ানা হয়ে গেল। উদ্দেশ্য ছিল- সেখানকার নেতৃবৃন্দের আদালতে এই বাইয়াতের বিরুদ্ধে এক শক্ত মামলা দায়ের করা। প্রতিনিধি দল বলল :

হে খাযরাজ সম্প্রদায়! আমরা জানতে পেরেছি, তোমরা আমাদের সঙ্গীকে আমাদের থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য গিয়েছ। এবং তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ওপর তাঁর হাতে বাইয়াত হয়েছ। আল্লাহর কসম! গোটা আরবের মধ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়।[২৮৪]

খাযরাজের মুশরিকরা এ বাইয়াতের কানা-কড়িও জানত না। কারণ এটি সম্পাদিত হয়েছিল ভরানিশার অন্ধকার গর্ভে পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে। এ কারণে তারা সবাই একযোগে কসম খেয়ে বলে উঠল: এমন কিছু হয়নি। আর হলে তো আমরা জানতামই। ঠিক তখনই সেখানে এসে উপস্থিত হলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল। এসেই সে বলতে লাগল: সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট একটা অভিযোগ এটা! এমন কিছুই হয়নি। আর আমার কওম আমাকে ছাড়া এমন একটি কাজ করবে তা কোনো দিনও হতে পারে না। আমি যদি তখন ইয়াসরিবেও থেকে যেতাম তবুও তারা আমার সঙ্গে মশওরা না করে এমন কাজ কোনো দিনও করত না।

মুসলমানরা তখন পরস্পরে এক অপরের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছিলেন। তারা ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব, নির্বিকার। হাঁ বা না-এর কোনোটিই তাদের কারও মুখ থেকে বের হয়নি।

তখন মুশরিকদের কথার দিকেই কুরাইশ নেতাদের সত্যয়নের পাল্লা ঝুঁকে পড়ল। কোনো উপায়ন্তর না দেখে অগত্যা ব্যর্থমনোরথ হয়ে পা বাড়ালো আপন ঠিকানায়।

কুরাইশের সুনিশ্চিত সংবাদ ও বাইয়াত গ্রহণকারীদের বিতাড়ন

এ সংবাদ মিথ্যা ও ভুল-এমন একটা মোটামুটি নিশ্চয়তা নিয়েই কুরাইশরা ইয়াসরিব থেকে ফিরে এলো। কিন্তু মক্কায় এসে তারা হাত পা গুটিয়ে বসে রইল না। এর সত্যতা যাচাই ও হক্ব-না হক্ব খুঁজে বের করার অভিযান আগের চেয়ে আরও জোরদার হলো। দিন ও রাতের প্রতিটি অলিতে গলিতে তারা সতর্ক দৃষ্টি আর সজাগ প্রহরী লাগিয়ে দিলো। এক পর্যায়ে তারা সুনিশ্চিত হতে পারল, 'প্রাপ্ত সংবাদ ছিল সম্পূর্ণ সত্য। সত্যি সত্যিই বাইয়াত সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু হজ্জে

---

[২৮৪] প্রাগুক্ত।

আগমনকারীরা ততক্ষণে নিজেদের দেশে চলে গিয়েছিল। তারপরও তারা ছাড়ল না। দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠালো তাদের পশ্চাদ্ধাবনে। কিন্তু মেঘ ততক্ষণে কেটে গিয়েছিল। বৃষ্টি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আর এখন এসেছে তারা পাত্র ভরার জন্য। যা হোক, শেষমেশ সাদ বিন উবাদা আর মুনযির ইবনে আমর ব্যতীত আর কাউকে দেখতে পেল না। দ্রুত তারা তাদের পিছু নিলে মুনযির পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। কিন্তু সাদ তাদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তারা হাওদার রশি দিয়ে তাঁর হাত-পা বেঁধে চুল ও রশি ধরে টানতে টানতে ও প্রহার করতে করতে মক্কায় এনে উপস্থিত করল। তখন মুতইম বিন আদী আর হারিস বিন হরব বিন উমাইয়্যা এসে তাকে তাদের হাত থেকে রেহাই দিলো। কারণ সাদ মদীনার পাশ দিয়ে গমনকালে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। এদিকে তাকে হারানোর পর আনসাররা নিজেদের মাঝে পরামর্শ করতে লাগলেন। তারা যে কোনো ভাবে তাকে ফিরিয়ে আনার চিন্তা করলেন। ঠিক এমন সময় তিনি তাদের কাছে উদিত হলেন। এরপর সকলে মিলে দ্বিধাহীন চিত্তে মদীনায় প্রবেশ করলেন।[২৮৫]

এই ছিল আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের নাতিদীর্ঘ কাহিনী। ইতিহাসে এটি 'বাইয়াতে আক্বাবায়ে কুবরা' নামে সবিশেষ পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। এমন এক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সম্পাদিত হয়েছিল এই বাইয়াত, মহব্বত আর ভালোবাসায় যা কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। মুমিনদের পরস্পরের মাঝে সাহায্য ও সহযোগিতার সুন্দর অনুভূতি যাতে উপচে পড়ছিল। বিশ্বাস ও আস্থা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আর বীরত্ব ও সাহসিকতা যার গা বেয়ে চুয়ে চুয়ে পড়ছিল। তাই তো ইয়াসরিবের এক মুমিন সুদূর মক্কার তার এই মুমিন ভাইয়ের দরদ আর প্রেমে উদ্বেলিত হয়ে পড়ত। তার ওপর যুলুমকারীদের প্রতি তার ঘৃণা আর ক্রোধের সীমা থাকত না। একমাত্র আল্লাহর জন্য না দেখে ভালোবাসা তার এই ভাইয়ের জন্য তার হৃদয়পুরীতে মমতা ও মহব্বতের প্রচণ্ড এক ঝড় হয়ে বয়ে যেত।

এই অনুভব ও অনুভূতি কিন্তু কোনো সাময়িক ঝোঁক কিংবা প্রবণতার ফসল ছিল না, দিন কয়েক পরে হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়াই ছিল যার তকদীরের লিখন। বরং এর উৎস আর মূল চালিকা শক্তি ছিল এক আল্লাহ, তাঁর রাসূল আর তাঁর কিতাবের প্রতি ঈমান। এ ছিল এমন এক ঈমান, জগতের কোনো শক্তিই যাতে একটুকু চির ধরাতে সক্ষম ছিল না। এ ছিল এমন এক ইস্পাত কঠিন বিশ্বাসের অজেয় দুর্গ, পৃথিবীর সকল বৈরী শক্তি যার সামনে নিতান্ত অসহায় ছিল। ফলে এ ঈমান যখন জাগলো, আক্বীদা আর আমলের জগতে একের পর এক বিস্ময়কর শত কীর্তির জন্ম দিতে লাগল। রচনা করতে লাগল এমন হাজারো গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অধ্যায়, পৃথিবী

---

[২৮৫] যাদুল মাআদ ২/৫১,৫২। ইবনে হিশাম ১/৪৪৮-৪৫০।

ইতঃপূর্বে যা থেকে শূন্য ছিল। এ ঈমান ইতিহাসের এক নয়া দিগন্তের দুয়ার খুলে দিয়েছিল। এই ঈমানের বদৌলতেই মুসলমানরা পৃথিবীর সব ভাণ্ডার ভরে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর আঁচল পটে রেখেছিলেন এমন লাখো দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ভূত ও ভবিষ্যতের ইতিহাস যার সামনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল।

হিজরতের পূর্বাভাস

এভাবে যখন আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াত সম্পন্ন হলো। জাহেলিয়াত আর কুফরীর পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-ভঙ্গে উদ্বেল মরু-সাগরে ইসলাম নিজের জন্য একটি শরণশিবির ও বাসভূমি খুঁজে পেল- ইসলামের জন্য যা ছিল তার জন্মদিন থেকেই একটি বিশাল ও বিরাট প্রাপ্তি-তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সেখানে হিজরত করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

হিজরতের অর্থ কেবল নিজের সকল কল্যাণ ও উপায়-উপকরণকে খুইয়ে ফেলে, সকল সহায়-সম্পত্তি আর বিত্ত-বিভবকে বিকিয়ে দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করাই ছিল না; বরং এর সঙ্গে সঙ্গে একজন মুহাজিরকে তার মনে এ কথাও বদ্ধমূল করে নিতে হতো যে, তার সবকিছু এখন এ জগতের সকলের জন্য হালাল ও উন্মুক্ত হয়ে গেছে। এখন পথের মাঝখানে কিংবা শেষে যে কোনো সময়ই তাকে তার সকল পাথেয় হারিয়ে ফেলতে হতে পারে। সে এখন অনবরত ছুটছে এক অজানা গন্তব্যে। সে জানে না তার পথের শেষ কোথায়? জানে না সে এ পথ কখনো ফুরাবে? না কি এভাবেই এক সময় এ সকল গ্লানি, চিন্তা আর পেরেশানির প্রবল ঝঞ্ঝায় তার প্রাণ প্রদীপ নিভে যাবে? সাঙ্গ হবে তার ভবলীলা।

কিন্তু এত সব জেনেও মুসলমানরা ধীরে ধীরে মদীনার পথে হিজরত করতে লাগলেন। আর অপরদিকে কাফের ও মুশরিকরাও তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে লাগল। কারণ, তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, বাপ-দাদার বাস্তু-ভিটা ছেড়ে দূর দেশে মুসলমানদের এই হিজরত প্রকৃত অর্থে তাদের জন্য ছিল এক মহা বিপদের অশনী সংকেত। নিম্নে এর কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা বিধেয় মনে করছি:

এক. মুসলমানদের মধ্যে মদীনায় সর্বপ্রথম হিজরতকারী সাহাবী ছিলেন আবু সালামা রা.। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াতেরও এক বছর পূর্বে মদীনায় হিজরত করেন। প্রথমে তাঁর স্ত্রী ও কোলের শিশু সন্তানও হিজরতের সঙ্গী ছিল। এরপর যখন হিজরতের পূর্ণ ইরাদা করে নিলেন তখন তার শ্বশুর গোষ্ঠী তাকে বলতে লাগল: তুমি তোমার নিজের জান নিয়ে যেতে চাচ্ছ যাও! কিন্তু আমাদের মেয়ের কী হবে ভেবে দেখেছ কি? কীসের ওপর ভর করে আমরা তোমার সঙ্গে তাকে শহর-নগর আর পথে পথে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি দিব? তখন তারা তাঁর কাছ থেকে তাঁর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিলো। তখন আবু সালামার গোষ্ঠীর লোকেরা ক্ষেপে উঠল। তারা বলল:

যখন আমাদের ছেলের কাছ থেকে তারা তাদের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়েছে তখন আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও তাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না। তখন তারা তাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল এবং তার হাত ছিঁড়ে ফেলল। অবশেষে তাকে নিয়ে নিজেদের কওমে ফিরে এলো। উপায়ন্তর ন্য দেখে আবু সালামা রা. একাকীই মদীনার দুর্গম পথে পা বাড়ালেন।

স্বামী ও সন্তান হারিয়ে উম্মে সালামা নিজ কওমের যালিমগুলির মাঝে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারলেন না। তিনি প্রতিদিন সকাল বেলা 'আবতাহ' নামক জায়গায় এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থেকে অশ্রুসজল নয়নে দূর সীমানায় চেয়ে চেয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করতেন। এভাবে কেটে গেল প্রায় বারোটি মাস। এরপর তার ওপর একজনের দয়া ও মমত্ববোধের সৃষ্টি হলো। তিনি তার কওমের লোকজনের উদ্দেশে বললেন: তোমরা এই হতভাগিনীকে কেন যেতে দিচ্ছ না? তোমার তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে আলাদা করে দিয়েছ! তখন তারা বলল, ঠিক আছে। তুমি চাইলে এখন আপন স্বামীর কাছে চলে যেতে পারো। এরপর তিনি শ্বশুরালয়ে গিয়ে কোলের সন্তানকে ফেরত চাইলে তারাও দিয়ে দিলো। তারপর তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একাকিনী যাত্রা করলেন মদীনার পথে। ভেবে দেখুন! এ ছিল চরম বিপদ সংকুল আর চড়াই-উতরাই ভরা সুদীর্ঘ পাঁচশ' কিলোমিটারের চেয়েও দূর পথের এক লম্বা সফর! কিছুদূর যেতে না যেতেই সে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশছোঁয়া বড় বড় পর্বতমালা। ধ্বংস আর হালাকের বিভীষিকা ভরা সংকীর্ণ উপত্যকা। অথচ, শ্বাপদসংকুল এ পথে এই দুর্বল ও অসহায় নারীর সঙ্গী বলতে রয়েছে কেবল তার বুকে আগলে রাখা দুধের শিশু। সে ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো জীব তার সঙ্গে নেই। এমন কেউ নেই যে ভয়ঙ্কর এ পথে তাকে ধেয়ে আসা কোনো আপদ থেকে রক্ষা করবে। বাড়িয়ে দিবে তার প্রতি সাহায্যের দুটি হাত। অবশেষে তানঈম নামক স্থানে পৌঁছলে উসমান বিন তালহা বিন আবী তালহার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। তিনি তার অবস্থা জেনে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে সসম্মানে মদীনায় নিয়ে যেতে লাগলেন। এক পর্যায়ে যখন তাদের চোখের সামনে আবছা আবছা দৃশ্য নিয়ে কুবা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন উসমান বিন তালহা রা. তাকে বললেন: আপনার স্বামী এ শহরেই আছেন, সুতরাং আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে এখানে প্রবেশ করুন। এভাবে তাকে নিরাপদ গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তিনি আবার মক্কার পথ ধরলেন। ২৮৬

দুই. সুহাইব বিন সিনান রূমী রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে হিজরত করেছিলেন। যখন তিনি হিজরতের ইরাদা করলেন তখন কুরাইশ কাফেররা তাকে বলল: তুমি এক নিঃস্ব ও ফকীর হয়ে আমাদের কাছে এসেছিলে। এরপর আমাদের মধ্যে থেকে তোমার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তুমি মর্যাদার সুউচ্চ

---

২৮৬ ইবনে হিশাম ১/৪৬৮-৪৭০।

শিখরে উপনীত হও। আর এখন তুমি চাচ্ছ সবকিছু নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে তাই না? আল্লাহর কসম! আমরা থাকতে তা কখনো হতে দিব না! তখন সুহাইব রা. তাদেরকে বললেন: যদি আমি তোমাদেরকে আমার সকল বিত্ত-বিভব আর সহায়-সম্পত্তি দিয়ে দিই তবে কি তোমরা আমার চলার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে? তারা বলল, হাঁ। তিনি বললেন: ঠিক আছে, তবে আমি আমার সকল সহায়-সম্পদ তোমাদেরকে দিয়ে দিলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সংবাদ জানতে পারলেন তখন বলে উঠলেন: 'সুহাইব ব্যবসায় লাভবান হয়েছে। সুহাইব ব্যবসায় লাভবান হয়েছে' ।২৮৭

তিন. উমর বিন খাত্তাব, আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ ও হিশাম বিন আস বিন ওয়ায়েল রা. পরামর্শক্রমে তানাজুব নামক একটি জায়গা নির্ধারণ করেছিলেন। কথা ছিল ভোরে সবাই সেখানে সমবেত হবেন। এরপর মদীনার পথে হিজরত করবেন। কিন্তু উমর ও আইয়্যাশ মিলিত হতে পারলেও হিশাম তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারেননি।

উমর বিন খাত্তাব ও আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ যখন মদীনায় পৌঁছে কুবায় অবতরণ করলেন ঠিক তখন আবু জাহল ও তার ভাই হারেস আইয়্যাশের কাছে এসে উপস্থিত হলো। তাদের তিনজনেরই জন্মদায়িনী ছিল আসমা বিনতে মুখাররবা। আইয়্যাশকে তারা বলল, তোমার মা কসম খেয়েছেন তোমাকে দেখার আগ পর্যন্ত তিনি চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াবেন না এবং সূর্যালোক থেকে ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন না। মায়ের এ দুরবস্থার কথা শোনামাত্রই আইয়্যাশের মন গলে গেল। কিন্তু উমর রা. তাকে সাবধান করে বললেন, আইয়্যাশ! আল্লাহর কসম, তোমার কওমের উদ্দেশ্যই হলো তোমাকে আপন দীনের পথ থেকে বিভ্রান্ত করা। সুতরাং, তাদের থেকে সতর্ক থেকো! আল্লাহর কসম! উঁকুনের উপদ্রব বেড়ে গেলে তোমার মা অবশ্যই মাথা আঁচড়াবেন। মক্কায় সূর্যের অগ্নি-তাপ আরেকটু বেড়ে গেলে তিনি এমনিতেই ছায়া নেবেন। কিন্তু আইয়্যাশ নিজ মাকে কসম ভাঙা থেকে মুক্ত করতে নাছোড়বান্দা ছিল। তাই শেষমেশ উমর রা. তাকে বললেন, আচ্ছা যদি নিজের পথেই হাঁটতে চাও তবে আমার এই উটটিকে নিয়ে যাও। এটা ভারি চালাক, চতুর ও দ্রুতগামী। কোনো অবস্থাতেই একে ছাড়বে না। যদি তোমার কওম তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনো ফাঁদ পাতে তবে এর পিঠে চড়ে তুমি মুক্তি ও নাজাতের রাস্তা খুঁজে নেবে।

এরপর আইয়্যাশ তাদের সঙ্গে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পরে আবু জাহল তাকে বলল, ভাই! আমাকে নিয়ে চলতে আমার উটটির বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তোমার মোটা-তাজা উটটির ওপর তোমার পেছনে

---

২৮৭ প্রাগুক্ত ১/৪৭৭।

আমাকে একটু বসিয়ে নাও না! সরলমনা আইয়্যাশ ধূর্ত আবু জাহলের কথায় সাড়া দিলো। সে যখন আবু জাহলকে ওঠানোর জন্য উটকে বসালো অমনি তারা দু'জনে চোখের পলকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বেঁধে ফেলল। এরপর প্রকাশ্য দিবালোকে সেই হালতে তাকে নিয়ে মক্কায় দাখিল হলো। সবাইকে সজাগ করে তারা বলল, হে মক্কাবাসী! আমাদের আহমকটির জন্য আমরা যেমন করেছি তোমরাও তোমাদের আহমকগুলির জন্য একই ব্যবস্থা গ্রহণ করো। [২৮৮]

মক্কা থেকে যে কোনো মুসলমানের মদীনায় হিজরত করার সংবাদ পেলেই মুশরিকরা তার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করত এই ছিল তার তিনটি জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও দেখুন তারা কী মুসলমানদের হিজরতের দুর্দম স্রোতের সামনে কখনো বাঁধ সৃষ্টি করতে পেরেছে? চতুর্দিকে বাধা-বিপত্তির এত পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও মুসলমানগণ একে অন্যের পর দলে দলে মদীনার পথে হিজরত করছিলেন। সুতরাং, আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের মাত্র মাস দু'য়েক পরে দেখা গেল গোটা মক্কায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর, আলী ও হাতে গনা কয়েকজন মজবুর (অক্ষম) মুসলমান ব্যতীত আর কেউ রইলেন না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সমস্ত আসবাব প্রস্তুত রেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে বের হওয়ার নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। আবু বকর রা.ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। [২৮৯]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে ইমাম বুখারী র. বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের উদ্দেশে বলেছিলেন, **'সারি সারি পর্বতমালার মাঝে সবুজ-শ্যামল এক ছায়াঘন ভূখণ্ড আমাকে দেখানো হয়েছে; ইনশা আল্লাহ সেটিই হবে তোমাদের হিজরতের পুণ্যভূমি'।** এরপর থেকে মুসলমানরা মদীনার পথে হিজরত করতে লাগলেন। ইতঃপূর্বে যারা হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাদের সিংহভাগই সেখান থেকে ফিরে এসে মদীনায় চলে যেতে লাগলেন। আবু বকরও হিজরতের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করেছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **'একটু সবুর করো! মনে**

---

[২৮৮] এভাবে হিশাম ও আইয়্যাশ মক্কায় কাফেরদের হাতে বন্দীই থেকে যান। অতঃপর রাসূলে কারীম সা. যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন তখন একদিন তিনি বললেন, হিশাম ও আইয়্যাশকে কে আমার নিকট এনে দিতে পারবে? তখন ওলীদ ইবনে ওলীদ দাঁড়িয়ে বলল, আমি পারব হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি গোপনে মক্কায় এলেন। এক মহিলা হিশাম ও আইয়্যাশের কাছে প্রতিদিন খাবার পৌছে দিয়ে আসত। তিনি সেই মহিলার পিছু নিয়ে চুপে চুপে তাদের বন্দীকারার জায়গাটি দেখে নিলেন। ছাদহীন একটি বাড়িতে তাদেরকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। চারদিকে সন্ধ্যা নেমে এলে তিনি সেখানে ঢুকে তাদের শৃঙ্খল কেটে দেন এবং তাদেরকে নিজের উটের পিঠে বহন করে মদীনায় নিয়ে আসেন। দেখুন ইবনে হিশাম ১/৪৭৪-৪৭৬। আর উমর রা. বিশ জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন। দেখুন সহীহ বুখারী ১/৫৫৮।

[২৮৯] যাদুল মাআদ ২/৫২।

হয় শীঘ্রই আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেওয়া হবে'। তখন আবু বকর রা. তাকে বললেন, 'আমার পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনার মনের তামান্নাও কি তাই'? তিনি বললেন, 'হাঁ'। এরপর আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একান্ত সঙ্গী হওয়ার বাসনায় হিজরত থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখলেন। তাঁর কাছে দু'টি উটনী ছিল। হিজরতের বাহন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ চার মাস[২৯০] যাবত তিনি সেই দু'টিকে বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন।

কুরাইশের পার্লামেন্ট : দারুন-নদওয়াতে

কুরাইশরা যখন লক্ষ্য করল; মুসলমানগণ ধীরে ধীরে তাদের ছেলে-সন্তান, পরিবার-পরিজন সবকিছু নিয়ে মদীনার আউস ও খাযরাজের কাছে চলে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে মক্কা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তখন তারা প্রমাদ গুনল। তাদের হুঁশ ফিরে এলো। চিন্তা ও পেরেশানি আর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছাপ বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তাদের পেশানিতে। কপালে তাদের বড় বড় ভাঁজ পড়ে গেল। এমন দুশ্চিন্তায় তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ল যার কোনো অভিজ্ঞতা তারা বাপ-দাদার জনমেও লাভ করেছিল না। ফলে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ল। নিশ্চিত বিপদের এক সর্বনাশা শঙ্কা ঘন অন্ধকার হয়ে চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ধরল। যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের পৌত্তলিক আর অর্থনৈতিক অবকাঠামো ধ্বংস আর বিলুপ্তির হুমকির মুখে পড়ল। মনে হলো এই বুঝি তাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে।

একটি উম্মাহ ও জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দানের পাশাপাশি তাদের ভেতরে সুন্দর ও সুগভীর প্রভাব ফেলার কী পরিমাণ শক্তি আর যোগ্যতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল তা তারা ভালো করেই জানত। পাশাপাশি তাঁর সাহাবীদের ইস্তেকামাত ও দৃঢ়তা, ছুবূত ও অবিচলতা আর তাঁর পথে ফেদা ও উৎসর্গ হওয়ার কী পরিমাণ আগ্রহ আর ইচ্ছাশক্তি ছিল তাও তারা জানত। ইয়াসরিবের আউস ও খাযরাজের মধ্যে শক্তি আর সামর্থের কী যে এক বিশাল ভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে সে সম্পর্কেও তারা ঢের জ্ঞান রাখত। তারা ভালো করেই অবগত ছিল এই দুই গোত্রের আকেল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সন্ধি আর শান্তি চুক্তির প্রতি কতটা আগ্রহ আর আসক্তি ছিল। দুশমন আর বৈরী শক্তিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার কতটা বেশি মানসিকতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কারণ বছরের পর বছর আর যুগের পর যুগ চলে আসা একটানা গৃহ যুদ্ধ তাদেরকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। ফলে তারা এখন একটুখানি শান্তি আর স্বস্তির ঠিকানা পেলেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করত।

---

[২৯০] সহীহ বুখারী: নবীজী ও সাহাবায়ে কেরামের হিজরত অধ্যায় ১/৫৫৩।

আর রণকৌশলগত দিক দিয়েও মদীনা কী পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক জায়গায় ছিল সে সম্পর্কেও তাদের জানার কমতি ছিল না। কারণ লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে ইয়েমেন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্যিক পথ ছিল সে দিক বিবেচনায় মদীনা ছিল অনেক বড় ভাগ্যবান। আর তায়েফ ও অন্যান্য গোত্রের কথা বাদ দিলেও কেবল মক্কাবাসীরাই বছরে সিরিয়ায় প্রায় আড়াই লাখ দীনারের ব্যবসা করত। আর এ কথা তো সবারই জানা যে, এ সকল ব্যবসা বাণিজ্যের মূল ভিত্তি ছিল পথ-ঘাটের সার্বিক ও ব্যাপক নিরাপত্তা।

সুতরাং, এখন ইয়াসরিবের মাটিতে যদি ইসলামের দাওয়াত মযবুত শেকড় গেড়ে বসে এবং সেখানকার জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে মিলে মক্কাবাসীদের মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয় তবে তা কতটা ভয়ানক আর খতরনাক হবে এ শঙ্কায় মুশরিকরা দিনরাত কম্পিত ও শঙ্কিত ছিল।

মুশরিকরা আসন্ন এ সর্বনাশা বিপদের মাত্রা খুব ভালো করেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এ কারণে তারা এ বিপদের মূল রূপকার ইসলামের দাওয়াতের পতাকাবাহী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রতিহত করার সবচে' সফল ও সার্থক পন্থা বের করার নিমিত্ত দিন রাত আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল।

নবুওতের চতুর্দশ বছরের ২৬ শে সফর বৃহস্পতিবার মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ ই সেপ্টেম্বর[২৯১] অর্থাৎ আক্বাবার দ্বিতীয় বাইয়াতের প্রায় আড়াই মাস পরে দিনের শুরুভাগে[২৯২] দারুন নদওয়াতে কাফের মুশরিকরা একটি সম্মেলন ডাকল। এটা ছিল গোটা মক্কার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ সম্মেলন। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবীলায়ে কুরাইশের সকল প্রতিনিধিদল এ সম্মেলনে যোগদান করল। যাতে করে এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয় যার মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহীকে দ্রুত দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া যায়। তার আলোর গতিধারা পুরোপুরি থামিয়ে দেওয়া যায়। তাকে গলা টিপে হত্যা করে বস্তায় ঢুকিয়ে রাখা যায়। আর কুরাইশ গোত্রের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের মুখগুলি এ সম্মেলনের সর্বাধিক উজ্জ্বল ছিল তারা সেগুলি হলোঃ

---

[২৯১] আমরা আল্লামা সুলাইমান মনসূরপুরী র. এর রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৯৫, ৯৭, ১০২, ২/৪৭১ থেকে এ ইতিহাস সংগ্রহ করেছি।

[২৯২] দিনের শুরুভাগে এর অধিবেশন শুরুর কথা পাওয়া যায় ইবনে ইসহাকের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, জিবরাঈল আ. রাসূলে কারীম সা. এর কাছে এসে তাদের এ সমাবেশের কথা জানিয়ে দেন এবং হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। ওদিকে বুখারী শরীফে আয়েশা রা. এর হাদীসে এসেছে, দুপুরের দিকে রাসূলে কারীম সা. আবু বকরের বাড়িতে গিয়ে তাকে বললেন, আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ সামনে দেখুন।

১. বনু মাখযূমের আবু জাহল বিন হিশাম।

২.৩. ৪.বনু নওফল বিন আবদে মানাফের যুবাইর বিন মুতইম, তুআইমা বিন আদী, হারেস বিন আমের।

৫. ৬. ৭. বনু আবদে শামছ বিন আবদে মানাফের শাইবা বিন রবীআ, ওতবা বিন রবীআ ও আবু সুফিয়ান বিন হরব।

৮. বনু আব্দুদ্দারের নযর বিন হারেস।

৯. ১০. ১১. বনু আসাদ বিন আব্দুল উয্যার আবুল বাখতারী বিন হিশাম, যামআ বিন আসওয়াদ ও হাকিম বিন হিযাম।

১২. ১৩. বনু সাহমের নুবাই বিন হাজ্জাজ ও মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ।

১৪. বনু জুমাহর উমাইয়্যা বিন খলফ।

যখন তারা নির্ধারিত দিনে দারুন নদওয়াতে এসে সমবেত হলো তখন ইবলীস শয়তানও এক বৃদ্ধের আকৃতিতে সেখানে উপস্থিত হলো। তার পরনে ছিল মোটা একটি কাপড়। সে এসে দারুন নদওয়ার দরজায় দাঁড়ালো। ভেতর থেকে তারা জিজ্ঞাসা করল কে এই বৃদ্ধ? ইবলীস জবাব দিলো এই বৃদ্ধ নজদ থেকে এসেছে। সে শুনতে পেয়েছে তোমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য এখানে বসেছ। হতে পারে তার কোনো উপদেশ তোমাদের কাজেও লেগে যাবে। তারা বলল ঠিক আছে! তবে ভেতরে আসুন। এভাবে সে তাদের মধ্যে জায়গা করে নিলো।

সভার বাক বিতণ্ডা ও পরিশেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সবাই উপস্থিত হওয়ার পরে যখন সভাকক্ষ কানায় কানায় ভরে গেল তখন একের পর এক বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপনের পালা শুরু হলো। লম্বা সময় জুড়ে চলল সেই বাক বিতণ্ডা আর তর্কযুদ্ধ। আবুল আসওয়াদ বলল, তাকে আমাদের মধ্য থেকে বের করে দিয়ে গোটা জাযীরার বাইরে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিব। তখন আমাদের স্বার্থ উদ্ধার হয়ে যাবে। আর তার যেখানে মন চায় সেখানে সে চলে যাবে। এ ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

তখন নজদের সেই বৃদ্ধ বলল, আল্লাহর কসম! এটা হতেই পারে না। তোমরা কি তাঁর বক্তব্যের চমৎকারিত্ব আর কথার মনোহারিত্ব প্রত্যক্ষ করোনি? এই সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে মানুষের হৃদয় দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর কসম! তোমরা যদি এটা করো তবে হবে কি জান? সে আরবের কোনো একটি মহল্লায় গিয়ে আশ্রয় নিবে। এরপর নিজ যাদুময়ী বক্তব্য আর মধুবর্ষী বচনের দ্বারা সে তাদেরকে নিজ অনুসারী বানিয়ে নেবে। অতঃপর সবাইকে নিয়ে একদিন সে তোমাদের ওপর

এই শহরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর সে তোমাদের সঙ্গে যা ইচ্ছা তা-ই করবে। সুতরাং, এটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করো।

আবুল বাখতারী বলল, আমার মতে তোমরা তাঁর হাত পায়ে শেকল লাগিয়ে অর্গলবদ্ধ এক অন্ধকার কুঠরিতে আটকে রেখো। এরপর তোমরা অপেক্ষা করো। দেখবে তার পরিণতি ঠিক তা-ই হবে যা হয়েছিল তার আগেকার কবি যুহাইর নাবেগার।

এবার নজদের সেই বৃদ্ধ বলে উঠল, আল্লাহর কসম! এটাও আমার পছন্দ হয়নি। কারণ, যদি তোমরা তাকে বন্দী করে রাখো তবে জেলখানার সেই দরজা ভেদ করে তাঁর আওয়ায পৌঁছে যাবে তাঁর সাথীদের কানে কানে। নিঃসন্দেহে তখন তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তাকে তোমাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তারা তাঁর সঙ্গে মিলে তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করবে। তাই আমার এ মত পছন্দ হয়নি। দয়া করে আরেকটি খুঁজে বের করো।

যখন সভাষদ থেকে উল্লিখিত উভয় প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করা হলো তখন তৃতীয় নম্বরে সেখানে ইতিহাসের ঘৃণ্য ও অসভ্য এমনি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় উপস্থিত সকলে একবাক্যে যাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। মক্কার সবচেয়ে বড় ও দাগী অপরাধী আবু জাহল বিন হিশাম এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল। আবু জাহল বলল: আল্লাহর কসম আমার কাছে এমন সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত একটি প্রস্তাব রয়েছে যাতে তোমরা একমত না হয়ে পারবে না। তারা বলল, সে কী আবুল হাকাম? সে বলল, আমার মত হলো তোমরা আরবের প্রত্যেকটি কবীলা থেকে একেকজন উৎসাহী, প্রেরণাদীপ্ত আর উদ্যমী সাহসী যুবক বাছাই করবে। এরপর তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ধারালো তলোয়ার দিবে। পরে তারা সকলে একযোগে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর ওপর আচানক ঝাঁপিয়ে পড়ে এক আঘাতে তাকে জায়গাতেই শেষ করে ফেলবে। তাহলে আমরা তাঁর হাত থেকে চিরদিনের জন্য রেহাই পাব। এমন হলে তাঁর রক্তের যিম্মাদারি গোটা আরবের সকল কবীলার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। আর তখন বনু আবদে মানাফ একা সকলের মুকাবেলা করার সাহস পাবে না। শুধু রক্তপণ নিয়েই তারা ক্ষান্ত থাকবে। আর আমরাও শুধু রক্তপণ দিয়েই বেঁচে যাব।

তখন বৃদ্ধ নজদী বলল, হাঁ-এটাই হয়েছে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব। এমন প্রস্তাব হয়-ই না।[২৯৩]

তখন দারুন নদওয়াতে উপস্থিত সকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইতিহাসের চরম ঘৃণিত এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। সকলে একে একে যে যার কবীলায় ফিরে যায়। কিন্তু সকলের হৃদয়ের দৃঢ় ও একান্ত অভিলাষ একটিই-কখন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হবে?

---

[২৯৩] দেখুন ইবনে হিশাম ১/৪৮০-৪৮২।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরত

কুরাইশের পরিকল্পনা বনাম আল্লাহর কর্ম-কুশলতা

এ ধরনের কোনো গোপন ও লুকানো পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের দিন রাতের চেষ্টা ছিল পৃথিবীর কোনো কাক-পক্ষীও যেন তাদের এ গোপন পরিকল্পনার কথা জানতে না পারে। এই ষড়যন্ত্র আর কূট-কৌশলের কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। কিন্তু তাদের কেউ কি জানত যে, তাদের মধ্যে এমন এক সত্তাও রয়েছেন যিনি তাদের সবকিছু জানেন। এভাবে কুরাইশরা আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। সুতরাং, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমনভাবে ব্যর্থ করে দিলেন যে, তারা আঁচও করতে পারেনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে জিবরাঈল আ. এসে কুরাইশের সকল ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। তাকে তিনি আরও বললেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মক্কা থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। এবং বের হওয়ার জন্য তিনি একটি সময় বেঁধে দিলেন। তিনি তাকে আরো বলে দিলেন কীভাবে কুরাইশের ঘৃণ্য পরিকল্পনার জবাব দিতে হবে। তিনি বললেন, আপনি আজ রাতটি আপনার নিত্যদিনের বিছানায় কাটাবেন না। [২৯৪]

গ্রীষ্মের রৌদ্রতপ্ত প্রচণ্ড দুপুরে-যখন মানুষ সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজ বাড়িতে একটু আরাম করছিল-রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের সফরসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য আবু বকরের বাড়িতে গমন করেন। আয়েশা রা.বর্ণনা করেন, আমরা এক গ্রীষ্মের দুপুরে আবু বকরের ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় কেউ বলে উঠল, ঐ যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন! তিনি সেদিন এমন এক সময় আমাদের কাছে আসছিলেন যে সময়ে সাধারণত কোনোদিন আসেন না। তখন আবু বকর রা. বললেন, তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। নিশ্চয়ই তিনি কোনো গরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে এ মুহূর্তে এসেছেন।

আয়েশা রা. বলেন, অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। ঘরে প্রবেশ করে তিনি বললেন, আবু বকর! তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের সকলকে ঘর

---

[২৯৪] ইবনে হিশাম ১./৪৮২। যাদুল মাআদ ২/৫২।

থেকে বের করে দাও। আবু বকর রা. বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা সবাই আমার পরিবারের সদস্য। তখন তিনি বললেন, আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আবু বকর রা. বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার সঙ্গে থাকব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ'।[২৯৫]

এরপর তিনি তার সঙ্গে সফরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করলেন। অতঃপর বাড়িতে ফিরে এসে অধীর আগ্রহ নিয়ে রাত নামার অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি তার দৈনন্দিনের কাজ স্বাভাবিক গতিতে চালিয়ে গেলেন। ফলে কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যে তিনি হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আর কুরাইশের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গৃহ অবরোধ

অপরদিকে কুরাইশের বড় বড় চিহ্নিত অপরাধীগুলি সকাল বেলা দারুন নদওয়াতে যে গোপন ঘৃণ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সেগুলোর বাস্তবায়নের প্রস্তুতিস্বরূপ সারাটি দিন কাটিয়ে দেয়। এর জন্য তারা ঐ সকল মুরব্বী থেকে এগারো জন নেতা নির্বাচন করেছিল। তারা হলোঃ

১.আবু জাহল বিন হিশাম।

২. হিশাম বিন আবুল আস

৩. উকবা বিন আবী মুইত

৪. নযর বিন হারিস

৫. উমাইয়্যা বিন খলফ

৬. যামআ বিন আসওয়াদ

৭.তুআইমা বিন আদী

৮. আবু লাহাব

৯. উবাই বিন খলফ

১০. নুবাই বিন হাজ্জাজ

১১. ও তার ভাই মুনাব্বিহ বিন হাজ্জাজ[২৯৬]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এশার নামায আদায় করে রাতের প্রথম ভাগেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতেন। এরপর মধ্য রাত

---

[২৯৫] সহীহ বুখারীঃ নবীজী ও সাহাবাদের হিজরত অধ্যায় ১/৫৫৩। হিজরতের জন্য দেখুন হাদীস নং ৪৭৬, ২১৩৮, ২২৬৩, ২২৬৪, ২২৯৭, ৩৯০৫, ৪০৯৩, ৫৮০৭, ৬০৭৯।

[২৯৬] যাদুল মাআদ ২/৫২।

অতিক্রম করে গেলে ভরা নিশিতে তিনি জেগে উঠে মসজিদে হারামে চলে যেতেন। সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন সালাতুত তাহাজ্জুদে। কিন্তু হিজরতেই সেই রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রা. কে তাঁর বিছানায় একখানা সবুজ হাযরা মাউতি চাদর গায়ে জড়িয়ে শোয়ার নির্দেশ দিলেন। পাশাপাশি তাকে বলে দিলেন, **এ রাতে কোনো বালা মুসিবত তোমার ওপর আপতিত হতে পারবে না।**

যখন রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনীভূত হলো। আস্তে আস্তে থেমে গেল সকল-জন কোলাহল। গোটা জনপদ আর মরুভূমি পরিণত হলো মৃত্যুপুরীতে। দু' চারটি নিশাচর বিহঙ্গ আর ঘুমন্তের গোঙানি ছাড়া সবকিছু নীরব হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল অধিকাংশ মানুষ। তখন প্রতিশ্রুতবদ্ধ জাহেলি মরু আরবের সেই মূর্খ যুবকগুলি দুনিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য দুষ্কর্ম সম্পাদনের জন্য গোপনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ির চারপাশে এসে অবস্থান নিলো। এক পর্যায়ে তাঁর গৃহের দরজায় বসে বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল। তারা ধারণা করে নিয়েছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গৃহে ঘুমিয়ে আছেন। সুতরাং, যখন বের হবেন তখনই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। এভাবেই হবে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

দুনিয়াবী এই ষড়যন্ত্রের সফলতার ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তারা নিশ্চিত ছিল বিজয় তাদের এবার হবেই হবে। এ সকল দুষ্কর্মীদের লিডার আবু জাহল দম্ভ আর গরিমায় ফেটে পড়ল। সে ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে তার সঙ্গীদেরকে বলল, মুহাম্মাদের ধারণা-তোমরা যদি তার অনুসরণ করো তবে তোমরা আরব ও আজমের বাদশা বনে যাবে। তারপর মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে। তখন তোমাদের জন্য জর্ডানের সুন্দর সুন্দর বাগিচাগুলোর মতো বাগ-বাগিচা উপহার দেওয়া হবে। আর যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ না করো তবে সে তোমাদের জন্য সর্বনাশ হয়ে দেখা দিবে। এরপর মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে। তখন তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পোড়ানো হবে।[২৯৭]

তাদের সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের নির্ধারিত সময় ছিল মাঝরাত অতিক্রম করার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হবেন। এ কারণে তারা নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষায় বিনিদ্র রইল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজে সততই বিজয়ী। তাঁর হাতেই আসমান আর যমিনের রাজত্ব। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি মানুষকে বাধ্য করতে পারেন কিন্তু তাকে কেউ বাধ্য করতে পারে না। সুতরাং, তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

২৯৭ ইবনে হিশাম ১/৪৮২, ৪৮৩।

সাল্লাম কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করে দেখালেনঃ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. আর কাফেররা যখন প্রতারণা করছিল আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা যেমন ছলনা করছিল, আল্লাহও তেমনি কৌশল অবলম্বন করছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহর কৌশল সবচেয়ে উত্তম। [সূরা আনফাল : ৩০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন গৃহ ত্যাগ করলেন

তেযী ও বলীয়ান একদল আরবীয় যুবক সম্পূর্ণ জাগ্রত ও সজাগ থাকা সত্ত্বেও কুরাইশদের ষড়যন্ত্র স্পষ্ট ও লজ্জাকর ব্যর্থতায় পরিণত হলো। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই অবস্থাতেই মাঝরাতে আপন ঘর থেকে বের হয়ে তাদের কাতার ভেদ করে চলে গেলেন। অথচ, তারা টেরই পেল না। তিনি তখন এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের সকলের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। তখন আল্লাহ তাআলা সাময়িকের জন্য তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ফলে তারা তাকে দেখতে পেল না। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে ছিল আল্লাহ তাআলার বাণীঃ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না। [সূরা ইয়াসীন : ৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিক্ষিপ্ত এক মুষ্টি মাটি আল্লাহ তাআলা সকলের মাথায় পৌঁছে দিলেন। এরপরে চলে গেলেন সোজা আবু বকর রা. এর বাড়িতে। এরপর আবু বকর রা. এর ঘরের গবাক্ষদ্বার দিয়ে রাতের গভীরেই দু'জনে চলে গেলেন মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে গারে সওরে।[২৯৮]

এদিকে অবরোধকারীরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বের হওয়ার অপেক্ষায় তখনো একটি একটি করে রহস্যভরা রাতের প্রহর গুনে চলছিল। কিন্তু সে পর্ব আসার আগেই তাদের ব্যর্থতার আর অসফলতার কাহিনী বের হয়ে পড়ল। বাইরে থেকে এক লোক এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় তাদেরকে দাঁড়ানো দেখে সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ? তারা বলল, মুহাম্মাদের। সে বলল, তোমাদের সব প্রয়াস তো ব্যর্থ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম! সে তোমাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এবং যাওয়ার সময় তোমাদের সকলের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে গেছে।

[২৯৮] ইবনে হিশাম ১/৪৮৩। যাদুল মাআদ ২/৫২।

এরপর লোকটি তার গন্তব্যে চলে গেল। তারা বলল, আল্লাহর কসম! আমরা তো তাকে দেখতে পাইনি। এরপর তারা যার যার মাথা থেকে ধূলি ঝাড়তে শুরু করল।

তারপরেও তারা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে ভেতরে আলীকে দেখতে পেল। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ তো এখনো চাদর জড়িয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে আছে! এভাবে তারা ভোর করল। সকাল বেলা যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানায় আলীকে আবিষ্কার করল তখন তারা যার পর নেই লজ্জিত হলো। তারা আলী রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তিনি জবাব দিলেন, আমি জানি না।[২৯৯]

ঘর থেকে গুহার পথে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওতের চতুর্দশ বছরের ২৭ শে সফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২/১৩ সেপ্টেম্বর[৩০০] রাতের আঁধারে নিজের ঘর ছেড়ে বন্ধু, দুনিয়ার মধ্যে তার জন্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ আবু বকরের ঘরে চলে গেলেন। এরপর পেছনের দরজা দিয়ে উভয় বেরিয়ে পড়লেন। তারা সুবহে সাদিকের আগেই মক্কা থেকে অতি ত্রস্তপদে বেরিয়ে গেলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকটা সুনিশ্চিতভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরাইশরা যখন তাঁর অনুপস্থিতি টের পাবে তখন তাদের সাধ্যমতো এদিক সেদিক তাঁর খোঁজে লোক পাঠাবে। আর এ ক্ষেত্রে উত্তর দিকে মদীনায় যাওয়ার প্রধান সড়কটির ওপরই সর্বপ্রথম তাদের দৃষ্টি পড়বে । এ কারণে তিনি কৌশলগত কারণে উত্তর দিকের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে মক্কা থেকে ইয়েমেনগামী দক্ষিণের পথ ধরলেন। এ পথে তিনি প্রায় পাঁচ মাইল অতিক্রম করে সওর পর্বতের একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এটা ছিল গগণস্পর্শী সুউচ্চ এক পর্বত। পথ ছিল চরম সংকীর্ণ। এ পর্বতে আরোহণ ছিল কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। তা ছাড়া এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিল পাথরের পর পাথর। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ের জুতো খুলে নিলেন। কারও কারও মতে, তিনি পায়ের এক কোণ দিয়ে হাঁটছিলেন যাতে মাটিতে পদচিহ্ন পড়ে না

---

[২৯৯] প্রাগুক্ত।

[৩০০] রহমাতুল্লিল আলামীন ১/৯৫। রাসূলের হিজরত উল্লিখিত তারিখ তথা নবুওতের চতুর্দশ বছরের সফর মাস হবে ঠিক তখন যখন আমরা বছরের শুরুর মাস হিসেবে মুহাররমকে গণ্য করব। আর যদি বছরের শুরুর মাস ঠিক ঐ মাসকে ধরি যে মাসে রাসূলে কারীম সা. নবুওত লাভ করেছিলেন তাহলে নবীজীর হিজরত নিশ্চিতভাবেই চতুর্দশ হিজরী না হয়ে ত্রয়োদশ হিজরীর সফর মাসে হবে। ঐতিহাসিকগণ কখনো প্রথম রাস্তা ধরেছেন। আবার কেউ দ্বিতীয় পথে গেছেন। আর এখানেই লেগেছে যত প্যাঁচ-গোঁচ। আমরা মুহাররম মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরে হিসাব করেছি।

থাকে। আবু বকর রা. তা পর্বত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে গেলেন। এরপর দু'জনেই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে এক সময় পৌঁছে গেলেন সওর পর্বত শিখরের এক গুহায়। ইসলামের ইতিহাসে এ গুহাটি 'গারে সওর' নামে পরিচিত।[৩০১]

যখন তাঁরা গুহায় ছিলেন

গুহায় পৌঁছে আবু বকর রা. বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি আগে গুহায় প্রবেশ করব, এরপর আপনি প্রবেশ করবেন"। ভেতরে যদি খারাপ কিছু থাকে তবে তা আমার ওপর দিয়ে যাবে, আপনি সুরক্ষিত থাকবেন। অতঃপর তিনি গুহায় ঢুকে সেটা পরিষ্কার করলেন। গুহার এক পাশে তিনি অনেকগুলি ছিদ্র দেখতে পেলেন। পরনের লুঙ্গি ছিঁড়ে কতগুলি ছিদ্র বন্ধ করে দিলেন। তারপরও দু'টি বাকি রয়ে গেল। তিনি সে দু'টির মুখে নিজের দু'টি পা দিয়ে রাখলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, এবার আপনি প্রবেশ করুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। এরপর আবু বকর রা. এর কোলে মাথা রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে গর্তের মধ্যে থেকে আবু বকর রা. এর পায়ে দংশন করা হল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিদ্রা ভেঙে যাওয়ার ভয়ে একটুকও নড়লেন না। কিন্তু যন্ত্রণার কারণে তাঁর চোখের পাপড়ির বাঁধ ভেঙে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূরানী চেহারায়। তিনি জেগে উঠে বললেন, কী ব্যাপার আবু বকর? তিনি বললেন, এক সাপ আমাকে দংশন করেছে ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ থেকে সামান্য লালা বের করে দংশনের স্থানে লাগিয়ে দিলেন। এতে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন আবু বকর রা.।[৩০২]

তারা গুহায় শুক্র, শনি ও রবি এই তিন রাত[৩০৩] অবস্থান করলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর রা. প্রতি রাতে তাদেরকে দেখতে যেতেন। আয়েশা রা. বলেন, তিনি তখন ছিলেন চালাক, চতুর ও উঠতি বয়সের এক বুদ্ধিমান তরুণ। রাতের শুরুভাগে তিনি তাদের কাছে যেতেন এবং সুবহে সাদিকের আগে অন্ধকার থাকতে মক্কায় চলে আসতেন। মানুষ মনে করত তিনি মক্কাতেই রাত যাপন করছেন। মক্কায় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেলেই রাতের

---

[৩০১] শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ১৬৭।

[৩০২] এটা রযীন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণনা করেছেন। সেখনে আরও একটি কথা বাড়তি আছে। তা হলো, ثم انتقض عليه তথা আবু বকর রা. এর মৃত্যুর সময় এ বিষের ব্যথা নতুন করে উদিত হয়েছিল। আর এটা ছিল তখন তাঁর মৃত্যুর অন্যতম কারণ। দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহঃ মানাকিবে আবু বকর রা. অধ্যায় ২/৫৫৬।

[৩০৩] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৩৩৬।

অন্ধকার গর্ভে তাদের কাছে গিয়ে সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিতেন। আর তাদের দেখাশোনা করতেন আবু বকরের গোলাম ও মেষ পালক আমের বিন ফুহাইরা। এশার নামাযের কিছু সময় পরে তিনি তাদের কাছে যেতেন। এরপর তাদের সঙ্গে রাত যাপন করে ভোর হওয়ার আগে আঁধারের রেশ থাকতেই তিনি মক্কায় ফিরে আসতেন। তাদের দু'জনের গারে সওরে থাকাকালীন তিনটি রাতেই[৩০৪] তিনি এমন করেছিলেন। আর আমের বিন ফুহাইরা আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের মক্কায় ফিরে আসার পরে মেষপাল নিয়ে ফিরে আসতেন। যাতে আব্দুল্লাহর পদচিহ্ন মেষের পদাঘাতে মিলে যায়।[৩০৫]

অপরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছুটে যাওয়ার পর ভোরে কুরাইশরা যখন তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হলো, তখন তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে তারা সর্ব প্রথম যে কাজটি করেছে তা হলো তারা আলী রা. কে প্রহার করেছে। এরপরে তাকে টেনে হিঁচড়ে কা'বায় নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ বন্দী করে রাখল। উদ্দেশ্য ছিল আলীর কাছ থেকে তাঁদের খবর বের করা।[৩০৬]

যখন আলী রা. এর কাছ থেকে তারা কিছুই আদায় করতে পারল না তখন তারা আবু বকরের বাড়ীতে এসে দরজায় খটখটাতে লাগল। আসমা বিনতে আবু বকর রা. দরজা খুলে বের হলেন। তারা তার কাছে জিজ্ঞাসা করল, তোমার আব্বা কোথায়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমার আব্বা কোথায় তা আমি জানি না। তখন পাষণ্ড ও খবিস আবু জাহল হাত উঠিয়ে অবুঝ এই অসহায় বালিকার নিষ্পাপ কপোলে এমন প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলো, যার আঘাতে তার কানের দুল ছিঁড়ে দূরে গিয়ে পড়ল।[৩০৭]

এরপরে কুরাইশের এক জরুরি সভা ডাকা হলো। উদ্দেশ্য ছিল তাদের সাধ্যমতো যে কোনো পন্থা কিংবা পদ্ধতি প্রয়োগ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. কে ধরতে হবে। তখন তারা মক্কা থেকে বের হওয়ার সকল পথে পথে সশস্ত্র পাহারাদার বসিয়ে দিলো। পাশাপাশি তারা ঘোষণা দিলো, যে কেউ জীবিত কিংবা মৃত তাদের দু'জনকেই এনে দিতে পারবে তাহলে তাদের প্রত্যেকের বদলে তাকে একশ' উট পুরস্কার দেওয়া হবে।[৩০৮]

এ সময় অগণিত লোক ঘোড়ায় চড়ে, পায়ে হেঁটে তাদের খোঁজে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাহাড়-পর্বত, মরু উপত্যকা আর গিরি-কন্দর তারা চষে বেড়াতে

---

[৩০৪] সহীহ বুখারী ১/৫৫৩, ৫৫৪।
[৩০৫] ইবনে হিশাম ১/৪৮৬।
[৩০৬] তারীখে তাবারী ২/৩৭৪।
[৩০৭] ইবনে হিশাম ১/৪৮৭।
[৩০৮] দেখুন সহীহ বুখারী ১/৫৫৪।

লাগল। কিন্তু এ সবই ছিল পণ্ডশ্রম। সবগুলির ফলাফল ছিল শুধু শূন্য আর শূন্য। যেতে যেতে তাদের একদল ঐ গুহার একেবারে মুখে এসে উপস্থিত হলো যে গুহায় অবস্থান করছিলেন প্রিয় নবীজী ও তাঁর একান্ত সঙ্গী আবু বকর রা.। কিন্তু আল্লাহর লীলা কে বোঝে? ইমাম বুখারী র. হযরত আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি আবু বকর রা. থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তখন গুহায় ছিলাম। মাথা উঠিয়ে আমি দেখতে পেলাম তারা গুহার মুখে দাঁড়ানো। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! যদি তাদের কেউ মাথা নীচু করে উঁকি দেয় তবেই তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, **আবু বকর! চুপ করো। আমরা শুধু দু'জন নই; আল্লাহ হলেন আমাদের তৃতীয় জন।** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **যে দু'জনের সঙ্গে তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?**[৩০৯]

মূলতঃ এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক বিশেষ মুজেযা যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করেছিলেন। যার কারণে তারা ঐ স্থান থেকেও খালি হাতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিল যখন তাদের আর তাদের দু'জনের মাঝে ব্যবধান ছিল মাত্র কয়েকটি কদম।

মদীনার পথে

যখন খোঁজাখুঁজির আগুন কিছুটা শান্ত ও স্তিমিত হয়ে এলো। কুরাইশের ছোটাছুটি আর দৌড়-ঝাঁপ থেমে গেল। লাগাতার তিনটি দিন দিগ্‌বিদিকে হাজারো লোক পাঠিয়েও ব্যর্থ কুচক্রী কুরাইশদের ক্রোধের অঙ্গার বাধ্য হয়ে নিভে গেল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

আগে থেকেই তারা আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত লাইসীকে রাস্তা দেখানোর জন্য ভাড়া করে রেখেছিলেন। সে ছিল সকল রাস্তাঘাট আর অলি গলি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত গাইড। কাফের কুরাইশদের ধর্মের লোক হওয়া সত্ত্বেও তার

---

[৩০৯] সহীহ বুখারী ১/৫১৬, ৫৫৮। মুসনাদে আহমদেও একই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সেখানে তার ভাষ্য হলো, আমি রাসূলে কারীম সা. কে বললাম আর তিনি তখন গুহায় ছিলেন- অপর এক বর্ণনায় আমি রাসূলে কারীম সা. কে বললাম যখন আমরা গুহায় ছিলামঃ যদি তাদের কেউ মাথা নীচু করে আমাদের পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবে তো আমাদেরকে নিশ্চিত দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, **আবু বকর! যে দু'জনের তৃতীয় জন হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?** আবু বকর রা. এর ভয় নিজের প্রাণের জন্য ছিল। বরং তাঁর এ ভয় ছিল প্রাণের প্রিয় রাসূলে কারীম সা. এর জন্য। শুনুন তাঁর ভাষ্যেঃ যদি আমি একা নিহত হই তবে তো তাতে কিছু আসে যায় না। আর যদি আপনি নিহত হন তবে তো গোটা পৃথিবীর একটি জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন রাসূলে কারীম সা. তবে বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا তুমি পেরেশান হয়ো না! নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন!! দেখুন শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠাঃ ১৬৮।

আমানতদারির কারণে তারা তাদের সওয়ারীদুটি তার কাছে রেখে দিয়েছিলেন এবং বলে দিয়েছিলেন ঠিক তিন রাত অতিবাহিত হয়ে গেলে সওয়ারীদু'টি নিয়ে গুহার কাছে নিয়ে হাযির হতে। হিজরী প্রথম বর্ষের রবীউল আউয়ালের গোড়ার দিকে, মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই সেপ্টেম্বর সোমবার রাতে আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত সওয়ারীদুটি নিয়ে তাদের কাছে চলে এলো। ইতঃপূর্বে আবু বকর রা. তাঁর গৃহে পরামর্শকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলে রেখেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি এই সওয়ারীদু'টির যে কোনো একটি নিজের জন্য বাছাই করে নিন এবং তাঁর কাছে তুলনামূলক ভালোটি এগিয়ে দিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে নিব। অপরদিকে আসমা বিনতে আবু বকর রা. খাবার-দাবার ও সামানপত্র নিয়ে হাযির হলেন। কিন্তু আসার সময় তিনি রশি আনতে ভুলে গেলেন। তাদের রওয়ানার সময় উপস্থিত হলে যখন তিনি সামানপত্র বাঁধতে গেলেন তখন দেখলেন তাতে রশি নেই। অগত্যা তিনি তার কোমরবন্ধনী খুলে দুই টুকরো করে এক টুকরো দিয়ে সামান বেঁধে দিলেন আর এক টুকরো কোমরে জড়িয়ে রাখলেন। এভাবে তিনি 'যাতুন নিতাকাইন' তথা দুই ফিতাওয়ালী উপাধি লাভ করলেন।[৩১০]

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর রা. ও আবু বকরের গোলাম আমের বিন ফুহাইরা যাত্রা শুরু করলেন। পথপ্রদর্শক আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত তাদেরকে নিয়ে উপকূলের পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন।

গারে সওর থেকে বের হওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত তাদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম ইয়েমেনগামী দক্ষিণের রাস্তা অবলম্বন করলেন। এরপর উপকূলবর্তী পশ্চিমের পথ অবলম্বন করলেন। অতঃপর যখন এমন স্থানে পৌঁছলেন যে স্থানে মানুষের আনাগোনা ছিল না তখন লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। এরপর এমন পথ ধরলেন, যে পথে মানুষের পদচারণা ছিল অতি সামান্য।

পথে পথে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি

১. ইমাম বুখারী র. আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা গারে সওর থেকে রাতের বেলা বের হয়ে সারা রাত আঁধারের বুক চিরে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। পরের দিন দুপুর পর্যন্ত আমরা সেভাবেই লাগাতার চলতে থাকলাম। সূর্য তখন ছিল আমাদের মাথার ওপর। রাতদিন একটানা সফর আমাদের হাত-পা অবশ করে দিচ্ছিল। আমরা বারবার চলৎশক্তি হারিয়ে

[৩১০] সহীহ বুখারী ১/৫৫৩, ৫৫৫। ইবনে হিশাম ১/৪৮৬।

ফেলছিলাম। রাস্তাঘাট তখন একেবারে ফাঁকা ছিল। তাতে চলার মতো সাহসী কাউকে নজরে পড়ছিল না। হঠাৎ একটি বিশাল পাথর আমাদের চোখে পড়ল। সুবিশাল কায়ার সুবাদে তপ্ত রবির ক্রোধ-ছটা থেকে সে বেঁচে গিয়েছিল। তার মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল ছায়াময় একটু স্থান। আমরা এর পাশে আমাদের যাত্রা বিরতি দিলাম। আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শোয়ার জন্য আমার হাত দিয়ে একটুখানি জায়গা তৈরি করলাম। এরপর সেখানে এক টুকরা কাপড় বিছিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি অনুরোধ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এবার আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার চারপাশ দেখা শোনার জন্য রয়েছি। তখন তিনি শুয়ে পড়লেন আর আমি তার চারপাশ দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম এক রাখাল স্বীয় বকরীর পাল নিয়ে বিশ্রামের আশায় পাথরটির দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে যুবক! তুমি কার লোক? সে মক্কা অথবা মদীনার এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করল।[৩১১] আমি তাকে বললাম তোমার কোনো বকরীর দুধ আছে কি? সে বলল হাঁ। আমি বললাম তবে কিছু দুধ দিতে পারবে কি? সে বলল হাঁ। এরপরে সে একটি বকরী ধরল। আমি বললাম, ময়লা-আবর্জনা আর ধূলা-বালি থেকে সাবধান থেকো। এরপর সে একটি পেয়ালায় খানিকটা দুধ দোহন করল। আমার কাছে একটি লোটা ছিল-রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পান ও উযূর পাত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য আমি সেটা সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু তাকে এমতাবস্থায় জাগ্রত করা আমি মুনাসিব মনে করলাম না। তাই তাঁর জেগে ওঠার অপেক্ষায় পাশে বসে রইলাম। যখন তিনি জেগে উঠলেন তখন আমি তাঁর কাছে গিয়ে দুধের ওপর সামান্য পানি দিলাম যাতে তার নিম্নাংশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন। তিনি এ পরিমাণ পান করলেন যে, খুশি আর তৃপ্তিতে আমার মন ভরে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'এখনো কি যাত্রা করার সময় হয়নি'? আমি বললাম কেন নয়? এরপর আমরা উভয় আবার চলতে লাগলাম।[৩১২]

২.আবু বকর রা. এর অভ্যাস ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে বসা। যেহেতু বার্ধক্যের ছাপ তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল এ জন্য মানুষের নজর ও তাওয়াজ্জুহ তাঁর প্রতি বেশি পড়ত। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে যেহেতু যৌবনের ছাপ প্রবল ছিল এ কারণে তাঁর প্রতি মানুষের চোখ কম পড়ত। এর ফলাফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, পথিমধ্যে তাঁদের সঙ্গে কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ ঘটলে যদি সে আবু বকর রা. কে জিজ্ঞাসা করত, 'আপনার সামনে বসা লোকটি কে? তিনি উত্তর দিতেন 'উনি

---

[৩১১] অপর এক বর্ণনায় কুরাইশের এক ব্যক্তির কথা রয়েছে।

[৩১২] সহীহ বুখারী ১/৫১০।

আমার পথপ্রদর্শক'। লোকটি বুঝে নিতো রাস্তা দেখানো রাহবর (গাইড)। অথচ, তাঁর উদ্দেশ্য থাকত জীবন ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক।[৩১৩]

৩. সফরের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিন তারা উম্মে মা'বাদ খুযাঈয়া নামের এক মহিলার তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল মক্কা থেকে ১৩০ কিলোমিটার দূরে কদীদের কাছাকাছি মুশাল্লাল নামক স্থানে। উম্মে মা'বাদ ছিলেন একজন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না বিদুষী নারী। নিজের তাঁবুর আঙিনায় তিনি বসে থাকতেন। এরপরে তাঁবুর পাশ দিয়ে যে-ই আসা যাওয়া করত তাকে তিনি খাওয়াতেন ও পান করাতেন। তারা তার কাছে গিয়ে বললেন, আপনার কাছে কিছু আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদি আমার কাছে আপনাদেরকে দেওয়ার মতো থাকত তবে আমি আপনাদের মেহমানদারির ক্ষেত্রে একটুকুও কার্পণ্য করতাম না। তাছাড়া বকরীগুলি অনেক দূর দূরান্তে চলে গেছে। আর এটা ছিল চরম দুর্ভিক্ষের বছর।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবুর এক কোণে একটি বকরী দেখতে পেয়ে বললেন, উম্মে মা'বাদ! এটা কেমন বকরী? তিনি বললেন, দুর্বলতার কারণে সে বকরীর পালের পেছনে পড়ে গেছে। তাই তাকে এনে আমি এখানে রেখে দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি দুধ দেয়? উম্মে মা'বাদ বললেন, তার পক্ষে এটা তো অনেক দূরের ব্যাপার! তিনি বললেন, তুমি আমাকে এটার দুধ দোহন করার অনুমতি দিবে কি? উম্মে মা'বাদ বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক, আপনি এটার মধ্যে দুধ দেখে থাকলে নির্বিঘ্নে দোহন করতে পারেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীটিকে কাছে টেনে তার ওলানে আপন হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। মুখে আল্লাহর নাম নিয়ে দুআ করলেন। বকরীটি তখন তার পা ছড়িয়ে দিলো। দুধে তার ওলান কানায় কানায় ভরে গেল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বড় দেখে একটি পাত্র নিয়ে এসো যা একটি বিশাল দলের জন্য যথেষ্ট হয়। এরপর তিনি তাতে এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে, এটা কানায় কানায় ভরে গিয়ে উপচে পড়ার উপক্রম করল। এরপর তিনি উম্মে মা'বাদকে তা থেকে পান করালেন। উম্মে মা'বাদ পরম তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে পান করলেন। এরপর সাথী-সঙ্গীদেরকে পান করালেন। তারাও পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। এরপর তিনি নিজে পান করলেন। শেষে ঐ পেয়ালায় আবারও এত পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যে সেটা আবারও ভরে গেল। পরে সেটি উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে সামনের দিকে যাত্রা করলেন।

---

[৩১৩] আনাস সূত্রে বুখারীর রেওয়ায়েত ১/৫৫৬।

কিছুক্ষণ পরেই উম্মে মা'বাদের স্বামী চরম দুর্বলতার কারণে চলতে না পারা সেই বকরীগুলি নিয়ে হাঁক ছেড়ে বাড়িতে এসে পৌছলেন। দুর্ভিক্ষের এ সময় বাড়িতে দুধ দেখে বিস্ময়ে তিনি হা হয়ে গেলেন। তিনি স্ত্রী উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বকরীর পাল ছিল দূর-দূরান্তে, ঘরেও কোনো দুধেল বকরী নেই, তাহলে বলো তো দুধ পেলে কোথায়? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এসব তো ঐ মুবারক ব্যক্তির বদৌলতে হয়েছে, যিনি একটু আগে আমাদের কাছে সামান্য সময়ের জন্য মেহমান হয়েছিলেন। তার কথা-বার্তা ছিল এমন এমন; তাঁর অবস্থা ছিল এমন এমন। এ কথা শুনে উম্মে মা'বাদের স্বামী বললেন, আল্লাহর কসম! এতো নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি, কুরাইশরা যার তালাশে হণ্যে হয়ে ঘুরছে। উম্মে মা'বাদ! তুমি আমার কাছে তাঁর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরো। তখন উম্মে মা'বাদ এত সুন্দর আর সুনিপুণভাবে স্বামীর কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক বর্ণাঢ্য চিত্র তুলে ধরলেন, মনে হচ্ছিল শ্রোতা যেন তাকে নিজের সামনে উপস্থিত দেখছিল। আল্লাহ চান তো আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শেষের দিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলি পর্বে এর ওপর আলোকপাত করব।

তখন আবু মা'বাদ বললেন, আল্লাহর কসম! উনি তো কুরাইশের সেই ব্যক্তি যার আলোচনা আমি ইতঃপূর্বে লোকমুখে শুনেছি। আমার জীবনের বড় সাধ ছিল তাঁর সঙ্গ দেওয়া। জীবনে যদি কোনোদিন এর সুযোগ ঘটে তবে অবশ্যই আমি আমার মনের এ তামান্না পূরণ করব।

এদিকে তখন মক্কার প্রতিটি অলিতে গলিতে একটি সুউচ্চ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল কিন্তু বক্তাকে দেখা যাচ্ছিল না। আওয়াজের ভাষা ছিল এই :

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ خَيْرَ جَزَائِهِ ... رَفِيقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلَا بِالْبِرِّ وَارْتَحَلَا بِهِ ... وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ

فَيَا لَقُصَيٍّ مَا زَوَى اللّٰهُ عَنْكُمُ ... بِهِ مِنْ فَعَالٍ لَا يُجَازَى وَسُودَدِ

لِيَهْنَ بَنِي كَعْبٍ مَكَانَ فَتَاتِهِمْ ... وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْصَدِ

سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا ... فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاءَ تَشْهَدِ

'আরশ অধিপতি আল্লাহ তাআলা সেই দু'জন বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যারা উম্মে মা'বাদের ডেরায় অবতরণ করেছেন।

তারা কল্যাণের সঙ্গে অবতরণ করেছেন আবার কল্যাণের সঙ্গে যাত্রা করে চলে গেছেন। যে মুহাম্মাদের বন্ধু হলো তাঁর জীবন তো নিশ্চিতই সফল!

হায় কুসাই! আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কত বেনযীর কীর্তি আর নেতৃত্ব তোমাদের থেকে নিয়ে গেছেন!!

বনু কাবে তাদের মেয়েদের বাসস্থান এবং মুমিনদের সুরক্ষার দুর্গ মুবারক হোক!

তোমরা নিজ নারীদেরকে তার বকরী ও পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো! যদি তোমরা স্বয়ং বকরীর কাছে জিজ্ঞাসা করো তবে সেও সাক্ষ্য দিবে'!!

আসমা রা. বলেন, আমরা জানতাম না রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ দিকে যাত্রা করেছিলেন। ঠিক এমন সময় মক্কার নিম্নভূমি থেকে একটি জিন এসে উপরোক্ত কবিতাগুলি আবৃত্তি করল। মানুষ এগুলি শুনে তার পিছে পিছে হাঁটছিল কিন্তু তাকে দেখছিল না। এভাবে সে সবাইকে নিয়ে মক্কার উচ্চভূমি দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি বলেন, তার কথা শুনেই তখন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার দিকে গেছেন।[৩১৪]

৪. পথে সুরাকা বিন মালিক রা. (তখনো মুসলমান হননি) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। সুরাকা বলেন, আমি আমার কওম বনু মুদলিজের একটি সভায় উপস্থিত ছিলাম। ঠিক এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা তখনো বসা ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা! এইমাত্র আমি উপকূলের পথ ধরে একটি ছোট্ট কাফেলা যেতে দেখেছি। সম্ভবত সেটা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের কাফেলা হবে। সুরাকা বলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম হাঁ তারাই। কিন্তু আমি তাকে বললামঃ না, তারা তো হতেই পারে না। বরং তুমি অমুক আর অমুককে দেখেছ। তারা খানিকটা আগে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই চলে গেল। এরপর আমি কিছুক্ষণ সেই সভায় থাকার পরে ঘরে গিয়ে বাঁদীকে আমার ঘোড়া বের করে টিলার পাশে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলাম। এদিকে আমি নিজে বর্শাটি হাতে নিয়ে ঘরের পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। লাঠির নিম্নভাগ দিয়ে আমি মাটি বিদীর্ণ করছিলাম আর ওপরিভাগ নীচু করে রাখছিলাম। এভাবে ঘোড়ার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে তার পিঠ চেপে বসলাম। সে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে নিয়ে দ্রুত ছুটছিল এবং এক পর্যায়ে আমি তাদের কাছাকাছিই পৌছে যাই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে সে হোঁচট খায় এবং আমি তার পিঠ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ি। এরপর আমি দাঁড়িয়ে ধুনকের দিকে আমার হাত বাড়াই। তূণ থেকে একটি তীর বের করি। উদ্দেশ্য ছিল ভাগ্যটা ভালো হবে না মন্দ হবে তা যাচাই করে নেওয়া। কিন্তু যেটা আমি

[৩১৪] যাদুল মাআদ ২/৫৩,৫৪। মুসতাদরাকে হাকিম ৩/৯, ১০। ইমাম বাগাবী প্রণীত শরহে সুন্নাহ ১৩/২৬৪।

চাচ্ছিলাম না ভাগ্য পরীক্ষায় সেটাই বের হলো। আমি আবার আমার ঘোড়ার পিঠ চেপে বসলাম। ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত ছুঁড়ে ফেলে তাদের কাছাকাছি চলে এলাম। এমনকি আমার কানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসছিল। আবু বকর রা. বার বার ঘুরে ঘুরে আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নির্বিকার। তিনি একবারও আমার দিকে তাকাননি। ঠিক এমন সময় আমার ঘোড়ার সামনের দুই পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে ডেবে গেল। আমি তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। এরপর আমি তাকে তাড়া দিলে সে আবার দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু মাটি থেকে পা বের করা তার জন্য বড় কষ্টসাধ্য ব্যপার ছিল। যাই হোক, সে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালো তখন আমি দেখলাম তার পায়ের নীচের মাটি থেকে আকাশের দিকে ধোঁওয়ার মত উঠছে। এরপর আমি আবার তীর পরীক্ষা করলাম। কিন্তু এবারও সেটা বের হলো যেটা আমার মনের ইচ্ছার বিপরীত ছিল। তখন আমি তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতি আহ্বান করলাম। তারা থেমে গেলেন। আমি আমার ঘোড়ায় চড়ে তাদের কাছে চলে এলাম। যে সময় কোনো অদৃশ্য শক্তি আমাকে বার বার তাদেরকে ধরা থেকে বাধা প্রদান করছিল তখনই আমি বুঝে ফেলেছিলাম যে, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত। তখন আমি তাকে বললাম, আপনার কওম আপনার মাথার বিনিময়ে পুরস্কার নির্ধারণ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে মক্কার মানুষ তাঁদেরকে কে কি করতে চাচ্ছে তা খুলে বললাম। তাদের কাছে আমি আমার পাথেয় ও জিনিসপত্র পেশ করলাম; কিন্তু তারা এর কিছুই গ্রহণ করলেন না। কেবল একটি কথাই তারা আমাকে বললেন, 'আমাদের সম্পর্কে ভয় দেখাও'। আমি তাদেরকে বললাম, তবে আমার জন্য আপনি একটি নিরাপত্তার পয়গাম লিখে দিন। তিনি আমের বিন ফুহাইরাকে নির্দেশ দিলেন, সে চামড়ার পিঠে তৎক্ষণাৎ আমার জন্য একটি নিরাপত্তার চিরকুট লিখে দিলো। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন।[৩১৫]

এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবু বকর রা. নিজেই বর্ণনা করেন, মক্কা থেকে আমরা যখন সফর করলাম তখন সেখানকার অধিবাসীদের সবাই আমাদেরকে হণ্যে হয়ে খুঁজছিল। কিন্তু কেবল সুরাকা বিন মালিক বিন জু'শুম ছাড়া আর কেউই আমাদের নাগাল পেল না। সুরাকা তার ঘোড়ায় চড়ে আমাদেরকে ধরতে এসেছিল।

---

[৩১৫] সহীহ বুখারী ১/৫৫৪। বনু মুদলিজের বসতি ছিল রাবেগের সন্নিকটে। রাসূলে কারীম সা. ও আবু বকর রা. যখন কদীদ থেকে ওপরে উঠছিলেন তখন সুরাকা রা. তাদের পেছনে লেগেছিলেন। দেখুন যাদুল মাআদ ২/৫৩। বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে সুরাকা রা. সফরের তৃতীয় দিনে তাদের পিছু নিয়েছিলেন।

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকটি তো আমাদেরকে ধরেই ফেলবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا তুমি ভয় পেও না আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন [সূরা তাওবাহ:৪০][৩১৬]

সুরাকা মক্কায় ফিরে গিয়ে দেখল লোকজন এখনো তাদের খোঁজে মত্ত রয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে বলতে লাগলেন, আমি তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। এদিকে তোমাদের কাজ শেষ। তোমরা এখন যেতে পারো। এভাবে দিনের শুরুতে যে ভক্ষক হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়েছিল এখন দিনের শেষে সে রক্ষক হয়ে ফিরে গেল।[৩১৭]

৫.মদীনায় যাওয়ার পথে বুরাইদা বিন হুসাইব আসলামীর সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ হলো। তার সঙ্গে তখন আশিটির মতো পরিবার ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারাও সবাই ইসলাম গ্রহণ করল। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার নামায আদায় করলে তাঁর পেছনে তারাও নামাযে শরীক হলো। এরপর উহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত বুরাইদা রা. তাঁর কওমের মধ্যে বসবাস করলেন। যুদ্ধের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে হাযির হলেন।

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভলক্ষণ গ্রহণ করতেন কিন্তু কুলক্ষণ গ্রহণ করতেন না। বুরাইদা তার কওম বনু সাহমের সত্তর জন আরোহী নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মুলাকাত করতে এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি কোন্ গোত্রের? তিনি বললেন আসলাম (তথা নিরাপত্তা) গোত্রের। তখন তিনি আবু বকর রা. কে বললেন, আমরা নিরাপদ। এরপর বললেন কার বংশের? তিনি উত্তরে বললেন, বনু সাহমের (তথা অংশ) । তিনি বললেন, **তোমার অংশ বেরিয়ে এসেছে।**[৩১৮]

৬. আরজ অঞ্চলের জুহফা ও হারশার মাঝখানে কছদাওয়াতে আবু আউস তামীম বিন হাজার বা আবু তামীম আউস বিন হাজার আসলামীর পাশ দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিক্রম করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো উট পেছনে রয়ে গিয়েছিল। যার কারণে তিনি ও আবু বকর রা. একই উটে সওয়ার ছিলেন। আউস তাকে একটি পুরুষ উটের ওপর আরোহণ করালো এবং মাসউদ নামক গোলামকে তাদের সঙ্গে

[৩১৬] সহীহ বুখারী ১/৫১৬।
[৩১৭] যাদুল মাআদ ২/৫৩।
[৩১৮] উসদুল গাবা ১/২০৯।

পাঠিয়ে দিলো। এবং বলে দিলো তোমার জানামতে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও মাহফূয রাস্তা দিয়ে তুমি তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং সামান্য সময়ের জন্যও তুমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। এরপর সে তাদেরকে নিয়ে পথ চলতে চলতে মদীনায় প্রবেশ করল। মদীনায় আসার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসউদকে তার মনীবের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময় তাকে বলে দিলেন যেন সে ফিরে গিয়ে আউসকে তার উটের গলায় ঘোড়ার লাগাম পরানোর নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ গলায় দুটি গিঁট দেয়। আর এটাই হবে তাদের নিদর্শন। উহুদের দিন যখন মক্কার মুশরিকরা অগ্রসর হয় তখন আউস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর পাঠানোর লক্ষ্যে সে তার গোলাম মাসউদ বিন হুনাইদাকে আরজ থেকে পায়ে হেঁটে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরণ করে। ইবনে মাকুলা তাবারী থেকে ঘটনাটি রেওয়ায়েত করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার অব্যবহিত পরেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার বসবাস ছিল আরজ অঞ্চলে।[৩১৯]

৭. হিজরতের পথে বাতনে রি'ম নামক স্থানে যুবাইরের সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ হয়। সে তখন সিরিয়া থেকে ফিরে আসা মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মধ্যে ছিল। তখন যুবাইর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রা. কে দু'টি সাদা কাপড় পরিয়ে দিয়েছিল।[৩২০]

হিজরী প্রথম বছর তথা নবুওতের চতুর্দশ বছরের ৮ ই রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর রোজ সোমবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুবায় অবতরণ করেন।[৩২১]

উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, যেই দিন মদীনার মুসলমানগণ সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কা থেকে বের হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলেন সেই দিন থেকে প্রতিদিন সকালে তারা মদীনা থেকে বেরিয়ে হাররা পর্যন্ত চলে এসে তার আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকত। অপেক্ষার এ পর্ব চলত দুপুরের আকাশে সূর্যের উত্তাপ উন্মাদ হয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত। এভাবে একদিন

---

[৩১৯] উসদুল গাবা ১/১৭৩। ইবনে হিশাম ১/৪৯১।

[৩২০] উরওয়া ইবনে যুবাইর সূত্রে ইমাম বুখারীর বর্ণনা ১/৫৫৪।

[৩২১] রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১০২। আর ঠিক এ দিনই রাসূলে কারীম সা. এর বয়স কোনো কম-বেশি ব্যতিরেকে তিপ্পান্ন বছর পূর্ণ হয়েছিল। আর তাঁর নবুওতের বয়স তেরো বছর পূর্ণ হয়েছিল- যদি ধরা হয় হস্তীবাহিনীর আক্রমণের একচল্লিশতম বছরের ৯ রবীউল আউয়াল তিনি নবুওত লাভ করেছিলেন। আর যদি ধরা হয় তিনি হস্তীবাহিনীর আক্রমণের একচল্লিশতম বছরের রমযান মাসে নবুওত লাভ করেছিলেন তবে সেই দিন রাসূলে কারীম সা. এর নবুওতের বয়স হয়েছিল বারো বছর পাঁচ মাস আঠারো কিংবা বাইশ দিন।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর হতাশ হৃদয়ে তারা বাড়ির পথ ধরেছিল। যখন তারা বাড়িতে এসে পৌঁছল ঠিক সেই সময় মদীনার এক ইহুদি কোনো কিছু দেখার জন্য নিজের একটি টিলার ওপর আরোহণ করেছিল। এমন সময় সে দেখতে পেল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা সাদা কাপড় পরে এগিয়ে আসছেন। তাদের কাপড় থেকে রূপালি আভা ঠিকরে পড়ছিল। তখন ইহুদি নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই গগণবিদারী কণ্ঠে ঘোষণা দিলো : হে আরবের অধিবাসীগণ! এই তো তোমাদের সৌভাগ্য তারকার উদয় ঘটেছে। যার অপেক্ষায় তোমরা এতদিন অধীর ছিলে। এ ঘোষণা শোনামাত্রই মুসলমানগণ তাদের অস্ত্র আর হাতিয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ত্রস্তপদে ছুটে এলো[৩২২] এবং হাররাতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, এর সঙ্গে বনু আমর বিন আওফে হৈ-হুল্লোড় শোনা গেল। সেখান থেকে তাকবীর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। মুসলমানরা তাঁর আগমনের খুশিতে তাকবীর দিলেন। তাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য বেরিয়ে পড়লেন ত্রস্তপদে। এরপর তাঁরা এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং নবুওতের সালাম প্রদান করলেন। পঙ্গপালের মতো চারদিক থেকে তাঁরা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বর্গীয় প্রশান্তির এক অমিয় আবহ তাকে তখন ঘিরে রেখেছিল। তাঁর ওপর অবতীর্ণ হচ্ছিল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতঃ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ. তবে জেনে রেখ আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। ওপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। [সূরা তাহরীম:৪][৩২৩]

উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, মুসলমানদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে নিজের ডান দিকে বনু আমের বিন আওফের অভিমুখী হলেন। এটা ছিল রবীউল আউয়ালের সোমবার দিন। তখন আবু বকর রা. উপস্থিত জনতার উদ্দেশে কিছু কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। এ সময় আনসারদের যারা ইতঃপূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছিলেন না, তারা আবু বকর রা. কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবে অভিবাদন জানাতে লাগলেন। অপর

---

[৩২২] সহীহ বুখারী ১/৫৫৫।
[৩২৩] যাদুল মাআদ ২/৫৪।

এক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর কাছে আসতে লাগলেন। এর মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথায় এসে রোদ পড়তে লাগল। তখন আবু বকর রা. নিজের চাদর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথার ওপরে ধরলেন। আর লোকেরা ঠিক তখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চিনতে পারল।[৩২৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বরণ করে নেওয়ার জন্য গোটা মদীনায় তখন একটা বিরাট উৎসবের আমেজ পড়ে গিয়েছিল। মদীনা উপুড় হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সবকিছু নিবেদন করে রেখেছিল। এটা ছিল মদীনার জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন। কারণ এমন সৌভাগ্য আর বরকতের দিন ইতঃপূর্বে কখনোই তার ভাগ্যে জুটেনি। ইহুদিরাও সেদিন তাদের ভাবী নবীর সুসংবাদের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল: আল্লাহ তাআলা দক্ষিণ দিক থেকে তাকে উত্থিত করবেন এবং পুণ্যময় ফারান গিরির মর্মতল থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন।[৩২৫]

কুবায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুলসুম বিন হাদমের গৃহে অবস্থান গ্রহণ করলেন। কারও কারও মতে সাদ বিন খাইসামার গৃহে। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।

ওদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হিজরতের পরে আলী রা. তিনদিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট মানুষ যে সকল আমানত রেখেছিল সেগুলি যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেন। এরপর পায়ে হেঁটে মদীনার পথে হিজরত করেন এবং কুবায় এসে তাদের দু'জনের সঙ্গে মিলিত হন এবং কুলসূম বিন হদমের গৃহে অবতরণ করেন।[৩২৬]

কুবায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সর্বমোট এই চারদিন অবস্থান করেন।[৩২৭] সেখানে রাসূলে কারীম

---

[৩২৪] সহীহ বুখারী ১/৫৫৫।

[৩২৫] সহীফাতু হুবকূক ৩:৩।

[৩২৬] ইবনে হিশাম ১/৪৯৩। যাদুল মাআদ ২/৫৪।

[৩২৭] ইবনে ইসহাক (ইবনে হিশাম ১/৪৯৪)। আর বুখারী শরীফের রেওয়াত ও এই রেওয়ায়েতের মাঝখানে রয়েছে আকাশ পাতাল তফাত। যেখানে ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন চার দিনের কথা সেখানে ইমাম বুখারী বলেছেন চব্বিশ ১/৬১, দশ ১/৫৫৫ এবং চৌদ্দ ১/৫৬০ দিনের কথা। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি নিজেই স্পষ্ট করে বলেছেন, রাসূলে কারীম সা. কুবাতে অবতরণ করেছিলেন সোম বার আর কুবা থেকে বের হয়েচিলেন শুক্রবার। দেখুন যাদুল মাআদ ২/৫৪,৫৫। আর তখন এটাতো স্পষ্টই হয়ে যায় যে, প্রবেশ ও বের হওয়ার দিনদু'টি বাদ দিলে বাকি দিনগুলির সংখ্যা কোনো ক্রমেই দশের কোটা অতিক্রম করে না। আর যদি এর সঙ্গে এই দিনদু'টিকেও

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং নামায আদায় করেন। নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পরে এটাই ছিল তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত ইসলামের প্রথম মসজিদ। কুবায় তাঁর অবস্থানের পঞ্চম দিন-তথা শুক্রবার-রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর হুকুমে নিজ সওয়ারীতে আরোহণ করেন। আবু বকর রা. তাঁর পেছনে বসলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীকে ছেড়ে দিলেন নিজ মাতুলালয় বনু নাজ্জারের দিকে। আগেই তিনি সেখানে তাঁর আগমনের সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার ফলে তারা সকলে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে লাগলেন মদীনার পানে।[৩২৮]যখন তিনি বনু সালেম বিন আউফের জনপদে গিয়ে পৌছলেন তখন জুমুআর নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিল। সেখানে তিনি বাতনে ওয়াদীতে উপস্থিত সবাইকে নিয়ে ঠিক সেই স্থানে নামায আদায় করলেন যেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল মসজিদ। সংখ্যায় তারা ছিলেন ১০০ জন।[৩২৯]

মদীনায় প্রবেশ

জুমুআর পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও চলতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি মদীনায় প্রবেশ করলেন। এটাই ছিল সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন ইয়াসরিবের কপাল খুলে গিয়েছিল। তার ভাগ্যাকাশে অগণিত অসংখ্য সৌভাগ্য তারার মেলা বসেছিল। সেই দিন সে একটি নতুন নাম পেয়েছিল। 'মদীনাতুর রাসূল' নামের সুরভী নিয়ে সে যেন পৃথিবীর মানচিত্রে সে দিন নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গোটা দিগন্ত সেই দিন সাআদাতির ঝিলিমিলি দেখে খুশিতে বাগবাগ হয়ে গিয়েছিল। তার প্রতিটি অলিগলিতে আল্লাহর তাআলার হামদ আর তাকবীর ধ্বনির মিছিল বের হয়েছিল। ঘরে ঘরে চাঁদের হাট বসেছিল। নিষ্পাপ আনসার বালিকাদের আবেগভরা কলকাকলি আর গানে গানে গোটা মদীনা নৃত্য করছিল[৩৩০]:

যুক্ত করা হয় তবে সেটাও বারো দিনের বেশি হয় না। মনে রাখতে হবে, এ হিসাব কিন্তু দুই সপ্তাহকে ঘিরে।

[৩২৮] সহীহ বুখারী ১/৫৫৫,৫৬০।

[৩২৯] ইবনে হিশাম ১/৪৯৪। যাদুল মাআদ ২/৫৫।

[৩৩০] আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. এর মতে, এ কবিতাগুলো রাসূলে কারীম সা. তাবুক থেকে ফিরে এলে আবৃত্তি করা হয়েছিল। আর যারা বলে এগুলো তিনি হিজরত করে মদীনায় এলে আবৃত্তি করা হয়েছিল তাদের এটা কেবল ধারণা ও উষর কল্পনা মাত্র। দেখুন যাদুল মাআদ ৩/১০। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কায়্যিম র. তাঁর এ মতের সমর্থনে কোনো স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য দলীল পেশ করেননি। অপরদিকে প্রাজ্ঞপুরুষ আল্লামা সুলাইমান মানসূরপুরী র. বনী ইসরাঈলের আম্বিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন সহীফার ইশারা ইঙ্গিত ও খোলাখুলি বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এগুলো ঠিকই রাসূলে কারীম সা. এর হিজরত করে মদীনায় আগমন কালে আবৃত্তি করা হয়েছিল। তবে উভয় সময়ই আবৃত্তি করাও কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়।

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ... مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا ... جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمُطَاعْ

'সানিয়াতুল বিদা'র (দক্ষিণে অবস্থিত) পর্বতগুলি থেকে আমাদের ওপর চতুর্দশী চাঁদের উদয় হলো।

আল্লাহর শোকরিয়া আদায় আমাদের কর্তব্য! যতক্ষণ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকবে।

হে আমাদের মাঝে প্রেরিত মহান! আপনি অনুসরনীয় ইসলাম নিয়ে এসেছেন।

জাগতিক ধন-সম্পদের বাহারে মদীনার আনসারগণ সমৃদ্ধ না হলেও হৃদয় আর মনের ধনের অকৃপণ পাচুর্যে তাদের প্রত্যেকেই পরম সমৃদ্ধ ও ধনী ছিল। আর এ কারণেই সকলের দিলের তামান্না ছিল একটিই- যদি আল্লাহর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরের মেহমান হতেন! এ কারণে রাসূলের কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উষ্ট্রী যার ঘরের সামনে দিয়ে গমন করত সে-ই তার লাগাম ধরে বলত: পরিমিত সামান-আসবাব, হাতিয়ার আর সুন্দর প্রতিরক্ষার মাঝে তাশরীফ আনুন! কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলতেন, **'তার পথ ছেড়ে দাও! কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট'**। এভাবে চলতে চলতে উষ্ট্রী ঠিক সেই জায়গায় এসে পৌছল আজ যেখানে মাথা উঁচু করে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে মসজিদে নববী। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর উষ্ট্রী উঠে দাঁড়ালো এবং কয়েক কদম সামনে বাড়ল। এরপর পেছনে ফিরে আবারও আগের জায়গায় এসে বসে পড়ল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পিঠ থেকে মাটিতে অবতরণ করলেন। এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মামার বংশ বনু নাজ্জার গোত্র। উষ্ট্রীর এ অবস্থা মূলত আল্লাহ তাআলার পূর্বলিখিত বিধানেরই বাস্তব রূপায়ণ ছিল। তার ভাগ্য ছিল। এ কারণে আগ থেকেই আল্লাহ তাআলা তার কপালে এই মহা সৌভাগ্য লিখে দিয়েছিলেন। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিলের তামান্নাও ছিল তাদের মধ্যে অবতরণ করে তাদেরকে মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যবান করা। তখন সবাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি নিজেদের মেহমান হওয়ার জন্য আবেদন জানাতে লাগল। কিন্তু সাহাবী হযরত আবু আইউব আনসারী রা. সকলের আগে বেড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওদা উঠিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'হাওদা যার ঘরে যাবে ব্যক্তিও তো সেই ঘরেই যাবে'**। ওদিকে হযরত আসআদ বিন যুরারা রা. এসে রাসূলের উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ফেললেন। এ কারণে পরিশেষে সেটি তাঁর কাছেই রয়ে গিয়েছিল।[৩৩১]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী তখন বললেন, **আমাদের এখানে কার ঘর অধিক নিকটবর্তী?** তখন আবু আইউব রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই তো আমার ঘর। এই তো আমার দরজা। তখন তিনি বললেন, **'চলো! আমাদের জন্য শোয়ার জায়গা প্রস্তুত করো'**। তিনি বললেন, আপনারা উভয়ে তাশরীফ আনুন! আল্লাহ বরকত দিবেন ইনশা আল্লাহ![৩৩২]

কিছুদিন পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত সওদা রা., তাঁর দুই কন্যা ফাতেমা ও উম্মে কুলসূম রা, উসামা বিন যায়েদ রা. ও উম্মে আয়মন রা. মদীনায় এসে পৌঁছলেন। ওদিকে আবু বকর রা. এর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকরও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. সহ নিজ পরিবার নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। কিন্তু নবী নন্দিনী হযরত যয়নব রা. এর বের হওয়া সম্ভব হলো না। তাই তিনি স্বামী আবুল আসের কাছে রয়ে যান। পরবর্তী সময় বদর যুদ্ধের পরে হিজরত করেন।[৩৩৩]

আয়েশা রা. বলেন, আমরা যখন মদীনায় এলাম তখন তা ছিল আল্লাহর দুনিয়ার সবচেয়ে মারাত্মক মহামারী-উপদ্রুত ভূখণ্ড। বুতহান উপত্যকা থেকে তখন লোণা পানি প্রবাহিত হতো।

তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পরপরই আবু বকর রা. ও বেলাল রা. অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন আমি একদিন তাদের কাছে গেলাম। আবু বকর রা. কে আমি বললাম, আব্বাজান! আপনার শারীরিক অবস্থা কেমন? বেলাল রা. কে বললাম, হে বেলাল! আপনার শরীরটা কেমন? আয়েশা রা. বলেন, যখন আবু বকরকে জ্বরের প্রচণ্ডতা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরত তখন তিনি বলতেন,

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ... وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

'ঘরের সবাই 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করছে; অথচ মৃত্যু তাঁর জুতোর ফিতার চেয়েও নিকটে'।

---

৩৩১ ইবনে হিশাম ১/৪৯৪-৪৯৬। যাদুল মাআদ ২/৫৫।
৩৩২ সহীহ বুখারী ১/৫৫৬।
৩৩৩ যাদুল মাআদ ২/৫৫।

যখন বেলাল রা. এর খানিকটা হুঁশ ফিরত তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠতেন,

أَلَا لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْماً مِيَاهَ مِجَنَّةٍ ... وَهَلْ تَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيْلُ

'হায় যদি আমি জানতাম যে, কোনো রাত (মক্কার) উপত্যকায় যাপন করতে পারব আর আমার চারপাশে ইযখির ও জালীল (ঘাস বিশেষ) থাকবে!

হায় কোনো দিন কি মিজান্না কূপের পাড়ে নামতে পারব! কোনো দিন কি আমার শামা আর তুফাইল (পর্বত) দেখা হবে'!!

আয়েশা রা. বলেন, তখন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলাম। এসে তাকে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আপনি শাইবা বিন রবীআ, উতবা বিন রবীআ, ও উমাইয়্যা বিন খলফের ওপর অভিসম্পাত নাযিল করুন! কারণ তারা বড় নির্মমতার সঙ্গে আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বের করে এই মহামারী-উপদ্রুত ভূমিতে ঠেলে দিয়েছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ! মক্কা আমাদের কাছে যতটা প্রেমময়ী ও প্রিয়তমা ছিল আপনি মদীনাকেও আমাদের নিকট তত কিংবা তার চেয়েও বেশি প্রেমময়ী করে দিন! এবং এটার আবহাওয়া আপনি নির্মল ও বিশুদ্ধ করে দিন! এর সবকিছুতে আপনি বরকত দিন! এবং তার থেকে আপনি তার জ্বরকে উঠিয়ে জুহফাতে নিয়ে যান! [৩৩৪]

আল্লাহ তাআলা তাঁর দোআ কবুল করলেন। এর পরপরই আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম এলোমেলো ও আলুথালুকেশী এক কৃষ্ণাঙ্গ নারী-প্রকৃতি মদীনা থেকে বের হয়ে মাহয়া তথা জুহফাতে গিয়ে অবতরণ করল। মূলত তা ছিল মদীনার প্লেগ জুহফাতে স্থানান্তরিত হওয়ার একটি নমুনা। এভাবে মুহাজিররা মদীনার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সঙ্গিন অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন তা থেকে নাজাত পেলেন। প্রতিকূলতার ঘনঘোর অন্ধকার রাতের অমানিশা কেটে গিয়ে তাদের জীবনে নেমে এলো শান্তি আর মুক্তির আলোর ভোর।

এই পর্যন্ত ছিল নবুওতের পর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কী জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। এরপরে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর মাদানী জীবনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করব ইনশা-আল্লাহ।

---

[৩৩৪] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৪/১১৯, হাদীস নং ১৮৮৯। আরও দেখুন হাদীস নং ৩৯২৬, ৫৬৫৪, ৫৬৭৭, ৬৩৭২।

মাদানী জীবন

দাওয়াত, জিহাদ ও সফলতার প্রতিশ্রুতি

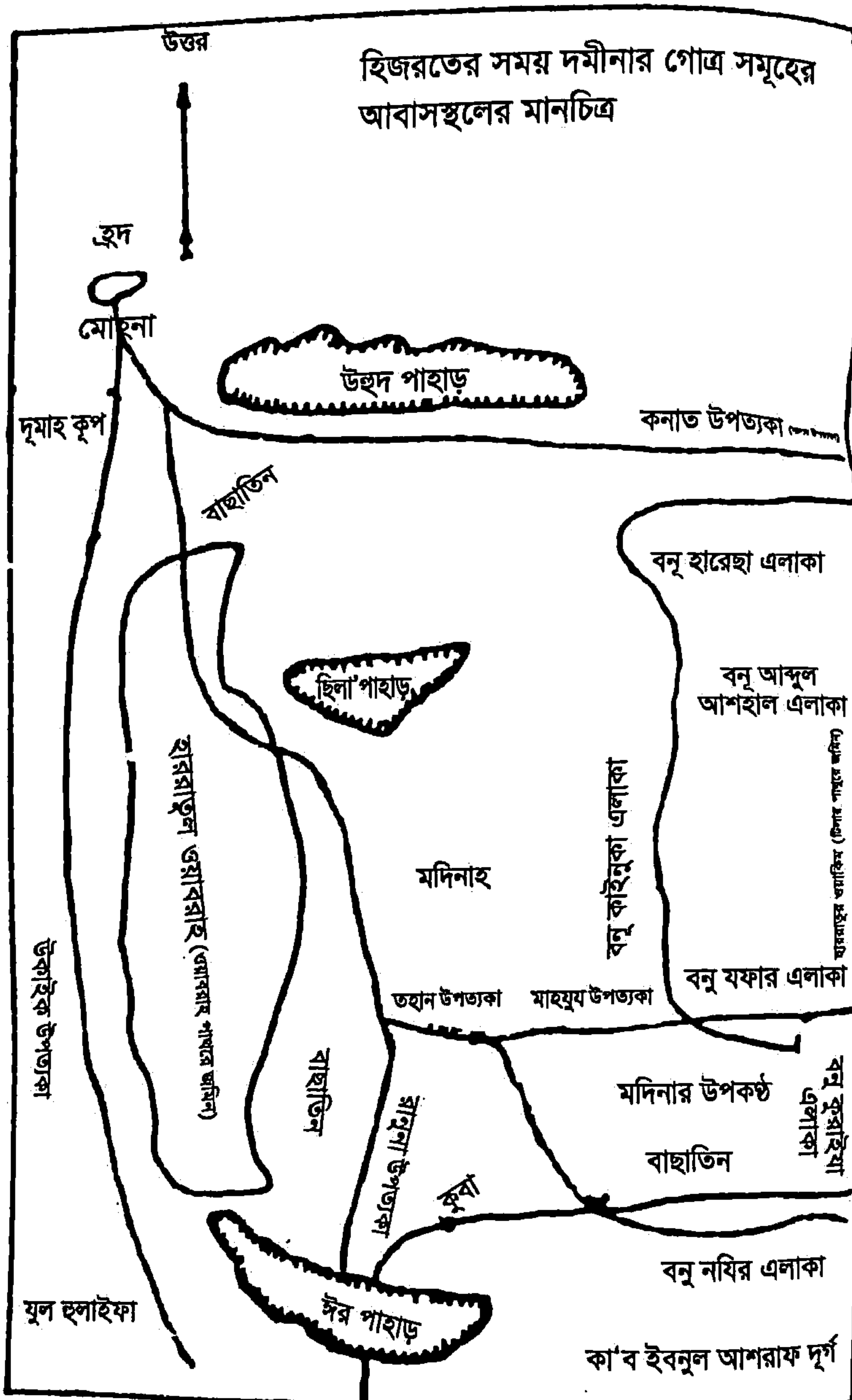
মাদানী জীবনে দাওয়াত ও জিহাদের বিভিন্ন অধ্যায়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাদানী জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের দাওয়াত দৃঢ়করণের অধ্যায়। এ অধ্যায়ে মদীনার ভেতরের শত্রুরা যেমনিভাবে উসকে দিয়েছে একের পর এক বিশৃঙ্খলা আর বিভেদের দাবানল, ঠিক তেমনিভাবে বাইরের শত্রু সেনারাও ঢেউয়ের পর ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েছে মদীনার বুকে। উদ্দেশ্য ছিল, ইসলামের মূলোৎপাটন করা। একেবারে গোড়া থেকে তাকে তুলে সজোরে যমীনে আছড়ে ফেলা। কিন্তু এই অধ্যায় সমাপ্ত হয় হিজরী ষষ্ঠ বছরের যুল কা'দ মাসে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে। যেখানে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জিত হয়েছিল। বছরের পর বছর ধরে চলে আসা মামলায় তারা কাফেরদের ওপর জয়ী হয়েছিল।

খ. জানের দুশমন বড় বড় রাঘব বোয়ালের সঙ্গে সন্ধি। পৃথিবীর দিক-দিগন্তে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেওয়া। চারদিকে ওত পেতে থাকা শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থকরণ। নবী-জীবনের এই অধ্যায় শেষ হয়েছিল হিজরী অষ্টম বর্ষের রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে।

গ. বিভিন্ন দিক থেকে আসা প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানানো ও দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণের অধ্যায়। এ অধ্যায়ের পরিধি ছিল হিজরী একাদশ বর্ষের রবীউল আউয়ালে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পর্যন্ত।


উত্তর
হিজরতের সময় দমীনার গোত্র সমূহের আবাসস্থলের মানচিত্র
হ্রদ
মোহনা
উহুদ পাহাড়
কনাত উপত্যকা
দূমাহ কূপ
বাছাতিন
বনূ হারেছা এলাকা
ছিলা' পাহাড়
বনূ আব্দুল আশহাল এলাকা
মদিনাহ
বনূ কাইনুকা এলাকা
আকীক উপত্যকা
বাছাতিন
তহান উপত্যকা
মাহযুয উপত্যকা
বনু যফার এলাকা
মদিনার উপকণ্ঠ
বাছাতিন
বনূ কুরাইযা এলাকা
কুবা
বনু নযির এলাকা
যুল হুলাইফা
ঈর পাহাড়
কা'ব ইবনুল আশরাফ দূর্গ

হিজরতের প্রাক্কালে মদীনার অধিবাসী ও তাদের সার্বিক অবস্থা

কেবল সব ধরনের ফেতনা ফাসাদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে প্রাণ নিয়ে অন্য কোনো শহরে চলে যাওয়ার নাম হিজরত ছিল না। বরং এর প্রকৃত অর্থ ছিল, আল্লাহর গোটা যমীনের কোনো এক নিরাপদ ভূখণ্ডে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শান্তির পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। আর এ কারণেই হিজরত করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির ওপরই হিজরত ফরয করে দেওয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে সেও এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় অংশ নেওয়ার গৌরব অর্জন করে। তার সৌন্দর্য বর্ধন ও মান-মযার্দা ও শোভা-আভা বৃদ্ধির পেছনে সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করে।

সন্দেহ নেই এই নতুন সমাজের পরিচালক ও এর সৈনিকদের নিরঙ্কুশ সিপাহসালার ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনিই ছিলেন ভাবী এই সমাজের কর্মবিধায়ক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের পর মদীনায় মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সার্বিক অবস্থার বিবেচনায় তারা প্রত্যেকেই ছিল একে অপর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও এই তিন শ্রেণীকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ফিকির করতে হয়।

উল্লিখিত শ্রেণী তিনটি হলো :

১. তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মহান ও সম্মানিত জামাআত।

২. মুশরিক; যারা তাঁর ওপর কখনোই ঈমান আনেনি। তারা ছিল মদীনার প্রকৃত অধিবাসী।

৩. ইহুদি।

১. নিজ সাহাবায়ে কেরামের দিক বিবেচনায় যে পরিস্থিতি তাঁর সামনে এসেছিল তা হলো, সবেমাত্র আসা নতুন এই মদীনা শহর তাদের কাছে এক নতুন রূপ ও লাবণ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। জন্মের পর থেকে কোনোদিন নিজেদের মাতৃভূমি মক্কাকে তারা যে রূপ ও লাবণ্যে জড়ানো দেখেনি। কারণ, মক্কাতে যদিও তাওহীদের এক চিরন্তন কালিমা তাদেরকে ঐক্যের সুতোয় গেঁথে দিয়েছিল এবং তারা একটি সুনির্দিষ্ট কক্ষপথ বেয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত ছিলেন। তারা ছিলেন বিতাড়িত ও যাযাবর। কোনো কিছুতে একটুকু নাক গলানোর

অধিকার তাদের ছিল না। নিজের অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না। বরং তাদের ধর্ম-শত্রুরা সব রকমের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির মালিক বনে বসেছিল। এ কারণে তারা সেখানে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা কোনো দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যেই সমাজের স্বপ্ন দেখে পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানব সমাজ। যে আদর্শ সমাজ থেকে দুনিয়ার কোনো মানব সমাজ বেনিয়ায ছিল না। আর এ কারণে আমরা দেখতে পাই, মক্কী জীবন সীমাবদ্ধ রয়েছে ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালার অল্প-বিস্তর বিবরণ এবং এমন কিছু বিধি-বিধানের ভেতরে, যা সবাই ব্যক্তিগতভাবেই আমল করে নিতে পারে। আখলাক, চরিত্র আর সুন্দর মুআমালাত-মুআশারাতের প্রতি আগ্রহান্বিত হতে পারে এবং দুশ্চরিত্র ও অসৌজন্যবোধ থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে।

এর বিপরীতে মদীনায় আগমনের প্রথম দিন থেকে শুরু করেই সকল ইচ্ছা-স্বাধীনতা আর অধিকার ছিল মুসলমানদের নিজেদের হাতেই। জগতের কোনো মানুষেরই তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালানোর ক্ষমতা ছিল না। আর এটাই তাদের কানে কানে যেন বলে দিলো, 'এখন তোমাদের জীবনকে ঢেলে সাজানোর সময় এসেছে। এখন একটি সুসভ্য সমাজ গড়ার সুযোগ এসেছে। সমাজনীতি ও অর্থনীতি নতুন করে গড়ে তোলার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, এখন হালাল-হারাম আর বিধিবদ্ধ ও নিষিদ্ধ, আখলাক-ইবাদত সবগুলো নিয়ে নতুন করে ফিকির করার সুময় ও সুযোগ হয়েছে। এক কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানব জীবনে যা কিছু প্রয়োজন হয় এখন থেকেই তোমরা তা গুছিয়ে নাও'।

এটি তাদের কানে কানে আরও বলে দিলো যে, 'এখন তোমাদের এমন একটি নতুন আদর্শ ও সুসভ্য সমাজ গড়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে যেই সমাজ তার সর্বদিক দিয়ে জাহেলী সমাজের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যেই সমাজ গোটা বিশ্ব মানবতার যে কোনো সমাজের তুলনায় সর্বদিক দিয়ে সামনে এগিয়ে থাকবে। যার সব বৈশিষ্ট্য হবে অনুপম। যেই সমাজের প্রতিটি কোণে কোণে আর আকাশে বাতাসে মূর্ত হয়ে ফুটে থাকবে দাওয়াতে ইসলামের ঐ নিরুপম প্রতিচ্ছবি, যার জন্য মুসলমানরা দীর্ঘ দশটি বছর এত কষ্ট, যুলুম আর নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছে'।

এখানে একটি ব্যাপার বুঝতে কারও একটুকুও কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, এ সকল আদর্শ আর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সমাজ গড়ে তোলা এক দিন, এক মাস কিংবা এক বছরের কথা নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটি লম্বা সময় ও যুগের, যাতে করে এ সময়ে ধীরে ধীরে একের পর এক শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিধি-বিধান ও নীতিমালা প্রণয়ন করা যায়। আর এ কাজের যিম্মাদারি হাতে তুলে নিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তার বাস্তবায়ন দিকনির্দেশনা,

মুসলমানদেরকে সেই অনুযায়ী আত্মশুদ্ধির তালীম তরবিয়াতের জন্য ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। আর তারা ইতিপূর্বে ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে। [সূরা জুমুআহ : ২]

সাহাবায়ে কেরামও রা. ঠিক একইভাবে তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তাদের ক্বলব ও ক্বালেব নিয়ে সদা সর্বদা দরবারে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর দেওয়া সকল আদেশ-নিষেধ সানন্দে মাথা পেতে মেনে নিতে রাজি ছিলেন। وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا. আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় তাঁর আয়াতসমূহ, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। [সূরা আনফাল : ২]

কিন্তু এ সকল দিকের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এ জন্য যতটুকু পয়োজন ততটুকুর মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ থাকব।

আর এটাই ছিল মুসলমানদের দিক থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর এটাই ছিল সেই সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আর সুউচ্চ প্রত্যাশা যেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আর প্রত্যাশা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল দাওয়াতে ইসলামী আর রিসালতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু এটা তো সবারই জানা কথা যে, তার জন্য কোনো তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না। বরং এটা এমন একটা বিষয় যার জন্য ধীর-স্থিরতাই কাম্য ছিল। তবে হ্যাঁ, কিছু বিষয় সেখানে অবশ্যই এমন ছিল, যার ত্বড়িৎ নিষ্পত্তি ও চূড়ান্ত ফয়সালা অতি দ্রুত প্রয়োজন ছিল। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে বিষয়টি, তা হলো মদীনার মুসলমানগণ তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল:

ক. এক ভাগে ছিল ঐ সকল মুসলমান যারা নিজেদের মাতৃভূমি আর ঘরবাড়িতেই ছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশি কোনো ফিকির কিংবা উদ্বেগ ছিল না যে নিজ ঘরে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছে। তারা ছিলেন আনসার। তবে তারা জ্বলছিলেন বছরের পর বছর ধরে চলে আসা পারস্পরিক হিংসা আর বিদ্বেষের চিতায়।

খ. দ্বিতীয় প্রকারে ছিলেন আরেক শ্রেণীর মুসলমান, যাদের আল্লাহর দুনিয়ায় নিজের বলতে কিছু ছিল না। জগতের বৈষয়িক সকল সম্পত্তি থেকে তাদেরকে

পুরোপুরি মাহরূম করে দেওয়া হয়েছিল। আর এভাবে রিক্তহস্ত ও সর্বস্বহারা হয়েই তারা আশ্রয় নিয়েছিলেন মদীনায় এসে। তারা ছিলেন মুহাজির। এই বিস্তৃত দুনিয়ায় এমন কোনো ভূখণ্ড ছিল না যেখানে গিয়ে তারা একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পেতে পারেন। দুনিয়ার কোনো মহলে এমন কোনো কাজ ছিল না যা করে তারা দু'মুঠো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন। এমন কোনো পয়সা তাদের গাঁটে ছিল না যার মাধ্যমে তাদের জীবন গাড়ির চাকা দু' কদম সামনে চলতে পারে। কিন্তু এ সকল শরণার্থীদের সংখ্যাও কম ছিল না। বরং দিন দিন এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কারণ, তাদের যে-ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছিল, তাকেই হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা তো স্পষ্ট যে, মদীনা কিন্তু তখন ধনে-বলে সমৃদ্ধ ও বিলাসের জোয়ারে ভাসমান কোনো শহর ছিল না। সুতরাং, যা হওয়ার তা-ই হলো। গোটা মদীনার অর্থনীতির পাল্লা উদ্বেগের নাগরদোলায় দুলতে লাগল। এর ভীত নড়বড়ে হয়ে গেল। আর ঠিক একই সময় ইসলামের শত্রুরা লেগে গেল মদীনার অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পেছনে। ফলাফল হলো, সকল পণ্যের আমদানী রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেল। মদীনার অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান আরও সঙ্গিন হয়ে গেল।

২. দ্বিতীয় গোত্র-তারা ছিল মুশরিক। মদীনার প্রকৃত অধিবাসী। কিন্তু মুসলমানদের ওপর তাদের কোনো প্রভাব কিংবা ক্ষমতা ছিল না। তাদের মধ্য থেকে কারও কারও হৃদয়ে স্বীয় বাপ-দাদার ধর্মের প্রতি সন্দেহ আর সংশয় দানা বেঁধে উঠেছিল। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার এক ঝড়ো হাওয়া অনবরত বয়ে চলছিল তাদের হৃদয়পুরীতে। বরং তাদের অনেকে চাচ্ছিল তাদের সেই ধর্মই ছেড়ে দিতে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ষড়যন্ত্র কিংবা শত্রুতা ছিল না। তারা ছিল পরম সৌভাগ্যবান। অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং আল্লাহর দীনের একনিষ্ঠ সেবকে পরিণত হলো।

এদের বিপরীতে তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তরে প্রচণ্ড হিংসা ক্রোধ আর বিদ্বেষ লালন করত। কিন্তু কোনোদিন সরাসরি তাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না। বরং পরিবেশ ও পরিস্থিতির খাতিরে ওপর দিয়ে তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশেই তারা বাধ্য হচ্ছিল। এদের খলনায়ক ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। বুআস যুদ্ধের পরে আউস এবং খাযরাজ তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এটাই ছিল তাদের সর্বপ্রথম ঐকমত্য-ইতঃপূর্বের শত শত বছরেও তারা কোনো দিন কারও নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল না। তখন তারা তার জন্য একটি মুকুট তৈরি করার আয়োজন করছিল। উদ্দেশ্য ছিল সেটি তার মাথায়

পরিয়ে দিয়ে তাকে নিজেদের বাদশাহ হিসেবে চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেওয়া। সে শীঘ্রই নিজেকে তাদের বাদশাহরূপে দেখতে যাচ্ছিল ঠিক এমন সময়ই মদীনা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদধূলিতে ধন্য হলো। তারা তাদের মত পাল্টে ফেলল। এতে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কারণ তার ধারণায় তিনি তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন। এ কারণে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে মনে চরম ঘৃণা ও ক্রোধ লালন করত। কিন্তু সে যখন দেখল যে, শিরকের ওপর থাকলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি কোনোদিনও তার অনুকূলে আসবে না এবং নিশ্চিতই তাকে ইয্যত, সম্মান ও পার্থিব জীবনের সব ধরনের লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হবে তখন সে বদর যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে বসল। এভাবে রাতারাতি সে মুসলমান বনে গেল। কিন্তু তার মনের মণিকোঠায় কুফরের সার্বভৌম রাজত্ব বিরাজমান ছিল। এ কারণে সে যখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কোনো সুযোগ পেত সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে লাগাতে ভুল করত না। আর তার সঙ্গী-সাথী যারা তার ভাবী রাজত্বকালে বিভিন্ন সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করার কথা ছিল তারা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশ নিল। কখনো কখনো তারা কোনো অবোধ ও সরল মুসলমানকে তাদের পরিকল্পনা এমনভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিযুক্ত করত যেন সে টেরই না পায়।

৩. তৃতীয় শ্রেণী ইহুদি। তারা আশুরী ও রোমান কর্তৃক যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়ে হিজাযের এ সকল অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল- যেমনটি আমরা পূর্বেই বলে এসেছি। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল হিব্রু জাতি। কিন্তু ঘরবাড়ি সর্বস্ব ছেড়ে হিজাযে চলে আসার পরে তারা পোশাক-পরিচ্ছদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি আর গন্ধে ও বর্ণে আরবীয় রঙে নিজেদেরকে রাঙিয়ে নেয়। এমনকি তাদের নিজেদের নাম ও গোত্রের নামও আরবি হয়ে যায়। তাদের ও আরবদের মধ্যে বৈবাহিক্ব সম্পর্ক কায়েম হয়। এতকিছু হওয়ার পরেও তাদের জাত্যভিমানকে কিন্তু তারা বিসর্জন দেয়নি। সাম্প্রাদিয়কতা ও গোত্রপ্রীতির দিক দিয়ে তারা পৃথিবীর যে কোনো জাতির চেয়ে অগ্রগামী ছিল। এ কারণে আরবদের সঙ্গে তারা কোনোদিনও পুরোপুরি মিলে যায়নি। নিজেদেরকে তাদের মধ্যে গুলিয়ে ফেলেনি। বরং তারা তাদের ইসরাঈলী-ইহুদি- বংশ নিয়ে গর্ব করত। তারা আরবদেরকে চরম তুচ্ছ করত। আরবদের সম্পদকে তারা নিজেদের জন্য হালাল মনে করত। যেন বাপ-দাদার সম্পদ; যেভাবে ইচ্ছা তারা তা ভোগ করতে পারবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

কোনো কোনো আহলে কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে, যাদের কাছে একটি দীনার আমানত রাখলেও ফেরত দিবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে যে, উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের ওপর কোন পাপ নেই। [সূরা আলে ইমরান : ৭৫]

ধর্মে কর্মে তাদের তেমন একটা মন ছিল না। সে কারণে তার প্রচার-প্রসারের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দিত না। ভাগ্য পরীক্ষা, সুলক্ষণ-কুলক্ষণের দর্শন, টোনা-তাবিজ আর ফুঁ-মন্তরের ভেল্কিই ছিল তাদের কাছে রয়ে যাওয়া তাদের ধর্মের অবশিষ্ট ও সর্বশেষ পুঁজি। আর এগুলির দ্বারাই তারা নিজেদেরকে বড় জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ভাবত। নিজেদেরকে মনে করত এই বিশ্ব পরিচালনার একমাত্র যোগ্য দাবিদার। আধ্যাত্মিক ময়দানের নেতৃত্বদানের সর্বোপযুক্ত ।

ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাদের নাম্বার শূন্য হোক আর যা-ই হোক, জীবিকা নির্বাহ, টাকা-পয়সা আর মাল কামাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার বাহারী রঙ দেখেও না দেখার ভান করার কিন্তু কোনো উপায়ই নেই। বিভিন্ন ফল-ফসল, খেজুর, শরাব আর কাপড়-চোপড়ের বড় বড় ব্যবসায় ছিল তাদের হাত। তারা পৃথিবীর দূর দূরান্ত থেকে কাপড়-চোপড়, শস্যদানা আর শরাব ইত্যাদি আমদানি করত। আর এর বিপরীতে আরবের খেজুর তারা সেসব ভূখণ্ডে রপ্তানি করত। এছাড়াও তাদের অন্যান্য কাজ ছিল, যেগুলো তারা করত। গোটা আরব মিলে বাৎসরিক ব্যবসায়িক খাতে যে পরিমাণ লাভ করত তারা তার কয়েকগুণ বেশি লাভ করত। এ নিয়েই তারা বসে থাকত না বরং তারা সুদ খেত এবং লম্বা লম্বা মেয়াদে তারা আরবের বিভিন্ন গোত্রপতি ও সরদারকে ঋণ দিত। বিনিময়ে কবিদের কাছ থেকে প্রশস্তিগীতি পেত, আর মানুষের মাঝে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। আর ঐ সকল ঋণের পরিবর্তে তারা তাদের কাছ থেকে তাদের ফলের বাগান, চারণভূমি, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি বন্ধক রাখত। পরে কয়েক বছর যেতে না যেতেই তারা সেগুলির মালিক হয়ে বসত।

চিরদিনই ইহুদিরা একটি যুদ্ধ ও বিগ্রহ, ফেতনা ও ফাসাদপ্রিয় জাতি ছিল। এটা ইহুদি চরিত্রের একটা শাশ্বত বৈশিষ্ট্য। কোনোদিনও তাদের ইতিহাস একটি

দিনের জন্য এই চরিত্র থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ঠিক সেই ধারাবাহিকতায় আরবের ইহুদিরা তাদের চারপাশে বসবাসরত কবীলাগুলির মধ্যে সর্বদাই ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধের আগুন উসকে দিত। একেকে অপরের বিরুদ্ধে নিদারুণ প্ররোচিত করত। নিশ্চুপ অথচ জটিল ষড়যন্ত্রের এমন নিশ্ছিদ্র ফাঁদ পাততো যে এসকল কবীলা কোনোদিন তা স্বপ্নেও কল্পনা করত না। ফলে এ সকল কবীলা যুদ্ধের আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু এক আগুন নিভতে না নিভতে তারা তাতে আবারও ঘি ঢেলে দিত। এর ফলে তা আগের চেয়েও আরও তাপে-উত্তাপে পূর্ণোদ্দমে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। যখন এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো তখন তারা বিশ্রামের জন্য বসে যেত। চুপ করে নিষ্পলক নেত্রে দর্শক হয়ে খেলার ফলাফল দেখার জন্য তারা চেয়ে থাকত। তখন এ সকল ফকীর ও হতভাগা আরব কবীলাগুলির ভাগ্যাকাশ যুদ্ধ আর বিগ্রহের ঘনঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যেতে দেখে তারা তামাশা করে মুখ বাঁকিয়ে হাসত। পাশাপাশি তাদেরকে অল্প সুদে অনেক বেশি ঋণ দিত। কারণ, তাদের ভয় ছিল, না জানি খরচের অভাবে তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। এভাবে তারা দু'টি বিশাল ফায়দা কুড়াত; এক. তাদের ইহুদি জাতির ইমেজ ধরে রাখত। দুই. সুদের বাজার সরগরম রাখত এবং এর মাধ্যমে ধন সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলত।

ইয়াসরিবে তাদের তিনটি কবীলা প্রসিদ্ধ ছিল:

১.বনু কাইনুকা,তারা ছিল খাযরাজের মিত্র। মদীনার অভ্যন্তরে তারা বসবাস করত।

২.বনু নাযীর,তারাও ছিল খাযরাজের মিত্র। তারা বাস করত মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায়।

৩.বনু কুরাইযা, তারা ছিল আউসের মিত্র। তারাও বসবাস করত মদীনার সীমান্তবর্তী এলাকায়।

উল্লিখিত গোত্রগুলিই যুগের পর যুগ ধরে আউস ও খাযরাজের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বের আগুন জ্বালিয়ে আসছিল। আর বুআস যুদ্ধে তো তাদের মিত্রদের সঙ্গে তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।

সুতরাং, ইহুদিদের জাতীয় চরিত্রের বিপরীতে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তারা ঘৃণা ও আক্রোশ ব্যতীত কোনো সুনজরে দেখবে এটা যুক্তি ও বিবেকবহির্ভূত অমূলক প্রত্যাশা ছিল। কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের স্বগোত্রীয় ছিলেন না। যদি এমন হতো, তাহলে না আশা করা যেত যে, তিনি তাদের জাত্যভিমানকে যেভাবেই হোক ধরে রাখবেন যা আরও হাজার বছর আগে তাদের ঘাড়ে কোনো এক দুর্ভাগ্য-সন্ধ্যায় চেপে বসেছিল। তা

ছাড়া ইসলাম ছিল এমন ধর্ম, যা সকল কবীলাকে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতি আহ্বান করে। তাদের মধ্য থেকে শত্রুতা ও দুশমনির জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমানত আর অপরের হক্ব ও অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে পবিত্র ও হালাল মাল ভক্ষণ করার অনুমতি দেয়। এর সবকিছুর দাবি ছিল এই যে, মদীনার সবগুলি কবীলার মাঝে বন্ধুত্ব আর সম্প্রীতির একটি সুন্দর বাঁধন কায়েম হবে। তারা একে অপরের বন্ধু হয়ে যাবে। আর তখন নিশ্চিতভাবেই ইহুদিদের বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া জীবাণু থেকে তারা সুরক্ষিত থাকবে। তখন তাদের ব্যবসায় ধস নামবে। তাদের সুদের বাজারে মন্দার মহামারী আপতিত হবে। অথচ এই সুদই তাদের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। বরং আরও আশঙ্কা আছে, সে সেকল কবীলা ও গোত্র জেগে উঠার। তখন তারা সে সকল মালের হিসাব লাগাবে, যা ইহুদিরা সুদস্বরূপ তাদের থেকে নিয়েছে এবং ঐ সকল ফলের বাগান, যমিন ও ভূসম্পত্তি তাদেরকে ফেরত দিতে বাধ্য করবে, যা সুদ আদায় করতে না পারার কারণে তারা তাদের থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল।

যেদিন ইহুদিরা বুঝতে পারল যে, ইসলাম ইয়াসরিবের মাটিতে স্থায়ী ও শক্তিশালী আবাসভূমি গড়ে তুলতে যাচ্ছে সেদিন থেকেই ইহুদিরা এ সবকিছুর পূর্ণ হিসাব রাখছিল। যেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দাখিল হলেন সেদিন থেকেই তারা তাদের অন্তরে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন শত্রুতা লালন করছিল। কিন্তু তখনো এগুলি প্রকাশ করার সাহস না থাকলেও পরবর্তীতে ঠিকই প্রকাশিত হয়েছিল।

উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা রা. থেকে ইবনে ইসহাকের বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ইবনে ইসহাক বলেন, আমি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রা. থেকে এই বর্ণনা পেয়েছি যে, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার নিকট ছিলাম তার সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। একইভাবে আমার চাচা আবু ইয়াসিরও তার সন্তানদের চেয়েও আমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। জীবনে যতবারই আমার অন্য কোনো ভাই বোনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি ততবারই তারা আমাকেই তাদের কোলে উঠিয়ে নিয়েছেন। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এসে বনু আমর বিন আউফের মহল্লায় অবতরণ করলেন তখন আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতাব আর আমার চাচা আবু ইয়াসির সকাল সকাল তার কাছে যান এবং পুরো দিন কাটিয়ে একেবারে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসেন। তিনি বলেন, তারা ছিলেন তখন সম্পূর্ণ ক্লান্ত, ভগ্নমনোরথ, আলস্য কিংবা দুর্বলতার কারণে যেন হেলেদুলে চলছিলেন। চিরদিনের অভ্যাসমতো আমি তাদের কাছে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু আমি ভারি অবাক হলাম। আল্লাহর কসম! তাদের কেউ আজ আমার দিকে

বিশ্ব মানবতার নেতৃত্বের আসন হারিয়ে ফেলবে। ছিটকে পড়বে সভ্যতার প্রশস্ত রাজপথ থেকে। কেননা, তারা এমন সব জঘন্য অন্যায় আর অপরাধে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে তারা এ আসনে অধিষ্ঠিত থাকার সব রকমের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। আর এখন সক্রিয়ভাবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে এ আসনে অভিষেক হবে তাঁর প্রিয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। দীনে ইবরাহীমের প্রধান উভয় কেন্দ্রের চাবিই আল্লাহ তাআলা এখন তাঁর হাতে তুলে দিবেন। সুতরাং এখন এক নতুন শতাব্দীর উদ্বোধন হবে। এক নতুন পৃথিবীর জন্ম হবে। যে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক নেতৃত্বেরও পট পরিবর্তন হবে। হাত বদল হয়ে এক জাতি থেকে তা অন্য জাতির কাছে চলে যাবে। কারণ, এর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল এমন একটি জাতির হাতে; বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানতের দ্বারা যে জাতি তার ইতিহাস ভরে রেখেছিল। যে জাতির প্রতিটি কদমে কদমে গাদ্দারি আর ধোঁকাবাজির ছাপ ছিল। সুতরাং, এ বিশাল গুরুত্বপূর্ণ আমানত আর তাদের হাতে থাকতে পারে না; বরং তা চলে যাবে এমন এক জাতির কাছে ভালো আর কল্যাণে উথলে ওঠা সমুদ্রে যে জাতি সর্বদা সাঁতরে বেড়াচ্ছিল। যে জাতির প্রতিটি অঙ্গ থেকে খায়র আর বরকতের সুমিষ্ট রসধারা চুইয়ে পড়ছিল। যে জাতির নবীর কাছে আজও সেই কুরআনে কারীমের ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল যেই কুরআনে কারীম সরল ও সত্য পথের দিশারী।

কিন্তু নেতৃত্বের সিংহাসনে এখন যে জাতির অভিষেক হওয়ার কথা ছিল তাঁর রাসূল তো আজও মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে আর গিরি-কন্দরে পথহারা পথিকের ন্যায় মানুষের দ্বারে দ্বারে গলা ধাক্কা খেয়ে ফিরছিলেন। সুতরাং, কীভাবে আসবে নেতৃত্বের সেই পরিবর্তন? কী হবে তার রূপরেখা? আর এটা সম্ভবও বা কীরূপে? এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে আরেকটি বাস্তবতা মেলে ও তুলে ধরে। আর তা হলো, এতদিন ধরে এ জাতির যে যুগ চলে আসছিল এখন সে যুগের পতন ঘটতে যাচ্ছে। এ জাতির এখন খোলস বদল ঘটবে। দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম যুগের যবনিকাপাত ঘটেছে। এখন বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে এসে হাযির হবে আরেকটি নতুন যুগ। পৃথিবীর আকাশে বাতাসে শোনা যাবে এক নয়া অধ্যায়ের আগমনী বার্তা। এটা হবে এমন এক নতুন যুগ; এমন এক নয়া অধ্যায়, যা তার আকার ও আদলে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে পুরনো যুগ আর প্রাচীন অধ্যায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। যার স্রোতধারা ভিন্ন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হবে। এ কারণেই তো এ সময়কার কিছু আয়াতে আমরা দেখতে পাই মুশরিকদের প্রতি দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট কণ্ঠের ধমক। ইরশাদ হয়েছে: وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

ফিরেও তাকালেন না। আমি বুঝতে পারলাম তারা বড়োই চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, আমি আমার চাচা আবু ইয়াসিরকে উদ্দেশ করে আমার আব্বা হুয়াই ইবনে আখতাবকে বলতে শুনলাম,

'তিনিই কি সে-ই জন'?

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! হাঁ'।

চাচাজান বললেন, 'আপনি কি সম্পূর্ণ নিশ্চিত'?

আব্বাজান বললেন, 'হাঁ, আমি হলফ করে বলতে পারি'।

চাচাজান বললেন, 'তাহলে এখন তাঁর ব্যাপারে কী করতে চাচ্ছেন?

আব্বাজান বললেন, 'আল্লাহর কসম! জীবনে যতদিন আছি ততদিন তাঁর সঙ্গে আমার সর্বাত্মক শত্রুতা অব্যাহত থাকবে'।[৩৩৫]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা.এর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসও একই বিষয়টি স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলে। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. ছিলেন ইহুদিদের প্রথম সারির একজন বিজ্ঞ আলেম। যখন মদীনায় বনু নাজ্জারে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সংবাদ পেলেন তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন দরবারে নববীতে। এমন কিছু প্রশ্ন পেশ করলেন যার উত্তর কেবল নবীদের জানা থাকবে। যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সে সকল প্রশ্নের উত্তর পেলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্থানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহুদিরা মূর্খ ও নির্বোধ জাতি। যদি আপনি আমার সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করার আগেই আমার ইসলাম সম্পর্কে তারা জানতে পারে তবে তারা আমাকে আপনার নিকট বোকা সাব্যস্ত করবে। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদেরকে ডেকে পাঠালেন। তারা এলো। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম তখন অন্য এক ঘরে আত্মগোপন করে রইলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কেমন লোক'? তারা সমস্বরে উত্তর দিলো, 'আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী এবং জ্ঞানীর সন্তান, এবং আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক ও সর্বোত্তম লোকের সন্তান'। কিংবা অন্য ভাষায়, 'আমাদের সরদার ও আমাদের সরদারের সন্তান', কিংবা তারা বলল, 'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান, এবং আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত লোক এবং সম্মানিত লোকের সন্তান'। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

৩৩৫ ইবনে হিশাম ১/৫১৮, ৫১৯।

তাদেরকে বললেন, 'এখন বলো তো যদি আব্দুল্লাহ মুসলমান হয়ে যায় তাহলে'? তারা বলল, 'আল্লাহ তাকে এ থেকে রক্ষা করুন'। দুই বার বা তিন বার তারা কথাটি বলল। তখন আব্দুল্লাহ রা. তাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। সকলের সামনে তিনি ঘোষণা দিলেন, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল'। তখন তারা বলল, 'এতো দেখছি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক এবং তার বাপও খারাপ লোক' এবং সেই সময়ই তারা তাঁর নামে বিভিন্ন কুকথা ও অপবাদ দিতে লাগল। অন্য ভাষায়, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. তাদেরকে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় করো। ঐ আল্লাহর কসম যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং তিনি সত্য দীন নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছেন। তখন তারা বলল, তুমি একটা মিথ্যুক।[৩৩৬]

এটাই ছিল ইহুদিদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রথম অভিজ্ঞতা, যা তিনি তাঁর মদীনায় আগমনের পয়লা দিনই তাদের কাছ থেকে অর্জন করেছিলেন।

আর এটাই ছিল মদীনার অভ্যন্তরীণ সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি, সেখানে অবতরণ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

আর মদীনার বাইরের পরিস্থিতি বিবেচনা করতে গেলে বলতে হয়, গোটা মদীনা এমন সব কবীলা ও গোত্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, যারা কুরাইশের ধর্মে বিশ্বাস করত। অথচ এই কুরাইশই ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের প্রধান শত্রু। দীর্ঘ দশটি বছর মুসলমানরা যখন তাদের হাতে ছিল তখন যিন্দিগির সর্বপ্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা, অন্যায় অত্যাচার, যুলুম নির্যাতন আর কত কিছুই না সহ্য করতে হয়েছে সেই অন্ধকারময় দিনগুলিতে। দিন দুপুরে তাদেরকে অনাকাঙ্খিত কতই না সব পরিস্থিতির মুকাবেলা করতে হয়েছে। যেখানে সেখানে তাদের ওপর চালানো হয়েছে লোমহর্ষক নির্যাতন। এরপর যখন তারা হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন তখন কুরাইশরা তাদের সহায়-সম্পদ সবকিছু কুক্ষিগত করে ফেলেছে। তাদের ও তাদের স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং যাকে পেরেছে বন্দী করে রেখেছে। যাকে পেরেছে তাকে

[৩৩৬] দেখুন সহীহ বুখারী ১/৪৫৯, ৫৫৬, ৫৬১।

কঠোর শাস্তি দিয়েছে। এতকিছু করার পরেও তারা তাদের মিশনে ক্ষান্তি দেয়নি। বরং 'সাহেবে রিসালত' তথা নবুওত ও রিসালতের মহা নায়ককে পৃথিবী থেকে নীরবে সরিয়ে দিতে ও তাঁর দাওয়াতের ইতি ঘটাতে লিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রে। এ সকল ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে তারা একটুকুও ত্রুটি করেনি। আর যখন মুসলমানরা মক্কা থেকে মাত্র পাঁচশ' কিলোমিটার দূরের একটি শহরে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে, তখন এটা কোনো দূরের ব্যাপার কিংবা অযৌক্তিক আশঙ্কা ছিল না যে, তারা এখন রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করবে না। এর পেছনেও যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কারণ, তারা একদিকে যেমন জাগতিক হর্তাকর্তা ছিল, অপরদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও তারা ছিল বিশেষ সম্মান ও ইয্যতের পাত্র। আরবের ধর্মীয় পরিমণ্ডলে মর্যাদার এক সুউচ্চ সিংহাসন পাতা ছিল। কারণ, তারা ছিল হারামের অধিবাসী। আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। সে মহান ঘরের রক্ষাকর্তা। সুতরাং, এখানে এ আশঙ্কাও অমূলক ছিল না যে, তারা আরবের অন্যান্য মুশরিককে মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে উসকে দিবে না। পরিশেষে এ সকল শঙ্কা-আশঙ্কা পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হলো। তারা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে তাদের সকল শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করল। পরিস্থিতি এতটা ঘোলাটে হয়ে গেল যে, গোটা মদীনার চতুর্দিকে শত্রুরা কিলবিল করতে লাগল। মদীনার আকাশ ঘোর ঘনঘটায় ছেয়ে গেল। দশদিশি থেকে নেমে এলো হতাশার সাগরে ডোবা এক ঘন কালো সুদীর্ঘ রাত। মদীনার সঙ্গে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হলো। একদিকে মদীনায় বাইরের জিনিসের আমদানি কমে গেল। অথচ অপরদিকে সেখানে শরণার্থীদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলছিল। সুতরাং, এমন বিদঘুটে পরিস্থিতিতে মক্কার ঐ সকল অমানুষ ও তাদের চেলা-চামুণ্ডা আর এই নতুন মাতৃভূমিতে সবেমাত্র পা রাখা এ সকল মুসলমানের মাঝে যুদ্ধের দাবানল জ্বলে ওঠা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

এখন মুসলমানদের জন্য এটা সম্পূর্ণ বৈধ ও যৌক্তিক হয়ে গিয়েছিল যে, যেমনিভাবে ঐ যালিমরা এতদিন তাদের সহায়-সম্পত্তি কুক্ষিগত করে রেখেছিল এখন তারাও তার প্রতিউত্তর দিবে। যে অবর্ণনীয় অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়েছিল এখন তার পাল্টা জবাব দিবে। যেমনিভাবে তারা এতদিন মুসলমানদের জীবনে একটার পর একটা বাঁধার সৃষ্টি করছিল, এখন তারাও তাদের জীবনে বাঁধার সৃষ্টি করবে। কড়ায় গণ্ডায় তাদের পাওনা তাদেরকে মিটিয়ে দিবে। যে পাল্লায় তারা এতদিন মুসলমানদেরকে ওযন করছিল এখন সে পাল্লাতে ঐ একই বাটখারা দিয়ে তাদের ওযনটাও দেখে নিবে। যাতে আর কোনো দিনও তারা মুসলমানদের পথে কাঁটা হওয়ার দুঃসাহস না দেখায়।

আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর যমীন থেকে সবার অলক্ষে সরিয়ে ফেলার দুরভিসন্ধি না করে।

মদীনায় আগমনের পর বহিরাগত এ সকল ঘোলাটে ও উদ্বেগকর পরিবেশ পরিস্থিতির মুখামুখি হয়েছিলেন রিসালতের মহানায়ক সাইয়েদুল মুরসালীন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু তাঁর ওপর অপরিহার্য ছিল যে, তিনি সে সকল বাঁধা ও বিব্রতকর পরিস্থিতির যথাযথ মুকাবেলা করবেন এবং পরিশেষে সফলতার কেতন উড়িয়ে বিজয়ী বেশে বেরিয়ে আসবেন।

তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসকল প্রতিকূলতাকে সুকৌশলে ও সযত্নে সামাল দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হলেন। কারণ আল্লাহর সাহায্য তো সর্বদাই তাঁর অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছিল। সুতরাং তিনি সবাইকে তাদের পাওনা মিটিয়ে দিলেন। যে ভালোবাসা ও অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ছিল তিনি তাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ার্দ্র হলেন। আর যে সমুচিত জবাব ও সাজা পাওয়ার মামলায় ফেঁসে গিয়েছিল তিনি তার বিচার করলেন। এর পাশাপাশি কুরআনে কারীমের শিক্ষাদান, আত্মশুদ্ধি আর মুসলমান ও মুমিনদেরকে সৎ ও সত্য পথের নির্দেশনার অব্যাহত ধারা তো চলছিলই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রিসালতের যিন্দিগিতে শাসানি আর শাস্তির চেয়ে ক্ষমা আর অনুগ্রহের পাল্লাই ভারী ছিল। এর ফলাফল সুস্পষ্ট-মাত্র দশ বছর যেতে না যেতেই গোটা দেশ বরং গোটা পৃথিবীর পরিবেশ ও পরিস্থিতি ইসলামের অনুকূলে এসে গেল। আল্লাহ চান তো আগামী পৃষ্ঠাগুলোর পরতে পরতে আর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে পাঠক সবকিছু খুব কাছ থেকেই দেখতে পাবেন।

প্রথম অধ্যায়
একটি নতুন সমাজের উদ্বোধন

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম হিজরীর ১২ রবীউল আউয়াল, মোতাবেক ৬২২ ঈসাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর জুমুআর দিন মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি সাহাবী আবু আইউব রা. এর ঘরের সামনে নামেন এবং বলেন, **'এটাই হবে আমার বাসস্থান ইনশা-আল্লাহ'**। এরপর তিনি আবু আইউব রা. এর ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

মসজিদে নববী নির্মাণ

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বপ্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ ছিল মসজিদে নববী নির্মাণ। তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য উষ্ট্রীর বসার জায়গাটি পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু সেই জায়গাটুকু ছিল দুই এতীম বালকের। তাই তিনি তাদের থেকে জায়গাটুকু কিনে নিলেন। নিজেও অংশ নিলেন মসজিদ নির্মাণে। পাথর আর ইট বহন করার ফাঁকে ফাঁকে তার পবিত্র রসনা নড়ে উঠে যবান মুবারক থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে আসত,

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ........ فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ»

' হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন! সুতরাং, আনসার ও মুহাজিরদেরকে আপনি মাফ করে দিন'!!

কখনো কখনো তিনি আরও বলে উঠতেন,

هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ... هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ

'এ বোঝা খাইবরের বোঝা নয়; আমাদের রবের কসম! এটা অনেক উত্তম ও পবিত্র'!!

এটি তাঁর সাহাবায়ে কেরামের কর্মোদ্যমে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত। উদ্দাম আর উচ্ছ্বাস বাড়িয়ে দিত বহুগুণে। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে ফেলতেন,

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ... لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

'যদি আমরা বসে থাকি আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করতে থাকেন; তবে এটা তো চরম গোমরাহীর কাজ হবে'!

মসজিদ নির্মাণের জন্য নির্বাচিত সেই জায়গায় মুশরিকদের অনেকগুলি কবর ছিল। কিছু বিরান ভূমি ছিল এবং তার সঙ্গে খেজুর ও গারকদের কয়েকটি গাছ ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে মুশরিকদের কবরগুলিকে

মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো। বিরানভূমিটুকু সমতল করা হলো। খেজুর ও গাছগুলো কেটে কেবলার দিকে আবার রোপন করা হলো। ইসলামের কেবলা ছিল তখন বাইতুল মুকাদ্দাস। দরজার উভয় পায়া পাথর দিয়ে বানানো হলো। মাটি এবং ইট দিয়ে দাঁড় করানো হলো চারদিকের দেয়াল। ছাউনি দেওয়া হলো খেজুর গাছের ডাল আর পাতা দ্বারা। খুঁটি দেওয়া হলো খেজুর গাছের কাণ্ড দ্বারা। মেঝে ছিল নুড়ি পাথর ও বালু মিশ্রিত। পুরো মসজিদে মোট তিনটি দরজা রাখা হলো। কেবলার দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ছিল একশ' হাত। চাওড়াও ছিল একই পরিমাণ কিংবা খানিকটা কম। মূল ভিত্তির গভীরতা ছিল তিন হাত। এই ছিল দুনিয়ার সেই ঐতিহাসিক ঘরের নগণ্য নির্মাণ-সামগ্রী পরবর্তীতে যে ঘর থেকে রচিত হয়েছিল গোটা বিশ্ব জয়ের অভিযান। যে ঘরের মিম্বর থেকে আসা নির্দেশে কেঁপে উঠেছিল গোটা সভ্য আর অসভ্য পৃথিবী। যে ঘরই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বিজয়াভিযান আর সফল পরিকল্পনার রেকর্ড গড়েছিল।

মসজিদের সঙ্গে লাগিয়ে মাটি ও পাথর দিয়ে আরও কয়েকটি ঘর নির্মাণ করা হলো। এগুলোর ছাউনিও ছিল খেজুর শাখা ও পাতা। আর এগুলিই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত স্ত্রীগণ উম্মাহাতুল মুমিনীন রা. এর ঘর। এগুলির নির্মাণ শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবী আবু আইউব রা. এর ঘর থেকে সেখানে চলে আসেন।[৩৩৭]

এটাই ছিল পৃথিবীর বুকের সর্বপ্রথম মসজিদ, যা শুধু নামাযের জন্য নির্মিত ছিল না। বরং এটা ছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে নিত্যদিন তালীমে ইসলাম ও কুরআনের সুধা বিতরণ করা হতো। যেখানে ইসলামের সকল দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা দেওয়া হতো। এটা ছিল এমন একটি সভাকক্ষ শত শত বছর ধরে বিবাদমান জাহেলী যুগের অসভ্য ও অসংস্কৃত গোষ্ঠীগুলোকে যেখানে মিলন মালায় গেঁথে দেওয়া হতো। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ আর বিগ্রহ যাদের হৃদয়গুলিকে একে অপরের বিরুদ্ধে ঘৃণায় ভরে দিয়েছিল, তারা এখানে এসে একে অপরের বন্ধু হয়ে যেত। এটা ছিল একটি জাতীয় আদালত, যেখানে মুশকিল আর জটিল সব মামলার নিষ্পত্তি হতো। আরও আগে বেড়ে বলা যায়, এটি একটি আন্তর্জাতিক পার্লামেন্ট যেখানে বিভিন্ন আইন পাস হতো, যেখানে একটি বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনার পরামর্শ-সভা বসত।

পাশাপাশি এ ঘরই ছিল একটি বিশাল সংখ্যার ফকীর ও হতদরিদ্র মুহাজির মুসলমানের শরণ-শিবির, যাদের সেখানে কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। ছিল না কোনো আত্মীয়-স্বজন কিংবা একটুখানি সহায়-সম্পত্তি।

---

[৩৩৭] সহীহ বুখারী ১/৭১,৫৫৫, ৫৬০। যাদুল মাআদ ২/৫৬।

হিজরতের এই প্রাথমিক দিনগুলিতেই আযানের প্রচলন শুরু হয়েছিল। এ ছিল সেই গুরুগম্ভীর অভ্রভেদী নিনাদ, যা প্রতিদিন পাঁচ বার দিক-দিগন্তে প্রবল আলোড়ন তোলে। যা গোটা দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে নিত্য কম্পন সৃষ্টি করে। যা প্রতিদিন পাঁচবার পৃথিবীর মানুষদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমরা জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। পাশাপাশি তা জগতের প্রত্যেক অহঙ্কারীকে সতর্ক করে দেয়। ইসলাম ব্যতীত আর যে কোনো ধর্মকে বাতিল ও অর্থহীন ঘোষণা করে। তা বলে দেয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক কেবল আল্লাহ তাআলা। সত্য ও গ্রহণযোগ্য দীন কেবল ইসলাম। আর এ আযান স্বপ্নে দেখার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন জলীলুল ক্বদর সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আবদে রাব্বিহী রা.। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমোদন করেন। একই রাতে হযরত উমরও রা. এ স্বপ্ন দেখেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও স্বীকৃতি দেন। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন হাদীস ও সীরাতের বড় বড় গ্রন্থে।৩৩৮

মুসলমানরা সবাই ভাই ভাই হয়ে গেল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের মাঝে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির মারকায মসজিদে নববী নির্মাণের পাশাপাশি আরও একটি অবকাঠামো বিনির্মাণ করেন, যা ছিল ইতিহাসের আরেক বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব অধ্যায়। আর তা হলো তিনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে পরস্পরের ভ্রাতৃত্বের বাঁধনে বেঁধে দিয়েছিলেন।

ইবনে কাইয়্যিম র. বলেন, 'অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস ইবনে মালিকের ঘরে বসে আনসার ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বাঁধন জুড়ে দিলেন। তাদের সংখ্যা ছিল নব্বই জন। অর্ধেক ছিল মুহাজির আর অর্ধেক ছিল আনসার। তিনি সমতা ও সম্প্রীতির ভিত্তির ওপর তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করলেন। বদর যুদ্ধ পর্যন্ত এই ধর্মীয় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতাগণই আত্মীয় স্বজনের পরিবর্তে মৃতের উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতো। এরপর যখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. বস্তুত যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশি হক্বদার। [সূরা আনফাল:৭৫] তখন এই ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্কের পরিবর্তে আত্মীয়তার সম্পর্কই উত্তরাধিকারের ভিত্তি সাব্যস্ত হলো।

কারও কারও মতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় আরেক বার কেবল মুহাজিরদেরকেই একে অপরের ভ্রাতৃত্বের ডোরে গেঁথে

---

৩৩৮ তিরমিযীঃ নামায পর্ব, আযানের সূচনা অধ্যায় ১/৩৫৮, ৩৫৯, হাদীস নং ১৮৯। মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবী দাউদ।

দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মতটি ততটা শক্তিশালী ও প্রমাণিত নয়। কারণ দীন, দেশ আর আত্মীয়তা আগ থেকেই মুহাজিরদেরকে সম্পর্কের ডোরে গেঁথে দিয়েছিল, সুতরাং এখন দ্বিতীয়বার আর তাদেরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আনসারদের দিক বিবেচনায় এ সম্পর্কের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৩৩৯]

ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধনের পেছনে যে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে কাজ করছিল তা হলো, যাতে করে জাহেলী যুগের সকল জাত্যভিমান গলে শেষ হয়ে যায়। জাতি ও দেশ, রঙ ও বর্ণ ভিত্তিক সকল ভেদাভেদ যেন পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেবল ইসলামই যেন হয় সকল সম্পর্ক, সৌভ্রাতৃত্ব আর সংসর্গের ভিত্তি।

সহমর্মিতা, সমবেদনা আর সম্প্রীতি এই অভূতপূর্ব ভ্রাতৃত্ববোধের মাঝে তার সকল রূপ ও লাবণ্য নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। নতুন করে পৃথিবীর মানচিত্রে গড়ে ওঠা এই সমাজ কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল আশ্চর্য আর অদৃষ্টপূর্ব সব আদর্শ আর উদাহরণে।

ইমাম বুখারী র. বর্ণনা করেন, মুহাজিরগণ যখন হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ও সাদ ইবনে রবী' রা. এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিলেন। তখন সাদ বিন রবী' আব্দুর রহমানকে বললেন, 'আমি আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী। সুতরাং, আমার বিত্ত-বিভবকে আমি দুই ভাগে ভাগ করে ফেলব। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে যে তোমার কাছে অধিক সুন্দরী প্রতিভাত হয় তার কথা তুমি আমাকে বলে দাও। আমি তাকে তালাক দিয়ে দিব। এরপর যখন তার ইদ্দত শেষ হবে তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে বরকত দান করুন। আপনি শুধু আমাকে বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন'। তখন তারা তাকে বনু কাইনুকার বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দিলো। এরপর যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর কাঁধে দেখা গেল অবশিষ্ট থাকা পনির ও ঘি'র পুঁটলি। এরপর থেকে তিনি নিত্যদিনই এমন করতে লাগলেন। একদিন তিনি বাজার থেকে ফিরছিলেন, তখন তার গায়ে কিছুটা হলুদের চিহ্ন দেখা গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **'কী ব্যাপার'?** তিনি বললেন, আমি বিবাহ করেছি হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'মহর হিসেবে তাকে কী দিয়েছ'?** তিনি বললেন, 'সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ'।[৩৪০]

---

[৩৩৯] যাদুল মাআদ ২/৫৬।

[৩৪০] সে সময়ে এর মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম। কারও কারও মতে, এক চতুর্থাংশ দীনার। দেখুন সহীহ বুখারী: মুহাজির ও আনসারদের মাঝে নবীজীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন ১/৫৫৩।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আনসারগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে বললেন, 'আমাদের ও আমাদের ভাইদের মাঝে খেজুরের বাগানগুলি ভাগ করে দিয়ে দিন'! তিনি বললেন, **'না, এ হবে না'**। তারা বলল, 'তাহলে তারা আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন আর আমরা উৎপাদিত ফল-ফসলে তাদেরকে অংশীদার করব'। তিনি বললেন, **'ঠিক আছে, এটা হতে পারে'**।[৩৪১]

এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, মদীনার আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদের প্রতি কতটা আন্তরিক, প্রসন্নচিত্ত ও আতিথেয়তাভাবাপন্ন ছিলেন। তাদের জন্য কতটা কুরবানী, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। পাশাপাশি এটাও আমাদের জন্য উপলব্ধি করা ভারি মুশকিল নয় যে, মুহাজিরগণও তাদের এই সম্মান ও ইয্যতের কতটা মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করছিলেন। এ কারণে তারা এটাকে স্বর্ণ-সুযোগ মনে করে আনসারদের কোনো কিছুই হাতিয়ে নেননি। কেবল মেরুদণ্ড সোজা রাখতে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুর বেশি আনসারদের মাল থেকে তারা কোনো দিন ছুঁয়েও দেখেননি।

আসল কথা কি, প্রকৃত অর্থে ভ্রাতৃত্বের এই বাঁধন ছিল একটি সুচিন্তিত হিকমতে এলাহী, দূরদর্শী রাজনৈতিক চিন্তাধারা আর ঐ সমস্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান মুহাজিরগণ মদীনায় এসে যার মুখামুখি হচ্ছিলেন। ইতঃপূর্বে এর প্রতি আমরা ইঙ্গিত দিয়ে এসেছি।

ইসলাম-ভিত্তিক মৈত্রী চুক্তি[৩৪২]

---

[৩৪১] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৪/৩৩৭, হাদীস নং ২০৪৯। আরও দেখুন ২২৯৩, ৩৭৮১, ৩৯৩৭, ৫০৭২, ৫১৪৮, ৫১৫৩, ৫১৫৫, ৫১৬৭, ৬০৮২, ৬৩৮৬। ভ্রাতৃত্বের এই ঘটনা আরও পড়ুন সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৫২৯। সুনানে আবী দাউদ হাদীস নং ২৯২৬। আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৫৬১, মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৪৩৬৬।

[৩৪২] চরম এক সংকটময় যুগ সন্ধিক্ষণে রাসূলে কারীম সা. ইসলাম ভিত্তিক এ মৈত্রী চুক্তির কাজে হাত দিয়েছিলেন। এ ছিল এমন এক সময় যা জাতি ও গোষ্ঠীর বিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জগতের সকল জাতি ও উম্মতকেই এ সময়টি অতিক্রম করে যেতে হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে বিবাদমান ও যুদ্ধাংদেহী উষ্ণ স্বভাবের মানুষগুলির হৃদয় সাম্য আর মৈত্রীর ছোঁয়ায় হীম-শীতল হয়ে যায়। শতধাবিভক্ত বিভিন্ন জাতির মানুষগুলো ঐক্যের সুতোয় গেঁথে এক আত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন আর তাদের মাঝে সেই পুরনো শত্রুতার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার আর এতটুকু সুযোগ থাকে না। অতঃপর যখন সম্পর্কের এ নতুন ভিত মজবুত হয়ে যায় তখন আর নতুন করে মুসলমানদের নিজেদের মাঝে নতুন সম্পর্ক ও মৈত্রী চুক্তির দ্বিতীয় কোনো প্রয়োজন থাকে না। এ কারণেই রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেছেন, لا حلف في الإسلام، وإنما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة। যার সারকথা হলো মৈত্রী যা ছিল সব ছিল জাহেলিয়াতের যুগে। ইসলাম এসে সেগুলো মজবুত করবে। কিন্তু এখন মুসলমানদের মাঝে নতুন করে মৈত্রী চুক্তির আর কোনো সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে, এটা হলো কোনো জাতি বিনির্মাণের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করার পরের কথা। কিন্তু বিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে অবশ্যই এ ধরনের মৈত্রী চুক্তির প্রয়োজন আছে। যেমন প্রয়োজন পড়েছিল স্বয়ং নবীজী সা. এর বেলাতেও। এ কারণে যখন আনাস বিন

যেভাবে মুসলমানদের মাঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক স্থাপন করলেন, একইভাবে আরও একটি চুক্তি করলেন, যার মাধ্যমে জাহেলী আরবের সমস্ত ভোঁজবাজি আর ভেল্কির অবসান ঘটল। গোত্র আর কবীলাভিত্তিক দ্বন্দ্ব দূরীভূত হলো। আর এর মাধ্যমে তিনি একটি শাশ্বত ইসলামী ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেন। নীচে আমরা সেই চুক্তির শর্তগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করছি:

এটা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে লিখিত কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুমিন-মুসলমান এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে এবং তাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে তাদের জন্য ফরমান:-

১. তারা অন্য সমস্ত মানুষ বাদে একই জাতি।

২. কুরাইশের মুহাজিররা নিজেদের আগের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত আদায় করবে[৩৪৩] এবং মুমিনদের মাঝে ইনসাফ ও নিয়ম অনুযায়ী বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে। আনাসারদেরও প্রত্যেক কবীলা নিজেদের আগের নিয়ম অনুযায়ী দিয়ত আদায় করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই মুমিনদের মধ্যে নিয়ম ও ইনসাফের সঙ্গে নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ আদায় করবে।

৩. মুমিনরা কোনো ঋণগ্রস্ত বা অভাবগ্রস্ত মুমিনকে ফিদইয়া কিংবা দিয়তের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী তাদের দান থেকে বঞ্চিত করবে না।

৪.সকল মুমিন ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে, তাদের মধ্যে থেকে যে যুলুম করবে অথবা মুমিনদের মাঝে অন্যায়, পাপ, বাড়াবাড়ি অথবা বিশৃঙ্খলা উসকে দিবে।

৫. আর তাদের সকলের হাত ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। চাই সে তাদের কারও সন্তানই হোক না কেন।

৬. কোনো কাফেরের পরিবর্তে একজন মুমিন অপর মুমিনকে হত্যা করবে না।

৭.কোনো মুমিনের বিরুদ্ধে কোনো কাফেরকে সাহায্য করা যাবে না।

মালিক রা. কে বলা হলো, আপনি কি জানেন রাসুলে কারীম সা. বলেছেন,ইসলামে কোনো মৈত্রী চুক্তি নেই? তিনি বললেন, স্বয়ং আমার ঘরে রাসূলে কারীম সা. মুহাজির ও আনসারদের মাঝে মৈত্রী সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ এখন নেই; কিন্তু এক সময় প্রয়োজনের কারণে ছিল)। [সহীহ বুখারী: কাফালাত পর্ব হাদীস নং ২২৯৪, ৬০৮৩. ৭৩৪০। আরও দেখুন সহীহ মুসলিম ৪/১৯৬০, হাদীস নং ২৫২৯। সুনানে আবী দাউদ হাদীস নং ২৯২৬। আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ৫৬১, মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৪/৩৬৬।

[৩৪৩] অর্থা ইসলামের আগে তাদের যে অবস্থা ছিল।

৮. আল্লাহর যিম্মাদারী এক ও অভিন্ন। একজন সাধারণ ব্যক্তি প্রদত্ত নিরাপত্তা সকলের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে গণ্য হবে।

৯. ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা আমাদের অনুসরণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে সাহায্য ও অন্যান্য মুসলমানের মতো সহযোগিতা। তার ওপর যুলুম করা যাবে না। আবার তার বিরুদ্ধেও কাউকে সাহায্য করা যাবে না।

১০. সমস্ত মুমিনের সন্ধি এক হবে। কোনো মুমিন কোনো মুমিনকে রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার ব্যাপারে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না। বরং সকলে মিলে ইনসাফের সাথে সন্ধি করবে।

১১. সকল মুসলমানের ঐ রক্তের মধ্যে সমান অধিকার থাকবে, যেই রক্ত তাদের কেউ আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করেছে।

১২. মুশরিকরা কুরাইশের কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তির মালের নিরাপত্তা প্রদান করার অধিকার রাখে না এবং মুমিনের বিরুদ্ধে তার হেফযতের জন্য বাঁধা সৃষ্টি করতেও পারবে না।

১৩. যে ব্যক্তি বিনাপরাধে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে এবং তার স্পষ্ট প্রমাণ মিলবে তবে তার বিনিময় হলো কেসাস। হাঁ, নিহত ব্যক্তির পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন রাযি থাকলে অন্য কিছুও হতে পারে।

১৪. সমস্ত মুমিন তার বিপরীতে চলে যাবে। তাদের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা ঠোকা ব্যতীত অন্য কিছু জায়েয হবে না।

১৫. কেনো মুমিনের জন্য জায়েয হবে না কোনো হাঙ্গামাকারী কিংবা বেদআতীকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেওয়া। আর যে তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও ক্রোধ কেয়ামতের দিন। তার কোনো নফল কিংবা ফরয গ্রহণ করা হবে না।

১৬. এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিলে তোমরা আল্লাহর ও তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তুলে ধরবে। [৩৪৪]

মানব সমাজে এগুলোর প্রভাব

এ সকল হিকমত আর চিন্তা-ফিকির ও পরিকল্পনার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নতুন মানব সমাজের গোড়াপত্তন করেন। যার বাহ্যিক চেহারা সুরত দেখেই ঐ সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের সম্যক উপলব্ধি হয়ে যেত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সংস্পর্শে এসে যে সকল বৈশিষ্ট্য শোভায় শোভামণ্ডিত ছিলেন এ সকল মহাত্মা সাহাবায়ে কেরাম

[৩৪৪] ইবনে হিশাম ১/৫০২,৫০৩।

রা.। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সর্বদা দুনিয়া ও দীনের তা'লীম দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোনটা হালাল আর কোনটা হারাম তা তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। মহান ও উত্তম চরিত্রের ওপর উৎসাহিত করতেন। আর তাদেরকে মহব্বত ও ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও মর্যাদাবোধ, ইয্যত ও সম্মান , সর্বোপরি ইবাদত আর আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন।

এক ব্যক্তি তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন ইসলাম উত্তম (অর্থাৎ ইসলামের কোন আমলটা উত্তম)? তিনি বললেন, **'মানুষদেরকে খানা খাওয়ানো, পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া।** [৩৪৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রা. বলেন, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, আমার চোখ যখন তাঁর চেহারা মুহারক দেখতে পেল, আমি নিশ্চিত হলাম এ কোনো মিথ্যুকের চেহারা হতে পারে না। এসে সর্বপ্রথম তিনি যা বলেছিলেন তা ছিল, **"হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচার-প্রসার করো, অন্যকে খাবার দাও, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ধরে রাখো, গভীর রাতের কোলে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে নামাযে দাঁড়িয়ে যাও-এবং নির্বিঘ্নে সোজা জান্নাতে চলে যাও"**।[৩৪৬]

তিনি বলতেন, **"সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অন্যায়-অত্যাচার থেকে নিরাপদ নয়"**।[৩৪৭]

তিনি আরও বলতেন, **"প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি অন্যান্য মুসলমান যার মুখ ও হাত (অর্থাৎ এগুলির অনিষ্ট) থেকে মুক্ত থাকে"**।[৩৪৮]

তিনি বলতেন, **"তোমাদের মধ্য থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার অন্য ভাইয়ের জন্য ঠিক তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে"**।[৩৪৯]

তিনি আরও বলতেন, **"সকল মুমিন একটি দেহের ন্যায়, যদি তার একটি চোখ পীড়িত হয় তবে গোটা শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তার বেদনা ও মর্ম ছড়িয়ে পড়ে, যদি তার মাথা ব্যাথা হয় তবে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হয়ে ওঠে"**।[৩৫০]

---

[৩৪৫] সহীহ বুখারী ১/৬,৯।

[৩৪৬] তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী- মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৬৮।

[৩৪৭] মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।

[৩৪৮] সহীহ বুখারী ১/৬।

[৩৪৯] সহীহ বুখারী ১/৬।

[৩৫০] মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।

তিনি বলতেন, "একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য একটি বিশাল ইমারতের ন্যায়-যার একটি অংশ অপর অংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে জড়িত থাকে"।[৩৫১]

তিনি আরও বলতেন, "তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে হিংসা করো না, একে অন্যের পেছনে পড়ো না; বরং সবাই ভাই ভাই হয়ে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিত্যাগ করা জায়েয নেই"।[৩৫২]

তিনি বলতেন, "সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারও ওপর যুলুম করতে পারে না। শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহও তার প্রয়োজন মিটাতে ব্যস্ত থাকবেন। যে ব্যক্তি অপর মুসলিম ভাইয়ের একটি (দুনিয়ার) মসিবত দূর করবে আল্লাহ তাআলা তার কেয়ামতের কঠিন মসিবতসমূহ থেকে একটি মসিবত দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কোনো দোষ গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলাও তার দোষ গোপন রাখবেন"।[৩৫৩]

তিনি আরও বলতেন, তোমরা পৃথিবীবাসীদের ওপর মেহেরবান হও তবে আসমানবাসীরাও তোমাদের ওপর মেহেরবান হবেন'।[৩৫৪]

তিনি বলতেন, "সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত অথচ তার মুমিন ভাই তার পাশেই ক্ষুধার্ত"।[৩৫৫]

তিনি আরও বলতেন, "মুমিনকে গালি দেওয়া ফাসেকী (পাপাচার), আর তাকে হত্যা করা কুফরী"।[৩৫৬]

এগুলির পাশাপাশি রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়াকেও তিনি সদক্বা ও সওয়াবের কাজ বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এটাও ঈমানের একটি অঙ্গ'।[৩৫৭]

তিনি আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করার প্রতি মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি তাদের সামনে সেগুলির ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য এমনভাবে তুলে ধরতেন, যা তাদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্থান করে নিত। বিবেকের দুয়ার

---

[৩৫১] বুখারী ও মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।
[৩৫২] সহীহ বুখারী ২/৮৯৬।
[৩৫৩] বুখারী ও মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২২।
[৩৫৪] সুনানে আবী দাউদ ২/৩৩৫। তিরমিযী ২/১৪।
[৩৫৫] বাইহাক্বী প্রণীত শুআবুল ঈমান- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪২৪।
[৩৫৬] সহীহ বুখারী ২/৮৯৩। তিরমিযী কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি অধ্যায় (৫২০) ৪/৩১১, হাদীস নং ১৯৮৩।
[৩৫৭] বুখারী ও মুসলিম। দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১২,১৬৭।

খোলার হাঁক দিত। তিনি বলতেন, **'পানি যেভাবে আগুনকে নিঃশেষ করে ফেলে ঠিক সদক্বাও পাপকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে'**।[৩৫৮]

তিনি আরও বলতেন, **'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে তার উলঙ্গাবস্থা থেকে বাঁচিয়ে পোশাক পরিয়ে দিলো আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিয়ে দিবেন। যে মুসলমান অপর কোনো মুসলমানকে ভুখা ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় কিছু খেতে দিবে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খেতে দিবেন। যে মুসলমান তার অপর কোনো মুসলমান ভাইকে তার পিপাসার সময় পানি পান করাবে আল্লাহ তাআলা তাকে (পরকালে) জান্নাতের সুসংরক্ষিত শরাব পান করাবেন'**।[৩৫৯]

তিনি আরও বলতেন, **'আগুন থেকে বেঁচে থাকো, একটি খেজুরের দানা (আল্লাহর পথে সদক্বা) দিয়ে হলেও। যদি তা না পারো তবে (কমপক্ষে) ভালো কথা বলে (কাজটি করে নিবে)'**।[৩৬০]

পাশাপাশি তিনি মুসলমানদেরকে ভিক্ষাবৃত্তির কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার প্রতি সবসময় উদ্বুদ্ধ করতেন। তাদের সামনে ধৈর্য আর অল্পেতুষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলতের দিকগুলো তুলে ধরতেন। এবং ভিক্ষাকে তিনি ভিক্ষুকের চেহারার আঁচড় ও যখম হিসেবে অভিহিত করতেন।[৩৬১] তবে বাধ্য হয়ে কেউ যদি এ বৃত্তি অবলম্বন করে তবে তাকে ভিন্ন ব্যাপার বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের ফযীলত, এর উত্তম বিনিময় ও সওয়াবের কথাও বলতেন। আসমান থেকে নেমে আসা ওহীর সঙ্গে তিনি তাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিককে শক্তভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে কুরআনে কারীম পাঠ করে শুনাতেন, তারাও তাঁকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, দাওয়াতী মিশনের সফল রূপায়ণ শুধু তাঁর একারই দায়িত্ব নয়; বরং তাদের ওপরও রয়েছে এই যিম্মাদারি। তাঁরাও এই গুরুদায়িত্ব কাঁধে বহনের ক্ষেত্রে সমান যিম্মাদার। সুতরাং, তখন এ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এভাবে সাহাবায়ে কেরামের চিন্তা-ফিকির পূর্ণ পরিপক্কতা ও সমৃদ্ধি লাভ করল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতি সমুন্নতির মানদণ্ডে উন্নীত হলো। হাজার বছর ধরে গাফেল হয়ে ঘুমিয়ে থাকা তাদের অনুভূতির তন্ত্রীগুলো জেগে উঠল। তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গোটা বিশ্ব মানবতা ও মানব সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করল। এভাবে তারা আম্বিয়ায়ে কেরামের পরে মানুষের ইতিহাসের সফলতার সানুদেশের সর্বোচ্চ প্রান্তে পৌঁছে গেলেন।

---

[৩৫৮] আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৪।

[৩৫৯] সুনানে আবী দাউদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৬৯। জামিউত তিরমিযী ৪/৫৪৬, হাদীস নং ২৪৪৯।

[৩৬০] সহীহ বুখারী ১/১৯০, ২/৮৯০।

[৩৬১] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী- মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৬৩।

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যদি কারও কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হয় তবে সে যেন যারা চলে গেছেন তাদের পন্থা অবলম্বন করে। কেননা, জীবিতদেরকে ফেতনা ও স্খলন থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সনদ দেওয়া যায় না। তারা ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরাম। তারা ছিলেন এ উম্মতের মাঝে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের হৃদয় আর মনগুলি ছিল সবচেয়ে পবিত্র ও শুচি-শুভ্র। জ্ঞানের দিক দিয়েও তারা ছিলেন সমৃদ্ধ ও পরম প্রাজ্ঞ। কৃত্রিমতা আর বাহ্যিক ঘটা থেকে তারা ছিলেন সবচেয়ে দূরে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর নবীর সঙ্গীরূপে মনোনীত করেছিলেন। তাঁর দীন কায়েমের জন্য তাদেরকে বাছাই করেছিলেন। সুতরাং, তোমরা তাদের প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে। তাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে তাকাবে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। তাদের আখলাক ও চরিত্রের মাধুরী থেকে যতটুকু পারো নিজেদের গায়ে মাখবে। মজবুতির সঙ্গে তাদেরকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। কেননা তারা ছিলেন পূর্ণ সরল ও সঠিক পথে'।[৩৮২]

তাছাড়া রিসালতের এই মহা নায়ক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এমন সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন, পূর্ণাঙ্গতা আর আল্লাহ-প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের এমন এক নিরুপম ছবি ছিলেন, ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব, উত্তম চরিত্র আর সুন্দর কর্মবিধির এমন এক নমুনা ছিলেন- যা মানুষের হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধ করে দূর থেকে তাঁর কাছে টেনে আনত। তাঁর একটি জীবনের জন্য শত শত জীবন বিলিয়ে দিত। কোনো কথা তাঁর মুখ দিয়ে বের হওয়া মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম তা পলকে আমলে পরিণত করার জন্য ছুটে যেতেন। যে কোনো দিকনির্দেশনা কিংবা হেদায়াতী কথা হলেই সাহাবায়ে কেরাম তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ছুটে যেতেন ।

এভাবেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এমন একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন ভূত ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর ইতিহাসে যে সুন্দর সমাজের কোনো নজির নেই। ইতিহাসে এ এক সম্পূর্ণ নতুন সমাজ। বিশ্ব মানবতা ও পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক নতুন সংযোজনা। পাশাপাশি সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই নতুন সমাজের প্রতিটি সদস্যদের জীবনে ধেঁয়ে আসা আপদ আর মুশকিলাতের ঝঞ্ঝাকে তিনি এমন সুন্দর ও সুনিপুণভাবে প্রতিহত করে দিলেন যে, কালের দুর্বিপাক আর যামানার অন্ধকারে বছরের পর বছর হাতড়ে ফেরা হতাশহৃদয় ঐ সকল মানব কাফেলার মুসাফিরগুলো এবার একটুখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল। পেয়েছিল শান্তির পেলব ছোঁয়া।

---

৩৮২ রযীন- মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩২।

এ সকল সমুন্নত ও সমৃদ্ধ মানবীয় গুণাবলীতে সজ্জিত ও শোভিত হয়ে সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই নতুন সমাজের প্রত্যেকটি দিক আর অঙ্গ পরিপূর্ণতায় পৌঁছে গিয়েছিল। যার কারণে পরবর্তী সময়গুলিতে তার বুকে আছড়ে পড়া শত ঝড় আর ঝঞ্ঝাও আপন গন্তব্য থেকে তাকে এক মুহূর্তের জন্য বিমুখ করতে পারেনি। ফলে সে তার কক্ষপথে আপন গতি অব্যাহত রাখল । চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্নভাবে। এভাবে ধীরে ধীরে একদিন সে ঘুরিয়ে দিলো স্বয়ং ইতিহাসের স্রোত ও গতিধারা। পৃথিবী দেখল কুদরতের এক বিস্ময়কর নয়া কারিশমা।

ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি

ঈমান ও আকীদা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি আর রাষ্ট্র ও সমাজের ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো একটি নতুন সমাজ ও একটি নতুন ইসলামী জাতি প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন-পর্ব শেষ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমুসলিমদের সঙ্গেও রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি মনোযোগী হলেন। এর পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা মানব সভ্যতার পরিপূর্ণ শান্তি আর সমৃদ্ধি বিধান করা। পুরো অঞ্চলটিকে একটি সুনির্দিষ্ট সূত্রে গেঁথে দেওয়া। এভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন করে ক্ষমা ও অনুগ্রহ, উদারতা ও সহমর্মিতার এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হলো, জাত্যভিমানের বিষে বিষাক্ত আর রক্ত ও বর্ণ-ভেদের কালিমা প্রলিপ্ত এই জাতিগুলি যা ইতঃপূর্বে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি।

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে, মদীনার আশপাশে যে সকল অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠী বসবাস করত তাদের মধ্যে ইহুদিরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা যদিও তাদের ভেতরে ভেতরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্বেষ আর সীমাহীন শত্রুতা পোষণ করত, তথাপি এখনো তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য কোনো বিবাদ কিংবা দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে সাহস করেনি। এ পরিস্থিতিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে একটি মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন, যার ভেতরে তাদের সমূহ কল্যাণ ও মঙ্গল লুকিয়ে ছিল। ধর্ম ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে এ চুক্তিতে তাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্বাসন-নীতি,জায়গীরদারী ও বিবাদ-বিসংবাদের কোনো কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল না।

এই মৈত্রীচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শর্ত ছিল নিম্নরূপ:

চুক্তিনামার শর্ত

১.বনু আউফের ইহুদিরা ও মুমিনরা মিলে একটি অভিন্ন জাতি বিবেচিত হবে। কিন্তু ইহুদিরা ইহুদিদের ধর্ম পালন করবে আর মুসলমানরা তাদের দীন

মেনে চলবে, তাদের দাস-দাসী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও তাদেরই থাকবে। বনু আউফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদিদের জন্যও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে।

২. ইহুদিরা নিজেরাই নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করবে। একইভাবে মুসলমানদের জীবিকার ব্যবস্থা করা তাদের নিজেদের কাঁধেই থাকবে।

৩. তবে এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কেউ যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে।

৪. অন্যায় ও পাপাচারের পরিবর্তে তারা একে অপরকে কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করবে।

৫. কেউ তার মিত্রের করা অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না।

৬. মযলুমকে সর্বত্র ও সবসময় সাহায্য করতে হবে।

৭. যতক্ষণ সময় যুদ্ধ চলবে ইহুদিরাও মুসলমানদের সঙ্গে এর খরচ বহন করবে।

৮. এই চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য এই ভূখণ্ডে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা ও রক্তপাত ঘটানো হারাম ও নিষিদ্ধ।

৯. যদি এই মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ সদস্যদের মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব ও বিবাদ দেখা দেয়, যা এ ভূখণ্ডের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ; তবে তা তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে।

১০. কোনো কুরাইশকে কিংবা তাদের মিত্র কবীলাকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে না।

১১. যদি ইয়াসরিব হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে পড়ে তবে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে। এবং প্রত্যেক দলই নিজ নিজ জায়গা থেকে দুশমনকে প্রতিহত করবে।

১২. এই চুক্তি কোনো যালিম কিংবা স্বেচ্ছাচারীর অমূলক পথের সহায়ক হবে না। ।[৩৬৩]

এভাবে এই মৈত্রীচুক্তি মজবুত ও সুদৃঢ় করণের মাধ্যমে মদীনা ও তার আশপাশের এলাকাসমূহ নিয়ে একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো। আর এই রাষ্ট্রের রাজধানী শহর ছিল মদীনা। (যদি তাঁর শানে বিশুদ্ধ হয় তবে) বলা যায় এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, প্রধান ও সর্বময় কর্তৃত্বের আধার ছিলেন স্বয়ং সাহেবে রিসালত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্যের পরিধি আরও বিস্তারের নিমিত্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তীতে আরবের অন্যান্য কবীলার সঙ্গেও মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন যেমন হয়েছিলেন ইহুদিদের সঙ্গে।

---

[৩৬৩] দেখুন ইবনে হিশাম ১/৫০৩, ৫০৪।

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

ইহুদি ষড়যন্ত্রের নতুন মাত্রা ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সঙ্গে গোপন আঁতাত

আমরা আগেই বলে এসেছি, মক্কী জীবনে মুসলমানদের ওপর কাফেররা কতটা অত্যাচার আর নির্যাতন চালিয়েছে। পরবর্তীতে তারা যখন হিজরত করেন তখনো তাদের বিরুদ্ধে কতটা ষড়যন্ত্র আর কৌশলে আটকে দেওয়ার ফাঁদ পাতা হয়েছে। এবার হাজারও অপরাধ কিন্তু আগে তারা করেছিল। কিন্তু দু একজন বাদ দিয়ে যখন সকল মুসলমান বাপ-দাদার ভিটে মাটি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে চলে আসেন তখনও কিন্তু তাদের হুঁশ ফিরে এলো না। অন্যায়ের পথ মাড়ানো থেকে তারা নিবৃত্ত হলো না। জাহেলিয়াতের বাহ্য-হিমেল হাওয়ায় নাক ডেকে তখনো তারা গভীর ঘুমে মত্ত ছিল। বরং তাদের এ ঘুম এখন আরও গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করল। মুসলমানদের ওপর তাদের আক্রোশ ও বিদ্বেষ আগের তুলনায় আরও বেড়ে চলল। কারণ তারা দেখেছিল যে, মুসলমানগণ তাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একটি সুন্দর ভূখণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছে। তাদের হৃদয় ও মনে হিংসার অনল প্রবল তেজে জ্বলে উঠল। এ কারণে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের আগে 'রঈসুল আনসার' তথা আনসারদের সরদার বলে খ্যাত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কাছে চিঠি লিখে পাঠালো। সে তখনো মুশরিক ছিল। সুতরাং তারা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলেই 'এক গোয়ালের গরু' ছিল এটা বলা নিষ্প্রয়োজন। সে আনসারদের সরদার হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবতরণ করলেন। তখন তারা সবাই তাঁর ওপর ঈমান এনে ইবনে উবাইকে পরিত্যাগ করল। কুরাইশরা তাঁর ও তাঁর মুশরিক সঙ্গীদের নিকট অত্যন্ত তিক্ত ও কঠোর ভাষায় শাসিয়ে চিঠি লিখল, 'তোমরা আমাদের লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয়তো তোমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করো নতুবা কৌশলে তাকে মদীনা থেকে বের করে দাও। নচেৎ আমরা আমাদের দলবল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বের হবো। তখন তোমাদের পুরুষদেরকে আমরা ধ্বংস করে ফেলব আর নারীদেরকে আমাদের জন্য বৈধ করে নিব'।[৩৬৪]

---

[৩৬৪] আবু দাউদ: বনু নযীর অধ্যায় ২/১৫৪।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কাছে চিঠি পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার মুশরিক স্বধর্মীয় ভাইদের আদেশ পালনের জন্য কোমর বেঁধে নামল। কারণ আগ থেকেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তার চরম হিংসা ও আক্রোশ ছিল। সে ভেবেছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে তার রাজত্বের মুকুট ছিনিয়ে নিজের মাথায় রেখেছেন। আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব বলেন, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তাঁর সতীর্থরা মাটি ও পাথরের মূর্তির গোলামগুলির কাছে গিয়ে পৌছল, তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ব্যাপার চূড়ান্ত করে ফেলল। এ খবর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে পৌছল তখন তিনি নিজে এসে হাযির হয়ে বললেন, **'আমি শুনেছি তোমাদেরকে কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ আর লড়াইয়ের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা তোমাদের ওপর গভীর রেখাপাত করেছে। কিন্তু তোমরা মনে রেখো, আজ তোমরা নিজেরা নিজেদের যে পরিমাণ ক্ষতি করতে যাচ্ছ সে পরিমাণ ক্ষতি তারা তোমাদেরকে কোনোদিনও করতে পারবে না। তোমরা তোমাদের ছেলে-সন্তান ও জ্ঞাতী- গোষ্ঠীকে হত্যা করতে যাচ্ছ'।** যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই বক্তব্য শুনতে পেল তখন তারা ভড়কে গেল।[৩৬৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল তখনো সক্রিয় কোনো বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল না। কারণ সে তার সঙ্গীদেরকে দেখছিল হয়তো তারা ঢিল দিয়েছিল কিংবা প্রকৃত ব্যাপার বুঝতে পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার কর্মকাণ্ড থেকে কিছুটা আঁচ করা যেত যে সে কুরাইশেরই এক চর এবং তাদের চক্রান্তের শক্তিশালী সদস্য। এ কারণে দেখা যেত, মুসলমান ও মুশরিকদের মাঝে বিবাদানল জ্বালানোর ক্ষেত্রে সে কখনো সামান্য একটু সুযোগ পেলেও তা হেলায় যেতে দিত না। আর সে তার জাত-গোষ্ঠী ইহুদিরদেরকে বাগিয়ে নিজের পাশেই রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল কখনো কোনো বিপদ এলে তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। কিন্তু দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত তাদের এ সকল কুটিল চক্রান্তের আগুন যা নিভিয়ে দিত, তা ছিল সাহেবে নবুওতের আল্লাহ প্রদত্ত 'হিকমত'।[৩৬৬]

মুসলমানদের জন্য মসজিদে হারামের দরজা বন্ধের ঘোষণা

এরপর সা'দ বিন মুয়ায রা. একদিন উমরার নিমিত্ত মক্কায় গেলেন। সেখানে উমাইয়্যা বিন খলফের মেহমান হলেন। উমাইয়্যাকে তিনি বললেন, 'একটা নির্জন ও নিরাপদ সময় বের করো তো! আমি কাবা ঘর তওয়াফ করতে চাচ্ছি'।

---

[৩৬৫] প্রাগুক্ত।

[৩৬৬] দেখুন সহীহ বুখারী ২/৬৫৫ ,৬৫৬ ,৯১৬ ,৯২৪।

কথামতো পূর্বাহ্নের খানিকটা পূর্বে তিনি তাকে নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে আবু জাহলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, 'আবু সফওয়ান! তোমার সঙ্গের লোকটি কে'? তিনি বললেন, 'সা'দ'। তখন আবু জাহল তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি দেখছি কতটা নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে মক্কায় এসে কাবা ঘর তওয়াফ করে চলে যাচ্ছ! অথচ তোমরাই কি ঐ সকল ধর্মদ্রোহীকে আশ্রয় দাওনি? তোমরা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাওনি? আল্লাহর কসম! আজ যদি তুমি আবু সফওয়ানের সঙ্গে না থাকতে তবে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারতে না'। তখন সাদ রা. জলদগম্ভীর নাদে তাকে বললেন, 'আজ যদি তুমি আমাকে কাবা ঘরের তওয়াফ থেকে বাঁধা দিতে তবে আমি তোমাকে বাঁধা দিতাম এর চেয়েও তোমার প্রয়োজনীয় ও জরুরি জিনিস থেকে, তখন তা তোমার জন্য আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াত-'মদীনার পথ দিয়ে তোমার বাণিজ্যিক যাত্রা'। [৩৬৭]

কুরাইশের পক্ষ থেকে মুহাজিরদেরকে হুমকি

কিন্তু কুরাইশরা এর চেয়েও বড় ধরনের কোনো খারাপ ও অনিষ্টের ফিকির করছিল। তারা এবার নিজেরাই মুসলমানদেরকে বিশেষ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে বলে ভাবছিল।

এটা তাদের শুধু ধারণা কিংবা কল্পকাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কুরাইশের এই ষড়যন্ত্র আর হীন চক্রান্তের খবর বিশ্বস্ত সূত্রেই পৌঁছেছিল। এ কারণে রাতে তিনি এক মুহূর্তও ঘুমাতেন না। আর ঘুমালেও সাহাবায়ের কেরামের প্রহরায় ঘুমাতেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম র. আয়েশা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা রা. বলেন, মদীনায় আসার পর থেকে শুরু করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ঘুমাতেন না। এরপর এক রাতে তিনি বললেন, **'যদি আমার সাহাবীদের কেউ রাতের বেলা আমাকে পাহারা দেওয়ার যিম্মাদারি নিত'**! আয়েশা রা. বলেন, আমরা ঐ অবস্থাতেই ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ সেখানে তরবারীর মৃদু আওয়াজ পেলাম। তিনি বললেন, **'ওখানে কে'?** আওয়াজ ভেসে এলো, 'সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **'এ সময় ওখানে কী করছ'?** তিনি বললেন, আমার মনে বার বার আপনার সম্পর্কে শঙ্কা দানা বেঁধে উঠছিল এ কারণে আপনাকে পাহারা দেওয়ার জন্য চলে এসেছি'। এ কথা শুনে রাসূলে কারীম

---

[৩৬৭] সহীহ বুখারী: কিতাবুল মাগাযী ২/৫৬৩।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদের জন্য দুআ করলেন। অতঃপর তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।[৩৬৮]

কিন্তু পাহারাদারীর এই ধারা হাতে গনা কয়েকটি রাতের জন্য ছিল না। বরং এটা ছিল সব সময়ের ব্যাপার। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহাবায়ে কেরাম রাতভর পাহারা দিতেন। এভাবে এক সময় যখন নাযিল হলো, وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মানুষ থেকে সুরক্ষিত রাখবেন [সূরা মায়েদা : ৬৭] তখন তাঁবু থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা বের করেন এবং বলেন, **'হে লোকসকল! তোমরা এবার চলে যেতে পারো! কেননা, স্বয়ং আল্লাহ আমার হেফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন'**।[৩৬৯]

দুর্ঘটনা আর বিপদের শঙ্কা কেবল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরেই ছিল না। বরং তারা সমস্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও বিদ্বেষ পোষণ করত। উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় এলেন এবং মদীনার আনসারগণ তাদেরকে আশ্রয় দিলেন, তখন গোটা আরব তাদের বিরুদ্ধে চলে গেল। অবস্থা এমন হলো, অস্ত্র ও হাতিয়ার ছাড়া তারা যেমন রাত যাপন করতে পারতেন না, ঠিক হাতিয়ার ছাড়া ভোর করতেন না'।

যুদ্ধের অনুমতি

এমনি ভাবে যখন চতুর্দিক থেকে বিপদের ঘনঘোর অমানিশা মুসলমানদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছিল, সমূহ আপদ আর মুসীবতের শঙ্কা তাদেরকে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল-এমনি এক হতাশাঘন পরিস্থিতিতে আসমানে এক নবালোকের ঝিলিক দেখা গেল। এ আলোকের ঝিলিক দেখা গিয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন মক্কার মুশরিকদের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেওয়া যেত যে, গোমরাহী আর জাহেলিয়াতের যে অতল অন্ধকার-সমুদ্রে তারা তলিয়ে গেছে, সেখান থেকে তারা আর কোনোদিনও উঠতে পারবে না, তাদের ঘাড় এত বেশি বাঁকা হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর কোনো ঔষধে তা আর সোজা ও ভালো হওয়ার আশা করা যায় না, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। কিন্তু তখনো তা

---

[৩৬৮] সহীহ বুখারীঃ জিহাদ পর্ব, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে পাহারাদারী অধ্যায় হাদীস নং ২৮৮৫। ফাতহুল বারী ৬/৯৫, হাদীস নং ৭২৩১, ফাতহুল বারী ১৩/২৩২। সহীহ মুসলিমঃ আসহাবে রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব পর্বঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. এর শ্রেষ্ঠত্ব ৪/১৮৭৫, হাদীস নং ৪০।

[৩৬৯] জামিউত তিরমিযীঃ সূরা মায়িদার তাফসীর ৫/২৩৪, হাদীস নং ৩০৪৬।

ফরয-কিংবা ওয়াজিব করা হয়েছিল না। আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন- أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ. ঐ সকল লোককে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছে। তাদের ওপর যুলুম করার কারণে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ সক্ষম। [সূরা হজ্জ:৩৯]

পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা আরও কতগুলো আয়াত নাযিল করলেন, যাতে এ কথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধের এই অনুমতি কেবল বাতিলের অন্ধকার দূরীভূত করে হক্বের আলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, اَلَّذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ. তারা এমন লোক যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। [সূরা হজ্জ : ৪১]

যুদ্ধের এই অনুমতি ছিল কেবল কুরাইশের বিরুদ্ধে। এরপর পরিস্থিতির আবর্তন ও দিন-রাতের পরিবর্তনে অনুমতি থেকে ওয়াজিব তথা অপরিহার্যের স্তরে উন্নীত হয়। কুরাইশের সীমা অতিক্রম করে তখন অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী পর্যন্ত তা পৌঁছে যায়। মূল ঘটনা বর্ণনার আগে আমরা এখন সংক্ষেপে জিহাদের বিস্তৃতির সেই অধ্যায় ও ধাপগুলোর ওপর আলোকপাত করছি:

এক. কুরাইশদের যুদ্ধের প্রতিপক্ষ বিবেচনা। কেননা, শত্রুতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তাদের শিবির থেকেই। সুতরাং, এখন মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা, তাদের বৈষয়িক উন্নতির পথ রুদ্ধ করা। তবে কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্যান্য মুশরিক এই বিধানের বাইরে ছিল।

দুই. কুরাইশ ব্যতীত আরবের অন্যান্য মুশরিকের মধ্য থেকে যারা এ ক্ষেত্রে কুরাইশদেরকে সঙ্গ দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেছে। তা ছাড়া অন্যান্য কবীলার যারা স্বতন্ত্রভাবেও মুসলমানদের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়েছিল তারা এই আইনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল।

তিন. মদীনার যে সকল ইহুদির সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৈত্রীচুক্তি ছিল। কিন্তু তারা খেয়ানত করে কুরাইশের সঙ্গে যোগ-সাজশ করেছিল সেই চুক্তিনামা তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও কিতাল করা।

চার. আহলে কিতাবের মধ্য থেকে যারা অর্থাৎ যে সকল খ্রিস্টান মুসলমানদের সঙ্গে আদাওতী ও শত্রুতা শুরু করেছিল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা- যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত হয়ে জিযয়া কর প্রদান করে।

পাঁচ. কিন্তু মুশরিক হোক, ইহুদি হোক কিংবা খ্রিস্টান হোক-তাদের মধ্য থেকে যে-ই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং, ইসলামের কোনো অধিকার ছাড়া তার জান-মালে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। আর তার প্রকৃত হিসাবের যিম্মাদারি থাকবে আল্লাহর হাতে।

মুসলমানদেরকে যখন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবে দেখলেন যে, মক্কার কুরাইশ কাফেরদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে বণিজ্য কাফেলা নিয়ে তাদের সিরিয়ায় যাওয়ার প্রধান পথ নিজেদের আয়ত্বে নিয়ে আসতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন:

এক. এ পথের পার্শ্ববর্তী কবীলাগুলি কিংবা মদীনা ও এ পথের মাঝখানে যে সব গোত্র বাস করে তাদের সঙ্গে মৈত্রী কিংবা অসহিংসতার চুক্তিকরণ। এ কারণে আমরা দেখতে পাই নবী জীবনে সর্বপ্রথম সামরিক পদক্ষেপটি গ্রহণ করার আগে কবীলায়ে জুহাইনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের আবাসভূমি ছিল মদীনা থেকে পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ মাইল দূরে। একইভাবে অন্যান্য সামরিক অভিযানের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অন্যান্য কবীলার সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে বিস্তারিত বিবরণ পাঠক দেখতে পাবেন ইনশা-আল্লাহ।

দুই. এ পথে একের পর এক বাহিনী প্রেরণ।

বদর যুদ্ধের আগের গাযওয়া ও সারিয়া[৩৭০]

যুদ্ধের অনুমতি পাওয়ার পর তা কাজে পরিণত করার নিমিত্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামরিক অভিযান শুরু করেন। এগুলোকে বলা যেতে পারে শত্রু-শিবিরের অবস্থা, অবস্থান ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয়মূলক অভিযান। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

* সাধারণভাবে মদীনাকে ঘিরে থাকা ও বিশেষভাবে মক্কাগামী রাস্তাগুলির অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা।

* এ সকল রাস্তায় বসবাসরত কবীলাগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া।

---

৩৭০ ঐতিহাসিকগণ নবী জীবনের যে সকল অভিযানে স্বয়ং তিনি বের হয়েছেন- যুদ্ধ সংঘটিত হোক বা না হোক- সেগুলোকে গাযওয়া আর যেগুলোতে নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে সিপাহসালার বানিয়ে প্রেরণ করেছেনে সেগুলোকে সারিয়া নামে অভিহিত করে থাকেন।

* ইয়াসরিবের মুশরিক ও ইহুদি, এবং মদীনার আশপাশে ঘূর্ণায়মান যাযাবর গোষ্ঠীগুলিকে জানিয়ে দেওয়া-'মুসলমানরা এখন সবল ও শক্তিশালী। অতীতে তাদেরকে যে দুর্বল মনে করা হতো সে দিনগুলির কথা এখন ভুলে যাও'!

* কুরাইশদেরকেও তাদের ঘাড়-তেড়ামীর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। তাদেরকে বলে দেওয়া যে, জাহেলিয়াত ও মূর্খতার অন্ধকারে আর বুঁদ হয়ে থেকো না। এবার খানিকটা চোখ মেলে বাস্তব অবস্থা পরখ করে নাও। তোমাদের জীবিকা নির্বাহ আর অর্থনীতির ওপর আপদের যে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে তা দেখে নাও। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে তারা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বাসভূমিতে যুদ্ধ আর বিগ্রহের আক্রোশ ঝেড়ে ফেলে দেয়। আল্লাহর পথে বাঁধা দেওয়া ও মক্কায় দুর্বল মুমিন-মুসলমানদেরকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকে। এতে করে মুসলমানদের পথের সকল কাঁটা সরে যাবে। স্বাধীনভাবে মনের সুখে তারা দীনের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়বে জাযীরাতুল আরবের প্রতিটি অলিতে গলিতে আর পথে প্রান্তরে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এ সকল সারিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

এক. সারিয়ায়ে 'সীফুল বাহর'

হিজরী প্রথম বর্ষের ১লা রমযান মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাহিনী প্রেরণ করেন। এতে আমীর নিযুক্ত করেন হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. কে। ত্রিশ জন মুহাজির সাহাবী রা. এর এই ছোট দলটিকে পাঠানো হয়েছিল সিরিয়া থেকে ফিরে আসা কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সার্বিক পরিস্থিতি জানানোর জন্য। তিনশ' লোকের সেই কাফেলার নেতা ছিল আবু জাহল। তারা লোহিত সাগরের কিণারায় অবস্থিত 'ঈস'[৩৭] নামক স্থানের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেন। উভয় বাহিনী যখন মুখামুখি হলো তখন মনে হলো যুদ্ধ বুঝি অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয় বাহিনীর মিত্র মাজদী বিন আমর জুহানী উভয়ের মাঝে মীমাংসা করে দেন। এভাবে যুদ্ধ-পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। হযরত হামযা রা. এর নেতৃত্বে প্রস্তুত এ বাহিনীর পতাকাই ছিল ইসলামের ইতিহাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বাঁধা সর্বপ্রথম পতাকা। এটার রঙ ছিল সাদা। এটা বহন করছিলেন আবু মারসাদ কান্নার ইবনে হুসাইন গানাভী।

দুই. সারিয়ায়ে রাবেগ

প্রথম হিজরীর শাওয়াল, মোতাবেক ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ষাট জন মুহাজির সাহাবীর একটি দল পাঠানো হল। এর আমীর বানানো হল উবাইদা বিন

---

৩৭ লোহিত সাগরের তীরে ইয়ানবা' ও মারওয়ার মধ্যবর্তী একটি স্থান।

হারেস বিন মুত্তালিব রা. কে। বাতনে রাবেগ নামক স্থানে কাফেরদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। তারা ছিল দুইশ' জন। দলপতি ছিল আবু সুফিয়ান। উভয় দলের পক্ষ থেকে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল। কিন্তু কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

এ সারিয়াতেই মক্কা থেকে দু'জন লোক এসে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তারা ছিলেন মিকদাদ ইবনে আমর বাহরানী ও উতবা ইবনে গাযওয়ান মাযেনী রা.।। তারা মুসলমান হয়েই কাফেরদের সঙ্গে অভিযানে বের হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কৌশলে তাদের সঙ্গে গিয়ে সহজে মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হওয়া। উবাইদা রা. এর বাহিনীর পতাকা ছিল সাদা। এটা ছিল সাহাবী মিসতাহ ইবনে উসাসা ইবনে মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ রা. এর হাতে।

তিন. সারিয়ায়ে খার্‌রার[৩৭২]

হিজরী প্রথম বর্ষের যুল কা'দ, মোতাবেক ৬২৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ জন সাহাবীর একটি দল গঠন করে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে একটি কুরাইশ কাফেলা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় তাদেরকে ওসীয়ত করে দেন খাররার নামক স্থান অতিক্রম না করতে। তারা পদব্রজে বের হলেন। দিনের বেলা কোথাও তারা লুকিয়ে থাকতেন আর রাতে সন্তর্পণে পথ চলতেন। এভাবে চলতে চলতে বৃহস্পতিবার ভোরে তারা খাররার গিয়ে পৌঁছলেন। পৌঁছে শুনতে পেলেন গতকালই সেই কাফেলা এ স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে। সা'দ বাহিনীর পতাকা ছিল সাদা। এটা বহন করছিলেন সাহাবী মিকদাদ বিন আমর রা.।

গাযওয়ায়ে আবওয়া বা ওদ্দান[৩৭৩]

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মোতাবেক, ৬২৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে সত্তর জন মুহাজির সাহাবীর একটি দল নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বের হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বিশেষকরে একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি নির্ধারণ করা। তারা যখন ওদ্দান নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন সেখানে খারাপ কিছু দেখতে পেলেন না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুপস্থিতিতে মদীনায় তিনি সা'দ বিন উবাদা রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন।

---

৩৭২ জুহফার নিকটবর্তী একটি স্থান।

৩৭৩ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। এখান থেকে মদীনা লাগোয়া রাবেগের দূরত্ব উনত্রিশ মাইল। আর আবওয়া ওদ্দানের সন্নিকটে একটি স্থান।

এ গাযওয়ার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু যমরার গোত্রপতি আমর বিন মাখশী আয- যমরীর সঙ্গে একটি মৈত্রীচুক্তি করেন। চুক্তির সারকথা ছিল নিম্নরূপঃ

এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বনু যমরার জন্য চুক্তিনামা। তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে। যদি তারা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। তবে হাঁ, আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যদি তারা বিদ্রোহ করে তবে সে ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না। (এ চুক্তি ততদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে) যতদিন না সমুদ্র তাকে সিক্ত করে ফেলে (অর্থাৎ সব সময়ের জন্য)। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করবেন তখন তাদেরকে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে হবে'।[৩৭৪]

এটাই ছিল সাহেবে রিসালতের যিন্দিগির সর্বপ্রথম গাযওয়া। এ জন্য তিনি মদীনা থেকে পনেরো দিন অনুপস্থিত ছিলেন। এ বাহিনীর পতাকা ছিল সাদা। এটা ছিল হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. এর হাতে।

পাঁচ. গাযওয়ায়ে বুয়াত

হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবীউল আউয়াল, মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুইশ' সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে একটি কুরাইশ কাফেলার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বের হন। এ কাফেলায় উমাইয়্যা ইবনে খলফসহ একশ' জন কুরাইশী লোক ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল আড়াই হাজার উট। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রযওয়ার পাশ দিয়ে বুয়াত[৩৭৫] নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। কিন্তু খারাপ কিছু দেখতে পেলেন না। এ সময় মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নায়েব ছিলেন সাহাবী সা'দ বিন মুয়ায রা.। পতাকা ছিল সাদা। এটার বাহক ছিলেন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা.।

ছয়. গাযওয়ায়ে সাফাওয়ান

দ্বিতীয় হিজরীর রবীউল আউয়াল, মোতাবেক ৬২৩ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বর মাসে কুরয ইবনে জাবের আল ফিহরী মুশরিকদের একটি দল নিয়ে গোপনে মদীনার চারণভূমির ওপর অতর্কিত হামলা চালালো এবং মুসলমানদের কিছু পশু লুণ্ঠন করল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পশ্চাদ্ধাবনের নিমিত্ত সত্তর জন সাহাবীর একটি দল নিয়ে নিজেই বের হলেন এবং বদরের

---

[৩৭৪] দেখুন মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যাহ ১/৭৫, আল্লামা যুরক্বানী কৃত শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যাহ।

[৩৭৫] বুওয়াত ও রযওয়া দু'টি পাহাড়ের নাম। সিরিয়াগামী রাস্তার পাশে এ পাহাড় দু'টি অবস্থিত। এখানে পাহাড় দু'টি হলেও এর গোড়া ও মূল কিন্তু একটি। অর্থাৎ একটি পাহাড় থেকে কালে দু'টি শাখা বের হয়েছে। মদীনা থেকে এর দূরত্ব ৪৮ মাইল।

কাছাকাছি সাফাওয়ান নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু কুরয ও তার বাহিনীর সাক্ষাৎ পেলেন না। এভাবে কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ফিরে এলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'গাযওয়ায়ে বদরে উলা' নামে প্রসিদ্ধ।

এ সময় মদীনার আমীর ছিলেন সাহাবী যায়দ বিন হারেসা রা.। পতাকা ছিল সাদা। এটি বহন করছিলেন সাহাবী আলী ইবনে আবী তালিব রা.।

সাত. গাযওয়ায়ে যুল উশাইরা

দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা মোতাবেক ৬২৩ ঈসায়ী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একশ' পঞ্চাশ অথবা দুই শ' জন সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে বের হলেন। বের হওয়ার ক্ষেত্রে কারও ওপর কোনো চাপ প্রয়োগ করা হয়নি। বাহন হিসেবে তাদের ছিল মাত্র ত্রিশটি উট। এগুলিতে তারা একের পর এক ধারাবাহিকভাবে কিছু পথ চলতেন। উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়াগামী একটি কুরাইশ কাফেলার গতিবিধি নির্ধারণ করা। মক্কা থেকে তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পেয়েই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হন। তাতে ছিল কুরাইশের বহু ধন-সম্পদ। মুসলিম বাহিনী যুল উশাইরা[৩৭৬] নামক স্থানে পৌঁছে জানতে পারল কয়েক দিন আগে এ স্থান অতিক্রম করে বাহিনী চলে গেছে। এটাই সেই কাফেলা যার প্রত্যাবর্তনের সময় আরেকটি বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। আর সেখান থেকেই হয়েছিল গাযওয়ায়ে বদরে কুবরার সূত্রপাত।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন জুমাদাল উলার শেষের দিকে, আর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন জুমাদাল উখরার শুরুতে। আর এ কারণেই হয়তো সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ গাযওয়ার মাস নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন।

এ গাযওয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনু যমরার সঙ্গে অসহিংসতার চুক্তি করেছিলেন।

এ সময় মদীনার শাসক ছিলেন সাহাবী আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযূমী রা.। পতাকা ছিল সাদা। এটি বহন করছিলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.।

আট. সারিয়ায়ে নাখলা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় হিজরীর রজব মোতাবেক ঈসায়ী ৬২৪ সনের জানুয়ারী মাসে ১২ জন মুহাজির সাহাবীর একটি বাহিনীকে

---

[৩৭৬] ইয়ানবার সন্নিকটে অবস্থিত এ স্থানটির নাম নাম উশাইরা। কেউ কেউ বলেন উশাইর-া। আবার কারও মতে, উসাইরা।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী রা.এর নেতৃত্বে নাখলার দিকে প্রেরণ করেন। তাদের উট ছিল ছয়টি। প্রত্যেক দু'জনে ধারাবাহিকভাবে একটি উটের ওপর আরোহণ করে পথ চলতেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, **ঠিক দুই দিন চলার পরে চিঠিটি খুলে দেখবে তাতে কী লেখা আছে, অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করবে'**। আব্দুল্লাহ বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। ঠিক দুই দিন পথ চলার পরে চিঠি খুলে দেখলেন তাতে লেখা আছে, **"আমার চিঠিটি যখন তুমি খুলে দেখবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে চলে যাবে। সেখানে একটি কুরাইশী কাফেলার অপেক্ষায় থাকবে। এরপর আমাদেরকে তার বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে দিবে"**। চিঠি পড়ে আব্দুল্লাহ রা. বললেন, 'আপনার সকল আদেশ শিরোধার্য'। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু কাউকে বাধ্য করতে চাচ্ছিলেন না। যে শাহাদাতকে ভালোবাসে সে যেন তৈরি হয়ে যায়, আর যে মৃত্যুকে অপছন্দ করে সে যেন ফিরে যায়। কিন্তু আমি শাহাদাতকে ভালোবাসি; বিধায় আমি পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি। তাঁর এ কথা শুনে সকলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু কিছু দূর চলার পরে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও উতবা ইবনে গাযওয়ান রা. তাদের উটটি হারিয়ে ফেললেন। এ কারণে তারা সেটির খোঁজে পেছনে পড়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. সঙ্গীদেরকে নিয়ে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলেন। তখন একটি কুরাইশী কাফেলা কিশমিশ, চামড়া ও ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে সে স্থান অতিক্রম করে। তাদের মধ্যে ছিল আমর বিন হাযরমী, আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরার দুই ছেলে ওসমান ও নওফেল। বনু মগীরার সরদার হাকাম ইবনে কায়সান। তখন মুসলমানরা পরামর্শ করতে বসল। অনেকে বলল, আজকের দিনটি হারাম মাস রজবের সর্বশেষ দিন। এখন যদি আমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হই তবে তো আমরা হারাম মাসের মর্যাদা লঙ্ঘন করলাম। আর যদি আজ রাতের জন্য তাদের থেকে আমরা নিবৃত্ত হই তবে তারা হারাম শরীফের সীমানায় ঢুকে পড়বে। পরিশেষে সর্বদিক বিবেচনা করে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। মুসলিম বাহিনী থেকে একজন আমর বিন হাযরমীর দিকে তীর মারল। এতে সে জায়গায় মারা পড়ল। তারা উসমান ও হাকামকে বন্দী করল আর নওফেল পালিয়ে বেঁচে গেল। এরপর তারা কাফেলার আসবাব-পত্র ও বন্দীদ্বয়কে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলো। এর পূর্বে তারা গনীমতের মাল থেকে 'খুমুস' (তথা এক পঞ্চমাংশ) বের করে রেখেছিল। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম 'খুমুস'। এটাই ছিল ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম বন্দী।

কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কৃতকর্ম পছন্দ করলেন না। তিনি তাদেরকে বললেন, **'আমি তো তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করতে বলিনি'**। এভাবে তিনি গনীমতের মাল ও দুই বন্দীর ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকলেন।

এদিকে কাফেরদের বহু দিনের প্রত্যাশিত 'সোনার হরিণ' নিজে নিজেই দরজায় এসে উপস্থিত হলো। তারা চারদিকে রটিয়ে দিলো মুসলমানরা আল্লাহর কথা বলে আবার নিজেরাই আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল মনে করে। এভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজারো প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগল। এক পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সকল কথার প্রতি উত্তরে ওহী অবতীর্ণ হয়। যাতে বলে দেওয়া হয় যে, কাফেরদের কুকীর্তি তো মুসলমানরা যা করেছে তার চেয়েও আরও মারাত্মক, ভয়াবহ ও জঘন্য (তাহলে তারা মুসলমানদের ব্যাপারটি নিয়ে এত লাফালাফি করে কেন?)। অবতীর্ণ হল–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

তারা তোমার কাছে সম্মানিত মাস অর্থাৎ তাতে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের অবস্থানকারীদেরকে সেখান থেকে বের করা আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর শিরক হত্যা থেকেও মারাত্মক। [সূরা বাকারা : ২১৭]

এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে, মুসলমান মুজাহিদদের চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপনের যে প্রয়াসে কাফেররা হাঙ্গামা সৃষ্টি ও লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে তার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহ করার ক্ষেত্রে, তাদেরকে যুলুম নির্যাতন করার ক্ষেত্রে সমগ্র হারাম ও নিষিদ্ধতার সীমা বহু আগেই পদদলিত করেছে। যখন তারা মুসলমানদের সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাদের নবীকে পৃথিবী থেকে সকলের অগোচরে বিদায় করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল তখন কি তারা হারাম শরীফের অধিবাসী ছিল না। (অথচ হারাম শরীফে কোনো ধরনের রক্তপাত তখনো নিষিদ্ধ ছিল)। তাহলে হঠাৎ করে কীভাবে এখন সেই সব মাসের প্রতি কাফেরদের অনুরাগ ও ভক্তি আবার বেড়ে গেল? হারাম মাসের প্রতি তাদের এই আচানক শ্রদ্ধা ও 'জো হুকুম' এর রহস্য কী? নিজেদের কালিমা-লিপ্ত অতীত ইতিহাস ভুলে মুসলমানদের ঘটনাকে কোন্ মুখে তারা লজ্জা ও কলঙ্কস্বরূপ প্রচার করছে? বাস্তবিকই মিথ্যা প্রচারণা আর প্রপাগান্ডার যেই তুফান কাফেররা গোটা আরবে বইয়ে দিয়েছে তা

তাদের নিজেদেরই আত্মমর্যাদাবোধ ও শ্লীলতার চরম দীনতারই সাক্ষাৎ প্রমাণ দেয়।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেন এবং নিহতের রক্তপণ তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।[৩৭৭]

এই ছিল বদর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া সারিয়া ও গাযওয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ সকল সারিয়া ও গাযওয়াতে মুসলমানরা কখনোই প্রতিপক্ষের জান কিংবা মালের প্রতি হাত বাড়ায়নি। কিন্তু মুশরিকরা যেদিন সর্বপ্রথম কুরয ইবনে জাবের ফিহরীর নেতৃত্বে মুসলমানদের সহায়-সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ায় ও সীমালঙ্ঘন করে, সেদিন থেকে মুসলমানদের জন্যও আর বসে থাকা সমীচীন ছিল না। সুতরাং, উদ্বোধন হয়েছিল মুশরিকদের পক্ষ থেকেই, ঠিক যে দৃশ্যটি দেখা যায় ইসলামী ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ের উষালগ্নে।

যাই হোক, সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশে যা কিছু হয়েছিল কুরাইশদের একেবারে হৃদয়ের ওপর তা চরম প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ভয়াবহ আপদের প্রকৃত চিত্র তাদের সামনে একেবারে মূর্ত হয়েছিল। মুসলমানদের থেকে এক প্রচণ্ড ভীতি তাদের হৃদয়-গভীরে জায়গা করে নিয়েছিল। তারা মুসলমানদেরকে তখন থেকে ভয় পেতে লাগল। কুরাইশরা বুঝতে পারল, মুসলমানরা এখন আর দুর্বল কিংবা ঘুমিয়ে নেই। এখন তারা পুরোপুরি জাগ্রত ও সচেতন। আগের মতো তাদেরকে দুর্বলতার ঔষধ খাইয়ে আর ঘুম পাড়ানোর সুযোগ নেই। এখন মুসলমানরা তাদের প্রতিটি বাণিজ্যিক কাফেলার গতিবিধি কদমে কদমে পরখ করে। আরও উপলব্ধি করে তারা অনেকটা হতাশ ও বিহ্বল হয়ে বসে পড়ল যে, মুসলমানরা এখন তিনশ' মাইল ডিঙিয়ে শত্রুর ওপর হামলা করে তাদের হত্যা করে, তাদের ধন-সম্পদ ও লোকদেরকে বন্দী করে নিরাপদে বিজয়ীবেশে মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম। এবার ঐ সকল মুশরিকরা পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারল যে, আজ থেকে সিরিয়ার পথে এখন তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা জনমের মতো একটা ফাসাদের গেরোকলে আটকা পড়ে গেল। তবুও তাদের গোমরাহী ও নাদানীর ঘুম ভাঙলো না। মূর্খতা তাদের পেছন ছাড়ল না। এতকিছু ভেবে দেখার পরেও এই ইতরপ্রাণ মুশরিকগুলি বিনয় ও নম্র হওয়ার পরিবর্তে, সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তির রাস্তা অবলম্বন করার বদলে -যেমন করেছিল জুহাইনা ও বনু যমরা গোত্রগুলো- আরও বেশি অন্যায়, আক্রোশ ও শত্রুতার পথ বেছে নিলো। তাদের বড় বড় সরদার ও

[৩৭৭] আমরা এ সকল গাযওয়া ও সারিয়ার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেছি: যাদুল মাআদ ২/৮৩-৮৫, ইবনে হিশাম ১/৫৯১-৬০৫ থেকে। তবে এ সকল গ্রন্থে এই গাযওয়া ও সারিয়াগুলোর বিন্যাস ও ক্রমধারার ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। সেখানে বর্ণিত বাহিনীর সদস্য সংখ্যার মধ্যেও যথেষ্ট গরমিল রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তথা যাদুল মাআদের বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল থেকেছি।

নেতাগুলি বেছে নিলো আগের সেই পথ-মুসলমানদেরকে এবার মদীনায় গিয়ে সেখানের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। এই বিদ্বেষ আর আক্রোশই তাদেরকে বদরের ময়দানে এনে মুসলমানদের হাতে ভীষণ মার খাইয়েছিল। হক্কের বিরুদ্ধে যুগে যুগে বাতিলের পরাজয়ের চিরসত্য ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়েছিল।

এদিকে সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের অব্যবহিত পরে হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের শা'বান মাসে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর জিহাদ ও কিতাল ফরয করে দেন এবং এ বিষয়ে কতগুলো আয়াত নাযিল করেন:

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (١٩٠) وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَأَخْرِجُوْهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَإِنْ قَاتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِيْنَ (١٩١) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ফেতনা ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। এরকমই কাফেরদের বদলা। অতঃপর যদি তারা বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায় তাহলে যালিমদের ওপর ছাড়া বাড়াবাড়ি নেই । [সূরা বাক্বারাহ : ১৯০-১৯৩]

এর পরপরই আল্লাহ তাআলা ভিন্ন প্রকৃতির কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন, এতে তিনি মুসলমানদেরকে বলে দেন কীভাবে কাফেরদের ওপর হামলা করে সহজে তাদেরকে পর্যুদস্ত করা যাবে। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। পাশাপাশি যুদ্ধের এ

চরম নেশার শরাব পিয়ে তারা উন্মাদ হয়ে নৈতিকতার সীমা পদদলিত না করেন এ উদ্দেশ্যে পরম গুরুত্বের সঙ্গে যুদ্ধের নীতিমালা বলে দেনঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গরদানে মারো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। [সূরা মুহাম্মাদ:৪-৭]

এরপর আল্লাহ তাআলা ঐ সকল মুসলমানের নিন্দা করে তাদের কাপুরুষতার গোমর ফাঁস করে দেন, যারা যুদ্ধের আয়াত অবতীর্ণ হওয়াতে চরম ভীত হয়ে পড়েছিল। জিহাদের কথা শুনে যাদের প্রচণ্ড হৃদকম্পন শুরু হয়ে গিয়ে তৃষ্ণায় প্রাণ কাতর হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ.

অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছাপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং, ধ্বংস তাদের জন্যে [সূরা মুহাম্মাদ : ২০]

আসল কথা কি যখন মুসলমানদের ওপর আল্লাহ তাআলা জিহাদ ও কিতাল ফরয করে দেন, তাদেরকে এ পথে পরমভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন এবং যথাযথ প্রস্তুতি নিতে বলেন-এর সবগুলো তখন সময়েরই দাবি ছিল। সে সময় পৃথিবীর যে কোনো সমরনায়ক ও রণভিজ্ঞ যদি এ সকল পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ম ও গভীর দৃষ্টি বুলাতেন তবে তিনি শত্রু-শিবিরের সমস্ত তর্জন-গর্জন মুহূর্তে ঠাণ্ডা করে ফেলার বিদ্যুৎ-সিদ্ধান্ত নিতেন। সুতরাং, সেখানে আল্লাহ তাআলা যিনি সব সমরনায়কের উর্ধ্বে। সবচেয়ে বেশি রণকুশলী- যিনি সকল অবস্থা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি অবগত তিনি কীভাবে বাস্তবতা ও সময়ের যৌক্তিক দাবিকে উপেক্ষা করে যাবেন? তখনকার সময় ও পরিবেশই চাচ্ছিল-এখন হক্ব ও বাতিলের মধ্যে একটা স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়ার সময় এসেছে। এখন দুই শিবিরের মাঝে একটা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়ে যাক-'এরপর যে বিজয়ী হয় সে টিকে থাক, আর যে পরাজিত হবে সে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়ে বিলুপ্ত হোক'। তাছাড়া সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা. এর ঘটনা কাফেরদের ওপর বজ্র হয়ে আঘাত হেনেছিল। তাদের ঘরের কাছে এসে তাদেরকে মেরে যাওয়ার এ লজ্জাজনক ঘটনা দিবানিশি তাদেরকে যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ করছিল। যেন তারা জ্বলন্ত এ অঙ্গারের ওপর উলট পালট করছিল এবং এ থেকে চিরতরে মুক্তির একটা অমলিন ও নিরঙ্কুশ পথের সন্ধান করছিল।

যুদ্ধের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ আয়াতগুলোর আগ-পিছে দৃষ্টিপাত করলে, স্পষ্ট ভাবে যে কথাগুলো ফুটে ওঠে তা হলো: রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষ দুই শিবিরের ঠিক মাথার ওপর ঝুলছে, যে কোনো সময় তা তাদের মাথায় পতিত হতে পারে। তবে শেষে পাল্লা মুসলমানদের দিকেই ঝুঁকে পড়বে এবং কাঙ্খিত বিজয় শেষে তাদের পদচুম্বন করবে। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখুন, 'আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আদেশ দিচ্ছেন-ওরা তোমাদেরকে যেভাবে তোমাদের জন্ম-ভূমি ও ভিটে-মাটি থেকে বের করে দিয়েছে তোমরাও ঠিক একইভাবে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও'! এরপর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বাতলে দিচ্ছেন যুদ্ধবন্দীদের ওপর আরোপিত নীতিমালা। বলে দিচ্ছেন, 'কাফেররা অস্ত্র ফেলার ঠিক আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমরা রণাঙ্গন তাপ-উত্তপ্ত রাখবে'। এর সবকিছুই স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, বিজয় পরিশেষে মুসলমানদের কপালেই লেখা আছে। কিন্তু এর সবকিছু তখনো পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছিল যাতে করে সকলে আল্লাহর পথে বাতিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে খোদা-প্রদত্ত শক্তির অপূর্ব কারিশমা প্রদর্শন করতে পারেন।

যুদ্ধ-শঙ্কা-ঘন এই উত্তপ্ত পরিবেশে দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মোতাবেক ঈসায়ী ৬২৪ এর ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাস

থেকে মসজিদে হারামের দিকে পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। উদ্দেশ্য ছিল ইহুদিদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল-ঈমান ও মুনাফিক ছিল তাদের পর্দা খুলে গিয়ে প্রকৃত ব্যাপার সবার সামনে ফুটে ওঠে-যারা মুসলমানদের শিবিরে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। এতে করে মুসলমানদের শিবির থেকে তাদেরকে বের করে দেওয়া হলো। আর এভাবেই ইসলামের শিবির আর মুসলমানদের রণসারি সবধরনের গাদ্দার ও মুনাফিক থেকে বিমুক্ত থেকে নির্ভেজাল ঈমানের অমিয় সুধা-দীপ্ত হয়ে হক্বের মশাল পৃথিবীর আকাশে চির অনির্বাণ রাখার দৃঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

তাছাড়া হতে পারে কিবলা পরিবর্তনের এই নির্দেশের ভেতরে আরেকটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়ে গেছে। আর তা হলো, 'এর মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের উদ্বোধন হলো; এটার ইতি ঘটবে ঠিক সেই দিন যেই দিন মুসলমানরা আবার তাদের জন্মভূমি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মক্কাকে কুফর ও শিরকের দুর্গন্ধ থেকে চিরমুক্ত করে ধুয়ে মুছে তাওহীদের রঙে রাঙিয়ে তুলবে। কেননা, কোনো কওমের কিবলা তার শত্রুর হাতে থাকবে এটা কি বড় বিস্ময়ের কথা নয়? আর যদি থেকেও থাকে, তবুও একদিন না একদিন তাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে-যদি তারা হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

স্বয়ং গোটা বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা, সর্বময় ক্ষমতার আধার আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ধরনের আদেশ-নিষেধ আর দিকনির্দেশনা পেয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জিহাদের উদ্যম ও উৎসাহ কয়েকগুণে বেড়ে গেল। জিহাদ ফী সাবীলিল্লার দিকে তাদের আগ্রহ প্রচণ্ড আকার ধারন করল। আল্লাহর কালীমা বুলন্দির জন্য প্রকাশ্য সমরে দুশমনের মুখোমুখি হওয়ার নেশায় বিভোর হয়ে গেলেন।

গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা

হক্ব আর বাতিলের মাঝে নিষ্পত্তিকর ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

গাযওয়ায়ে যুল উশাইরার বর্ণনার সময় আমরা বলে এসেছি, কুরাইশের সেই কাফেলাটি তখন মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সিরিয়ায় চলে যায় সত্য, কিন্তু পরবর্তীতে প্রত্যাবর্তন কালে এটিই গাযওয়ায়ে বদরে কুবরার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর যখন সিরিয়া থেকে মক্কার পথে এই কাফেলার প্রত্যাবর্তনের সময় অত্যাসন্ন হয়ে পড়ে তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার অবস্থান ও গতিবিধি নির্ধারণের জন্য তালহা ইবনে আব্দুল্লাহ আর সাঈদ ইবনে যায়েদ রা. কে উত্তর দিকে প্রেরণ করেন। তারা উভয়ে হাওরা নামক স্থানে পৌছে যাত্রাবিরতি করেন। তখন দলপতি আবু সুফিয়ান তার কাফেলা নিয়ে তাদেরকে অতিক্রম করে। এ অবস্থায় তারা সেখানে একটুকুও দেরি না করে ঝড়োগতিতে মদীনায় ছুটে আসেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলা ছিল তাদের বড় বড় নেতা আর বিত্তশালীদের মূল্যবান ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে ভরপুর। সে কাফেলার বিভিন্ন প্রকার সম্পদ আর জাগতিক প্রাচুর্য বয়ে চলছিল এক হাজার উট, যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার দীনারের (প্রায় দুই শ' সাড়ে বাষট্টি কেজি স্বর্ণ) চেয়ে মোটেও কম হবে না। কিন্তু ভরা-প্রাচুর্য এক কাফেলার প্রহরা ও রক্ষণা-বেক্ষণে নিয়োজিত ছিল মাত্র চল্লিশ জন লোক।

এটা ছিল মুসলমানদের জন্য মক্কাবাসীদের শাহরগে মরণ কাঁমড় বসিয়ে দেওয়ার এক স্বর্ণ-সুযোগ। তাদের অর্থনীতির ওপর যম-আঘাত হানার জন্য একটি মোক্ষম সময়, যা যুগে যুগে তাদেরকে যন্ত্রণার আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকবে। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মাঝে সমুন্নত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, **'প্রবল প্রাচুর্যে ভরা কুরাইশের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা তোমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং, তোমরা বেরিয়ে পড়ো! হতে পারে আল্লাহ তাআলা তা গনীমত স্বরূপ তোমাদের হাতে তুলে দিবেন।**

কিন্তু কারও ওপর তিনি কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করলেন না। বরং যার যার ইচ্ছা-স্বাধীনতার ওপর ছেড়ে দিলেন। কেননা, তারা কেউই ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, হাতিয়ার ও সমরাস্ত্রবিহীন কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার

পরিবর্তে তাদেরকে অস্ত্রে-সজ্জিত কুরাইশের এক বিশাল ঐরাবত-প্রমাণ সামরিক বাহিনীর মুকাবিলা করতে হবে। এ কারণে এক বিশাল সংখ্যক সাহাবী মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন। তারা ধারণা করেছিলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ অভিযানটিও আগের অভিযানগুলোর তুলনায় আদৌ ভিন্ন কিছু হবে না। সে কারণে তিনি কাউকে যুদ্ধে না যাওয়ার ওপর দোষারোপ করেননি।

ইসলামী বাহিনীর শক্তির পরিমাণ ও নেতৃত্ব বণ্টন

এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন শ' তের বা চৌদ্দ কিংবা সতের জন সাহাবী রা. কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। তাদের মধ্যে বিরাশি বা তিরাশি কিংবা ছিয়াশি জন ছিলেন মুহাজির। আর দুই শত একত্রিশ জন ছিলেন আনসার। একষট্টি জন ছিলেন আউসের ও একশ' সত্তর জন ছিলেন খাযরাজ বংশের। কিন্তু এই অভিযানের জন্য তিনি কোনো ব্যাপক প্রচারণা কিংবা মাহফিল করলেন না। খুব ভালো সরো-সামান ও পাথেয়ও সঙ্গে নিলেন না। এর কারণে দেখা গেল গোটা বাহিনীর মধ্যে মাত্র একটি[৩৭৮] কিংবা দু'টি ঘোড়া ছিল-একটি ছিল সাহাবী যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. এর। আর আরেকটি ছিল মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দী রা. এর। উটের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে সত্তরটি। দু'জন কিংবা তিনজন করে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক তাতে আরোহণ করতেন। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আলী ও মারছাদ ইবনে আবী মারছাদ গানাবী রা. তিনজনে একটি উটের ওপর পালাক্রমে আরোহন করতেন।

মদীনার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা আর মসজিদে নববীতে নামাযের ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করা হলো সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. কে। কিন্তু পরবর্তীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রওহা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির রা. কে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো এবং তিনি মদীনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

পুরো বাহিনীর সবচেয়ে বড় ও মূল পতাকাটি তুলে দেওয়া হলো মুসয়াব ইবনে উমাইর কুরাশী আবদারী রা. এর হাতে। এটির রঙ ছিল সাদা। গোটা বাহিনীকে দুইভাগে ভাগ করা হলো:

এক. মুহাজির বাহিনী: এ বাহিনীর পতাকা দেওয়া হলো আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর হাতে। পতাকাটির নাম ছিল 'উকাব'।

দুই. আনসার বাহিনী: এর পতাকা দেওয়া হলো সাহাবী সা'দ বিন মুয়ায রা. এর হাতে। আর পতাকা দু'টিই ছিল কালো।

---

[৩৭৮] মুসনানে আবী ইয়া'লা ১/২৪২, হাদীস নং ২৮০ এবং ১/২৬০, হাদীস নং ৩০৫। মুসনাদে আহমদ ১/১২৫,১৩৮।

ডান পাশের বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হলো যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. এর কাঁধে। আর বাম দিকের মিকদাদ ইবনে আমর রা. কে। গোটা বাহিনীতে কেবল তারা দু'জনই ছিলেন অদ্বিতীয় অশ্বারোহী। যেমন ইতিপূর্বে গেছে। পেছনের বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হলো কায়স ইবনে আবী সা'সা' রা. কে। আর পুরো মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন নবীয়ে দোজাহান রাসূল মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বদরের পথে মুসলিম বাহিনীর যাত্রা

এভাবে অনেকটা প্রস্তুতি ছাড়াই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাহিনীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন বদরের পথে। মদীনা থেকে বের হয়ে তিনি মক্কাগামী মূল পথ ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন। এভাবে রওহা নামক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলেন। সেখান থেকে আবার যখন চলতে শুরু করেন তখন বাম দিকে মক্কাগামী মূল পথ ছেড়ে বদর প্রান্তরের উদ্দেশে নাযিয়ার দিকে ডানে ঘুরে গেলেন। এরপর নাযিয়ার উপকণ্ঠ দিয়ে নাযিয়া ও মাযীকে সাফরার মধ্যবর্তী ওয়াদীয়ে রুহক্বান অতিক্রম করলেন। এরপর মাযীকে সফরা থেকে ওয়দীয়ে সাফরায় অবতরণ করলেন। এখানে থেকেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসবস ইবনে আমর জুহানী ও আদী বিন আবী যাগবা জুহানী রা. কে কুরাইশী কাফেলার অবস্থান ও গতিবিধির সংবাদ জানার নিমিত্ত বদরের দিকে প্রেরণ করেন ।

মক্কায় কুরাইশী কাফেলার দূত

আগেই আমরা বলে এসেছি যে, সিরিয়া থেকে ফিরতি কুরাইশের এই বিশাল বাণিজ্য কাফেলার সরদার ছিল আবু সফিয়ান। আদতেই সে ছিল বিচক্ষণ, সতর্ক ও চতুর। আগ থেকেই সে জানত যে, মক্কার পথে প্রতিটি পদে পদে বিপদ ওত পেতে আছে। শত্রুসেনা ও প্রেতাত্মারা মুখ ব্যাদান করে আছে প্রতিটি বাঁকে বাঁকে বাণিজ্য কাফেলাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য। এ কারণে সে বিভিন্ন কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করে প্রকৃত ব্যাপার আঁচ করতে পেরেছিল। তার কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ বাহিনীকে তার কাফেলার ওপর আক্রমণের দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান যমযম ইবনে আমর গিফারীকে ভাড়া করে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কাফেলার সাহায্যের আবেদন করে ঝড়ো গতিতে মক্কায় পাঠিয়ে দিলো। যমযম দ্রুত মক্কায় পৌঁছে সেকালের রীতি অনুযায়ী উটের নাক কেটে, হাওদা উল্টিয়ে ও নিজের পরনের জামা ছিঁড়ে-ফেঁড়ে মক্কার এক উপত্যকায় নিজের উটের ওপর দাঁড়িয়ে সমুচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিলো, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, কাফেলা! ... কাফেলা!! আবু সুফিয়ানের কাছে তোমরা তোমাদের যে সম্পদ

অর্পণ করেছ, তা এখন মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের হাতে চলে যাচ্ছে!.....আমি জানি না তোমরা গিয়ে তাকে পাবে কি না? .....সাহায্য! ....সাহায্য'!!!

মক্কাবাসীদের যুদ্ধের প্রস্তুতি

যমযমের এ ঘোষণা মক্কাবাসীদের মধ্যে দারুণ প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। তারা বিদ্যুৎগতিতে যার যার ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে বলল, 'মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা কি আমাদেরকে ইবনে হাযরমীর কাফেলার মতো (দুর্বল) মনে করেছে? তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম! সে অতি শীঘ্রই জানতে পারবে অন্য কিছু। এদিকে মক্কাবাসীদের দু'টি জিনিসের ইখতিয়ার ছিল, হয়তো নিজেই এ বাহিনীর সঙ্গে বের হওয়া নতুবা নিজের বদলে কাউকে পাঠিয়ে দেওয়া। এতে সবাই ঐক্যবদ্ধ হলো এবং একমাত্র আবু লাহাব ছাড়া কুরাইশের সকল নেতা ও সরদার বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু আবু লাহাবও নিজের জায়গায় তার এক করযদারকে পাঠিয়ে দিলো। পাশাপশি তারা তাদের পার্শ্ববর্তী আরবের অন্যান্য কাফেলার লোকদেরকেও জমা করল। তাই দেখা গেল, কবীলায়ে কুরাইশের এক মাত্র বনু আদী ব্যতীত আর কেউ এর থেকে পিছিয়ে রইল না। বনু আদীর একজন লোকও এ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি।

মক্কী বাহিনীর পরিসংখ্যান

যাত্রার শুরুতে কুরাইশী বাহিনীর সংখ্যা ছিল অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত প্রায় এক হাজার তিন শত সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রণকুশলী যোদ্ধা। তাদের কাছে ছিল একশ' ঘোড়া এবং ছয় শ' লৌহ বর্ম। এ বাহিনীতে উটের সংখ্যা ছিল এত বেশি যার সঠিক পরিসংখ্যান বলা দুঃসাধ্য। দলপতি ছিল আবু জাহল ইবনে হিশাম। আর আসবাব পত্রের যিম্মাদারিতে ছিল কুরাইশদের প্রথম শ্রেণীর নয়জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ। খাবারের জন্য তারা একদিন নয়টি আরেকদিন দশটি উট যবাই করত।

বনু বকরকে ঘিরে সমস্যা

যখন কুরাইশের এই বিশাল বাহিনী যাত্রার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করল, তখন হঠাৎ তাদের মনে পড়ল বনু বকরের কথা। কারণ তাদের সঙ্গে তখন তাদের শত্রুতা ও যুদ্ধ -বিগ্রহ চলছিল। তাদের আশঙ্কা হলো, না জানি বনু বকর পেছন থেকে তাদের ওপর হামলা করে বসে! তখন তারা ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল এবং এ যাত্রা থেকে পিছপা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ইবলীস বনু কেনানার সরদার সুরাকা বিন মালিক বিন জু'সুম মুদলিজীর আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি তোমাদেরকে রক্ষা করব বনু কেনানা পেছন থেকে তোমাদেরকে এমন কোনো অনিষ্ট করা থেকে, যা তোমরা অপছন্দ কর।

মক্কী বাহিনীর যাত্রা

এরপর তারা তাদের জনপদ থেকে যাত্রা করে বেরিয়ে এলো। যেমনটি আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর তারা আল্লাহর পথ থেকে বাঁধা দিতে। [সূরা আনফাল : ৪৭]

এবং তারা সম্মুখ পানে অগ্রসর হলো- যেমনটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদ,তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে বিদ্বেষ করে তাদের লোক-লশকর নিয়ে বের হলো। এবং وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হলো। [সূরা ক্বলম : ২৫] নিজেদের কাফেলার ওপর তাদের দুঃসাহসিকতার কারণে।

বদরের উদ্দেশ্যে কাফেলা ঝড়ো গতিতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে উড়ে যেতে লাগল। পথে প্রথমে তারা উসফান উপত্যকায় এসে পৌছল। এরপর কুদাইদ হয়ে জুহফায় গিয়ে অবস্থান করল। জুহফায় এসে তারা আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে এক নতুন বার্তা পেল: 'তোমরা তোমাদের যে কাফেলা, তোমাদের লোক-লশকর ও ধন-সম্পদ বাঁচাতে বের হয়ে এসেছিলে আল্লাহ তাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং, তোমরা এখন যেখানে আছ সেখান থেকে মক্কায় ফিরে চলো'!।

কাফেলা বেঁচে গেল

আবু সুফিয়ানের কাফেলা বেঁচে যাওয়ার কাহিনী হলো, সে আগ থেকেই তার কাফেলা নিয়ে মক্কাগামী মূল পথ ধরে চলছিল। তথাপি সে তার প্রতিটি কদম পূর্ণ সচেতনতা ও সতর্কতার সঙ্গে ফেলছিল। পাশাপাশি সে শত্রুর গতিবিধি জানার মাধ্যম বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দিয়েছিল। যখন বদরের কাছাকাছি গিয়ে তার কাফেলা অগ্রসর হচ্ছিল মাজদী ইবনে আমরের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। আবু সুফিয়ান তাকে মদীনার মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। মাজদী তাকে জানালো, আমি অপরিচিত কাউকে তো দেখিনি কিন্তু দু'জন ঘোড় সওয়ারকে দেখেছি যারা ঐ টিলার পাশে ঘোড়া থামিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। এরপর নিজেদের মশকে পানি ভরে আবার চলে গেল। তখন আবু সুফিয়ান সেখানে দৌড়ে গেল। উটের মল পরীক্ষা করে তাতে খেজুরের বীচি পেল। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! এটা তো ইয়াসরিবের উটের খাবার। এরপর সে তড়িৎ গতিতে কাফেলার কাছে ফিরে এলো। বদর হয়ে বাম দিকে মক্কাগামী মূল পথ ছেড়ে এবার সে সোজা দক্ষিণে গিয়ে সমুদ্র উপকূল দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। এভাবে তারা মদীনার মুসলিম বাহিনীর হাত থেকে বেঁচে গেল এবং মক্কা থেকে আগত

সামরিক বাহিনীর কাছে ফেরত যাওয়ার জন্য চিঠি পাঠালো, যা তারা জুহফাতে বসে পেয়েছিল।

মক্কী বাহিনীর প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা : চরম মতানৈক্য

যখন মক্কী বাহিনী এ চিঠি পেল তখন তারা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু কুরাইশের সবচেয়ে বড় বাঁদর প্রেতাত্মা আবু জাহল চরম দম্ভ আর গর্ব ভরে আস্ফালন করে উঠল। সে বলল, 'আল্লাহর কসম! বদর প্রান্ত দেখার আগ পর্যন্ত আমরা ফিরব না। সেখানে আমরা তিনদিন থাকব। আমাদের পশুগুলি কুরবানী করব। খাবারগুলি খেয়ে ফেলব। শরাবের পেয়ালাগুলি ফুরিয়ে নিব। আমাদের নর্তকীগুলির গান শুনব ও বাহারী নৃত্য দেখব। গোটা আরবের তামাম কবীলা এ কথা জানতে পারবে। এর পর আমরা ফিরে যাব। তাতে হবে কী- গোটা আরবের অন্তরে আমাদের শ্রদ্ধা ও ভয়ের আবহ জন্মাবে। আজীবন তারা আমাদেরকে যুগপৎ শ্রদ্ধা করবে ও ভয় পাবে'।

আবু জাহলের বিরোধিতা করে আখনাস ইবনে শুরাইক ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। কিন্তু সবাই তার কথা মানল না। তখন সে নিজে এবং তার মিত্র বনু যুহরা- সে এই অভিযানে তাদের অধিপতি ছিল- ফিরে গেল। ফলে একজন যুহরীও বদরে অংশগ্রহণ করেনি। তারা ছিল প্রায় তিন শ' জন। বনু যুহরা পরবর্তীতে আখনাস ইবনে শুরাইকের সিদ্ধান্ত নিয়ে গর্ব করত। আজীবন সে তাদের নিকট গণ্যমান্য ও শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিল।

বনু যুহরার দেখাদেখি বনু হাশিমও ফিরে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু আবু জাহল তাদের পথে দানবীয় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। সে সবাইকে বলে দিলো আমরা ফিরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এ দলটি যেন ফিরে যেতে না পারে'।

বনু যুহরা চলে যাওয়ার পর মক্কী বাহিনীর সংখ্যা এসে দাঁড়ালো হাজার যোদ্ধায়। আবু জাহল তাদেরকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলো। চলতে চলতে তারা বদরের উপকণ্ঠে এসে বদর উপত্যকার সীমান্তে অবস্থিত উদওয়াতুল কুসওয়া (দূর প্রান্ত) এর একটি টিলার আড়ালে অবতরণ করল।

সংকীর্ণতা ও সমস্যার আবর্তে মুসলিম বাহিনী

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যাফিরান উপত্যকার পথ ধরে চলছিলেন তখন তাঁর কাছে কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলার নিরাপদে প্রত্যাবর্তন ও সামরিক কাফেলার আগমন সংবাদ এসে পৌঁছে। সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রক্তক্ষয়ী লড়াই এড়ানো এখন আর কোনো সুযোগ নেই। কঠোর মেহনত ও মুজাহাদা, সাহস ও বীরত্ব আর দৃঢ়তা ও অবিচলতা নিয়ে তাদের সামনে বাড়তেই হবে। কারণ, এখন মক্কী বাহিনীকে এই খোলা উপত্যকায় বিমুক্ত নীল আকাশ তলে

স্বাধীন ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হবে নবপ্রতিষ্ঠিত এ নতুন জাতিকে গলা টিপে হত্যা করা। কারণ, এতে তাদের সামরিক শক্তি ও প্রতাপ আরও বৃদ্ধি পাবে। তাদের রাজনৈতিক প্রভাব আরও বড় আকার ধারণ করবে। অপরদিকে মুসলমানদেরকে দুর্বল করে দেওয়া হবে এবং তাদের জন্য এটা বড় লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার কারণ হয়ে দেখা দিবে। বরং হয়তো এরপরে ইসলামী আন্দোলন একটা প্রাণহীন লাশে পরিণত হবে। এবং এ অঞ্চলে যারাই ইসলামের প্রতি সামান্য হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তারাই সেধে ইসলামের গায়ে এসে পড়ার দুঃসাহস দেখাবে।

তাছাড়া এখানে এ ধরনের কী নিশ্চয়তা ছিল যে, মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে গেলেও কাফেররা মদীনার দিকে অগ্রসর হবে না এবং সেখানে মদীনার চার দেয়ালের মাঝে তাদের ওপর হিসাব-কিতাব ছাড়াই গণহত্যা চালাবে না। সত্যিই! যদি মুসলিম বাহিনী একটু ঢিল দিত, তবে তা মুসলমানদের সাহস ও তাদের সুনামের ক্ষেত্রে খারাপ প্রভাব পড়ত।

পরামর্শ সভা

হঠাৎ ধেয়ে আসা এই অতর্কিত ঝড়ের উপস্থিতি দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চ সামরিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। সেখানে তিনি চলমান অবস্থা ও পরিস্থিতির ওপর সম্যক আলোকপাত করলেন। মুসলিম বাহিনীর বড় বড় সরদার ও সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘক্ষণ মতবিনিময় করলেন। ঠিক এই মুহূর্তে এক শ্রেণীর লোকের মন সেই ঝড়ের কথা মনে করে কেঁপে উঠল। তাদের বুকে ধুকধুকানির জোয়ার এলো। রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কথা মনে করে দুরুদুরু বুকের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦)

যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন সত্যের সাথে। অথচ, ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) অপছন্দ করছিল। তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্যের ব্যাপারে তা প্রকাশিত হবার পর; তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছিল। আর তারা দেখছিল। [সূরা আনফাল : ৪-৫]

কিন্তু নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম ও সামরিক নায়কদের মধ্যে আবু বকর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, 'এটি একটি ভালো ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ'। এরপর উমর রা. দাঁড়িয়েও অনুরূপ মত দিলেন। অতঃপর মিকদাদ ইবনে আমর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন আপনি তাতে

চলতে থাকুন! আমরা সর্বদা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর কসম! বনী ইসরাঈলরা নবী মূসা আ. কে যা বলেছিল, فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ অর্থাৎ, "আপনি ও আপনার রব যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব"। আমরা তা কোনোদিনও বলব না। বরং আমরা বলব, 'আপনি ও আপনার রব সামনে যান এবং যুদ্ধ করুন, আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করব'। ঐ আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আপনি আমাদেরকে বারকুল গিমাদ পর্যন্ত নিয়ে যান তবুও আমরা সবাই আপনার সঙ্গী হয়ে তার আগে যত শত্রু আছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যতক্ষণ না আপনি সেখানে গিয়ে পৌঁছবেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বক্তব্য শুনে বললেন, **'ভালো'** এবং তাঁর জন্য তিনি দুআ করলেন।

ওপরোক্ত তিনজন নেতৃবৃন্দ ছিলেন মুহাজির সাহাবীদের মধ্য থেকে। অথচ মুসলিম বাহিনীতে তাদের সংখ্যা ছিল ভারি নগণ্য। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার নেতৃবৃন্দের মনের অবস্থা জানতে চাইলেন। কেননা, তারা ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনশক্তি। তা ছাড়া যুদ্ধের ভার অধিকাংশই তাদের বহন করতে হবে। তথাপি তাদের সঙ্গে চুক্তি ছিল কেবল মদীনার অভ্যন্তরেই প্রযোজ্য। এ কারণে, মদীনার বাইরে এসে মুসলমানদের সঙ্গে তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য ছিল না। তাই তিনি উল্লেখিত তিন নেতার বক্তব্য শুনে বললেন, **'হে লোকসকল! তোমাদের কী ইচ্ছা? আমাকে খুলে বলো'**! মূলতঃ এর দ্বারা তিনি আনসারদেরকে সম্বোধন করেছিলেন। আনসারদের সরদার ও পতাকাবাহী প্রাজ্ঞপুরুষ সাহাবী হযরত সা'দ বিন মুয়ায রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি কি আমাদেরকে উদ্দেশ্য করেছেন?

তিনি বললেন, **'হাঁ'**।

সা'দ বিন মুয়ায রা. বললেন, "আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য। এরপর আমরা আপনার আনুগত্য করা ও আপনার কথা মান্য করার ওপর চুক্তি করেছি। সুতরাং, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মনের ইচ্ছা অনুযায়ী আপনি কাজ করুন। ঐ আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে ঐ সমুদ্র তীরে গিয়ে উপস্থিত

হন, এরপর তার বুকে ঝাঁপ দেন, তবে আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের এক ব্যক্তিও তা থেকে জানের মায়ায় পেছনে রয়ে যাবে না। আপনি যদি আগামী দিন সকালে আমাদেরকে নিয়ে দুশমনের মুখামুখি হন, তবে তাতে আমাদের না-পছন্দীর কিছু থাকবে না। আমরা যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করব। লড়াইয়ে আমরা জোয়ানী ও তেজোদ্দীপ্ত পৌরুষের প্রমাণ দিব। আল্লাহ সম্ভবত আমাদের দ্বারা আপনার চোখ জুড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। সুতরাং, আপনি আমাদেরকে নিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন। আল্লাহ চান তো বরকত দিবেন"।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ রা. এর কথা শুনে খুব খুশি হলেন। এর দ্বারা তার মন দারুণ ফুরফুরে হয়ে উঠল। তিনি বললেন, **"তোমরা সামনে চলো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো, 'আল্লাহ তাআলা আগে আমাকে দু'দলের মধ্য থেকে একটি অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেন এখনই সেই কওমের মৃত্যুঘাট দেখতে পাচ্ছি"।**

মুসলিম বাহিনীর ক্রমবর্ধমান পথচলা

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাফিরান থেকে আবার পথচলা শুরু করেন। এরপর কয়েকটি পাহাড়ী বাঁক মাড়িয়ে - যেগুলিকে আসাফির বলা হতো-দাব্বাহ নামক একটি আবাদ জনপদে অবতরণ করলেন। এরপরে ডানদিকে পাহাড়ের মতো হান্নান নামক বিশালকায় টিলাটি অতিক্রম করে বদরের উপকণ্ঠে পৌছে যাত্রা বিরতি করলেন।

শত্রুর গতিবিধি নির্ধারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদক্ষেপ

এখানে পৌছে স্বয়ং মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় 'গুহার বন্ধু' আবু বকর রা. কে সঙ্গে নিয়ে শত্রু শিবিরের গতিবিধি জানার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। যখন তারা উভয় কুরাইশ শিবিরের আশপাশে হাঁটাচলা করছিলেন তখন এক আরব শাইখের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কুরাইশদের এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। (তাকে এ প্রশ্ন করা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমুন্নত ও পৃথিবীর ইতিহাসের বিরল সমর কৌশলের পরিচায়ক, কারণ তাতে তাঁর গোপনীয়তা আরও বেশি প্রকাশ পেয়েছিল।) কিন্তু বৃদ্ধও সম্ভবত ছিল দারুণ চতুর। তাই সে বলল, তোমাদের দু'জনের পরিচয় দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি না'। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'আগে তুমি আমাদের প্রশ্নের জবাব দাও, তাহলে তোমার প্রশ্নের জবাবও পেয়ে যাবে'**। সে বলল, এটা কি ওটার বিনিময়ে? তিনি বললেন, **'হাঁ'**।

তখন আরব শাইখ বলল, আমি জানতে পেরেছি, মুহাম্মাদ অমুক তারিখে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়েছে। যদি এ সংবাদ সত্য হয়ে থাকে, তবে এখন তারা অমুক স্থানে আছে - সে ঠিক ঐ স্থানের নাম বলল, যেখানে মুসলিম বাহিনী অবস্থান করছিল- আর আমি এও জানতে পেরেছি যে, কুরাইশ বাহিনী অমুক তারিখে মক্কা থেকে বের হয়েছে। যদি এ খবর সত্য হয়ে থাকে তবে এখন তারা অমুক স্থানে রয়েছে। এবারও সে ঠিক ঐ জায়গার নাম করল যেখানে তখন মক্কী বাহিনী যাত্রাক্ষান্তি দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল।

এপর যখন সে তার বক্তব্য শেষ করে থামল তখন জিজ্ঞাসা করল তোমরা কারা? তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আমরা 'মা' তথা পানির অধিবাসী**। এতুটুকু বলেই তারা চলে গেলেন। এদিকে বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, কোন্ পানি? ইরাকের ?

মক্কী বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য

একই দিন সন্ধ্যায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও শত্রু বাহিনীর অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁর কথায় সাড়া দিয়ে নেতৃস্থানীয় তিন জন মুহাজির সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন- আলী ইবনে আবী তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম ও সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস। তারা একেবারে বদর প্রান্তের কূপের কাছে গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে তারা দু'জন যুবককে কুরাইশ বাহিনীর পানি ভরতে দেখতে পেলেন। তারা তাদের দু'জনকে বন্দী করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে নিয়ে এলেন। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। লোকেরা এ ফাঁকে তাদের দু'জনের কাছে কুরাইশ বাহিনীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করল। তারা উভয় বলল, আমরা কুরাইশদেরকে পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা আমাদেরকে পানির জন্য পাঠিয়েছে। তাদের এ জবাব লোকদের পছন্দ হলো না। তাদের আশা ছিল যে, তারা বলবে আমরা আবু সফিয়ানের লোক। কারণ, তখনো তাদের অন্তরে সেই কাফেরদের ওপর বিজয়ের স্বপ্ন সতত রঙিন ছবি আঁকতে প্রলুব্ধ করছিল। এ কারণে তারা তাদের দু'জনকে খুব রকম করে পিটালো। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে শেষ পর্যন্ত তারা বলতে বাধ্য হলো, আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। তখন তারা তাদেরকে ছেড়ে দিলো।

নামায শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিন্দার সুরে তাদেরকে বললেন,**'যখন তারা তোমাদের সাথে সত্য বলেছে, তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করেছ। আর যখন তারা তোমাদেরকে মিথ্যা বলেছে, তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ! আল্লাহর কসম! তারা সত্য বলেছে। তারা কুরাইশের লোক।**

এরপর তিনি যুবকদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন,'**তোমরা আমাকে কুরাইশদের সম্পর্কে কিছু বলবে**'? তারা বলল, 'উদওয়ায়ে কুসওয়ার পেছনে যে টিলাটি দেখতে পাচ্ছেন তারা এর আড়ালে রয়েছে'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, **সংখ্যায় তারা কতজন হবে?** তারা বলল, 'অনেক'। তিনি বললেন, '**কত**'? তারা বলল, তা জানি না। তিনি বললেন, **তারা প্রতিদিন কয়টা উট যবাই করে?** তারা বলল, এক দিন নয়টা, আরেকদিন দশটা। তিনি বললেন, **তাদের সংখ্যা 'নয় শ' থেকে 'হাজার' এর মাঝামাঝি হবে।** তিনি বললেন, **কুরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে হতে তাদের বাহিনীতে কে কে আছে?** তারা বলল, উতবা ইবনে রবীআ, শাইবা ইবনে রবীআ, আবুল বাখতারী ইবনে হিকাম, হাকীম ইবনে হিযাম, নওফল ইবনে খুওয়াইলিদ, হারিস ইবনে আমের, তুআইয়মা ইবনে আদী, নযর ইবনে হারিস, যামআ ইবনে আসওয়াদ, আবু জাহল ইবনে হিশাম, উমাইয়্যা ইবনে খলফ প্রমুখ। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর দিকে মনোযোগী হয়ে বললেন, '**এই তো মক্কা এবার তোমাদের সামনে তার কলিজার টুকরা সন্তানগুলিকে ফেলে দিয়েছে**'।

রহমতের বৃষ্টি

আল্লাহ তাআলা ঐ রাতে প্রবল বৃষ্টিপাত ঘটালেন। তুমুল বৃষ্টিপাতে কাফেরদের শিবিরে কাদা জমে গেল। যার দরুন তারা সহজে সামনে অগ্রসর হতে পারছিল না। এর বিপরীতে মুসলমানদের শিবিরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল সামান্য। এ কারণে এটা তাদের জন্য দারুণ উপকারী প্রমাণিত হলো। এতে তারা ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়ে উঠলেন। শয়তানের নাপাকী ও দুর্গন্ধ তাদের থেকে দূরীভূত হয়ে গেল। পরিমিত বর্ষণের বদৌলতে নরম যমীন শক্ত ও সুন্দর হয়ে গেল। উত্থিত বালুরাশি জমে বসে গেল। মুসলমানদের পদ তাতে সুদৃঢ় হলো। এক কথায় রাতের এ বৃষ্টিপাত মুসলমানদের জন্য সর্বদিক থেকে কল্যাণময় ও ফলপ্রদ প্রমাণিত হলো । বস্তুত এ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য।

গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থানের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রসর

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের আগে বদর কূপের পাড়ে গিয়ে অবস্থান নেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং চাইলেন যাতে কুরাইশরা এ কূপের পাড়ে অবস্থান নিতে না পারে। এ কারণে তিনি রাতের বেলা বদরের সবচেয়ে কাছের কূপের পাড়ে গিয়ে যাত্রাবিরতি করলেন। তখন সাহাবী হুবাব ইবনে মুনযির অভিজ্ঞ রণকুশলী ও সমরনায়ক হিসেবে জিজ্ঞাসা করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেখানে অবস্থান নিয়েছেন এটা কি ঐ স্থান, যেখানে আল্লাহ আপনাকে নামিয়েছেন? তা থেকে আমাদের এক

কদম সামনে অগ্রসর কিংবা পিছু হটার সুযোগ নেই, না কি তা আপনার মত ও রণ কৌশল। তিনি বললেন, **'না, এটা ওহী নয়; বরং তা ব্যক্তিগত মত, রণকৌশল মাত্র'**।

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা মুসলিম বাহিনীর অবস্থানের জন্য উপযুক্ত নয়। আপনি লোকদেরকে বলুন এখান থেকে আরও সামনে এগিয়ে যেতে। এবং কুরাইশ বাহিনীর সবচেয়ে কাছের কূপটির পাড়ে তাঁবু স্থাপন করতে। তখন আমরা আশপাশের বাকি কূপগুলো নষ্ট ও অনুপোযুক্ত করে দিয়ে আমাদের কূপটির পাড়ে হাউয বানিয়ে তাতে আমাদের পানি ভরে রাখব। এরপর আমরা তাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা তৃষ্ণা পেলে পানি পান করব আর তারা থাকবে তৃষ্ণাতুর। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **'তোমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক ও যুক্তিযুক্ত'**।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়ে শত্রু শিবিরের সবচেয়ে কাছের কূপটির নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। রাতের মাঝামাঝি সময় সেখানে গিয়ে মুসলিম বাহিনী অবস্থান নিলো। অতঃপর তারা হাউয বানালেন এবং বাকি কূপগুলি ভরাট করে ফেললেন।

নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু

কূপের পাড়ে মুসলিম বাহিনীর অবস্থান নেওয়ার পর সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পরামর্শ দিলেন যে, মুসলমানরা এখন আপনার জন্য নেতৃত্বের একটি কেন্দ্র তৈরি করুক। যাতে করে আল্লাহ না করুন! যদি মুসলমানদের পরাজয় হয় কিংবা অন্য কোনো হাঙ্গামা সৃষ্টি হয় তাহলে তখন যেন তা কাজে লাগে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাকে বললেন,

'হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার জন্য একটি ঝুপড়ি তৈরি করে দিই। আপনার পাশে আপনার সওয়ারী প্রস্তুত রাখি, এরপর আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যদি আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেন এবং শত্রুর ওপর আমাদেরকে বিজয় দান করেন, তবে তো তা আমাদের দিলের চাহিদা ও তামান্না। আর যদি (আল্লাহ না করুন) এর বিপরীত হয়, তাহলে আপনি আপনার সওয়ারীর ওপর আরোহণ করে আমাদের যে সকল লোক পেছনে রয়েছে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবেন। কেননা, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পেছনে এমন হাজার হাজার লোক রয়ে গেছে যারা আমাদের চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসে। যদি তারা জানত যে, আপনি যুদ্ধ ও সংঘর্ষের মুখামুখি হতে যাচ্ছেন তবে তারা কোনোদিনও আপনাকে ছেড়ে পেছনে রয়ে যেত না। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে আপনাকে হেফাযত করবেন। তারা আপনার সার্বিক কল্যাণ কামনা করবে। আপনার সঙ্গে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে তাঁর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর ভালোর জন্য দুআ করলেন। অতঃপর মুসলমানরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য যুদ্ধের ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণে একটি উঁচু টিলার ওপর একটি ঝুপড়ি বানালেন। যেখান থেকে যুদ্ধের ময়দানের পুরো অবস্থা সহজে দৃষ্টি গোচর হতো।

এরপর সা'দ বিন মুয়ায রা. এর নেতৃত্বে কয়েকজন আনসার যুবককে নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝুপড়ির চারপাশে সব সময়ের জন্য প্রহরায় নিযুক্ত করা হলো।

সেনা-বিন্যাস ও রাত যাপন

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সেনা-সারি সুবিন্যস্ত করলেন[৩৭৯] এবং ময়দানের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর নিজ হাত মুবারক দিয়ে ইশারা করে যাচ্ছিলেন যে, **'আগামী দিন অমুক এখানে নিহত হবে ইনশা-আল্লাহ, আর অমুক ওখানে নিহত হবে ইনশা-আল্লাহ'**।[৩৮০] এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানের একটি গাছের কাণ্ডের নিকট সারা রাত নামাযে কাটিয়ে দিলেন। মুসলমানরাও সে রাত বড়ই শান্ত হৃদয় আর আলোকিত প্রাণ নিয়ে ঘুমালেন। আপন প্রভুর ওপর আস্থা আর ভরসায় তাদের হৃদয় ভরপুর ছিল। গভীর ঘুমের প্রকৃত পরশ তাদের তাপিত আত্মায় শান্তিস্নাত আভা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। তারা নিশ্চিন্ত ছিল- এ রাতের প্রান্তে অপেক্ষমান যে রোশনি-ভরা প্রভাত, তাদের প্রভুর দেওয়া প্রতিশ্রুত সেই বিজয় তাদের হাতে ধরা দিবেই দিবেঃ

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.

যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের ওপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের কদমগুলো। [সূরা আনফাল : ১১]

---

[৩৭৯] দেখুন তিরমিযীঃ জিহাদ পর্বঃ কাতার ও সেনাবিন্যাস অধ্যায় ১/২০১।

[৩৮০] আনাস রা. সূত্রে মুসলিম র. এর রেওয়ায়েত- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫৪৩।

রাতটি ছিল জুমুআর রাত। দ্বিতীয় হিজরীর পবিত্র রমযান মাসের সতেরো তারিখ। এ মাসেরই আট কিংবা বারো তারিখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন।

সমরাঙ্গনে মক্কী বাহিনীর আগমনঃ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ

অপরদিকে কুরাইশরা এ রাতটি কাটালো উদওয়ায়ে কুসওয়াতে তাদের সেনাশিবিরে। ভোরের আলো ফুটলে তারা রণাঙ্গনে তাদের বাহিনীর বিন্যাসের নিমিত্ত সামনে অগ্রসর হলো এবং টিলা থেকে বদর উপত্যকায় নেমে এলো। তাদের মধ্য থেকে একটি দল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাউযের নিকট এলো। তিনি বললেন, **'তাদেরকে তোমরা কেউ কিছু বলো না'**। কিন্তু কেবল হাকীম বিন হিযাম ছাড়া তাদের যে ব্যক্তিই এখান থেকে পানি পান করেছিল সে-ই নিহত হলো । তিনি সেই পর্বে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং খাঁটি মুমিন হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, তিনি যখন কোনো শক্ত শপথ করতেন তখন এ কথা বলতেন, 'ঐ সত্তার শপথ! যিনি আমাকে বদর যুদ্ধের দিন প্রাণে বাঁচিয়েছেন'।

কুরাইশ বাহিনী ময়দানে স্থির হওয়ার পরে উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহীকে পাঠালো মাদানী বাহিনীর শক্তির পরিধি নির্ণায়নের জন্য। উমাইর তার ঘোড়া নিয়ে মুসলিম শিবিরের চারদিকে ঘুরে আপন শিবিরে ফিরে গেল। গিয়ে বলল, মুসলমানদের সংখ্যা কমবেশি তিন শ' হবে। তা ছাড়া অন্য কোথাও তাদের সৈন্য লুকানো আছে কি না বা সাহায্যের জন্য কোনো বাহিনী আসবে কি না সে ব্যাপারে আমি এখনো নিশ্চিত কিছু বলতে পারব না।

এরপর সে আশপাশের গোটা উপত্যকায় ঘোড়া ছুটিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কিছু না পেয়ে পরিশেষে নিজ শিবিরে ফিরে এলো। এসে বলল, আমি কোথাও কিছু দেখতে পাইনি। কিন্তু আমি এমন কিছু বিপদ দেখেছি, যা মৃত্যুকে বয়ে বেড়াচ্ছিল। ইয়াসরিবের প্রতিটি উটের পিঠে একজন করে যমদূত বসা দেখেছি। এরা এমন এক কওম, তরবারী ব্যতীত যারা আর কিছুকে নিজেদের রক্ষাকবচ ও শরণশিবির বানায়নি। আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের একজন নিহত হওয়ার আগে তাদের একজনকেও তোমরা হত্যা করতে পারবে। আর যখন তারা তোমাদের হাতে গনা নেতৃস্থানীয় লোকগুলিকে হত্যা করে ফেলবে তখন আর বেঁচে থেকে এ জীবনে কী লাভ? তাই এখনো সুযোগ আছে, আরেকবার ভালো করে ভেবে নাও!

এ সময় আবু জাহলের মতের বিপক্ষে -যে যুদ্ধের ওপর পা জমিয়ে বসেছিল- কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই মক্কায় ফিরে যাওয়ার কথা উঠল। হাকিম বিন হিযাম

মানুষের নিকট দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দিলো। সে উতবা বিন রবীআর কাছে এসে বলল, আবুল ওলীদ! আপনি কুরাইশদের মুরব্বী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একজন। তারা আপনার কথা মান্য করে। এই আখেরী মুহূর্তে এমনি ভালো কোনো কাজ করবেন কি? যার কারণে আপনাকে চিরদিন মানুষ মনে রাখবে। সে বলল, এটা এমন কী ব্যাপার হাকীম? সে বলল, আপনি আপনার লোকদেরকে নিয়ে মক্কায় ফিরে যান এবং আপনার মিত্র আমর বিন হাযরমীর ব্যাপারটি নিজের কাঁধে তুলে নিন। উতবা বলল, ঠিক আছে আমি মেনে নিলাম। কিন্তু তুমি এ ব্যাপারে আমার যিম্মাদার থাকবে যে, সে আমার মিত্র। সুতরাং, আমি তার রক্তপণ (ঋণ) এর ব্যাপারে যিম্মাদার এবং তার যে মাল নষ্ট হয়েছে তারও যিম্মাদার।

এরপরে উতবা হাকীম বিন হিযামকে বলল, তুমি হানযালিয়্যার ছেলের (আবু জাহল- হানযালিয়্যাহ ছিল তার মায়ের নাম) কাছে যাও। কেননা, কোনো সুস্থ মতামত ও সিদ্ধান্তের বিপরীতে মানুষের মস্তিষ্ককে বিগড়ে ফেলতে ও তাদের মন ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে অধিক আশঙ্কা আমি আর কারও কাছ থেকে করি না।

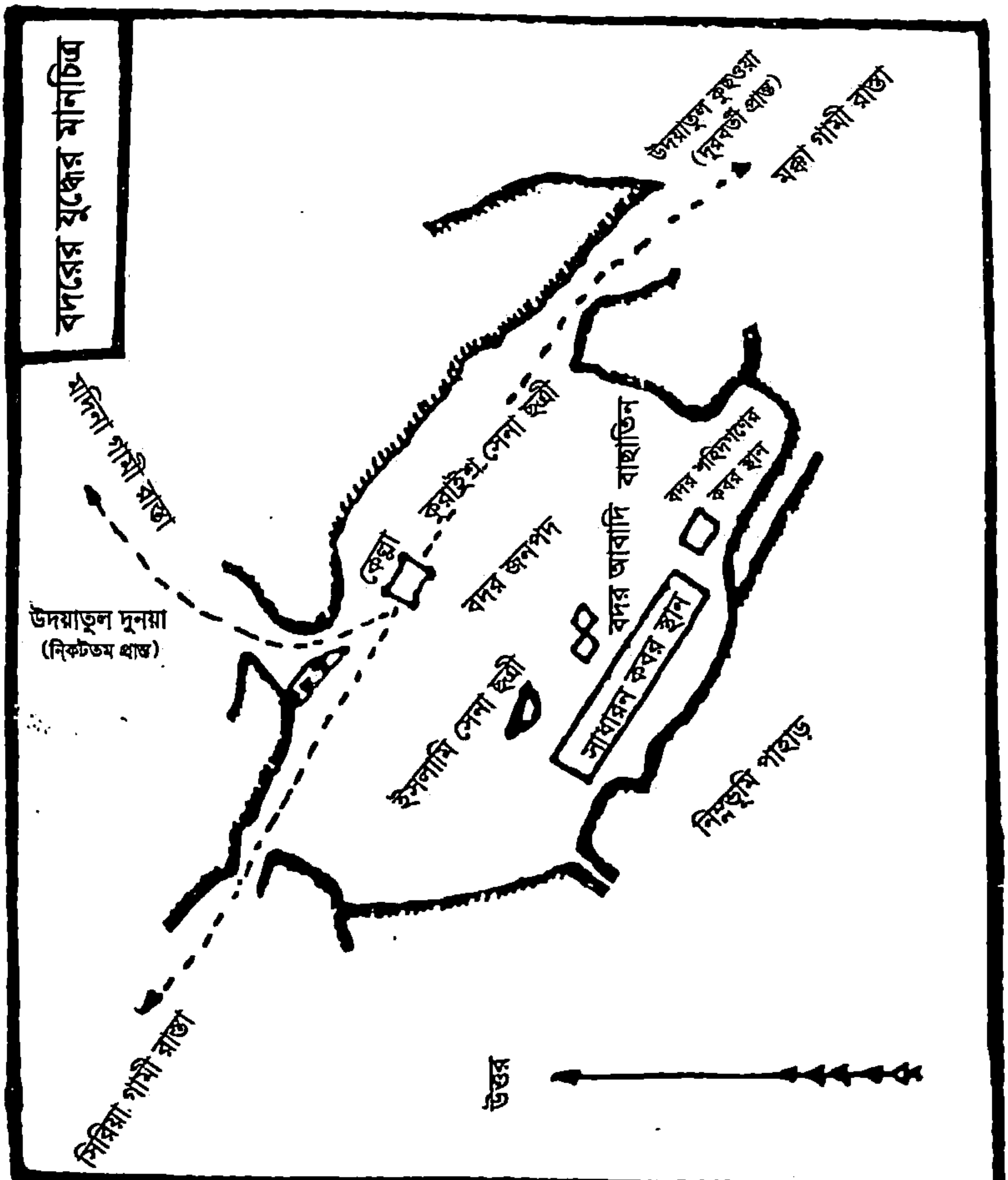
অতঃপর উতবা ইবনে রবীআ লোকদেরকে ডেকে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তোমাদের কী হবে? আল্লাহর কসম! তোমরা তাঁর কোনো ক্ষতি করলে তোমাদের একজন অপরজনের চেহারায় এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তাকে আর কোনো দিনও না তাকানোর পথে নিয়ে যাবে। হয়তো তাঁর চাচাতো ভাই কিংবা মামাতো ভাই নিহত হবে। কিংবা তাঁর আত্মীয় স্বজনের কেউ নিহত হবে। সুতরাং, তোমরা ফিরে যাও এবং মুহাম্মাদ ও গোটা আরবের মাঝ খান থেকে তোমরা সরে দাঁড়াও। যদি তারা তাঁর কোনো ক্ষতি করে তবে তাতে তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে সে তোমাদেরকে এ অবস্থায় পাবে যে, তোমরা তাঁর সঙ্গে যা করতে চেয়েছিলে, পরিশেষে তা করোনি।

ওদিকে হাকীম বিন হিযাম আবু জাহলের কাছে গিয়ে দেখল সে বর্ম প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। গিয়েই সে তাকে বলল, আবুল হাকাম! উতবা আমাকে অমুক কথা বলার জন্য পাঠিয়েছে। আবু জাহল তার কথা শোনামাত্রই বলে উঠল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদেরকে দেখে উতবার কলিজা পানি হয়ে গেছে। কখনোই না। আল্লাহর কসম! আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা কখনোই ফিরে যাব না। উতবা যা কিছু বলেছে তার কারণ হলো, সে মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখে ভয় পেয়ে গেছে। তাছাড়া তার এক ছেলে রয়েছে মুসলমানদের শিবিরে (সে ছিল আবু হুযাইফা ইবনে উতবা- ইতঃপূর্বে সে ইলমাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেছিল।) এ কারণে

সে তাদের থেকে তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে।

উতবা সম্পর্কে আবু জাহলের মন্তব্য যখন তার কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে বলল, ঐ পাছায় সুগন্ধী ব্যবহারকারী অতি শীঘ্রই জানতে পারবে আমার কলিজা পানি হয়ে গেছে না তাঁর? এ সময় আবু জাহল তাড়াতাড়ি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো। কারণ তার ভয় ছিল যুদ্ধের এই বিরোধিতা না জানি ধীরে ধীরে আরও চরম আকার ধারণ করে। অতঃপর সে আমর বিন হাযরমীর ভাই আমের বিন হাযরমীর কাছে খবর পাঠিয়ে দেয় যে, তোমার এই মিত্র (উতবা) লোকদেরকে নিয়ে ফিরে যেতে চায়। অথচ, তোমাদের চোখেমুখে আজও প্রতিশোধের চরম আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিজেদের অত্যাচার ও ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নাও।

এরপরে আমের দাঁড়িয়ে পাছা থেকে কাপড় সরিয়ে উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলো হায় আমর! হায় আমর!! তখন লোকেরা উন্মত্ত হয়ে পড়ল। প্রবল উন্মাদনায় তারা ফেটে পড়ল। আপন অনিষ্ট ও কুকর্মের ওপর অটল থাকার স্থির সিদ্ধান্ত করল। উতবা মানুষকে যে পথে দাওয়াত দিচ্ছিল সে পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখার প্রয়াস চলছিল। এভাবে রেষ ও আক্রোশ হিকমত ও প্রজ্ঞার ওপর প্রবল হলো। কয়েকজন নেতার সাময়িক যুদ্ধ-বিরোধিতা একটুকুও ফলপ্রদ প্রমাণিত হলো না।



উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো

যখন টিলার পাশ দিয়ে মুশরিকরা আত্মপ্রকাশ করল এবং উভয় বাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ! এই কুরাইশ বাহিনী দম্ভভরে তাদের অশ্বরাজি নিয়ে ছুটে এসেছে আপনার বিরুদ্ধে ও আপনার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। সুতরাং, হে আল্লাহ! আপনি তাদের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। হে আল্লাহ! আগামীকাল আপনি তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিন'! এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উতবা ইবনে রবীআকে কুরাইশী কাফেলার মধ্যে তার একটি লাল উটের ওপর দেখে বললেন, যদি এই বাহিনীর

কারও মধ্যে কোনো ভালো কিছু থেকে থাকে তবে তা রয়েছে ঐ লাল উটওয়ালার কাছে। যদি তারা তার অনুসরণ করে তবে তারা সঠিক পথের দিশা পেয়ে যাবে।

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে সারিবদ্ধ করে যুদ্ধের স্তর বিন্যাস করছিলেন। এ সময় একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে। তাঁর হাতে একটি তীর ছিল এবং সেটি দ্বারা তিনি কাতার সোজা করে দিচ্ছিলেন। তখন সাহাবী সাওয়াদ ইবনে গাযিয়্যা রা. কাতার থেকে একটু সামনে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের তীর দ্বারা তার পেটে সামান্য খোঁচা দিলেন এবং বললেন, **সাওয়াদ! সোজা হয়ে দাঁড়াও!!** তখন সাওয়াদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনর্থক আমার পেটে গুঁতো দিয়েছেন, আমি ব্যাথা পেয়েছি। তাই প্রতিশোধ না নিয়ে আপনাকে আমি ছাড়ছি না। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পেট মুবারক হতে কাপড় সরিয়ে দিয়ে বললেন, ঠিক **আছে এবার তুমি তোমার প্রতিশোধ নিয়ে নাও**। তখন সাওয়াদ রা. তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পেট মুবারকে চুমু খেলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **'এমন কেন করলে? সাওয়াদ!** তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন সামনে কী উপস্থিত? তাই আমি চাচ্ছিলাম জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি আমার এভাবে কাটুক যে, আমার চামড়া আপনার চামড়ার সঙ্গে মিলিত হয়ে আছে'। সবকিছু শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কল্যাণ আর মঙ্গলের জন্য দুআ করলেন।

কাতার বিন্যাস পর্ব শেষ হলে রাসূলে কারীম সা. মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করলেন, তাঁর সর্বশেষ আজ্ঞা পাওয়ার আগে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু করে না দেয়। অতঃপর তিনি তাদেরকে বিশেষ বিশেষ যুদ্ধ-রীতি বাতলে দিলেন। সুতরাং, তিনি তাদেরকে বললেন, **যখন তারা তোমাদের একেবারে কাছে চলে আসবে, তখন তোমরা তাদের প্রতি তীর বর্ষণ করবে; কিন্তু তোমরা তোমাদের তীর বাকী রেখ! তোমাদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত তোমরা কেউ নাঙ্গা তরবারি নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করো না**। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণপ্রতীম সহচর আবু বকর রা. কে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঝুপড়িতে ফিরে এলেন। সা'দ বিন মুয়ায রা. আপন বাহিনী নিয়ে ঝুপড়ির দরজায় যথারীতি দাঁড়িয়ে গেলেন নবীজীর প্রহরায়।

অপরদিকে মুশরিকদের শিবিরে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু জাহল দিনের শুরুতে আল্লাহর কাছে সাফ সাফ ফয়সালার জন্য দুআ করল। সে বলল, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক ছিন্নকারী; যে অধিক

পথভ্রষ্ট; তাকে তুমি আজ ধ্বংস করে দাও! হে আল্লাহ! আর আমাদের মধ্যে যে তোমার অধিক প্রিয় ও সন্নিকটে আছে তাকে তুমি সাহায্য করো!!

আর এ ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ. তোমরা যদি মীমাংসা কামনা করো, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা এসে গেছে। আর যদি তোমরা বিরত থাকো তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি ফিরে আসো তবে আমিও তেমনি করব। বস্তুত তোমাদের কোনোই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল, তা যত বেশিই হোক। জেনে রেখ! আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। [সূরা আনফাল : ১৯]

অন্তিম মুহূর্ত : জ্বলে উঠল তীব্র অনল

বদর প্রান্তরে যুদ্ধের সর্বপ্রথম ইন্ধন দিলো আসওয়াদ ইবনে আব্দুল আসাদ মাখযূমী। সে ছিল খারপ চরিত্রের একজন লোক। সে নিজ শিবির থেকে বলতে বলতে বের হলো, আমি আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করছি- হয়তো তাদের কূপ থেকে পানি পান করব; নতুবা তা বিরান করব কিংবা তার সামনে প্রাণ বিলিয়ে দিব। এভাবে সে যখন সামনে অগ্রসর হলো তখন মুসলিম শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন আল্লাহর এক সিংহ- বীর বাহাদুর সাইয়েদুনা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.। উভয় যখন মুখোমুখি হলো তখন হামযা রা.তার অর্ধ গোছা থেকে তার পা উড়িয়ে দিলেন। সে তখন হাউযের সামনে চিত হয়ে পড়ে গেল। তার পা থেকে তখন নিজ শিবির অভিমুখি হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। তারপরও সে থেমে যাওয়ার পাত্র ছিল না। নিজ কসম পূরণ করার লক্ষ্যে সে হামাগুড়ি দিয়ে হাউযের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। অবশেষে তাতে গিয়ে পড়ল। কিন্তু হামযা রা. তার ওপর দ্বিতীয় আঘাত হানলেন। এভাবে কূপের মধ্যে পড়েই তার সলিল সমাধি ঘটল।

সম্মুখ লড়াই

এভাবে আসওয়াদের হত্যার মধ্য দিয়ে বদর যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল। আসওয়াদ নিহত হওয়ার পরে মুশরিক শিবিরের একই পরিবারের নামকরা তিন অশ্বারোহী বের হলো। তারা ছিল- উতবা বিন রবীআ, তার ভাই শাইবা বিন রবীআ ও ওলীদ বিন উতবা। যুদ্ধের কাতার থেকে তারা সামনে বেরিয়ে যখন যুদ্ধের প্রতি আহ্বান করতে লাগল তখন তিন জন আনসার যুবক তাদের দিকে বের হয়ে আসলেন। আউফ ইবনুল হারিস, মুআওয়িয ইবনুল হারিস তাদের মায়ের নাম

আফরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা.। তাদেরকে দেখে তারা বলল, তোমরা কারা? জবাবে তারা বললেন : আনসারদের একটি দল। তারা বলল, তোমরা সম্ভ্রান্ত প্রতিপক্ষ, কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; আমাদের স্বগোত্রীয় জ্ঞাতি ভাইদেরকে চাই। অতঃপর তাদের একজন আহ্বান করল, মুহাম্মাদ! আমাদের জ্ঞাতি ভাইদেরকে বের হতে বলো! তখন রাসূলে কারীম সা. নির্দেশ বললেন, **উবাইদা ইবনুল হারিস দাঁড়াও! হামযা দাঁড়িয়ে যান!! আলী তুমি দাঁড়িয়ে যাও!!!** যখন তারা দাঁড়িয়ে তাদের কাছাকাছি চলে গেলেন তখন তারা বলল, তোমরা কারা? তারা তাদের পরিচয় দিলেন। অতঃপর তারা বলল, হাঁ, তোমরা সম্মানিত প্রতিপক্ষ। অতঃপর উবাইদা রা. - যিনি কিছুটা বয়স্ক মানুষ ছিলেন- মুকাবেলা করলেন উতবা ইবনে রবীআর, হামযা রা. যুদ্ধ করলেন শাইবার সাথে, আর আলী রা. যুদ্ধ করলেন ওলীদের সাথে।[৩৮১] হামযা ও আলী রা. তাদের শত্রুকে কিছুক্ষণের মধ্যে হত্যা করে ফেললেন ; কিন্তু উবাইদা রা. ও তার শত্রুর মধ্যে দুইটা পাল্টাপাল্টি আঘাত বিনিময় হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকে অপরকে বধ করে ফেলেছিল। ঠিক তখনই হামযা ও আলী গিয়ে উতবার ওপর আঘাত হেনে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। এরপরে তারা উবাইদা রা. কে নিয়ে মুসলিম শিবিরে ফিরে এলেন। উবাইদার পা কেটে গিয়েছিল। এই আহত অবস্থাতেই বদর যুদ্ধের চার কিংবা পাঁচ দিন পর সাফরাতে শাহাদতের অমিয় সুধা পানে ধন্য হলেন- মুসলমানরা তখন বিজয়ের কেতন উড়িয়ে মদীনার দিকে ফিরে আসছিল। আলী রা. কসম খেয়ে বলতেন যে, আল্লাহর এই আয়াত তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে: هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করেছে। [সূরা হজ্জ : ১৯]

ব্যাপক আক্রমণ

মুশরিকদের জন্য এই ব্যক্তিগত লড়াইয়ের ফলাফল অশুভ ও প্রতিকূল ছিল। মূলত এটা ছিল যুদ্ধ শুরুর আগে তাদের জন্য এক বিরাট ধাক্কা। এক সঙ্গে চোখের পলকে তারা তাদের তিন নামকরা বীরকে খুইয়ে বসেছে। তখন রাগে ও ক্রোধে তাদের নাক-কান দিয়ে ধোঁয়া বের হতে লাগল। চোখের পলকে সবাই একসঙ্গে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অপরদিকে মুসলমানরা স্বীয় দরবারে ইলাহীতে সাহায্য সহযোগিতা প্রার্থনা ও তাঁর সুমহান দরবারে একনিষ্ঠ হয়ে মাথা নত করে মুনাজাতের মাধ্যমে মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই শুরু করল। মুসলমানরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে

---

[৩৮১] এটা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। আর আহমদ ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুসারে উবাইদা রা. ওলীদের আলী শাইবার আর হামযা উতবার মুকাবেলা করেছিলেন- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৪৩।

থেকে মুশরিকদেরকে কেবল প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন। অথচ তাতেই মুশরিকদের ক্ষতির পরিমাণ প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল। মুসলমানদের মুখে ছিল, 'আল্লাহ এক', 'আল্লাহ এক'।

আপন রবের সান্নিধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আকুতি

অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সারি বিন্যাস শেষে আপন ঝুপড়িতে ফিরে আসার পর থেকেই আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুত সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। দরবারে এলাহীতে তিনি বার বার বলছিলেন, **'হে আল্লাহ আপনি আমাকে যা ওয়াদা করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন! হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আপনার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি চাচ্ছি'**। এভাবে যখন রণাঙ্গন ক্রমশ আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করল। তপ্ত সমরাঙ্গনে মৃত্যু নেশার এক অবর্ণনীয় হোলি খেলা শুরু হলো। ঢাল আর তলোয়ারের ঝনঝনানিতে সমর-চাকা নৃত্য করে ঘুরতে লাগল প্রবল তালে। যুদ্ধ তার প্রান্তসীমায় গিয়ে উপনীত হলো তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বিনয় সহকারে আপন মালিকের কাছে মুনাজাত করছিলেন, **'হে আল্লাহ! আজ যদি এই ছোট দলটিকে আপনি ধ্বংস করে দেন, তবে ভূপৃষ্ঠের বুকে আর কোনোদিন আপনার ইবাদত করা হবে না। হে আল্লাহ! আপনি যদি চান, তবে আজকের পরে কোনোদিন আর আপনার ইবাদত করা হবে না।** এত মযবুতি আর আকুতির মাধুরী মিশিয়ে তিনি দুআ করছিলেন যে, কাঁধ থেকে তার চাদর খুলে গেল। সিদ্দীকে আকবর রা. তা উঠিয়ে দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এখন হয়েছে। আপনি আপনার রবের কাছে বড় করুণ সুরে সবকিছু তুলে ধরেছেন।

এদিকে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের কাছে ওহী পাঠালেন, أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। সুতরাং, তোমরা মুমিনদেরকে দৃঢ় রাখো। আমি কাফেরদের মনে ভীতি ঢেলে দিব। [সূরা আনফাল : ১২] এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছেও ওহী পাঠালেন أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। [সূরা আনফাল:৯] অর্থাৎ তারা একসঙ্গে আসবেন না। বরং একজনের পেছনে একজন আসবেন।

ফেরেশতাদের অবতরণ

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানিকটা তন্ময় হয়ে গেলেন। এবং কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে বললেন, আবু বকর সুসংবাদ গ্রহণ করো! ঐ তো জিবরাঈল দাঁড়িয়ে; তাঁর মাথার ওপর ধূলি উড়ছে'। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আবু বকর সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। ঐ দেখো জিবরাঈল তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছেন। আর তাঁর চারপাশে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা মিছিল করছে'।

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরে ঝুপড়ির দরজা থেকে বেরিয়ে তেলাওয়াত করলেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। [সূরা ক্বামার : ৪৫] এরপর তিনি একমুষ্ঠি নুড়ি পাথর হাতে নিলেন। অতঃপরে কুরাইশদের দিকে ফিরে বললেন,'চেহারা বিকৃত হয়ে যাক'। এরপরে তা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। পুরো ময়দানে যত মুশরিক ছিল আল্লাহ সকলের চোখ, নাক ও মুখে তা পৌঁছে দিলেন। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং.... [সূরা আনফাল : ১৭]

পাল্টা আক্রমণ

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহিনীকে শত্রু পক্ষের ওপর পাল্টা আক্রমণের সর্বশেষ নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা তাদের ওপর দৌড়ে গিয়ে হামলা চালাও'। তাদেরকে তিনি এ কথা বলে প্রাণোদ্দীপ্ত করে তুললেন যে, ঐ সত্তার কসম যার কুদরতি হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আজ যে ব্যক্তিই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এরপরে ধৈর্যের সঙ্গে সওয়াবের প্রত্যাশায় পলায়নের পরিবর্তে সামনের দিকে ধাবমান অবস্থায় শাহাদাতের পিয়ালা পান করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। তিনি তাদেরকে আরও বলছিলেন, তোমরা ঐ জান্নাতের দিকে ছুটে যাও- যার বিস্তৃতি আকাশ ও যমীনের সমান। এ সময় সাহাবী উমাইর ইবনে হুমাম রা. বলে উঠলেন, বাহ! বাহ!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি 'বাহ-বাহ' কেন বলেছ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম আমার উদ্দেশ্য কেবল সেখানে যেতে পারা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। তুমি সেখানে যেতে পারবে যাও! এরপর তিনি তার থলি

থেকে কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু পরক্ষণে নিজেই বললেন, যদি খেজুরগুলি খাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি তবে তা তো অনেক দীর্ঘ হায়াত (তবে তো আমার জান্নাতে দাখিল হতে ভারি দেরি হয়ে যাবে) তাই তিনি বাকিগুলি দূরে ফেলে দিয়ে কাফেরদের একেবারে ভেতরে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।[৩৮২]

একইভাবে আফরার ছেলে আউফ ইবনে হারিস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার কোন্ কাজ দেখে আল্লাহ হেসে ফেলেন? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যখন বান্দা নগ্ন শরীরে (বর্মহীন অবস্থায়) শত্রুর ভেতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দেয়**। তখন তিনি তার বর্মটি খুলে ফেলে হাতে তরবারি নিয়ে ময়দানে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শহীদ হলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুসলিম বাহিনীকে পাল্টা হামলার নির্দেশ দিলেন। কাফেরদের আক্রমণের তীব্রতা তখন নিভে যাচ্ছিল। তাদের তলোয়ারের শাণ ভোঁতা হতে শুরু করেছিল। ক্লান্তি,আলস্য আর এক অজানা ভীতি তাদের হৃদয়-মন দখল করে নিয়েছিল। এ কারণে এ মুহূর্তে হিকমতপূর্ণ এ পদক্ষেপটি মুসলমানদের কদম মযবুতির জন্য দারুণ উপকারী প্রমাণিত হলো। কেননা, তখন তারা সবেমাত্র হামলার উদ্বোধন করছিলেন। আর তাদের যুদ্ধ-নেশা ছিল তখন তার যৌবনে। ফলে তারা লড়াই ও সমর ইতিহাসের এক বিরল ও প্রচণ্ড হামলা করে বসলেন শত্রুর ওপর। শত্রু শিবিরের কাতারের পর কাতার উল্টে দিতে লাগলেন। এক কথায় তাদেরকে কচুকাটা করলেন। তারা যখন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বর্ম পরা দেখলেন তখন তাদের তেয ও উদ্দীপনা আরও বেড়ে গেল। তখন তিনি আরও সামনে এগিয়ে গেলেন। এক পর্যায়ে তিনি মুশরিকদের এতটা কাছে চলে গেলেন যে, তাঁর সামনে আর কেউ ছিল না।[৩৮৩] তখন তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আওয়াজে বলছিলেন, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।

তখন মুসলমানরা বীরত্বের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করলেন। ওদিকে আসমান থেকে নেমে আসা ফেরেশতা বাহিনী তাদেরকে সাহায্য করলেন। সুতরাং, ইবনে সাদের সূত্রে ইকরিমা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, সে দিন,কোনো শত্রুর মাথা

---

[৩৮২] মুসলিম ২/১৩৯। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৩১।

[৩৮৩] বুখারী: তাফসীর পর্ব, আল্লাহর বাণী سيهزم الجمع ويولون الدبر অধ্যায় ৪৮৭৫। মুসনাদে আহমদ ১/৩২৯।

কেটে পড়ছিল; কিন্তু জানা যাচ্ছিল না, কে তাকে মেরেছে? কোনো ব্যক্তির হাত কেটে পড়ছিল; কিন্তু জানা যাচ্ছিল না, কে তাকে আঘাত করেছে? ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মুসলমানদের এক সৈন্য এক মুশরিক সৈন্যকে ময়দানে তাড়া করছিল। হঠাৎ মুশরিক সৈন্যটির ওপর থেকে এক অদৃশ্য চাবুকের আওয়াজ ভেসে এলো- এর অশ্বারোহী তাতে বলছিল, হাইযূম! অগ্রসর হও। এরপর মুসলমান সৈন্যটি দেখতে পেল তার সামনের মুশরিকটি মাটিতে চিত হয়ে পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, চাবুকের আঘাতে তার নাক ভেঙে গেছে, চেহারা ফেটে গেছে এবং তর সারা শরীর নীল হয়ে গেছে। তখন আনসারী সাহাবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সব ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে তিনি বললেন, **'তুমি সত্যই বলেছ। এটা ছিল তৃতীয় আসমানের ফেরেশতার পক্ষ থেকে সাহায্য'**। [৩৮৪]

আবূ দাউদ মাযেনী রা. বলেন, আমি এক মুশরিক সৈন্যকে হত্যার জন্য তার পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম। কিন্তু আমার তরবারি তার কাছে পৌঁছার আগেই হঠাৎ ধড় থেকে তার মুণ্ড আলাদা হয়ে গেল। আমি বুঝে নিলাম, অন্য কেউ তাকে হত্যা করেছে। এক আনসারী সাহাবী রাসূলের চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। তখন আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম! আমাকে সে বন্দী করেনি! আমাকে বন্দী করেছে মাথায় চিতাযুক্ত ঘোড়ার পিঠে মুণ্ডিত মস্তকের এক সুদর্শন অশ্বারোহী; কিন্তু এখন আমি তাকে মুসলমানদের শিবিরে দেখছি না। আনসারী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই তাকে বন্দী করেছি। তিনি বললেন, **চুপ করো! আল্লাহ তোমাকে একজন সম্মানিত ফেরেশতার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন।**

আলী রা. বলেন, বদরের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ও আবু বকর রা. কে বলেছিলেন, **তোমাদের একজনের সঙ্গে জিবরাঈল আ. রয়েছেন। আরেক জনের সঙ্গে মীকাঈল আ. রয়েছেন। আর ইসরাফীলও আ. বিশাল ফেরেশতা যিনি যুদ্ধের ময়দানে আসেন।**[৩৮৫]

রণাঙ্গন থেকে ইবলীসের পলায়ন

ইবলীস সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম মুদলিজীর আকৃতিতে বদর প্রাঙ্গণে এসেছিল এবং এখনো তাদের (কাফেরদের) সঙ্গেই ছিল। সে যখন আসমান থেকে দলে দলে ফেরেশতার অবতরণের দৃশ্য দেখতে পেল, এবং

---

[৩৮৪] এমন বর্ণনা রয়েছে ইমাম মুসলিম থেকেও ২/৯৩।

[৩৮৫] মুসনাদে আহমদ ১/১৪৭। মুসনাদে বাযযার ১৪৬৭। মুসতাদরাকে হাকিম ৩/১৩৪। তিনি এটাকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবীও একই মত পোষণ করেছেন। মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১/২৮৪, হাদীস নং ৩৪০।

খানিক বাদে তাদের হাতে মুশরিকদের দুরবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করল তখন সে দ্রুত রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেল। হারিস ইবনে হিশাম তাকে সুরাকা ভেবে তার জামার প্রান্ত টেনে ধরল। কিন্তু সে হারিসের বুকে একটা শক্ত ঘুষি বসিয়ে দিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিলো এরপর পালালো। মুশরিকরা তাকে বলল, এই সুরাকা তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি আগে বলোনি যে, তুমি আমাদের সাথে থাকবে। আমাদেরকে রেখে চলে যাবে না! সে বলল, إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ নিশ্চয়ই আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছ না। আর আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা আনফাল : ৪৮]।

এরপর সে ভাগতে থাকল, অবশেষে সে সুদূর সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিল।

চূড়ান্ত পরাজয়

এ সময় মুশরিকদের সেনাসারিতে হতাশা, স্থবিরতা আর উদ্বেগের ছাপ ক্রমশ বড় স্পষ্ট হয়ে ধরা দিলো। বিপরীত থেকে মরু সাইমুম হয়ে ধেয়ে আসা প্রাণোদ্দীপ্ত মুসলিম সৈন্যদের ঝড়ো হামলার মুখে তাদের পা টলটলায়মান হয়ে গেল। ভেতরের ভীরুতা বাহ্যিক সাহসিকতার ছিন্ন আবরণে কতকাল আর চাপা দিয়ে রাখা যায়! এতক্ষণে যুদ্ধ প্রায় আখেরী প্রান্তে উপনীত হলো। মুশরিকরা এবার ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যে যেদিক পারল দিকভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন ছুটে পালালো। আর মুসলমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে হত্যা কিংবা বন্দী করতে লাগলেন। এভাবে পরাজয় তাদের ওপর পুরোপুরি জেঁকে বসল।

আবু জাহলের অবিচলতা

গোঁড়া শয়তান আবু জাহল যখন তার সাধের বাহিনীর কাতারে স্থবিরতা, উদ্বেগ আর অস্থিরতার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল, তখন সে ভীতি আর অবশ্যম্ভাবী এ পরাজয়ের ঢলের সামনে দেয়াল দাঁড় করিয়ে তা রুখতে চাইল। তাই সে চরম দম্ভ আর অহংকারভরে বলতে লাগল, সুরাকার লাঞ্ছনা যেন তোমাদেরকে পরাজিত না করে। কারণ, সে মুহাম্মাদের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। উতবা, শাইবা ও ওলীদের মৃত্যু যেন তোমাদেরকে দিশেহারা না করে। কেননা, তারা তড়িঘড়ি করেছিল। লাত ও উয্যার কসম! তাদের সবাইকে রশি দ্বারা বাঁধার আগ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ফিরে যাব না। তোমাদের কাউকে যেন আমি তাদের একজনকেও হত্যা করতে না দেখি। তোমরা তাদেরকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখবে। কারণ, পরবর্তীতে আমাদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দিতে হবে তো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তার এ মিথ্যা দম্ভ আর অহঙ্কারের খোলস খুলে গিয়ে বাস্তবতার আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। খানিক বাদেই সে দেখতে পেল

মুসলমানদের প্রচণ্ড হামলার প্রবল স্রোতের মুখে তাদের কাতারগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়া মুসলমানদের প্রতাপে তাদের বুকের পাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

তবে হ্যাঁ, এতকিছুর মাঝেও মুশরিকদের একটি অবিচল ও সুস্থির দল সুনির্দিষ্ট নিয়মে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা তার পাশে তরবারির সুরক্ষিত প্রাচীর বানিয়ে রেখেছিল। বর্মে ছিল তারা ঢাকা। কিন্তু হারিকেনের গতিতে ছুটে আসা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ তাদের সে প্রতিরোধের দেয়াল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলো। বর্মে বর্মে ছাওয়া প্রাসাদ মাটির বুকে ভেঙে পড়ল। আর তার ঠিক মাঝেই মুসলমানরা ইসলামের এই চির দুশমন আবু জাহলকে ঘোড়ার পিঠে করে এদিক সেদিক ছুটতে দেখল। কিন্তু তার নিজেরও খবর ছিল না যে, এ ময়দানেরই এক পাশে মৃত্যু তার জন্য চুপটি মেরে অপেক্ষা করছিল - কখন সময় হবে আর তার তপ্ত-তাজা খুন দুই আনসার যুবকের হাতে বের করে পান করা হবে।

আবু জাহলের কুপোকাত

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বলেন, আমি যখন বদরের সারিবদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছিলাম, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম আমার ডান ও বাম পাশে রয়েছে অল্প বয়সের দু'জন কিশোর। আমি এটা দেখে মনে খুব একটা স্বস্তি পেলাম না (কেননা তাদের থেকে বড় ধরনের কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না) কিন্তু হঠাৎ তাদের একজন অন্যজন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে বলল, চাচা! আবু জাহল কে? তা আমাকে একটু দেখিয়ে দিন!! আমি বললাম, ভাতিজা! তুমি আবু জাহলকে দিয়ে কী করবে? সে বলল, আমি শুনেছি সে নাকি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গালি দেয়। ঐ সত্তার কসম, যার কুদরতি হাতে আমার জান! যদি আমি তাকে একটি বারের জন্য দেখতে পাই, তবে আমার শরীর তার শরীর থেকে আলাদা হবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্য থেকে একজন নিহত হয়। একটুখানি কিশোরের মুখে এ কথা শুনে আমি বিস্ময়ে 'থ' বনে গেলাম। তিনি বলেন, একটু পরে দ্বিতীয় জন আমাকে খোঁচা দিলো এবং গোপনে প্রথম জনের মতো বলল। আর ঠিক তখনই আমি দেখতে পেলাম, আবু জাহল ঘোড়ায় চড়ে সৈন্যদের মাঝে ছোটাছুটি করছিল। আমি তাদের দু'জনকেই বললাম, ঐ যে দেখো, যাকে তোমরা খুঁজছিলে! তিনি বলেন, মুহূর্তে কিশোর প্রাণ দু'টো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জনমের মতো তাকে ঠাণ্ডা করে ফেলল। এরপর উভয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কে তাকে হত্যা করেছ? জবাবে তাদের প্রত্যেকেই বলল,

আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন, **তোমরা কি তোমাদের তরবারি মুছে ফেলেছ?** তারা বলল, না। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তরবারির দিকে তাকিয়ে দু'টিকেই রক্তমাখা দেখতে পেয়ে বললেন, **তোমরা দু'জনেই তাকে হত্যা করেছ।** এবং তিনি আবু জাহলের সালাব (যুদ্ধে নিহত কাফের সৈন্যের সঙ্গে থাকা সবকিছু, যা মুসলিম হত্যাকারী মুজাহিদকে দেওয়া হয়) মুয়ায বিন আমর বিন জামূহ রা.কে দিয়ে দিলেন। আর কিশোরদ্বয় ছিল মুয়ায বিন আমর বিন জামূহ আর মুআওয়িয বিন আফরা রা.।[৩৮৬]

ইবনে ইসহাক রহ. বলেন, মুআয বিন আমর বিন জামূহ রা. বলেন, আমি শুনলাম,মুশরিকরা বলাবলি করছিল, আবু জাহল পর্যন্ত আজ পৌঁছার সাধ্য কারও নেই। সে তখন লম্বা গাছের মতো শত শত তরবারি আর লৌহবর্মের বেষ্টনীতে ছিল। অগণিত সেনা তার চারপাশে সুরক্ষিত পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেন, যখন আমি এ কথা শুনলাম, তখন নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম। সুযোগ বুঝে হঠাৎ তার ওপর আমি আক্রমণ করে বসলাম। আমি তাকে সজোরে আঘাত করলাম, যা তার পায়ের অর্ধ গোড়ালিকে পা থেকে উড়িয়ে দিলো। আল্লাহর কসম! সেটিকে আমার কাছে মনে হচ্ছিল ঐ খেজুর বীচির মতো, যা পাথরের নীচে ফেলে সজোরে আঘাত করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এমন সময় তার ছেলে ইকরিমা এসে আমার কাঁধে আঘাত করল। এতে আমার কাঁধ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয়ে শুধু একটু চামড়ার সঙ্গে ঝুলছিল। আমি সেটাকে আমার এক পাশে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। কিন্তু এতে আমার সমস্যা হচ্ছিল। সারা দিন আমি সেভাবে লড়াই চালিয়ে গেলাম। কিন্তু যখন এতে আমার কষ্ট হচ্ছিল তখন তাকে আমি আমার নীচে রেখে জোরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলি।[৩৮৭] আবু জাহল তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় নীল স্বপ্ন দেখতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। এমন সময় সেখান থেকে যাচ্ছিল মুআওয়িয ইবনে আফরা। সে তাকে আঘাত করে ঠাণ্ডা করে দিলো। কিন্তু তখনো শেষ নিঃশ্বাস আবু জাহলের মধ্যে বাকি ছিল। এরপরে মুআওয়িয রা. রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং এক পর্যায়ে নিজেও শাহাদাতের অমিয় সুধা পানে ধন্য হলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জাহলের অবস্থা কে দেখে আসতে পারবে? সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন দিকে তার খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাকে ময়দানের

---

[৩৮৬] সহীহ বুখারী ১/৪৪৪, ২/৫৬৮। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৫২। কেবল একজনকে সালাব দেওয়ার কারণ হলো অপর জন সেই বদর প্রান্তরেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

[৩৮৭] এই মুয়ায বিন আমর বিন জামূহ রা. ইসলামের তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফফান রা. এর খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

এক স্থানে গিয়ে পেলেন। তখনো তার সর্বশেষ নিঃশাস বাকি ছিল। তিনি তার গলায় পা রেখে দাড়ি ধরে মস্তক আলাদা করে ফেলার ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর দুশমন! শেষমেশ আল্লাহ কি তোকে লাঞ্ছিত করেননি? সে বলল, আল্লাহ কীভাবে আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন? আমি কি ঐ ব্যক্তির ওপর আশ্চার্য হব? যাকে তোমরা (নিজ গোত্রের লোক) হত্যা করেছ কিংবা ঐ লোকের ওপরে কি কোনো লোক আছে? যাকে তোমরা হত্যা করেছ। এরপর সে বলল, হায় কৃষক ব্যতীত অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করত! অতঃপর সে বলল, আমাকে তুমি বলো তো বিজয় কার পদচুম্বন করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। অতঃপর সে ইবনে মাসউদ রা. কে লক্ষ্য করে বলল- তাঁর পা ছিল তখন আবু জাহলের গলায়- হে হীন মেষচারী! তুমি বড় উচ্চ আর ও বন্ধুর জায়গায় পা রেখেছ।

উল্লেখ্য : ইবনে মাসউদ রা. মক্কায় মেষ চরাতেন।

এ আলোচনা শেষ হওয়ার পরে ইবনে মাসউদ রা. তার মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন এবং তা নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আল্লাহর দুশমন আবু জাহলের মাথা। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اَللّٰهُ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আল্লাহ ঐ সত্তা, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই-তিন বার বললেন। এরপর বললেন, আল্লাহু আকবর। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। আপন বান্দার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং একাই বিশাল দলকে পরাজয়ের গ্লানিতে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো! এরপর আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু জাহলের নিকট নিয়ে চললাম। তিনি তাকে দেখে বললেন, "এটা ছিল এই উম্মতের ফেরাউন"।

তপ্ত রণাঙ্গনের উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে ঈমানের মধু-দীপ্তি

ইতঃপূর্বে আমরা উমাইর ইবনুল হুমাম ও আউফ ইবনুল হারিস- ইবনে আফরা- এর দু'টি চমৎকার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি। এদু'টি ছাড়াও বদরের পুরো যুদ্ধে এমন অগণিত অসংখ্য দৃশ্যের জন্ম হয়েছে, যেগুলোতে নবজন্মা এই জাতির প্রতিটি সদস্যের চমৎকার ঈমান দীপ্ত, আর নির্ভেজাল বিশ্বাসের শক্তির সুমিষ্ট ও নজরকাড়া দৃশ্য ফুটে উঠেছে। এটা ছিল ইতিহাসের সর্বপ্রথম বিরল যুদ্ধ, যেখানে বাপ তার ছেলের বিরুদ্ধে, ভাই তার সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে তপ্ত রণাঙ্গনে উন্মুক্ত তরবারি হাতে এলোকেশে দাঁড়িয়ে গেছে। কারণ, ঈমান ও বিশ্বাসের মূলনীতি তাদের উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্যের এক সীমারেখা টেনে দিয়েছে।

ফলে, তরবারিই তাদের মধ্যে ফয়সালা করেছে। এখানে মযলুম আর যালিম, পরাজিত আর জিৎ মুখামুখি হয়েছিল। ফলে সুমিষ্ট তাওহীদের সুধা পিয়ে মজলুম যালিমের ওপর, পরাজিত জিৎ এর ওপর জয়লাভ করেছিল। মনের ক্ষেদের তপ্ত জ্বালা প্রতিশোধের রসে শীতল করেছিল।

এক. ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক রহ. সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, **আমি জানতে পেরেছি, বনু হাশিম ও অন্যান্য কবীলার কিছু লোককে জোর করে আনা হয়েছে। তারা স্বেচ্ছায় এ যুদ্ধে আসেনি। আমাদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের কোনো কাজ নেই। সুতরাং, তোমরা বনু হাশিমের কাউকে দেখলে তাকে হত্যা করবে না। আবুল বাখতারী ইবনে হিশামকে যে দেখবে তাকেও হত্যা করবে না। তেমনিভাবে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও কেউ হত্যা করবে না। কারণ, সে বাধ্য হয়ে এখানে এসেছে।**

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে আবু হুযাইফা ইবনে আতাবা রা. বললেন, আমরা আমাদের বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করব আর আব্বাসকে ছেড়ে দিব? আল্লাহর কসম! আমি তাকে দেখতে পেলে তরবারি দিয়ে ফেঁড়ে ফেলব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ কথা গিয়ে পৌছল। তিনি উমর বিন খাত্তাব রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, **আবু হাফস! রাসূলের চাচার চেহারায় কি তরবারি দিয়ে আঘাত করা যায়?** উমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমায় অনুমতি দিন, তার ঘাড়টা আমি ধড় থেকে আলাদা করি দিই। আল্লাহর কসম! সে মুনাফিক হয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে আবু হুযাইফা রা. বলতেন, যে কথাটি সেই দিন আমি বলে ফেলেছিলাম সে ব্যাপারে আমি আজও পর্যন্ত আল্লাহর কাছে নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। আমি আজও সে ভয়ে ভীত। তবে হাঁ, হয়তো আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া এর কাফ্‌ফারা হতে পারে। সুতরাং তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

দুই. আবু বাখতারীকেও হত্যা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কায় ছিলেন তখন তিনি তাঁকে মানুষের যুলুম ও নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া তিনি নিজে তাঁকে কোনো দিনও কষ্ট দেননি। এমন কিছু কখনো করেননি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করতেন। পাশাপাশি তিনি বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে বয়কটের চুক্তিনামা সংবলিত দলীলটি যারা ছিঁড়ে ফেলেছিল তাদের একজন ছিলেন।

কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও আবুল বাখতারী সেদিন নিহত হয়েছিল। কারণ, সাহাবী মুজাযযার ইবনে যিয়াদ বালাবী রা. রণাঙ্গনে তাকে একজন মুশরিক সঙ্গীসহ দেখতে পেলেন। তারা উভয়ই সমান তালে যুদ্ধ করছিল। মুজাযযার রা. তার উদ্দেশ্যে বললেন, আবুল বাখতারী! আল্লাহর রাসূল আপনাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গীকেও? মুজাযযার বললেন, না! আল্লাহর কসম, আপনার সঙ্গীকে আমরা ছাড়ব না। আল্লাহর কসম! তবে আমি ও সে উভয়ই মরতে রাযি আছি। এরপর তারা উভয় যুদ্ধ শুরু করল। মুজায্যার তাকে হত্যা করতে বাধ্য হলেন।

তিন. সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও মুশরিক উমাইয়্যা ইবনে খলফের মাঝে মক্কায় থাকাকালে বন্ধুত্ব ছিল। বদরের দিন আব্দুর রহমান উমাইয়্যার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়্যা তখন তার ছেলে আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। আব্দুর রহমানের কাছে তখন কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল, যা তিনি দুশমনদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। উমাইয়্যা তাকে দেখে বলল, আমাকে তোমার প্রয়োজন আছে কি? কেননা, আমি তোমার সঙ্গের এ সকল লৌহবর্মের চেয়ে শতগুণে ভালো। আমি আজকের মতো আর কোনো দিন দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন? তার উদ্দেশ্য ছিল, যে আমাকে বন্দী করবে আমি তাকে দুধেল উষ্ট্রী মুক্তিপণ স্বরূপ দিব। এ কথা শুনে আব্দুর রহমান বর্মগুলি ফেলে দিলেন এবং তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলেন। আব্দুর রহমান বলেন, আমাকে উমাইয়্যা ইবনে খলফ বলল- তখন আমি তার ও তার ছেলের মাঝখানে হাঁটছিলাম- ঈগলের পালক বুকে রাখা তোমাদের মধ্যে ঐ লোকটি কে? আমি বললাম, হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। সে বলল, আজ আমাদের এই প্রলয়কাণ্ড তার কারণেই ঘটেছে।

আব্দুর রহমান রা. বলেন, আমি সামনে থেকে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় বেলাল রা. কোত্থেকে এসে তাদেরকে দেখে ফেললেন। আর এই ছিল সেই উমাইয়্যা, যে মক্কায় বেলাল রা.কে অবর্ণনীয় যুলুম নির্যাতন করেছিল। বেলাল রা. তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, কাফের-রাজ উমাইয়্যা ইবনে খলফ! আজ হয়তো সে বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব!! আমি বললাম, বেলাল! এরা তো আমার বন্দী। তিনি বললেন, হয় আমি বাঁচব নতুবা সে বাঁচবে! আমি বললাম ও হাবশী বেটা! তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তিনি বললেন, হয় সে বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব। এরপর তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর আনসার! ও তো কাফের সরদার উমাইয়্যা ইবনে খলফ, হয় সে বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব।

আব্দুর রহমান রা. বললেন, ইতোমধ্যে অনেক লোক এসে আমাদেরকে হাতবালার মতো ঘিরে ফেলল। কিন্তু আমি উমাইয়্যাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলাম। তিনি বলেন, পেছন থেকে এক লোক উমাইয়্যার ছেলের পায়ে আঘাত করলে সে মাটিতে পড়ে গেল। তখন উমাইয়্যা এত জোরে আর্তনাদ করে উঠল, যা আমি ইতঃপূর্বে কোনোদিনও শুনিনি। আমি তাকে বললাম নিজেকে বাঁচাও। কিন্তু আজ তো বাঁচাতেও পারবে না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারব না। তিনি বলেন, এরপর তারা তরবারি দিয়ে উভয়কে কচুকাটা করল। আব্দুর রহমান রা. পরবর্তীতে বলতেন, আল্লাহ তাআলা বেলালকে রহম করুন! একদিকে আমার বর্মগুলিও চলে গেল। আরেকদিকে আমার বন্দীদের ব্যাপারেও তিনি আমাকে দুর্ভোগে ফেলেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উমাইয়্যা ইবনে খলফের সঙ্গে আমার একটি চুক্তি ছিল যে, তিনি মক্কাতে আমার জান মালের হেফাযত করবেন। আর আমি মদীনায় তার জান মালের হেফাযত করব। সুতরাং, বদরের দিন যখন লোকেরা বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন আমি তাকে বন্দীদের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য পাহাড়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বেলাল হঠাৎ করে তাকে দেখে ফেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আনসারদের মজলিসে গিয়ে বললেন, কাফের সরদার উমাইয়্যা ইবনে খলফ ঐ তো যাচ্ছে। আজ হয় সে বাঁচবে, নয় আমি বাঁচব। সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের একটি দলসহ তিনি আমাদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলেন। আমি ধরা খাওয়ার ভয়ে উমাইয়্যার ছেলেকে পেছনে রেখে বললাম : কিছুক্ষণ তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত রাখো। তারা এসেই তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর আবার আমাদের পেছনে ছুটল। উমাইয়্যা ছিল ভারী ও মোটা লোক। যার কারণে সে দ্রুত চলতে পারছিল না। যখন তারা আমাদেরকে একেবারে ধরেই ফেলল, আমি তাকে বললাম উমাইয়্যা বসে পড়ো। সে বসে পড়ল। আমি নিজেকে তার শরীরের ওপর চড়িয়ে দিয়ে তাকে রক্ষার সর্বশেষ চেষ্টা চালালাম। কিন্তু তারা এদিক ওদিক থেকে তরবারি চালাতে লাগল। একজন হঠাৎ নীচ থেকে তাকে আঘাত করল। এভাবে তাকে হত্যা করে ফেলল। আমার পায়েও একজন আঘাত করে যখম করে ফেলল। পরবর্তীতে আব্দুর রহমান রা. আমাদেরকে তাঁর পায়ের পিঠের সেই যখমের চিহ্ন দেখাতেন।[৩৮৮]

চার. সে দিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আপন মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু ঈমানের এই তপ্ত জোশের সামনে নিছক

---

[৩৮৮] সহীহ বুখারীঃ ওকালাত পর্ব ১/৩০৮।

আত্মীয়তার সম্পর্ক একটি বারের জন্য চোখ মেলে চেয়ে দেখার সুযোগ পেল না। অথচ এর পরে যখন মদীনায় ফিরে গেলেন তখন নবীজীর চাচা আব্বাসকে বন্দীদের মধ্যে দেখতে পেয়ে বললেন, আব্বাস! আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন! আল্লাহর কসম, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আমি এত খুশি হবো যত খুশি আমি আমার বাপ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণেও হতাম না। কারণ, আমি জানি আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিলের তামান্না-আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন (তবে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন)।[৩৮৯]

পাঁচ. সে দিন আবু বকর সিদ্দীক রা. নিজের ছেলে আব্দুর রহমানকে মুশরিকদের মধ্যে দেখতে পেয়ে তার উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন, ওই খবীস! আমার ধন-সম্পদ কী করেছিস? আব্দুর রহমান বলল,

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ شِكَّةٍ وَيَعْبُوبُ ... وَصَارِمٍ يَقْتُلُ ضُلَّالَ الشَّيْبُ

'হাতিয়ার, রণ-বীণ আর ঐ তরবারি ছাড়া আর কিছু নেই; যা বুড়োকালের গোমরাহীর ইতি ঘটায়'।

ছয়. বদর যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরাম যখন মুশরিকদেরকে বন্দী করতে শুরু করলেন সা'দ বিন মুয়ায রা. তখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝুপড়ির দরজায় নাঙ্গা তরবারি হাতে নির্বিকার দাঁড়িয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন ঝুপড়ির ভেতরে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন, লোকদের কর্মকাণ্ডে সা'দ বিন মুয়াযের চেহারায় বিরক্তের ঘনঘোর মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে। তার কাছে এসে তিনি বললেন, সা'দ! কী ব্যাপার? ওরা যা করছে তা কি তোমার অপ্রিয় লাগছে? তিনি বললেন হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা ইসলামের জীবনে এই প্রথম তার দ্বারা শিরকপূজারীদেরকে চপেটাঘাত করেছেন, এ কারণে মূর্তি পূজার জীবাণুবাহী এই সব আবর্জনাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে পুঁতে ফেলাই আমার কাছে প্রিয় ছিল।

সাত. উভয় শিবিরের তুমুল লড়াইয়ে গোটা রণাঙ্গন তখন জাহান্নামের বিভীষিকার রূপ নিয়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান আসাদীর তরবারি ভেঙে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি ফাটা ডাল দিয়ে বললেন **উক্কাশা নাও, এটা দিয়েই জিহাদ চালিয়ে যাও!** তিনি যখন সেটা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত থেকে নিচ্ছিলেন তাতে সামান্য ঝাঁকুনি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তা লম্বা, শক্ত, শুভ্রলৌহনির্মিত এক শাণিত তরবারির রূপ পরিগ্রহ করল। তিনি যুদ্ধের শেষ

---

[৩৮৯] মুসতাদরাকে হাকিম (শাওকানী প্রণীত ফাতহুল ক্বাদীর ২/৩২৭)

পর্যন্ত সেটা দ্বারা যুদ্ধ করলেন। সেই তরবারিটির নাম ছিল 'আউন'। এরপর থেকে তিনি যেখানেই যেতেন তরবারিটি তাঁর সঙ্গে থাকত। সর্বশেষে যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি শহীদ হয়েছিলেন তখনো এটি তাঁর কাছে ছিল।

আট. যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সাহাবী মুসআব বিন উমাইর আবদারী রা. তার সহোদর আবু আযীয ইবনে উমাইর- সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল- এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এক আনসারী সাহাবী তাকে বাঁধছিলেন। তখন মুসআব রা. আনসারীকে বললেন, এটার দ্বারা তোমার হাতকে তুমি শক্তিশালী করো! কেননা, তার মা বড়ই মালদার, এটার বিনিময়ে সে তোমাকে ভালো অঙ্কের মুক্তিপণ দিতে পারে। তখন আবু আযীয ভাই মুসআবকে বলল, আমার প্রতি তোমার বক্তব্য কি এটাই ভাই? মুসআব তাকে বললেন, এ আনসারী আমার ভাই; তুমি নও!

নয়. যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের মরদেহগুলি একটি কূপের ভেতরে ফেলে দিতে বললেন। এর ধারাবাহিকতায় উতবা ইবনে রবীআর মরদেহ যখন টেনে আনা হচ্ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উতবার ছেলে আবু হুযাইফার দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন এক অজানা বিষাদে আবু হুযাইফার গোটা চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি তাকে বললেন, **আবু হুযাইফা! বাপের জন্য কি মনে কষ্ট লাগছে?** তিনি বললেন, না আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার পিতা কিংবা তার হত্যার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ কিংবা সংশয়ে নেই। কিন্তু যে জিনিসটি আমাকে নিদারুণ কষ্ট ও যন্ত্রণা দিচ্ছে তা হলো জন্মের পর থেকেই আমি আমার পিতাকে দেখে এসেছি একজন বিচক্ষণ, সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। এ কারণে আমার মনের একান্ত প্রত্যাশা ছিল হয়তো তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন। কিন্তু যখন আমি তাকে দেখলাম কুফরীর ওপরই মৃত্যু বরণ করেছে তখন হতাশ হয়ে গেলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দুআ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে ভালো কথা বললেন।

উভয় শিবিরের নিহতদের পরিসংখ্যান

ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম যুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধের ফলাফল ছিল ইসলামের চির দুশমন কাফেরদের চূড়ান্ত ও চরম লজ্জাকর পরাজয়। শাশ্বত সত্য দীন ইসলামের এক নিরঙ্কুশ বিজয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে মোট চৌদ্দ জন সাহাবী শাহাদাতের সুধা পান করেন। তাদের ছয় জন ছিলেন মুহাজির আর আট জন ছিলেন আনসার।

অপরদিকে মুশরিকরা এই যুদ্ধে চরম ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়েছিল। তাদের সত্তর জন নিহত হয়েছিল। আরও সত্তর জন হয়েছিল মুসলমানদের হাতে বন্দী।

তবে নিহত ও বন্দীদের অধিকাংশই ছিল আরবের নেতৃস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠসন্তানগুলি।

রণাঙ্গনে যুদ্ধ সমাপ্তির পর্দা নেমে এলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের পক্ষে নিহতদের নিকটে এলেন। খানিকটা সময় চেয়ে থেকে এই মরদেহগুলির উদ্দেশে তিনি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, **তোমরা তোমাদের নবীর কতটা খারাপ গোত্র ছিলে! তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছ আর মানুষ আমাকে বিশ্বাস করেছে। যেখানে অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে সেখানে তোমরা আমাকে আজীবন লাঞ্ছিত করার চেষ্টা চালিয়েছ। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছ আর মানুষ আমাকে তাদের নিজেদের জন্মভূমিতে আশ্রয় দিয়েছে!** এরপর তিনি তাদেরকে কূপে ফেলার নির্দেশ দিলে তাদেরকে টেনে এনে চিরদিনের মতো বদরের একটি বদ্ধ ও পাঁক-ভরা কূপে ফেলে দিয়ে পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বিদায় করে দেওয়া হলো।

সাহাবী আবু তালহা রা. থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে চব্বিশ জন মুশরিক সরদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মরদেহ সেখানের একটি বদ্ধ ও পচা-দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলে কারীম এর নীতি ছিল যখন কোনো কওমের ওপর বিজয় লাভ করতেন তখন তিনি সেখানে তিন দিন অবস্থান করতেন। এভাবে যখন বদরেও যুদ্ধোত্তর অবস্থানের তৃতীয় দিন হলো তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রা করার আদেশ দেন। অতঃপর বদর ছেড়ে চলতে লাগলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই কূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন খানিকটা সময় সেখানে দাঁড়ালেন। কূপের পাড়ে গিয়ে সেখানে নিক্ষিপ্তদের নাম ও তাদের বাপ-দাদাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন: **হে অমুকের ছেলে অমুক! হে অমুকের সন্তান অমুক!! তোমাদের কি এটা আনন্দিত করে যে, যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে। আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরাও কি তা সত্য পেয়েছ?** উমর রা. বলে উঠলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রাণহীন লাশের সঙ্গে কী কথা বলছেন? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ঐ সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তাদের চেয়ে তোমরা আমার কথা বেশি শুনছ না!** অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, **তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না। কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, তারা এ কথার কোনো জবাব দিতে পারে না।**[৩৯০]

. রী ও মুসলিম- মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৪৫।

পরাজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌছল

বদর রণাঙ্গন থেকে মুশরিকরা সুবিন্যস্তভাবে পালাতে পারেনি। তারা যে যার মতো দৌড়ে-ছুটে পালিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ী উপত্যকা আর গিরি-কন্দরে ছড়িয়ে পড়ে। আশ্রয় নেয় যে যেখানে পারে। এরপর যে যখন পারে ভীত-সন্ত্রস্ত প্রাণে ছুটে মক্কার পথে। কিন্তু সকলেই ছিল বিব্রত ও উৎকণ্ঠিত- কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে তারা প্রবেশ করবে? কীভাবে মুখ দেখাবে স্বজাতি আর স্বদেশের মানুষগুলিকে।

ইবনে ইসহাক বলেন, কুরাইশের এই ভয়াবহ বিপদ আর দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে মক্কায় গিয়ে সর্বপ্রথম উপস্থিত হয় হাইসুমান ইবনে আব্দুল্লাহ খুযাঈ। তারা দেখেই জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার! তোমার পেছনের লোকদের খবর কী? সে বলল, উতবা ইবনে রবীআ, শাইবা ইবনে রবীআ, আবুল হাকাম ইবনে হিকাম, উমাইয়্যা ইবনে খলফসহ মক্কার বড় বড় নেতারা সবাই মারা পড়েছে। এভাবে সে যখন কুরাইশের বড় বড় নেতা ও সম্ভ্রান্ত মানুষগুলির নাম মৃতের কাতারে বলে যাচ্ছিল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা তাকে থামিয়ে দিলো। সে ছিল হাতীমে বসা। সে বলল, আল্লাহর কসম, এর আকল যদি ঠিক থাকে তাহলে তাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে দেখো! তারা বলল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার কী অবস্থা? সে বলল, সফওয়ান এই তো হাতীমে বসা আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি তার বাপ ও ভাইকে এই চোখে নিহত হতে দেখেছি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম আবু রাফে' রা. বলেন : আমি আব্বাসের গোলাম ছিলাম এবং আমাদের ঘরে ইসলামের প্রবেশ ঘটেছিল। আব্বাস রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। উম্মে ফযল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আমিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু আব্বাস তাঁর ইসলামকে তখনো লুকিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে আবু লাহাব বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিল। এ কারণে বদর যুদ্ধের সংবাদ যখন তার কাছে এসে পৌছল আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলেন। তার বড় মুখ ছোট করে দিলেন। এর বিপরীতে যুদ্ধের সংবাদে আমাদের হৃদয় ও মন শক্তিশালী হয়ে উঠল। আমি ছিলাম খুব দুর্বল মানুষ। যমযম কূপের ঘরের মধ্যে বসে তীর বানাতাম। আল্লাহর কসম! সেদিনও আমি সেখানে বসে তীর বানাচ্ছিলাম আর উম্মে ফযলও আমার পাশে বসা ছিলেন। আমরা তখন যুদ্ধের সংবাদ পেয়ে আনন্দাপ্লুত ছিলাম। তখন আবু লাহাব তার পা'দুটি খারাপভাবে টেনে টেনে এসে হুজরার এক কোণে বসে পড়ল। আমার পিঠ ছিল তার পিঠের দিকে। আবু লাহাব তখনো সেখানে বসা ছিল যখন হঠাৎ একদল লোক চিৎকার করে উঠল, ঐ তো আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব চলে এসেছে! আবু লাহাব তাকে বলল, এদিকে এসো! আমার জীবনের কসম! তোমার কাছেই রয়েছে প্রকৃত সংবাদ। আবু রাফে' বলেন

: আবু সুফিয়ান তখন সেখানে বসে গেল। সব মানুষ গোল বেঁধে চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। আবু লাহাব বলল, ভাতিজা! বলো আমাদের লোকদের কী হয়েছে? সে বলল : চাচা! অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমরা একদল মানুষের সামনে পড়ে গিয়েছিলাম যাদের কাছে আমরা আমাদের ঘাড় পেতে দিয়েছিলাম। তারা যেভাবে চেয়েছে আমাদেরকে হত্যা করেছে। যেভাবে চেয়েছে আমাদেরকে বন্দী করেছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! তার জন্য আমি লোকদের দোষ দিই না। এমন কিছু লোকের মুখে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম, যারা ছিল আসমান ও যমীনের মাঝে সাদা পোশাক পরিহিত এবং মাথায় চিতা ঘোড়ার ওপর আরোহী। আল্লাহর কসম! তারা কোনো কিছু ছাড়ছিল না। আর না কোনো কিছু তাদের মুকাবিলা করতে সক্ষম ছিল।

আবু রাফে' বলেন, তখন আমি আমার হাত দ্বারা হুজরার এক প্রান্তের কাপড় উঠিয়ে বললাম, তারা ছিলেন ফেরেশতা। আবু রাফে' বলেন, তখন আবু লাহাব সঙ্গে সঙ্গে তার হাত উঠিয়ে আমার মুখে কষিয়ে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলো। আমিও তার মুকাবিলা করতে গেলাম। কিন্তু সে আমাকে ওপরে তুলে মাটিতে আছড়ে মারল। এরপর আমার ওপর চড়ে বসে আমাকে মারতে লাগল। কিন্তু আমি ছিলাম এক জন দুর্বল লোক। উম্মে ফযল এতক্ষণ বসা ছিলেন। এবার তিনি উঠে গিয়ে তাঁবুর একটি খুঁটি দিয়ে আবু লাহাবকে সজোরে আঘাত করলেন। এতে তার মাথায় ভীষণ যখম সৃষ্টি হয়ে গেল। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, তার মনীব উপস্থিত নেই, বিধায় তাকে খুব দুর্বল মনে করেছ? তখন আবু লাহাব কোনো কথা না বলে লাঞ্ছিত হয়ে উঠে চলে গেল। আল্লাহর কসম! এর সাত দিন পরেই সে 'আদাসা' রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। তা এক ধরনের ফোড়া যা আরবরা খুবই খারাপ মনে করত। যখন সে এতে মারা পড়ল তখন তার সন্তানরা তাকে ফেলে রাখল। তিন দিন ঐ অবস্থায় পড়ে থাকল। কেউ তার মরদেহের কাছেও যেত না এবং তার দাফনের ইচ্ছাও করছিল না। অতঃপর যখন তার সন্তানরা তাকে ফেলে রাখার কারণে বকাঝকা ও গালিগালাজের শঙ্কাবোধ করল তখন তারা একটি গর্ত খুঁড়ে একটি কাঠ দিয়ে তাকে ঠেলে নিয়ে সে গর্তে ফেলে দিলো এবং দূর থেকে তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করে তার মরদেহ ঢেকে দিল।

এভাবেই বদর রণাঙ্গনে মক্কা তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কচুকাটার কাহিনী শুনতে পেল। এ সংবাদ তাদের ওপর নিদারুণ কুপ্রভাব ফেলেছিল। এমনকি নিহতদের ওপর বিলাপ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। যাতে মুসলমানরা তাদের ওপর খুশী না হয়।

ঠিক এ সময়ই মক্কায় এক মজার ঘটনা ঘটে গেল । আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব তার তিন ছেলেকে বদরের ময়দানে হারিয়ে ছিল। এ কারণে সে তার

নিহত সন্তানত্রয়ের ওপর কাঁদতে চাচ্ছিল। কিন্তু সে ছিল অন্ধ লোক। হঠাৎ এক রাতে কোনো এক বিলাপকারিনীর আওয়াজ তার কর্ণকুহরে এসে আঘাত হানল। তাই সে তার গোলামকে ডেকে বলল, দেখো তো মৃতের ওপর বিলাপ করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কি না? কুরাইশরা তাদের নিহতদের ওপর বিলাপ করছে কি না? তাহলে আমি আমার ছেলে আবু হাকীমার ওপর বিলাপ করে কাঁদব। কেননা তার বিরহে আমার হৃদয়-মন্দির ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। গোলাম ফিরে এসে বলল, সেটা এক মহিলার কান্নার আওয়াজ। মহিলা তার উট হারিয়ে ফেলেছে আর এ জন্য সে কাঁদছে। তখন আসওয়াদ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। তার ভেতর ঠেলে মুখ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে লাগল,

أَتَبْكِي أَنْ يَضِلَّ لَهَا بَعِيرٌ ... وَيَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ

فَلَا تَبْكِي عَلَى بَكْرٍ وَلَكِنْ ... عَلَى بَدْرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ

عَلَى بَدْرٍ سَرَاةِ بَنِي هُصَيْصٍ ... وَمَخْزُومٍ وَرَهْطِ أَبِي الْوَلِيدِ

وَبَكِّي إِنْ بَكَيْتِ عَلَى عَقِيلٍ ... وَبَكِّي حَارِثًا أَسَدَ الْأُسُودِ

وَبَكِّيهِمْ وَلَا تَسَمِي جَمِيعًا ... وَمَا لِأَبِي حُكَيْمَةَ مِنْ نَدِيدِ

أَلَا قَدْ سَادَ بَعْدَهُمْ رِجَالٌ ... وَلَوْلَا يَوْمُ بَدْرٍ لَمْ يَسُودُوا

' সে কি তার উট হারিয়ে যাওয়ার জন্য কাঁদছে? এ কারণে কি বিনিদ্রা তার ঘুম হারাম করে দিয়েছে?

উটের জন্য কোঁদো না! কাঁদো বদরের জন্য; যেখানে কপাল ফেটে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে!

কাঁদো বদরের জন্য যেখানে বনু হুসাইস, বনু মাখযূম আর আবু ওলীদের কবীলার সূর্যসন্তানগুলি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!!

যদি কাঁদতেই হয় তবে কাঁদো আকীলের জন্য, কাঁদো হারিসের জন্য- যারা ছিল সিংহ শাবক।

তোমরা তাদের জন্য কাঁদো আর তাদের সকলের নাম নিও না! আর আবু হুকাইমার জন্য শোক প্রকাশের কেউ নেই।

দেখো! তাদের পরে এমন লোক রাতারাতি নেতা হয়ে গেছে, যদি বদরের দিন না হতো তবে তারা নেতা হতে পারত না'!!

সাহায্য আর বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছল

যখন মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় চূড়ান্ত ও নিশ্চিত হলো তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের কাছে দু'জন সুসংবাদদাতা পাঠিয়ে দিলেন। যাতে তাঁরা মদীনাবাসীদেরকে আগে আগে সুসংবাদ দেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে প্রেরণ করলেন মদীনার উচ্চ-ভূমির দিকে। আর যায়দ ইবনে হারেসা রা. কে পাঠিয়ে দিলেন নিম্নভূমির দিকে।

ইতঃপূর্বে ইহুদি ও মুনাফিকরা মদীনাতে মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম আতঙ্ক আর ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল। এমনকি তারা এ কথা বলার দুঃসাহস দেখিয়েছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। অতঃপর যখন এক মুনাফিক যায়দ ইবনে হারিসা রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উষ্ট্রী কসওয়ার ওপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখল, তখন সে বলল : মুহাম্মাদ অবশ্য নিহত হয়েছে। আর এই তাঁর উষ্ট্রী, আমরা তা চিনি। আর এই যায়দ ভয়ের কারণে কী বলবে? নিজেও তা জানে না। সে পালিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে।

যখন দূতদ্বয় মদীনায় গিয়ে পৌঁছলেন, মুসলমানরা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের খবর শুনতে লাগল। অবশেষে যখন তাদের কাছে মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয় নিশ্চিত হলো তখন মদীনায় আনন্দ আর খুশির বন্যা বইতে লাগল। মদীনার চর্তুদিক হেলতে দুলতে লাগল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে। মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ -যারা মদীনায় রয়ে গিয়েছিলেন- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ মহা বিজয়ের অভিভাষণ জানানোর জন্য বদরের পথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

উসামা বিন যায়দ রা. বলেন, আমাদের কাছে বদর রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয়ের সংবাদ যখন এসে পৌঁছল তখন আমরা নবী নন্দিনী রুকাইয়্যা রা. এর কবরের মাটি সমান করে দিচ্ছিলাম। তিনি ছিলেন উসমান রা. এর স্ত্রী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অসুস্থতার কারণে উসমান রা. কে ও আমাকে তাঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

মদীনার পথে নববী সেনাদল

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করলেন। কিন্তু রণাঙ্গন থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে গনীমতের মাল নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। যখন তাদের এ মতবিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন যার কাছে যা আছে সব জমা দিয়ে

দিতে। যখন সবাই সবকিছু জমা দিয়ে দিলো তখন এর সমাধান নিয়ে নাযিল হলো আয়াতে কুরআনী- যাতে রয়েছে জীবনের সব সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান।

উবাদা বিন সামেত রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বের হলাম। তাঁর সঙ্গে বদর যুদ্ধে অংশ নিলাম। উভয় বাহিনী মুখামুখি হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে শত্রুর ওপর বিজয় দান করলেন। তখন একটি দল তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে ও হত্যা করতে পশ্চাদ্ধাবন করল। অপর একটি দল গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে খালি ময়দানে উপুড় হয়ে দু'হাতে কাফেরদের ফেলে যাওয়া সম্পদ কুড়াতে লাগল। তৃতীয় আরেকটি দল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরে রেখেছিল। যাতে করে দুশমন অজ্ঞাতে তাঁর কোনো ক্ষতি করে না বসে। দিনের শেষে যখন রাত নামল এবং সবাই একে অপরের কাছে জমা হতে লাগল, তখন যারা গনীমতের মাল সংগ্রহ করেছিল তারা বলতে শুরু করল যে, আমরা এগুলো সংগ্রহ করেছি। সুতরাং, এতে অন্য কারও দাবি থাকতে পারে না। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল তারা বলল : তোমরা আমাদের চেয়ে এ সম্পদের বেশি হক্বদার নও। কেননা, আমরাই তো শত্রুদেরকে এগুলো থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানিতে ডুবিয়ে মেরেছি। (আর এখন তোমরা খালি ময়দানে এর দাবিদার বনে গিয়েছ)। আর যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রহরায় ছিল তারা বলল, আমাদের ভয় ছিল, না জানি তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো ক্ষতি করে বসে। তাই আমরা তাঁর প্রহরায় ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

তারা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম সম্পর্কে। বলে দিন, গনীমতের মাল হলো আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করো-যদি ঈমানদার হয়ে থাকো। [সূরা আনফাল : ১]

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[৩৯১]

---

৩৯১ আহমদ ৫/৩২৩, ৩২৪। হাকিম ২/৩২৬।

বদর প্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় বাহিনী ও মুশরিক যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন। তার সঙ্গে মুশরিকদের থেকে পাওয়া 'নফল'ও ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কা'বকে এর তত্ত্বাবধানে রাখা হলো। যখন তারা মাজীকে সফরা অতিক্রম করলেন তখন মাজীক ও নাযিয়ার মধ্যবর্তী একটি টিলার ওপর অবতরণ করলেন। সেখানে বসেই গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ বাইতুল মালের জন্য রাখার পরে বাকিটা সমানভাবে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

মদীনায় ফেরার পথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফরাতে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন নযর বিন হারেসকে সেখানে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। সে ছিল বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পতাকাবাহী। তাছাড়া সে ছিল কুরাইশের দাগী অপরাধীদের একজন। ইসলামের ঘোর শত্রু ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্টদানের অন্য যে কারও তুলনায় অগ্রগামী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে আলী ইবনে আবী তালিব রা. তার শিরচ্ছেদ করেন।

অতঃপর যখন তিনি ইরকে যুবয়াতে গিয়ে পৌছেন তখন উকবা ইবনে আবী মুঈতকে হত্যা করার আদেশ দেন। আমরা আগেই বলে এসেছি ইসলাম ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সে কত বড় শত্রু ছিল। সে ছিল ঐ ব্যক্তি যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযাবস্থায় তাঁর ওপর উটের ছিন্ন ও পচা-গলা নাড়ি-ভুঁড়ি নিক্ষেপ করেছিল। এ ব্যক্তিই একদিন তার চাদর দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গলায় ফাঁস দিয়েছিল এবং তাঁকে প্রায় হত্যা করে ফেলেছিল। যদি সময় মতো হযরত সিদ্দীকে আকবর আবু বকর রা. না এসে পড়তেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার হত্যার আদেশ জারী করলেন তখন সে বলল, মুহাম্মাদ! আমার ছেলে-সন্তানের দায়িত্ব কে নিবে? তিনি বললেন, আগুন।[৩৯২] অতঃপর আসেম ইবনে সাবেত আনসারী রা. তাকে হত্যা করেন। কারও কারও মতে তার হত্যাকারী ছিলেন আলী ইবনে আবী তালিব রা.।

পেছনের দিনগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই দু'জন ইসলাম বিদ্বেষীর হত্যা করা ছিল সময়ের অপরিহার্য দাবি। কারণ, তারা শুধু যুদ্ধবন্দীই ছিল না; বরং আধুনিক পরিভাষায় তাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবেই আখ্যা দেওয়া যায়।

অভিভাষণ প্রতিনিধি

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রওহা নামক স্থানে এসে পৌছলেন তখন মদীনার নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ- যারা দূতদ্বয়ের কাছ থেকে

---

[৩৯২] সিহাহ সিত্তাহ। দেখুন সুনানে আবী দাউদ (আউনুল মা'বূদ) ৩/১২।

বিজয়ের খোশখবরী শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য বের হয়েছিলেন- তাঁর সঙ্গে এসে মুলাকাত করলেন। তখন সালামা ইবনে সালামা রা. তাদেরকে বললেন, এখন তোমরা কোত্থেকে সম্ভাষণ জানাতে এসেছ ? আল্লাহর কসম! আমরা তো উটের মতো বড় বড় দানবদের সঙ্গে লড়েছি এবং পরিশেষে সেগুলোকে যবাই করে দিয়েছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় মুচকি হেসে বললেন, **'ভাতিজা! এরা এ কওমের সরদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ'**।

উসাইদ বিন হুযাইর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আপনাকে জয়মাল্যে ভূষিত করেছেন। আপনার চোখকে শীতল ও তৃপ্ত করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনাকে শত্রুর মুখামুখি হতে হবে এ কথা ভেবে আমি বদর ময়দানে না গিয়ে মদীনায় রয়ে যাইনি; বরং আমি ভেবেছিলাম যে, তারা বানিজ্য কাফেলা। আমি যদি জানতাম যে, আপনি শত্রুর মুখামুখি হতে যাচ্ছেন, তবে আমি কখনোই রয়ে যেতাম না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীবেশে মহানায়কের ভূমিকায় মদীনায় প্রবেশ করলেন। মদীনা ও আশপাশের ইসলামের শত্রুরা তাঁর অপ্রত্যাশিত এই সাফল্য দেখে ভয়ে কম্পমান ছিল। শত শত বনী আদম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো। এই সময় প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিল 'রঈসুল মুনাফিকীন' আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার সঙ্গী মুনাফিকরা।

তাঁর মদীনায় আগমনের একদিন পর বন্দীরাও মদীনায় উপনীত হলো। তিনি তাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। দেওয়ার সময় সকলকে বলে দিলেন বন্দীদের সঙ্গে উত্তম ও সদাচরণ করবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ নির্দেশ পৃথিবীর সমর-ইতিহাসে এক নতুন পর্বের অবতারণা করেছিল। এ নির্দেশের ফলে দেখা গেল সাহাবায়ে কেরাম রা. তাদেরকে রুটি খাওয়াতেন, আর নিজেরা খেয়ে থাকতেন কেবল খেজুর। কারণ সর্বদা তাদের মনে যে কথাটি বিরাজমান ছিল তা হলো- এটা নবীয়ে দোজাহান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ।

যুদ্ধবন্দীদের ফয়সালা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে মশওরা করলেন। আবু বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এরা তো আমাদেরই জ্ঞাতি-

গোষ্ঠী ও জ্ঞাতি ভাই। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করুন। তাহলে মুক্তিপণের অর্থ ইসলামের জন্য ব্যাপক শক্তি ও বলের কারণ হবে। অপরদিকে আল্লাহ যদি কোনোদিন তাদের হৃদয়গুলিকে হেদায়াতের আলোকমালায় উদ্ভাসিত করে দেন তবে তারা তো আমাদের পক্ষেরই শক্তিতে পরিণত হবে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমর রা. এর দিকে তাকিয়ে বললেন, **খাত্তাবের বেটা! তোমার কী মত?** উমর রা. বলেন, আমি বললাম, আমার মত আবু বকর রা. এর মতের ঠিক বিপরীত। আমার মতে অমুককে - তিনি নিজের এক আত্মীয়ের নাম ধরে- আমার হাতে সমর্পণ করুন, আমি তার শিরশ্ছেদ করব। আলীর হাতে আকীল ইবনে আবী তালিবকে অর্পণ করুন সে তার ঘাড় উড়িয়ে দিবে। হামযার হাতে তাঁর অমুক ভাইকে তুলে দিন সে তাকে হত্যা করবে। এতে করে আল্লাহ তাআলা জানবেন যে, মুশরিকদের প্রতি আমাদের অন্তরে এতটুকু শিথিলতা কিংবা নমনীয়তা নেই। আর এরা তো ঐ সকল মুশরিকের দলপতি, নেতা ও সরদার।

উমর রা. বর্ণনা করেন, আবু বকরের মতটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনঃপূত হয়েছিল। তাই তিনি আমার মত গ্রহণ না করে তাঁর মতানুযায়ী তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, পরের দিন সকালে আমি যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলাম তখন আবু বকরও রা. তাঁর সঙ্গে বসা ছিলেন। আমি দেখলাম তারা উভয়ে কাঁদছেন। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ও আপনার সঙ্গী কেন কাঁদছেন? আমাকেও বলুন। যদি আমার কান্না আসে তবে কাঁদব। আর যদি না আসে তবে আপনাদের কান্না দেখে কাঁদব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে তোমার সঙ্গীদের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার জন্য কাঁদছি।** এরপর তিনি নিকটের একটি গাছের দিকে ইশারা করে বললেন, **আমার কাছে তাদের ওপর আসমানী আযাব আরও কাছ থেকে দেখানো হয়েছে।** [৩৯৩]

আর আল্লাহ তাআলা তখন আয়াত নাযিল করলেন,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْآخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٦٨)

---

[৩৯৩] আল্লামা ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৩৬।

নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হিকমতওয়ালা। যদি একটি বিষয় না হতো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সেজন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছত। [সূরা আনফাল: ৬৭-৬৮]

এখানে 'কিতাব' দ্বারা কী উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কারও মতে, তা হলো আল্লাহ তাআলার বাণী فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً الخ (অতঃপর তোমাদের ইচ্ছা-চাইলে মুক্তিপণ গ্রহণ করতে পারো নতুবা এমনিতেই ছেড়ে দিতে পারো)। এখানে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাদের ওপর আযাব আসেনি। তবে তাদেরকে তিরষ্কার করা হয়েছে এ জন্য যে, তারা যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে কচুকাটা করার আগেই তাদেরকে বন্দী করেছিল। কেউ কেউ বলেন, বরং উল্লিখিত আয়াতটি পরবর্তী সময়ে নাযিল হয়েছে। আর আগের আয়াতে 'কিতাব' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর জ্ঞানে যা রয়েছে যে, নিকট ভবিষ্যতে গনীমতের মাল তাদের জন্য হালাল করে দেওয়া হবে কিংবা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভূত ও ভবিষ্যতের সকল পাপ মোচন করে দেওয়া হবে। তাদের ওপর সর্বদা রহমত ও অনুগ্রহের এক বিশেষ নজর থাকবে।

যেহেতু সিদ্দীকে আকবর রা.এর মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয়েছিল, এ জন্য যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হলো। বন্দীদের মুক্তিপণ ধার্য করা হয়েছিল চার ও তিন হাজার থেকে শুরু করে এক হাজার দিরহাম পর্যন্ত। তাছাড়া মক্কাবাসীরা লেখা পড়া জানত। কিন্তু মদীনাবাসীরা লেখাপড়া জানত না। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, যে মুক্তিপণের অর্থ আদায় করতে সক্ষম নয়, সে মদীনার আনসারদের দশজন সন্তান পড়াবে। যখন তারা লেখাপড়া মোটামুটি শিখে নিবে তখন এটাই হবে তার মুক্তিপণ।

কয়েকজন বন্দীর ওপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুগ্রহ করে কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্তি দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন মুত্তালিব ইবনে হানতাব, সাইফী ইবনে আবী রেফায়া, আবু উয্যাহ জুমাহী- এ ব্যক্তি উহুদ যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় নিহত হয়। এর বিবরণ পরে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতা আবুল আসকেও বিনিময় ছাড়া মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তবে শর্ত ছিল এই যে, সে মক্কায় পৌঁছেই নবী নন্দিনী যয়নব রা. কে মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। যয়নব রা. তার মুক্তিপণ স্বরূপ যে সম্পদ পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে নিজ মাতা খাদীজা রা. এর দেওয়া একটি গলার হার ছিল। বিবাহের সময় তাকে তিনি সেটা উপহার দিয়েছিলেন। রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে দেখতে পেয়ে দারুণ মর্মাহত হলেন। তাঁর হৃদয়-দুয়ার ভেঙে প্রবল উচ্ছ্বাসে চোখে অশ্রুর বান ডাকল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের কাছে আবুল আসকে এমনিতে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করলে সবাই তাতে সম্মতি দিলো। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর শর্ত করে দিলেন যে, মক্কায় পৌঁছে যয়নবের রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে। সুতরাং, সে মক্কায় পৌঁছে ওয়াদা অনুযায়ী কাজ করল। যয়নব রা. হিজরত করে মদীনায় চলে এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন হারেসা ও একজন আনসার সাহাবী রা. কে প্রেরণ করেন তাকে নিয়ে আসতে। তাদেরকে বলে দেন, **'তোমরা ইয়াজাজ স্থানে চলে যাবে। সেখানে তোমরা যয়নবের সাক্ষাৎ পাবে এবং তাকে নিয়ে মদীনায় চলে আসবে'**। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশমতো গিয়ে তাকে নিয়ে এলেন। তার হিজরতের কাহিনী ছিল অনেক লম্বা ও বেদনাময়।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আরেকজন ছিল সুহাইল ইবনে আমর। সে ছিল সুন্দর বাগ্মী ও আকর্ষণীয় বক্তৃতাকারী। উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুহাইলের সামনের ওপরের পাটির দাঁতদু'টি তুলে ফেলুন, এতে তার জিহ্বা বের হয়ে পড়বে। তাহলে সে আর কোনো দিন কোথাও আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে পারবে না। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমরের' এ আবেদন মঞ্জুর করলেন না। কারণ এতে 'মুসলা' তথা অঙ্গবিকৃতির সাদৃশ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, আর তা ইসলামে সাফ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া এতে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে জবাবদিহির ভয় ছিল।

হযরত সা'দ ইবনে নুমান উমরা করার জন্য মক্কায় গেলে আবু সুফিয়ান তাকে বন্দী করে ফেলে। আর তার ছেলে আমর ইবনে আবী সুফিয়ান ছিল মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দীদের একজন। এ কারণে তার ছেলে আমরকে যখন মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেও তখন সা'দের রাস্তা ছেড়ে দেয়।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনে কারীমের সূরা আনফাল নাযিল হয়। অন্য কথায় বলা যায়- এ সূরাটি ছিল বদর যুদ্ধের ওপর আল্লাহ তাআলার কৃত ব্যাখ্যা। তবে তা আরও লাখো কোটি বিজেতা আর সমরনায়কের ব্যাখ্যার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, যা সাধারণত কোনো যুদ্ধজয়ের পরে দেওয়া হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুসলমানদের কয়েকটি চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যেগুলি তখনো তাদের মধ্যে বাকি রয়ে গিয়েছিল এবং কোথাও কোথাও প্রকাশিত হয়ে পড়ছিল। এতে ধরিয়ে দেওয়া এসকল চারিত্রিক ত্রুটি আর দুর্বলতার প্রতি তারা যত্নবান হবে, এভাবে সকল ব্যাধি কাটিয়ে উঠে তারা সর্বদিক দিয়ে সুন্দর, সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে।

এরপর তিনি এ যুদ্ধে তাঁর পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে কী কী সাহায্য করা হয়েছে এবং কখন কখন করা হয়েছে তা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। যাতে করে তারা এটা ভেবে ধোঁকা না খেয়ে বসে যে, যা কিছু হয়েছে এ সবই তাদের পেশী-শক্তি আর সামরিক-শক্তির মাধ্যমে হয়েছে। যাতে তারা তাদের বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতাকে জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি বানিয়ে না নেয়। তাহলে ধীরে ধীরে তারা অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হয়ে যাবে। বরং এর বিপরীতে যেন তারা সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপরই ভরসা করে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।

এরপর তাদের সামনে রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর এই লড়াইয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অংশ নেওয়ার মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়, যুদ্ধে বিজয়ের বরমাল্য গলায় পরতে হলে তাকে কেমন চরিত্রের মানুষ হতে হয়! কোন্ কোন্ গুণাবলী আর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাদেরকে হতে হয়।

এরপরে মুশরিক, ইহুদি, মুনাফিক ও যুদ্ধবন্দীদেরকে সম্বোধন করা হয়। তাদেরকে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও দরদীকণ্ঠে সদুপদেশ দেওয়া হয়। হক্ব ও সত্যের পথ অবলম্বন করা এবং তা আঁকড়ে ধরে থাকার প্রতি পথনির্দেশ করা হয়।

এরপর মুসলমানদেরকে গনীমতের মাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। গনীমতের বিভিন্ন নীতিমালা ও এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ তাদেরকে বাতলে দেওয়া হয়।

অতঃপর তাদেরকে প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধ ও সন্ধির বিভিন্ন নিয়ম-কানুন আর বিধি-বিধান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে ইসলামের যুদ্ধ-বিগ্রহ জাহেলী যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। চরিত্র, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের দিক থেকে মুসলমান জাতি অন্য সমস্ত জাতির ওপরে থাকে এবং তামাম দুনিয়ার কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম শুধু একটি দর্শন কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির নাম নয়; বরং এটি তার অনুসারীকে এমন নীতিমালা আর বিধানের কঠোর অনুবর্তী বানায়, যা সভ্য ও সংস্কৃতিমান মানুষের পরিচয়।

এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের কতগুলি ধারা বলে দেওয়া হয়, যাতে বলা হয় : ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসরত আর বাইরে বসবাসরত মুসলমানদের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে?

বিবিধ ঘটনাবলী

এই হিজরী দ্বিতীয় বর্ষেই রমযানের রোযা ও সদক্বায়ে ফিতর ফরয করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যাকাতের নেসাব বলে দেওয়া হয়। সদকায়ে ফিতর ফরয করা

এবং যাকাতের নেসাব বর্ণনা করা হয়েছিল মূলতঃ ঐ সকল বাস্তুহীন সাহাবায়ে কেরামের জীবন সফর একটুখানি শান্তিময় ও হালকা করার জন্য, যারা মদীনায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, যারা ছিলেন নিঃস্ব ও ফকীর।

তবে সবচেয়ে খুশি ও আনন্দের বিষয় হলো, এটাই ছিল সেই বছর, যে বছর মুসলমানরা তাদের জীবনের সর্বপ্রথম ঈদ পালন করে। এ বছর তথা দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে ইসলামের জীবনে সর্বপ্রথম ঈদ নেমে আসে। বদর প্রান্তরে যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মাথায় বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন এর ঠিক কয়েকদিন পরেই আল্লাহ তাদেরকে এই সৌভাগ্যের ঈদ দান করেছিলেন। এখন মুসলমানরা স্বাধীন ছিলেন। সুতরাং মদীনার প্রতিটি অলিতে গলিতে আর গিরি কন্দরে তাকবীর ও তাহলীল ধ্বনির সমুন্নত নাদে গলা ফাটিয়ে তারা ঘোষণা করতে সক্ষম ছিলেন। আসলে কি মুসলমানদের জীবনে তখন আনন্দ আর উৎসবমুখর এক নয়া আস্বাদ নেমে এসেছিল। এভাবে তাদের হৃদয়গুলি আল্লাহর প্রেম তাঁর ভালোবাসায় উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। তাঁর অনুগ্রহ ও রেযামন্দি তালাশে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কারণ, তিনি তাদের জীবনকে পদে পদে বিভিন্ন নেয়ামত দ্বারা ভরিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতিটি মুহূর্তে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করছিলেন। এদিকে ইঙ্গিত দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

আর স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে অল্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো। [সূরা আনফাল:২৬]

বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক আয়োজন

বদর ছিল মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম সশস্ত্র সামরিক অভিযান। এটা ছিল ইতিহাসের অন্যতম চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিকর যুদ্ধ। যেখানে মুসলমানদের নিরঙ্কুশ বিজয় হয়েছিল। গোটা আরব চোখ বড় বড় করে মুসলমানদের অবিস্মরণীয় সে বিজয় প্রত্যক্ষ করেছিল। আর যারা এ যুদ্ধে একটি শুভ ফলাফলের সবার চেয়ে বেশি প্রত্যাশী ছিল তারাই তাতে বেশি নাকানি-চুবানি খেয়েছিল- তারা ছিল মুশরিক। কিংবা ইহুদিরা যারা মুসলমানদের বিজয় ও সফলতাকে তাদের নিজেদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ওপর ধ্বংস ও মরণ আঘাত হিসেবে দেখত। সুতরাং, বদর প্রান্তরে যেদিন বিজয় মুসলমানদের

পদচুম্বন করেছিল, সে দিন থেকেই এই দুই দল প্রচণ্ড দ্বেষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আততায়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদি ও মুশরিকদেরকে পাবেন। [সূরা মায়িদাহ : ৮২০]

মদীনায় এমন কিছু লোক ছিল, যারা এদের হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের ভূমিকা পালন করত। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু আসলে কুফরীতে তাদের প্রাণ অন্যদের তুলনায় আরও বেশি শক্ত ছিল। কারণ বাহ্যিকভাবে হলেও ইসলামে দাখিল হওয়া ছাড়া মান মর্যাদা নিয়ে তারা বেঁচে থাকার আর কোনো পথ পেয়েছিল না, তাই সেই উদ্দেশ্য পূরণই তাদেরকে ইসলামের দুয়ারে টেনে এনেছিল। তারা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল ও তার বাহিনী। প্রথমোক্ত দুই দলের তুলনায় ইসলামের বিরুদ্ধে শেষোক্ত দলটি মোটেও পেছনে ছিল না।

উল্লিখিত তিনটি দল ছাড়া ইসলামের বিরুদ্ধে আরও একটি দল কাজ করে যাচ্ছিল। তারা ছিল মদীনার আশপাশের মরু-যাযাবর জাতিগোষ্ঠী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণের কারণ ঈমান কিংবা কুফর ছিল না। কারণ ঈমান ও কুফরের মাঝে তারা কোনো ব্যবধান বুঝত না। বরং তাদের কাছে যে জিনিসটির দাম ও গুরুত্ব ছিল তা হলো, তারা ছিল ডাকাত ও লুণ্ঠক প্রকৃতির। যার কারণে তারা মুসলমানদের এ বিশাল বিজয় আর মহা সাফল্যে আচমকা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। এক অজানা ভয় তাদের গোটা অস্তিত্বকে চেপে ধরল। তাদের এ ভয়ের ব্যাখ্যা হলো- যদি এভাবে দিন দিন মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তবে মদীনাতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এতে করে তাদের অসহায় পথিকের সবকিছু ছিনতাই আর লুণ্ঠনের দুয়ারে চিরদিনের জন্য তালা লেগে যাবে। আর ঠিক এ ভয়ই শেষে বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে তাদেরকে মুসলমানদের শত্রু বানিয়ে দেয়।

আর এর দ্বারাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বদর প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য একদিকে যেমন আরবের বুকে একটি নবজন্মা জাতি হিসেবে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল। অপরদিকে তা চারদিকে মুসলমানদের দুশমনের জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং, এখন এটা প্রকৃতিজ ব্যাপার ছিল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলের উদ্যোগ ও কার্যক্রম এক রকম হবে না। বরং যার সুবিধা যেভাবে হাসিল হবে, যে তার লক্ষ্যস্থলে যেভাবে পৌছতে পারবে তাকে সে উদ্যোগই গ্রহণ করতে হবে।

এভাবে যখন মদীনা ও তার আশপাশের ইসলামের শত্রুরা ওপর দিয়ে হলেও ইসলামের বন্ধু ও সুহৃদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ঠিক তখনই মদীনার ইসলাম বিদ্বেষী ইয়াহুদীদের এক গোষ্ঠী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা ঘোষণা করে। প্রচণ্ড বিদ্বেষ আর ক্রোধের উদ্গীরণ ঘটিয়ে তারা মদীনার পরিস্থিতি গরম করে ফেলে। অপরদিকে মক্কাও ইসলামের শাহরগে এক মরণ কাঁমড় বসিয়ে দেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তারা উচ্চকণ্ঠে বদরের প্রতিশোধ নেওয়ার কথা দাঁত কড়মড়িয়ে বলছিল। তাদের রণপ্রস্তুতি প্রকাশ্যেই দেখা যাচ্ছিল। যেন তারা তাদের অবস্থা দ্বারা মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছিল,

وَلَا بُدَّ من يومٍ أغرَّ محجلٍ ... يَطُوْلُ اِسْتِمَاعِيْ بَعْدَهُ لِلنَّوَادِبِ

'এমন একটি উজ্জ্বল আলোকিত দিন অবশ্যই আসা জরুরী
যার পরে যুগের পর যুগ বিলাপকারীদের বিলাপ শোনা যাবে'।

কুরাইশের এই হুমকি ধমকি বিফলে যায়নি। যার ফলে দেখা গেল, এক বছর যেতে না যেতেই তারা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হীন অভিপ্রায়ে রওয়ানা দিলো। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'গাযওয়ায়ে উহুদ' নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের পরম সুখ্যাতি আর অসম সাহসের ওপর যা দারুণ নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

তবে এ সকল ঝড়ের মুকাবিলা করার জন্য মুসলমানরাও ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রণকৌশল পূর্ণ আবেগে প্রতিটি পদক্ষেপে দারুণ তেযে ফুটে ওঠে। পাশাপাশি বিপদের এ সকল ঘনঘটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতনতা ও সতর্কতা তো ছিলই। সামনের দিকে তার প্রত্যেকটি কদম ছিল মাপা মাপা। এ সকল কারণেই বিজয় সর্বশেষে তাঁরই পদচুম্বন করেছিল। আর শত্রু বাহিনীর জন্য তা হয়ে এসেছিল ব্যাপক সর্বনাশ। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এ সকল কাহিনীরই নিখুঁত ছবি আঁকার চেষ্টা করব।

কুদর নামক স্থানে গাযওয়ায়ে বনু সুলাইম

বদর যুদ্ধের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সর্বপ্রথম যে খবর এসেছিল তা হলো বনু সুলাইম ও বনু গাতফান মদীনা আক্রমণের জন্য তাদের সকল শক্তি ও মনোবল সঞ্চয় করছে। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ঠাণ্ডা করতে দুই শ' আরোহী সৈন্য নিয়ে তাদের বাসভূমিতে ছুটে চললেন এবং কুদর[৩৯৪] নামক স্থানে পৌছে গেলেন।

[৩৯৪] মক্কা ও সিরিয়ার পূর্ব দিকস্থ বাণিজ্যিক পথে নজদের ভেতরে অবস্থিত বনু সুলাইমের একটি কূপ।

তখন বনু সুলাইম পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় উপত্যকায় পাঁচ শ' উট রেখে গেল। মুসলিম বাহিনী তা নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেন। 'খুমুস' বের করার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ভাগ করে দিলেন। তাতে প্রত্যেকে দু'টি করে উট পেল। তাদের রেখে যাওয়া একটি গোলামও মুসলমানদের হাতে এলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। এরপরে মদীনায় ফিরে আসেন।

এই গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল বদর থেকে ফিরে আসার সাত দিন পরে দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে কিংবা মুহাররমের মাঝামাঝি সময়ে। এ সময়ে মদীনায় যিম্মাদারি অর্পণ করা হয়েছিল সিবা' ইবনে উরফুতার হাতে। কারও কারও মতে, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর হাতে।[৩৯৫]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ষড়যন্ত্র

বদর প্রান্তরে মুশরিকদের পরাজয়ের উল্লেখযোগ্য একটি প্রভাব ছিল এই যে, তারা ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। বিদ্বেষের আগুন দিবানিশি তাদেরকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছিল। গোটা মক্কা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে জ্বলন্ত অনলকুণ্ডলীর ওপর ফুটন্ত পানির মতো টগবগ করছিল। এর পরিণতি হলো এই যে, আরবের প্রসিদ্ধ দুই বীরপুরুষ (তাদের ধারণা মতে) এই সব ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এর উৎসমূলে চিরদিনের জন্য মৃত্যুবাঁধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিলো। আর তিনি ছিলেন স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালীন নবী মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বদর যুদ্ধের কয়েকদিন পর উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী ও সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা কা'বার হাতীমের মধ্যে বসে গল্প করছিল। ইসলাম ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি চরম বিদ্বেষের জন্য উমাইর আগ থেকেই পুরো কুরাইশদের মধ্যে কুখ্যাত ছিল। আর তার ছেলে ওহাব ইবনে উমাইর ছিল মুসলমানদের হাতে বদরের যুদ্ধবন্দী। বিভিন্ন কথার সূত্র ধরে এক পর্যায়ে সে বদর প্রান্তরের কূপে নিক্ষিপ্তদের আলোচনা তুলল। তখন সফওয়ান বলল, আল্লাহর কসম! তাদের পরে বেঁচে আর কী লাভ'?

উমাইর তাকে বলল, আল্লাহর কসম! তুমি সত্য বলেছ। কিন্তু যদি আমার ওপর ঐ সব ঋণ না থাকত, যা পরিশোধ করার ব্যবস্থা আমার নেই। আর আমার বাল-বাচ্চা ও পরিবার না থাকত, আমার পরে যাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা

---

[৩৯৫] যাদুল মাআদ ২/৯০। ইবনে হিশাম ২/৪৩,৪৪।

হয়; তাহলে আমি সোজা মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম। কারণ, এখন তাঁর কাছে যাওয়ার উপযুক্ত কারণ আমার কাছে রয়েছে। আমার ছেলে এখন তাদের হাতে বন্দী।

সফওয়ান এটাকে স্বর্ণ-সুযোগ হিসেবে দেখল। সে তৎক্ষণাৎ উমাইরকে বলল, তোমার সব ঋণ পূরণ করার দায়িত্ব আমার। তোমার পরিবারও আমার দায়িত্বে থাকবে। যতদিন তারা আছে আমি তাদেরকে দেখে রাখব। এমন হবে না যে, আমার কোনো জিনিসের সামর্থ্য আছে আর তারা সেটা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তখন উমাইর তাকে বলল, তবে আমার ও তোমার এ ব্যাপারটি সবার থেকে লুকিয়ে রাখবে। সে বলল, তাই হবে।

এরপর উমাইর তরবারিতে ভালো করে শাণ দিয়ে তাতে বিষ মাখিয়ে নিলো। অতি দ্রুত সফর করে এক সময় মদীনায় এসে উপস্থিত হলো। সে যখন মসজিদে নববীর দরজায় তার উটকে বসাচ্ছিল তখন হযরত উমর রা. তাকে দেখে ফেললেন- তিনি তখন সাহাবায়ে কেরামের একটি মজলিসে বদর প্রান্তরে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কতটা সম্মান ও সাহায্য করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন- তিনি তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, 'এ কুকুর আল্লাহর দুশমন উমাইর মদীনায় এসেছে কেন? নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি ব্যতীত সে এখানে আসেনি'। এরপরে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! ঐ তো আল্লাহর দুশমন উমাইর, কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে মদীনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি বললেন, **আমার কাছে তাকে নিয়ে এসো!** উমর রা. তার কাছে গিয়ে তরবারির খাপ তার গলায় চেপে ধরলেন। পাশাপাশি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বলে দিলেন, আপনারা আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে যান, এই খবীস থেকে তাঁর সম্পর্কে অতি সতর্ক ও সচেতন থাকুন। কেননা তার ওপর আস্থা রাখা যায় না। এরপর তাকে নিয়ে এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে দেখলেন- উমর রা. তখন তার গলা চেপে ধরে ছিলেন- তখন বললেন, **উমর তাকে ছেড়ে দাও!, তুমি আমার কাছে এসো উমাইর!**

তখন সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বলল, আপনাদের প্রভাত সুন্দর হোক! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **উমাইর! আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তোমার অভিভাষণের চেয়ে আরও সুন্দর একটি অভিভাষণ দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তা হলো সালাম- যা জান্নাতবাসীদের অভিভাষণ হবে।**

অতঃপর তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, **তুমি কেন এসেছ?** সে বলল, আমি এসেছি আমার ছেলের জন্য, সে আপনাদের হাতে বন্দী হয়েছে। আপনারা তার প্রতি ইহসান করুন।

তিনি তাকে বললেন, **তাহলে কাঁধে তরবারি এনেছ কেন?** সে বলল, তরবারির সর্বনাশ হোক! আপনি বলুন তো এই তরবারি কি আমাদের জন্য কিছু করতে পেরেছে?

তিনি বললেন, **উমাইর! আমার কাছে সত্য বলো!! তুমি কেন এসেছ?**

এবারও সে বলল, এ উদ্দেশ্যেই এসেছি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না; বরং **তুমি আর সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা একদিন কাবার হাতীমের ভেতরে বসে গল্প করছিলে। তখন তোমরা বদর প্রান্তরের কূপের কথা আলোচনা করছিলে। এর ফাঁকে তুমি বলেছিলে, যদি আমার ঋণ আর পরিবার পরিজনের ঝামেলা না থাকত, তবে আমি সোজা মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম। এরপরে সফওয়ান আমাকে হত্যা করার শর্তে তোমার ঋণ ও পরিবার পরিজনের যিম্মাদারি গ্রহণ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমার ও এসব কিছুর মাঝে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান।**

উমাইর ভড়কে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইতঃপূর্বে আপনি আমাদেরকে আসমান থেকে আসা যে ওহীর কথা বলতেন আমরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছি। আমার আর সফওয়ানের মাঝে যে ঘটনাটি ঘটেছিল পৃথিবীর কোনো মানুষ সেখানে ছিল না। আল্লাহর কসম! তিনিই আপনাকে সেই ঘটনার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আমাকে ইসলামের দিকে হেদায়াত করেছেন। আমাকে এ পথে টেনে এনেছেন। এরপরে সে কালিমায়ে শাহাদত পড়ল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, **তোমাদের ভাইকে তোমরা দীন শিখাও। তাকে কুরআন পড়াও। তার বন্দীকে মুক্ত করে দাও।**

অপরদিকে সফওয়ান মক্কা থেকে উমাইর রওয়ানা দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে মক্কায় মানুষের কাছে বলে বেড়াত, তোমরা এমন একটি সুসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাদেরকে বদর প্রান্তরের দুঃখ বেদনার কথা ভুলিয়ে দিবে। এভাবে সে প্রতিদিন বিভিন্ন কাফেলাকে উমাইর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত। একদিন এক ঘোড়সওয়ার তাকে উমাইরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছে দিলো। তখন সফওয়ান কসম কাটল, জীবনে কোনোদিনও আর তার সঙ্গে কথা বলবে না। কখনো তাকে একটুকুও সাহায্য করবে না।

কিছুদিন পর উমাইর মক্কায় ফিরে গেল। সেখানে সে মানুষদেরকে ইসলামের দিকে ডাকতে লাগল। পরবর্তী সময় দেখা গেল ইসলামের নতুন এ দাঈর হাত ধরে অগণিত অসংখ্য মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।[৩৯৬]

গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের সঙ্গে যে মৈত্রীচুক্তি করেছিলেন সে চুক্তির ধারাগুলি আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর দিলের একান্ত বাসনা ছিল চুক্তিতে উল্লিখিত সবগুলি শর্ত পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা। কার্যতও তাই করেছিলেন। তাই তো দেখা যায় চুক্তি করার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো দিন কোনো মুসলমান এমন কোনো কাজ করেননি, যা চুক্তিপত্রে উল্লিখিত শর্তের এক বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ বিপরীত হয়। কিন্তু জনমভরই ইহুদিরা তো পৃথিবীর এমন এক জাতি, গাদ্দারী, প্রতারণা আর প্রবঞ্চনায় পরিপূর্ণ যাদের অতীত ইতিহাস। ধোঁকা আর খেয়ানত ছিল ইহুদি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ জাতির ইতিহাসের এমন কোনো অধ্যায় চোখে পড়বে না, যেখানে মুহূর্তের জন্য তাদের এ গুণাবলী(?) গায়েব হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, এখন যদি চুক্তিবিরোধী কোনো কিছু তাদের থেকে প্রকাশ পায় তবে তাতে আদৌ বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কবরে চলে যাওয়া বাপ-দাদাদের স্বভাবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার মতো জাতি ইহুদিরা ছিল না। তাই ইহুদি চরিত্রের এ বিস্ময়কর উত্তরাধিকারের তারা মোটেও অবমূল্যায়ন করল না। তারা তাদের চিরাচরিত নিয়মে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত আর গাদ্দারীর পথ ধরল। মুসলমানদের নিজেদের ভেতরে তারা অস্থিরতা, উদ্বেগ আর অনাস্থার বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জোর কদমে সামনের অগ্রসর হতে লাগল। এর কিছু উদাহরণ দেখুন:

ইহুদি ষড়যন্ত্রের উদাহরণ

ইবনে ইসহাক র. বলেন, একদিন আউস ও খাযরাজের মুসলমানরা এক মজলিসে বসে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। এমন সময় ইহুদিদের এক বুড়ো শয়তান শাস ইবনে কায়স তাদের কাছ দিয়ে গমন করল। সে ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী, ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি চরম হিংসুক আর সর্বদা তাদের অকল্যাণকামী এক ইহুদি প্রেতাত্মা। আইয়ামে জাহেলিয়াতে চরম শত্রুতা আর বিদ্বেষের আগুন ইসলামের বদৌলতে নিভে গিয়ে সেখানে যখন আউস ও খাযরাজের মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব আর মিলনের অনির্বাণ প্রদীপ জ্বলে উঠল- এ দৃশ্য দেখে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। চরম আক্রোশ আর হিংসায় তার মুখ ও চোখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, বনু কাইলার নেতৃবৃন্দ আবার এক

[৩৯৬] ইবনে হিশাম ১/৬৬১-৬৬২।

হতে শুরু করেছে। আল্লাহর কসম! বনু কাইলার নেতৃবৃন্দ যদি এক হয়ে যায়, তবে তো মদীনায় আমাদের আর কিছুই রইল না। তাই সে তার সঙ্গে থাকা এক ইহুদি যুবককে ডেকে বলল, তুমি তাদের কাছে গিয়ে বসে পড়ো। এরপর তাদেরকে বুআস যুদ্ধ ও তার আগেকার অন্ধকার দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দাও। তাদের সামনে এমন কিছু কবিতা আবৃত্তি করবে যা তারা ঘনঘোর ধূলি ওড়ানো সেই তপ্ত রণাঙ্গনে আবৃত্তি করত। যুবক গিয়ে তাই করল। তখন আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। তারা বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ল। পরস্পর একে অপরের ওপর বড়াই করতে লাগল। অবস্থা এমন হলো উভয় গোত্রের লোকেরা একেকজন হাঁটু গেড়ে বসে চরম বিবাদে লিপ্ত হলো। অতঃপর তাদের একজন অপরজনকে বলল, তাহলে চলো এখনই সেই অতীতের দিনগুলি ফিরিয়ে আনি- অর্থাৎ চাইলে চলো অতীতের গৃহযুদ্ধে আবার লিপ্ত হয়ে পেশীর বল পরখ করে দেখি। চরম উত্তেজনায় উভয় দল হারাচৈতন্য হয়ে পড়ল। তারা বলল ঠিক আছে, হাররাতে মুকাবেলা হবে। হাতিয়ার.......... হাতিয়ার............। (যুদ্ধের ঘনঘটা তখন তাদের মাথার ওপর প্রবল আবেগে ঘূর্ণায়মান ছিল)

এ খবর গিয়ে পৌঁছল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট। খবর পেয়েই তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তাদের উদ্দেশে তিনি বললেন, **হে মুসলমানগণ! সাবধান!! সাবধান!!! আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই তোমরা জাহেলিয়াতের আঁচল নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছ? অথচ আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে তোমাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে এসেছেন, তার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্মানিত ও ইয্যতওয়ালা করেছেন। জাহেলিয়াতের কলুষতা থেকে তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন। কুফরীর অন্ধকার থেকে তোমাদেরকে বাইরে টেনে এনেছেন, তোমাদের পরস্পরের হৃদয়গুলিকে মুহাব্বত আর ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন?**

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনে তারা চেতনা ফিরে পেলেন। তারা বুঝতে পারলেন, এটা ছিল শয়তানের একটা ধোঁকা ও ঘরের শত্রুর ষড়যন্ত্র। তখন তারা খুব কাঁদলেন। আউস ও খাযরাজের এক অপরজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে পেছনে সম্পূর্ণ অনুগত হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা ইসলামের চির দুশমন শাস ইবনে কায়সের ষড়যন্ত্রের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই ধপ করে নিভিয়ে দিলেন।[৩৯৭]

[৩৯৭] ইবনে হিশাম ১/৫৫৫-৫৫৬।

ইহুদিরা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির পেছনে, দাওয়াতে ইসলামীর পথে প্রাচীর দাঁড় করার পেছনে যে কতটা চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যয় করত এটা তার একটি উদাহরণ মাত্র। এ ক্ষেত্রে তাদের আরও বহু পদক্ষেপ ও কর্মপদ্ধতি ছিল। কখনো তারা মুসলমানদের মাঝে মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিত। দুর্বল মুসলমানদের হৃদয়ে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠানোর জন্য দিনের শুরু ভাগে তারা ঈমান নিয় আসত আবার শেষভাগে কুফরী করত। তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত কেউ যদি ঈমান আনত তবে তারা তার জীবিকার পথকে সংকীর্ণ করে দিত। যদি তারা তার কাছে কিছু পেত তবে দিন রাত তার জন্য তাগাদা দিতে থাকত। আর যদি সে তাদের কারও কাছে কিছু পেত তারা অন্যায়ভাবে তা ভক্ষণ করত। আদায় না করে উল্টো বলে দিত, তুমি যখন তোমার বাপ-দাদার ধর্মের ওপর ছিলে তখন আমাদের কাছে তোমার ঋণ ছিল কিন্তু এখন যখন তুমি ধর্মত্যাগী হয়ে গিয়েছ, তখন আমাদের কাছে তুমি আর কিছু চাইতে পারবে না।[৩৯৮]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাদে চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা বদর যুদ্ধের আগেই এসব শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এ সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতেন। কারণ তাদের দিলের তামান্না ছিল- হায় যদি তারা সঠিক পথে দিশা পেত! যদি পুরো মদীনা সুখ-শান্তি-ভরা একটি জান্নাতে পরিণত হতো!!

বনু কাইনুকা'র চুক্তি ভঙ্গ

কিন্তু ইহুদিরা যখন দেখল যে, বদর প্রান্তরে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে অবিস্মরণীয় ও ঈর্ষণীয় সাহায্য করেছেন, মদীনার নিকট ও দূরের মানুষের মনে এখন তাদের ইয্যত, শক্তি ও সাহসের একটি ছাপ বয়ে গেছে, তখন তাদের রাগের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। এবার তারা সকল ছল-চাতুরি ছুঁড়ে ফেলে প্রকাশ্যে মুসলমানদের শত্রুতায় অবতীর্ণ হলো। দিনের আলোতে খোলাখুলি তারা মুসলমানদের সঙ্গে ঘাড়তেড়ামী ও একগুঁয়েমী শুরু করল।

এ ক্ষেত্রে তাদের গুরুঠাকুর ছিল কট্টর ইহুদি কা'ব বিন আশরাফ (তার ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করব)। তেমনিভাবে মদীনার ইহুদিদের গোত্র তিনটির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আর ইতরমার্কা ছিল বনু কাইনুকা'। তারা মদীনার অভ্যন্তরে 'বনু কাইনুকা' নামক নিজেদের নামে নামকরা মহল্লায় বাস করত। জাতে তারা ছিল কামার। বিভিন্ন ধরনের ঘটি-পেয়ালা তারা তৈরি করত। কুদরত

৩৯৮ মুফাসসিরীনে কেরাম তাদের এ কাজের উদাহরণ পেশ করেছেন সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতে।

দক্ষ এ পেশার কারণে স্বাভাবিকভাবে তাদের সকলের কাছেই সমরাস্ত্র ও হাতিয়ার ছিল। তাদের যুদ্ধোপযুক্ত লোক সংখ্যা ছিল সাত শ' জন। তাছাড়া তারা ছিল মদীনার ইহুদিদের সবচেয়ে সাহসী গোত্র। আর তারাই সবার আগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল।

আল্লাহ তাআলা যখন বদর রণাঙ্গনে শিরক ও মুশরিকদের ওপর ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন, তখন তাদের অবাধ্যতার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেল। তাদের যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দিন দিন আরো বেড়ে গেল। কোনো মুসলমান তাদের বাজারে গেলে তার সঙ্গে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাসত। এমনকি তারা মুসলিম মহিলাদের সঙ্গেও ইতরামি শুরু করে দিলো।

যখন তাদের অশোভনীয় এ আচরণ আরও বৃদ্ধি পেল এবং মুসলমানদের জন্য তা অসহনীয় হয়ে উঠল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকলকে একত্র হতে বললেন। তারা একত্র হলে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন সদুপদেশ দান করলেন, তাদেরকে সঠিক ও ন্যায়ের পথে ডাকলেন এবং অন্যায় ও অসদাচরণ থেকে তাদেরকে সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু কিছুতে তাদের কিছু হলো না। তাদের দম্ভ আরো বেড়ে গেল। তাদের বাঁকা ঘাড় আরও বাঁকা হয়ে গেল।

ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধে কুরাইশদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন পরাজিত করে মদীনায় ফিরে আসেন, সে দিন বনু কাইনুকার বাজারে ইহুদিদেরকে সমবেত করে বললেন, **হে ইহুদি সম্প্রদায়! কুরাইশের ঘাড়ে যে বিপদ আপতিত হয়েছে, তা তোমাদের ওপর আপতিত হওয়ার আগেই ইসলাম গ্রহণ করে নাও।** তারা বলল, মুহাম্মাদ! আপনি নিজেকে নিজে ধোঁকায় ফেলে রাখেন না। আপনি কুরাইশের এমন একটি দলকে পরাজিত করেছেন, যারা ছিল মূর্খ; যুদ্ধ ও রণকৌশল সম্পর্কে তাদের একটুকুও জ্ঞান ছিল না। সুতরাং, যদি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তবে তখনোই বুঝবেন আমরা কোন্ প্রকৃতির মানব। তখন বুঝতে পারবেন, আমাদের মতো লোকদের সঙ্গে জীবনেও আপনার মুকাবেলা হয়নি। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (١٣)

কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হবে এবং দোযখে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। আর তা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। নিশ্চয়ই ঐ দু'টো দলের মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের; এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে উপদেশ রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। [সূরা আলে ইমরান:১২-১৩][৩৯৯]

ইহুদিরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার জবাবে যা বলেছিল তার অর্থ ছিল যুদ্ধের সাফ ঘোষণা। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ক্রোধ দমিয়ে রাখেন। মুসলমানগণও সবর করে যান। তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন, দিন ও রাতের আবর্তন ইহুদিদের জন্য কী বার্তা নিয়ে আসে?

বনু কাইনুকার ইহুদিদের দুঃসাহস এতে আরও বেড়ে যায়। তারা একের পর এক মদীনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর ফিতনা-ফাসাদ জন্ম দিতে থাকে। নিজেদের হাতে এভাবে তারা নিজেদের কবর খুঁড়তে থাকে। যেন বড় তৃপ্তির সঙ্গে তারা নিজেদের ওপর রঙিন জীবনের একে একে সবগুলি দরজা বন্ধ করে দিতে থাকে। একে একে বেঁচে থাকার সবগুলি অধিকার তাদেরকে বিদায় সালাম জানিয়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে যেতে থাকে।

ইবনে হিশাম আবু আউন থেকে বর্ণনা করেন, একজন আরব রমণী কিছু পণ্য বিক্রির জন্য বনু কাইনুকার বাজারে যায়। অতঃপর সেগুলি বিক্রি করা হলে এক স্বর্ণকারের নিকট বসে। তখন সেখানের উপস্থিত ইহুদিরা তাকে তার মুখের নেকাব খুলতে বলে। কিন্তু সে অস্বীকৃতি জানায়। তখন সেই স্বর্ণকার মহিলার অগোচরে তার পরনের কাপড়ের একটি প্রান্ত পিঠের সঙ্গে বেঁধে দেয়। এতে করে সে যখন দাঁড়ায় তখন তার লজ্জাস্থান সকলের সামনে বের হয়ে পড়ে। এ দৃশ্যে তারা হেসে ওঠে এবং মহিলাটি চিৎকার করে ওঠে। তখন এক মুসলমান ইহুদি স্বর্ণকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। তখন ইহুদিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সেই মুসলমানকে হত্যা করে। এতে করে তার পরিবার ইহুদিদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। আর তখনই তাদের ও বনু কাইনুকার মাঝে সম্পর্কের রশি পুরোপুরি ছিঁড়ে যায়। চারদিকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ঘোলাটে হয়ে যায়।[৪০০]

---

[৩৯৯] সুনানে আবী দাউদ ও আউনুল মা'বূদ ৩/১১৫। ইবনে হিশাম ১/৫৫২।
[৪০০] ইবনে হিশাম ৪৭,৪৮।

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন

এরপরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধৈর্যের বাঁধ একটি একটি করে সবগুলি ভেঙে যায়। তিনি মদীনার যিম্মাদারী আবু লুবাবা আব্দুল মুনযির রা. এর কাছে রেখে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পতাকা দিয়ে আল্লাহর বাহিনী নিয়ে ছুটে চলেন বনু কাইনুকার বস্তিতে। যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখল তখন তড়িঘড়ি করে দুর্গে আশ্রয় নিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখলেন। আর এ অবরোধ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে শনিবার দিন। পশ্চিমাকাশে যুল কা'দার নতুন চাঁদ ওঠার আগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পনেরো দিন চলল অবরোধ। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মনে প্রচণ্ড ভীতি ঢেলে দেন। -আর এটাই আল্লাহর রীতি, তিনি যখন কোনো কওমকে লাঞ্ছিত ও পরাজিত করার ইচ্ছা করেন তখন তাদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দিয়ে পৌরুষ শক্তি ছিনিয়ে নেন। অতঃপর তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এই শর্ত দিয়ে আত্মসমর্পণ করে যে, তিনি তাদের জান-মাল, স্ত্রী-পরিজন ও ছেলে-সন্তানের জন্য যে ফয়সালা দিবেন তা তারা মাথা পেতে মেনে নিবে। এরপরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তাদের সবাইকে বেঁধে ফেলা হয়।

এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল আবারও মুনাফেকীতে লিপ্ত হয়। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাদেরকে মাফ করে দেওয়ার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করতে থাকে। সে বলল, মুহাম্মাদ! আমাদের মিত্রদের ওপর খানিকটা অনুগ্রহ করুন। উল্লেখ্য বনু কাইনুকা' খাযরাজের মিত্র ছিল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় নেন। এতে ইবনে উবাই আবারও তার আগের কথাই বলতে থাকে কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথায় কান দেন না। তখন ইবনে উবাই তার হাত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্মের পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, **আমাকে ছেড়ে দাও!** তিনি এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েন যে, তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। এরপরে আবার বললেন, **আফসোস! আমাকে তুমি ছেড়ে দাও!!** কিন্তু মুনাফিক তার জোরাজুরি আর পীড়াপীড়ি চালিয়ে যায় এবং বলে, আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি আমার মিত্রদের ওপর অনুগ্রহ করবেন। তাদের চারশ' জন বর্মহীন, তিনশ' জন বর্মপরিহিত; তারা আমাকে লাল ও কালো মানুষ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অথচ আপনি চাচ্ছেন এক সকালে তাদের সবাইকে পৃথিবী

থেকে বিদায় করে দিতে তাই না! আল্লাহর কসম! কালের দুর্বিপাককে আমি বেজায় ভয় পাই।

পরিশেষে এই মুনাফেকটার কারণে- যার বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণের বয়স এখনো পুরেপুরি একমাস যেতে পারেনি- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে নমনীয় আচরণ করেন। তিনি তাদের প্রাণভিক্ষা দেন। কিন্তু তাদেরকে মদীনা থেকে বের হয়ে অনেক দূরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং বলে দেন মদীনার ধারে কাছেও তাদেরকে যেন কোনোদিন দেখা না যায়। তখন তারা বের হয়ে 'আযরুয়াতে শাম' এর দিকে চলে যায়। কিছুদিন যেতে না যেতে সেখানে তাদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায়।

যাওয়ার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ধন-সম্পদ জব্দ করেন। তার মধ্য থেকে নিজের জন্য তিনি তিনটি কামান, দু'টি লৌহবর্ম, তিনটি তরবারি ও তিনটি বর্শা নিয়ে নেন এবং গনীমত থেকে 'খুমুস'ও বের করে নেন। গনীমতের মাল জমা করার দায়িত্বে ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা.।[৪০১]

গাযওয়ায়ে সাওয়ীক

মক্কায় সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা, মদীনায় ইহুদি ও মুনাফিকরা যখন তাদের ষড়যন্ত্র ও বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখন আবু সুফিয়ান নতুন এক দুরভিসন্ধি আবিষ্কারের ফন্দি আঁটতে লাগল। যাতে খরচ কম হবে কিন্তু লাভ বেশি হবে। তাই সে একটু দ্রুত এ পথে অগ্রসর হলো। কারণ, তার ভয় ছিল এমন না হলে তার কওমের সম্মান ও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যাবে। বদর প্রান্তরের লজ্জাকর পরাজয়ের পর সে পূর্বেই শপথ করে নিয়েছিল, যতদিন না মুহাম্মাদের সঙ্গে লড়াই করবে ততদিন পর্যন্ত সহবাসের গোসলের পানি তার চুলের আগাও স্পর্শ করতে পারবে না। এভাবে সে তার কসম পূরণের জন্য দুইশ' আরোহী যোদ্ধা নিয়ে মদীনার পথে পা বাড়ালো। চলতে চলতে কানাত উপত্যকার শেষ মাথায় অবস্থিত 'সাইব' নামক পাহাড়ের পাদদেশে এসে তাঁবু স্থাপন করল। এখান থেকে মদীনার দূরত্ব ছিল প্রায় বারো মাইল। কিন্তু সরাসরি মদীনা আক্রমণের কথা চিন্তা করে তার কলিজার পানি শুকিয়ে গেল। তাই সে অন্য পথ অবলম্বন করল। সে ডাকাতি ও লুণ্ঠন শুরু করল। সে একাকী রাতের অন্ধকারে চুপিসারে মদীনার আশপাশের এলাকায় প্রবেশ করে হুয়াই ইবনে আখতাবের বাড়িতে এসে উঠল। তাকে দরজা খুলতে বললে সে ভয় পায় এবং

---

[৪০১] যাদুল মাআদ ২/৭১,৯১। ইবনে হিশাম ২/৪৭-৪৯।

অস্বীকৃতি জানায়। এরপর তারা বনু নযীরের সরদার ও খাযাঞ্চী সাল্লাম ইবনে মিশকামের কাছে যায় এবং সাল্লাম তাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি দেয়। সে খুব করে তাকে মেহমানদারি করে এবং শরাব পান করায়। কিছু গোপন আলাপচারিতাও তাদের মধ্যে হয়। এরপর আবার রাতের শেষভাগে অন্ধকার থাকতেই সে তার সাথীদের নিকট ফিরে আসে। তখন তাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী পাঠিয়ে মদীনার পার্শ্ববর্তী উরাইয নামক বস্তির ওপর আক্রমণ করে। তারা সেখানে কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। সেখানে একটি ক্ষেতে তারা এক আনসার আর তার মিত্রকে পেয়ে উভয়কে হত্যা করে। এরপর পালিয়ে মক্কায় ফিরে আসে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবায়ে কেরামের একটি দল নিয়ে আবু সুফিয়ান বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু তারা আরও দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। পালানোর সুবিধার্থে তারা তাদের খাদ্যসামগ্রী অনেক 'সাওয়ীক' তথা ছাতু ফেলে রেখে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কুরকুরাতুল কুরদ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে আবার মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় তারা যে ছাতু ফেলে দিয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা তা উঠিয়ে নিয়ে আসে। এ ভাবে এ যুদ্ধের নাম হয়ে যায় 'গাযওয়ায়ে সাওয়ীক' তথা 'ছাতু অভিযান'। এটা ছিল বদর যুদ্ধের দুই মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ঘটনা। এ সময় মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির রা.।[৪০২]

গাযওয়ায়ে যী আমর

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় এটাই ছিল সবচেয়ে বড় সামরিক হামলা, যার নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং নবীয়ে আরাবী মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা সংঘটিত হয়েছিল তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে।

এ যুদ্ধের কারণ ছিল- বিভিন্ন সূত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, বনু সা'লাবা ও বনু মুহারেবের একটি বিশাল বাহিনী একত্র হয়েছে। তারা মদীনার চারপাশের এলাকাগুলির ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। এ খবর পেয়ে তিনি মুসলমানদেরকে প্রস্তুত হতে বললেন। সাড়ে চার শ' পদাতিক ও আরোহী সৈন্য নিয়ে তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে এলেন। মদীনার দায়িত্ব দেওয়া হলো উসমান ইবনে আফফান রা. এর হাতে।

---

[৪০২] যাদুল মাআদ ২/৯০,৯১। ইবনে হিশাম ২/৪৪,৪৫।

পথিমধ্যে বনু সা'লাবার জুবার নামক একটি লোককে তারা গ্রেফতার করলেন। তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সে মুসলমান হয়ে গেল। তখন তাকে বেলাল রা. এর হাতে সোপর্দ করা হলো। পরে সে-ই মুসলিম বাহিনীকে পথ দেখিয়ে শত্রু-ভূমি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল।

শত্রুরা যখন মদীনার বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেল তখন তারা পাহাড়ের বিভিন্ন কন্দরে লুকিয়ে পড়ল। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের বাহিনী নিয়ে তাদের সমবেত হওয়ার স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এখানে 'যু আমর' নামক একটি কূপ ছিল। এখানে হিজরী তৃতীয় সনের পুরো সফর মাসটি কিংবা তার চেয়ে কয়েকদিন কম কাটালেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উদ্দেশ্য ছিল যাতে বেদুঈন যাযাবর জাতিগোষ্ঠীগুলি মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিমাণ অনুধাবন করতে পারে এবং তাদের ওপর ভয়-ভীতি ও কাপুরুষতা চেপে বসে। সবকিছু সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।[৪০৩]

কা'ব বিন আশরাফের হত্যা

কা'ব বিন আশরাফ ছিল চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদি সরদার। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি সবার চেয়ে আগে বেড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে দাওয়াত দিত।

সে ছিল বনু নাহবানের তাঈ কবীলার লোক। আর তার মা ছিল বনু নযীরের মেয়ে। সে ছিল গোটা আরবের মধ্যে অন্যতম প্রাচুর্য ও বিত্তশালী। তার রূপ-সৌন্দর্য আর সুকুমার অবয়বের গোটা আরবে সুনাম ছিল। পাশাপাশি সে ছিল একজন খ্যাতিমান কবি। তার বসবাসের কেল্লা ছিল বনু নযীরের বস্তির পেছনে মদীনার দক্ষিণ-পূর্বে।

যখন বদর প্রান্তরে সহায়-সম্বলহীন কয়েকশ' মুজাহিদের হাতে কুরাইশদের বড় বড় সরদার আর সশস্ত্র হাজার সৈন্যের নাকানি-চুবানির সংবাদ তার কানে গিয়ে পড়ল, তখন সে বলল, সত্যি কি তাই? তারা ছিল আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত লোক, মানুষের বাদশাহ ও অধিপতি সমতুল্য। সুতরাং, মুহাম্মাদ যদি এখন তাদের এমন কিছু করে থাকে তবে পৃথিবীর আলো বাতাসে বেঁচে থাকার চেয়ে মাটির উদরে চলে যাওয়াই তো ভালো।

---

৪০৩ ইবনে হিশাম ২/৪৬। যাদুল মাআদ ২/৯১। কথিত আছে, দু'সূর কিংবা গাউরস মুহারিবীর পক্ষ থেকে রাসূলে কারীম সা. কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র এ গাযওয়াতেই করা হয়েছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ মতে এটা ছিল অন্য কোনো গাযওয়ার ঘটনা। দেখুন সহীহ বুখারী ২/৫৯৩।

অতঃপর যখন তার কাছে এ সংবাদ নিশ্চিতভাবে পৌঁছল তখন আল্লাহর এ শত্রু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠল। তাদের শত্রুদের প্রশংসা করে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে শুরু করল। কেবল এতেই সন্তুষ্ট ছিল না; বরং সে সরাসরি মক্কায় কুরাইশদের কাছে চলে গেল। সেখানে মুত্তালিব ইবনে আবি ওদাআ সাহমীর কাছে অবতরণ করল। তাদের সামনে সে এমন কিছু কবিতা আবৃত্তি করছিল যাতে বদর প্রান্তরের নিহত মুশরিক কূপবাসীদের কথা মনে করে তাদেরকে নিয়ে কাঁদছিল। এর দ্বারা মুশরিকদের আত্মমর্যাদাবোধের আগুন চতুর্গুণ তেজে জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিল এবং প্রতিশোধের চরম নেশায় তাদেরকে মাতাল করে তুলছিল। তাদেরকে আহ্বান করছিল পুনরায় এক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। মক্কায় থাকাকালে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য মুশরিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের ধর্ম তোমার কাছে অধিক প্রিয় না কি মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের ধর্ম? আর আমাদের মধ্যে কে সর্বাধিক সরল ও সঠিক পথে আছে? সে বলল, তোমরাই তাদের চেয়ে অধিক সত্য ও সর্বোত্তম পথে রয়েছ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। [সূরা নিসা : ৫১]

এরপর কা'ব সেই অবস্থায় মদীনায় ফিরে এলো। এবার সে সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে বাজে ও অমূলক বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। তারা রসনার শাণ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিতে লাগল।

আর ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **কে আছে কা'ব ইবনে আশরাফের একটা ব্যবস্থা নিতে পারে? কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চরম কষ্ট দিয়েছে।** তৎক্ষণাৎ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা, আব্বাদ বিন বিশর, আবু নায়েলা- তার নাম ছিল সিলকান ইবনে সালামা। আর তিনি ছিলেন কা'ব বিন আশরাফের দুধ ভাই- হারেস ইবনে আউস এবং আবু আবস ইবনে জবর রা. প্রস্তুত হয়ে গেলেন। এ দলটির আমীর ছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা.।

বিভিন্ন রেওয়াতে কা'ব বিন আশরাফের হতাকাণ্ড সম্পর্কে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা হলোঃ যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **কা'ব বিন আশরাফকে কেউ কিছু করতে পারবে? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর**

রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করে দিই? তিনি বললেন, হাঁ। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, তাহলে আমাকে কয়েকটি কথা বলার অনুমতি দিন! তিনি বললেন, **ঠিক আছে তুমি বলতে পারো!**

তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা কা'ব বিন আশরাফের কাছে এসে বলল, এই লোকটি- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ইঙ্গিত দিলেন- আমাদের কাছে সদক্বা চায়। আসলে তিনি আমাদেরকে ভারি বিপদে ফেলে রেখেছেন।

কা'ব বলল, আল্লাহর কসম! এখন তোমরা তাঁর প্রতি আরও বিরক্ত হয়ে পড়বে।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. বললেন, আমরা যেহেতু তাঁর আনুগত্য করেছি, এ কারণে তাঁর শেষ পরিণতি জানার আগ পর্যন্ত তাকে ছাড়তে পারব না। যাই হোক, আমার এক কিংবা দুই ওসাক শস্য প্রয়োজন।

কা'ব বলল, ঠিক আছে। তবে আমার কাছে তোমাকে কিছু বন্ধক রাখতে হবে।

ইবনে মাসলামা বললেন, আপনি কী চাচ্ছেন?

কা'ব বলল, তোমার বিবিদেরকে রাখো।

ইবনে মাসলামা বললেন, আপনার কাছে কীভাবে আমার বিবিদেরকে বন্ধক রাখব। অথচ, আপনি হলেন গোটা আরবের সবচেয়ে সুন্দর ও কমনীয়কায় পুরুষ।

কা'ব বলল, তাহলে তোমার ছেলে-মেয়েকে রাখো।

ইবনে মাসলামা বললেন, তাতে মানুষ আমাদেরকে গালি দিবে। লোকেরা বলবে, এক ওসাক কিংবা দুই ওসাক খাদ্যের জন্য তাদের বাপ তাদেরকে বন্ধক রেখেছে। তখন মানুষ আমাদেরকে গালি দিবে। তবে আপনার কাছে আমার হাতিয়ার বন্ধক রাখতে পারি।

কা'ব বলল, ঠিক আছে, নিয়ে এসো!

আবু নায়েলাও হুবহু মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. এর পথ অনুসরণ করল। তিনি কা'ব বিন আশারাফের কাছে এসে প্রথমে কিছুক্ষণ বিভিন্ন কবিতা আদান-প্রদান করতে লাগলেন। এরপর তাকে বললেন, ভাই ইবনে আশরাফ! আমি একটি প্রয়োজনে আপনার নিকট এসেছি। আমি এখন তা আপনার কাছে খুলে বলতে চাই, কিন্তু আমাকে ওয়াদা দিন আর কাউকে তা বলবেন না।

কা'ব বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

আবু নায়েলা বললেন, ভাই ইবনে আশরাফ! এই লোকটির - ইঙ্গিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে- এখানে এসে তো আমাদেরকে দারুণ বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। গোটা আরব আমাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জীবনের চারদিকের সঙ্গে আমদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, পরিবার-পরিজন ও ছেলে সন্তান একে একে সব বিদায় নিচ্ছে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। একের পর এক আপদের তোড়ে ছেলে-সন্তানগুলি হাঁপিয়ে উঠছে। এভাবে মুহাম্মাদ বিন মাসলামার সঙ্গে যেমন আলোচনা হয়েছিল সে পথ ধরেই তাদের আজকের আলোচনাও সামনে এগিয়ে চলল। কথার ফাঁকে একবার আবু নায়েলা বলে উঠল, আমার ক'জন সঙ্গীর অবস্থাও হুবহু আমার মতোই। আমি চেয়েছিলাম তাদেরকেও আমার সঙ্গে নিয়ে আসতে। আপনি তাদের কাছেও কিছু বিক্রি করবেন এবং তাদের ওপর ইহসান করবেন।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা ও আবু নায়েলা যে উদ্দেশ্যে এই কথোপকথনের আয়োজন করেছিলেন সে ক্ষেত্রে তারা পরিপূর্ণরূপে সফল হয়েছিলেন। কেননা, এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, এরপর যখন সে তাদেরকে হাতিয়ার ও বন্ধু-বান্ধবসহ আসতে দেখবে তখন তার মনে ভিন্ন কিছুর উদয় ঘটবে না।

সেদিন ছিল হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রবীউল মাসের চৌদ্দ তারিখ। দিনের শেষে চারদিকে সন্ধ্যা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পরে শুরু হলো রাতের আনাগোনা। চন্দ্রালোকিত ও জোৎসাস্নাত এই রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী কাল সকালে পৃথিবীতে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করার জন্য এক জায়গায় সমবেত হলো একটি দল। বিদায়কালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'বাকীউল গারকাদ' পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। দু'চারটি কথায় অতি সংক্ষেপে তাদের সকলের উদ্দেশে বললেন, **আল্লাহ তাআলার নামে তোমরা পথ চলতে শুরু করো। আয় আল্লাহ! তুমি তাদেরকে সাহায্য করো।** এরপর তিনি বাড়িতে ফিরে গেলেন। তাদের সফলতা ও সুরক্ষার জন্য দরবারে ইলাহীতে নামায ও মুনাজাত করতে লাগলেন।

দলটি কা'ব বিন আশরাফের দুর্গের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখন আবু নায়েলা কা'বকে ডাক দিলো। সে সদ্য বিবাহ করেছিল। তাই তাদের কাছে আসার জন্য উদ্যত হলে স্ত্রী কা'বকে বলল, এ সময় কোথায় যাচ্ছেন? আমার কান তাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। সেখান থেকে রক্তের গন্ধ আসছে'।

কা'ব বলল, আরে ওটা তো আমার ভাই মুহাম্মাদ বিন মাসলামা, আর আমার দুধভাই আবু নায়েলা। মানুষের যে কোনো ডাকে সাড়া দেওয়াই তো ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের নিদর্শন। এরপর সে মাথায় সুগন্ধি মেখে বেরিয়ে এলো।

আবু নায়েলা আগ থেকেই তার সঙ্গীদেরকে বলে রেখেছিল, যখন সে আমাদের কাছে আসবে তখন আমি তার মাথার সুগন্ধি ঘ্রাণ নেওয়ার ছলে চুল ধরে ফেলব। যখন তোমরা দেখবে, তার চুল ধরে আমি তাকে কাবু করে ফেলেছি তখন তোমরা এসে তাকে একযোগে আঘাত করে তার দম্ভের চির ইতি ঘটাবে। কা'ব তাদের কাছে এসে বিভিন্ন বিষয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করল। তখন আবু নায়েলা বললেন, ইবনে আশরাফ! চলুন আজুয পাহাড়ের ঘাঁটিতে গিয়ে বাকি রাত সেখানে গল্প করেই কাটিয়ে দিই! কা'ব বলল, যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে। তখন তারা সে দিকে হাঁটতে লাগল। পথিমধ্যে আবু নায়েলা বলল, আমি এ রাতের মতো সুগন্ধ ও সুঘ্রাণের রাজ্য-রাত কোনোদিনও দেখিনি। তার এ কথা শুনে গর্ব আর অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কা'ব বলে উঠল, আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুগন্ধ রমণী আছে। আবু নায়েলা বলল, আপনার মাথা থেকে খানিকটা ঘ্রাণ নেওয়ার অনুমতি দিন। কা'ব বলল, হাঁ হাঁ। নিঃসংকোচে নিতে পারো। তখন আবু নায়েলা কাবের মাথার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নিজে ঘ্রাণ নিলো। সঙ্গীদেরকেও নিতে বলল। কিছুদূর যাওয়ার পরে আবু নায়েলা বলল, ভাই আরেক বার? কা'ব বলল হাঁ নিশ্চয়ই। তখন সে আগের মতো করে ঘ্রাণ নিলো। এতে কাবের অন্তরে স্থির হলো এবং সন্দেহজনক কোনো কিছুই রইল না।

কিছুক্ষণ পথ চলার পরে আবু নায়েলা বলল, ভাই আরেকটি বার দেওয়া যায়? কা'ব বলল, হাঁ। তখন কাবের মাথায় আবু নায়েলা তার হাত ঢুকিয়ে দিলো। যখন কিছুটা শক্ত করে ধরতে পারল তখন বলে উঠল 'এবার আল্লাহর দুশমনকে সাবাড় করে ফেলো! তখন তার ওপর কয়েকটি তরবারি ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুই হলো না। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা একটি ছুরি নিয়ে তার নাভীর নীচে বসিয়ে দিলো। ছুরি তার নাড়ি-ভুঁড়ি ফেঁড়ে বেরিয়ে গেল। আল্লাহর এই বড় দুশমনের প্রাণহীন মরদেহ ধপাস করে ভূপাতিত হলো। মরণের আগে সর্বশেষে সে এমন এক চিৎকার দিয়েছিল যাতে চারদিকের সবকিছু কেঁপে উঠেছিল। সবগুলো কিল্লাতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন-বাতি ইত্যাদি জ্বলে উঠল (কিন্তু কিছুই তার উপকারে এলো না)

এরপর দলটি ফিরে এলো। হারিস ইবনে আউস তার এক সঙ্গীর তলোয়ারের খোঁচায় আহত হয়েছিলেন এবং তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। তারা যখন হাররাহ উরাইয নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন তখন দেখলেন হারিস তাদের মাঝে নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে তিনি এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর সঙ্গীরা তাকে উঠিয়ে নিলো এবং বাকীয়ে গারকদে পৌঁছে সমুন্নত আওয়াজে তাকবীর দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে বুঝতে পারলেন, তারা তাদের মিশনে সফল হয়েছে। এরপর তিনিও তাকবীর দিয়ে তাদের কাছে ছুটে এলেন। তাদের কাছে পৌঁছে তিনি বললেন,

এই মুখগুলো সবসময় কামিয়াব হোক! তারা বললেন, আপনার মুখও হে আল্লাহর রাসূল। এরপর তারা দুশমনের ছিন্নমস্তক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে রাখলেন। তিনি তা দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং হারিসের যখমে খানিকটা থুথু দিলেন। এতে হারিস সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। জীবনে আর কোনো দিনও এখানে তিনি ব্যথা অনুভব করেননি।[৪০৪]

যখন ইহুদিরা তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি আর আস্থাস্থল, সরদার কা'ব বিন আশরাফের নিহত হওয়ার সংবাদ পেল, তখন তাদের তেড়া অন্তরে প্রচণ্ড এক ভীতি জায়গা করে নিলো। তারা বুঝতে পারল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে দেখেন যে, অঙ্গীকার ও চুক্তিকে পিঠ দেখিয়ে দিন রাত সে শান্তি, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নষ্টের পেছনে থাকে। পাশাপাশি কোনো উপদেশ কিংবা পরামর্শ তার কোনো কাজে না আসে, তখন তার বিরুদ্ধে তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে সামান্যও বিলম্ব কিংবা ত্রুটি করেন না। এ কারণে তারা তাদের এ বড় সরদার ও নামী লোকটিকে হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও সামান্য আওয়াযও করল না। বরং একেবারে নিশ্চুপ ও নির্বিকার রইল। যেন তারা কিছু জানতেই পারেনি। তাঁর অঙ্গীকার পূরণের প্রতি চরম কৃত্রিমতা দেখাতে লাগল এবং 'সাঁপ অতি দ্রুত তার গর্তে লুকিয়ে পড়ল'।

এভাবে দীর্ঘ একটি সময় পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে জেগে ওঠা সকল ষড়যন্ত্র আর বিশৃঙ্খলা দমনের প্রতি কিছুটা মনোযোগী হতে পেরেছিলেন। আর মুসলমানরাও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বালা-মুসিবত থেকে কিছুটা রেহাই পেলেন। দিবানিশি যার আশঙ্কায় তারা শঙ্কিত ছিলেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে তারা যার উপস্থিতির গন্ধ পাচ্ছিলেন।

গাযওয়ায়ে বুহরান

এটা ছিল তিন শ' যোদ্ধা নিয়ে গঠিত একটি বিশাল সামরিক অভিযান। তৃতীয় হিজরীর রবীউস সানী মাসে বাহরানের দিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নেতৃত্বে রওয়ানা হয়েছিল। এটা হিজাযের ভেতরে ফুরূ এর আশপাশে এক খনিবহুল ভূমি ছিল। সেখানে তিনি পুরো রবীউস সানী অতঃপর জুমাদাল উলা কাটিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। এ অভিযানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।[৪০৫]

---

[৪০৪] আমরা এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেছি ইবনে হিশাম ২/৫১-৫৭, সহীহ বুখারী ১/৩৪১, ৪২৫, ২/৫৭৭, সুনানে আবী দাউদ ও আউনুল মা'বূদ ২/৪২,৪৩ এবং যাদুল মাআদ ২/৯১ থেকে।

[৪০৫] ইবনে হিশাম ২/৫০,৫১। যাদুল মাআদ ২/৯১। কিন্তু এ গাযওয়ার কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে মতানৈক্য রয়েছে। কারও কারও মতে, রাসূলে কারীম সা. এর নিকট খবর পৌছেছিল যে, বনু

সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারিসা

বদর ও উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এটাই ছিল সর্বশেষ ও সর্বাধিক সফল একটি সামরিক অভিযান। তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরাতে এটা সংঘটিত হয়েছিল।

বিস্তারিত বিবরণঃ অস্থিরতা আর স্থবিরতার যে ভূত কুরাইশদের ওপর বদর যুদ্ধের পর থেকে জেঁকে বসেছিল তখনও তা সরেনি। ইতোমধ্যেই গ্রীষ্মকাল চলে এলো। তাদের সিরীয় বাণিজ্যিক মৌসুমের সময় হয়ে গেল। এ কারণে এখন তাদেরকে পেয়ে বসল নতুন এক পেরেশানী।

এবারের মৌসুমের জন্য কুরাইশরা সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাকে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলার অধিপতি বানিয়েছিল। সে একদিন কুরাইশদেরকে সমবেত করে বলল, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা আমাদের সিরীয় বাণিজ্যের রাজপথ আমাদের জন্য বিদপসংকুল আর প্রতিকূল বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু এখনো আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করতে পারিনি। তারা সমুদ্রোপকূলীয় পথ কখনো ছেড়ে দিবে না। কারণ সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে তারা সন্ধি করে নিয়েছে। তা ছাড়া তাদের অধিকাংশ লোক মুহাম্মাদের দলে গিয়ে ভিড়েছে। সুতরাং, বুঝতেই পারছি না আমরা কোন্ পথে সিরিয়া যাব? এখন যদি ঘরে বসে বসে আমাদের মূল পুঁজিটুকুও খেয়ে বসি তবে আমাদের মরদেহ দাফন করার মতো কোনো লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমরা তো জানই, আমাদের ব্যবসার মূল ভিত্তিই হলো গ্রীষ্মকালের সিরীয় সফর আর শীতকালের হাবশা সফরটি।

এভাবে একের পর এক আলোচনা চলতে লাগল। এক পর্যায়ে আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব সফওয়ানকে লক্ষ্য করে বলল, তাহলে তোমরা উপকূলীয় পথ ছেড়ে ইরাকের পথ ধরে যাও। সে পথ অনেকটা লম্বা হলেও মদীনার অনেক পূর্বদিক দিয়ে নজদ হয়ে সিরিয়ায় গিয়ে পৌছতে পারবে। কিন্তু কুরাইশদের কেউ-ই এ পথের হদিসও জানত না। তাই আসওয়াদ সফওয়ানকে বলল, বনু বকর বিন ওয়ায়েলের ফুরাত ইবনে হাইয়্যানকে গাইড স্বরূপ সঙ্গে নিয়ে নাও। সে এ সফরে তোমাদেরকে নতুন এ পথ অনায়াসে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

এভাবে কুরাইশদের চিরাচরিত পথ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন এ পথ ধরে তাদের গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করল। কিন্তু কীভাবেই যেন তাদের কাফেলার এ খবর এবং তাদের সফর পরিকল্পনার সবকিছু উড়ে গিয়ে

সুলাইম মদীনা কিংবা মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণের জন্য একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেছে। কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজেই কুরাইশদের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় কারণটিই উল্লেখ করেছেন ইবনে হিশাম র.। ইবনুল কায়্যিম র. এর পছন্দও তাই। এ কারণে তিনি প্রথমটি আদৌ উল্লেখই করেননি।

মদীনায় পৌঁছল। তার কারণ হলো সালীত ইবনে নুমান মুসলমান হয়ে তখনো মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। এটা ছিল শরাব হারাম হওয়ার আগের ঘটনা। একদিন তিনি নুআইম ইবনে মাসঊদ আশজাঈর সঙ্গে শরাবের আসরে একত্র হলেন। নুআইম তখনো মুসলমান হয়নি। প্রচুর শরাব পানে নুআইম এক পর্যায়ে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে সালীতকে কাফেলার পরিকল্পনা-প্রোগ্রাম সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরল। আর সালীত তখনোই এ পরম গুরুত্বপূর্ণ কাফেলার এ গোপন তথ্য নিয়ে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে একাকী বেরিয়ে পড়লেন মদীনার পথে প্রিয় হাবীবের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ যায়দ বিন হারেসা কালবীর নেতৃত্বে এক শ' আরোহীর একটি দল অভিযানের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। যায়দ রা. ঝড়ো গতিতে তার কাফেলা নিয়ে ছুটে চললেন উদ্দীষ্ট গন্তব্যে। কুরাইশরা তখন নজদের 'কারদা' নামক স্থানে একটি কূপের নিকট যাত্রা বিরতি করেছিল। যায়দ বিন হারেসার বাহিনী তাদের সম্পূর্ণ অলক্ষিতে আচানক তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ, এ আক্রমণের তোপের মুখে তাদের কিছুই করার ছিল না। মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেন। সফওয়ান ও তার সাথে কাফেলার যে প্রহরী ছিল, তাদের কোনো ধরনের আক্রমণ করা ছাড়াই এ অবস্থায় পালিয়ে আপন জান বাঁচানো ব্যতীত আর কোনো উপায় ছিল না।

মুসলমানরা কাফেলার পথ-নিদের্শক (গাইড) ফুরাত ইবনে হাইয়্যানকে বন্দী করলেন। কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী সে ছাড়া আরও দু'জনকে বন্দী করা হলো। তা ছাড়া কাফেলায় যে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাত্র ইত্যাদি ছিল তার এক বিরাট অঙ্কের গনীমত মুসলমানরা লাভ করলেন। যার পরিমাণ ছিল প্রায় এক লাখ দিরহাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খুমুস' বের করার পরে গনীমতের মাল মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। কুরাইশ কাফেলার গাইড ফুরাত ইবনে হাইয়্যান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলো।[৪০৬]

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কুরাইশদের দগদগে ঘা তখনো শুকায়নি। ঠিক এই মুহূর্তে তাদের কপাল আবার ফাটল। তাদের বাণিজ্যিক ভিত্তি সিরিয়াগামী কাফেলাটি মুসলমানদের হাতে ধরা খেয়ে সর্বস্ব খুইয়ে বসল। মূলত এটা ছিল বদর যুদ্ধের পরে কুরাইশদের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। এক দুঃখজনক দুর্ঘটনা। কুরাইশদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এখন দুঃখ ও পেরেশানীতে

[৪০৬] ইবনে হিশাম ২/৫০,৫১।

পরিণত হলো। একে একে জীবনের সবগুলি পথ তাদের মুখের ওপর দুয়ার বন্ধ করে দিতে লাগল। এখন তাদের সামনে কেবল দু'টি পথ খোলা ছিল। হয়তো নিজেদের ঘাড় তেড়ামী ও অহংকারের পথ থেকে পেছনে হটে এসে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি ও মৈত্রীচুক্তি করে ভালো মানুষ হয়ে যাবে, নতুবা আবার এমন এক যুদ্ধের আয়োজন করবে, যা তাদের হৃত ঐতিহ্য ফিরিয়ে দিবে। তাদের হারিয়ে যাওয়া ইয্যত ও সম্মান পুনরুদ্ধার করবে। অপরদিকে যা হবে মুসলমানদের ওপর এক মরণ আঘাত, যা তাদেরকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করে দিবে। পৃথিবীর কারও ওপর তখন তাদের আর রাজত্ব করার খাহেশ জাগবে না। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যস্বরূপ তারা বাপ দাদার কাছ থেকে যে উত্তরাধিকার লাভ করেছিল, তা তাদেরকে প্রথম পথ অবলম্বন করতে অনুমতি দিচ্ছিল না। তাই তারা দ্বিতীয় পথটিই বেছে নিলো। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তাদের সকলের চোখে মুখে। এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য মক্কায় চলতে লাগল দারুণ প্রস্তুতি। তাদের দৃঢ় সংকল্প ছিল- এবার মুসলমানদের ঘরে গিয়েই তাদেরকে শেষ করে ফিরব। জনমের তরে তাদেরকে তবে বুঝিয়েই ছাড়ব 'আমরা কী চীয'। বস্তুত এ সবই ছিল 'উহুদ' যুদ্ধের ভূমিকা।

গাযওয়ায়ে উহুদ

প্রতিশোধের আগুন-জ্বলা এক যুদ্ধের জন্য কুরাইশদের ব্যাপক রণপ্রস্তুতি

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কাফেরদের বাছা বাছা সরদারগুলি কীভাবে যেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটি ছিল একটা চূড়ান্ত পরাজয়। কুরাইশদের হাজার বছরের ইতিহাসে এত বড় দুর্ঘটনা আর কোনোদিনও ঘটেছিল না। তাই তারা বদর প্রান্তরের কথা কোনো রাত দিন একটি মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেনি। মুসলমানদের ওপর আক্রোশ ও হিংসার আগুনে তারা দিন রাত জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এ কারণে তারা অহোরাত্র শুধু প্রতিশোধের স্বপ্নে বিভোর ছিল। তাদের মুখ দিয়ে অস্ফুটে বের হচ্ছিল- 'প্রতিশোধ'! 'প্রতিশোধ'!! এমনকি কুরাইশরা তাদের নিহতদের ওপর আত্মীয় স্বজনকে কাঁদতে বারণ করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে বলে দিয়েছিল বন্দীদের মুক্তিপণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করতে। কারণ তাতে মুসলমানদের নিকট তাদের দুরবস্থা ও দুর্ঘটনার কথা ফাঁস হয়ে যাওয়া আশঙ্কা ছিল।

বদর যুদ্ধের পরে কুরাইশদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো- এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে, যা তাদের রাগ আর ক্রোধের উপশম করবে। তাদের হিংসা আর বিদ্বেষের পিপাসায় হীম শীতল পানি ঢেলে পরিতৃপ্ত করবে। যার পরে তারা দুঃখময় অতীত ভুলে একটুখানি তৃপ্তির ঢেকুর তুলবে। এ সব স্বপ্ন সামনে রেখেই তারা উহুদের ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা যতগুলি উদ্যোগ নিয়েছিল, তার মধ্যে সর্ব প্রথম তারা এ কাজটি করল যে, যে কাফেলাটি নিয়ে আবু সুফিয়ান সিরিয়া থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছিল, আর যাকে উপলক্ষ্য করেই মূলতঃ বদর প্রান্তরে এক রক্তক্ষয়ী দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তার সব ধন-সম্পদ এ ভাবী যুদ্ধের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। এ কারণে তারা সে সকল মালের মালিকদেরকে ডেকে বলল, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ তোমাদের ওপর যুলুম করেছে। তোমাদের বাছা বাছা লোকগুলিকে ধরে ধরে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে। এ কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তোমরা এ সম্পদ দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করো। তাহলে হয়তো আমরা তার থেকে এবার একটা প্রতিশোধ নিতে পারব। তখন তারা সবাই তাতে সাড়া দিলো। তাদের সমস্ত ধন-সম্পদ বিক্রি করে ফেলল। এর মূল্যমান দাঁড়ালো এক হাজার উট ও পঞ্চাশ হাজার দিনার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ.

নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে তারা বাঁধা দিতে পারে আল্লাহর পথ থেকে। সুতরাং, তারা তা ব্যয় করতে থাকবে। তারপর তা তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তারা হেরে যাবে। [সূরা আনফাল : ৩৬]

এরপর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবের হাবশী কবীলাগুলো, বনু কেনানা ও তাহামার অধিবাসীদের যারা অর্থ দিয়ে অংশ নিতে চায় সে সকল আরব কবীলার জন্য তারা দানের ভাণ্ড খুলে বসল। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে উৎসাহিত করার বহু ফন্দি ও ফিকির আবিষ্কার করল। এক পর্যায়ে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা কবি আবু ইয্যাহকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরবদেরকে যুদ্ধে উত্তেজিত করার প্ররোচনা দিলো। আবু ইয্যাহ বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্তিপণ নেওয়া ছাড়া এমনিতেই ছেড়ে দেন। তবে তাকে এই শর্ত দিয়ে দেন যে, সে জীবনে আর কোনো দিন ইসলাম ও মুসলমানদের বিপক্ষ শিবিরে দাঁড়াবে না। কিন্তু এদিকে সফওয়ান তার সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, সে যদি রণাঙ্গন থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারে তবে তাকে ধনী ও সমৃদ্ধিশালী করে দিবে কিংবা তার মেয়েদের দেখাশোনা করবে। তখন আবু ইয্যাহ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গাদ্দারী করল। সে তার কণ্ঠকে বিকিয়ে দিলো। দিন রাত আরব কবীলাগুলোকে কবিতা দ্বারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম উত্তেজিত করতে লাগল। এই একই কাজের জন্য তারা কবি মুসাফা' ইবনে আবদে মানাফ জুমাহীসহ আরও অনেককে ব্যবহার করেছিল।

অপরদিকে আবু সুফিয়ান সাওয়ীক অভিযান থেকে ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে; বরং এক বিশাল অঙ্কের মালামাল ফেলে রেখে ফিরে আসার পর থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে একটু বেশি দূর এগিয়ে ছিল।

পাশাপাশি এ মাটি আরও ভিজিয়ে দিয়েছিল কিংবা এ আগুন আরও দ্বিগুণ শতগুণ তেজে জ্বালিয়ে দিয়েছিল সর্বশেষে তাদের সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারেসার আক্রমণের মুখে বাণিজ্যের সর্বশেষ পাথেয়টুকু খুইয়ে বসা। কারণ, এটা তাদের অর্থনীতির ওপর এত বিশাল ও বড় আঘাত ছিল যে, তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিল। তাদের দুঃখ ও পেরেশানী এতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, যার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। এক কথায়- এমন হাজারও উপাদান কুরাইশদের সামনে এসে গিয়েছিল যাতে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার খোরাক বরং প্রলুব্ধি খুঁজে পাচ্ছিল। আর তখনোই তারা এ ব্যাপক রণপ্রস্তুতি শুরু করল।

কুরাইশ বাহিনীর পরিসংখ্যান ও নেতৃত্ব

বছর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার ব্যাপক রণপ্রস্তুতিও সম্পন্ন হলো। কুরাইশ, তাদের মিত্র কবীলা ও হাবশীদের থেকে মোট তিন হাজার যোদ্ধা মক্কায় এসে উপস্থিত হলো। কুরাইশ নেতারা এ অভিযানে নারীদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা স্থির করল। কেননা, হুরমত ও ধন-সম্পদের হেফাযতের উপলব্ধি জানবাযীর সঙ্গে লড়াই করার কারণ হবে। এমন নারীর সংখ্যা কুরাইশ বাহিনীতে ছিল পনেরো জন।

তাদের বাহিনীতে সফর ও বোঝা বহনের জন্য ছিল মোট তিন হাজার উট। যুদ্ধের জন্য ছিল দুই শ' ঘোড়া[৪০৭]- ঘোড়াগুলিকে তেজি আর বলীয়ান রাখার জন্য তারা সেগুলিতে আরোহণ না করে সারা পথ হাতে লাগাম ধরে নিয়ে আসে- আর হেফাযতের জন্য ছিল সাত শ' লৌহ বর্ম। কুরাইশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল আবু সুফিয়ান ইবনে হরব। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ। আর তার সহকারী ছিল ইকরিমা বিন আবী জাহল। আর পতাকা ছিল বনু আব্দুদ্দারের কাছে।

মক্কী বাহিনীর যাত্রা

এভাবে যখন ব্যাপক প্রস্তুতি পুরোপুরি সম্পন্ন হলো তখন মক্কী বাহিনী বিপুল উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে মদীনার পথে যাত্রা করল। পেছনের ইতিহাসগুলি, অতীত জীবনের দুঃখময় অধ্যায়গুলি, আর বুকে চেপে রাখা হিংসার আগুন তাদের মন ও মননে বিদ্বেষের আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এবং যে তিক্ত লড়াই তাদের সামনে আসছে সেদিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

শত্রু-যাত্রার সংবাদ মদীনায়

আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. মক্কায় বসে বসে কুরাইশদের প্রতিটি নড়াচড়া আর সামরিক প্রস্তুতি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিলেন। অতঃপর কুরাইশরা যখন মক্কা থেকে যাত্রা করল তিনি এক দ্রুত কাসেদ পাঠিয়ে দিলেন মদীনার পথে- যার কাছে ছিল এ বাহিনীর বিস্তারিত সব বিবরণ আর গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য।

গুরুত্বপূর্ণ এ চিঠিটি তাড়াতাড়ি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দূত ঝড়ো গতিতে ছুটল। এত দ্রুত সে পথ অতিক্রম করল যে, মক্কা থেকে রওয়ানা দিয়ে সে তিন দিনের মধ্যে মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। অথচ মক্কা ও মদীনার পথের দূরত্ব ছিল প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার। সে

---

[৪০৭] যাদুল মাআদ ২/৯২। এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। আর হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে লিখেছেন এক শ' ঘোড়া ৭/৩৪৬।

যখন মদীনায় উপস্থিত হলো তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবাতে বসা ছিলেন। সেখানে সে এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি দরবারে রিসালতে অর্পণ করে।

সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব চিঠিটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পড়ে শোনান। প্রিয় নবীজী রসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তা লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। অতি দ্রুত তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে এ ব্যাপারে চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক মত বিনিময় করেন।

প্রতিকূল প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে মুসলমানদের রণপ্রস্তুতি

এরপর মদীনার পরিস্থিতি ব্যাপক ঘোলাটে ও হাঙ্গামাঘন হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম যে কোনো সময়ের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য যখন নামায পড়তেন তখনও হাতিয়ার পাশে রেখে নিতেন।

সা'দ বিন মুয়ায, উসাইদ বিন হুযাইর, সা'দ বিন উবাদা রা. প্রমুখ সাহাবীকে নিয়ে একটি দল গঠন করা হলো। তারা দিন-রাত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রহরায় থাকতে শুরু করলেন। এমনকি সারা রাত তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় হাতিয়ার নিয়ে বসে থাকতেন। মদীনার অন্যান্য প্রবেশপথ ও জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন প্রহরাঘাঁটি নিযুক্ত করা হলো। কারণ, যে কোনো সময় অতর্কিত হামলার ভয় গোটা মদীনার আকাশ কালো করে রেখেছিল। পাশাপাশি আরও কয়েকটি ছোট ছোট দল দুশমনের গতিবিধি নির্ধারণের জন্য কাফেরদের সম্ভাব্য অবলম্বিত পথের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

মদীনার উপকণ্ঠে মক্কী বাহিনী

মক্কী বাহিনী তাদের চিরাচরিত দক্ষিণের মূল পথটি ধরে সম্মুখযাত্রা অব্যাহত রাখল। এ বাহিনী যখন আবওয়া - যেখানে শুয়ে ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিত আম্মাজান আমিনা- নামক স্থানে পৌঁছল, তখন আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা প্রিয় নবীজীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সম্মানিতা মাতার কবর খোঁড়ার পরামর্শ দেয়। কিন্তু কুরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ তার এ ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তাদের ভয় ছিল যদি একবার এ দরজা খোলা হয় তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন কালো অধ্যায় সংযোজিত হবে- যার পরিণতি হবে মানব সভ্যতার জন্য বড়ই ভয়াবহ।

এরপর মক্কী বাহিনী অব্যাহত যাত্রা করে মদীনার একেবারে গলার কাছে এসে উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে তারা আকীক উপত্যকা ধরে পথ চলে। এরপর সেখান থেকে তারা ডান দিকে ঘুরে যায় এবং উহুদ পাহাড়ের কাছাকাছি 'আইনাইন'- যা

মদীনার উত্তরে 'কানাত' উপত্যকার পাশের একটি বিরান ভূমি- নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং সেখানে তারা শিবির স্থাপন করে। দিনটি ছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ শুক্রবার।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার জন্য পরামর্শ সভা

এদিকে মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শত্রুদের একের পর এক সংবাদ আসা অব্যাহত ছিল। সর্বশেষে তাঁর কাছে মক্কী বাহিনীর শিবির স্থাপনের সংবাদ এসে পৌছল। তখন তিনি উচ্চ সামরিক পরামর্শ সভা ডাকলেন। সেখানে তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে কর্তব্য স্থিরের নিমিত্ত মতবিনিময় করলেন। তাদের সামনে তিনি সদ্য দেখা তাঁর একটি স্বপ্নের কথা তুলে ধরলেন : তিনি বললেন, **আল্লাহর কসম! আমি একটি ভালো স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখেছি একটি গাভী যবাই করা হচ্ছে। আমি আমার তরবারির প্রান্তে কিছু ভাঙন দেখেছি। আর আমি এটাও দেখেছি যে, আমার হাতকে একটি সুদৃঢ় বর্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছি।** পরে তিনি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন এভাবে যে, এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত শাহাদাত বরণ করবেন। আর তরবারির প্রান্তে ভাঙনের ব্যাখ্যা দিলেন এই যে, আহলে বাইতের কেউ শহীদ হবে। আর লৌহবর্মের ব্যাখ্যা দিলেন মদীনাকে।

এরপর তিনি নিজ মতামত পেশ করলেন সাহাবায়ে কেরামের কাছে যে, তারা যেন মদীনার বাইরে না গিয়ে ভেতরে থেকে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করে। যদি মুশরিকরা সেখানে শিবির পেতে অবস্থান করে তবে তারা অবস্থান করুক। কোনো ফলাফল ছাড়া শেষমেশ তারা এমনিতেই বিদায় নিবে। আর যদি তারা মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকতে চায় তবে মুসলমানরা তাদের গলির মাথায় বসেই তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিবে। আর নারীরা ছাদ থেকে তাদের ওপর পাথর ফেলে হত্যা করবে। মূলত এটাই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের মতও ছিল অনুরূপ। সে খাযরাজের একজন নেতা হিসেবে এ সভায় উপস্থিত ছিল। তবে এখানে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তার এ মতমিলনটি এ ভিত্তিতে ছিল না যে, সামরিক অভিজ্ঞতা ও রণকুশলতার দিক থেকে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ছিল; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল 'এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করা' অর্থাৎ সে যেন এ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে পারে আবার কেউ তা জানতেও না পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চাইলেন প্রথম বারের মতো গণমুসলমানদের সামনে তাদের মুখোশটা খুলে দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে। তিনি চাইলেন, ইসলামের আবডালে তারা যে কুফর ও নিফাক লুকিয়ে রেখেছে তা সকলের সামনে তুলে ধরতে। আর এই চরম সঙ্গিন মুহূর্তে যেন মুসলমানরা দেখে নেয় যে, তাদের জামার

আস্তীন আর প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে কতগুলি বিষধর সাপ লুকিয়ে রয়েছে। যেগুলি তাদের দংশনের জন্য সর্বদা মুখ ব্যাদান করে আছে।

অপরদিকে কিছু নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম, যারা বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি তারা আগে বেড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মদীনা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিলেন। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের এ মতে সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। এমনকি কেউ কেউ বলেও ফেললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ দিনটির আকাঙ্খায় বহুদিন যাবৎ তৃষ্ণাতুর হয়ে রয়েছি। আর আল্লাহর কাছে দুআ করেছি। এরপর তিনি সেই দিনটি আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্যস্থল আমাদের একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আপনি শত্রুর দিকে ছুটে চলুন। তারা যেন না ভাবে, আমরা ভয় পেয়েছি।

এ সকল উৎসাহী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.। বদরের যুদ্ধেও যিনি অসাধারণ বাহাদুরি আর বীরত্ব প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, ঐ সত্তার কসম! যিনি তোমার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন, যতক্ষণ না মদীনার বাইরে গিয়ে আমার এই তরবারি দিয়ে তাদের সঙ্গে লড়াই করব ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু খাব না।[৪০৮]

এ সকল সাহাবীর উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মত থেকে নেমে এসে তাদের মতের ওপর সিদ্ধান্ত দিলেন। এভাবে কর্ম স্থির হলো: মদীনা থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রকাশ্য সমরে দুশমনের মুকাবেলা করা হবে।

ইসলামী সেনা বিন্যাস ও রণাঙ্গনে যাত্রা

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জুমুআর নামায আদায় করলেন। নামাযের পরে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিলেন এবং সবরকমের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে তিনি আরও খোশখবরী দিলেন যে, ধৈর্য ও অবিচলতার মধ্যেই সাহায্য ও বিজয় লুক্কায়িত আছে। তখন তাদের হৃদয়গুলি আনন্দের নাগরদোলায় দুলতে লাগল। এরপর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায আদায় করলেন অনেক লোক তখন উপস্থিত হয়েছিল। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরাও ইতোমধ্যে হাযির হয়ে গিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। অকৃত্রিম দুই

---

[৪০৮] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/১৪।

বন্ধু আবু বকর ও উমর রা. তাঁর সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন। তারা দু'জনে গায়ে জামা পরিয়ে দিলেন এবং মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন। তখন নবীয়ে দো-জাহান অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দু'টি বর্ম পরে, তরবারি নিয়ে লোকদের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ওদিকে লোকজন তাঁর অপেক্ষায় বসা ছিল। উপস্থিত লোকজনকে সা'দ বিন মুয়ায ও উসাইদ বিন হুযাইর রা. বলে দিয়েছিলেন, তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মদীনা থেকে বের হতে বাধ্য করেছ। সুতরাং, এখন তিনি এলে তোমাদের পথ থেকে তোমরা পিছু হটে আসবে। তখন সবাই লজ্জিত হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এলেন তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার বিরোধিতা করা আমাদের জন্য কখনোই উচিত হয়নি। সুতরাং, এখন আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। যদি আপনি মদীনায় থাকতে চান তবে তা-ই করুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **কোনো নবীর জন্য উচিত নয়- যখন তিনি বর্ম পরিধান করেন, তখন তা আবার খুলে ফেলবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ও শত্রুর মাঝে ফয়সালা করে দেন।**[৪০৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করলেন:

এক. মুহাজির বাহিনী: তাদের পতাকা দিলেন মুসআব বিন উমাইর আবদারী রা. এর হাতে।

দুই. কবীলায়ে আউসের আনসার বাহিনী: তাদের পতাকা দিলেন উসাইদ বিন হুযাইর রা. এর হাতে।

তিন. কবীলায়ে খাযরাজের আনসার বাহিনী: তাদের পতাকা দিলেন হুবাব ইবনে মুনযির রা. এর হাতে।

যাত্রার শুরুতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজার যোদ্ধা, এক শ' লৌহবর্ম। কিন্তু পুরো বাহিনীতে কোনো ঘোড়সওয়ার ছিল না।[৪১০] আর মদীনায় রেখে গেলেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রা. কে বাকি সাহাবায়ে কেরামের নামাযের ইমামতির জন্য। এরপর তিনি যাত্রার ঘোষণা দিলেন। মুসলিম বাহিনী মদীনা ছেড়ে উত্তর দিকে চলতে লাগল। সা'দ বিন মুয়ায ও সা'দ বিন উবাদা রা. লৌহবর্ম আবৃত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

---

[৪০৯] মুসনাদে আহমদ ৩/৩৫১। নাসাঈ। হাকিম। ইবনে ইসহাক। ইমাম বুখারী তরজমাতুল বাব ২৮ এ এটা উল্লেখ করেছেন।

[৪১০] ইবনুল কায়্যিম র. হুদা এর ২/৯২ বলেছেন ঘোড়সওয়ার ছিল পঞ্চাশ জন। ইবনে হাজার এ প্রসঙ্গে লেখেন এটা যে স্পষ্ট ভুল; এতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ মূসা ইবনে উকবা র. দৃঢ় মত ব্যক্ত করেছেন যে, উহুদে তাদের কাছে কোনো ঘোড়া ছিল না। ওয়াক্বেদী লেখেন, পুরো বাহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল- একটি নবীজীর জন্য আর দ্বিতীয়টি আবু বুরদা রা. এর জন্য (ফাতহুল বারী ৭/৩৫০)।

সামনে সামনে চলতে লাগলেন। যখন 'সানিয়াতুল বিদা' তে এসে পৌছলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতি উন্নতমানের হাতিয়ারে সজ্জিত মুসলমানদের মূল বাহিনী থেকে পৃথক একটি বাহিনী দেখতে পেলেন। তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হলো এরা খাযরাজের মিত্র ইহুদিরা[৪১১]- তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, **তারা কী মুসলমান হয়েছে?** তাকে না সূচক জবাব দেওয়া হলে তিনি শিরকপূজারীদের বিরুদ্ধে কুফরপূজারীদের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান।

বাহিনী নিরীক্ষণ

'শাইখাইন' নামক স্থানে পৌছার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিরীক্ষণ করলেন। তখন বাহিনীতে যারা যুদ্ধোপযুক্ত বয়সের চেয়ে ছোট ছিল তাদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব, উসামা বিন যায়দ, উসাইদ বিন যুহাইর, যায়দ বিন সাবেত, যায়দ ইবনে আরকাম, আরাবাতা ইবনে আউস, আমর বিন হিযাম, আবু সাঈদ খুদরী, যায়দ বিন হারেসা আনসারী, সা'দ বিন হাব্বাহ রা. । ইতিহাসে বারা ইবনে আযেব রা. এর নামও উল্লিখিত সাহাবায়ের কেরামের মাঝে পাওয়া যায়। কিন্তু বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, এ দিন তিনি সশরীরে রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু তাদের ব্যতিক্রমে সাহাবী রাফে' বিন খাদীজ ও সামুরা বিন জুনদাব রা. কে ছোট হওয়া সত্ত্বেও অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কেননা, রাফে' রা. তীর নিক্ষেপণে যথেষ্ট পারদর্শী ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আর এ কারণেই তাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তখন তার সমবয়সী সামুরা রা. বললেন, আমি রাফে'র চেয়ে শক্তিশালী। বলীখেলায় আমি রাফে' কে হারিয়ে দিই। যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ সংবাদ দেওয়া হলো তখন তিনি তার সামনে তাদেরকে কুস্তি লাগলে বললেন। কুস্তিতে সামুরা রাফেকে পরাজিত করল। তখন তিনি সামুরা রা.কেও অনুমতি দিলেন।

উহুদ ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে রাত যাপন

এ সময় চারদিকের উজ্জ্বল আকাশ অন্ধকার করে রাতের আগমনী বার্তা নিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে তাদেরকে নিয়ে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। অতঃপর সেখানেই রাত

[৪১১] এটা ইবনে সাদের রেওয়ায়েত। তাতে রয়েছে তারা ছিল বনু কাইনুকার বাহিনী ২/৩৪। কিন্তু এটা তো সর্বজন বিদিত কথা যে, বদর যুদ্ধের পরেই বনু কাইনুকাকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন আবার তাদের এখানে আসার কোনো অর্থ হয় না।

যাপন করেন। রাতে পঞ্চাশ জন সাহাবীর একটি দলকে পুরো বাহিনীর প্রহরায় নিযুক্ত করা হলো। তাদের প্রধান কাজ দেওয়া হলো সারা রাত পুরো বাহিনীর চারদিকে ঘোরাফেরা করা। তাদের আমীর ছিলেন সারিয়ায়ে কা'ব বিন আশরাফের বীর পুরুষ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আনসারী রা.। আর যাকওয়ান ইবনে আবদে কায়স রা. এর কাঁধে দেওয়া হলো নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেফাযতের দায়িত্ব।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তাঁর সঙ্গীদের ঘাড় তেড়ামী

সূর্যোদয়ের খানিকটা আগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনী নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। পথিমধ্যে 'শাওত' নামক স্থানে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। এখান থেকে শত্রুবাহিনী খুব কাছেই ছিল। তিনি তাদেরকে দেখছিলেন আর তারাও তাকে দেখছিল। আর ঠিক এখানে এসেই মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ঘাড় তেড়ামী ও মগড়ামী শুরু করল। সে তার তিন শ' সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে গেল এই ছুতো দিয়ে যে, জানি না কীসের ওপর ভিত্তি করে লড়াই করব? পাশাপাশি সে এই দলীলও কায়েম করল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের কথা মেনেছেন কিন্তু তার কথা মানেননি।

সন্দেহ নেই, মুসলিম বাহিনী থেকে সে ও তার সঙ্গীদের আলাদা হয়ে চলে যাওয়ার কারণ এটা ছিল না, যা এই মুনাফিক বলেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মত মেনে নেননি। কারণ যদি এমনই হতো তবে মদীনা থেকে বের হয়ে এতদূর পর্যন্ত তাদের সফর করার মানে কী ছিল? যদি এমনই হতো তবে তো যাত্রার শুরুতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। বরং এখানে এসে তাদের এই ঘাড় তেড়ামীর মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর একেবারে চোখ ও কানের সামনে এই সঙ্গিন মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙে ফেলে তাদের মাঝে হতাশা আর অস্থিরতা ছড়িয়ে দেওয়া। এতে করে বিশাল একদল সৈন্য তার থেকে আলাদা হয়ে যাবে। যারা তার সঙ্গে রয়ে যাবে তাদেরও মনোবল ও সাহসিকতার প্রদীপ বিশাল সংখ্যার দুশমনের ভয়ের ঝটিকায় ধপ করে নিভে যাবে। তখন শত্রু বাহিনীও অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের নেশায় লড়াইয়ের ময়দানে উন্মাদ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুসলিম শিবিরে এই হতাশাঘন দৃশ্য দেখে তারা উল্লাসে নৃত্য করবে। তাদের মনোবল আরও অটুট ও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর একেবারে কাছের একনিষ্ঠ সাহাবায়ের কেরামের জীবন ঘড়ির কাঁটা খুব সহজে বিকল করে দেওয়া যাবে। সকল নিরাশা আর ঝামেলার মেঘ সরে গিয়ে এই মুনাফিকের নেতৃত্বের আকাশ আবারও নির্মেঘ ও সুনীল হয়ে উঠবে।

মুনাফিকের কুমতলব কিছুটা পূর্ণ হয়েছিল বটে। মুসলিম বাহিনীর দু'টি দল- আউসের বনু হারেসা আর খাযরাজের বনু সালামা- এর চরণ স্খলিত হওয়ার উপক্রম

হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধরে রাখলেন। এ কারণে তাদের মধ্যে স্থবিরতা ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়া, ফিরে যাওয়ার ইরাদা করার পরেও আল্লাহর পথে অবিচল রইল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর ইরশাদঃ

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর ওপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। [সূরা আলে ইমরান:১২২]

এই নাযুক পরিস্থিতে হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম রা. ফিরে যাওয়া মুনাফিকদেরকে এ সময় তাদের করণীয় ও কর্তব্যের কথা ইয়াদ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি ফিরে যেতে উদ্যত মুনাফিকদের পেছনে যেতে যেতে বললেন, তোমরা ফিরে এসো! পরে হয়তো যুদ্ধ করো কিংবা দুশমন প্রতিহত করো। কিন্তু মুনাফিকরা তার কথার জবাবে বলল, যদি আমরা জানতাম লড়াই হবে তবে ঠিকই আমরা ফিরে যেতাম না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে হারাম রা. তাদের কাছ থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তার মুখে তখন ছিল- 'আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ তোদেরকে দূরে রাখুন!! নিশ্চয়ই তিনি তাঁর নবীকে তোদের থেকে বেনিয়ায রাখবেন'। এই মুনাফিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদঃ

لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ.

এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায়, যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হলো এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত করো। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন, তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। [সূরা আলে ইমরান : ১৬৭]]

অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনী উহুদের পথে

মুনাফিকদের এই ঘাড়তেড়ামী অবশেষে ফিরে যাওয়ার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশিষ্ট সাত শ' সৈন্য নিয়ে অব্যাহত গতিতে দুশমনের অভিমুখে চলতে লাগলেন। দুশমনের শিবির ছিল উহুদের বিপরীত দিকে। এ কারণে তিনি বললেন, **কেউ আছে কি? যে আমাদেরকে শত্রুর পাশ দিয়ে ছাড়া অন্য জায়গা দিয়ে নিয়ে যাবে?**

আবু হাইসামা রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপরে তিনি দুশমনের শিবির পশ্চিম দিকে রেখে বনু হারেসার বসতি ও ক্ষেতের পাশ দিয়ে একটি ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন।

এ পথে মুসলিম বাহিনী মিরবা' ইবনে কাইযী'র এর বাগানের পাশ দিয়ে যায়। মিরবা' ছিল একটা অন্ধ মুনাফিক। সে যখন মুসলিম বাহিনীর উপস্থিতি টের পেল তখন এক মুষ্টি মাটি নিয়ে মুসলমানদের দিকে ছুঁড়ে মারল এবং মুখে বলছিল, তুমি যদি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকো তবে তোমাকে আমি আমার বাগানে ঢোকার অনুমতি দিচ্ছি না। কয়েক জন তাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমরা তাকে হত্যা করো না! বেচারার চোখই শুধু অন্ধ না, ওর হৃদয়টাও অন্ধ।**

সেখান থেকে আরও সামনে এগিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপত্যকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের একটি ঘাঁটিতে অবতরণ করে শিবির স্থাপন করলেন। তাদের সামনে ছিল মদীনা আর পেছনে ছিল উহুদ পর্বতের নিঃসীম সানু-শিখর। এভাবে শত্রু শিবির মদীনা আর মুসলিম শিবিরের মাঝে ছিল।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর কাতার বিন্যাস করলেন। তার মধ্য থেকে পঞ্চাশ জন অভিজ্ঞ তীরন্দায সাহাবীর একটি বিশেষ দল নির্বাচিত করলেন। তাদের আমীর বানালেন বদরী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর ইবনে নুমান আনসারী আউসী রা. কে। এরপর তাদেরকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম শিবির থেকে প্রায় দেড় শ' মিটার পূর্ব দিকের একটি পাহাড়ে- যা এখন জাবালে রুমাত নামে প্রসিদ্ধ- শক্তভাবে অবস্থান নিতে বললেন।

এর পেছনে উদ্দেশ্য কী ছিল তা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সকল তীরন্দাযের উদ্দেশে দেওয়া দিকনির্দেশনার মধ্যে বলে দিলেন। তিনি তাদের আমীর আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইরকে লক্ষ্য করে বললেন, **তীরের মাধ্যমে অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন কিছুতেই আমাদের পেছন দিক থেকে আসতে না পারে।** (তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।) **যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক, তোমরা তোমাদের অবস্থানে সুদৃঢ় থাকবে। তোমাদের দিক থেকে যেন আমাদের ওপর হামলা না আসে।**[৪১২] এরপর তিনি তীরন্দায বাহিনীকে উদ্দেশ করে বললেন, **আমাদের পেছন দিকটা তোমরা**

---

[৪১২] ইবনে হিশাম ২/৬৫,৬৬।

সুরক্ষিত রেখো! যদি তোমরা দেখো আমরা মার খাচ্ছি তবুও আমাদের সাহায্যে তোমরা এ স্থান ছেড়ে দিয়ে চলে এসো না। আর যদি আমাদেরকে গনীমত সংগ্রহ করতে দেখো তবুও আমাদের সঙ্গে এসো না!![৪১৩] ইমাম বুখারী রহ. এর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, **যদি তোমরা দেখো আমাদের মাথার ওপর পাখি উড়ছে তারপরও তোমরা আমার পাঠানো সংবাদ পাওয়ার আগে এ স্থান ত্যাগ করো না। আর যদি তোমরা দেখো দুশমনকে আমরা পরাজিত করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছি, তারপরও তোমরা আমার পক্ষ থেকে সংবাদ পাওয়ার আগে এ স্থান ত্যাগ করো না!!** [৪১৪]

এভাবে মুসলিম বাহিনীর একটি দলকে এই গুরুত্বপূর্ণ সামরিক নির্দেশনা দিয়ে পাহাড়ে নিযুক্ত করার মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ একমাত্র ফাঁকটিও বন্ধ করে দিলেন যেখান থেকে দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনীর মুসলিম বাহিনীর কাতারে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল।

অবশিষ্ট বাহিনীর বিন্যাস কালে মুনযির ইবনে আমর রা. কে ডান পাশে রাখলেন। বাম পাশের আমীর বানালেন যুবাইর ইবনে আওয়্যাম রা. কে । আর তার সহকারী হিসেবে দিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. কে। পাশাপাশি যুবাইর রা. কে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে সর্বোচ্চ অবিচলতা দেখানোর নির্দেশ দিলেন। আর কাতারের সামনে এমন একদল তরুণপ্রাণ, তাগড়া জোয়ান মুজাহিদ রাখলেন যারা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতায় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যাদেরকে হাজার হাজার লোকের সমান মনে করা হতো।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সেনাবিন্যাস ছিল বাস্তবিকই অনেক সূক্ষ্ম ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। এ সেনাবিন্যাসের মাধ্যমেই স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে- সাহেবে রিসালতের যিন্দিগি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামরিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতায়ও কতটা সমৃদ্ধ ছিল। এ যুদ্ধে মহা সমরনায়ক প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাবিন্যাসের যে সূক্ষ্মতা আর যে রণকৌশলের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন তা পৃথিবীর অন্য কোনো সমরনায়কের পক্ষে সম্ভব ছিল না- চাই সে যত বড়ই বীরপুরুষ কিংবা রণনায়ক হোক। রণাঙ্গনে দুশমনের পরে এসেও সর্বোত্তম জায়গাটি দখল করে নিলেন। অথচ, দুশমন তাঁর আগে এসেও এ জায়গাটি বেছে নিতে পারেনি। কেননা, মুসলিম শিবিরের পেছন আর ডান দিক হেফাযতের জন্য বুক উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল উহুদ পাহাড়। আর যুদ্ধ চলা কালে বাম ও পেছনের দিকে সেই একমাত্র ফাঁকা জায়গাটিতে ছিলেন এক দল রণভিজ্ঞ

---

[৪১৩] মুসনাদে আহমদ, তাবারানী, হাকিম সকলে ইবনে আব্বাস রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন। দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৩৫০।

[৪১৪] সহীহ বুখারীঃ কিতাবুল জিহাদ ১/৪২৬।

তীরন্দায। আর যুদ্ধের নেতৃত্বদানের জন্য একটি উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে নিজের শিবির স্থাপন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল যদি মুসলমানদের ওপর পরাজয় নেমে আসে তবুও যেন পালাতে গিয়ে পশ্চাদ্ধাবনরত দুশমনের হাতে বন্দী হওয়ার পরিবর্তে এখানে এসে আশ্রয় নেওয়া যায়। আর যদি দুশমন এই শিবির দখল করার জন্য সামনে বাড়ে তবে যেন তাদের জন্য ব্যাপক সর্বনাশের ব্যবস্থা হয়। এর বিপরীতে দুশমনদেরকে এমন একটি নীচু স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করতে বাধ্য করলেন যে, বিজয় যদি তারও হয় তবুও তা থেকে সে সামান্য পরিমাণই ফায়েদা কুড়াতে পারবে। আর যদি জয় হয় মুসলমানদের, তবে তার হাত থেকে পালিয়ে যাওয়াও তাদের জন্য কঠিন হবে। একইভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সমরকুশলী ও রণভিজ্ঞ বীরপুরুষ সাহাবায়ে কেরামকে নির্বাচিত করে শত্রুদের চেয়ে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যার দীনতাও ঘুচিয়ে ও পুষিয়ে নিলেন।

এভাবে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার ভোরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেনাবাহিনীর কাতারবিন্যাস সম্পন্ন হয়।

বিক্রমের প্রাণ ফুঁকে দিলেন মুজাহিদদের মধ্যে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুজাহিদদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু না করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি দু'টি লৌহবর্মে আবৃত হয়ে সবার সামনে বের হলেন। সাহাবায়ে কেরামকে তিনি শেষবারের মতো 'কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ'র প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। দুশমনের সঙ্গে মুকাবিলার সময় তিনি তাদেরকে অবিচলতা ও ছুবূতে কদম ইখতিয়ার করার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে সব ঝড়ের মুখে অবিচল হয়ে তিষ্ঠিতে বললেন। তাদের ভেতরে ফুঁকে দিলেন তাজাপ্রাণ আর প্রদীপ্ত-পৌরুষের এক অদম্য আত্মা। অবস্থা এমন হলো- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি খরশাণ তরবারি বের করে বললেন, **তোমাদের মধ্যে কে পারবে এই তরবারির হক্ব আদায় করতে?** আলী ইবনে আবী তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে গেলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কারো হাতে সেটা তুলে দিলেন না। এরপর এগিয়ে গেলেন আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাতা রা.। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটার হক্ব কী? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, **দুশমনের মুখে এত জোরে আঘাত করা যাতে এটা বেঁকে যায়।** তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটার হক্ব আদায় করব। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু দুজানাকে সেটা দিয়ে দিলেন।

আবু দুজানা রা. ছিলেন প্রসিদ্ধ জানবায মুজাহিদ। যুদ্ধের সময় এক বিরল ভঙ্গিমায় চলার খ্যাতি ছিল তাঁর। তাঁর একটি লাল ফিতা ছিল। তিনি যখন এটা

বেঁধে নিতেন তখন লোকেরা বুঝে ফেলত যে, মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত আবু দুজানার লড়াইয়ের এ গতি কেউ থামাতে পারবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে কাঙ্খিত তরবারিটি পেয়ে তিনি সেই লাল ফিতাটি মাথায় বেঁধে নিলেন এবং মুসলিম বাহিনীর কাতারের মাঝে বীর-ভঙ্গিমায় চলতে লাগলেন। আর তখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, **এটা এমন এক ভঙ্গিময় চলা, এ স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও আল্লাহ তাআলা যা পছন্দ করেন না।**

মক্কী বাহিনীর কাতার বিন্যাস

মক্কী বাহিনী যুদ্ধের সাধারণ নিয়মানুযায়ী কাতার বিন্যাস করল। পুরো বাহিনীর ব্যাপক নেতৃত্ব দেওয়া হলো আবু সুফিয়ান সখর ইবনে হরবের কাঁধে- যিনি নিজ বাহিনীর মাঝখানে অবস্থিতি করছিলেন। ডানপাশের বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ - তিনি তখনো মুশরিক ছিলেন। আর বামপাশের নেতৃত্বে ছিলেন ইকরিমা বিন আবী জাহল- তিনিও তখনো মুসলমান হননি। পদাতিক বাহিনীর নেতা ছিল সফওয়ান বিন উমাইয়্যা আর তীরন্দায বাহিনীর নায়ক ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে আবী রবীআ।

কুরাইশের পতাকা ছিল বনু আব্দুদ্দারের একটি ছোট দলের কাছে। এটা ছিল তাদের বংশানুক্রমিক পেয়ে আসা এক মূল্যবান উত্তরাধিকার- যা বনু আবদে মানাফ কুসাই বিন কিলাব থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অধিকারগুলো বণ্টনের- বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা যে সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছি- সময় থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছিল। অন্য কারও এটা নিয়ে তাদের সঙ্গে বিবাদ করার অধিকার ছিল না। কারণ এটা ছিল তাদের বাপ দাদার থেকে পাওয়া এক অব্যাহত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। কিন্তু মক্কী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান তাদেরকে মনে করিয়ে দিলেন- বদর প্রান্তরে তাদের পতাকাবাহী নযর বিন হারিস বন্দী হওয়ার পরে গোটা বাহিনীর ওপর কী চরম দুর্ভোগ নেমে এসেছিল। তিনি তাদের গোস্বানলকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললেন, হে বনু আব্দুদ্দার! বদর যুদ্ধে তোমরা ছিলে আমাদের পতাকাবাহী। পরবর্তী সময় আমাদের কী পরিণতি হয়েছিল? তা তো তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছ। আর শত্রু পক্ষের আক্রমণের সূচনা হয় পতাকাবাহীকে ঘিরেই। যদি পতাকা নেমে যায় তবে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। সুতরাং, তোমরা এখন এই পতাকা সামাল দিতে পারলে দাও। আর যদি না পারো তবে আমাদের হাতে তুলে দাও!

আবু সুফিয়ান তার উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ সফল হলেন। বনু আব্দুদ্দার আবু সুফিয়ানের বক্তব্যে ভীষণ রাগে আর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তারা তাকে ধমক দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল। তাকে বলল, ঠিক আছে,

আমরা তোমার হাতে আমাদের পতাকা তুলে দিব। কিন্তু আগামী কাল দেখতে পাবে আমরা কী করি! সত্যিই পরের দিন রণাঙ্গনে তারা এতটা দৃঢ়তা আর অবিচলতার পরিচয় দিলো যে, একে একে সবাই প্রাণ উৎসর্গ করল।

কুরাইশের কূটনৈতিক চালবাজি

বিভীষণ যুদ্ধের রণভেরী বেজে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে কুরাইশরা মুসলিম শিবিরে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সর্বশেষ ও সর্বশক্তি নিয়োগ করল। আবু সুফিয়ান আনসারদের কাছে লোক পাঠিয়ে বলে দিলো, তোমরা আমাদের ও আমাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মাঝখান থেকে সরে দাঁড়াও, তাহলে আমরা তোমাদেরকে কিছুই বলব না। তোমাদেরকে হত্যা করার আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই ঈমানের সামনে শয়তানী এই কূটচালের কী-ই বা ক্ষমতা আছে? যেই ঈমানে একটুকু ফাটল সৃষ্টি করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারও নেই। যেই ঈমান ছিল পাথরের পাহাড়ের মতো দৃঢ় ও অবিচল। মরুভূমিতে বহুদিনের জমে থাকা কোনো বালিয়াড়ি ছিল না। পৃথিবীর কোনো ধূলিঝড় কিংবা ঝঞ্ঝার শক্তি ছিল না, তাকে আপন জায়গা থেকে একটুখানি টলাবে। আনসারগণ তাদের প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে চরম আক্রোশের সঙ্গে তাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল।

ধীরে ধীরে চূড়ান্ত মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো। দুই দল ক্রমশঃ একে অপরের কাছাকাছি চলে আসতে শুরু করল। একই উদ্দেশ্যে কুরাইশরা এই সঙ্গিন মুহূর্তে আরও একটি প্রয়াসের তীর ছুঁড়ল। কুরাইশ কুচক্রী ফাসেক আবু আমের আনসারদের দিকে এগিয়ে এলো। তার প্রকৃত নাম ছিল আবদু আমর ইবনে সাইফী। কিন্তু মানুষ তাকে 'রাহেব' নামে ডাকত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম দিলেন 'ফাসেক'। জাহেলিয়াতের যুগে সে ছিল আউসের গোত্রপতি। অতঃপর যখন ইসলামের আগমন ঘটল তখন এটা তার চোখের শূলে পরিণত হলো। সে প্রকাশ্য দিবালোকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে দিলো। এই হীন উদ্দেশ্যে সে মদীনা থেকে বের হয়ে কুরাইশদের কাছে চলে গেল। তাদেরকে উত্তেজিত করে তুলল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর। প্রলুব্ধ করল তাকে হত্যা করার ওপর। আর সে তাদেরকে অঙ্গীকার করেছিল যে, তার কওমের লোকেরা যখন তাকে দেখবে তখন তার আনুগত্য করবে এবং তার দলে এসে ভিড়বে। সুতরাং, সেই ছিল প্রথম ব্যক্তি, যে হাবশী ও গোলামদের সঙ্গে সর্বপ্রথম মুসলমানদের দিকে এগিয়ে এলো। সে আপন কওমকে ডাক দিলো এবং তাদের কাছে নিজের পরিচয় তুলে ধরার নিমিত্ত বলল, হে আউস সম্প্রদায়! আমি আবু আমের। তখন তার কবীলা আউসের লোকেরা বলে উঠল, হে ফাসেক! আল্লাহ তোর চোখকে আনন্দের কিছু দেখতে না দিন! তখন সে বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমি চলে আসার পরে আমার কওমকে ভূতে পেয়েছে। (অতঃপর যখন যুদ্ধ শুরু হলো

তখন এই লোকটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করল এবং তাদের প্রতি জমে জমে পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করল।)

এভাবে ঈমানী সূত্রে আবদ্ধ মুসলিম শিবিরের মাঝে বিভেদের বিষ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কুরাইশের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটিও ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। তাদের এ সকল কর্মের দ্বারাই বোঝা যায়, মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর কতটা ভয় ভীতি ছড়িয়ে রেখেছিল। অথচ, শক্তি ও সংখ্যায় তারা মুসলমানদের চেয়ে বহুগুণে এগিয়ে ছিল।

কুরাইশ নারীদের ভূমিকা

কুরাইশ নারীদের ভূমিকাও এ যুদ্ধে সরগরম ছিল। তাদের নেত্রী ছিল আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা। তারা সেনাবাহিনীর কাতারের মধ্যে ছোটাছুটি করছিল। ঢোল-তবলা বাজিয়ে তারা পুরুষ যোদ্ধাদের ভেতরে প্রবল রণোন্মাদনা সৃষ্টি করছিল। জানবায পুরুষদের মধ্যে তারা আত্মমর্যাদাবোধের তীব্র তাড়নার জন্ম দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে সংঘাত আর সংঘর্ষের শাণিত অনুভূতি তৈরির প্রয়াসে চরম মেহনত করে যাচ্ছিল। কখনো তারা পতাকাবাহীদেরকে সম্বোধন করে বলছিল,

وَيْهًا بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
وَيْهًا حُمَاةَ الْأَدْبَارِ
ضَرْبًا بِكُلِّ بَتَّارِ

'বনু আব্দুদ্দার!
ও পশ্চাতের সান্ত্রীরা!!
বীর দর্পে চালাও শমশীর!!!

আবার কখনো তাদের কওমকে লড়াইয়ের প্রতি উত্তেজিত করে কবিতা আবৃত্তি করত,

إِنْ تُقْبِلُوْا نُعَانِقْ
وَنَفْرِشِ النَّمَارِقْ
أَوْ تُدْبِرُوْا نُفَارِقْ
فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

যদি সামনে বাড়ো তবে আমরা গলাগলি করব। তোমাদের জন্য গালিচা বিছিয়ে দিব। আর যদি পিছু হটো তবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনোদিনও আর পাবে না।

সংঘাতের সূচনা

ধীরে ধীরে উভয় বাহিনী একে অপরের কাছে চলে এলো। দুই দল নিকট থেকে নিকটতর হলো। সংঘর্ষ আর সংঘাতের চরম মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো। সংঘাতের সূচনা করল মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইবনে আবী তালহা আবদারী। সে ছিল কুরাইশের অন্যতম বীরপুরুষ। মুসলমানরা তার নাম দিয়েছিলেন 'কোলাব্যাঙ'। সে একটি উটে সওয়ার হয়ে মুশরিক বাহিনী থেকে বের হয়ে লড়াইয়ের প্রতি মুসলমানদেরকে ডাকতে লাগল। কিন্তু তার চরম বীরত্বের কারণে কেউ বের হচ্ছিল না। হঠাৎ যুবায়ের রা. বের হয়ে তাকে কোনো সুযোগ দিলেন না। বরং ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তার উটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাঁধে তুলে শক্ত মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন। এরপর ঠাণ্ডা মাথায় নিজের তরবারি দিয়ে তাকে যবাই করলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চমৎকার এ লড়াই দেখে তাকবীর দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মুসলিম শিবির থেকে সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত ঢেউয়ের মতো তাকবীর ধ্বনি উথলে উঠল। তিনি যুবায়ের রা. এর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর ব্যাপারে বললেন, **প্রত্যেক নবীর একজন হাওয়ারী (একান্ত সহকারী) থাকে; আর আমার হাওয়ারী হলো যুবায়ের।**[৪১৫]

পতাকা ঘিরে ঘনঘোর যুদ্ধ; বাহকদের ধারাবাহিক মরণ

এরপর উহুদ প্রান্তরে ব্যাপক যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আহত আর নিহতদের চিৎকারে আশপাশের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল। ময়দানের প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দুই দলের মাঝে বয়ে চলছিল ঘনঘোর সংঘর্ষ আর সংঘাতের প্রবল ঝড়। বিশেষকরে যুদ্ধের পরিস্থিতি আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ ছিল মুশরিকদের পতাকা ঘিরে। বনু আব্দুদ্দার তাদের নেতা তালহা ইবনে আবী তালহা নিহত হওয়ার পরে পতাকা ধরার জন্য এগিয়ে এলো। তালহার পরে পতাকা হাতে নিলো তার ভাই আবু শাইবা উসমান ইবনে আবী তালহা। সে যুদ্ধের গরম ময়দানে পতাকা উঠিয়ে ধরে এগিয়ে এলো। তার মুখে ছিল :

إِنَّ عَلَى أَهْلِ اللِّوَاءِ حَقًّا ... أَنْ تُخْضَبَ الصَّعْدَةُ أَوْ تَنْدَقَّا

'পতাকাবাহীদেরকে অবশ্যই বর্শা খুনরাঙা করতে হবে বা ভেঙে টুকরো টুকরো করতে হবে'!

হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. ছুটে এসে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তার কাঁধে এত জোরে এক আঘাত বসিয়ে দিলেন যে, কাঁধসহ তার হাত আলাদা হয়ে গেল এবং গোটা শরীর চিরে নাভী পর্যন্ত গিয়ে তরবারি পৌঁছল আর তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল।

---

[৪১৫] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/১৮।

এরপর আবু সা'দ বিন আবী তালহা এসে পতাকা উঠিয়ে নিলো। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. তার প্রতি একটি তীর ছুঁড়লে তা এসে তার গলায় বিঁধল। আঘাতের প্রচণ্ডতায় তার জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে এলো এবং সে জায়গায় কুপোকাত হয়ে পড়ল। কারও কারও মতে, আবু সা'দ পতাকা নিয়ে বের হয়ে স্বতন্ত্র সংঘাতের প্রতি ডাকছিল। তখন আলী ইবনে আবী তালিব রা. তার দিকে অগ্রসর হন। উভয়ের মাঝে কয়েক তরফা আঘাত-পাল্টা আঘাত হয়। শেষমেশ আলী রা. তাকে প্রচণ্ড এক আঘাত করেন এবং সে তখনই নিহত হয়।

এরপর এসে পতাকা ধরল মুসাফা' ইবনে তালহা ইবনে আবী তালহা। সাহাবী আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবীল আফলাহ রা. এর তীরে সে তখন নিহত হয়। তারপর পতাকা উঠিয়ে নেয় তার ভাই কিলাব ইবনে তালহা ইবনে আবী তালহা। যুবায়ের ইবনুল আওয়্যাম রা. তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং উভয়ের মধ্যে কিছুটা সংঘাত হওয়ার পর যুবায়ের রা. তাকে হত্যা করেন। এরপর পতাকা উঁচু করে ধরে তাদের ভাই জুলাস ইবনে তালহা ইবনে আবী তালহা। সাহাবী তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ রা. তাকে বর্শা দ্বারা সজোরে আঘাত করলে সে জায়গায় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কারও কারও মতে, আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবীল আফলাহ রা. এর তীরের আঘাতে সে নিহত হয়।

এভাবে মুশরিকদের একটি পতাকাকে তুলে ধরার জন্য আবু তালহা আব্দুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে আব্দুদ্দার এর একই পরিবারের ছয়জন সদস্য তরতাজা প্রাণ বিকিয়ে দিলো। তারা সকলে নিহত হলে পতাকা তুলে নেয় বনু আব্দুদ্দারের আরতা ইবনে শুরাহবীল। তাকে হত্যা করেন আলী ইবনে আবী তালিব রা.। কারও মতে, তাকে হত্যা করেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা.। এরপরে পতাকা তুলে নেয় শুরাইহ ইবনে কারেয। আর তাকে হত্যা করে ফেলেন কুযমান। এই কুযমান ছিল মুনাফিক, তাই সে ইসলামের জন্য নয়; বরং জাত্যভিমানের জোশে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল। এরপর পতাকা তুলে নিল আবু যায়দ আমর ইবনে আবদে মানাফ আবদারী এবং তাকেও কুযমান হত্যা করে ফেলে। এরপর পতাকা নেয় শুরাহবীল ইবনে হাশিম আবদারীর এক ছেলে এবং কুযমান তাকেও হত্যা করে ফেলে।

এভাবে বনু আব্দুদ্দারের মোট দশজন একের পর এক পতাকা নিয়ে প্রাণ হারায়। তখন কুরাইশদের পতাকা আকাশের বুকে তুলে ধরার মতো তাদের পরিবারে আর কেউ ছিল না। এ কারণে তাদের সুয়াব নামক এক হাবশী গোলাম এসে পতাকা তুলে নেয়। সে এমন বীরত্ব আর রণকুশলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে, যা তার আগের পতাকাবাহী মাওলাদেরকে হার মানিয়ে দেয়। এভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তার হাত কেটে যায়। উপায়ন্তর না দেখে সে তার বুক ও ঘাড় দ্বারা পতাকার ওপর বসে যায়, যাতে করে তা কোনো দিকে হেলে না পড়ে।

অতঃপর যখন তাকে হত্যা করে ফেলা হয় তখন সে বলছিল, হে আল্লাহ! এখন তো আমার কিছু করার নেই।

সুয়াব নিহত হওয়ার পরে মুশরিকদের পতাকা মাটিতে পড়ে যায়। তখন পতাকা বহন করার মতো তাদের শিবিরে আর কেউ থাকে না। আর এ কারণে তখন তা মাটিতেই থেকে যায়।

অন্যান্য অংশে সংঘাতের চিত্র

মুশরিকদের পতাকা ঘিরে যেভাবে ভীষণ রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছিল একইভাবে গোটা উহুদ প্রান্তর তখন প্রচণ্ড মৃত্যু বিভীষিকায় ভয়াল কালো আঁধারের রূপ নিয়েছিল। কিন্তু মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীর কাতারে মহা গৌরবে রাজত্ব করে চলছিল ঈমানের প্রদীপ্ত প্রাণ। প্রচণ্ড পাহাড়ী ঢলের সামনে যেমন সমস্ত বাঁধ ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে ঈমানের জোশে মেতে উঠে মুসলমান মুজাহিদরা শিরকপূজারীদের ব্যূহ ভেদ করে সব ভেঙে তছনছ করে দিতে থাকেন। আর তারা মুখে বলতে থাকেন, 'আমিত্, আমিত্ (অর্থাৎ মারো, মারো); এটা ছিল উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের গোপন সংকেত।

এদিকে সাহাবী আবু দুজানা রা. লাল ফিতা মাথায় বেঁধে সামনের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর হাতে ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেওয়া তরবারি। মনে প্রাণে দৃঢ় সংকল্প- যে করেই হোক এ তরবারির হক্ব আমাকে আদায় করতেই হবে। এভাবে লড়াই করতে করতে মুশরিকদের কাতারের মধ্যে ঢুকে গেলেন। শুরু করেন এক বিরল মৃত্যুখেলা। মুশরিকদের যাকেই সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই শেষ করে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন যমসদনে। এভাবে মুশরিকদের কাতারের পর কাতার উলট পালট করে দিচ্ছিলেন। যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. বলেন, আমি যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাঁর তরবারি চেয়েছিলাম এবং তিনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন, তখন মনে সামান্য কষ্ট পেয়েছিলাম। আর তিনি সেটা দিয়েছিলেন আবু দুজানাকে। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি তাঁর ফুফু সাফিয়্যার ছেলে, কুরাইশ বংশের লোক। তাছাড়া আমি তার আগে চেয়েছি। কিন্তু সেটা তিনি আমাকে না দিয়ে তাকে দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি দেখব সে আজ কী করে? তখন আমি তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমি দেখলাম সে তার লাল ফিতাটি বের করে মাথায় বেঁধে ফেলে। আনসারগণ এ দৃশ্য দেখে বলতে থাকে, আবু দুজানা মৃত্যুর ফিতা বের করেছে। তখন সে বলতে বলতে বের হয়,

أَنَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي ... وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ
أَلَّا أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الْكَيُّولِ ... أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللهِ وَالرَّسُولِ

'আমি ঐ খেজুর গাছের ছায়ায় বসে আমার প্রিয়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এক মুহূর্ত সময়ও কাতারের পেছনে পড়ে থাকবো না (বরং সামনে এগিয়ে দুশমনের ওপর) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরবারি চালাবো'!

সে যাকেই সামনে পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে। মুশরিকদের মধ্যে এক যোদ্ধা ছিল সে আমাদের আহত যাকেই পেত শেষ করে ফেলত। তারা উভয় ধীরে ধীরে একে অপরের কাছে চলে যাচ্ছিল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করলাম যেন তিনি তাদেরকে একত্র করে দেন। বাস্তবিকই তখন উভয়ের মাঝে লড়াই বেধে গেল। আঘাত পাল্টা আঘাত বিনিময় হতে লাগল। মুশরিকটি আবু দুজানার ওপর তলোয়ার চালালে আবু দুজানা সুকৌশলে ঢাল দিয়ে তা ফিরিয়ে দেয়। আর তখন মুশরিকটির তরবারি ঢালের মধ্যে ঢুকে রয়ে যায়। তখন আবু দুজানা তাকে আঘাত করে হত্যা করে ফেলে।[৪১৬]

অতঃপর আবু দুজানা কাতারের পর কাতার উলট পালট করে সামনে এগিয়ে চলতে লাগলেন। এভাবে চলতে চলতে এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি কুরাইশের নারীদের নেত্রীর কাছে পৌঁছে যান। আবু দুজানা বলেন, আমি একটা মানুষ দেখলাম সৈন্যদেরকে যুদ্ধের প্রতি বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করে যাচ্ছিল। তখন আমি তার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। যখন আমি তার ওপর তরবারি উত্তোলন করলাম সে চিৎকার করে উঠল আর তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, সে একটি নারী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরবারি দ্বারা একটি নারীর ওপর আঘাত করা আমি শোভনীয় মনে করলাম না।

সে ছিল হিন্দা বিনতে উতবা। যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. বলেন, আমি দেখেছি আবু দুজানা হিন্দা বিনতে উতবার মাথর সিঁথির ওপর তরবারি উঠিয়েছিল কিন্তু পরক্ষণে তা আবার সরিয়ে ফেলে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই ভালো জানেন।[৪১৭]

ওদিকে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো লড়াই করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি আক্রমণের এক বেনজীর দৃশ্য দেখিয়ে মুশরিক বাহিনীর কলিজার মধ্যে ঢুকে গেলেন। ঝটিকা বেগে বয়ে যাওয়া পাগলা হাওয়ার সামনে মরা গাছের শুকনো পাতাগুলো অসহায় হয়ে ঝরে পড়তে থাকে ঠিক তেমনিভাবে তার তরবারির সামনে মুশরিকদের তরতাজা প্রাণগুলো চিরদিনের জন্য ঝরতে লাগল। মুশরিক বাহিনীর পতাকাবাহীদেরকে হালাক করার পাশাপাশি তিনি বীর বিক্রমে বড় বড় মুশরিকদেরকে ধরে ধরে চিরদিনের জন্য ঠাণ্ডা করে দিতে লাগলেন। এভাবে সংঘাত আর সংঘর্ষের অচিন দুনিয়ায় হঠাৎ তাঁর প্রাণপ্রদীপ নিভে গিয়ে

---

[৪১৬] ইবনে হিশাম ২/৬৮,৬৯।
[৪১৭] ইবনে হিশাম ২/৬৯।

চারপাশটা অন্ধকার করে দিয়ে যায়। কিন্তু তাকে বীরোচিতভাবে শহীদ করা হয়নি; বরং কাপুরুষের মতো লুকিয়ে থেকে তাঁর অজ্ঞাত দুনিয়ায় বসে লজ্জাজনকভাবে তাকে শহীদ করা হয়।

আল্লাহর সিংহ হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিবের শাহাদাত

হামযা রা. কে শহীদ করেছিল ওয়াহশী ইবনে হরব (পরে তিনি মুসলমান হয়ে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন-রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি তাঁকে হত্যা করার কাহিনী নিজে বর্ণনা করেছেন ঠিক এভাবে: আমি জুবাইর ইবনে মুতইমের গোলাম ছিলাম। জুবাইরের চাচা তুআইমা ইবনে আদী বদর প্রান্তরে নিহত হয়েছিল। অতঃপর যখন কুরাইশরা উহুদের পথে যাত্রা করে তখন জুবাইর আমাকে বলল, তুমি যদি আমার চাচার বদলে মুহাম্মাদের চাচা হামযাকে হত্যা করতে পারো তবে তুমি আযাদ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, অতঃপর আমি কাফেলার সঙ্গে বের হলাম। জন্মসূত্রে আমি ছিলাম একজন হাবশী। তাই হাবশীদের মতো বর্শা নিক্ষেপে পারদর্শী ছিলাম। এ ক্ষেত্রে আমার লক্ষ্যভ্রম খুব কমই হতো। অতঃপর যখন লড়াই শুরু হলো তখন আমি হামযাকে খুঁজতে লাগলাম। আমি তাকে মুশরিকদের ভিড়ের মধ্যে উগ্র ও উত্তেজিত উটের মতো দেখতে পেলাম। তিনি সামনে যা কিছু পাচ্ছিলেন সব উলট পালট করে দিচ্ছিলেন। কোনো কিছুই তার সামনে দাঁড়াতে পারছিল না। আল্লাহর কসম! আমি তার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। তখন তিনি যেন আমার কাছে এসে পড়েন এ জন্য আমি একটি গাছ কিংবা পাথরের আবডালে চলে গেলাম। হঠাৎ দেখলাম সিবা' ইবনে আব্দুল উয্যা আমাকে পেছনে রেখে তার দিকে এগিয়ে গেল। তিনি তাকে দেখা মাত্রই হুঙ্কার ছাড়লেন, হে লজ্জাস্থান কর্তনকারিনীর বাচ্চা-তার মা ছিল খতনাকারিনী- এদিক আয়! এরপর তিনি তরবারি দ্বারা তার মাথায় এতটা জোরে আঘাত করলেন যে, মনে হলো তার কোনোদিন মাথাই ছিল না।

ওয়াহশী বলেন, তখনই আমি আমার বর্শা তুলে নিলাম। অতঃপর তিনি যখন আমার মনের মতো জায়গায় চলে এলেন তখন আমি তাঁর দিকে তা ছুঁড়ে দিলাম। সেটা তার পেটের মধ্যে ঢুকে দুই উরুর মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপরেও তিনি আমার দিকে ছুটে এলেন। কিন্তু পারলেন না। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। অতঃপর আমি তাঁর কাছে এসে আমার বর্শাটি বের করে নিয়ে সোজা শিবিরে ফিরে এসে বসে পড়লাম। কারণ আমার আর কিছুর প্রয়োজন ছিল না। আর তাকেও আমি হত্যা করেছিলাম আযাদী লাভের জন্য। অতঃপর যখন আমি মক্কায় ফিরে আসি তখন আমি আযাদ হয়ে যাই।[৪১৮]

---

[৪১৮] ইবনে হিশাম ২/৬৯-৭২। সহীহ বুখারী ২/৫৮৩- এ ওয়াহশী তায়েফ যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ঠিক একই যুদ্ধ করে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলিমাতুল কায্যাবকে হত্যা করেন। অবশেষে রোমানদের বিরুদ্ধে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

পরিস্থিতি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. এর শাহাদাতে মুসলিম শিবিরের বিশাল সর্বনাশ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম মুজাহিদগণ পুরো ময়দানের পরিস্থিতি তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। তখনো অসামান্য দুঃসাহসিকতা আর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন আবু বকর, উমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম, মুসআব ইবনে উমাইর, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, সা'দ বিন মুআয, সা'দ বিন উবাদা, সা'দ বিন রবী' ও আনাস বিন নযর প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম। তারা মুশরিকদের মনোবল ভোঁতা করে দিয়েছিলেন। তাদের শক্তি আর প্রতাপের প্রাচীরে বিশাল ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

নারীর পেলব বন্ধন থেকে শাণিত তরবারির বন্ধনে

এ সময়ের আরেকজন শ্রেষ্ঠ জানবায মুজাহিদ ছিলেন 'গাসীলুল মালায়িকাহ' বলে খ্যাত সাহাবী হানযালা রা.- ইনি হলেন হানযালা ইবনে আবী আমের। আর শুধু আবু আমের হিসেবে পরিচিত যে, তাকে মুসলমানরা 'ফাসেক' বলে ডাকতেন। একটু আগেই আমরা তার কথা আলোচনা করেছি। হানযালা রা. ছিলেন তখন সদ্য বিবাহিত। চন্দ্রালোকিত এক রাতে নব পরিচয়ের এক নতুন সন্ধানে আপন তরুণ প্রাণ প্রণয়ীর পেলব-কোমল বাহুবন্ধনে ছিলেন। ঠিক এমন সময় যুদ্ধের রণভেরী মদীনার আকাশ বাতাস ভারী করে দেয়। তাঁর কর্ণকুহরে এসে আঘাত হানে জিহাদের ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতি প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহ্বান। যুদ্ধের তপ্ত প্রান্তর রণাঙ্গন যার খেলার মাঠ কীভাবে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে কাপুরুষের মতো এক কুমারী নারীর বাহুবন্ধনে পড়ে থাকবেন। দু'হাতে এ বাহুবন্ধন দূরে ঠেলে দিয়ে তৃষ্ণাতুরের মতো ছুটে গেলেন জিহাদের ময়দানে। মুশরিকদের কাতারের পর কাতার উল্টে দিয়ে একেবারে তাদের সর্বাধিনায়ক আবু সুফিয়ান সফর ইবনে হরবের কাছে পৌঁছে গেলেন। যদি আল্লাহ তাআলা সেই মুহূর্তে তাকে শাহাদাতের সুমিষ্ট শরাব পান না করাতেন তবে তিনি তাকে ঠিকই মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিতেন। তিনি আবু সুফিয়ানের ওপর তরবারি উত্তোলন করে আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হলেন ঠিক সেই মুহূর্তে শাদ্দাদ ইবনে আসওয়াদ তাঁকে দেখে ফেলল। আচমকা সে ছুটে এসে তাকে সজোরে আঘাত করল। এতে স্বয়ং হানযালা রা. শহীদ হয়ে গেলেন।

তীরন্দায বাহিনীর কৃতিত্ব

মুসলিম বাহিনীর জন্য যুদ্ধের পরিবেশ অনুকূলে রাখার ক্ষেত্রে তীরন্দায মুজাহিদ বাহিনীরও অবদান ছিল অসামান্য। ফাসেক আবু আমেরে সহযোগিতায় খালিদ বিন ওয়ালিদ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিন তিনবার মুসলমানদের পেছন

দিক থেকে আক্রমণ করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে চূড়ান্ত পতনের প্রয়াস পায়। কিন্তু আল্লাহর পথের ঐ সকল সাহসী মুজাহিদ প্রত্যেক বারই তাদের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন।[৪১৯]

মুশরিকদের পতন

এভাবে এ ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের চাকা অবিরাম ঘুরতে লাগল। হাতে গনা কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত ছোট এ দলটি মুশরিকদের বিশাল শক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে পুরো রণাঙ্গন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। এতে করে মুশরিক বীর পুরুষদের মনোবলে ধীরে ধীরে ঘুণে ধরল। তাদের সাহসের তরবারি ভোঁতা হয়ে গেল। ডানে-বামে, সামনে-পেছনে তাদের বাহিনীর কাতার তছনছ হয়ে যেতে লাগল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, যেন তিন হাজার মুশরিকদের একটি কাফেলা কয়েক শ' র পরিবর্তে ত্রিশ হাজার মুসলিম বাহিনীর মুকাবিলা করছিল। বীরত্ব ও সাহসিকতা, ঈমানের তেজ ও বলে মুসলমানরা ছিলেন চলচঞ্চল ও প্রাণবন্ত।

মুসলিম মুজাহিদদের আক্রমণের বাঁধভাঙা জোয়ার ঠেকাতে মুশরিকরা পরপর কয়েকটা বালির বাঁধ নির্মাণের প্রয়াস পেল। হামলার এ দুয়ার বন্ধ করে দিতে তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা চালালো। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল কিছুতেই কিছু হবে না; যে ঢল প্রবল বিদ্রোহে নেমে আসছে কোনো বাঁধ তার গতিরোধ করতে পারবে না তখন তাদের মনোবল ভেঙে গেল। ফলে দেখা গেল সুয়াব নিহত হওয়ার পরে তাদের বাহিনীর প্রধান পতাকাটি যখন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল তখন থেকে কেউ আর সেটা ওঠানোর সাহস করছিল না। ঠিক তখনোই তারা রণাঙ্গনে পিঠ দেখালো। শিরক আর মাটি নির্মিত বেজান মূর্তির পূজারীরা যে যেদিকে পারল ভাগতে লাগল। প্রতিশোধের যে তুষের আগুন এতদিন তাদের হৃদয়কে জ্বলে পুড়ে ছাই করে দিচ্ছিল, হারানো সম্মান আর ইয্যত পুনরুদ্ধারের যে ইস্পাত-কঠিন শপথ তাদেরকে প্রচণ্ড রণোন্মাদনায় স্থান ও অবস্থান সবকিছু ভুলিয়ে রেখেছিল, প্রাণের মায়ায় মুহূর্তে এখন তারা সে সবের কথা ভুলে গেল।

ইবনে ইসহাক বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর মদদ নাযিল করেন। তিনি তাদেরকে দেওয়া আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন। তলোয়ার দিয়ে তাদেরকে এত পরিমাণ কচুকাটা করতে লাগলেন যে, নিজেদের শিবির ছেড়ে তারা জান নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। এভাবে তারা এক নিশ্চিত পরাজয়ের মুখামুখি হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা.নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি হিন্দা বিনতে উতবা ও তার সঙ্গীদের পায়ের গোছা

[৪১৯] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৩৪৬।

দেখছিলাম। তারা কাপড় উঠিয়ে পালাচ্ছিল। তখন তাদের সবাইকে কয়েদ করা আমাদের পক্ষে খুব একটা দূরের ব্যাপার ছিল না।[৪২০]

সহীহ বুখারীতে বারা ইবনে আযেব রা. এর হাদীসে এসেছেঃ যখন আমরা তাদের সঙ্গে মুকাবিলা করতে লাগলাম তখন তারা পালাতে লাগল। আমি নারীদেরকে দেখলাম কাপড় উঠিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছিল। তখন তাদের পায়ের গোছা দেখা যাচ্ছিল।[৪২১] আর মুসলমানরা তাদের পশ্চাতে তরবারি চালিয়ে ও তাদের ফেলে যাওয়া গনীমতের মাল কুড়িয়ে ছুটে যাচ্ছিলেন।

তীরন্দায বাহিনীর সর্বনাশা ভুল

এভাবে যখন অল্প কয়েকজন মুজাহিদ নিয়ে গঠিত মুসলমানদের ছোট কাফেলাটি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত মক্কার বিশাল সৈন্যবহরের ওপর দ্বিতীয় বারের মতো- প্রথম বার ঘটেছিল ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে- এক নিরঙ্কুশ বিজয়ের ইতিহাস রচনা করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের পাহাড়ে নিযুক্ত তীরন্দায বাহিনী এমন একটি ভুল করে বসল যার কাফফারা তাকে চিরদিন বয়ে বেড়াতে হবে। এই সর্বনাশা ভুলের ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণই পাল্টে যায়। এতে মুসলমানদের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়, যার মাশুল কোনো দিনও আদায় করা সম্ভব হবে না। এমনকি এটি সাহেবে রিসালত সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন নাশের কারণ হতে পারত। এতে মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাতি ধূলায় মিশে যায়। বদর যুদ্ধের পর থেকে যে দুশমনরা এতদিন তাদের ভয়ে রীতিমতো কম্পমান ছিল এখন তারা তাদের মাথায় উঠে নৃত্য করার দুঃসাহস দেখায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মুসলিম শিবিরের পেছনের পাহাড়ে নিয়োজিত পঞ্চাশ জন তীরন্দায মুজাহিদকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন- জয় পরাজয় যা-ই হোক- তারা যেন সেখান থেকে কোনো অবস্থায় একটুও সরে না যায়। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বার বার দেওয়া এ কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা যখন মুসলিম সৈন্যদেরকে দুশমনের ফেলে যাওয়া গনীমতের মাল কুড়াতে দেখল তখন ক্ষণিকের জন্য হলেও তাদের ওপর দুনিয়ার পুরনো প্রভাব আবার জেঁকে বসে। তখন একজন আরেকজনকে বলতে শুরু করে, ঐ দেখো গনীমত.........গনীমত.........তোমাদের সঙ্গীরা সব কুড়িয়ে নিচ্ছে........এখন আর কীসের অপেক্ষা?

কিন্তু তাদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. তাদেরকে বার বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেওয়া নির্দেশ স্মরণ করিয়ে

---

[৪২০] ইবনে হিশাম ২/৭৭।

[৪২১] সহীহ বুখারী ২/৫৭৯।

দিচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলছিলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরা কি তা ভুলে গেছ?

কিন্তু তাদের সিংহভাগই তাঁর কথায় কোনো কান দিলো না; বরং বলল, আল্লাহর কসম! আমরা সেখানে গিয়ে গনীমত নিয়েই ছাড়ব।[৪২২]এরপর চল্লিশ কিংবা এই তীরন্দায মুজাহিদদের অধিকাংশই মুসলমানদের সঙ্গে গনীমতের মাল কুড়ানোর জন্য নিজেদের জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন। এভাবে মুসলমানদের পেছনের দুয়ার শত্রুর জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। ইবনে জুবাইর রা. দশ কিংবা তার চেয়েও কম সংখ্যক সাহাবী নিয়ে অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিন্তু তাদের প্রতিজ্ঞা ছিল- হয় মরব নতুবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি আসবে; তবু এখান থেকে চুল পরিমাণ সরব না।

মুশরিকদের নরকে

মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর সালার খালিদ বিন ওয়ালিদ এই স্বর্ণ-সুযোগটি একটুও বৃথা যেতে দিল না। সে তার বাহিনী নিয়ে সর্বনাশা সেই ঝড় হয়ে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল পাহাড়ে নিয়োজিত আট দশজন তীরন্দায মুজাহিদের ওপর। বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে আসা এ ঝড়ের হঠাৎ আগমনে জুবাইর রা. ও তার বাহিনী মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। এরপর তারা শুরু করল মুসলমানদের পেছন দিক থেকে ঝটিকা হামলা। তারা জোরে জোরে পশুর মতো বিকৃত চিৎকার শুরু করে দিলো। এতে পলায়নোদ্যত মুশরিক বাহিনীর প্রাণ ফিরে এলো। তারা পূর্ণ উদ্দাম আর চঞ্চলতা নিয়ে আবারও ফিরে এলো রণাঙ্গনে। তখন তাদের একটি নারী আমরা বিনতে আলকামা হারেসিয়্যা মাটিতে পড়ে থাকা মুশরিকদের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরল। তখন মুশরিকরা পতাকার চারপাশে সমবেত হয়ে অন্যান্যদেরকে ডাকতে লাগল। সবাই মিলে আবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পরিস্থিতির বিপাকে বিব্রত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুসলমানদের ওপর। ঘাস কাটার মতো তাদেরকে পাইকারী হারে ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। সামনে, পেছনে, ডানে, বামে- সবদিক থেকে তারা মুসলমানদেরকে ঘিরে ধরল। মুসলমানরা পড়ে গেলেন শাঁখের করাতে।

প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে সাহেবে রিসালতের অবিচলতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মূল মুসলিম বাহিনীর পেছনে নয় জন সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে গঠিত একটি ছোট মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে অবস্থান করছিলেন।[৪২৩] তিনি মুসলমানদের বীরত্ব ও পলায়নরত মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্য নিরীক্ষণ করছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে খালিদ বিন ওয়ালিদের

---

[৪২২] বারা বিন আযেব রা. থেকে ইমাম বুখারীর বর্ণনা ১/৪২৬।

[৪২৩] সহীহ মুসলিমে ২/১০৭ রয়েছে উহুদের দিন রাসূলে কারীম সা. এর সঙ্গে সাত জন আনসার আর দুই জন মুহাজির ছিলেন।

ঝড় পেছনের দিক থেকে ছুটে এসে সব কিছু এলোমেলো করে দিলো। তখন তাঁর সামনে দু'টি পথ খোলা ছিলঃ হয়েতো মুসলিম বাহিনীকে তাদের তকদীরের ফয়সালার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের ও সঙ্গী নয় সাহাবীর প্রাণ নিয়ে ময়দান ছেড়ে দ্রুত কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবেন নতুবা নিজের জানকে খতরার দরিয়ায় নিক্ষেপ করে দিকভ্রান্ত ও বিব্রত সাহাবায়ে কেরামকে নিজের দিকে ডেকে আনবেন। এরপর তাদেরকে নিয়ে নতুন বেগে ও নতুন আবেগে নতুন করে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন শিরকপূজারীদের বুকের ওপর।

ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিনব বীরত্ব আর অনুপম রণকুশলতার খানিক আলোকছটার ঝলকানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যে বাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু ও প্রাণ সে বাহিনীকে ময়দানে অদৃষ্টের ফয়সালার ওপর ছেড়ে দিয়ে তিনি কীভাবে চলে যেতে পারেন? তাই তিনি উচ্চস্বরে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে ডাকতে লাগলেন **'আল্লাহর বান্দারা! আমার কাছে চলে এসো!!** অথচ তিনি জানতেন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আওয়াজ শোনার আগে মুশরিকরাই শুনে নিবে। তারপরও এই খতরনাক মুহূর্তে নিজের জান খতরায় ফেলে তিনি তাদেরকে ডাকতে লাগলেন।

বাস্তবেও তাই হলো। মুসলমানদের আগে মুশরিকদের কানেই তাঁর আওয়াজ আগে গিয়ে পড়ল । আর তারা তখন মুসলমানদের আগেই তাঁর দিকে ছুটে এলো।

ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী

যখন মুসলমানদের ওপর খালিদ বিন ওয়ালিদের ঝড় এসে আঘাত হানল তখন তাদের একদল হুঁশ হারিয়ে ফেলল। একমাত্র নিজেকে ছাড়া তারা তখন সবকিছুর কথা ভুলে গেল। তাই তারা আপন প্রাণ নিয়ে পালানোর পথ অবলম্বন করল। রণাঙ্গন ছেড়ে তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল- পেছনে একবারও ফিরে দেখল না জাহান্নামের কী মৃত্যু বিভীষিকা শুরু হয়েছিল সেখানে! দৌড়ে তাদের কেউ কেউ একেবারে মদীনায় গিয়ে ঢুকে গেল আবার কেউ কেউ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

আরেকদল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে ফিরে এলো। কিন্তু ছত্রভঙ্গ হওয়াতে মুশরিকদের সঙ্গে তারা মিলে গেল। কে মুসলিম আর কে মুশরিক পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়ে গেল। তখন মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করতে লাগল। ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের প্রাণ অজ্ঞাতসারে ঝরে যেতে লাগল। ইমাম বুখারী র. আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উহুদের ময়দানে মুশরিকদের যখন চূড়ান্ত পরাজয় ঘটল তখন ইবলীস চিৎকার

জুড়ে দিলো, হে আল্লাহর বান্দারা পেছনে এসো! সঙ্গে সঙ্গে তারা পেছনে ফিরে এলো আর এদিকে পেছনের বাহিনী আগে বাড়ল, মুসলমানরা পড়ে গেল ঘূর্ণায়মান জাঁতার পাটার মাঝে। তখন হুযাইফা রা. দেখলেন তার পিতা ইয়ামানের ওপর মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দারা উনি আমার পিতা। আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহর কসম! তার কথায় তারা কোনো ভ্রুক্ষেপই করল না এবং এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। হুযাইফা রা. বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন! উরওয়া র. বলেন, হুযাইফা রা. যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার মধ্যে সব ধরনের উত্তম গুণাবলী বিদ্যমান ছিল- অবশেষে এ অবস্থায় তিনি তার রবের সঙ্গে মিলিত হন।[৪২৪]

মোটকথা, এ বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষিপ্ততা আর বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। তারা সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে চেতনা হারিয়ে ফেলল। নিজেরাও ভুলে গেল কোথায় যাবে এবং কেন যাবে! আর ইসলামের ইতিহাসের চরম এই নাযুক মুহূর্তে তাদের কানে ভেসে এলো একটি বিকৃত ঘোষণা- 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে'। এতক্ষণ তাদের যতটুকু হুঁশ ছিল এখন তাও উবে গেল। তাদের আত্মার ইমারত ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অনেকে ছাতি ফেটে মারা পড়ার উপক্রম হলো। অনেকে হাতিয়ার ফেলে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন। কেউ কেউ আবার আবু সুফিয়ানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য 'রঈসুল মুনাফিকীন' আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দলে ভিড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সময় আনাস বিন নযর রা. তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে শূন্যহাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কীসের অপেক্ষা করছ? তারা বলল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে তাঁর পরে তোমরা বেঁচে থেকে কী করবে? তোমরা দাঁড়িয়ে যাও! যার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুসুধা পান করেছেন তোমরাও সে পথে প্রাণ বিলিয়ে দাও!! এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা- মুসলমানরা- যা করে সে সম্পর্কে আমার কিছুই করার নেই। আর ওরা- মুশরিকরা- যা করে তা থেকে আমি তোমার কাছে বিমুক্ত। এরপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন। সা'দ বিন মুয়ায রা. সামনে পড়লে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছ আবু আমর! আনাস রা. বললেন, সা'দ! ঐ তো উহুদ পাহাড়ের পেছন দিক থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। এরপর তিনি সামনে বেড়ে দুশমনের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধ শেষে একমাত্র

[৪২৪] সহীহ বুখারী ১/৫৩৯, ২/৫৮১, ফাতহুল বারী ৭/৩৫১,৩৬২,৩৬৩। বুখারী ব্যতীত অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে রাসূলে কারীম সা. তার দিয়ত আদায় করে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হুযাইফা রা. বললেন, আমি তার দিয়ত মুসলমানদেরকে সদকা করে দিলাম। এতে রাসূলে কারীম সা. এর নিকট তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে যায়।

তার বোন একটি আঙ্গুল দেখে তাকে সনাক্ত করতে পারলেন। তার শরীরে তখন ছিল আশিটিরও বেশি তীর, তরবারি আর বিষাক্ত বর্শার আঘাত![৪২৫]

একই ভাবে সাবেত ইবনে দাহদাহ রা. নিজ কওমকে ডেকে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি নিহত হয়েও থাকেন কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো চিরঞ্জীব; তিনি কখনো মরবেন না। সুতরাং তোমরা তোমাদের দীনের জন্য আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। কেননা, তোমাদের বিজয়দাতা ও সাহায্যকারী তো খোদ আল্লাহ তাআলা। তার কথা শুনে আনসারদের একটি দল উঠে দাঁড়ালো। তিনি তাদেরকে নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে খালিদের বর্শার আঘাতে তিনি শহীদ হয়ে যান। তার সঙ্গীরাও একে একে সবাই শাহাদাত বরণ করেন।[৪২৬]

তেমনিভাবে এক মুহাজির সাহাবী এক আনসারীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন রক্তাক্ত অবস্থায় ছটফট করছিলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! আপনি কি জানতে পেরেছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন? আনসারী রা. বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও তিনি তার দাওয়াত তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছেন। সুতরাং, তোমাদের দীনের জন্য এখন তোমরা লড়াই করে যাও![৪২৭]

এ ধরনের উৎসাহ, উদ্দীপনা আর প্রণোদনায় মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে আবার তাদের প্রাণ ফিরে এলো। তাদের আগের হুঁশ-জ্ঞান আর সঠিক দিকনির্দেশনা তাদের ভেতরে আবার জায়গা করে নিলো। আত্মসমর্পণ কিংবা উবাই ইবনে সালূলের দলে ভিড়ার যে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন তা বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। হাতে উঠিয়ে নিলেন ফেলে দেওয়া প্রিয় হাতিয়ার। আবারও ইস্পাত-কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন, শিরক পূজারীদের যে ঝড় তাদের সবকিছু কিছুক্ষণ আগে উলট পালট করে দিয়েছে, প্রাণহীন মূর্তির উচ্ছ্বাসী সমর্থকদের যে ঢল তাদের সাহস আর প্রতিজ্ঞার তরণী ভাসিয়ে বহু দূরে নিয়ে গেছে এবার সে ঝড় আগল মেরে থামিয়ে দিতে হবেই হবে। এবার সে ঢলের সামনে বাঁধ নির্মাণ করে তার স্রোত রুখতেই হবে। এবার তাদের লক্ষ্য ছিল নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দু শিবির পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। ওদিকে তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পৌঁছে গেল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হওয়ার যে সংবাদ চতুর্দিকে ছড়ানো হয়েছে তা ছিল জাল ও মিথ্যা। তখন তাদের শক্তি ও সাহস আরও বেড়ে গেল। প্রচণ্ড ভীতি সঞ্চালনে শুকিয়ে যাওয়া তাদের প্রাণগুলি আবারও নয়া সাহসের

[৪২৫] যাদুল মাআদ ২/৯৩, ৯৬। সহীহ বুখারী ২/৫৭৯।
[৪২৬] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/২২।
[৪২৭] যাদুল মাআদ ২/৯৬।

রসে অভিষিক্ত হয়ে উঠল। এভাবে তারা দুর্ভেদ্য ইসলামী নেতৃত্বের মারকাযে পৌঁছে গেলেন। অথচ, একটু আগেও তারা প্রচণ্ড মার খেয়েছিলেন। রক্তাক্ত লড়াইয়ের এক তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে তখন তৃতীয় আরেকটি দল ছিল যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন। শুরু থেকেই তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তাদের প্রথম সারিতে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক, উমর বিন খাত্তাব, আলী ইবনে আবী তালিব প্রমুখ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম রা.। তারা ছিলেন মুজাহিদদের সামনের সারিতে। কিন্তু যখন তারা 'তাঁর পবিত্র সত্তা'- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ওপর বিপদের ঘনঘটা পুঞ্জীভূত হওয়ার আভাস পেলেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রথম সারিতে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরে রক্তক্ষয়ী লড়াই

যখন মুজাহিদ বাহিনীর অন্যান্য দল খালিদ বিন ওয়ালিদের নিয়ে আসা প্রবল ঝড়ের মুকাবেলা করে যাচ্ছিলেন; যখন মুশরিকদের সুযোগ-সন্ধানী যাঁতাকলে পড়ে তারা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘিরেও ঘনঘোর সংঘর্ষ আর সংঘাতের মৃত্যুখেলা চলছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যখন মুশরিকদের পাল্টা আক্রমণের ঝড়টি সবেমাত্র মুসলমানদের প্রতি ধেয়ে আসছিল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে মাত্র নয় জন মুজাহিদ লড়ে যাচ্ছিলেন। এরপর যখন তিনি মুসলমানদেরকে নিজের কাছে ডাক দিলেন, **আল্লাহর বান্দারা! তোমরা আমার কাছে চলে এসো!! আমি আল্লাহর রাসূল।** মুসলমানদের আগে তখন মুশরিকরাই তাঁর আওয়াজ শুনল এবং তাঁকে চিনে ফেলল। তারা তার দিকে ছুটে এসে প্রবল তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাদের ভারী দল নিয়ে তার ওপর এসে আপতিত হলো। অথচ, ততক্ষণে মুসলমানদের একজন সৈন্য এদিকে এসে পৌঁছতে পারেনি। সুতরাং, ধেয়ে আসা মুশরিকদের সেই বিশাল বাহিনী, আর মাত্র নয় জন মুজাহিদ সাহাবীর মাঝে শুরু হলো জীবন-মৃত্যুর লড়াই। এ ছিল এমন এক লড়াই যার পরতে পরতে প্রস্ফুটিত ছিল বীরত্ব ও সাহসিকতা, প্রেম ও ভালোবাসা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, উৎসর্গ ও বিসর্জনের নিরুপম চিত্রমালা।

ইমাম মুসলিম রহ. আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত জন আনসারী আর দু'জন কুরাইশী এই মোট নয় জন সাহাবী নিয়ে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। যখন মুশরিকরা প্রবল হামলার তুফান নিয়ে তাঁর ওপর আছড়ে পড়তে শুরু করল

তখন তিনি বললেন, **কে তাদেরকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে রাখবে আর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে? কিংবা সে জান্নাতে আমার একান্ত সাথী হবে?** তখন এক আনসারী এগিয়ে গেলেন এবং তাদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেলেন। এরপর তারা আবারও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একেবারে কাছে চলে এলো। তিনি বললেন, **কে তাদেরকে আমাদের থেকে ফিরিয়ে রাখবে আর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করবে? কিংবা সে জান্নাতে আমার একান্ত সাথী হবে?** তখন আরেকজন আনসারী এগিয়ে গেল এবং লড়াই করে শহীদ হয়ে গেল। এভাবে মোট সাত জন শাহাদাত বরণ করল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই কুরাইশী সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, **আমরা আমাদের সঙ্গীদের ওপর ইনসাফ করিনি।**[৪২৮] শহীদ সাত জনের সপ্তম জন ছিলেন সাহাবী আম্মারা ইবনে ইয়াযীদ ইবনে সাকান রা.। লড়াই করতে করতে যখন তার শরীর একেবারে চালনির মতো ঝাঁঝরা হয়ে গেল তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ হয়ে গেলেন।[৪২৯]

নবী জীবনের সবচেয়ে নাযুক মুহূর্ত

ইবনে সাকান শহীদ হওয়ার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মাত্র দুইজন মুহাজির সাহাবী রয়ে গেলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবু উসমান রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে দিনগুলিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তখনকার একটি যুদ্ধে তাঁর পাশে তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ও সা'দ (বিন আবী ওয়াক্কাস) [৪৩০]ব্যতীত আর কেউ ছিলেন না। প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে লক্ষ্য করে এটা ছিল নবী জীবনের সর্বাপেক্ষা নাযুক ও খতরনাক মুহূর্ত। অপরদিকে মুশরিকদের দিকে লক্ষ্য করে এটা ছিল একটি সোনালি সুযোগ। মুশরিকরাও এ সুযোগ অলসতাভরে দূরে ঠেলে দেয়নি। বরং তারা এর থেকে সর্বোচ্চ ফায়েদা নেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। যদিও তা ফলপ্রদ ছিল না।

তারা একযোগে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আক্রমণ করে বসল। তারা চাচ্ছিল চিরদিনের মতো তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে। উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস তাঁর প্রতি একটি পাথর ছুঁড়ে মারলে তা গিয়ে

---

[৪২৮] সহীহ মুসলিমঃ গাযওয়ায়ে উহুদ অধ্যায় ২/১০৭।

[৪২৯] এর সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের একটি দল রাসূলে কারীম সা.এর কাছে এসে পৌছে গেলেন। তারা আম্মারা রা. কে কাফেরদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। অতঃপর তারা তাকে রাসূলে কারীম সা. এর নিকট নিয়ে এলে তাঁর পা মুবারকের ওপর তিনি শুয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে তিনি রবের সান্নিধ্যে চলে যান। তখন তাঁর কপোল দেশ ছিল রাসূলে কারীম সা. এর কদম মুবারকের ওপর স্থাপিত (ইবনে হিশাম ২/৮১)।

[৪৩০] সহীহ বুখারী ১/৫২৭, ২/৫৮১।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধে আঘাত হানে। সঙ্গে সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনের ডানপাশের নীচের পাটির রুবাঈ দাঁতটি ভেঙে যায় এবং তাঁর অধর ফেটে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী এগিয়ে এসে তাঁর কপালে আঘাত করে তা ক্ষত করে দেয়। আরেক প্রেতাত্মা সওয়ার আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়া এগিয়ে আসে। সে তার তরবারি দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাঁধের ওপর এত জোরে আঘাত হানে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত সে ব্যাথা অনুভব করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁর পরনের লৌহবর্মদু'টি অক্ষত থাকে। তখন সে প্রথমটির মতো তাঁর চেহারায় দ্বিতীয় আরেকটি প্রচণ্ড আঘাত হানে এতে তার শিরস্কের দু'টি কড়া ভেঙে সেই চন্দ্রবদনে ঢুকে যায়। তখন সে মুখে বলতে থাকে, এই লও! আমি ইবনে কামিয়া (সবকিছু ভেঙে চুরমারকারীর ছেলে)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, **আল্লাহ তোকেও ভেঙে চুরমার করে দিন!** [৪৩১]

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আঘাতের পর আঘাতে (উহুদ প্রান্তরে) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান্দান শহীদ হয়, তাঁর মাথায় যখম সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হাতে রক্ত মুছে যাচ্ছিলেন আর মুখে বলছিলেন, **ঐ কওম কীভাবে সফল হবে যে তার নবীর চোহারা যখম করে দিয়েছে, আর তাঁর দাঁত ভেঙে দিয়েছে? অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন!** তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. আপনার কোনো ইখতেয়ার নেই; হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দিবেন। কারণ, তারা জালেম। [সূরা আলে ইমরান : ১২৮][৪৩২]

তাবরানীর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি তখন বলেছিলেন, **ঐ কওমের ওপর আল্লাহর কঠিন গযব নেমে আসবে যে কওম তার নবীর চেহারা রক্তাক্ত করেছে।** এরপর কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন, **হে আল্লাহ আপনি আমার কওমকে মাফ করে দিন! কেননা তারা জানে না।**[৪৩৩] সহীহ মুসলিমে রয়েছে তিনি বলে উঠলেন, হে

---

[৪৩১] আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও রাসূলের দুআ কবুল করেছেন। আবু আয়েয থেকে বর্ণিত, ইবনে কামিয়া নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ছাগলের খোঁজে বের হয়ে একটি পাহাড় চূড়ায় গিয়ে পেয়ে যায়। পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছলে এক পাহাড়ী বকরী তাকে আক্রমণ করে। এটা তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে পাহাড়-চূড়া থেকে নীচে ফেলে দেয় (ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩) তাবারানী বলেন, আল্লাহ তাআলা পাহাড়ী বকরীটিকে তার ওপর চড়াও করে দেন। ফলে সে তাকে শিং দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৬)।

[৪৩২] সহীহ বুখারী ২/৫৮২। সহীহ মুসলিম ২/১০৮।

[৪৩৩] ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩।

আমার রব তুমি আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও, কেননা তারা জানে না।[৪৩৪] আল্লামা কাযী ইয়াযের 'শিফা' নামক কিতাবে রয়েছে তিনি বলেন, **হে আল্লাহ আপনি আমার কওমকে হেদায়াত দিয়ে দিন, কেননা তারা জানে না।**[৪৩৫]

সন্দেহ নেই, মুশরিকরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই দৌড়ে এসেছিল। কিন্তু দুই কুরাইশ সাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. ও তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. অভিনব বীরত্ব আর সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মুকাবিলা করেন। এ কারণে দেখা যায় মাত্র দু'জন লোকই তাদের হীন উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। তারা ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ দুই তীরন্দায; যার ফলে অবিরাম তীর বৃষ্টি বর্ষণ করে মুশরিকদের দলটিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হন।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের তূণ দিয়ে বললেন, **আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য কুরবান হোন, তুমি তীর মারতে থাকো।**[৪৩৬] রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথার দ্বারাই সা'দ রা. এর যোগ্যতার পরিধি উপলব্ধি করা যায়। কেননা, একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কারও ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ পিতা-মাতাকে একত্রে উৎসর্গ করেননি।[৪৩৭]

অপরদিকে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা. এর ঘটনা নাসাঈ শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। জাবের রা. উহুদ যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ছুটে আসার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে আনসার সাহাবীদের ছোট একটি দল ছিল। এমন সময় মুশরিকরা তাঁর দিকে ছুটে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **এদেরকে কে প্রতিহত করতে পারবে?** তালহা রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমি। এরপর জাবের রা. আনসারদের একের পর এক সামনে যাওয়া এবং শাহাদাত বরণ করার ঘটনা বর্ণনা করেন। যেমনটি আমরা মুসলিম শরীফের বরাতে আগে বর্ণনা করেছি। যখন আনসারদের সবাই শহীদ হয়ে গেল তখন তালহা রা. অগ্রসর হলেন। জাবের রা. বলেন, তালহা রা. সামনে এগিয়ে একাই এগারো জনের সমান লড়াই করলেন। এরপরে তার হাতে তরবারির এমন এক আঘাত লাগল যে, হাতের আঙ্গুলগুলি কেটে গেল। তখন আচমকা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'হাসসি' (

---

৪৩৪ সহীহ মুসলিমঃ গাযওয়ায়ে উহুদ অধ্যায় ২/১০৮।
৪৩৫ শিফা বিতা'রীফি হুকূকিল মুস্তফা ১/৮১।
৪৩৬ সহীহ বুখারী ১/৪০৭,২/৫৮০,৫৮১।
৪৩৭ প্রাগুক্ত।

যা ব্যাথার সময় বলা হয়)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যদি তুমি এ স্থানে 'বিসমিল্লাহ' বলতে, তবে ফেরেশতারা তোমাকে উঠিয়ে নিত, আর মানুষ তোমার দিকে চেয়ে থাকত**। জাবের রা. বলেন, এরপর আল্লাহ তাআলা মুশরিকদেরকে ফিরিয়ে দেন।[৪৩৮] ইকলীলে হাকেম থেকে বর্ণিত যে, উহুদের দিন তাঁর গোটা শরীরে উনচল্লিশ বা পঁয়ত্রিশটি যখম হয় এবং তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়।[৪৩৯]

কায়স ইবনে আবী হাযেম রা. থেকে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি তালহার হাত অবশ ছিল। তিনি সেই অবশ হাত দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মুশরিকদের থেকে হেফাযত করেছেন।[৪৪০]

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ র.বর্ণনা করেন,রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালহা রা. সম্পর্কে বলেছেন, **যে ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে ভ্রাম্যমান কোনো শহীদকে দেখতে চায়, তবে সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে।** [৪৪১]

আবু দাউদ ত্বয়ালেসী আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবু বকর রা.যখন উহুদের কথা স্মরণ করতেন, তখন বলতেন, পুরো সেই দিনটি ছিল তালহার জন্য। [৪৪২]

আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁর সম্পর্কে আরও বলেছেন,

يَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ وَجَبَتْ.... لَكَ الْجِنَانُ وَبُوِّئْتَ الْمَهَا الْعِيْنَ [443]

' হে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ! তোমার জন্য অসংখ্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে। আর তুমি নিজের ঘরে 'হুরে আইন' এর ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছ!

সেই ঘনঘোর অন্ধকার ঘেরা বিব্রতকর মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য তাঁর অদৃশ্য সাহায্য অবতীর্ণ করলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি উহুদের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি। তার দু'পাশে সাদা কাপড়ে দু'জন মুজাহিদ প্রচণ্ড যুদ্ধ করছিলেন। আমি তাদেরকে সেদিনের আগে কোনোদিন দেখিনি পরেও আর কোনোদিন দেখিনি। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তারা দু'জন ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল আ.।[৪৪৪]

---

[৪৩৮] ফতহুল বারী ৭/৩৬১। সুনানে নাসাঈ ২/৫২।
[৪৩৯] প্রাগুক্ত ৭/৩৬১।
[৪৪০] সহীহ বুখারী ১/৫২৭,৫৮১।
[৪৪১] তিরমিযীঃ মানাকিব, হাদীস নং ৩৭৪০। ইবনে মাজাহঃ মুকাদ্দমা হাদীস নং ১২৫।
[৪৪২] ফাতহুল বারী ৭/৩৬১।
[৪৪৩] মুখতাসারু তারীখি দিমাশক ৭/৮২।
[৪৪৪] সহীহ বুখারী ২/৫৮০। এমনই রয়েছে সহীহ মুসলিম শরীফেও ঃ ফাযাইল ৪/১০৮২, হাদীস নং ৪৬,৪৭।

রাসূলের পাশে সাহাবায়ে কেরামের ভিড়

প্রচণ্ড দুঃখময় এ ঘটনাগুলি মাত্র কয়েকটি মুহূর্তে চোখের পলকে ঘটে গিয়েছিল। কেননা বড় বড় ও নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম যারা যুদ্ধের সময় প্রাথমিক কাতারগুলিতে ছিলেন তারা যুদ্ধের পট পরিবর্তন দেখা মাত্রই কিংবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আওয়াজ শোনা মাত্রই দ্রুত ছুটে আসতেন; যাতে করে প্রিয় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে দুশমনের একটি সামান্য আচড়ও লাগতে না পারে। অথচ তারা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌছলেন ততক্ষণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারকের কয়েক স্থানে যখম সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রহরায় নিয়োজিত ছয় জন আনসারী ইতোমধ্যেই শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন এবং সপ্তমজনও মৃত্যুর দুয়ারে উপস্থিত ছিলেন। আর বাকি দুই কুরাইশী মুজাহিদ সা'দ ও তালহা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে রক্ষা করতে প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর যখন তারা সেখানে পৌছে গেলেন তখন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে তাদের শরীর ও হাতিয়ারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দিলেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করার সবরকমের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এ সকল সাহাবীগণের মধ্যে সর্ব প্রথম যিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন হিজরতের রাতে গুহায় তাঁর একান্ত বন্ধু হযরত আবু বকর রা.।

ইবনে হিব্বান তার সহীহতে আয়েশা রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক রা. বলেছেন : উহুদের দিন সকল লোকজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে সরে যায়। অতঃপর সবার আগে আবার তাঁর কাছে যে ফিরে আসে সে ছিলাম আমি। আমি তাঁর সামনে এক ব্যক্তিকে দেখলাম প্রাণপণ যুদ্ধ করে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করছিল। আমি বললাম, তুমি তালহা হও! তোমার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক, তুমি তালহা হও! তোমার ওপর আমার মা-বাবা কুরবান হোক (অর্থাৎ যেহেতু আমি এই পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি এ জন্য আমার হৃদয়ের তামান্না ছিল যদি আমার কওমের কেউ হয় তবে তা খুশির ব্যাপার হবে)।[৪৪৫] খানিক বাদেই আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. আমার কাছে এসে পৌছলেন। আমি আবু উবাইদাকে দেখলাম যেন পাখির মতো উড়ে আসছিলেন তিনি। তখন আমরা উভয়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তালহা সেখানে ভূপাতিত হয়ে আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমাদের ভাইকে সামলে নাও! সে (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে**। আমরা দেখলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকেও ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে এবং শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া চোখের নীচের

---

[৪৪৫] তাহযীবু তারীখি দিমাশ্ক ৭/৭৭।

কপোল দেশে ঢুকে গিয়েছিল। আমি তা খোলার জন্য গেলে আবু উবাইদা রা. বললেন, আবু বকর! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি আমাকে খুলতে দিন! অতঃপর তিনি একটি কড়া মুখে কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে টানতে শুরু করলেন, যাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কষ্ট না হয়। শেষে সেটি বের করে ফেললেন। কিন্তু এতে তার নীচের পাটির একটি দাঁত পড়ে গেল। তখন আমি দ্বিতীয়টি তুলতে গেলে আবু উবাইদা রা. আবার বললেন, আবু বকর আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে তুলতে দিন! এরপর দ্বিতীয় কড়াটিও তিনি আস্তে আস্তে বের করে নিলেন; কিন্তু তার নীচের পাটির আরও একটি দাঁত পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমাদের ভাইকে সামলে নাও; সে (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে!** তিনি বলেন, তখন আমরা তালহাকে দেখার জন্য তার দিকে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তার গায়ে দশটারও বেশি আঘাত রয়েছে।[৪৪৬] আর 'তাহযীবে তারীখে দিমাশক'[৪৪৭] নামক কিতাবে রয়েছে, আমরা তার কাছে এসে দেখলাম তার শরীরে তীর, তরবারি আর বর্শার কমবেশি সত্তরটি আঘাত রয়েছে। তার আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল। আমরা তাকে কোনো রকম সুস্থ করার চেষ্টা করি।

এই চরম দুঃসময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে বীর মুজাহিদ সাহাবায়ে কেরামের একটি দল এসে পৌঁছল। তাদের মধ্যে ছিলেন আবু দুজানা, মুসআব ইবনে উমাইর, আলী ইবনে আবী তালিব,[৪৪৮] সাহল ইবনে হানীফ, আবু সাঈদ খুদরী রা. এর পিতা মালেক ইবনে সিনান, উম্মে আম্মারাহ নুসাইবা বিনতে কা'ব মাযেনিয়্যা, কাতাদা বিন নুমান, উমর ইবনুল খাত্তাব, হাতেব বিন আবু বালতা'আ ও আবু তালহা প্রমুখ রা.।

মুশরিকদের হামলার প্রকোপ বৃদ্ধি

মুশরিকদের সংখ্যা যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ওপর তাদের হামলার প্রকোপ ও প্রচণ্ডতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গর্তে পড়ে গেলেন। এটা ছিল সেই গর্ত আবু আমের ফাসেক যেটি এ ধরনের একটি দুর্ঘটনার জন্য আগ থেকেই

---

[৪৪৬] যাদুল মাআদ ২/৯৫।

[৪৪৭] ৭/৭৮।

[৪৪৮] আলী ইবনে আবী তালিব রা. বলেন, উহুদের দিন যখন লোকজন রাসূলে কারীম সা. এর চারপাশ থেকে চলে গেল তখন আমি নিহতদের মাঝে রাসূলে কারীম সা. কে খুঁজতে লাগলাম। সেখানে তাকে না পেয়ে আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি পালিয়ে যেতে পারেন না। অথচ তাকে আমি ময়দানেও দেখছি না। কিন্তু আল্লাহ সম্ভবত আমাদের কৃতকর্মের কারণে চরম ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আর এ কারণে তাঁর নবীকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। তাহলে এখন লড়াই করে আত্মাহুতি দিয়ে আর কী ফায়েদা হবে? তখন আমি আমার তরবারির বাট ভেঙে ফেলি। এরপর আমি মুসলমানদের ওপর গিয়ে পড়লে তারা আমার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিলো। আর অমনিতে আমি তাদের মাঝে রাসূলে কারীম সা. এর সামনে পড়ে যাই। মুসনাদে আবী ইয়া'লা ১/৪১৬, হাদীস নং ৫৪৬।

খুঁড়ে রেখেছিল। সেখানে পড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পা মচকে গেল। আলী রা. তাড়াতাড়ি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে ফেললেন এবং তালহা রা. (যিনি নিজেও চরম আহত ছিলেন) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কোলে জড়িয়ে ধরলেন। এতে করে তিনি দাঁড়াতে সক্ষম হলেন। নাফে' ইবনে জুবাইর বলেন, আমি এক মুহাজির সাহাবীকে বলতে শুনেছি, আমি উহুদ যুদ্ধে শরীক ছিলাম। এ যুদ্ধে আমরা চারদিক থেকে শুধুই তীর বৃষ্টি দেখছিলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঠিক মাঝখানে। কিন্তু প্রত্যেকটা তীর তাঁর থেকে ফিরিয়ে রাখা হচ্ছিল। আমি আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরীকে সেদিন বলতে শুনেছি, মুহাম্মাদ কোথায় আমাকে দেখিয়ে দাও! আজ হয়তো সে বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার পাশেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তখন কেউ ছিল না। সে তাঁকে কিছু না বলে চলে যায়। পরে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা যখন জানতে পারে তখন তাকে ভর্ৎসনা করে। সে বলে, আল্লাহর কসম! আমি তাকে দেখিনি। আল্লাহর কসম তাকে আমাদের থেকে মাহফুয রাখা হয়েছে। এরপর আমরা চারজন মিলে দৃঢ় শপথ করে তাঁকে হত্যা করার জন্য বের হলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারিনি।[৪৪৯]

তালহা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুক উঁচু করে তাকে ঢাল বানিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দুশনের নিক্ষিপ্ত তীরগুলিকে ফিরিয়ে রাখছিলেন। আনাস রা. বলেন, উহুদের দিন যখন সবাই পরাজয় বরণ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে দূরে চলে গেল তখন আবু তালহা রা. একটি ঢাল নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে রয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠতম ও অভিজ্ঞ তীরন্দায। সেদিন তিনি দুই কিংবা তিনটি ধনুক ভেঙে ফেলেন। তখন তালহা রা.এর পাশ দিয়ে একটি লোক তূনীর নিয়ে যাচ্ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এটা আবু তালহাকে দিয়ে দাও। তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে দুশমনের অবস্থা দেখার জন্য মাথা উত্তোলন করতেন। আর তখন আবু তালহা রা. তাঁকে বলতেন, আমার মাতা-পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি মাথা উঁচু করবেন না! দুশমনের তীর আপনাকে এসে আঘাত করতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের আগেই রেখে দিয়েছি।[৪৫০]

আনাস রা. আরও বর্ণনা করেন, আবু তালহা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে একটি মাত্র ঢাল দ্বারাই দুশমনের তীর বৃষ্টি প্রতিহত করছিলেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দায। এ কারণে তিনি যখনই কোনো তীর

---

[৪৪৯] যাদুল মাআদ ২/৯৭।
[৪৫০] সহীহ বুখারী ২/৫৮১।

নিক্ষেপ করতেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঁকি দিয়ে দেখতেন তা কোথায় গিয়ে আঘাত হানে।[৪৫১]

আবু দুজানা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। তার পিঠে দুশমনের একটার পর একটা তীর এসে বিঁধতে লাগল কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিকার, অবিচল।

সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআ রা. উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাসের- যে খবীস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান্দান মুবারক শহীদ করে দিয়েছিল- পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তরবারির এক আঘাতে তার মাথা শরীর থেকে আলাদা করে ফেললেন। এরপর তার ঘোড়া ও তরবারি নিয়ে নিলেন। কিন্তু সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. এর মনের একান্ত তামান্না ছিল তাঁর এই ভাই উতবাকে হত্যা করা। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণ হলো না। এ ক্ষেত্রে সফল হলেন হাতেব রা.।

সাহল ইবনে হুনাইফ রা. ছিলেন অন্যতম দক্ষ তীরন্দায। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে শাহাদাতের ওপর বাইয়াত হলেন এবং মুশরিকদেরকে বিতাড়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তীর নিক্ষেপ করছিলেন। কাতাদা বিন নুমান রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ধনুক দ্বারা এত তীর নিক্ষেপ করলেন যে, তার ধনুকের এক কোণা ভেঙে গেল। তখন কাতাদা বিন নুমান রা. তা নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন। আর ঠিক এ সময় তার চোখে আঘাত লেগে চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে চেহারার ওপর ঝুলে পড়ে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাত মুবরক দিয়ে তাকে স্বস্থানে রেখে দিলেন। পরবর্তীতে দুই চোখের মধ্যে এটাকেই বেশি সুন্দর লাগত এবং এটার দৃষ্টিশক্তিও বেশি ছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. সেদিন লড়াই করতে করতে মুখে আঘাত খেলেন। তাতে তার সামনের দাঁত পড়ে গেল। তার শরীরে মোট কুড়িটি কিংবা তারও বেশি যখম হয়েছিল। কয়েকটি আঘাত খেয়েছিলেন পায়ে, যার ফলে তিনি চিরদিনের মতো লেংড়া হয়ে গেলেন।

আবু সাঈদ খুদরীর. এর পিতা মালিক বিন সিনান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চন্দ্রবদন থেকে রক্ত চুষে নিয়ে গিলে ফেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **থুথু ফেলে দাও!** তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি থুথু ফেলব না। অতঃপর আবার যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোককে দেখতে চায় সে যেন তাকে দেখে নেয়।** এরপর তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

---

[৪৫১] প্রাগুক্ত ১/৪০৬।

উম্মে আম্মারা রা. সেদিন যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ মুসলমানদের মাঝে তিনি ইবনে কামিয়ার মুখামুখি হন। ইবনে কামিয়া তার কাঁধের ওপর এতটা জোরে আঘাত করে যে, বিশাল ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে যায়। তিনিও ইবনে কামিয়াকে তার তরবারি দ্বারা কতগুলি আঘাত করলেন। কিন্তু সে একত্রে দু'টি বর্ম পরা ছিল যার কারণে রেহাই পায়। উম্মে আম্মারা লড়াই করে মোট বারো জায়গায় আহত হলেন।

সাহাবী মুসআব ইবনে উমাইর রা. ইবনে কামিয়া ও তার সঙ্গীদের হাত থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেফাযত করার জন্য চরম বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল তার হাতে। তারা তার ডান হাতে আঘাত করে তা কেটে ফেলল। তখন তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা উঁচিয়ে ধরেন এবং কাফেরদের ঢলের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর তার বাম হাতও কেটে ফেলা হয়। এরপর তিনি বসে গিয়ে তার বুক ও ঘাড় দ্বারা পতাকা উঁচু করে ধরে রাখেন। যালিমরা তখন তাকে একেবারে শহীদ করে দেয়। তাকে হত্যা করেছিল ইবনে কামিয়া। কিন্তু মুসআব ইবনে উমাইর রা. এর আকৃতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কিছুটা মিল থাকার কারণে সে তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেবেছিল। যার কারণে তাকে হত্যা করার পর সে দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং ঘোষণা দিতে থাকে 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে'।[৪৫২]

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ভুয়া খবর রটানো; যুদ্ধে এর প্রভাব

মুহূর্তে তার এ ঘোষণা মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। এটা ছিল চরম নাযুক মুহূর্ত যখন এক অগণন সংখ্যার সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় ও মন দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যায়। তাদের প্রাণশক্তি স্তিমিত হয়ে যায়। দেখতে দেখতে মুসলিম বাহিনীর কাতারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে চরম ইন্তিশার ও বিশৃঙ্খলা। চতুর্দিকে অস্থিরতা ও ছত্রভঙ্গের বাজার সরগরম হয়ে ওঠে। তবে এতে মুশরিকদের হামলার প্রকোপ কিছুটা কমে আসে। কারণ তারা সুনিশ্চিত ধরে নিয়েছিল যে, এখন তারা তাদের লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছে গেছে। এ কারণে তাদের অনেকেই আক্রমণের পরিবর্তে নিহত মুজাহিদদের লাশ কাটা-ছেঁড়া ও বিকৃত করতে শুরু করে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধারাবাহিক যুদ্ধ পরিচালনা ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ

মুসআব ইবমে উমাইর রা. এর শাহাদাতের পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর পতাকা তুলে দিলেন আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর হাতে। অতঃপর তিনি ঘোর যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত

---

[৪৫২] দেখুন ইবনে হিশাম ২/৭৩,৮০-৮৩। যাদুল মাআদ ২/৯৭।

সাহাবায়ে কেরামও রা. তখন তাদের বীরত্বের পরম বাহার আর নৈপুণ্য দেখাতে থাকেন। তারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন এবং দুশমনের হামলা প্রতিহত করছিলেন।

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের হাতে পড়া সাহাবায়ে কেরামের দিকে পথ করে নিতে সক্ষম হলেন এবং তাদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সাহাবী কা'ব বিন মালেক রা. তাকে সর্বপ্রথম দেখেই চিনে ফেললেন। তিনি সুউচ্চ ঘোষণা দিয়ে উঠলেন, হে মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এইতো এখানে! তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দিলেন, যাতে মুশরিকরা তার অবস্থান জানতে না পারে। কিন্তু ইতোমধ্যেই তার এ আওয়াজ মুসলমানদের কর্ণকুহরে গিয়ে আলোড়ন তুলে ফেলেছিল। তারা ছুটে এলো চারদিক থেকে। দেখতে না দেখতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে প্রায় ত্রিশজন সাহাবী সমবেত হয়ে গেলেন।

এই সমাবেশের পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে পাহাড়ের ঘাঁটি তথা মুসলিম শিবিরের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু এটা যেহেতু মুশরিকদের সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার মতো ছিল এ জন্য মুশরিকদের চড়াও অব্যাহত ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সকল আক্রমণের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পথ করে নিচ্ছিলেন। এতে তাদের আক্রমণ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু ইসলামের জেগে ওঠা বলীয়ান সিংহদলের সাহস ও শাহযূরীর সামনে তাদের ব্যর্থতার চিত্রই কেবল ভেসে উঠছিল।

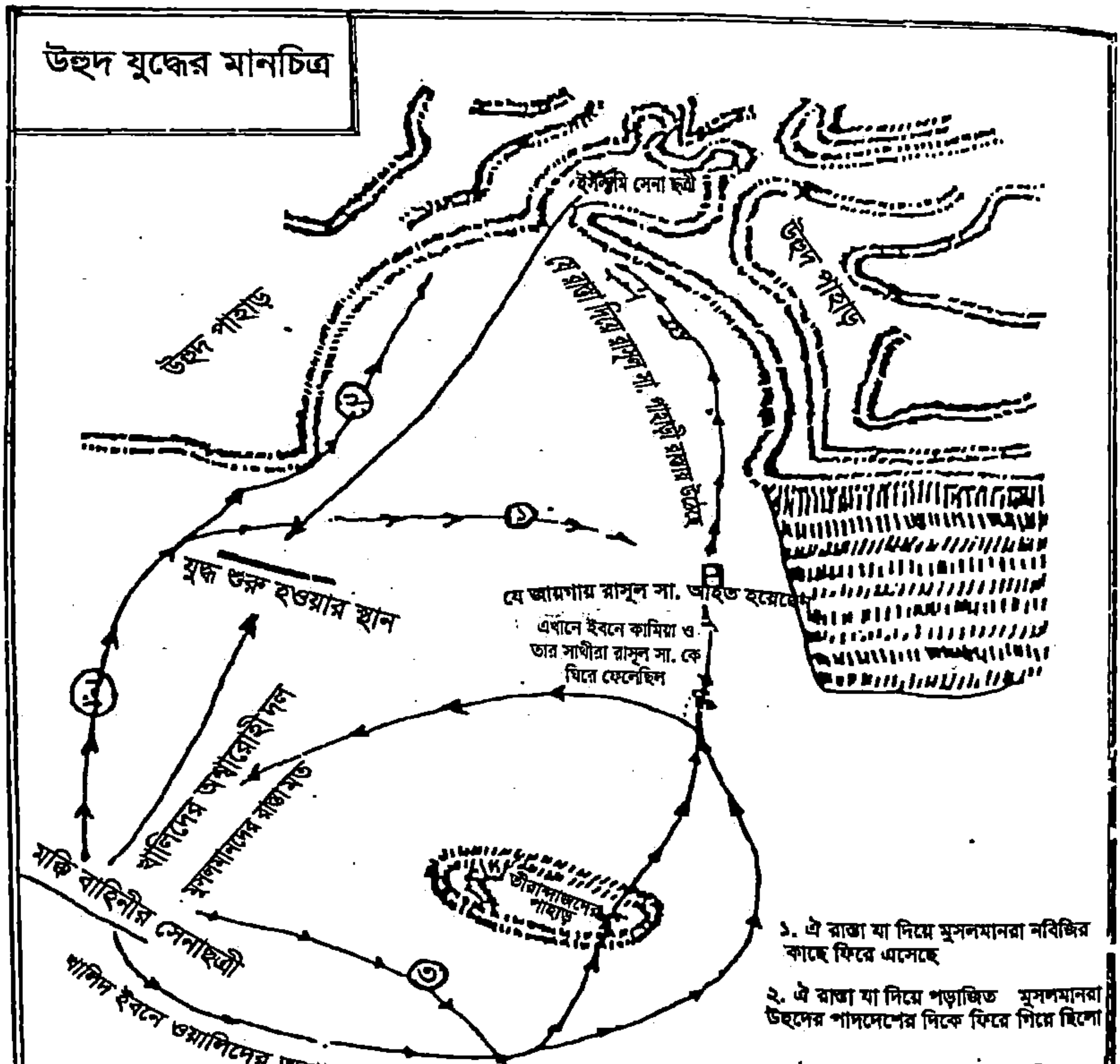
এ সময় এক মুশরিক ঘোড়সওয়ার উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগীরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে এ কথা বলতে বলতে অগ্রসর হলো, হয়তো তুমি বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুকাবিলা করার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে তার ঘোড়া একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। তখন হারেস ইবনে সিম্মাহ রা. অগ্রসর হয়ে তার পায়ে সজোরে আঘাত করে তাকে বসিয়ে দিলেন। এরপর তাকে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা করে তার হাতিয়ার নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এসে মিলিত হলেন।

কিন্তু মক্কার আরেক ঘোড়সওয়ার আব্দুল্লাহ ইবনে জাবের যেন উড়ে এসে হারেস ইবনে সিম্মাহর ওপর হামলা করে বসে এবং তাঁর কাঁধে সজোরে তরবারি হানে। মুসলমানগণ তাড়াতাড়ি তাকে উঠিয়ে আনেন। অপরদিকে লাল ফিতা ওয়ালা মুজাহিদ সাহাবী আবু দুজানা রা. আব্দুল্লাহ ইবনে জাবেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর তরবারি হানেন। তরবারির আঘাতে ইবনে জাবেরের মাথা উড়ে যায়।

এই ঘনঘোর সংঘাত আর সংঘর্ষঘেরা পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর তন্দ্রা ঢেলে দেন। এটা ছিল তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহ। কুরআনে কারীমেও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

সাহাবী আবু তালহা রা. বলেন, উহুদ যুদ্ধে যাদের ওপর আল্লাহ তাআলা তন্দ্রা ঢেলে দেন আমিও ছিলাম তাদের একজন। আমার এত তন্দ্রা এসেছিল যে, বার বার আমার হাত থেকে তরবারি পড়ে যাচ্ছিল। একবার পড়ে যেত তখন আমি তা উঠিয়ে নিতাম.......... আবার পড়ে যেত আর আমি আবার উঠিয়ে নিতাম....।[৪৫৩]

এভাবে শুজাআত ও বীরত্বের চরম পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করে ছোট এ দলটি সুবিন্যস্তভাবে পাহাড়ের ঘাঁটিতে নিজেদের মারকাযে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। অবশিষ্ট সৈন্যদের জন্যও ধীরে ধীরে পথ তৈরি হয়ে যায়। আর তারা একের পর এক এখানে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হতে থাকে। এভাবে খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকুশলতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রণকুশলতার সামনে বড় অসহায় হয়ে পড়ে।



[৪৫৩] সহীহ বুখারী ২/৫৮২।

উবাই ইবনে খলফের হত্যা

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন উবাই ইবনে খলফ এ কথা বলতে বলতে তার দিকে অগ্রসর হয়, মুহাম্মাদ কোথায়? আজ হয়তো সে বাঁচবে নতুবা আমি বাঁচব। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে থামিয়ে দিব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমরা তাকে আসতে দাও!** অতঃপর যখন সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে এলো, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারেস ইবনে সিম্মাহ রা. এর কাছ থেকে একটি ছোট বর্শা হাতে উঠিয়ে নিলেন। সেটা হাতে নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামান্য একটু ঝাঁকুনি দিলেন। এতে আশপাশের লোকজন এভাবে উড়ে বহুদূরে সরে গেল যেভাবে উট শরীর ঝাঁকুনি দিলে তার গায়ের মশা-মাছি দূরে সরে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে তার কণ্ঠনালীর পাশ দিয়ে সামান্য একটু জায়গা ফাঁকা দেখতে পেলেন। তিনি হাতের বর্শাটি সেদিকেই ছুঁড়ে মারেন। আঘাতে সে কয়েক বার ঘোড়া থেকে ঝুলে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যখন সে কুরাইশ শিবিরে ফিরে গেল তখন তার গলায় বড় কোনো যখমের চিহ্ন ছিল না। কোনো রক্তও বের হয়েছিল না। কিন্তু সে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। তারা বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কী বাজে বকছ? তোমার তো কিছুই হয়নি! উবাই বলল : সে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কায় আমাকে একদিন বলেছিল, **আমি তোমাকে হত্যা করব**।[৪৫৪]সেদিন থেকেই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, যদি সে আমার প্রতি সামান্য থুথু নিক্ষেপ করত, তবুও আমি মরে যেতাম। এরপর মক্কায় ফেরার পথে 'সারিফ' নামক স্থানে আল্লাহর এ দুশমন মারা যায়। উরওয়া থেকে আবু আসওয়াদের একটি বর্ণনা ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের তার পিতা থেকে বর্ণনায় পাওয়া যায়, জীবনের শেষদিকে সে গাধার মতো বিকৃত চিৎকার করত এবং বলত, ঐ সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার যতটা কষ্ট হচ্ছে যদি যুল মাযাজের সমস্ত লোকদের সেই কষ্ট হতো তবে তারা সবাই মরে যেত!![৪৫৫]

---

[৪৫৪] মূল ঘটনা হলো, রাসূলে কারীম সা. যখন মক্কায় ছিলেন তখন এই উবাই রাসূলে কারীম সা. এর কাছে এসে বলত, মুহাম্মাদ! আমার আউদ নামের একটা ঘোড়া আছে। এটাকে আমি প্রতিদিন তিন সা' দানা খাইয়ে মোটাতাজা করছি। এর পিঠের ওপর চড়ে আমি তোমাকে হত্যা করবো দেখো! রাসূলে কারীম সা. তখন বলতেন, **বরং আমি তোমাকে হত্যা করব ইনশা- আল্লাহ।**

[৪৫৫] ইবনে হিশাম ২/৮৪। মুসতাদরাকে হাকিম ২/৩২৭।

তালহা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঠিয়ে নিলেন

পাহাড়ের দিকে যাওয়ার পথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে একটি বিশাল পাথর সামনে পড়ল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটার ওপরে উঠে পার হতে চাইলেন কিন্তু পারলেন না। কারণ একদিকে তিনি তো খানিকটা ভারী হয়ে গিয়েছিলেন অপরদিকে তার শরীরে ছিল দুইটি বর্ম। তাছাড়া তিনি মারাত্মক রকমের আহত হয়েছিলেন। তখন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রা. তাঁর নীচে বসে গেলেন এবং তিনি তালহার কাঁধে আরোহণ করলেন। তখন পাথরের উচ্চতা তাঁর পা বরাবর হয়ে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তালহা (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে।**[৪৫৬]

মুশরিকদের সর্বশেষ হামলা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছে স্থির হলেন তখন মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর সর্বশেষ হামলা করে বসল। ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে উঠে এলেন তখন কুরাইশের একটি দল পাহাড়ে উঠতে লাগল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবু সুফিয়ান ও খালিদ বিন ওয়ালিদ। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করলেন, **হে আল্লাহ! তারা যেন আমাদের ওপর আসতে না পারে।** তখন উমর বিন খাত্তাব রা. ও তাঁর সঙ্গে কয়েকজন মুহাজির সাহাবী মিলে তাদেরকে পাহাড় থেকে নামিয়ে দিলেন।[৪৫৭]

'মাগাযিউল আমাবী' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মুশরিকরা পাহাড়ের ওপর উঠে এসেছিল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, **তাদেরকে হটিয়ে দাও!** সা'দ রা. বললেন, আমি একা কীভাবে তাদেরকে হটিয়ে দিব? কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কথাটি তিনবার বললেন। তখন তিনি তূণীর থেকে একটি তীর বের করে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লে সে সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। তিনি বলেন, এরপর আমি আবার তীর নিলাম। আমি তাকে চিনতাম। সেটা দ্বিতীয় আরেকজনের প্রতি ছুঁড়ে মারলে সেও জায়গায় কুপোকাত হয়ে যায়। তখন তারা সবাই সেখান থেকে নেমে যায়। তখন আমি বললাম, এটা একটি বরকতময়

---

[৪৫৬] ইবনে হিশাম ২/৮৬। তিরমিযী: জিহাদ পর্ব হাদীস নং ১৬৯২, মানাকিব হাদীস নং ৩৭৩৯, মুসনাদে আহমদ ১/১৬৫, হাকিম এটাকে সহীহ অভিহিত করেছেন ৩/৭৪, যাহাবীরও একই মত।
[৪৫৭] ইবনে হিশাম ২/৮৬।

তীর। এরপর সেটাকে আমার নিজস্ব তূণীরের মধ্যে রেখে দিলাম। ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত সেটা সা'দের কাছেই ছিল। অতঃপর সেটা তাঁর সন্তানদের হাতে চলে যায়।[৪৫৮]

শহীদানের অঙ্গ-বিকৃতি

এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সর্বশেষ আক্রমণ। যেহেতু তারা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত কিছু জানত না; বরং তাদের মোটামুটি একটা স্থূল ধারণা ছিল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তারা হত্যা করতে পেরেছে- এ কারণে তখন তারা নিজস্ব শিবিরে চলে গেল এবং মক্কার দিকে ফেরার পথ ধরার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আর ঠিক তখন তাদের কিছু পুরুষ ও নারীরা মুসলিম শহীদানের লাশগুলির অঙ্গ বিকৃত করতে শুরু করল। তারা তাদের নাক, কান ও পুরুষাঙ্গ কেটে দিতে লাগল। পেট ফুঁড়ে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে দিতে শুরু করল। হিন্দা বিনতে উতবা হামযার পেট চিরে কলিজা বের করে চিবাতে লাগল। কিন্তু গিলতে না পেরে ফেলে দিলো। কর্তিত নাক ও কান দ্বারা কানের দুল ও গলার হার বানালো।[৪৫৯]

শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য মুসলিম মুজাহিদদের প্রস্তুতি

যুদ্ধের এই অন্তিম মুহূর্তে উহুদ প্রান্তরে এমন দু'টি ঘটনা ঘটে গেল যার দ্বারা বোঝা যায় মুসলিম মুজাহিদদের জিহাদের প্রতি কতখানি প্রস্তুতি ছিল এবং আল্লাহর পথে প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কতটা উদগ্রীব ও উদ্দীপ্ত ছিলেন:

এক. কা'ব বিন মালিক রা. বলেন, যে সকল মুসলমান ঘাঁটি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন আমি ছিলাম তাদের একজন। তখন আমি থমকে দাঁড়ালাম এবং সামনে অগ্রসর হলাম। দেখলাম ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক দৈত্যকায় মুশরিক শহীদানের লাশের সারির মধ্য দিয়ে চলছিল এবং মুখে বলছিল, যবাই করা বকরীর মতো তাদেরকে কীমা করতে থাকো। হঠাৎ দেখলাম একজন মুসলিম সৈন্য তার পথ ধরে অপেক্ষা করছিল। তখন আমি কৌতূহল বশত তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। আমি দু'জনের প্রতি তাকিয়ে দেখলাম গঠন-প্রকৃতি আর অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে কাফের সৈন্যটাই এগিয়ে ছিল। আমার চোখের সামনেই দু'জনের মাঝে লড়াই শুরু হলো। খানিকবাদেই মুসলিম সৈন্যটি প্রতিপক্ষের মাথার ঠিক মাঝ বরাবর এত জোরে তরবারি বসিয়ে দিলো যে, তরবারি তার নিতম্ব দিয়ে বেরিয়ে গেল। সোজা দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে পড়ে গেল। এরপর

---

[৪৫৮] যাদুল মাআদ ২/৯৫।
[৪৫৯] ইবনে হিশাম ২/৯০।

মুসলিম সৈন্যটি তার মুখ থেকে মুখোশ খুলে ফেলে বলল, কী হে কা'ব? কেমন দেখলে? আমি আবু দুজানা! [৪৬০]

দুই. যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে কিছু মুমিন নারী রণাঙ্গনে এসে উপস্থিত হন। আনাস রা. বলেন, আয়েশা বিনতে আবী বকর ও উম্মে সুলাইম রা. কে দেখলাম তারা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত হয়ে পিঠের ওপর পানিভর্তি মশক নিয়ে মুজাহিদদের মাঝে বিতরণ করছিলেন। মশক খালি হয়ে গেলে আবার ভরে এনে আবারও পান করাচ্ছিলেন।[৪৬১] উমর রা. বলেন, আনসারদের উম্মে সালীত উহুদের দিন আমাদেরকে মশক ভরে পানি পান করাচ্ছিলেন।[৪৬২]

তাদের মধ্যে উম্মে আয়মনও রা. ছিলেন। যখন তিনি মুসলমানদের বিপর্যয় ও ময়দান ছেড়ে পালিয়ে মদীনার দিকে ছুটতে দেখলেন তখন তাদের মুখের দিকে মাটি ছুঁড়ছিলেন আর বলছিলেন 'এই নাও সুতো কাটার যন্ত্র; (যা ঘরে বসে বসে মহিলাদের কাজ ছিল) আর আমাদেরকে তরবারি দাও! এরপর তিনি রণাঙ্গনের দিকে ছুটে গেলেন এবং আহত সৈনিকদের পানি পান করাতে লাগলেন। তখন হিব্বান ইবনে আরাকাতা তার দিকে তীর ছুঁড়ে মারে। তিনি পড়ে গেলেন এবং তাঁর পর্দা খুলে গেল। তখন আল্লাহর এ দুশমন বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে নিদারুণ কষ্ট পেলেন। তিনি সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের কাছে একটি পরহীন তীর দিয়ে বললেন, **তাঁর দিকে এটা ছুঁড়ো!** সা'দ রা. ছুঁড়লেন। তীরটি গিয়ে হিব্বানের গলায় বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গে সে চিত হয়ে পড়ে গেল এবং তার লজ্জাস্থান বের হয়ে পড়ল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন, তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি ইরশাদ করলেন, **সা'দ উম্মে আয়মনের পক্ষ থেকে কিসাস আদায় করে নিয়েছে। আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করুন!**[৪৬৩]

ঘাঁটিতে ফেরার পর

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘাঁটিতে খানিকটা স্থিতি লাভ করলেন তখন আলী রা. মিহরাস থেকে তার ঢাল ভরে পানি নিয়ে এলেন। মিহরাস বলা হয় পাথরের মাঝখানের ঐ সামান্য গভীরতাকে যেখানে এসে পানি জমে থাকে। কারও কারও মতে, মিহরাস ছিল উহুদ প্রান্তরের একটি কূপের নাম। যাই হোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে সে পানি

[৪৬০] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/১৭।
[৪৬১] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৬/৯১, হাদীস নং ২৮৮, ২৯০২, ৩৮১১, ৪০৬৪।
[৪৬২] প্রাগুক্ত ৬/৯৩, হাদীস নং ২৮৮১, ৪০৭১।
[৪৬৩] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/২২।

পেশ করার পর তিনি তাতে সামান্য গন্ধ অনুভব করেন। যার কারণে তা পান করলেন না। কিন্তু সেই পানি দিয়ে চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর কিছু পানি মাথায় ঢেলে দিলেন, আর মুখে বলছিলেন, **তাদের ওপর আল্লাহর ভীষণ ক্রোধ হোক, যারা তাদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করেছে।**[৪৬৪]

সাহল রা.বলেন, আমি তাদের সবাইকে চিনি, যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন, পানি ঢালছিলেন, আর যা দ্বারা তাঁর চিকিৎসা করা হচ্ছিল। তাঁর কন্যা ফাতেমা রা. তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছিলেন। আলী ইবনে আবী তালিব ঢাল দিয়ে পানি ঢালছিলেন। অতঃপর যখন ফাতেমা রা. লক্ষ্য করলেন, পানি ঢালার দ্বারা রক্ত প্রবাহ বরং বেড়েই চলছে তখন তিনি এক টুকরা চাটাইয়ের অংশবিশেষ নিয়ে আগুনে পোড়ালেন। এরপর সেই ছাইয়ের গুড়া ক্ষতস্থানে লাগানো হলে রক্তধারা বন্ধ হলো।[৪৬৫]

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তখন কোত্থেকে যেন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট পানি নিয়ে এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পানি পান করলেন এবং তাঁর কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।[৪৬৬] যখমের কারণে তিনি বসে বসে যোহরের নামায আদায় করলেন। গোটা মুসলিম বাহিনী তাঁর পেছনে বসে বসে নামায আদায় করলেন।[৪৬৭]

যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ানের বিদ্রূপ ও উমর রা. এর সঙ্গে বাক্যবিনিময়

ফিরে যাওয়ার জন্য যখন মুশরিকদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলো তখন আবু সুফিয়ান পাহাড়ে মুসলিম শিবিরের দিকে এগিয়ে এলো। এরপর সে চেঁচিয়ে উঠল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি? মুসলমানদের কেউ কোনো জবাব দিলেন না। তখন সে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে আবু কোহাফার বেটা আছে কি? কেউ কোনো জবাব দিলেন না। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে উমর বিন খাত্তাব আছে কি? এবারও মুসলিম শিবির থেকে সে কোনো সাড়া পেল না। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো জবাব দিতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানের শুধু এই তিনজনের বেঁচে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল, সে জানত যদি এ তিনজনের কোনো একজন বেঁচে থাকে তবে ইসলাম আবারও জেগে উঠবে। এভাবে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে আবু সুফিয়ান বলল, চলো! এ তিনজন থেকে তোমরা জনমের মতো মুক্তি

---

[৪৬৪] ইবনে হিশাম ২/৮৫।
[৪৬৫] সহীহ বুখারী ২/৫৮৪।
[৪৬৬] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/৩০।
[৪৬৭] ইবনে হিশাম ২/৮৭।

পেলে!! এবার আর উমর রা. নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, হে আল্লাহর দুশমন! তুই যাদের নাম নিয়েছিস তারা সবাই জীবিত ও সুস্থ আছেন। এখনো আল্লাহ তোকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা রেখে দিয়েছেন। তখন সে বলল, তোমাদের নিহতদের অঙ্গ-বিকৃতি করা হয়েছে। কিন্তু আমি এর আদেশ দেইনি আবার খারাপও বলিনি। এরপর আবু সুফিয়ান না'রা দিলো, 'হুবলের জয় হোক! হুবলের জয় হোক!!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমরা কি তার জবাব দিবে না?** মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কীসের দ্বারা তার জবাব দিব? তিনি বললেন, **তোমরা বলো, আল্লাহ সর্বমহান ও রাজাধিরাজ।**

তখন আবু সুফিয়ান বলল, আমাদের উয্যা আছে আর তোমাদের কোনো উয্যা নেই।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে আবার বললেন, **তোমরা কি তার জবাব দিবে না?** তারা বললেন, আমরা কীসের দ্বারা জবাব দিব? তিনি বললেন, **তোমরা বলো, আল্লাহ আমাদের মাওলা, আর তোমাদের কোনো মাওলা নেই।**

এরপর আবু সুফিয়ান বলল, কত সুন্দর কাজ হয়েছে। আজকের দিনটি বদর যুদ্ধের দিনের বদলা হয়েছে। যুদ্ধ যেন ঠিক বালতির মতো।

তখন উমর রা. তার জবাবে বললেন, বরাবর হয়নি; আমাদের নিহতরা জান্নাতে রয়েছে আর তোমাদের নিহতরা জাহান্নামে।

অতঃপর আবু সুফিয়ান বলল, উমর! আমার কাছে এসো!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **যাও! গিয়ে দেখো সে কী বলে!!** তখন উমর রা. তার কাছে এলেন। আবু সুফিয়ান তাকে বলল, উমর তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করছি, আমরা কি মুহাম্মাদকে হত্যা করতে পেরেছি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম না! তিনি এখন বসে বসে তোমার কথা শুনছেন! তখন আবু সুফিয়ান বলল, ইবনে কামিয়ার চেয়ে তুমি আমার কাছে অধিক সত্যবাদী ও সৎ মানুষ।[৪৬৮]

বদর প্রান্তরে মুকাবিলার প্রতিশ্রুতি

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু সুফিয়ান যখন তার বাহিনী নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল তখন সর্বশেষে বলে গেল, আগামী বছর বদর প্রান্তরে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সাহাবীকে

---

[৪৬৮] ইবনে হিশাম ২/৯৩,৯৪। যাদুল মাআদ ২/৯৪। সহীহ বুখারী ২/৫৭৯।

লক্ষ্য করে বললেন, **তাকে বলে দাও! ঠিক আছে। আমাদের ও তোমাদের মাঝে প্রতিশ্রুতি রইল!**[৪৬৯]

মুশরিকদের গতিবিধি নিরীক্ষণ

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইবনে আবী তালিব রা. কে মুশরিক বাহিনীর পেছনে পাঠিয়ে দিলেন। যাওয়ার আগে তাকে বলে দিলেন, **তুমি তাদের পেছনে পেছনে যাবে। দেখবে তারা কী করে? আর তাদের উদ্দেশ্য কী? যদি তারা ঘোড়া দূরে রেখে উটে সওয়ার হয়ে পথ চলে, তবে বুঝে নিবে তাদের উদ্দেশ্য মক্কা! আর যদি তারা ঘোড়ায় চড়ে উটগুলিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় তবে বুঝে নিবে তাদের উদ্দেশ্য মদীনা!! ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তারা মদীনার দিকে আসে তবে মদীনায় গিয়ে আমরা তাদের কঠিন ও শক্ত জবাব দিব।** আলী রা. বলেন, তখন আমি তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণের জন্য তাদের পেছনে গেলাম। আমি দেখলাম তারা ঘোড়া দূরে রেখে উটের পিঠে চলছিল। এর মানে ছিল- তারা মক্কায় ফিরে যাচ্ছে।[৪৭০]

নিহত ও আহতদের সন্ধানে

কুরাইশদের ফিরে যাওয়ার পর মুসলমানরা নিহত ও আহতদের সন্ধানে বের হলেন। যায়দ বিন সাবিত রা. বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সা'দ বিন রবী' এর সন্ধানে পাঠালেন। তিনি আমাকে বলে দিলেন, **যদি তুমি তাকে জীবিত পাও, তবে আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে এবং তাকে বলবে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন, তোমার কেমন লাগছে?** তিনি বলেন, তখন আমি নিহতদের মাঝে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। যখন আমি তার কাছে পৌঁছলাম তখন তাঁর জীবনের মাত্র কয়েকটি নিঃশ্বাস বাকি ছিল। তীর, তরবারি ও বর্শার প্রায় সত্তরটি আঘাত ছিল তার শরীরে! আমি বললাম, সা'দ! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। এবং তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনার কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর সালাম। আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলে দিবেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আপনি আমার আনসার কওমকে বলে দিবেন, যদি তোমাদের চোখের এক পলক পরিমাণ হায়াত থাকে, আর তখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

---

[৪৬৯] ইবনে হিশাম ২/৯৪।

[৪৭০] ইবনে হিশাম ২/৯৪। আর ফাতহুল বারীতে রয়েছে, তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে ছিলেন সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. ৭/৩৪৭।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত দুশমন পৌঁছে যায়-তবে আল্লাহর কাছে জবাব দেওয়ার মতো তোমরা কিছু পাবে না! এ কথা দু'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণপাখি উড়ে গেল।[৪৭১]

লোকজন আহতদের মাঝে উসাইরিমকে খুঁজে পেল। তার নাম ছিল আমর বিন সাবিত। তার জীবনের শেষ সূর্যাস্তের অপেক্ষা কয়েকটি মুহূর্ত বাকি ছিল। ইতঃপূর্বে তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হলেও সে সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ কারণে তাকে যুদ্ধের ময়দানে আহত দেখে লোকেরা কৌতূহলী হয়ে বলাবলি করতে লাগল, উসাইরিম এখানে এলো কীভাবে? তাকে তো আমরা এ অবস্থাতে রেখে এসেছি যে, সে এ দীনকে অস্বীকার করত! তাই তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কেন এসেছ? গোষ্ঠীর টানে না কি ইসলামের খাতিরে? সে বলল, আমি ইসলামের জন্য এসেছি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। এখন আমার অবস্থা তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এ কয়েকটি কথা বলে উসাইরিম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। লোকেরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তার ঘটনা উল্লেখ করলে তিনি বললেন, **সে জান্নাতী!** আবু হুরাইরা রা.বলেন, (সে জান্নাতী) অথচ, সে আল্লাহর জন্য এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েনি! (কেননা ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সে জিহাদে চলে এসেছে এবং কোনো নামাযের সময় হওয়ার আগেই সে শহীদ হয়ে গেছে)[৪৭২]

আহতদের মধ্যে কুযমানকেও খুঁজে পাওয়া গেল। সে বীরের মতো যুদ্ধ করেছিল। একাই সাত কিংবা আটজন মুশরিককে মৃত্যুর ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেও আহত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। লোকেরা তাকে বনু যফরের বস্তিতে তুলে নিয়ে গেল। মুসলমানরা তাকে সুসংবাদ শোনালো। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি যুদ্ধ করেছি আমার কওমের স্বার্থে; যদি এমন কোনো বিষয় এখানে না থাকত, তবে আমি কখনো যুদ্ধ করতে আসতাম না। এরপর যখন তার ক্ষতস্থান আরও অসহনীয় হয়ে উঠল তখন সে নিজেই নিজেকে যবাই করে ঠাণ্ডা করে দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার কথা উঠালে তিনি বলতেন, **সে জাহান্নামী।**[৪৭৩] -এটাই হলো জাতীয়তাবাদের স্বার্থে কিংবা ফী সাবীলিল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো পথে নিহতদের পুরস্কার! চাই সেটা ইসলামের পতাকা তলে; বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কেরামের মুজাহিদ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন।

---

[৪৭১] যাদুল মাআদ ২/৯৬।

[৪৭২] যাদুল মাআদ ২/৯৪। ইবনে হিশাম ২/৯০।

[৪৭৩] প্রাগুক্ত ২/৯৭,৯৮। ইবনে হিশাম ২/৮৮।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত নিহতদের মাঝে বনু সা'লাবা গোত্রের এক ইহুদি ছিল। সে তার কওমকে বলেছিল, হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমরা জানো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য ছিল। তখন তারা বলল, আজকে তো শনিবার দিন। সে বলল, শনিবার তাতে কী হয়েছে? তখন সে তার তরবারি ও আসবাবপত্র গুছিয়ে নেয় এবং বলে, যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই, তবে আমার সব ধন-সম্পদ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্য। তিনি তা দিয়ে যা ইচ্ছা তা করবেন। এরপর সে পরদিন সকাল সকাল বের হলো এবং বীর বিক্রমে লড়াই করে শহীদ হয়ে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বললেন, **মুখাইরীক সর্বোত্তম ইহুদি ছিল।**[৪৭৪]

শহীদানের কাফন-দাফন

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উহুদের শহীদানকে মন ভরে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, **আমি তাদের ওপর সাক্ষী। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর পথে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়, আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন এমনভাবে উঠাবেন যে, তার যখম থেকে শোণিতধারা বের হতে থাকবে। এগুলোর রঙ তো রক্তের রঙের মতোই হবে। কিন্তু ঘ্রাণ হবে মেশকের ঘ্রাণের মতো।**[৪৭৫]

অনেক সাহাবায়ে কেরাম তাদের শহীদ আত্মীয় স্বজনকে মদীনায় নিয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন তাদেরকে যেন ফিরিয়ে আনা হয়। অতঃপর তাদের জায়গায় গোসল ব্যতীতই দাফন করা হয়। আর তাদেরকে তাদের পরনের কাপড়েই দাফন করা হবে। কেবল হাতিয়ার বা চামড়া থাকলে তা সরিয়ে নেওয়া হবে। দু'জন বা তিন জনকে এক এক কবরে দাফন করা হচ্ছিল। প্রত্যেক দু'জনকে একটি কাফনের কাপড়ে জড়ানো হচ্ছিল। কাফন শেষ হলে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, **তাদের মধ্যে কার কুরআনে কারীম বেশি মুখস্থ?** তখন লোকজন যার দিকে ইশারা করত তাকে আগে কবরে নামানো হতো। তিনি বলতেন, **আমি কেয়ামতের দিন তাদের ওপর সাক্ষী থাকব।**[৪৭৬] আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম রা. ও আমর বিন জামূহ রা. এর মাঝে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা থাকার কারণে তাদের দু'জনকে এক কবরে দাফন করা হয়।[৪৭৭]

---

[৪৭৪] ইবনে হিশাম ২/৮৮,৮৯।

[৪৭৫] প্রাগুক্ত ২/৯৮।

[৪৭৬] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৩/২৪৮, হাদীস নং ১৩৪৩, ১৩৪৬-১৩৪৮, ১৩৫৩, ৪০৭৯।

[৪৭৭] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ২/৫৮৪। যাদুল মাআদ ২/৯৮।

যুদ্ধ প্রান্তরে হানযালা রা. এর লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ময়দানের এক কোণে মাটির ওপর তার লাশ পাওয়া গেল। তার লাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সংবাদ দিলেন যে, ফেরেশতারা তাকে গোসল দিয়েছে। এরপর তিনি বললেন **তার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করো কী ব্যাপার?** তখন তারা তার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঘটনা বর্ণনা করেন। আর তখন থেকেই তার নাম হয়ে যায় 'গসীলুল মালায়িকাহ'[৪৭৮] (ফেরেশতা কর্তৃক গোসলকৃত)

প্রিয় চাচা ও দুধভাই হামযা রা. এর অবস্থা দেখে দুঃখ আর পেরেশানীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুঁকড়ে ওঠেন। তাঁর ফুফু সাফিয়্যা রা. ভাই হামযার অবস্থা দেখার জন্য এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছেলে যুবাইরকে বললেন, তাকে হামযা রা. থেকে দূরে রাখতে। কারণ তার ভাইয়ের যা হয়েছে তা দেখে সে সহ্য করতে পারবে না। তখন সাফিয়্যা রা. বললেন, কেন পারব না? আমি শুনেছি, আমার ভাইয়ের অঙ্গ-বিকৃতি করা হয়েছে। কিন্তু এটা আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। এ জন্য যা কিছু হয়েছে আমরা তাতে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট। আমি এর উত্তম বদলার আশায় অবশ্যই ধৈর্য ধরে থাকব। তখন তিনি এসে ভাই হামযা রা. কে দেখলেন। তাঁর জন্য নামায পড়ে দুআ করলেন। 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা হামযা রা. কে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সঙ্গে এক সাথে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। আব্দুল্লাহ ছিল হামযা রা. এর ভাগ্নে এবং দুধভাই।

ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. এর জন্য যতটা কাঁদলেন আমি আর কোনো দিন অন্য কারও জন্য তাঁকে ততটা কাঁদতে দেখিনি। তাকে তিনি ক্বিবলার দিকে রাখলেন। এরপর তাঁর জানাযার নামায আদায় করলেন। নামাযে তিনি এতটা কাঁদলেন যে, তাঁর কান্নার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল।[৪৭৯]

আসলে উহুদ প্রান্তরের শহীদানের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ আর হৃদয়বিদারক। এ ছিল বড় তিক্ত আর কলিজা-ফাটা নিদারুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য। খাব্বাব রা. বলেন, হামযা রা. এর জন্য কাফন ছিল শুধু একটা সাদা-কালো

---

[৪৭৮] যাদুল মাআদ ২/৯৪।

[৪৭৯] ইবনে সাযান। দেখুন শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত 'মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ২৫৫।

ডোরাকাটা চাদর। এটা দিয়ে যদি তাঁর মাথা ঢেকে দেওয়া হতো তবে পা বের হয়ে পড়ত। আবার যদি পা ঢেকে দেওয়া হতো তবে মাথা বের হয়ে পড়ত। পরিশেষে সেটা তাঁর মাথায় টেনে দেওয়া হলো। আর তাঁর পায়ের ওপর 'ইযখির' (এক প্রকারের ঘাস) ছড়িয়ে ঢেকে দেওয়া হলো।[৪৮০]

আব্দুর রহমান বিন আউফ রা.বলেন, মুসআব বিন উমাইর রা.শহীদ হয়েছেন। আর তিনি ছিলেন আমার চেয়ে উত্তম। কিন্তু তাকে দাফন করা হয়েছিল এমন একটি চাদর দিয়ে যে, তার মাথা ঢাকা হলে পা বেরিয়ে পড়ত। আবার পা ঢাকা হলে মাথা বেরিয়ে পড়ত।[৪৮১] খাব্বাব রা. থেকেও এমনটি বর্ণিত আছে। সেখানে আরও রয়েছে, তখন রাসূলে কারীম সা. বললেন, **চাদর দ্বারা তার মাথা ঢেকে দাও! আর পায়ের ওপর ইযখির ছড়িয়ে দাও।**।[৪৮২]

আল্লাহর প্রশস্তি ও মুনাজাতে বিভোর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইমাম আহমদ র. বর্ণনা করেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা ময়দান ছেড়ে চলে গেল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, **তোমরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও! এখন আমি আমার রবের গুণগান গাইব।** তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে বলতে লাগলেন:

হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা আপনার জন্য। হে আল্লাহ আপনি যা প্রশস্ত করে দিবেন তা কেউ সংকীর্ণ করতে পারবে না। আর আপনি যা সংকীর্ণ করে দিবেন তা কেউ প্রশস্ত করতে পারবে না। হে আল্লাহ! আপনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারবে না। আর আপনি যাকে পথ দেখাবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আপনি যা দিবেন তা কেউ ফিরিয়ে রাখতে পারবে না। আর আপনি যা ফিরিয়ে রাখবেন তা কেউ দিতে পারবে না। আপনি যা দূর করে দিবেন তা কেউ নিকটে আনতে পারবে না। আর আপনি যা নিকটে আনবেন তা কেউ দূর করে দিতে পারবে না। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর আপনার রহমত, বরকত, ফযল-করম ও রিযিক ছড়িয়ে দিন।

---

[৪৮০] মুসনাদে আহমদ, মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১৪০।
[৪৮১] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ৩/১৬৮, ১৬৯, হাদীস নং ১২৭৪, ১২৭৫, ৪০৪৫।
[৪৮২] সহীহ বুখারী ২/৫৭৯ ,৫৮৪। ফাতহুল বারী ৩/১৭০, হাদীস নং ১২৭৬, ৩৮৯৭, ৩৯১৩, ৩৯১৪, ৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৩২, ৬৪৪৮।

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চিরস্থায়ী নেয়ামত প্রার্থনা করছি, যা কখনো হটবে না এবং শেষও হবে না। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দারিদ্র্যের দুর্দিনে সাহায্য এবং ভীতিকর দিনে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যা দান করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আর যা দান করেননি তার অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে তুলুন এবং আমাদের অন্তরে তা সুসজ্জিত করে দিন। আর আমাদের নিকট কুফর, পাপাচার ও আপনার অবাধ্যতাকে অপ্রিয় করে দিন। আর আমাদেরকে আপনি পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ আমাদেরকে আপনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দিন। মুসলমান হিসেবে আমাদেরকে আপনি জীবিত রাখুন। আর আমাদেরকে লাঞ্ছনা ও ফিতনা মুক্ত রেখে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে মিলিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি ঐ সকল কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিন, যারা আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যারা আপনার রাস্তা থেকে মানুষকে বারণ করে। আর আপনি তাদের ওপর আপনার আযাব ও গযব নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা কাফের আপনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিন। হে সত্য প্রভু![৪৮৩]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন ; ভালোবাসা ও বিসর্জনের বিরল দৃষ্টান্ত

শহীদানের কাফন দাফন এবং আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ ও মুনাজাত শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে যাত্রা করলেন। এ সময় সত্য ও পুণ্যাত্মা মুমিন নারী-পুরুষ সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য সীমাহীন ভালোবাসা আর আত্মবিসর্জনের সেই বিরল দৃষ্টান্ত আবারও চোখে পড়ে, যা একবার চোখে পড়েছিল উহুদের যুদ্ধ-তপ্ত মৃত্যু-বিভীষিকাময় রণাঙ্গনে।

মদীনায় ফেরার পথে হামানা বিনতে জাহাশ রা.এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তখন তাকে তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশের শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হলে তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়েন এবং তার মাগফিরাত কামনা করেন। এরপর তাকে তার মামা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয়। তখনও তিনি ইন্না লিল্লাহ পড়েন এবং তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করেন। এরপর তার কাছে তার প্রেমময় স্বামী মুসআব বিন উমাইর রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দেওয়া হয়। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন এবং ডুকরে কাঁদতে থাকেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে লক্ষ্য করে বলেন, **প্রত্যেক স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর মনের ভেতরে একটি বিশেষ স্থান থাকে।**[৪৮৪]

---

[৪৮৩] বুখারী- হাদীস নং ৬৯৯। মুসনাদে ইমাম আহমদ ৩/৪২৪।
[৪৮৪] ইবনে হিশাম ২/৯৮।

এরপর বনু দীনারের এক মহিলার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। উহুদ প্রান্তরে ইতোমধ্যে তার স্বামী, ভাই ও বাপ শাহাদাত বরণ করেছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাকে তাঁদের শাহাদাতের সংবাদ দিলেন তখন তিনি বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কী অবস্থা? তাঁরা বললেন : হে অমুকের মা! তিনি ভালো আছেন এবং সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ঠিক যেমনটি তোমার দিলের তামান্না। তখন তিনি বললেন : আমাকে একটু তাঁর নিকট নিয়ে চলো! আমার নিজের চোখে আমি তাকে দেখতে চাই। তখন তাকে ইঙ্গিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখিয়ে দেওয়া হয়। তাকে দেখে মহিলা বলে ওঠেন : আপনি থাকতে সব বড় বড় বিপদও অনেক ছোট (মনে হয়।)[৪৮৫]

কিছুদূর যাওয়ার পরে সা'দ বিন মুয়ায রা. এর মা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে দৌড়ে আসেন। সা'দ রা. তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোড়ার লাগাম ধরে ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি আমার মা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সুস্বাগতম তাকে!** অতঃপর তিনি তার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি কাছে এলেন, তখন তাকে তাঁর মুজাহিদ সন্তান আমর বিন মুয়ায রা. এর শাহাদাতের সংবাদ দিয়ে সান্ত্বনা দেন। তখন তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আপনি জীবিত আছেন তখন আর সকল বিপদ আমার কাছে খুবই হালকা হয়ে যাবে। এরপর রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুহাদায়ে উহুদের জন্য দুআ করলেন এবং বললেন, **হে উম্মে সা'দ! তুমি নিজে সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং অন্যান্যদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের শহীদান জান্নাতে সবাই একত্রে অবস্থান করছে। আর তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আমার শাফায়াত কবুল করা হয়েছে।**

উম্মে সা'দ তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। এই খোশখবরী শোনার পরে আর কে আছে তাদের জন্য কাঁদবে? এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের পরিবারের বেঁচে থাকা সদস্যদের জন্যও দুআ করুন! তিনি দুআ করলেন, **হে আল্লাহ! আপনি তাদের হৃদয়ের দুঃখ-পেরেশানী দূর করে দিন। তাদেরকে আপনি তাদের মুসীবতের উত্তম বদলা দান করুন এবং যাদেরকে তারা রেখে গেছেন তাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করুন।**[৪৮৬]

---

[৪৮৫] প্রাগুক্ত ২/৯৯।
[৪৮৬] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/৪৭।

মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ঐ দিন তথা তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের সাত তারিখ শনিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় গিয়ে পৌছেন। ঘরে পৌছার পর মেয়ে ফাতেমার হাতে তরবারি দিয়ে বলেন, **প্রিয় মা আমার! এর রক্তটুকু ধুয়ে নাও। এটা আজ আমার জন্য সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।** আলী ইবনে আবী তালিবও রা. তার হাতে তরবারি দিয়ে বলেন, এটাকেও ধুয়ে নাও! আল্লাহর কসম! এটা আজ আমার জন্য সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : **যদি তুমি বিরল যুদ্ধ করে থাকো, তবে সাহল ইবনে হুনাইফ আর আবু দুজানাও বিরল যুদ্ধ করেছে।**[৪৮৭]

উভয় বাহিনীর নিহতদের পরিসংখ্যান

অধিকাংশ সীরাত ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞের ঐকমত্যে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের নিহতের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। তাদের সিংহভাগই ছিলেন আনসার। আনসারদের সর্বমোট শহীদ হয়েছিলেন পঁয়ষট্টি জন। একচল্লিশ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। আর চব্বিশ জন ছিলেন কবীলায়ে আউসের। মুসলিম শিবিরের মধ্যে একজন ইহুদিও নিহত হয়েছিল। আর মুহাজিরদের মধ্যে শহীদ হয়েছিলেন মাত্র চার জন।

মুশরিকদের কত জন নিহত হয়েছিল? এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মাঝে চরম মতানৈক্য দেখা যায়। প্রখ্যাত সীরাত বিশেষজ্ঞ ইবনে ইসহাকের মতে, তাদের মোট নিহত হয়েছিল বাইশ জন। কিন্তু সীরাত ও ইতিহাসের আলোকে উহুদ যুদ্ধের বিস্তারিত আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং যুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে তাদের সৈন্যদের নিহত হওয়ার যে চিত্র ফুটে ওঠে সঠিক ও গভীরভাবে তা নিরীক্ষণ করলে তাদের যে সংখ্যা বেরিয়ে আসে তা হলো সাইত্রিশ জন; কিছুতেই বাইশ জন নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[৪৮৮]

মদীনার ঘোলাটে আবহাওয়া

উহুদ প্রান্তর থেকে ফিরে মুসলমানগণ তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের আট তারিখের (শনিবার ও রবিবারের মাঝের) রাতটি কাটালেন বড়ই পেরেশানী আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। সারা রাত ক্লান্তি তাদেরকে অস্থির করে রেখেছিল। এতকিছু সত্ত্বেও তারা রাতভর মদীনার বিভিন্ন অলিগলি আর পথের প্রান্তে কড়া প্রহরায় নিয়োজিত থাকলেন। বিশেষ করে তাদের সর্বাধিনায়ক ও সিপাহসালার

---

[৪৮৭] ইবনে হিশাম ২/১০০।

[৪৮৮] দেখুন ইবনে হিশাম ২/১২২-১২৯। ফাতহুল বারী ৭/৩৫১। মুহাম্মাদ আহমদ বাশমীল প্রণীত গাযওয়ায়ে উহুদ পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮০।

সাহেবে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ছিল তাদের বাড়তি উদ্বেগ। কারণ সন্দেহ আর সংশয় চারদিক থেকে তাদেরকে সাঁপের মতো পেঁচিয়ে ধরেছিল।

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ

রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিলেন। তাঁর ভয় ছিল- যদি পথিমধ্যে মুশরিকদের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ে বসে যে, উহুদ প্রান্তরে তাদের যতটুকু বিজয় ও সফলতা এসেছে তা থেকে তারা একটুকুও ফায়েদা হাসিল করতে পারেনি; বরং তা পুরোটাই খোয়া গেছে, তখন তারা অবশ্যই এর ওপর লজ্জিত হবে এবং পুরনো ভুলের মাশুল স্বরূপ তারা ফিরে এসে দ্বিতীয় বার মদীনা আক্রমণের দুঃসাহস দেখাবে। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ মক্কী বাহিনীর গতিবিধি নির্ণয়ের জন্য লোক পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সীরাত বিশেষজ্ঞদের বর্ণনাঃ উহুদ যুদ্ধের পরের দিন সকাল বেলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন এবং তাদেরকে দুশমনের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের আট তারিখ রবিবার। তিনি তাদেরকে বললেন, যারা উহুদ যুদ্ধে উপস্থিত ছিল কেবল তারাই এ অভিযানে যেতে পারবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাকে বলল, আমিও কি আপনার সঙ্গে যাব? তিনি তাকে বললেন, না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড আহত, ও ক্ষত-বিক্ষত, অথচ প্রাণোদ্দীপ্ত সাহাবায়ে কেরাম সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দিলের তামান্না ছিল আপনি যে যুদ্ধেই যাবেন আমিও আপনার সঙ্গে থাকব। কিন্তু আমার পিতা উহুদের সময় তার মেয়েদেরকে দেখা শোনার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে যান। সে কারণে আমি যেতে পারিনি। দয়া করে এখন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে সফরের অনুমতি দিন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদীনা থেকে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন।

ঠিক এ সময় মা'বাদ ইবনে আবী মা'বাদ খুযাঈ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কারও কারও মতে,

সে তখনো শিরকের ওপরই ছিল; কিন্তু সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরম হিতৈষী ছিল। কারণ তার কওম বনু খুযায়া আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কওম বনু হাশিমের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি ছিল। সে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল : মুহাম্মাদ! আপনার ও আপনার সঙ্গীদের ওপর যে মুসীবত আপতিত হয়েছে আমরা তাতে দারুণ কষ্ট পেয়েছি। আমাদের মনের একান্ত বাসনা ছিল আল্লাহ আপনাকে হেফাযতে রাখুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ হিতকামনা দেখে তাকে বললেন, তুমি গিয়ে আবু সুফিয়ানকে ভয় দেখাও!

মুশরিকদের মদীনায় ফেরার ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে শঙ্কা ছিল পরবর্তী সময়ে তা একশ' তে একশ' বাস্তব ও সত্য প্রমাণিত হয়। কেননা, তারা যখন মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে রাওহা নামক স্থানে অবতরণ করে তখন তারা একে অপরকে ভর্ৎসনা করতে থাকে। তাদের একজন অপরজনকে বলে, তোমরা কেনই বা কিছু না করে তাদেরকে ছেড়ে দিলে? তোমরা শুধু তাদের দর্প চুরে ছেড়ে দিয়েছ। অথচ, তাদের এমন এমন নেতারা সবাই প্রাণে বেঁচে গেছে, যারা তাদেরকে আবার জাগিয়ে তুলতে সক্ষম। আবার তোমরা ফিরে চলো! সমূলে তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলো।

এতে করে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ ভাসাভাসা কর্মপদক্ষেপের বক্তব্যটি এসেছিল এমন লোকদের পক্ষ থেকে উভয় দলের বাস্তব শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে যারা নিতান্ত অজ্ঞতা ও মূর্খতার রাজ্যে বিচরণ করছিল। এ কারণে তাদের নেতা চতুর সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা তাদের এ মতের চরম বিরোধিতা করল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এমন কাজ করো না! কেননা, আমার ভয় হয় উহুদ যুদ্ধে যে সকল মুসলমান শরীক হয়নি এখন তারাও মিলে তোমাদের ওপর একযোগে হামলা চালাবে। সুতরাং, এখন তোমরা এভাবে ফিরে চলো যে, বিজয় তোমাদেরই পদচুম্বন করেছে। কেননা, আমার ভয় হয় তোমরা আবার মদীনায় ফিরে গেলে এর উল্টোটা নিয়ে ফিরে আসতে হয় কি না। কিন্তু অধিকাংশের রায়ের সামনে সফওয়ানের এ কথাটি হাওয়ায় মিশে গেল। মক্কা বাহিনী পুনরায় মদীনার দিকে যাত্রা করার সংকল্প করল। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে যাত্রা করার ঠিক আগ মুহূর্তে মা'বাদ ইবনে আবী মা'বাদ খুযাঈর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো। আবু সুফিয়ান তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তখনো অবগত ছিল না। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করল, পেছনের হালত কী? মা'বাদ প্রোপাগান্ডার সাম্প্রদায়িক হামলা করে তাকে বলল, মুহাম্মাদ এক বিশাল দল নিয়ে মদীনা থেকে বেরিয়ে তোমাদেরকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি এমন বাহিনী কখনো দেখিনি। প্রতিশোধের আগুনের ধোঁয়া হরহামেশা তাদের

নাক আর মুখ দিয়ে বের হচ্ছে। উহুদ যুদ্ধে যারা তার সঙ্গে শরীক হতে পারেনি আজ তারাও তাকে সঙ্গ দিয়েছে এবং হারিয়ে যাওয়া সুযোগের ওপর আফসোস করছে। তোমাদের প্রতি বিদ্বেষ আর ক্রোধের এমন তিক্ত আগুনে তারা জ্বলছে, যা আমি কোনোদিনও আর দেখিনি।

আবু সুফিয়ান বলল : আরে ভাই তুমি এগুলো কী বলছ?

মা'বাদ বলল : আমার শঙ্কা হয় তোমরা এখান থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগেই কি না তাদের ঘোড়ার কপাল তোমার নজরে পড়ে কিংবা এই বালিয়াড়ির পেছনে তাদের প্রথম দলটি উদিত হয়ে যায়।

আবু সুফিয়ান বলল : আল্লাহর কসম! আমরা তাদের ওপর আরেকটা ঝটিকা আক্রমণ চালাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে গিয়েছি।

মা'বাদ বলল : এমনটি করো না! মনে রেখো,আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী।

আর ঠিক এই মুহূর্তগুলিতে মক্কী বাহিনীর মনোবল পুরোপুরি ভেঙে গেল। মুসলমানদের থেকে প্রচণ্ড ভীতি আর ত্রাস তাদের ওপর জেঁকে বসল। এখন বাঁচার উপায় ছিল একটিই- ডানে বামে না তাকিয়ে সোজা মক্কার পথে যাত্রা অব্যাহত রাখা। এতকিছু সত্ত্বেও আবু সুফিয়ান ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডার সাম্প্রদায়িক অভিযান জুড়ে দিলো। যে কোনোভাবেই তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে তাদের পশ্চাদ্ধাবন ও পরে সেই সূত্র ধরে দ্বিতীয় আরেকটি সংঘর্ষ থেকে বেঁচে যাওয়া যায় কি না। আর আবু সুফিয়ান এ ক্ষেত্রে সফলও হলো। কবীলায়ে আব্দুল কায়সের একটি কাফেলা আবু সুফিয়ানের বাহিনীর পাশ দিয়ে মদীনার দিকে যাচ্ছিল। তখন আবু সুফিয়ান তাদেরকে বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমার পক্ষ থেকে একটি বার্তা পৌঁছে দিবে। তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি থাকল, তোমরা যখন মক্কায় ফিরে আসবে তখন উকায মেলায় তোমাদের এই সওয়ারী যত কিশমিশ বহন করতে পারে আমি তা দিব।

তারা বলল, হাঁ।

আবু সুফিয়ান বলল, তাদেরকে তোমরা বলবে, আমরা তাঁর ও তাঁর সাথীদেরকে চিরদিনের মতো ঠাণ্ডা করে দেওয়ার জন্য বিরাট এক বাহিনী নিয়ে আবার মদীনার দিকে এগিয়ে আসছি।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হামরাউল আসাদে ছিলেন তখন উল্লিখিত কাফেলাটি তাদের পাশ দিয়ে গমন করে। আবু সুফিয়ান তাদেরকে যা বলেছিল তাদেরকে এ সংবাদগুলি দিয়ে দেয় এবং তারা বলে,

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় করো। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। বস্তুত আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। [সূরা আলে ইমরান:১৭৩-১৭৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিবার হামরাউল আসাদে উপস্থিত হওয়ার পরে সোম, মঙ্গল ও বুধ এই তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের নয়, দশ ও এগারো তারিখ। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে যান। মদীনায় ফিরে যাওয়ার আগে আবু ইযযাহ জুমাহী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে গ্রেফতার হয়। বদর যুদ্ধের সময় সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার চরম দারিদ্র্য ও অনেকগুলি মেয়ে থাকার কারণে কোনো মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিয়ে দেন। তবে শর্ত ছিল সে তার মুখকে কোনোদিন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না। কিন্তু সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করল এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে গাদ্দারী করল। মানুষকে সে তার কবিতা দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলো। তাকে গ্রেফতার করা হলে সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে মাফ করে দিন এবং আমার ওপর অনুগ্রহ করুন! আমার মেয়েদের জন্য হলেও আমাকে ছেড়ে দিন! আমি আপনার কাছ ওয়াদা করছি সামনে থেকে কখনো আর এরূপ করব না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এখন এটা আর হতে পারে না যে, তুমি মক্কায় গিয়ে হাত দিয়ে গাল হাতিয়ে বলবে আমি মুহাম্মাদকে দুই বার ধোঁকা দিয়েছি। মুমিন কখনো এক গর্ত থেকে দুই বার আক্রান্ত হয় না।** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে যুবাইর কিংবা আসেম বিন সাবিত রা. ধড় থেকে তার মাথা আলাদা করে ফেলেন।

একইভাবে মক্কার এক গুপ্তচরকে হত্যা করা হলো। সে ছিল উমাইয়্যা খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান এর নানা মুআবিয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে আবীল আস। উহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা যখন ফিরে যায় তখন এই চর তার চাচাতো ভাই সাহাবী উসমান বিন আফফান রা. এর নিকট আসে। তিনি রাসূলে কারীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার জন্য নিরাপত্তা চান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্তে তাকে নিরাপত্তা দেন যে, যদি তিন দিন পরে তাকে মদীনায় পাওয়া যায় তবে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা ছাড়াই হত্যা করা হবে। অতঃপর ইসলামী বাহিনী যখন মদীনা থেকে চলে গেল তখন সে তিনদিনের বেশি মদীনায় থেকে মক্কী বাহিনীর গোয়েন্দাগিরি করতে লাগল। বাহিনী ফিরে এলে মুআবিয়া পালিয়ে মদীনা থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন হারেসা রা. ও আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে পাঠিয়ে তাকে হত্যা করান।[৪৮৯]

সন্দেহ নেই গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ নামটা ভিন্ন হলেও এটা মূলতঃ ভিন্ন কোনো গাযওয়া ছিল না; বরং এটা ছিল গাযওয়ায়ে উহুদেরই একটি অংশ। তার উপসংহার এবং তারই পর্বগুলো হতে রয়ে যাওয়া সর্বশেষ পর্ব।

এই ছিল গাযওয়ায়ে উহুদের বিশদ বর্ণনা। এই গাযওয়ায়ে উহুদের পরিণতি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সীরাত ও ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা লম্বা ও সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আসলে কি এ গাযওয়াতে মুসলমানদের জয় হয়েছিল না কি পরাজয়? সত্য ও প্রকৃত ব্যাপার আসলে কোন্‌টি? সত্যি কথা বলতে কি গাযওয়ায়ে উহুদের দ্বিতীয় পর্যায়ে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ময়দানের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল নিঃসন্দেহে কাফেরদের ঝুলিতে। রণাঙ্গনের পাল্লা ছিল তাদের দিকেই ঝুঁকে। আর এর পুরো বিপরীত ছিল মুসলমানদের অবস্থা। তারা তখন পড়ে গিয়েছিলেন মহা বেকায়দায়। আর এ দ্বিতীয় পর্বে মুসলমানদের একটি দল বিশেষের সুনিশ্চিত পরাজয় হয়েছিল। এতকিছু সত্ত্বেও এখানে এমন কতগুলি ব্যাপার রয়ে গেছে যেগুলির কারণে আমরা মুশরিকদেরকে সফল ও বিজয়ী সাব্যস্ত করতে পারি না।

সবচেয়ে বাস্তব কথা হলো মক্কী বাহিনী মুসলমানদের শিবির দখল করতে পারেনি। তাছাড়া মাদানী বাহিনীর একটি বড় দল মুসলিম শিবিরে বিপর্যয় ও বিপত্তি ছড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও প্রবল বীরত্ব আর বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, যার ফলে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। একইভাবে মুসলমানদের পাল্লা এতটা উঠে যায়নি যে, মুশরিকরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে। মদীনার কোনো সৈন্য মুশরিকদের হাতে বন্দী হয়নি। তাছাড়া মুসলমানদের গনীমতের এক কানাকড়িও তারা নিতে পারেনি। মুসলমানরা তাদের শিবিরে থাকা সত্ত্বেও মুশরিকরা যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব

---

[৪৮৯] গাযওয়ায়ে উহুদ ও গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন ইবনে হিশাম ২/৬০-১২৯, যাদুল মাআদ ২/৯১-১০৮, ফাতহুল বারী ৭/৩৪৫-৩৭৭, সহীহুল বুখারী, শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী কৃত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ২৪২-২৫৭।

শুরু করেনি। তারপর তারা যুদ্ধ শেষে ময়দানে একদিন, দুইদিন বা তিনদিন অবস্থান করেনি, অথচ তৎকালীন সময়ে এটাই ছিল বিজয়ীদের নিদর্শন ও অভ্যাস; বরং এর বিপরীতে তারা দ্রুতগতিতে লেজ গুটিয়ে নিয়েছে এবং মুসলমানরা ময়দান ছাড়ার আগেই তারা ময়দান ছেড়ে চলে গেছে। তাছাড়া তারা ধন-সম্পদ আর ছেলে-সন্তান হাতিয়ে নেওয়ার জন্য মদীনায় প্রবেশ করারও দুঃসাহস দেখায়নি। অথচ, সেখান থেকে মাত্র দু'চার কদম দূরে অবস্থিত পুরুষ-শূন্য মদীনা তাদেরকে দরজা খুলে হাতছানি দিচ্ছিল।

এই সবগুলি দিক বিবেচনা করলে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুরাইশরা সেদিন যা কিছু অর্জন করেছিল তাকে বেশির চেয়ে বেশি এই বলা চলে যে, তারা মুসলমানদেরকে এক বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়ার যে স্বপ্নে তারা মত্ত ছিল তা কিন্তু মোটেও বাস্তবায়িত হয়নি। তা ছাড়া অনেক সময় বিজয়ী দলও তো রণাঙ্গনে এ ধরনের বিশাল ক্ষয় ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে। সুতরাং, এটাকে মুশরিকদের বিজয় বলে আখ্যা দেওয়া যায় না।

বরং আমরা আরও আগে বেড়ে বলতে পারি, আবু সুফিয়ানের দ্রুত নিজ বাহিনী নিয়ে লেজ গুটিয়ে মক্কার পথ ধরার অর্থ ছিল যদি যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব শুরু হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে নিজ বাহিনীর পরাজয় সম্পর্কে সে সুনিশ্চিত ছিল। এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ময়দান ছেড়ে চলে যায়। যদি গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদে আবু সুফিয়ানের ভূমিকার প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে এ জিনিসটি আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

সুতরাং, আমরা এখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এটা ছিল একটি ফলাফলবিহীন ও অনিষ্পত্তিকর যুদ্ধ। প্রত্যেক দলই কিছুটা সফলতা অর্জন করেছে ও কিছুটা ব্যর্থতার মুখামুখি হয়েছে। তবে প্রতিপক্ষের ভয়ে কেউ ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেনি। আর এর অর্থই হলো এমন এক যুদ্ধ- যেখানে জয়-পরাজয়ের ফয়সালা দেওয়া যায় না।

আর ঠিক এদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ.

তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতোই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা করো, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

[সূরা নিসা : ১০৪]

আয়াতে অন্যকে বিপর্যয়ের শিকার করা ও নিজে শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে এক দলকে অন্য দলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায়, প্রাপ্তির খাতায় উভয়ের নাম্বার ছিল সমান-সমান। যখন রণাঙ্গন থেকে তারা ফিরে যায় তখন উভয় দলই ছিল অজয়ী-অজিত।

যুদ্ধের ওপর কুরআনের আলোকপাত

কুরআনে কারীম এ যুদ্ধের প্রতিটি অধ্যায়ের ওপর ভিন্ন ভিন্ন আলোকপাত করেছে এবং ঐ সমস্ত কারণগুলো স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, যে সকল কারণে মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছিল এই মহা বিপর্যয়ের কালো রাত। তাছাড়া কুরআন কারীম ঐ দুর্বল দিকগুলোও প্রকাশ করে দিয়েছে, যা ইমানদারদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিল এই সমস্ত মূলোৎপাটনকারী জায়গাগুলোতে তাদের করনীয় ও দায়িত্বের পরিবর্তে এবং ঐ সুমহান উদ্দেশ্যের পরিবর্তে, যা অর্জনের জন্যে এ উম্মতকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ বৈশিষ্টের পরিবর্তে, যার কারণে এই উম্মত সর্বোত্তম উম্মত হিসেবে ব্যতিক্রম।

একইভাবে কুরআন নির্ভেজাল তাওহীদের এ সকল পতাকাবাহীর মাঝে চুপটি মেরে থাকা মুনাফিকদের লেজ টেনে বের করেছে। খাঁটি ও একনিষ্ঠ মুমিনদের মাঝে বসেই তাদের প্রতি প্রচণ্ড আক্রোশ ও বিদ্বেষ পোষণকারী এসকল মুনাফিককে সে মুমিনদের মজলিস থেকে কান ধরে উঠিয়ে সবার সামনে কষিয়ে থাপ্পড় মেরে তাদের পেছনের চিত্র সবার সামনে তুলে ধরেছে। পাশপাশি সে দুর্বলচিত্ত মুমিনরা সন্দেহ আর সংশয়ের যে নাগরদোলায় দোল খাচ্ছিল; বরং জাতীয় সূত্রে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত ছিল যাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার সেই ইহুদিরা তাদেরকে পেরেশানীর যে তুফানে ফেলে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছিল কুরআন তাদেরকে সে মহা বিপদ থেকে নাজাত দিয়েছে, মুক্তির স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। পাশাপাশি এ যুদ্ধের ভেতরে যে বিশেষ তত্ত্ব ও মহামূল্যবান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে কুরআনে সেদিকেও ইঙ্গিত করতে ভুলেনি।

কুরআনে কারীমের সূরা আলে ইমরানের প্রায় ষাটটি আয়াত নাযিল হয় এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। এ আলোচনার উদ্বোধন ছিল যুদ্ধের একেবারে প্রথম পর্ব থেকেই–

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ.

আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন.......... [সূরা আলে ইমরান : ১২১]

আর একেবারে যুদ্ধের শেষে গিয়ে এর ফলাফল ও এর পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা যে বিশাল তত্ত্ব ভাণ্ডার রয়েছে, সংক্ষেপে অথচ অতি ব্যাপকভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে এভাবে:-

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, যতক্ষণ না তিনি নাপাককে পাক থেকে পৃথক করবেন। আর আল্লাহ এমনও নন যে, তোমাদিগকে গায়বের ওপর অবগত করাবেন। তবে আল্লাহ স্বীয় রসূলগণের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নেন। সুতরাং, আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রাসূলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন করো। বস্তুত তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। [সূরা আলে ইমরান : ১৭৯]

গাযওয়ায়ে উহুদের তত্ত্বকথা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. এ ব্যাপারে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন।[৪৯০]। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেছেন : বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা যে মহাবিপদ আর চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাতে তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশাল দয়া ও অনুগ্রহ ছিল। এর ভেতরে লুকিয়ে ছিল বিশেষ হিকমত ও তত্ত্ব। তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নির্দেশ অমান্য করার পরিণতি মুসলমানদেরকে চিনিয়ে দেওয়া। কারণ, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল তীরন্দাযকে কোনো অবস্থাতেই তাদের স্থান ছেড়ে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই সে নির্দেশ অমান্য করেছিল।

আরেকটি হিকমত ছিল এই যে, সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম আর মুরসালীনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিয়ম ছিল একের পর এক পরীক্ষা করা ও বিভিন্ন বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করা। আর এর হিকমত হলো, যদি মুসলমানরা সকল ক্ষেত্রেই জয়ী হয় তবে তাদের শত্রুরাও কৌশলে তাদের ভেতরে ঢুকে যাবে। তখন সত্যমিথ্যা বের করা অসম্ভব হয়ে পড়বে (যেমন হয়েছিল এ যুদ্ধে)। আর

[৪৯০] দেখুন যাদুল মাআদ ২/৯৯-১০৮।

যদি সব সময় তাদের পরাজয় হয় তবে তাতে নবুওত ও রিসালতের কোনো অর্থই থাকবে না। সুতরাং, হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হলো উভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা- কখনো জয়; কখনো পরাজয়। যাতে কে সত্য আর কে মিথ্যা কোনো কষ্ট ব্যতিরেকেই তা বের হয়ে পড়ে। তার কারণ হলো, বহু মুনাফিকের নেফাক ছিল মুসলমানদের অজানা,অজ্ঞাত। অতঃপর যখন এ ঘটনা ঘটল এবং মুনাফিকরা যা বলার বলে দিলো তখন ইশারা-ইঙ্গিত দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্তে রূপ নিলো। মুসলমানরা জানতে পারল, তাদের নিজেদের ঘরেই লুকিয়ে আছে কতগুলি বিষাক্ত ও ভয়ঙ্কর সাপ। অথচ, তারা কোনোদিনও এদের উপস্থিতি ঠাওর করতে পারেনি।

তাছাড়া আরেকটি হিকমত ছিল এই যে, যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে খানিকটা বিলম্বে সাহায্য ও নুসরত করা হয়, তবে এতে তাদের মনে কোনো দম্ভ কিংবা অহঙ্কার জায়গা করে নিতে পারবে না। এভাবে যখন তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তখন খাঁটি মুমিনরা ধৈর্য ধারণ করবে আর মুনাফিকরা বিমূঢ় হয়ে পড়বে।

আরেকটি হিকমত ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্য জান্নাতে এমন কতগুলি উচ্চ স্থান নির্ধারিণ করে রেখেছেন যেখানে তারা তাদের আমল দ্বারা কোনোদিনও পৌঁছতে পারবে না। এ কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন, যাতে তারা এ সকল পরীক্ষায় পাস করে সেই বুলন্দ মরতবায় উন্নীত হতে পারে।

এ যুদ্ধের আরও একটি হিকমত ছিল এই যে, শাহাদাত হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ মরতবা। এ কারণে, তিনি তাদেরকে শাহাদাতের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। এর বিপরীতে তিনি তার দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ কারণে, তিনি তাদেরকে নাফারমানি ও তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্টদানের কাজে ডুবিয়ে রেখেছেন। ফলে এর দ্বারা তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের পথ সুগম করবে। আর তখন তিনি তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদের অপরাধগুলি ক্ষমা করে দিবেন। আর কাফেরদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।[৪৯১]

---

[৪৯১] ফাতহুল বারী ৭/২৪৭।

উহুদ ও আহযাবের মধ্যবর্তী সারিয়া ও সামরিক অভিযান

উহুদ প্রান্তরে ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক ট্র্যাজিডি ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক বিশাল দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনা মুসলমানদের এতদিনের অর্জিত সুনাম আর সুখ্যাতি ধূলোয় মিশিয়ে দিলো। মুসলমানদের ইয্যত ও সম্মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। দুশমনের কলিজা থেকে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভয় উড়ে গেল। মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ আর বহিরাগত শত্রুদের বিদ্বেষের আগুন দাবানলের মতো দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠল। দশদিশি থেকে মুসলমানদেরকে আবার ঘিরে ধরল বিপদ আর বিপাকের কালো ঘনঘটা। ইহুদি, মুনাফিক আর মরুচারী বেদুঈন জনগোষ্ঠী প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে আরম্ভ করল। প্রত্যেকেই এবার তাদেরকে একটু খোঁচা দেওয়ার সুযোগ সন্ধান করতে লাগল; বরং তাদের ধ্বংসের প্রতি লালায়িত হলো। তাদের হৃদয়ের গহীন থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এলো, 'এই বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলতেই হবে'।

স্বভাবতই তাই দেখা গেল। উহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মাত্র দু'মাস যেতে না যেতেই বনু আসাদ মদীনার ওপর হামলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল। এরপর চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বনু আজল ও বনু কারাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, যার ফলাফল ছিল দশজন সাহাবীর শাহাদাত বরণ। একই মাসে আমের বিন তুফাইল আমেরী বিভিন্ন কবীলাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। আর এটা শেষ হয় সত্তর জন সাহাবীকে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা 'বীরে মাঊনা'র ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এ সময় বনু নযীরও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে দুশমনি শুরু করে এবং শেষে চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার জঘন্য ষড়যন্ত্র করে। একই হিজরী সালের জুমাদাল ঊলা মাসে বনু গাতফান মদীনার ওপর আক্রমণের স্পর্ধা দেখায়।

এভাবে ঐতিহাসিক উহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আর সুনাম-সুখ্যাতি মাটি হয়ে যায় তা মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করে ফেলে। তাদেরকে গনীমতের মাল মনে করে সবাই তাতে ভাগ চেয়ে বসতে শুরু করে। মুসলমানদের ভাগ্যাকাশ আরেকবার ভয়াল মূর্তি ধারণ করে। এই চরম নাযুক মুহূর্তে সাহেবে রিসালতের 'হিকমত' আর দূরদর্শিতা আবার জেগে উঠে চরম উদ্দীপনা নিয়ে ছুটে আসা এ দুর্বিপাকের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে ঠেলে সেগুলির বাঁক ঘুরিয়ে দেয়। মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া ইয্যতের দিনগুলি আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনে। দুশমনের অন্তরে তাদের ভয়-ভীতি নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে

সক্ষম হয়। আর এ ক্ষেত্রে তাঁর সর্বপ্রথম সফল পদক্ষেপ ছিল গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ। এতে মুসলিম বাহিনীর সুখ্যাতি কিছুটা হলেও রক্ষিত হয়। এর দ্বারা তার আগের দিনের অবস্থান অনেকটা সুদৃঢ় হয়; বরং বলা যায় আরও বেশি হয়। সামনের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা এগুলি সবিস্তারে আলোচনা করব:

সারিয়ায়ে আবী সালামা

উহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের অভিযাত্রা খানিকটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে বনু আসাদ ইবনে খুযাইমা সর্বপ্রথম তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ আসে, তালহা ইবনে খুওয়াইলিদ এবং সালামা ইবনে খুওয়াইলিদ তাদের কওম ও অনুসারীদেরকে নিয়ে বনু আসাদ ইবনে খুযাইমাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করে চলছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ এ আস্ফালন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে দেড় শ' জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীর একটি সারিয়া প্রেরণের প্রস্তুতি নিলেন। তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন আবু সালামা রা. কে। তাদের জন্য তিনি একটি পতাকা বেঁধে দিলেন। আবু সালামা রা. তার বাহিনী নিয়ে বনু আসাদ ইবনে খুযাইমা প্রস্তুত হওয়ার আগে তাদের বস্তির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিত এ হামলায় তারা হতভম্ব ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এ সময়ে মুসলমানরা তাদের উট ও বকরীগুলি ধরে নিয়ে কোনো সংঘর্ষ কিংবা সংঘাতের মুখামুখি হওয়া ছাড়াই বিজয়ী বেশে মদীনায় ফিরে যায়।

চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসের নতুন চাঁদ ওঠার সময় মদীনা থেকে এ বাহিনী পাঠানো হয়। অতঃপর অভিযান থেকে ফিরে আসার পর আবু সালামা রা. এর একটি যখম- যা উহুদ যুদ্ধের সময় সৃষ্টি হয়েছিল- আবার দগদগে তাজা হয়ে ফেটে যায় এবং এতে আবু সালামা রা. শাহাদাত বরণ করেন।[৪৯২]

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস অভিযান

চতুর্থ হিজরীর মুহাররম তথা ঐ একই মাসের পাঁচ তারিখে মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ আসে যে, খালিদ ইবনে সুফিয়ান হুযালী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করছে। সংবাদ পেয়ে তাকে ঠাণ্ডা করার উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসকে প্রেরণ করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা. মদীনা থেকে একটানা আঠারো দিন অনুপস্থিত থাকেন। এরপর মুহাররমের সাত দিন বাকি থাকতে শনিবার মদীনায় ফিরে

---

[৪৯২] যাদুল মাআদ ২/১০৮।

আসেন। তিনি খালিদকে হত্যা করে তার মাথা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। মাথাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে রাখলেন। তিনি আব্দুল্লাহর হাতে একটি লাঠি তুলে দিয়ে বলেন, **এটা কেয়ামতের দিন তোমার ও আমার মাঝে একটি নিদর্শন হবে।** সুতরাং, তাঁর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন তিনি লাঠিটি তার কাফনের মধ্যে জড়িয়ে দেওয়ার অসিয়ত করে গেলেন।[৪৯৩]

রজী' অভিযান

এই একই বছর অর্থাৎ চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আজল ও কারাহ গোত্রের কিছু লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসে। তারা তাঁকে জানায় যে, তাদের মধ্যেও ইসলামের কিছু চর্চা হয়েছে। এরপর তারা তাঁর নিকট দাবি করল, যেন তিনি তাদের সঙ্গে এমন লোক প্রেরণ করেন, যে তাদেরকে দীন শিক্ষা দিবে এবং কুরআন শিখাবে। তখন তিনি তাদের সঙ্গে ছয়জন সাহাবীকে পাঠিয়ে দেন- এটা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা।

আর বুখারীর বর্ণনা মতে, সংখ্যায় তারা ছিলেন দশ জন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী তাদের আমীর ছিলেন মারসাদ ইবনে আবী মারসাদ গানাবী রা.। আর ইমাম বুখারী বলেন, আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবের দাদা আসেম ইবনে সাবেত রা.। অতঃপর তারা তাদেরকে নিয়ে চলে গেল। যখন তারা রজী' নামক স্থানে পৌঁছল–আর তা হল রাবেগ ও জুদ্দার মাঝামাঝি হিজাযের প্রান্তে বনু হুযাইল গোত্রের কূপ। তখন তারা তাদের ওপর হুযাইলের একটি শাখাগোত্র বনু লাহইয়ানকে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। বনু লাহইয়ানের প্রায় একশ' তীরন্দায তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং তাদের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে একসময় তাদের কাছে পৌছে যায়। তারা তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সাহাবায়ে কেরামের ছোট দলটি তখন একটি উঁচু টিলার ওপর আশ্রয় নিলেন। তারা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের সঙ্গে আমাদের এই চুক্তি ও অঙ্গীকার যে, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। কিন্তু সিংহশাবক আসেম রা.আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং নিজ সঙ্গীদেরকে নিয়ে লড়াই শুরু করলেন। লড়াই করতে করতে তাদের মধ্য থেকে সাতজনই দুশমনের তীরের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। কেবল খুবাইব, যায়দ বিন দাসিন্নাহ এবং আরেকজন লোক তখনো বেঁচে থাকেন। তারা তাদেরকে আরও একবার অঙ্গীকার দিলো। তখন তাঁরা টিলা থেকে নেমে এলেন। কিন্তু দুশমনরা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাদেরকে ধনুকের ছিলা দ্বারা বেঁধে ফেলল। তখন তাদের তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, শুরুতেই তোমরা গাদ্দারি করে বসলে! তিনি তাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন তারা তাঁকে টানাটানি করতে লাগল এবং

---

৪৯৩ যাদুল মাআদ ২/১০৯। ইবনে হিশাম ২/৬১৯,৬২০।

যেতে বাধ্য করল। কিন্তু তারপরও যখন তিনি কঠিন অস্বীকৃতি জানালেন তখন তারা তাকে হত্যা করে ফেলল এবং যায়দ ও খুবাইব রা. কে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দিলো। তারা দু'জন বদর যুদ্ধে মক্কী বাহিনীর বড় বড় নেতাদেরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব রা. কে তারা প্রথমে বন্দী করে রাখে। এরপর তারা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তাঁকে হারাম থেকে বের করে তানঈমে নিয়ে আসে। যখন তারা তাকে শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল তখন তিনি বললেন, তোমরা আমাকে দুই রাকাআত নামায পড়তে দাও! তারা তাকে পড়তে দিলো। তিনি নামায পড়ে নিলেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা না বলতে যে, সে ভয় পেয়ে গেছে তাহলে আমি নামায আরও দীর্ঘায়িত করতাম। এরপর তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে আপনি এক এক করে গুণে রাখুন! এরপর তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিন!! তাদের একজনকেও আপনি ছাড়বেন না!!! এরপর তিনি নিম্নলিখিত কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন,

لَقَدْ اَجْمَعَ الْأَحْزَابُ حَوْلِي وَأَلَّبُوا ... قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ

وَقَدْ قَرَّبُوْا أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ ... وَقُرِّبْتُ مِنْ جِذْعٍ طَوِيلٍ مُمَنَّعِ

إِلَى اللّٰهِ أَشْكُوْ غُرْبَتِي بَعْدَ كُرْبَتِي ... وَمَا جَمَعَ الْأَحْزَابُ لِي عِنْدَ مَضْجَعِي

وَقَدْ خَيَّرُونِي الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُ ... وَقَدْ ذَرَفَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَدْمَعِ

فَذَا الْعَرْشِ، صَبِّرْنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي ... فَقَدْ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدْ بُؤْسَ مَطْمَعِي

وَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ فِي اللّٰهِ مَضْجَعِيْ

وَذٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'বহু লোকজন আমার চারপাশে সমাবেশ করেছে। নিজেদের কবীলাগুলোকে উত্তেজিত করে তুলেছে। সকল মজমা এখন এখানে জমা করে বসেছে।

নারী ও শিশুদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আর আমাকে একটি শক্ত লম্বা খেজুরকাণ্ডের কাছে আনা হয়েছে।

আমি আমার প্রবাসের দুরবস্থা আর আমার মৃত্যুর বধ্যভূমিতে এ সকল দলের জড়ো করা বিপদের নালিশ আল্লাহর কাছেই করছি।

তারা আমাকে কুফরীর ইখতিয়ার দিয়েছিল; অথচ, মৃত্যু তাঁর চেয়ে কত সোজা ও সহজ! আমার চোখ অশ্রুসজল; কিন্তু তাতে অশ্রু নেই।

হে সম্মানিত আরশ অধিপতি! আমার বিরুদ্ধে দুশমনের দুষ্কর্মের ওপর আমাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দিন।

তারা আমার মাংস টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আমার আহার নষ্ট হয়েছে।

আমি মুসলমান হয়ে মরব এ কারণে আল্লাহর পথে কোন্ ক্ষেত্রে আমি মারা যাব তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই।

আর এ সব তো আল্লাহর জন্যই; যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে এ টুকরো টুকরো মাংসপিণ্ডগুলিও বরকতের ছোঁয়ায় ধন্য করবেন'!

আবু সুফিয়ান তাকে বলল, যদি তোমার স্থানে এখানে মুহাম্মাদকে এনে আমরা তাঁর গরদান উড়িয়ে দেই, আর তাঁর পরিবর্তে তোমাকে তোমার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়- তবে কি তোমার আনন্দ লাগবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এমনটি কখনো হতে পারে না। আমি আমার পরিবারের মধ্যে থাকব, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এখানে এনে তার গায়ে একটি কাঁটা ফুঁটানো হবে, আমি তাও কোনো দিন পছন্দ করব না। এরপর তারা তাকে ফাঁসিতে ঝুলালো এবং তাঁর লাশ পাহারা দেওয়ার জন্য লোক রেখে গেল। কিন্তু আমর বিন উমাইয়্যা যমরী রা. রাতের বেলা এসে কৌশলে তার লাশটি নিয়ে গিয়ে দাফন করে দিলেন। খুবাইব রা.কে হত্যার দায়িত্ব নিয়েছিল উকবা ইবনুল হারিস। কারণ, খুবাইব রা. বদর যুদ্ধে উকবার পিতা হারিসকে হত্যা করেছিলেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে, খুবাইবই রা. সর্ব প্রথম মৃত্যুর সময় দুই রাকাআত নামায আদায়ের সুন্নাত জারী করেন। তাকে যখন বন্দী করে রাখা হয়েছিল তখন অনেকে তাকে আঙ্গুরের ছড়া নিয়ে খেতে দেখেছিল। অথচ, গোটা মক্কায় তখন আঙ্গুরের নাম-গন্ধও ছিল না।

অপরদিকে যায়দ ইবনে দিসান্নাকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা কিনে নেয় এবং তার পিতার বদলে তাকে হত্যা করে।

আসেম রা. কে শহীদ করে দেওয়ার পরে কুরাইশরা তার শরীর থেকে কিছু নিয়ে আসার জন্য একদল লোক পাঠায়। কারণ, তিনি বদর যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় নেতাগুলিকে বেছে বেছে বের করে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার লাশের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বিষাক্ত ভীমরুল প্রেরণ করেন। ফলে তারা তার লাশের ধারে কাছেও আসতে পারল না। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে দুশমনের হাত থেকে রক্ষা করলেন। তারা তাকে কিছুই করতে পারল না। আসেম রা. আল্লাহর কাছে এই অঙ্গীকার করেছিলেন যে, কোনো মুশরিক যেন তাকে স্পর্শ না করে এবং তিনিও কোনো মুশরিককে স্পর্শ না করেন। উমর রা. এর কাছে যখন তার শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলার নিজ মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর পরেও হেফাযত করেন, যেভাবে করেন তার জীবদ্দশায়।[৪৯৪]

[৪৯৪] ইবনে হিশাম ২/১৬৯-১৭৯। যাদুল মাআদ ২/১০৯। সহীহ বুখারী ২/৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭৫।

'বীরে মাউনা' ট্র্যাজিডি

যে মাসে রজী'র ঘটনা ঘটল ঐ একই মাসে এমন আরেকটি ট্র্যাজিডির জন্ম হয়, যা আগের সেই ট্র্যাজিডির তুলনায় অনেক বেশি ভয়াবহ ও শোকবহুল ছিল। আর ইসলামের ইতিহাসে এটাই 'বীরে মাউনা' ট্র্যাজিডি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বীরে মাউনা ট্র্যাজিডির সংক্ষিপ্ত বিবরণ : 'মুলাইবুল আসিন্নাহ' (বর্শা-খেলাড়ু) নামে কথিত আবু বারা আমের ইবনে মালিক মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন; কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করল না আবার দূরেও সরে থাকল না। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি নজদবাসীদের কাছে আপনার সাহাবায়ে কেরামের একটি দল পাঠাতেন, যারা তাদেরকে আপনার দীনের প্রতি ডাকত, তবে আমার আশা তারা তাদের ডাকে সাড়া দিত! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তাদের ব্যাপারে আমি নজদবাসীকে ভয় করি।** আবু বারা বলল, আমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে চল্লিশ জন সাহাবায়ে কেরাম রা. কে পাঠিয়ে দিলেন- এটা ইবনে ইসহাকের মত। আর সহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন- আর এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তাদের আমীর নিযুক্ত করা হলো বনু সায়িদার 'মু'নিক লিয়ামূত' নামে খ্যাত মুনযির ইবনে আমর রা.কে। এই কাফেলার সদস্য সাহাবায়ে কেরাম রা.এর সবাই ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান, বিজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও ক্বারী। তারা এ ভাবে চলতে লাগলেন যে, দিনের বেলায় কাঠ কুড়াতেন আর সেগুলো বিক্রি করে আহলে সুফ্‌ফার জন্য খাবার কিনতেন। কুরআন পাঠ করতেন আর রাতের বেলা নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এভাবে তারা বনু আমের ও হাররায়ে বনু সুলাইমের মাঝখানের ভূমিতে বীরে মাউনা নামক কূপের কাছে অবতরণ করলেন। এরপর সাহাবায়ে কেরাম উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মিলহান রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র দিয়ে আল্লাহর দুশমন আমের বিন তুফাইলের কাছে পাঠালেন। সে চিঠিটির দিকে একবার চেয়েও দেখল না। বরং এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিলো- সে তার পেছনের দিক থেকে বর্শা মেরে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিলো। রক্ত দেখে হারাম রা. বললেন, আল্লাহু আকবার! কা'বার রবের শপথ! আমি কামিয়াব হয়ে গেছি।

এরপর আল্লাহর এ দুশমন বাকি সদস্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য গোটা বনু আমেরকে বের হতে বলল। কিন্তু আবু বারার নিরাপত্তা দেওয়ার কারণে তারা তার

ডাকে সাড়া দিলো না। এ দরজা থেকে নিরাশ হয়ে সে বনু সুলাইমের দরজায় আওয়াজ দিলো। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল ও যাকাওয়ান এই তিন কবীলা তার ডাকে সাড়া দিলো। তারা সবাই ছুটে এসে সাহাবায়ে কেরামকে ঘিরে ধরল। এত দুশমনের মাঝে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামকে যেন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও উভয় পক্ষের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ হলো এবং শুধু কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রা. ব্যতীত একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। তাকে আহত অবস্থায় শহীদানের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হলো। এরপরে তিনি সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান এবং খন্দক যুদ্ধের দিন শাহাদাত বরণ করেন। অপর দুই সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যমরী ও মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমের মুসলমানদের উট চরাচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলের ওপর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়তে দেখলেন। মুনযির এটা দেখে এগিয়ে এসে রণাঙ্গনে অবতরণ করেন এবং সঙ্গীদের সঙ্গে শাহাদাত বরণ করেন। আর আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. বন্দী হন। পরক্ষণে দুশমনরা যখন জানতে পারে যে, তিনি মুযার গোত্রের তখন আমের তার কপালের চুলগুলি কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ থেকে আযাদ করে দেয়।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. ইসলামের ওপর এ মরণাঘাতের বেদনাদায়ক দুঃসংবাদ নিয়ে দরবারে রিসালতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ও প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরামের শাহাদাতের ট্র্যাজিডি তুলে ধরলেন। এতে উহুদ যুদ্ধে যে যখম সৃষ্টি হয়েছিল তা আবার দগদগে তাজা হয়ে গেল। তারপরও সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা ছিল, তা হলো প্রথম দল শহীদ হয়েছিল আল্লাহর পথে দুশমনের সঙ্গে যুদ্ধ করে; আর দ্বিতীয় দল শহীদ হলেন চরম মুনাফেকী আর গাদ্দারির বেদিতে বলি হয়ে।

ফেরার পথে আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী যখন কানাত উপত্যকার শুরুতে কারকারাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন সেখানে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন। বনু কিলাবের দু'জন লোকও এসে তখন সে গাছতলায় বিশ্রাম গ্রহণ করে। যখন তারা দু'জন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমর রা. তাদেরকে হত্যা করে ফেললেন। তিনি তখন ভেবেছিলেন, এই বুঝি তার সঙ্গীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হলো। অথচ তাদের দু'জনের সঙ্গে যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুক্তি ছিল তা তিনি মোটেই জানতেন না। মদীনায় আসার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, তুমি এমন দুই ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, যাদের রক্তপণ আমাকে দিতেই হবে। এরপর রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান ও তাদের মিত্র ইহুদিদের কাছ থেকে রক্তপণের টাকা আদায় করতে লাগলেন।[৪৯৫] আর এটাই পরবর্তী সময়ে গাযওয়ায়ে বনু নযীরের কারণ হয়েছিল। সামনে সেগুলো আলোচনা করা হবে ইনশা-আল্লাহ!

হাতে গনা মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে দুই দু'টি (রজী' অভিযান ও বীরে মাউনা) দুঃখজনক ট্র্যাজিডি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে নিদারুণ ব্যথা দিয়েছিল।[৪৯৬] সীমাহীন আঁধিপীড়া আর মনোকষ্ট পাহাড় হয়ে জমে বসেছিল তার অমলিন দিলের পিঠে। এ যন্ত্রণায় তাঁর ধৈর্যের বাঁধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।[৪৯৭] তিনি এ সকল গাদ্দার আর বিশ্বাসঘাতক কওমগুলির জন্য বদদুআ করলেন। সহীহ বুখারী শরীফে আনাস রা. থেকে বর্ণিত, বীরে মাউনা প্রান্তরে যারা অন্যায়ভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করে দিয়েছিল, তিনি টানা ত্রিশ দিন ভোরে তাদের জন্য বদদুআ করলেন। ফজরের নামাযে তিনি রি'ল, যাকাওয়ান, লাহইয়ান ও উসাইয়্যার ওপর বদদুআ করতেন আর বলতেন, উসাইয়্যা (তুচ্ছ নাফারমান) আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফারমানি করেছে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আয়াত নাযিল করেন। আমরা তখন সে আয়াত পাঠ করতাম কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা মানসূখ হয়ে যায়। আয়াতটি ছিল, আমাদের কওমকে জানিয়ে দাও, আমরা আমাদের রবের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তিনি আমাদের ওপর রাযী আছেন, আমরাও তার ওপর রাযী আছি। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুনূত পড়া ছেড়ে দেন।[৪৯৮]

গাযওয়ায়ে বনু নযীর

যেদিন থেকে এই পৃথিবীতে ইহুদি জাতির যাত্রা শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, গাদ্দারী আর বিশ্বাসঘাতকতা তার চরিত্রের অপরিহার্য উপাদান ছিল। তাই ইহুদিরা শুরু থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের নিত্যদিনের উত্থান আর উন্নতি দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। ক্রোধে আর আক্রোশে তারা ঠোঁট কামড়াচ্ছিল- যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তাই আজ পর্যন্ত ইসলাম ও

---

[৪৯৫] দেখুন ইবনে হিশাম ২/১৮৩-১৮৮। যাদুল মাআদ ২/১০৯। সহীহ বুখরী ২/৫৮৪, ৫৮৬।

[৪৯৬] ইবনে সা'দ উল্লেখ করেন, আসহাবে রজী' আর আসহাবে বীরে মাউনার লোমহর্ষক ট্র্যাজিডি রাসূলে কারীম সা. এর নিকট একই রাতে এসে পৌছেছিল- তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/৫৩।

[৪৯৭] আনাস রা. থেকে ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে কারীম সা. কে অতটা ব্যথিত আর কোনোদিনও হতে দেখিনি যতটা হয়েছিলেন আসহাবে বীরে মাউনার কারণে- তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/৫৪।

[৪৯৮] বুখারী ২/৫৮৬-৫৮৮।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা মারামারির পথে তারা গিয়েছিল না ; বরং তারা অগ্রসর হচ্ছিল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য তথা ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের কুটিল পথ ধরে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের চুক্তি ও অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও তাদের ওপর যে কোনো ধরনের বালা-মুসীবত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য হাজারো পথ ও পন্থা উদ্ভাবন করছিল কিন্তু কোনোদিন সরাসরি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে আসেনি। তাছাড়া বনু কাইনুকা'র নির্বাসন আর কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনায় তারা আরও ভড়কে গিয়েছিল। ফলে তখন থেকে তারা সেয়ানা মুন্সীর মতো সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ও নীরব হয়ে গিয়েছিল। সব ধরনের লাফালাফি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল।

কিন্তু উহুদ যুদ্ধের পর তাদের স্পর্ধা আবারও বেড়ে যায়। এবার তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও দুশমনি দেখাতে থাকে। মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে তারা গোপন আঁতাত করার চেষ্টা করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের কল্যাণের জন্য দিনরাত কাজ করে যেতে থাকে।[৪৯৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কিছু না বলে চুপ করে দেখছিলেন তারা কতটা বাড়তে পারে? কিন্তু রজী' অভিযান ও বীরে মাউনার ঘটনার পরে তাদের এ দুঃসাহস ও স্পর্ধা আরও বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে তারা মানবিকতার সকল সীমা-পরিসীমা ছাড়িয়ে যায়। স্বয়ং সাহেবে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন নাশের অপচেষ্টা চালায়।

ঘটনার পূর্ণ বিবরণ হলো : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাআত নিয়ে ইহুদিদের কাছে গেলেন। তিনি তাদের কাছে আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরীর হাতে নিহত বনু কিলাবের ব্যক্তিদ্বয়ের জন্য রক্তপণ চাইলেন। কেননা, এটা মুসলমানদের সঙ্গে তাদের চুক্তির শর্তভুক্ত ছিল। তখন তারা বলল, আবুল কাসেম! ঠিক আছে,আপনি এখানে বসুন! আমরা আপনার প্রয়োজন মিটিয়ে দিচ্ছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে তখন আবু বকর, উমর, আলী ও সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাত ছিল।

অতঃপর ইহুদিরা যখন এদিকে নির্জনে মিলিত হলো, শয়তান তাদের ওপর জেঁকে বসলো। হতভাগাদের সর্বনাশা পথকে শয়তানী ভেল্কিতে বাহারী রূপ দিয়ে তাদের সামনে পরিবেশন করা হলো। তারা এবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

---

[৪৯৯] সুনানে আবী দাউদ: নযীর অধ্যায় ৩/১১৬, ১১৭ (আওনুল মা'বুদ ফী শরহে সুনানে আবী দাউদ)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে বসল। তারা বলল, তোমাদের কে এই জাঁতাটি উঠিয়ে মুহাম্মাদের মাথার ওপর ছেড়ে দিতে পারবে? তখন বদবখত ইহুদি আমর ইবনে জিহাশ বলল, আমি পারব। সাল্লাম ইবনে মিশকাম তাদেরকে বলল, তোমরা এ কাজ করতে যেও না! আল্লাহর কসম! তোমরা যা করতে যাচ্ছ, তাকে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। তা ছাড়া এটা তোমাদের ও তার মাঝে কৃত চুক্তিনামার বিপরীত কাজ হবে। কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পনায় অনড় থাকল।

এদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে জিবরাঈল আ.নেমে এলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুত সেখান থেকে উঠে মদীনার পথ ধরলেন। পরে সাহাবায়ে কেরাম তার সঙ্গে মিলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি উঠে গেলেন অথচ আমরা টেরও পেলাম না? তিনি তখন তাদেরকে ইহুদিদের দুরভিসন্ধির কথা খুলে বললেন।

এরপরেও ইহুদিদের বিরুদ্ধে নীরবতা অবলম্বন করা সমীচীন ছিল না। তাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. কে তাদের কাছে এ কথা বলে পাঠিয়ে দিলেন যে, **তোমরা মদীনা থেকে বের হয়ে যাও! আমাদের সঙ্গে তোমরা আর এখানে থাকতে পারবে না!! এর জন্য তোমাদের সর্বমোট সময় হলো দশ দিন। এরপর যাকে এখানে পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা করা হবে!** মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়া ছাড়া ইহুদিদের সামনে দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা ছিল না। এ কারণে তারা কয়েকদিন লাগিয়ে সফরের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। ঠিক এ সময় আবার তাদের কাছে এসে উপস্থিত হলো আরেক নরশয়তান রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল। সে তাদের নিকট সংবাদ পাঠালো: তোমরা তোমাদের জায়গায় স্থির থাকো। তোমাদের ঘর বাড়ি থেকে তোমরা বের হয়ো না। কেননা, আমার সঙ্গে দুই হাজার লোক আছে, তারাও তোমাদের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের জন্য তাদের প্রাণ বিলিয়ে দিবে।

لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ.

তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনো কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। [সূরা হাশর:১১]

তা ছাড়া বনু কুরাইযা ও বনু গাতফানে তোমাদের মিত্ররাও তোমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে।

রঈসুল মুনাফিকীনের এ অভয় শুনে ইহুদির প্রাণে পানি ফিরে এলো। তাদের ভেতরে আস্থা আর মনোবল তৈরি হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে

যাওয়ার ওপর সিদ্ধান্ত স্থির হলো। রঈসুল মুনাফিকীনের কথার প্রতি তাদের নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব পুরোপুরি লালায়িত হয়ে উঠল। তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বলে পাঠালো, আমরা আমাদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হবো না। এখন তোমার যা মন চায় করতে পারো।

সন্দেহ নেই, এটি ছিল মুসলমানদের জন্য এক বড় নাযুক সময়। কেননা, এই খতরনাক ও নাযুক সময়ের বাঁকে দুশমনের সঙ্গে তাদের সংঘাত আর সংঘর্ষের ইতিহাস খুব একটা সন্তোষজনক ছিল না। তারা দেখছিল, গোটা আরব তাদের বিরুদ্ধে পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে আছে। সুযোগ পেলেই হয়তো কামড়ে বসবে। তা ছাড়া দুই দু'টি তাবলীগী জামাতকে কতটা নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে সে সম্পর্কেও তাদের খবর ছিল। পাশাপাশি মদীনার বনু নযীরের ইহুদিদের যতটা সমরশক্তি ছিল তাতে তাদেরকে পরাজিত করা অতটা চাট্টিখানি ব্যাপার ছিল না; বরং এক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে মুসলমানদের জন্য শ্বাপদসংকুল পথ মাড়াতে যাওয়া ছিল। কিন্তু বীরে মাউনার দুর্ঘটনার আগে দুশমনের পক্ষ থেকে তাদের যে যখমগুলি শুকিয়ে যাচ্ছিল বীরে মাউনার পরে তা আবার দগদগে তাজা হয়ে গেল। তাছাড়া একের পর এক গাদ্দারি আর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে এখন তারা আগের চেয়ে অনেকটা সজাগ ও সচেতন হয়ে গিয়েছিল। এখন ঐ সকল অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার আগুন তাদের ভেতরে শতগুণ তেজে জ্বলে উঠেছিল। এ কারণে সর্বশেষ তারা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাদের বিরুদ্ধে লড়ার সুদৃঢ় সংকল্প করলেন- পরিণতি যাই হোক, সেগুলি নিয়ে তাদের ভাবার সময় ছিল না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন হুয়াই ইবনে আখতাবের জবাব পৌছল তখন তিনি ও সাহাবায়ে কেরাম তাকবীর দিলেন। এরপর তিনি তাদের মুকাবেলায় বের হলেন। সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম রা. কে মদীনার দায়িত্ব দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নযীরের ইহুদিদের দিকে রওয়ানা হলেন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর হাতে। বনু নযীরের বস্তিতে পৌছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর অবরোধ জারী করে দিলেন।

বনু নযীর তাদের দুর্গে আশ্রয় নিয়ে দুর্গের ওপর উঠে মুসলমানদের ওপর তীর আর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। তাদের খেজুর গাছ আর বাগ বাগিচা ছিল রসদপত্রের সরবরাহ কেন্দ্র। এ কারণে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলি কেটে জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবি হাস্‌সান রা. বলেন,

وَهَانَ عَلَى سُرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ

'বুওয়াইরার খেজুর বাগানে বিস্তীর্ণ আগুন বনু লুওয়াইর সরদারদের জন্য ছিল মামুলী ব্যাপার'। (বুওয়াইরা ছিল বনু নযীরের খেজুর বাগানের নাম)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ.

তোমরা যে খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ অথবা তা তার কাণ্ডের ওপর ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। [সূরা হাশর:৫]

যখন তাদেরকে অবরোধ করা হলো তখন বনু কুরাইযা তাদের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও বনু গাতফানের তাদের মিত্ররা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। এ কারণে কেউ তাদেরকে কোনো উপকার করতে কিংবা তাদের থেকে কোনো বিপদ দূর করতে এগিয়ে আসেনি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের ঘটনার উপমা দিয়েছেন ঠিক এভাবেঃ

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ.

তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। [সূরা হাশর : ১৬]

অবরোধ বেশি দিন স্থায়ী হলো না। মাত্র ছয় দিন চলল। অবশ্য কারও কারও মতে, অবরোধের মুদ্দত ছিল পনেরো দিন। এরই ভেতরে আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ভীতি ঢেলে দেন। তখন তারা চুপসে যায় এবং আত্মসমর্পণ করে হাতিয়ার জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ পাঠায়, আমরা মদীনা থেকে বের হয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এই শর্তে দুর্গ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিলেন যে, একমাত্র হাতিয়ার ব্যতীত উটের পিঠে করে ধন-সম্পদ হতে যা কিছু তারা নিয়ে যেতে পারে সেগুলো নিয়ে স্ত্রী-পরিজনসহ যেন বের হয়ে যায়।

এই শর্ত মেনে নিয়ে তারা দুর্গ থেকে নেমে যায়। যাওয়ার সময় ঘরের দরজা ও জানাগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেদের হাতে তারা নিজেদের ঘর ভেঙে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘরের চৌকাঠ ও ছাদের আড়াটা পর্যন্ত ফেলে রেখে যায়নি। এরপর তারা স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদেরকে তুলে নিলো। মোট ছয় শ' উটের পিঠে তারা মালামাল বোঝাই করল। তাদের সিংহভাগ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ-

যেমন হুয়াই ইবনে আখতাব, সাল্লাম ইবনে আবীল হুকাইক খাইবরের দিকে রওয়ানা হলো। একদল চলে গেল সিরিয়ার দিকে। আর মাত্র দু'জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে। তারা ছিল ইয়ামীন ইবনে আমর এবং আবু সা'দ ইবনে ওহাব। তাদেরকে তাদের ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের হাতিয়ারগুলি হস্তগত করে নেন। পাশাপাশি তাদের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পদ নিজ অধিকারে নিয়ে নেন। হাতিয়ার ছিল সর্বসাকুল্যে পঞ্চাশটি লৌহবর্ম, পঞ্চাশটি শিরস্ত্রাণ আর তিনশ' চল্লিশটি তরবারি।

বনু নযীরের জায়গা-জমি ও ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলা কেবল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দান করেছিলেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করবেন সেভাবেই তা ব্যয় করতে পারবেন। আর তা থেকে কোনো 'খুমুস' বের করা হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা বিশেষভাবে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে চড়ে তাদের ওপর হামলা চালায়নি। তবে তিনি তা শুধু প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। আর আনসারদের মধ্য থেকে কেবল আবু দুজানা রা. ও সাহল ইবনে হুনাইফ রা. কে দিলেন। কারণ, তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সম্পদ থেকে বছর ভরে উম্মাহাতুল মুমিনীনের খরচ দিতেন। এরপর যা কিছু রয়ে গিয়েছিল, সেগুলি জিহাদের সামান তথা হাতিয়ার ও ঘোড়া ক্রয় বাবদ দান করে দিয়েছিলেন।

বনু নযীরের এ ঘটনা ঘটেছিল চতুর্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পুরো সূরা হাশর নাযিল করেন। তাতে তিনি ইহুদিদের বিতাড়নের চিত্র অঙ্কন করেন। সেখানে মুনাফিকদের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করেন। 'ফাই' সম্পর্কিত বিস্তারিত আহকাম বর্ণনা করেন। মুহাজির ও আনসাদের প্রশংসা করেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সামরিক উপকারিতার নিমিত্ত দুশমনের বস্তিতে কাটাকাটি কিংবা পোড়াপুড়ির বৈধতা বর্ণনা করেন। পাশাপাশি বলে দেন, এটা ভূপৃষ্ঠে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অন্তর্ভুক্ত নয়। শেষের দিকে মুমিনদেরকে তাকওয়া ও আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উপদেশ দেন এবং উপসংহারে নিজ সত্তার প্রশস্তি, আসমায়ে হুসনা ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর একটা ঝলক দেখিয়ে সূরা শেষ করেন।

সূরা হাশর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা. বলতেন, তোমরা একে সূরা বনী নযীর বলো![৫০০]

---

[৫০০] ইবনে হিশাম ২/১৯০-১৯২। যাদুল মাআদ ২/৭১, ১১০। সহীহ বুখারী ২/৫৭৪,৫৭৫।

এই ছিল গাযওয়ায়ে বনু নযীর সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বিশেষত ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সারনির্যাস। তবে ইমাম আবু দাঊদ এবং আব্দুর রায্যাক র. প্রমুখ এই গাযওয়ার পেছনে ভিন্ন আরেকটি কারণ বর্ণনা করেন। আর তা হলো, বদর যুদ্ধের পরে কুরাইশ কাফেররা ইহুদিদের কাছে পত্র লিখেছিল যে, তোমরা বর্ম ও দুর্গের অধিবাসী। সুতরাং, এখন তোমরা হয় আমাদের সঙ্গীর সঙ্গে সংঘাত চালিয়ে যাও নতুবা আমাদের পক্ষ থেকে অমুক অমুক শাস্তির জন্য তৈরি হয়ে যাও। আমাদের ও তোমাদের নারীদের অলঙ্কারের মাঝে তখন আর কেউ অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। যখন ইহুদিদের কাছে এই পত্র এসে পৌঁছে তখন বনু নযীর মুসলমানদের সঙ্গে গাদ্দারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ পাঠায়, আপনি আপনার ত্রিশ জন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বের হোন! আর আমরাও আমাদের ত্রিশ জন আলেম নিয়ে বের হবো। অমুক স্থানে আমাদের মুকাবিলা হবে। অতঃপর তারা আপনার কথা শুনবে। আপনার কথা শুনে যদি তারা আপনার ওপর ঈমান আনে, তবে আমরা সবাই আপনার ওপর ঈমান আনব। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ত্রিশ জন সাহাবী নিয়ে বের হলেন। ইহুদিদের মধ্য থেকেও ত্রিশ জন আলেম বের হলেন। একটা খোলা প্রান্তরে পৌঁছে ইহুদিরা একে অপরকে বলল, ত্রিশ জন মানুষের ভেতরে কীভাবে তোমরা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছবে। যাদের প্রত্যেকেই তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সুতরাং, তার কাছে তোমরা সংবাদ পাঠাও যে, ষাট জন মানুষ এক জায়গায় থেকে আমরা কীভাবে আপনাদের কথা শুনব? আর আপনারাও বা কীভাবে আমাদের কথা শুনবেন? তার চে' ভালো আপনি সর্বমোট তিন জন সাহাবী নিয়ে বের হোন! আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেম নিয়ে বের হবো। এরপর তারা আপনার বক্তব্য শুনবে। যদি তারা আপনার ওপর ঈমান আনে, তবে আমরা সবাই আপনার ওপর ঈমান আনব এবং আপনাকে সত্যায়ন করব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তিনজন সাহাবী নিয়ে বের হলেন। অপরদিকে ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার জন্য সঙ্গে খঞ্জর লুকিয়ে নিয়ে এলো। কিন্তু ইতোমধ্যে বনু নযীরের এক হিতৈষী নারী তার ভাই আনসারী মুসলমানের কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ইহুদিদের গাদ্দারীর পরিকল্পনার সংবাদ পাঠিয়ে দিলো। তার ভাই দ্রুত ছুটে এসে রাস্তায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পেয়ে যায় এবং সেখানে তিনি পৌঁছার আগেই তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকেই ফিরে যান। পরের দিন সকাল বেলা বাহিনী নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের বস্তিতে এসে তাদের ওপর অবরোধ জারী করেন এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা যতক্ষণ না

আমার সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। কিন্তু তারা কোনো অঙ্গীকার করতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন মুসলমানরা সেদিনই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলেন। পরের দিন সকাল বেলা ঘোড়া ও সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনু নযীরকে ছেড়ে বনু কুরাইযার ওপর চড়াও হলেন এবং তাদেরকে অঙ্গীকার করার কথা বললেন। তারা অঙ্গীকার করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে ফিরে আসেন এবং বাহিনী নিয়ে বনু নযীরের দিকে গমন করেন। পরিশেষে হাতিয়ার ব্যতীত উট যা বহন করে নিতে পারে সেগুলো নিয়ে নির্বাসনের শর্তে বনু নযীরকে দুর্গ থেকে নামিয়ে আনেন। তখন বনু নযীর নেমে এলো এবং সামান ও রসদপত্র, ঘরের দরজা-জানালা ও লাকড়ী ইত্যাদিসহ উটের পিঠে যা বহন করতে পারল সেগুলো নিয়ে নেমে এলো। যাওয়ার আগে তারা নিজের হাতে নিজেদের ঘরগুলি ভেঙে চুরে বিরান করে দিয়ে সেগুলো দিয়ে লাকড়ী বানিয়ে তা নিয়ে গেল। এই নির্বাসনই ছিল সিরিয়ার তাদের সর্বপ্রথম সমাবেশ।[৫০১]

গাযওয়ায়ে নজদ

কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়াই বনু নযীরের ওপর মুসলমানদের এই অপ্রত্যাশিত বিজয়ে মদীনা ও তার আশপাশে মুসলমানদের উপস্থিতি ও অবস্থিতি আবারও শক্তিশালী ও মযবুত হলো। আর মুনাফিকরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের ষড়যন্ত্র ও কুটিল চক্রান্তের দরুন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার মদীনার চারপাশের মরুচারী যাযাবর বেদুঈন জাতিগোষ্ঠীগুলোর লাফালাফি বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা উহুদ যুদ্ধের পর থেকে মুসলমানদেরকে জ্বালিয়ে আসছিল, মুসলমানদের পাঠানো বিভিন্ন জামাতকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা মদীনার ওপর আক্রমণের দুঃসাহসী পরিকল্পনা করছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনো ঐ সকল গাদ্দারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি ঠিক এমন সময় তাঁর কাছে সংবাদ এলো যে,গাতফানের বনু মুহারিব, বনু সালাবার বেদুঈনরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন। একারণে তিনি নজদের মরুভূমির মধ্যে অনেক দূর ঢুকে গেলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুশমনের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি করা, যাতে তারা দ্বিতীয়বার এ ধরনের দুঃসাহস দেখাতে না পারে ।

---

[৫০১] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক ৫/৩৫৮-৩৬০, হাদীস নং ৯৭৩৩। সুনানে আবী দাউদঃ খারাজ, ফাই, প্রশাসন পর্বঃ বনু নযীর অধ্যায় ২/১৫৪।

এদিকে লুটপাট ও লুণ্ঠনের জন্য প্রস্তুত দুশমন যখন মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেল, সঙ্গে সঙ্গে তারা পর্বত শিখরে লুকিয়ে পড়ল। বিভিন্ন গিরি-গুহা আর ঘাঁটিতে গিয়ে তারা আশ্রয় নিল। এভাবে মুসলিম বাহিনী তাদের মনের ভেতরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসে।

সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞরা এ সময় তথা চতুর্থ হিজরীর রবীউস সানী কিংবা জুমাদাল উলা মাসে নজদ এলাকায় আরও একটি নির্দিষ্ট গাযওয়া সংঘটিত হওয়ার কথা বলেন। তারা এটাকে গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা নামে আখ্যায়িত করেন। তাহক্বীক ও গবেষণার পরে আমরা যে জিনিসটি হাতে পাই তা হলো,এ সময় নজদ এলাকায় যে একটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল- তা বলা যায় হলফ করে। কেননা, পরিবেশই তখন এমন ছিল না। উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবু সুফিয়ান বদর প্রান্তে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল,সেই প্রতিশ্রুতির সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। আর এটা তখন সমর কুশলতার দাবি ছিল না যে,বেদুঈন ও মরুচারী যাযাবর জাতিগোষ্ঠীগুলোকে তাদের দম্ভ ও অহঙ্কারের ওপর ছেড়ে দিয়ে মুশরিকদের মুকাবিলার জন্য মদীনা খালি করে বদর পর্যন্ত চলে যাবেন। তাই সমীচীন বরং জরুরি ছিল এ ধরনের একটি বিশাল অভিযানে যাওয়ার আগে তাদের কাঁটা উপড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত মনে বের হওয়া।

কিন্তু যে কথাটি এখনো রয়ে যায়, তা হলো চতুর্থ হিজরীর রবীউস সানী কিংবা জুমাদাল উলা মাসে সংঘটিত এ গাযওয়াকে 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' হিসেবে সাব্যস্ত করা ঠিক হবে না। কেননা গাযওয়ায়ে যাতুর রিকাতে আবু হুরাইরা রা. ও আবু মূসা আশআরী রা. শরীক ছিলেন। আর এটা তো সুনিশ্চিত যে, আবু হুরাইরা রা. খাইবর যুদ্ধের মাত্র কয়েকদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু মূসা আশআরী রা. সর্বপ্রথম খাইবরে এসেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাৎ পান। এ হিসেবে বলা যায়, গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা সংঘটিত হয়েছিল গাযওয়ায়ে খাইবরের পরে। তা ছাড়া এখানে আরও একটি প্রমাণ রয়েছে, তা হলো 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সালাতুল খওফ' তথা ভয়ের নামায আদায় করেন। আর সালাতুল খওফ সর্বপ্রথম শরীয়তসিদ্ধ হয়েছিল গাযওয়ায়ে উসফান-এ। আর সর্বসম্মতিক্রমে গাযওয়ায়ে উসফান সংঘটিত হয়েছিল খন্দক যুদ্ধের পরে। আর খন্দক যুদ্ধ হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে।

গাযওয়ায়ে বদরে সানিয়্যা (দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ)

বেদুঈন ও যাযাবর গোষ্ঠীকে ঠাণ্ডা করার পরে মুসলমানরা এবার তাদের বড় দুশমনের সঙ্গে রণাঙ্গনে আরেকবার মিলিত হওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগল। বছর ঘুরে এসে আবু সুফিয়ানের সঙ্গে উহুদ প্রান্তরে দেওয়া প্রতিশ্রুতির সময়টুকু শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে

কেরামের বের হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। যাতে দুই দল মুখামুখি হয়ে উহুদ প্রান্তরে যে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি এখন সেটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারে। যারা টিকে থাকার যোগ্য ও উপযুক্ত, একমাত্র তারাই যেন টিকে থাকে।

চতুর্থ হিজরীর শা'বান মোতাবেক ৬২৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে দশটি ঘোড়াসহ পনেরো শ' সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হন। মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর হাতে। আর মদীনার যিম্মাদারি দিয়ে আসা হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. এর হাতে। বদর প্রান্তরে পৌছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কী বাহিনীর আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অপরদিকে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশটি ঘোড়াসহ দুই হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা থেকে যাত্রা করে এক মঞ্জিল দূরে মাররুয যাহরানে এসে পৌছে মাজান্না নামক প্রসিদ্ধ একটি কূপের পাড়ে তাঁবু ফেলে। কিন্তু মক্কা থেকেই তার মনের অবস্থা ছিল বড় করুণ। প্রচণ্ড এক ভীতি তাকে কাবু করে ফেলেছিল। তার সাহস আর বীরত্বের ওপর চড়ে বসেছিল। অতঃপর যখন সে মাররুযাহরানে এসে অবতরণ করে তখন সে আরও ভেঙে পড়ে। সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এখন সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার বিভিন্ন ফন্দি আঁটতে শুরু করে। তখন সে তার সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বলে, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের এ ধরনের একটি যুদ্ধের জন্য একটি সুন্দর ও উর্বর বছর দরকার ছিল। কিন্তু দেখ এ বছরটি বড়ই দুর্ভিক্ষ আর খরার বছর। এ কারণে আমি এখন ফিরে যাওয়াই যথার্থ মনে করছি; তোমরাও আমার সঙ্গে ফিরে চলো! সৈন্যবাহিনীর মনের অবস্থাও ছিল ঠিক সেনানায়কের অনুরূপ। কারণ, সে যখন এই মত প্রকাশ করল, তখন গোটা বাহিনীর একজন মানুষও এর কোনো প্রতিবাদ করল না। বরং চুপসে গিয়ে অবুঝ বালকের মতো সবাই তার কথায় সায় দিয়ে মক্কার পথ ধরল।

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর প্রান্তরে দীর্ঘ আট দিন শত্রুর অপেক্ষায় বসে থাকলেন। সেখানে তারা তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক আসবাবপত্র বিক্রি করলেন এবং প্রত্যেক এক দিরহামে দুই দিরহাম লাভ করলেন। এরপর এ অবস্থায় মদীনায় ফিরে এলেন যে, যুদ্ধের সাহসী পদক্ষেপের লাগাম তাদের হাতে চলে এসেছিল। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি আর ভীতি সকল শত্রুর মনে আবার আগের মতো জায়গা করে নিলো। পুরো পরিস্থিতি আবার মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এলো।

এই গাযওয়াটি ইতিহাসে বদরে মাওইদ (প্রতিশ্রুত বদর), বদরে সানিয়া (দ্বিতীয় বদর), বদরে আখিরা (সর্বশেষ বদর) ও বদরে সুগরা (ছোট বদর) ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।[৫০২]

---

[৫০২] এ গাযওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ইবনে হিশাম ২/২০৯ ,২১০। যাদুল মাআদ ২/১১২।

গাযওয়ায়ে দূমাতুল জান্দাল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর বদর প্রান্তর থেকে মদীনায় ফিরে এলেন। গোটা অঞ্চলে তখন শান্তি আর নিরাপত্তার হিমেল হাওয়া বয়ে চলছিল। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার আরব সীমান্তের দূর-দূরান্তের অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল গোটা অঞ্চলে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা শান্তি ও শৃঙ্খলা যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয়, পরিস্থিতি যেন সর্বাবস্থায় মুসলমানদের সহায়ক হয়, সর্বোপরি দোস্ত-দুশমন সবাই যেন তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়।

বদরে সুগরার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছয় মাস মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, সিরিয়ার কাছাকাছি দূমাতুল জান্দালে কিছু কবীলা রাস্তা আটকে সাধারণ মানুষের সবকিছু ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং পাশাপাশি তারা মদীনা আক্রমণের জন্য বিশাল এক বাহিনী প্রস্তুত করছে। সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চম হিজরীর রবীউল আউয়ালের পাঁচ দিন বাকি থাকতে এক হাজার সাহাবীর এক বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। মদীনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সাহাবী সিবা' ইবনে উরফুতা গিফারী রা. কে। বনু উযরার এক ব্যক্তিকে গাইড হিসেবে নিয়ে নিলেন। তার নাম ছিল মাযকূর।

দুশমন যেন তাদের উপস্থিতি ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে এ জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহিনী নিয়ে রাতের বেলা পথ চলতেন আর দিনের বেলা কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন তারা বের হয়ে গেছে। মুসলমানরা এরপর তাদের ক্ষেত-খামার ও চারণভূমির ওপর হামলা করলেন। সেখানে কিছু তাদের হস্তগত হলো আর কিছু পালিয়ে বাঁচল।

অপরদিকে দূমাতুল জান্দালের সাধারণ বাসিন্দারা যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। মুসলমানরা যখন ময়দানে অবতরণ করলেন তখন তাদের একজন মানুষও খুঁজে পাওয়া গেল না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। বিভিন্ন বাহিনী বিভিন্ন দিকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তাদের একজনকেও তারা খুঁজে বের করতে পারল না। এরপর তিনি মদীনার পথ ধরেন। এই গাযওয়াতে উয়াইনা ইবনে হাসিন থেকে কিছু ফায়েদা লাভ হয়। দূমাহ সিরিয়ার একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। এখান থেকে দামেশকের দূরত্ব পাঁচ দিনের সফর আর মদীনার দূরত্ব পনেরো দিনের।

এভাবে দ্রুত ঝড়ো অভিযান আর একের পর এক বিজ্ঞোচিত সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণের বদৌলতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা

অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। গোটা পরিস্থিতি মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সময় আর কালের বিবর্তনের চাকা মুসলমানদের অনুকূলে ঘুরতে থাকে। অভ্যন্তরীণ আর বহিরাগত বিপদ আর নানা সংকটের যে কালো অন্ধকার তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল এবার তা ধীরে ধীরে কেটে যেতে শুরু করে। মুনাফিকরা সমস্ত লাফালাফি বন্ধ করে শান্ত-শিষ্ট ও সুসভ্য হয়ে যায়। মদীনার ইহুদিদের একটি গোষ্ঠীকে ইতোমধ্যেই নির্বাসিত করা হয়। আর অন্য কবীলা সন্ধিচুক্তির নিয়মানুযায়ী শান্তিঘন পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করতে থাকে। মদীনার আশপাশের বেদুঈন ও যাযাবর জাতিগোষ্ঠীগুলিও ভালো মানুষ হয়ে যেতে শুরু করে। কুরাইশরাও মুসলমানদেরকে নিয়ে মাথা ঘামানো থেকে ক্ষান্তি দেয়। তাই মুসলমানরা এখন পরাক্রমশালী গোটা বিশ্ব জাহানের মালিকের পৃথিবীতে তাঁর মনোনীত দীন ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও তাবলীগের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

গাযওয়ায়ে আহযাব

দীর্ঘ একটি বছর বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, আক্রমণ-অভিযান শেষে গোটা জাযীরাতুল আরবে তখন শান্তি, নিরাপত্তা আর স্বর্গীয় পরিবেশ বিরাজ করছিল। সর্বত্র বয়ে চলছিল সুখ ও শান্তি, সৌহার্দ ও সম্প্রীতির এক অমিয় স্রোতধারা। কিন্তু ইহুদি জাতি তখনো তাদের আদিম হালতে বহাল ছিল। গাদ্দারি, বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানত ও ষড়যন্ত্রের কারণে ইতঃপূর্বে তাদেরকে বহুবার লাঞ্ছনার বেদিতে বলি হতে হয়েছে। বহু বার তাদের গলায় অপমানের জুতোর মালা শোভা (?) পেয়েছে। এতকিছুর পরও অবোধ এ জাতির হুঁশ ফিরে আসেনি। তাদের নাদানির নিঁদ ভাঙেনি। তাদের আস্ফালন বন্ধ হয়নি। শত ভালো কথা আর সৎ উপদেশ যেন তাদের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। খাইবরে তাদেরকে নির্বাসিত করে দেওয়ার পর, সেখান থেকে তারা দিনরাত মদীনার দিকে চেয়ে থাকত- অপেক্ষায় ছিল মুসলমান আর পৌত্তলিকদের মাঝের সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের ওপর কোনো বিপদ এসে পড়ে কিনা? কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের কপোলকল্পিত স্বপ্নের ঠিক বিপরীতে পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে চলে গেল। প্রতিদিনের নিত্য নতুন দিন রাত মুসলমানদের জন্য যখন খোশখবরী নিয়ে আসতে থাকে তখন তাদের টনক নড়ে। হিংসার আগুনে তারা দগ্ধ হতে থাকে খুব করে।

তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নয়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের ঠিক শাহরগে এক মরণ কাঁমড় বসিয়ে দেওয়ার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে। কিন্তু সরাসরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতরণ করার সাহস ইহুদিরা কোনো দিনও পায়নি। অথচ, তাদের এ ষড়যন্ত্র সফল হতেই হবে। তাই এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত তারা এক ভয়ঙ্কর পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে।

বনু নযীরের বিশ জন সরদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কায় কুরাইশদের কাছে চলে যায়। সেখানে গিয়ে মুশরিকদেরকে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে এবং এর জন্য তাদেরকে ইহুদিদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। কুরাইশরা একে এক স্বর্ণ সুযোগ মনে করে তাদের ডাকে সাড়া দেয়। কেননা, তারা ইতঃপূর্বে বদরে সানিয়াতে বের হওয়ার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করেছিল। এ কারণে তারা এর মাধ্যমে তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি ফিরিয়ে আনার এবং ওয়াদা পূরণের চেষ্টা চালায়।

অতঃপর এ দলটি বনু গাতফানের কাছে যায়। কুরাইশদের মতো তাদেরকেও একই ভাবে দাওয়াত দিলে তারা সানন্দে এ দাওয়াত কবুল করে

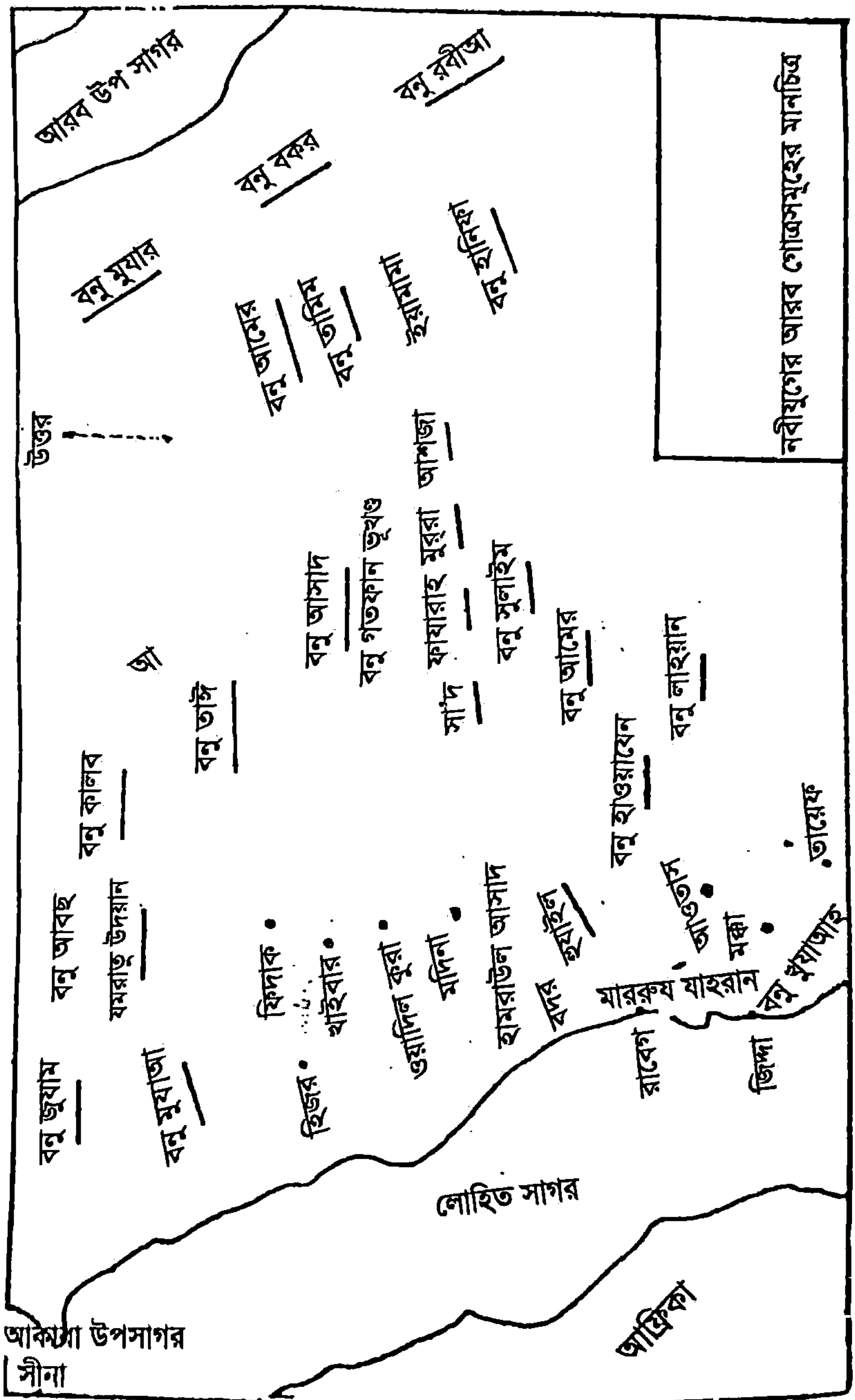
নেয়। এরপর তারা একে একে আরবের বিভিন্ন কবীলাকে একই দাওয়াত দিতে শুরু করে । এতে বহু কবীলা তাদের দাওয়াত কবুল করে নেয়। এভাবে ইহুদি নেতারা আরবের বিভিন্ন কবীলাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের ওপর উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে সফল হয়।

এরপর দক্ষিণ দিক থেকে কুরাইশ, কেনানা ও তাহামায় তাদের মিত্রদলের চার হাজার লোক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বের হয়। মাররুয যাহরানের এসে বনু সুলাইমও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পূর্ব দিক থেকে গাতফানের শাখাগোত্র বনু ফাযারা, বনু মুররাহ, বনু আশজা' যথাক্রমে উয়াইনা ইবনে হিসন, হারেস ইবনে আউফ ও মিসআর ইবনে রুহাইলার নেতৃত্বে বের হয়। বনু আসাদ ও অন্যান্য আরও কিছু কবীলা তাদেরকে সঙ্গ দেয়।

জাযীরাতুল আরবের বহু কবীলার সমন্বয়ে এ দলটি নির্ধারিত একটি দিনে মদীনার পথে যাত্রা করে।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই মদীনার উপকণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হয় দশ হাজার সশস্ত্র যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী। এ ছিল এমন এক বাহিনী, যাতে উপস্থিত যোদ্ধাদের সংখ্যাই সম্ভবত গোটা মদীনার মোট জনসংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ না করুন যদি এই বিশাল বাহিনী হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে মদীনার ওপর অতর্কিত হামলা করে বসত তবে তা মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াত। মুসলমানদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে পর্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে পৃথিবী থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে ফেলত। কিন্তু মদীনার নেতৃত্ব ও শাসনব্যবস্থা ছিল এক অভিনব সচেতন ও জাগ্রত শাসনব্যবস্থা। প্রতিটি মুহূর্তে শিরদাঁড়ার ওপর আঙ্গুল রেখে সে তার নাড়ি-নক্ষত্র আর রক্ত সঞ্চালনের গতিবিধি নিরীক্ষণ করত। আশপাশের গোটা পরিস্থিতি ছিল সর্বদা তার নখদর্পণে। সময় ও কালের স্রোত কোন্ সময় কোন্ দিকে বাঁক নেয় এদিকে ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি। এ কারণে এ বিশাল বাহিনী তাদের জায়গা থেকে দু' কদম সামনে বাড়ার আগেই মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এই বিভীষণ আক্রমণের দুঃসংবাদ পৌঁছে গেল।


নবীযুগের আরব গোত্রসমূহের মানচিত্র
আরব উপ সাগর
বনু রবীআ
বনু বকর
বনু মুযার
বনু আমের
বনু তামিম
য়ামামা
বনু হানিফা
উত্তর
আশজা
বনু আসাদ
বনু গতফান
ফাযারাহ
মুররা
বনু সুলাইম
বনু আমের
বনু লাহয়ান
সা'দ
বনু তাই
বনু কাল্ব
বনু হাওয়াযেন
তায়েফ
বনু আবস
যমরাতু উদয়ান
ফিদাক
খাইবার
ওয়াদিল কুরা
মদিনা
হামরাউল আসাদ
বদর
মক্কা
মাররুয যাহরান
বনু খুযাআহ
রাবেগ
জিদ্দা
বনু জুযাম
হিজর
লোহিত সাগর
আফ্রিকা
আকাবা উপসাগর
সীনা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনতিবিলম্বে এক উচ্চ পরামর্শ সভার আহ্বান করলেন। নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত উপস্থিত হলে তিনি তাদের সঙ্গে মদীনার অস্তিত্বের ওপর মারাত্মক হুমকিস্বরূপ এ ভীষণ বিপদ মুকাবেলার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন। বিভিন্ন মতবিনিময় আর আলাপ-আলোচনার পরে সর্বসম্মতিক্রমে বিজ্ঞ সাহাবী সালমান ফারসী রা. এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সালমান ফারসী রা. বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্যে যখন আমরা দুশমন কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়তাম তখন আমরা খন্দক তথা পরিখা খনন করতাম। বস্তুতঃ এটা ছিল একটা সময়োপযুক্ত ও যথেষ্ট বিজ্ঞোচিত এক নতুন ও অভিনব কৌশল, যার সম্পর্কে আরবদের ইতঃপূর্বে কোনো ধারণা ছিল না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহীত পরিকল্পনাটি দ্রুত বাস্তবায়নের প্রতি মনোযোগী হলেন। তিনি প্রত্যেক দশজনকে চল্লিশ হাত পর্যন্ত পরিখা খননের যিম্মাদারি প্রদান করলেন এবং নিজেও এ কাজে অংশ নিলেন। এতে মুসলমানরা পরম আগ্রহ আর উদ্দীপনার সাথে পরিখা খননের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। উদাহরণতঃ বুখারী শরীফে সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে পরিখার ভেতরে ছিলাম। তারা সবাই পরিখা খনন করছিলেন। আর আমরা আমাদের কাঁধে মাটি বহন করে ওপরে তুলছিলাম। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةْ...... فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ

'হে আল্লাহ আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন; তাই আপনি মুহাজির ও আনসারদেরকে ক্ষমা করে দিন'।[৫০৩]

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন খন্দকের দিকে গিয়ে দেখতে পেলেন সাহাবায়ে কেরাম ভোরের কনকনে হীম-শীতল বাতাসের মধ্যেও খননের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এমন কোনো গোলাম ছিল না, যারা তাদের পক্ষ থেকে এ কাজ আঞ্জাম দিবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ ক্লান্তি আর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম দেখে ইরশাদ করলেন :

اللّٰهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ.... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ

'হে আল্লাহ! আখেরাতের জীবনই তো জীবন। সুতরাং, আপনি আনসার ও মুহাজিরদেরকে মাফ করে দিন!

তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কথার জবাবে বললেন,

---

৫০৩ সহীহ বুখারী: গাযওয়ায়ে খন্দক অধ্যায় ২/৫৮৮।

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا[504]

'আমরা তো তারা, যারা মুহাম্মাদের হাতে বাইয়াত হয়েছি! যতদিন বেঁচে থাকব জিহাদ চালিয়ে যাবো'!!

সহীহ বুখারীতে বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখেছি, তিনি পরিখার মাটি বহন করছিলেন, তাতে তার পেটের চামড়া ধূলোয় ঢাকা পড়ে যায়। তাঁর মাথা মুবারক ছিল ঘন-কালো কেশ-মণ্ডিত। তিনি মাটি বহন করছিলেন আর ইবনে রাওয়াহার কয়েকটি কবিতা মুখে আওড়াচ্ছিলেন:

اَللّٰهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا...... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا،

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا......... وَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا،

إِنَّ الأُلَى قَدْ رَغَّبُوا عَلَيْنَا..... إِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

'হে আল্লাহ যদি তুমি না হতে তবে তো আমরা হেদায়াত পেতাম না, সদক্বা করতাম না, নামায পড়তাম না।

সুতরাং, আমাদের ওপর তুমি প্রশান্তি অবতীর্ণ করো! যদি আমরা লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হই, তবে আমাদের কদম অবিচল রাখো!!

তারাই তো আমাদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে তুলেছে। যদি তার কোনো দ্বন্দ্ব বাঁধাতে চায়, তবে আমরা কোনো দিনও মাথা নত করব না'!!

তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ শব্দগুলো জোরে জোরে টেনে টেনে বলছিলেন। অপর এক বর্ণনায় সর্বশেষ লাইনটি এসেছে এভাবে:

إِنَّ الأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا..... إِنْ أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا۔

'তারা আমাদের ওপর যুলুম করেছে। এখন যদি তারা আমাদেরকে কোনো বিপদে ফেলতে চায় তবে আমরা কখনো মাথানত করব না।

গরীব ও দরিদ্র সাহাবায়ে কেরাম এভাবেই প্রবল উচ্ছ্বাসভরে কাজ করে যাচ্ছিলেন, আর তাদের শিরায় শিরায় বয়ে চলছিল উদ্দাম আর প্রাণচাঞ্চল্যের বিদ্রোহী তরঙ্গ। অথচ, ঘরের খবর নিলে দম বন্ধ হয়ে কলিজা ফাটার মতো অবস্থা ছিল। আনাস রা. বলেন, (পরিখা খননকারী মুসলমানরা) একমুষ্টি যব নিয়ে আসতেন, এরপর তাদেরকে যব ও গরম চর্বি পরিবেশন করা হতো।

[৫০৪] সহীহ বুখারী ১/৩৯৭, ২/৫৮৮।
[৫০৫] প্রাগুক্ত ২/৫৮৯।

একদিকে তখন সবাই থাকত ক্ষুধাতুর। আর অপরদিকে সেই সামান্য খাবারটুকু থাকত বাসি।[৫০৬]

আবু তালহা রা. বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ক্ষুধার অভিযোগ করে আমাদের প্রত্যেকের পেটে একটি করে বাঁধা পাথর তাঁকে দেখালাম। তিনি তখন আমাদেরকে তাঁর পেটে দু'টি বাঁধা পাথর দেখালেন।[৫০৭]

পরিখা খননের এই কঠিন দিনগুলিতেই সময়ে সময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওতের বহু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল। জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চরম ক্ষুধার্ত দেখে একটি পশু যবাই করলেন। আর তার স্ত্রী এক সা' যব পেষণ করলেন। এরপর তারা গোপনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কয়েকজন সাহাবীসহ তাদের বাড়িতে দাওয়াত করলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা খন্দক খননে যারা ব্যস্ত ছিল সবাইকে ডাকলেন। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তারা সবাই এসে সেই খাবার তৃপ্তির সঙ্গে পেট ভরে খেলেন। তারপরও গোশতের টুকরা তখনো পাত্রের মধ্যে জ্বাল হচ্ছিল এবং রুটির খামিরাও আগের মতো রয়ে গিয়েছিল।[৫০৮]

নু'মান বিন বশীর রা. এর বোন একমুঠো খেজুর তার বাপ ও মামাকে দেওয়ার জন্য পরিখার কাছে নিয়ে এলেন। ঘটনাক্রমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি তার কাছে খেজুর চাইলেন। এরপর সেগুলো কাপড়ের ওপর মেলে পরিখা খননের কাজে ব্যস্ত সকল লোককে ডাকলেন। একদিকে তারা সেখান থেকে খেতে লাগলেন অপরদিকে খেজুরও বেড়ে চলল। পরিখা খননকারীগণ এক পর্যায়ে পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন। অথচ, খেজুর তখনো (বেশি হওয়ার কারণে) কাপড়ের পাশ থেকে পড়ে যাচ্ছিল।[৫০৯]

এদু'টির চেয়েও আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমরা পরিখা খনন করছিলাম, এমন সময় আমাদের সামনে হঠাৎ এক প্রকাণ্ডকায় শক্ত পাথর বেরিয়ে আসে। লোকজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে জানালো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পরিখা খনন কালে একটি বিশাল পাথর বের হয়েছে। তিনি বললেন, **চলো আমি গিয়ে দেখি।** তাঁর পেটে তখন পাথর বাঁধা ছিল। তিন দিন ধরে আমরা কোনো কিছু মুখে দেইনি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৫০৬] সহীহ বুখারী ২/৫৮৮।
[৫০৭] তিরমিযী। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৪৪৮।
[৫০৮] সহীহ বুখারী ২/৫৮৮,৫৮৯।
[৫০৯] ইবনে হিশাম ২/২১৮।

ওয়া সাল্লাম কোদাল নিয়ে পাথরটির ওপর প্রচণ্ড এক আঘাত করলেন। চোখের পলকে পাথরটি বালুর মতো গুঁড়া হয়ে গেল। [৫১০]

বারা রা. বলেন, পরিখা খননের দিন আমাদের সামনে পরিখার কোনো এক অংশে বড় একটা পাথর পড়েছে, যাতে কোদাল কোনো কাজ করছিল না। আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি এসে কোদাল নিলেন এবং 'বিসমিল্লাহ' বললেন। তারপর তাতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে পাথরটি এক টুকরা হয়ে গেল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আল্লাহু আকবার! আমার হাতে সিরিয়ার চাবিসমূহ তুলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! এ মুহূর্তে আমি সিরিয়ার লাল অট্টালিকাসমূহ দেখতে পাচ্ছি। তারপর তিনি দ্বিতীয় বার আঘাত করলে পাথরটি আরেক টুকরা হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আমাকে পারস্য দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এ মুহূর্তে মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে তৃতীয় আঘাত করলে পাথরটি পুরোপুরি ভেঙে গেল। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! আমাকে ইয়েমেনের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি এ জায়গায় বসে সানার তোরণগুলি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।[৫১১]

সালমান ফারসী রা. থেকে ইবনে ইসহাকের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।[৫১২]

যেহেতু কেবল উত্তর দিক ছাড়া বাদবাকি সব দিক থেকে বিভিন্ন নালা, পাহাড়-পর্বত আর বাগ-বাগিচা ঘিরে ছিল, আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খুব ভালো করেই জানতেন যে, এত বড় এক বিশাল বাহিনীর আক্রমণ কেবল উত্তর দিক থেকেই সম্ভব, তাই তিনি এ দিকটাতেই পরিখা খনন শুরু করেন।

দিনের পর দিন মুসলমানরা তাদের পরিখা খননের কাজ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যান। তারা সূর্যোদয় থেকে একটানা সূর্যাস্ত পর্যন্ত খনন কার্যে ব্যস্ত থাকতেন। এরপর সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে যেতেন। এভাবে সেই বিশাল পৌত্তলিক শত্রু বাহিনী মদীনার চার দেয়ালের উপকণ্ঠে নাক জাগানোর আগেই নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিখা খননের কাজ সুসম্পন্ন হলো।[৫১৩]

কুরাইশরা সর্বপ্রথম নিজেদের চার হাজার সৈন্য নিয়ে 'জুরফ' ও 'যাগাবা' র মধ্যবর্তী 'রূমা' নামক স্থানে নালাগুলির সঙ্গমস্থলে অবতরণ করে। এদিকে বনু গাতফান ও নজদবাসীদের মধ্যে থেকে যারা তাদের অনুসারী ছিল, তারা ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে উহুদের এক প্রান্তে 'যানাবে নাকমা' নামক স্থানে যাত্রাক্ষান্তি দেয়।

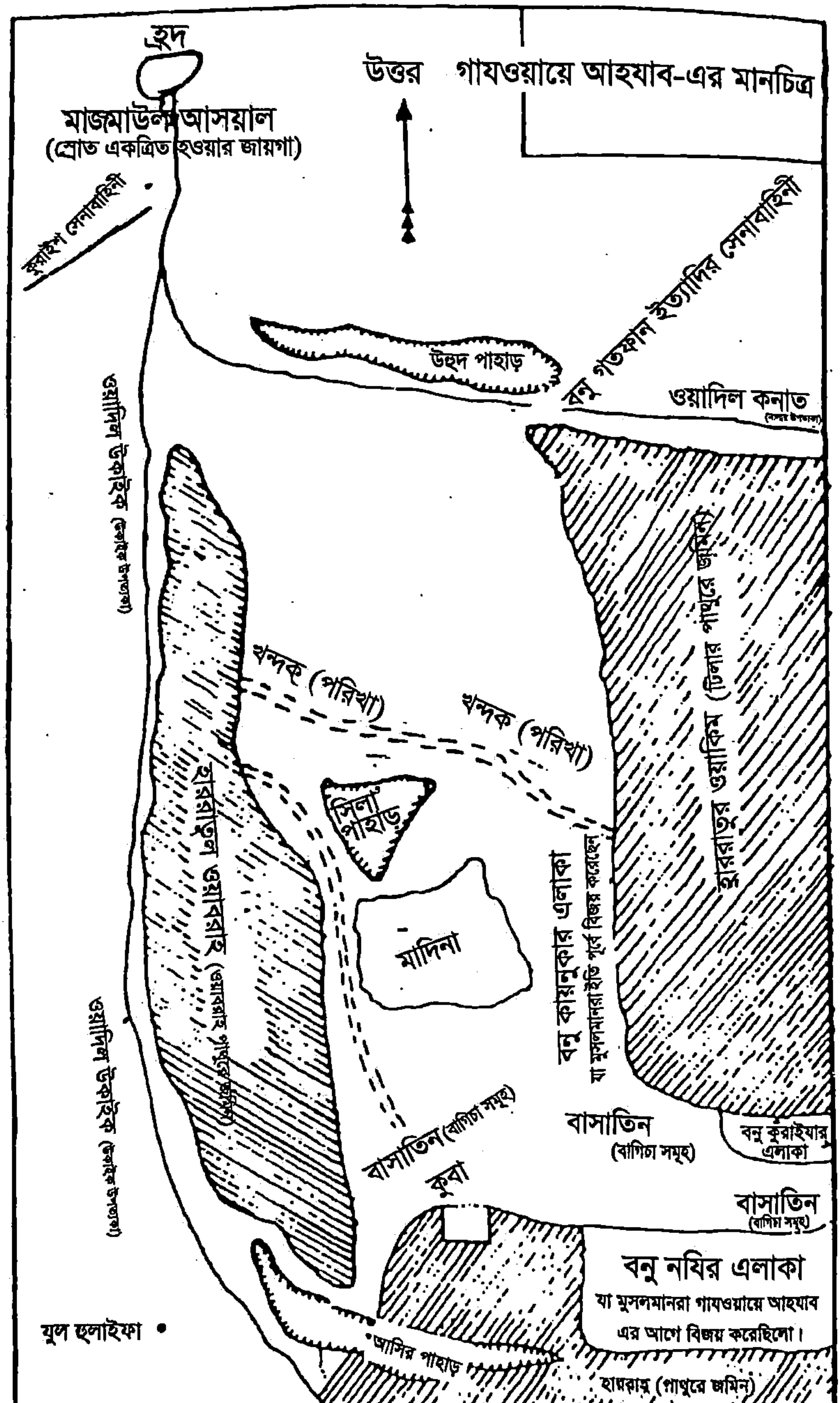
---

[৫১০] সহীহ বুখারী ২/৫৮৮।

[৫১১] সুনানে নাসাঈ ২/৫৬। মুসনাদে আহমদ ৪/৩০৩। কিন্তু হাদীসের ভাষ্য নাসাঈর নিজস্ব নয়। সেখানে অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে।

[৫১২] ইবনে হিশাম ২/২১৯।

[৫১৩] প্রাগুক্ত ৩/৩৩০,৩৩১।


হ্রদ
উত্তর
গাযওয়ায়ে আহযাব-এর মানচিত্র
মাজমাউল আসয়াল
(স্রোত একত্রিত হওয়ার জায়গা)
কুরাইশ সেনাবাহিনী
বনু গতফান ইত্যাদির সেনাবাহিনী
উহুদ পাহাড়
ওয়াদিল কনাত
ওয়াদিল আকীক
খন্দক (পরিখা)
খন্দক (পরিখা)
হাররাতুল ওয়াবরাহ
সিলা পাহাড়
মাদিনা
বনু কায়নুকার এলাকা
হাররাতুল ওয়াকিম (টিলার পাথুরে জমিন)
বাসাতিন (বাগিচা সমূহ)
বাসাতিন
(বাগিচা সমূহ)
বনু কুরাইযার এলাকা
কুবা
বাসাতিন
(বাগিচা সমূহ)
বনু নযির এলাকা
যা মুসলমানরা গাযওয়ায়ে আহযাব
এর আগে বিজয় করেছিলো।
যুল হুলাইফা
আসির পাহাড়
হাররাহ (পাথুরে জমিন)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.

যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। [সূরা আহযাব:২২]

আর মুনাফিক ও দুর্বলচিত্ত ঈমানদাররা যখন এই বিশাল বাহিনী দেখল ভয়ে তখন তাদের ছাতি ফেটে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। তাদের মনোবলে প্রচণ্ড কম্পন এলো।

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.

আর যখন মুনাফিক এবং ঐ সমস্ত লোকেরা, যাদের অন্তরে রোগ ছিল বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে ধোঁকারই ওয়াদা করেছেন। [সূরা আহযাব : ১২]

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন হাজার একনিষ্ঠ সাহাবী নিয়ে বের হলেন। জাবালে সালা' এর দিকে তারা পিঠ করে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। এখন মুসলমান আর কাফেরদের মধ্যে অন্তরায় ছিল কেবল পরিখা। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংকেত ছিল 'হা-মীম লা ইউনসারূন'। মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যাওয়া হয় সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. কে। আর নারী ও শিশুদেরকে মদীনার দুর্গে হেফাযতে রেখে যাওয়া হয়।

মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হয়ে যখন বিশাল পরিখা দেখতে পেল তখন তারা হতভম্ব হয়ে উপায়ন্তর না দেখে অবরোধ জারী করল। অথচ, ইতঃপূর্বে এর জন্য তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। কারণ, এটা ছিল এমন পরিকল্পনা- তাদের ভাষায় ষড়যন্ত্র- আরবরা যার সঙ্গে কোনো দিনও পরিচিত ছিল না। এ কারণে তারা এক মুহূর্তের জন্য এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি।

মুশরিকরা রাগে ও ক্রোধে পরিখার পাড়ে পাড়ে ঘুরতে লাগল। কোনো সংকীর্ণ জায়গা খুঁজে পেয়ে সেখান থেকে মদীনায় ঢোকার চেষ্টা চালাতে লাগল। মুসলমানরাও পরিখার এপারে বসে তাদের প্রত্যেকটি হরকত গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল। মাঝে মাঝে তাদের প্রতি তীর বৃষ্টি ছুঁড়ত, যাতে করে তারা পরিখার ধারে কাছেও আসতে না পারে বা কোনো ভাবে এটা অতিক্রম করতে না পারে কিংবা ভেতরে মাটি ফেলে পথ আবিষ্কার করতে না পারে।

দীর্ঘ অবরোধের পরে কোন্দিন তার ফল বের হবে? আর সে পর্যন্ত নিষ্ফল ও অর্থহীন দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এ আশায় কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী তৃপ্ত হতে

পারছিল না। তাই তারা চঞ্চলতায় লাফ মারছিল। কেননা, পরিখার পাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মশা মারা তো আর শাহসওয়ারদের বৈশিষ্ট্য ছিল না। তাই আমর ইবনে আবদে ওদ্দ, ইকরিমা বিন আবী জাহল ও জিরার বিন খাত্তাব প্রমুখসহ অশ্বারোহী বাহিনীর ছোট একটি দল পরিখার সংকীর্ণ একটি জায়গা বেছে নিয়ে সেখান থেকে পার হয়ে এপারে চলে এলো। এরপর তাদের ঘোড়াগুলি পরিখা ও সালা' এর মাঝে লবণাক্ত জায়গায় চক্কর দিতে লাগল। আলী ইবনে আবী তালিব রা. একদল মুসলিম সৈন্য নিয়ে তারা যেখান থেকে পরিখা পার হয়ে এপারে চলে এসেছিল সেখানে বসে গেলেন। আমর তাদের কাউকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করল। আলী রা. তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি আমরকে এমন একটি কথা বললেন, সে ধৈর্য ধরে ঘোড়ার পিঠে বসতে না পেরে নীচে পড়ে গেল। আর সে ছিল মুশরিকদের সাহসী ও বীর পুরুষদের মধ্যে থেকে একজন। আলী রা. তার ঘোড়ার পা কেটে দিলেন এবং তার চেহারায় আঘাত করলেন। এরপর সে আলী রা.এর দিকে এগিয়ে এলো। উভয়ের মধ্যে কয়েক বার আঘাত-পাল্টা আঘাত বিনিময় হলো। পরিশেষে আলী রা. তাকে হত্যা করে ফেলেন। বাকিরা পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখে পালিয়ে পরিখার ওপারে চলে যায়। এতটা ভীতি আর শঙ্কা তাদেরকে পেয়ে বসেছিল যে, ইকরিমা পালানোর ব্যতিব্যস্তার কারণে নিজের বর্শাটি ফেলে রেখে যায়।

মুশরিকরা একটানা কয়েকদিন পরিখা পাড়ি দেওয়ার কিংবা তাতে পথ নির্মাণের সব রকমের চেষ্টা প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু মুসলমানরা কৌশলে সমুচিত জবাব দিয়ে তাদেরকে দূরে রাখে। তাদের ওপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং তাদের তীর বৃষ্টির দাঁতভাঙা জবাব দেয়। এভাবে মুশরিকদের সকল অপপ্রয়াস বৃথা যায়।

এই কঠিন লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো এক ওয়াক্তের নামায ছুটে যায়। বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত, উমর বিন খাত্তাব রা. খন্দক যুদ্ধের দিন এসে কুরাইশ কাফেরদেরকে খুব করে গালি দিতে শুরু করেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সূর্য ডুবতে বসেছে। অথচ, এখন পর্যন্ত আমি নামায আদায় করতে পারিনি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : **আমিও তো এখন পর্যন্ত নামায পড়তে পারিনি**। এরপর আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে 'বুতহান' নামক স্থানে অবতরণ করি। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য উযূ করেন, আমরাও উযূ করি। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর তিনি আসরের নামায আদায় করেন। আসর শেষ করে তখনোই মাগরিবের নামায পড়ে নেন।[৫১৪]

---

[৫১৪] সহীহ বুখারী ২/৫৯০।

এই নামায ছুটে যাওয়ার কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিদারুণ মর্মাহত হয়ে মুশরিকদের জন্য বদদুআ করেন। সহীহ বুখারীতে আলী রা. থেকে বর্ণিত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক যুদ্ধের দিন বলেছেন, **আল্লাহ তাদের ঘর-বাড়ি আর কবরগুলি আগুন দিয়ে ভরে দিন, যেমনিভাবে তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায থেকে বিরত রেখেছে।**[৫১৫]

মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা এই চার ওয়াক্ত নামায পড়তে দেয়নি। পরে তিনি একসঙ্গে সবগুলি নামায আদায় করেন। ইমাম নববী রহ. বলেন, উল্লিখিত বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় বিধান করার পন্থা হলো, খন্দক যুদ্ধ বেশ কয়েকদিন স্থায়ী হয়েছিল। সুতরাং,এ ঘটনা কোনো এক দিনের। আর ওটা আরেক দিনের। [৫১৬]

এখান থেকেই বোঝা যায়, মুশরিকদের পক্ষ থেকে পরিখা অতিক্রমের জন্য বেশ কয়েক দিনই দফায় দফায় চেষ্টা চালানো হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে এটা প্রতিরোধও করতে হয়েছে। তবে উভয় বাহিনীর মাঝখানে পরিখা অন্তরায় থাকার সুবাদে কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম কিংবা বড় কোনো রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি। বরং শুধু তীর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল।

এই তীর ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্য দিয়ে উভয় পক্ষের হাতে গনা কয়েকটি হতাহতের ঘটনা ঘটে। মুসলমানদের পক্ষে ছয় জন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। আর মুশরিকদের দশ জন যোদ্ধা নিহত হয়েছে। আর কেবল মুশরিকদের একজন বা দু'জন তরবারির আঘাতে প্রাণ হারায়। এই তীর নিক্ষেপের ঘটনাতেই সা'দ বিন মুয়ায রা. তীর বিদ্ধ হন। তীরটি এসে তার হাতের শাহরগে বিঁধে যায়। কুরাইশের হাব্বান ইবনে আরিকা নামক এক ব্যক্তি এ তীর ছুঁড়ে। তখন সা'দ রা. দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো ভালো করেই জানেন যে, আপনার রাসূলকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাকে নিজ জন্মভূমি থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে প্রিয়তম আমার কাছে আর কিছুই নেই। হে আল্লাহ! আমার মনে হয় এখন আপনি আমাদের ও দুশমনের মধ্যে লড়াই শেষ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন। সুতরাং কুরাইশের সঙ্গে আর কোনো লড়াই যদি বাকি থাকে তবে আপনার পথে সেই লড়াইয়ে আমাকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিন! আর যদি আপনি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে যখম বহাল

---

[৫১৫] প্রাগুক্ত।

[৫১৬] আল্লামা ইমাম নববী কৃত শরহে মুসলিম ১/২২৭।

রাখুন এবং একেই আমার মৃত্যুর কারণ বানিয়ে দিন![৫১৭] দুআর শেষে সা'দ রা. বললেন, বনু কুরাইযার পরিণতি দেখে আমার চোখ জুড়ানোর আগ পর্যন্ত আমাকে আপনি মৃত্যু দান করবেন না![৫১৮]

এভাবে মুসলমানরা যখন উত্তপ্ত রণাঙ্গনে দুশমনের সঙ্গে নিত্যনতুন এরূপ প্রতিকূলতার মুখামুখি হচ্ছিলেন, ঠিক সেই নাযুক মুহূর্তে তাদের শরীরে মরণ কামড় বসিয়ে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত সাপগুলি তাদের গর্তের ভেতরে দিন রাত ছোটাছুটিতে ব্যস্ত ছিল। বনু নযীরের দাগী অপরাধী ও বুড়ো শয়তান হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কুরাইযার বস্তিতে গিয়ে তাদের নেতা ও গোত্রপতি কা'ব বিন আসাদ কুরাযীর নিকট উপস্থিত হয়। তার নেতৃত্বে বনু কুরাইযা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এ চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল মদীনা আক্রান্ত হলে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সাহায্য সহযোগিতা করবে- যেমনটি আমরা পেছনে উল্লেখ করেছি। হুয়াই তার দরজায় হাঁক ছাড়লে কা'ব তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু হুয়াই তার সঙ্গে এভাবে বিভিন্ন কথা বলতে লাগল যে কা'ব শেষ পর্যন্ত দরজা খুলেই দিলো। ঘরে ঢুকে হুয়াই বলল, কা'ব! আমি তোমাদের কাছে এ কালের বৈশিষ্ট্য-তিলক ও উত্তরঙ্গ সমুদ্র নিয়ে এসেছি। কুরাইশের বড় বড় নেতা আর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগুলিকে আমি 'রুমা'র 'মাজমাউল আসইয়াল' এ এনে অবতরণ করিয়েছি। পাশাপাশি বনু গাতফানের সরদারদেরকেও এনে যানাবে নাকামাতে এনে অবতরণ করিয়েছি। তারা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছে, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সমূলে উৎপাটিত করা ছাড়া তারা কখনোই ফিরে যাবে না।

সবকিছু শুনে কা'ব বলল, আল্লাহর কসম! তুমি আমার নিকট কালের কলঙ্ক-তিলক আর শূন্য-গর্ভ মেঘ নিয়ে এসেছ, যার ভেতরে কোনো পানি নেই। যাতে রয়েছে শুধু বিজলী-চমক আর তর্জন-গর্জন; নিছক এগুলি ছাড়া যাতে আর কিছুই নেই। আফসোস! হুয়াই তুমি আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও!! কেননা, চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুহাম্মাদ থেকে আমি সকল অঙ্গীকার পালন আর সততা ব্যতীত আর কিছু দেখিনি।

কিন্তু হুয়াই এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ছিল না। সে কা'বকে বিভিন্ন ফন্দির মারপ্যাঁচে আটকে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। শেষমেশ কা'ব তাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিলো, যদি কুরাইশ ও গাতফান মুহাম্মাদকে কিছু করতে না পেরে ফিরে যায়, তবে আমিও তোমার সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করব। এরপর

[৫১৭] সহীহ বুখারী ৩/৫৯১।
[৫১৮] ইবনে হিশাম ৩/৩৩৭।

তোমাদের যা হয় আমারও তাই হবে। এভাবে হুয়াই ইবনে আখতাবকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মাধ্যমে কা'ব বিন উসাইদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কৃত চুক্তি ভেঙে ফেলল এবং তার মাঝে ও মুসলমানদের মাঝের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হলো।[৫১৯]

এরপর বনু কুরাইযার ইহুদিরা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ইবনে ইসহাক বলেন, সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রা. হাস্সান বিন সাবিত রা. এর 'ফারে' নামক এক দুর্গে ছিলেন। হাস্সান রা. নারী ও শিশুদের সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। সাফিয়্যা বলেন, আমাদের পাশ দিয়ে এক ইহুদি চলে যায়। এরপর সে দুর্গের চারপাশে ঘুরতে থাকে। এটা ছিল সেই সময়ের কথা যখন বনু কুরাইযা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাদের যে চুক্তি ছিল তা ভঙ্গ করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, যে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন। এই ফাঁকে এখন আমাদের যদি কিছু হয়েও যায় তবুও তাঁর কিছু করার থাকবে না। সাফিয়্যা বলেন, তখন আমি বললাম, হাস্সান! ঐ যে ইহুদিটাকে দেখছ দুর্গের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় সে পেছনে থাকা ইহুদিদের নিকট আমাদের নারী ও শিশুদের সংবাদ জানিয়ে দিবে। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামও এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে। তাই তুমি জলদি করে যাও! বেটাকে হত্যা করে এসো!

হাস্সান রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি তো জানেন যে, আমি এ কাজের লোক নই। সাফিয়্যা রা. বলেন, তখন আমি কোমর বেঁধে তাঁবুর একটি খুঁটি হাতে উঠিয়ে নিই। এরপ দুর্গ থেকে বের হয়ে এক আঘাতে তাকে শেষ করে দিয়ে আবার দুর্গে ফিরে এসে হাস্সানকে বললাম, হাস্সান! সে কেবল পুরুষ হওয়ার কারণে আমি তার সলব (নিহতের সঙ্গে থাকা সকল আসবাব) নিয়ে আসতে পারিনি। তুমি গিয়ে নিয়ে এসো! হাস্সান রা. বললেন, আমার এ সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন নেই।[৫২০]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানিতা ফুফুর এই মহান কীর্তি মুসলমানদের নারী ও শিশুদের হেফাযতের ক্ষেত্রে দারুণ প্রভাব

---

৫১৯ ইবনে হিশাম ২/২২০,২২১।

৫২০ ইবনে হিশাম ২/২২৮। হাফিয ইবনে হাজার বলেন, আহমদ র. এটা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর থেকে শক্তিশালী সনদে বর্ণনা করেছেন- ফাতহুল বারী ৬/২৫৮।

ফেলেছিল। এর দ্বারা এটাও জানা যায় যে, ইহুদিরা ধারণা করেছিল এই সমস্ত টিলা ও কেল্লাগুলো, যাতে মুসলমানদের নারী ও শিশুরা রয়েছে ইসলামী সেনা বাহিনীর হেফাযতে রয়েছে। অথচ, বাস্তবতা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা তাদেরকে একা রেখে সবাই রণাঙ্গনে চলে গিয়েছিলেন। তাই তারা দ্বিতীয় বার এ কাজের দুঃসাহস দেখায়নি। তবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সঙ্গে নিজদের সম্পর্ক ও ঐক্য যাহির করণার্থে তারা পৌত্তলিক বাহিনীকে বিভিন্ন রসদপত্র যুগিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছিল। এমনকি মুসলমানরা তাদের রসদবাহী বিশটি উট হস্তগত করতে সক্ষম হলেন।

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের দিকে দ্রুত মনোযোগী হলেন- যাতে এ যুদ্ধে আসলে বনু কুরাইযার বাস্তব ও প্রকৃত অবস্থান কোন্ দলে তা স্পষ্ট হয়ে যায় । ফলে সে অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা যাচাইয়ের জন্য সা'দ বিন মুয়ায, সা'দ বিন উবাদা, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ও খাউওয়াত ইবনে জুবাইর রা. কে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় তাদেরকে বলে দেন, **তোমরা গিয়ে দেখবে তাদের সম্পর্কে আমাদের কাছে যে সংবাদ এসে পৌঁছেছে তা সত্য না কি মিথ্যা। যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে আমার কাছে এসে শুধু ইঙ্গিতের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিবে। লোকদের বাহু ভেঙে দিবে না। আর যদি তারা অঙ্গীকারের ওপর অটল থাকে তবে প্রকাশ্যে সবার সামনে ঘোষণা করে দিবে।** তারা সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন ইহুদিরা শয়তানীর চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রকাশ্যে তারা গালিগালাজ ও দুশমনি করেছে। এমনকি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে অপমান করার স্পর্ধা দেখিয়েছে।

তারা বলতে শুরু করেছে, আল্লাহর রাসূল আবার কে? আমাদের ও মুহাম্মাদের মাঝে কোনো চুক্তি-টুক্তি নেই। এতটুকু দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাঠানো দলটি ফিরে এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে তারা একটি সংকেত দিলো এবং অস্পষ্ট করে শুধু বলল, আযাল ও কারাহ। অর্থাৎ আযাল ও কারাহ যেমনিভাবে রজী' অভিযানের মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তারাও তেমনিভাবে গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

বাস্তবতা লুকানোর শত চেষ্টা তারা করলেও লোকজন প্রকৃত ব্যাপার ঠিকই বুঝে ফেলল। এভাবে একটি নতুন ভয়ঙ্কর বিপদ দানবের মতো তাদের সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেল।

মুসলমানরা তখন দাঁড়িয়েছিল জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও চরম নাযুক পরিস্থিতিতে ছিলেন। কারণ, বনু কুরাইযা যদি এখন তাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসে

তবে সেখানে এমন কিছু ছিল না, যা তাদেরকে সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। অপরদিকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষার প্রহর গনছে এক বিশাল বাহিনী। তা ছাড়া তাদের নারী ও শিশুরা সেই বিশ্বাসঘাতক নরখাদকদের মুখের সামনে বে-হেফাযতে ফেলে রাখা মালের মতো অসহায় হয়ে বসে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তাদের এ দুরবস্থার চিত্র কুরআনে কারীম অতি বর্ণাঢ্য ও চমৎকার ভাবে এঁকেছে ঠিক এভাবে:–

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.

যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্চিছল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিলেন। [সূরা আহযাব : ১০-১১]

ঠিক একই মুহূর্তে কোনো কোনো মুনাফিকের নেফাক জানালা খুলে ছুঁচ বের করতে শুরু করে। অনেকে বলে ফেলে, মুহাম্মাদ আমাদেরকে এক সময় কিসরা ও কায়সারের ধন ভাণ্ডার প্রাপ্তির গল্প শুনাত; অথচ এখন আমাদের একেক জনের অবস্থা হয়েছে এমন যে, নিরাপদে একটু প্রকৃতির ডাকেও সাড়া দিতে পারছি না। কেউ কেউ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামনে বলতে লাগল, আমাদের ঘর-বাড়ি দুশমনের সামনে খোলা পড়ে আছে। তাই আমাদেরকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন! আমরা এখান থেকে বের হয়ে যাব। কেননা, আমাদের ঘর মদীনার বাইরে। এই নাযুক পরিস্থিতিতে বনু সালামার পদস্খলনের আশঙ্কা দেখা গেল। এ সকল লোক সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা নাযিল করেছেন,

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের সাথে ধোঁকার ওয়াদা ছাড়া করেনি। এবং যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি। অথচ, সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। [সূরা আহযাব:১২-১৩]

এই ছিল মুসলিম বাহিনীর অবস্থা। অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যখন বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ এসে পৌঁছল তখন তিনি আপন মুখাবয়ব ও মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলেন। এরপর তিনি চিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকলেন। এতে করে মুসলমানদের পেরেশানী আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এক সুংসবাদ দিতে দিতে উঠলেন। তিনি বলছিলেন : আল্লাহু আকবর! **মুসলমানগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করো!** এরপর তিনি এই চরম নাযুক পরিস্থিতি সাময়িকভাবে হলেও সামাল দেওয়ার প্রতি মনোযোগী হন এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি মদীনাতে একটি ছোট রক্ষীবাহিনী প্রেরণ করেন- যাতে করে মুসলমানদের নারী ও শিশুরা অতর্কিত হামলার শিকার না হয়। কিন্তু বড় দুশমনদের মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণাত্মক ও অগ্রগামী অভিযান তখন সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি বনু গাতফানের দুই নেতা উয়াইনা ইবনে হিসন ও হারিস ইবনে আউফ এর সঙ্গে মদীনার উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ প্রদানের ওপর সন্ধি করতে চাইলেন। এতে করে তারা তাদের বাহিনী নিয়ে চলে যাবে। এরপর মুসলমানরা তাদের চিরচেনা দুশমনের সঙ্গে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইতঃপূর্বে তারা বার বার যাদের শক্তি পরীক্ষা করেছে। এভাবে এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ বিন মুয়ায ও সা'দ বিন উবাদা রা. এর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তারা দু'জনে বললেন, যদি এটা আল্লাহর নির্দেশ হয়ে থাকে তবে আমাদের এটা মেনে নিতে ও আনুগত্য করার ব্যাপারে কোনো কথা নেই। আর যদি আপনি কেবল আমাদের জন্যই এমনটি করার ইচ্ছা করেন তবে আমাদের তা প্রয়োজন নেই। একটা সময় তো এমন ছিল যখন তারা এবং আমরা সবাই আল্লাহর সঙ্গে জঘন্য শিরক আর প্রাণহীন মাটি ও পাথরের মূর্তির পূজার বদ্ধ কূপে ডুবে বুঁদ ছিলাম। তখনো তারা উধার কিংবা ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া কোনোদিন আমাদের ফসলের প্রতি লালায়িত হতে পারেনি। আর আজ আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, আমাদের সরল ও সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের মাল দিয়ে দিব? আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে কেবল তরবারিই উপহার দিব। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উভয়ের মতামতকে সঠিক স্বীকৃতি দিলেন এবং বললেন, **এটা তোমাদের জন্য আমি করতে চেয়েছিলাম; কারণ আমার চোখের সামনে গোটা আরব আজ তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।**

অতঃপর সর্ব শক্তিমান আল্লাহ তাআলা- সমস্ত প্রশংসা তাঁর জন্য- নিজের পক্ষ থেকে এমন একটি পথ বের করে দিলেন, যে পথে তিনি দুশমনকে লাঞ্ছিত

করলেন। তাদের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করলেন। আর তাদের শাণিত মনোবলকে ভোঁতা করে দিলেন। আর সে পথটি ছিল এই: বনু গাতফানের নুআইম ইবনে মাসউদ ইবনে আমের আশজাঈ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইতঃপূর্বে মুসলমান হয়েছি। কিন্তু আমার কওম আমার ইসলাম সম্পর্কে এখনো জানে না। সুতরাং,এখন আপনার যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ দিতে পারেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যেহেতু তুমি কেবল একাই, এ জন্য যতটুকু পারো আমাদের থেকে তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দাও ! তবে মনে রেখো, যুদ্ধ মানেই কৌশলে লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া। নুআইম ইবনে মাসউদ রা. তৎক্ষণাৎ বনু কুরাইযার নিকট চলে গেলেন। জাহেলী যুগে তিনি বনু কুরাইযার স্বজন ছিলেন। এ কারণে অতি সহজে তাদের কাছে গিয়ে তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি আমার কতটা টান আর মুহাব্বত রয়েছে তা তোমরা ভালো করেই জানো। তারা বলল, তা তো অবশ্যই। তিনি বললেন, কুরাইশের সঙ্গে আপনাদের তাল মিলালে হবে না। তাদের ব্যাপার আর আপনাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই এলাকা আপনাদেরই। আপনাদের ধন-সম্পদ,বাড়ি-ঘর,পরিবার-পরিজন সব এখানে। এই এলাকা ছেড়ে আপনারা কোনোদিনও অন্য কোথাও যেতে পারবেন না। অপরদিকে কুরাইশ ও বনু গাতফান মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এখানে লড়াই করার জন্য এসেছে। আর আপনারাও তাদেরকে সঙ্গ দিয়েছেন। অথচ,এখানে তাদের বাড়ি-ঘর কিছুই নেই। যদি তারা কোনো সুযোগ পায় তবে সেটা কাজে লাগাবে। আর যদি কিছু না পায় তবে লেজ গুটিয়ে আপনাদেরকে ছেড়ে নিজেদের দেশে চলে যাবে। তখন এখানে থাকবেন কেবল মুহাম্মাদ আর থাকবেন আপনারা। ইচ্ছামতো তিনি তখন আপনাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন। তারা বলল, তাই তো! তাহলে এখন কী করা যায়? নুআইম! তিনি বললেন, আপনাদের কাছে তারা তাদের জিনিসপত্র বন্ধক রাখার আগ পর্যন্ত আপনারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। তারা বলল, তোমার সিদ্ধান্তের কোনো তুলনা হয় না, নুআইম!

এরপর নুআইম সোজা কুরাইশের কাছে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমাদের প্রতি আমার কতটা মুহাব্বত আর ভালোবাসা রয়েছে আর আমি তোমাদের কতটা হিতৈষী তা কি তোমরা জানো? তারা বলল, জী হাঁ। তিনি বললেন, মদীনার ইহুদিরা মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গের ওপর এখন ভীষণ লজ্জিত হয়েছে। তাদের মাঝে এখন পত্র বিনিময়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ইহুদিরা এখন তোমাদের কাছ থেকে তোমাদের জিনিসপত্র বন্ধক নিয়ে মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিবে। এরপর তোমাদের বিরুদ্ধে তার সঙ্গে মিলে যাবে। সুতরাং, যদি তারা তোমাদের কাছে বন্ধক চায় তবে

তোমরা তাদেরকে বন্ধক দিবে না। তারা বলল, তোমার বক্তব্য যথার্থ!

পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের শনিবারের রাতে তারা ইহুদিদের কাছে বলে পাঠালো, এটা আমাদের থাকার জায়গা নয়। আমাদের ঘোড়া আর উটগুলি সব আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে। সুতরাং, তাড়াতাড়ি প্রস্তুতি নাও! মুহাম্মাদের সঙ্গে আমরা এখন সরাসরি সংঘাতে নামব!! ইহুদিরা তাদের কাছে সংবাদ পাঠালো, আজকে তো শনিবার দিন। আর তোমরা তো জানোই এ দিনের প্রতি অবহেলার কারণে আমাদের পূর্ববর্তীদের কী হয়েছিল? তাছাড়া তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের আসবাবপত্র আমাদের কাছে বন্ধক না পাঠাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের সঙ্গে মিলে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না। ইহুদিদের এ জবাব নিয়ে যখন দূত এলো তখন কুরাইশ ও বনু গাতফান পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, আল্লাহর কসম! নুআইম তোমাদেরকে সত্য বলেছে!! তখন তারা ইহুদিদের কাছে সংবাদ পাঠালো, আল্লাহর কসম! আমরা তোমাদের কাছে আমাদের কাউকেই পাঠাবো না। সুতরাং, তোমরা নিজেরাই আমাদের সঙ্গে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ো! এ সংবাদ পেয়ে বনূ কুরাইযা বলল, আল্লাহর কসম! নুআইম তোমাদেরকে সত্য বলেছে!! এভাবে এক দলের ওপর থেকে আরেক দলের বিশ্বাস উঠে গেল। তাদের মৈত্রীর সারিতে চুপিসারে বিভেদ আর বিশৃঙ্খলার বীজ উপ্ত হলো। তাদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

এদিকে মুসলমানরা আল্লাহর কাছে দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের গোপন রহস্য আপনি গোপন রাখুন! ভয়-ভীতি থেকে আপনি আমাদেরকে নিশ্চিন্ত রাখুন!

রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ করছিলেন, **হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! আপনি এই বাহিনীগুলিকে পরাজিত করুন! হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন! তাদেরকে ভীত-কম্পিত করে তুলুন!**[৫২১]

এটা ছিল সেই সময় যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের দুআ কবুল করেছিলেন। এভাবে যখন মুশরিকদের সারিতে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলার ঝড় বয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর বাস্তবিকই প্রবল ঝটিকা আর দমকা হাওয়া বইয়ে দিলেন। এতে তাদের তাঁবু-মাবু সব উড়ে গেল। চুলার ওপর রাখা হাড়ি-পাতিল সব উল্টে ভেতরে পড়ে রইল। তাঁবুর খুঁটি-মুটি আর রশি-টশি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গায়েব হয়ে গেল। এভাবে তাদের ভীত নড়বড়ে হয়ে গেল। এর ওপর আবার পাঠিয়ে দিলেন ফেরেশতাদের এক বাহিনী। তারা এসে তাদেরকে কম্পিত করে তুললেন। তাদের অন্তরে ঢেলে দিলেন প্রচণ্ড ত্রাস আর আতঙ্ক।

---

[৫২১] সহীহ বুখারী : জিহাদ পর্ব ১/৪১১। কিতাবুল মাগাযী ২/৫৯০।

হাড়কাঁপানো সেই কনকনে শীতের রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. কে পাঠালেন তাদের খবর নিয়ে আসার জন্য। তিনি এসে তাদের এ অবস্থা দেখলেন। ততক্ষণে তারা ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল। পরম খুশি আর আনন্দের আবেগে সেই শীতের রাতের কুয়াশা আর আঁধার কেটে ঝড়ো বেগে ফিরে এলেন সাহাবী হুযাইফা রা.। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনালেন তাদের ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতির সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা দুশমনের ষড়যন্ত্র তাদের মুখেই ফিরিয়ে ছুঁড়ে মারলেন। তাদের মুকাবিলার জন্য তিনি নিজেই যথেষ্ট হলেন। এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলেন। তাঁর বাহিনীকে সম্মানিত করলেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করলেন। একাই এক বিশাল বাহিনী পরাজিত করলেন। দয়াময় প্রভুর রহমতের সরোবরে অবগাহন করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ধীর পদক্ষেপে মদীনায় ফিরে গেলেন।

প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে গাযওয়ায়ে খন্দক সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে। মুশরিকরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে কমবেশি সর্বমোট এক মাস অবরোধ করে রাখে। বিভিন্ন তথ্যসূত্র ও গন্থাবলীর সমন্বয়ে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা হলো, মুশরিকদের পক্ষ থেকে অবরোধ শুরু হয়েছিল শাওয়াল মাসে। আর শেষ হয়েছিল যুল কা'দ মাসে। আর ইবনে সা'দ এর বর্ণনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাযওয়ায়ে খন্দক শেষে মদীনায় ফিরে গিয়েছিলেন বুধবার। যুল কা'দ মাস শেষ হতে তখনো সাত দিন বাকি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে গাযওয়ায়ে আহযাব কোনো ক্ষয়-ক্ষতির লড়াই ছিল না; বরং এটা ছিল গোত্রপ্রীতি আর জাত্যভিমানের লড়াই। এ যুদ্ধে বড় ধরনের কোনো তিক্ত রক্তপাতের ঘটনাও ঘটেনি। এত কিছুর পরেও ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া। তার কারণ হলো এ যুদ্ধে স্বয়ং মুশরিকরা বিভেদ আর অনৈক্যের ফাঁদে আঁটকে গিয়েছিল। এর মধ্যে আরও ইঙ্গিত ছিল যে, আরবের কোনো শক্তিই সেই ছোট শক্তিটিকে সমূলে উৎখাত করতে পারবে না, যা মদীনায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। কেননা, গাযওয়ায়ে আহযাবের সময় তারা যত বড় বাহিনী নিয়ে এসেছিল, এত বড় আর বিশাল শক্তিশালী বাহিনী আরবরা কোনোদিনও কোথাও নিয়ে আসেনি। এ কারণে আল্লাহ তাআলা যখন তাদেরকে বিতাড়িত করেছিলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এখন থেকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব; তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না; এখন থেকে আমরা আমাদের বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে ছুটে যাব।**[৫২২]

---

[৫২২] সহীহ বুখারী ২/৫৯০।

গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা

যেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাযওয়ায়ে খন্দক থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, সেদিন যোহরের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উম্মে সালামা রা. এর ঘরে গোসল করছিলেন, তখন জিবরাঈল আ. তাশরীফ নিয়ে এলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, আপনি কি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? কিন্তু ফেরেশতারা তো এখনো হাতিয়ার রাখেনি! আর আমিও সবেমাত্র দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন থেকে ফিরে এসেছি। আপনার সঙ্গীদেরকে নিয়ে বনু কুরাইযার দিকে চলুন। আমিও আপনার সামনে সামনে যাচ্ছি। আমি তাদের দুর্গে কম্পন সৃষ্টি করব। তাদের অন্তরে প্রচণ্ড ভীতি ঢেলে দিব। অতঃপর জিবরাঈল আ. ফেরেশতাদেরকে নিয়ে চলতে লাগলেন।

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ঘোষককে ঘোষণা দিতে বললেন, যে ব্যক্তি শ্রবণ ও আনুগত্যের ওপর রয়েছে, সে যেন আসরের নামায বনু কুরাইযায় গিয়ে আদায় করে। মদীনার দায়িত্ব দিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. কে। আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর হাতে পতাকা দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিলেন। আলী রা. যখন তাদের দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সেখান থেকে বাজে মন্তব্য শুনতে পেলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে নিয়ে বনু কুরাইযার 'বীরে আন্না' নামক কূপের পাড়ে অবতরণ করেন। সাধারণ মুসলমানরাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এবং দ্রুত বনু কুরাইযার দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু রাস্তাতেই আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল। একদল বলল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবেই আমরা বনু কুরাইযাতে গিয়েই আসরের নামায আদায় করব। পরে দেখা গেল এ দল ইশার নামাযের পরে আসরের নামায আদায় করেছে। আরেক দল বলল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ ইরশাদ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বের হওয়া। এরপর তারা রাস্তাতেই আসরের নামায আদায় করে নিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'দলের কারোরোই সমালোচনা করেননি।

এভাবে মুসলিম বাহিনী দলে দলে বনু কুরাইযায় গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হলো। তাদের সর্বমোট সংখ্যা

ছিল তিন হাজার। ঘোড়া ছিল ত্রিশটি। তারা বনু কুরাইযার দুর্গের পাশে অবতরণ করে তাদের ওপর অবরোধ জারী করে দিলেন।

যখন অবরোধ দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল, তখন তাদের নেতা কা'ব ইবনে আসাদ তাদের কাছে তিনটি পথ তুলে ধরল: এক. ইসলাম গ্রহণ করে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দলে দাখিল হয়ে যাবে। এতে তাদের জান-মাল, নারী-পুরুষ সবকিছু হেফাযতে থাকবে। সে তাদেরকে আরও বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা নিশ্চিতভবে বুঝতে পেরেছে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। তিনিই সেই ব্যক্তি তোমাদের কিতাবে যার আগমনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। দুই. অথবা তারা তাদের নারী-শিশুদেরকে নিজেদের হাতে হত্যা করবে। এরপর নাঙা তলোয়ার হাতে মুহাম্মাদের বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতে হয়তো বিজয় লাভ করবে নতুবা গোষ্ঠীসুদ্ধ তারা শেষ হয়ে যাবে। তিন. নতুবা তারা মুহাম্মাদ ও তাঁর বাহিনীর ওপর অতর্কিত হামলা করে বসবে। আর এ জন্য তারা ব্যবহার করবে শনিবার দিনকে। কারণ শনিবার মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে আক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকবে। কিন্তু তারা উল্লিখিত তিনটি পথই প্রত্যাখ্যান করল। আর এটাই ছিল সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন তাদের সরদার প্রচণ্ড রাগ আর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদেরকে বলেছিল, *'মায়ের পেট থেকে জন্ম নেওয়ার পর থেকে তোমাদের কেউ কখনো একটি রাতও সুস্থ চেতনা নিয়ে কাটায়নি'*।

উল্লিখিত তিনটি পন্থাই প্রত্যাখ্যান করার পরে ইহুদিদের নিকট রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে দুর্গ থেকে অবতরণ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। তারপরও তারা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তাদের কতিপয় মুসলিম মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট লোক পাঠালো যে, আবু লুবাবা রা. কে আমাদের কাছে পঠিয়ে দিন আমরা তার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখব। আবু লুবাবা রা. ছিলেন তাদের মিত্র। তাছাড়া তাদের এলাকায় তার ধন-সম্পদ ও বাল-বাচ্চা ছিল। তাকে দেখা মাত্র ইহুদি পুরুষরা দাঁড়িয়ে গেল। আর নারী ও শিশুরা তার সামনে উচ্চস্বরে কান্না জুড়ে দিলো। এ দৃশ্য দেখে আবু লুবাবার মন গলে গেল। তারা বলল, আবু লুবাবা! মুহাম্মাদের নির্দেশে দুর্গ থেকে নেমে যাওয়া কি আপনি সমীচীন মনে করেন? তিনি বললেন, হাঁ; এবং তার হাত দ্বারা গলার দিকে ইশারা করলেন। যাতে ইঙ্গিত ছিল তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে তিনি খেয়ানত করে ফেলেছেন। তাই দ্রুত ফিরে এলেন। রাসূলের কাছে না এসে সরাসরি মদীনায় মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। মসজিদের পিলারের

সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে শপথ করলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে এই বাঁধন খোলা ব্যতীত খুলবেন না। আর বনু কুরাইযায় তিনি আর কখনোই যাবেন না। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুভব করছিলেন যে, আবু লুবাবার ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর যখন তিনি তার বিস্তারিত ঘটনা শুনলেন তখন বললেন, **সে যদি আমার কাছে চলে আসত তবে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু সে নিজেই এ পথ বেছে নিয়েছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করার আগ পর্যন্ত আমি কিছুই করতে পারব না।**

আবু লুবাবার কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও বনু কুরাইযা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে দুর্গ থেকে অবতরণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করল। প্রচুর খাদ্য উপকরণ, পানির কূপ আর দুর্ভেদ্য দুর্গে থাকার সুবাদে বনু কুরাইযার অনেক দিন এই অবরোধে থাকার শক্তি ও ক্ষমতা ছিল। এর বিপরীতে মুসলমানরা গাযওয়ায়ে খন্দকের শুরু হতে এ পর্যন্ত ধারাবাহিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। পাশাপাশি প্রতিটি মুহূর্তে ধূধূ বিয়াবানে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ আর ক্ষুধা-তৃষ্ণার মুখামুখি হচ্ছিলেন। কিন্তু বনু কুরাইযার এ লড়াই ছিল একটি সাম্প্রদায়িক লড়াই। তাই আল্লাহ তাদের হৃদয়ে ভয়-ভীতি ঢেলে দিলেন। তাদের আত্মিক শক্তি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তাদের মনোবলের সুউচ্চ ইমারত মাটিতে ধসে গেল। এক পর্যায়ে আলী ইবনে আবী তালিব ও যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. চিৎকার করে উঠলেন, আল্লাহর কসম! হয়তো হামযার মতো আমরা শহীদ হয়ে যাবো নতুবা তাদের দুর্গ জয় করেই ছাড়ব।

এ সময় বনু কুরাইযা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফয়সালায় দুর্গ থেকে নেমে আসার প্রতি দ্রুত মনোযোগী হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পুরুষদেরকে বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তখন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আনসারী রা. এর তত্ত্বাবধানে তাদেরকে হাতকড়া পরানো হলো। আর তাদের নারী ও শিশুদেরকে পুরুষদের থেকে এক কোণে আলাদা করে রাখা হলো। তখন আউস গোত্র দাঁড়িয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বনু কাইনুকার সঙ্গে যে আচরণ করেছিলেন তা তো আপনি নিজেই জানেন। তারা আমাদের ভাই খাযরাজের মিত্র। এ হিসেবে তারা আমাদেরও মিত্র। সুতরাং, তাদের ওপর ইহসান করুন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমাদের কেউ যদি তাদের ব্যপারে ফয়সালা করে তবে কি তোমরা সন্তুষ্ট থাকবে? তারা বলল, জ্বী নিশ্চয়ই! তিনি বললেন, তাহলে সা'দ বিন মুয়ায তাদের ফয়াসালা করবে। তারা বলল, আমরা রাযি আছি।

তিনি সা'দ বিন মুয়ায রা. কে ডেকে পাঠালেন। খন্দক যুদ্ধে তাঁর হাতের প্রধান রগ প্রচণ্ড যখম হয়ে যাওয়ার দরুন তিনি মদীনাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণে তাকে একটি গাধার পিঠে আরোহণ করানো হলো। এভাবে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট চলে এলেন। আউসের লোকেরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, সা'দ! তোমার মিত্রদের সঙ্গে ভালো আচরণ করো!! তাদের ওপর ইহসান করো!! কেননা, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে তাদের ওপর ইহসান করার জন্যই ফয়সালার দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি তাদের কোনো জবাব না দিয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। এভাবে যখন তাদের আবেদন-নিবেদন ধীরে ধীরে বেড়ে চলল, তখন তিনি বললেন, সাদের জন্য সময় এসেছে, সে আল্লাহর জন্য ফয়সালার ক্ষেত্রে কোনো নিন্দুকের নিন্দার ভয় পাবে না। যখন তারা তার কাছ থেকে এ কথা শুনতে পেল তখন অনেকে মদীনায় ফিরে গিয়ে মানুষকে তাদের মৃত্যুসংবাদ শুনালো।

সা'দ রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা তোমাদের সরদারের দিকে এগিয়ে যাও! লোকেরা এগিয়ে তাকে সওয়ারীর পিঠ থেকে অবতরণ করিয়েই বলতে লাগল, সা'দ! তারা তোমার ফয়সালার ওপর ভিত্তি করে দুর্গ থেকে অবতরণ করেছে। তিনি বললেন, আমার ফয়সালা তাদের ওপর কার্যকর হবে? তারা বলল, হাঁ। তিনি বললেন, মুসলমানদের ওপরেও কি? তারা বলল, হাঁ। তিনি বললেন, এখানে যিনি আছেন তাঁর ওপরেও? তারা বলল, হাঁ। তার উদ্দেশ্য ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু তিনি তাঁর সম্মান ও ইয্যতের কারণে কথাটি বলার সময় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদের কথা বুঝতে পেরে বললেন, **হাঁ, আমার ওপরেও**। তিনি বললেন, তাহলে তাদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা হলো, তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হবে। নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। ধন-সম্পদ বন্টন করে নেওয়া হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদের এ ফয়সালা শুনে বললেন, **তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফয়সালাই করেছ, সাত আসমানের ওপরে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে ফয়সালা করেছিলেন।**

সা'দ রা. এর ফয়সালা ছিল সম্পূর্ণ আদল ও ইনসাফভিত্তিক। এতে মোটেও যুলুম কিংবা অন্যায় ছিল না। কেননা, বনু কুরাইযা সারা জীবন মুসলমানদের সঙ্গে যা করে এসেছে, সে কথা বাদ দিলেও এখন তারা মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য পনেরো শ' তরবারি, দুই হাজার বর্শা, তিন শ' লৌহবর্ম, পাঁচ শ' ঢাল প্রস্তুত করে রেখেছিল। বিজয়ের পরে যেগুলো আল্লাহর অসীম কুদরতে মুসলমানদের হাতে এসেছিল।

এই ফয়সালার পরে বনু কুরাইযাকে বনু নাজ্জারের এক মহিলা- বিনতে হারিসের ঘরে বন্দী করে রাখা হলো। এরপর মদীনার বাজারে তাদের জন্য খন্দক খনন করা হলো। তারপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তাদের একেক দল করে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেই খন্দকে তাদের শিরশ্ছেদ করা হলো। যারা এখনো বন্দী আছে তারা তাদের সরদার কা'ব ইবনে আসাদকে বলল, আপনার কী মনে হয়, আমাদের সঙ্গে কী করা হবে? সে বলল, সব জায়গাতেই কি তোমরা বুঝতে পারো না? দেখছ না ঘোষক থেমে নেই! আর তোমাদের যারা যাচ্ছে তাদেরও ফিরে আসার নাম নেই। আল্লাহর কসম! সবাইকে হত্যা করা হচ্ছে। যাই হোক, তাদের ছয় শ' কিংবা সাত শ' জন পুরুষ সবাইকে শিরচ্ছেদ করা হলো।

এভাবেই খেয়ানত আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত সাপগুলিকে সমূলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো। যারা এতদিন পর্যন্ত একটার পর একটা তাদের অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এসেছে। যারা মুসলমানদের জীবনের সবচেয়ে নাযুক ও খতরনাক মুহূর্তে তাদের শত্রুবাহিনীর সঙ্গ দিয়ে তাদের ধ্বংস ও বিলুপ্তি তরান্বিত করতে চেয়েছে। এভাবে একের পর এক বিভিন্ন অপরাধ ও দুষ্কর্মের মাধ্যমে তারা প্রথম কাতারের যুদ্ধাপরাধী ছিল- যাদের সমুচিত শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড।

বনু নযীরের চেলাপেলার সঙ্গে তাদের বুড়ো শয়তানটাকে হত্যা করা হয়। সে ছিল উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা রা. এর পিতা গাযওয়ায়ে খন্দকের অন্যতম দাগী যুদ্ধাপরাধী হুয়াই ইবনে আখতাব। খন্দক যুদ্ধে কুরাইশ ও বনু গাতফান ফিরে যাওয়ার পর সেও ইহুদিদের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করেছিল। কারণ, সে খন্দক যুদ্ধের সেই গাদ্দারি আর বিশ্বাসঘাতকতার দিনগুলিতে কা'ব ইবনে আসাদকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যখন তাকে নিয়ে আসা হলো তখন তার গায়ের জামাটি প্রত্যেক প্রান্ত থেকে সে কয়েক আঙ্গুল পরিমাণ ছিঁড়ে রেখেছিল যাতে করে সেটা কাউকে 'সলব' হিসেবে দেওয়া না যেতে পারে। তখন তার উভয় হাত ঘাড়ের সঙ্গে রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম! তোমার সঙ্গে শত্রুতার কারণে আমি কখনো আমার নিজেকে (অনুশোচনা বশত) তিরষ্কার করিনি; তবে মনে রেখো! যে আল্লাহর সঙ্গে লড়তে যাবে সে পরাজিত হবেই হবে। এরপর লোকদেরকে বলল, হে লোকসকল! আল্লাহর ফয়সালার সামনে আমার কোনো বক্তব্য নেই। এটাতো তকদীরেরই লিখন ছিল, যা আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলের জন্য লিখে রেখেছিলেন। এরপর সে বসে পড়ল এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো। এভাবে যেন সে জীবনের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়েও ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

তাদের নারীদের মধ্য থেকে কেবল একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, সে খাল্লাদ ইবনে সুওয়াইদ রা.এর প্রতি চাক্কি ছুঁড়ে তাকে শহীদ করে দিয়েছিল। এ কারণে কিসাস হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়।

পুরুষদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে হত্যা করে বাকিদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং, আতিয়্যা কুরাযী রা. অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলমান হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সান্নিধ্যের পরশে ধন্য হয়েছিলেন।

সাহাবী সাবেত বিন কায়স রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট যুবাইর ইবনে বাতা ও তার পরিবার পরিজনের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন। আর তার ধন-সম্পদ হিবা চেয়েছিলেন। কারণ, যুবাইয়েরের সাবেত রা. এর প্রতি ইহসান ও অনুগ্রহ ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তখন সাবেত বিন কায়স রা. যুবাইরকে বললেন, রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রাণভিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার ধন-সম্পদ ও পরিবার আমাকে দান করেছেন। আমি সেগুলো তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন তুমি এর সবকিছু নিয়ে চলে যাও! কিন্তু যুবাইর যখন তার কওমের সবার হত্যার কথা জানতে পারল তখন সে বলল, হে সাবেত! তোমার কাছে আমার ইহসান ও অনুগ্রহের আবেদন এই যে, তমি আমাকে আমার বান্ধবদের সঙ্গে মিলিয়ে দাও! তখন তাকেও শিরশ্ছেদ করা হলো এবং তার ইহুদি বান্ধবদের জগতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সাবেত রা. যুবাইরের ছেলে আব্দুর রহমান কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই আব্দুর রহমান ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

একইভাবে বনু নাজ্জারের এক নারী উম্মুল মুনযির সালমা বিনতে কায়স রা. রেফায়া ইবনে সামাওয়াল কুরাযীকে হিবা (দান) চাইলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেফায়াকে তার হাতে তুলে দিলেন। সেও তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং পরবর্তী সময়ে রেফায়া ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

বনু কুরাইযার আখেরী রাতে দুর্গ থেকে অবতরণের আগে তাদের একটি দল ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এতে তাদের জান, মাল ও পরিবার-পরিজন রক্ষা পেয়েছিল।

ঐ একই রাতে বনু কুরাইযার এক ব্যক্তি আমর ইবনে সা'দ- সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে গাদ্দারীতে বনু কুরাইযার সঙ্গে ছিল না- দুর্গ থেকে বের হয়ে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রহরী-প্রধান মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তাকে দেখেও কিছু বললেন না। কিন্তু পরে আর জানা যায়নি, সে কোথায় চলে গিয়েছিল?

বনু কুরাইযার সম্পদ জমা করা হলে তা থেকে 'খুমুস' তথা এক পঞ্চমাংশ বের করার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল

বণ্টন করে দেন। তিনি প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈন্যকে দেন তিন অংশ; দুই অংশ অশ্বের আর এক অংশ আরোহীর। আর প্রত্যেক পদাতিক সৈন্যকে দেন এক অংশ করে। অতঃপর বন্দীদেরকে সা'দ বিন যায়দ আনসারী রা. এর তত্ত্বাবধানে নজদে পাঠিয়ে দেন সেখানে তিনি তাদেরকে বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে ঘোড়া ও যুদ্ধের হাতিয়ার ক্রয় করেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কুরাইযার নারীদের মধ্য থেকে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খুনাফাকে নিজের জন্য পছন্দ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর হাতেই রয়ে যান। এটা হলো ইবনে ইসহাকের বর্ণনা।[৫২৩] আর কালবীর মতে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দেন। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরীতে তাকে নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। পরবর্তী সময় বিদায় হজ্জে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফিরে আসার পথে তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।[৫২৪]

যখন বনু কুরাইযার ভাগ্যের সুনির্দিষ্ট ফয়সালার বাস্তব রূপায়ন সুসম্পন্ন হলো তখন আল্লাহর প্রিয় বান্দা সা'দ বিন মুয়ায রা. এর দুআ- যা আমরা পেছনে গাযওয়ায়ে আহযাবে উল্লেখ করেছি- কবুল হওয়ার সময় এসে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদের জন্য মসজিদে নববীর পাশে তাঁবু স্থাপন করে দিয়েছিলেন, যাতে করে কাছ থেকে তাঁকে দেখে যেতে পারেন। এভাবে যখম বনু কুরাইযা অধ্যায়ের ইতি ঘটল, তখন তার যখম আবার কাঁচা হয়ে ফেটে যেতে লাগল। আয়েশা রা. বলেন, তার যখম থেকে অঝোর ধারায় খুন প্রবাহিত হতে লাগল। বন্ধ করার কোনো উপায় ছিল না। মসজিদে সাদের তাঁবু ছাড়াও বনু গিফারের একটা তাঁবু ছিল। তারা হঠাৎ তাদের তাঁবুতে রক্তধারা আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল, হে তাঁবুর বাসিন্দারা! তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে এ কী আসছে? পরে দেখল সা'দ রা. এর হাতের যখম থেকে অনবরত খুন বের হচ্ছে! এই ধারাবাহিকতায় তিনি আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।[৫২৫]

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন, **সা'দ বিন মুয়াযের মৃত্যুতে দয়াময় আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল।**[৫২৬] ইমাম তিরমিযী র. আনাস রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, যখন সা'দ বিন মুয়াযের জানাযা বহন করা হলো তখন মুনাফিকরা বলতে

---

[৫২৩] দেখুন ইবনে হিশাম ২/৩৪৫।

[৫২৪] তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ১২।

[৫২৫] সহীহ বুখারী ২/৫৯১।

[৫২৬] সহীহ বুখারী ১/৫৩৬। সহীহ মুসলিম ২/২৯৪। তিরমিযী ২/২২৫।

লাগল, এর জানাযা এত হালকা! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ফেরেশতারা তাঁর জানাযা বহন করছে।**[৫২৭]

বনু কুরাইযার অবরোধ কালে মুসলমানদের পক্ষে একজন শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন খাল্লাদ ইবনে সুওয়াইদ। বনু কুরাইযার এক মহিলা তার দিকে জাঁতা ছুঁড়ে মেরেছিল। তাছাড়া উক্কাশা রা. এর ভাই আবূ সিনান ইবনে মিহ্সান অবরোধকালে মারা যান।

ওদিকে আবু লুবাবা একটানা ছয় দিন মসজিদে নববীর খুঁটির সঙ্গে বাঁধা থাকেন। প্রত্যেক নামাযের সময় তার স্ত্রী এসে বাঁধন খুলে দিতেন আর তিনি নামায আদায় করে আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে যখন উম্মে সালামা রা. এর ঘরে ছিলেন; তখন সে রাতের আখেরী প্রান্তে সুবহে সাদিকের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার তওবা কবুলের সুসংবাদ আসে। উম্মে সালামা রা. ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, আবু লুবাবা সুসংবাদ গ্রহণ করো! আল্লাহ তাআলা তোমার তওবা কবুল করেছেন। তখন মানুষ তাকে বাঁধনমুক্ত করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূল ছাড়া এ বাঁধন আর কেউ খুলতে পারবে না। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হয়ে ফজরের নামায পড়তে যাচ্ছিলেন তখন তাকে বাঁধনমুক্ত করে দেন।

গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা সংঘটিত হয়েছিল হিজরী পঞ্চম বর্ষের যুল কা'দ মাসে। আর অবরোধ চলছিল মোট পঁচিশ দিন।[৫২৮]

আল্লাহ তাআলা গাযওয়ায়ে আহযাব ও গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা সম্পর্কে সূরা আহযাবের কিছু আয়াত নাযিল করেন। সেখানে তিনি মূল ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লেখ করেন। মুমিন ও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেন। অতঃপর দুশমন বাহিনীর ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়া এবং আহলে কিতাব তথা ইহুদিদের গাদ্দারি ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতির সুচারু চিত্র এঁকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন।

---

[৫২৭] তিরমিযী ২/২২৫।

[৫২৮] ইবনে হিশাম ২/২৩৭, ২৩৮। এ গাযওয়ায়ে সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ২/২৩২-২৭৩। সহীহ বুখারী ২/৫৯০, ৫৯১। যাদুল মাআদ ২/৭২-৭৪।

গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযার পরে সামরিক কর্মকাণ্ড

সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকের হত্যা

আবু রাফে সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইক ছিল ইহুদিদের দাগী অপরাধীদের প্রথম কাতারের একজন, যারা আরবের বিভিন্ন কবীলাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক পতাকা তলে সমবেত করে, টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ দিয়ে সহায়তা করে গাযওয়ায়ে খন্দকের মতো প্রলয়কাণ্ডের হোতা ছিল।[৫২৯] তা ছাড়া সে সুযোগ পেলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও কষ্ট দিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা থেকে অবসর হলেন তখন খাযরাজের লোকজন এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আবেদন জানালো। কারণ, ইতঃপূর্বে ইহুদি নেতা কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করেছিল আউসের মুসলমানরা। এ কারণে তারা চাচ্ছিল এই ফযীলতের ভাগীদার এবার তারা হতে। এ কারণে তারা দৌড়ে এলো দরবারে রিসলাতের অনুমোদন নিতে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হত্যার অনুমতি দিলেন। তবে কোনো নারী কিংবা শিশু হত্যা থেকে তাদেরকে তিনি বারণ করে দিলেন। সুতরাং, খাযরাজের বনু সালামার পাঁচ জনের একটি ছোট দল গঠন করা হলো এই গোপন মিশন বাস্তবায়নের জন্য। তাদের সালার (প্রধান) নিযুক্ত করা হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. কে।

ছোট এই দলটি মদীনা থেকে বের হয়ে খাইবরের পথ ধরল। কারণ, সেখানেই ছিল আবু রাফে সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইকের কেল্লা। তারা যখন সেখানে পৌছেন ততক্ষণে সূর্য ডুবে গিয়েছিল। তপ্ত রোদময় দিনের কর্ম-ব্যস্ততা আর ক্লান্তি শেষে একটু রাহাত আর শান্তির আশায় মানুষ যে যার ঘরে গিয়ে মাথা গুঁজেছিল। তখন সালার আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. আপন সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা এখানেই বসে অপেক্ষা করো! আমি সামনে গিয়ে কেল্লার দ্বাররক্ষকের সঙ্গে একটু ভাব জমিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারি কি না দেখি! এরপর তিনি দরজার কাছে গিয়ে মানুষের ভীড় দেখে কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললেন, যেন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বসেছেন। ইতোমধ্যে সবাই ভেতরে ঢুকে গেল। দ্বাররক্ষক তখন আওয়াজ দিলো, আল্লাহর বান্দা! ঢুকতে চাইলে জলদি করে ভেতরে চলে এসো! এখনই আমি কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিচ্ছি।

---

[৫২৯] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৩৪৩।

আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক রা. বলেন, তখন আমি কেল্লার ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়লাম। সব লোকজন ঢুকলে দারোয়ান কেল্লার ফটক বন্ধ করে দিয়ে চাবিগুলি একটি খুঁটির পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে আরামের জন্য চলে গেল। তিনি বলেন, (যখন চারদিকের পরিবেশ শান্ত হয়ে এক রাশ নিস্তব্ধতা নেমে এলো) তখন আমি উঠে গিয়ে প্রথমে চাবিগুলি নিয়ে দরজা খুলে ফেললাম। আবু রাফে'র অভ্যাস ছিল এ সময় গল্পের আসর জমিয়ে বসা। সে থাকত কেল্লার উপরের একটি কক্ষে। এক সময় গল্পের আসর যখন সমাপ্ত হলো এবং তার সকল সঙ্গীসাথীরা চলে গেল তখন আমি ওপরে তার কক্ষের দিকে উঠলাম। আমি যে দরজাই খুলে ভেতরে ঢুকলাম একটা একটা করে ভেতর দিক থেকে বন্ধ করে নিতে লাগলাম। মনে মনে বললাম, যদি তারা আমার আগমনের সংবাদ জেনেও ফেলে তবুও তাকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত তারা আমার কাছে এসে পৌঁছতে পারবে না। এভাবে আমি এক সময় তার কাছে পৌঁছে গেলাম। ঘুটঘুরে অন্ধকার ভরা একটি নিস্তব্ধ কামরায় আবু রাফে' তার পরিবারের মধ্যে বেঘোর ঘুমে বুঁদ ছিল। তার অবস্থান ঠিক কোথায় আমি ঠাওর করতে পারলাম না। তাই আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, আবু রাফে'! সে বলল, কে? আমি আওয়াজ শুনে সে দিকে অগ্রসর হয়ে অনুমান করে সজোরে তরবারি হানলাম। কিন্তু আঘাতটা ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ল না। সে চিৎকার করে উঠল। আমি তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার গিয়ে তাকে বললাম, আবু রাফে'! কীসের আওয়াজ পেলাম? সে বলল, তোর মা ধ্বংস হোক! কেউ আমার কামরায় ঢুকে একটু আগে আমার ওপর তরবারির আঘাত হেনেছে। তিনি বলেন, এবার আমি শরীরের পুরো শক্তি দিয়ে তার ওপর তরবারি হানলাম। সে মেঝেতে পড়ে গিয়ে রক্তে লুটোপুটি খেতে লাগল। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, এবারও তাকে পুরোপুরি হত্যা করতে পারিনি। এরপর আমি তার পেটে তরবারি চালিয়ে পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। এবার আমি তাকে হত্যার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর আমি একটার পর একটা দরজা খুলে একটা সিঁড়ির কাছে গিয়ে মাটিতে পৌঁছে গিয়েছি ভেবে পা রাখলাম। কিন্তু আমার অনুমান ভুল ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আমি নীচে গড়িয়ে পড়লাম। সেটা ছিল চন্দ্রালোকিত রাত। আমার পা ভেঙে গেল। পাগড়ি দ্বারা আমি পা বেঁধে নিলাম। এরপর আমি দৌড়ে গিয়ে দরজার ওপর বসে পড়লাম। মনে মনে বললাম, তার হত্যার খবর শোনার আগ পর্যন্ত এখান থেকে বের হবো না।

ভোর হলো। প্রভাতী পাপিয়ার থেকে থেকে পিউ পিউ ডাক শুনে আশপাশের প্রকৃতি জেগে উঠল। এক ঘোষক কেল্লার শিখর দেশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলো, আমি হিজাযের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবু রাফে'র মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি। তখন

আমি আমার সাথীদের নিকট দৌড়ে গিয়ে বললাম, মুক্তি মিলেছে! আল্লাহ তাআলা আবু রাফে' কে হত্যা করেছেন। এরপর আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। তিনি বললেন, **তোমার পা বিছিয়ে দাও!** আমি আমার পা বিছিয়ে দিলাম। তিনি আমার পায়ে তাঁর হাত মুবারকের ছোঁয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ আমার পা এমন হয়ে গেল, যেন কোনোদিনও তাতে কোনো ব্যথা ছিল না।[৫৩০]

এটা হলো ইমাম বুখারী র. এর বর্ণনা। আর ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, দলের সবাই মিলে আবু রাফে'র কাছে যায় তারপর সবাই মিলে তাকে হত্যা করে। আর তার ওপর তরবারির হামলা চালিয়ে যিনি হত্যা করেছিলেন তিনি ছিলেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রা.। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে, রাতের অন্ধকারে তারা যখন আবু রাফেকে হত্যা করল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আতীকের পা ভেঙে গেল তখন তারা তাকে উঠিয়ে কেল্লার দেয়ালের এক ফাঁকে প্রবহমান একটি নালার কাছে নিয়ে গিয়ে সেখানে ঢুকে গেলেন। ইহুদিরা আগুন চালিয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করল। কাউকে না পেয়ে পরিশেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। ইহুদিরা ফিরে যাওয়ার পর তারা তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে এলো।[৫৩১]

এই সারিয়াটি পাঠানো হয়েছিল হিজরী পঞ্চম বর্ষের যিলকা'দ কিংবা যিলহজ্ব মাসে।[৫৩২]

এভাবে যখন গাযওয়ায়ে আহযাব ও কুরাইযার সশস্ত্র লড়াই থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা বিরতি পেলেন তখন তিনি আশপাশের কবীলাগুলির ওপর শাসনমূলক আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিলেন। কারণ, এ সকল কবীলা জায়গায় জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত করছিল এবং শক্তি প্রয়োগের আগ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হওয়ার লোক ছিল না।

সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা

গাযওয়ায়ে আহযাব ও গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযা থেকে ফারেগ হওয়ার পর এটাই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাঠানো প্রথম সারিয়া। এ সারিয়ার সদস্য ছিলেন সর্বমোট ত্রিশ জন অশ্বারোহী।

এই সারিয়াকে পাঠানো হয়েছিল নজদের বাকরাত অঞ্চলের মধ্যে যারিয়্যার পার্শ্ববর্তী কুরতা নামক স্থানে। যারিয়্যা ও মদীনার মধ্যে দূরত্ব ছিল সাত দিনের।

---

[৫৩০] সহীহ বুখারী ২/৫৭৭।

[৫৩১] ইবনে হিশাম ২/২৭৪,২৭৫।

[৫৩২] রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২২৩। গাযওয়ায়ে আহযাব ও গাযওয়ায়ে বনী কুরাইযার অন্যান্য উৎসগ্রন্থ।

ষষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসের দশ তারিখে এ বাহিনী বনু বকর ইবনে কিলাবের একটি শাখাগোত্রের দিকে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে যখন তাদের ওপর হামলা করলেন,তখন তারা পালিয়ে গেল। মুসলমানরা তাদের উট ও বকরী হস্তগত করে নিলেন। এবং মুহাররম মাসের এক দিন বাকি থাকতে তারা মদীনায় এসে হাযির হন। এ সময় তাদের সঙ্গে আসে বনু হানীফার সরদার সুমামা ইবনে আসাল হানাফী। মুসাইলিমাতুল কায্যাবের নির্দেশে[৫৩৩] সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার জন্য বের হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাকে বন্দী করে ফেলে। মদীনায় নিয়ে আসার পর তারা তাকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন, **সুমামা তোমার কাছে কী আছে?** সে বলল, মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে। যদি তুমি আমাকে হত্যা করো তবে একজন খুনওয়ালাকে হত্যা করলে। আর যদি আমার ওপর ইহসান করো তবে একজন কৃতজ্ঞ বান্দার প্রতি ইহসান করলে। আর যদি ধন-সম্পদ চাও তবে যা মনে চায় চেয়ে নিতে পারো। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সে অবস্থায় রেখে চলে যান। পরবর্তী সময় তিনি আরেকবার তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একই প্রশ্ন করেন এবং সে তাকে একই জবাব দেয়। এরপর তৃতীয় আরেকদিন তিনি তার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং আগের প্রশ্নগুলিই করেন। সুমামাও তাকে আগের সেই উত্তর দেয়। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সুমামাকে তোমরা ছেড়ে দাও!** তারা সুমামাকে ছেড়ে দিলো। মুক্তি পাওয়ার পর সে নিকটের একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করল। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলল, আল্লাহর কসম! গোটা পৃথিবীতে আমার কাছে আপনার চেহারার চেয়ে অধিক অপ্রিয় কোনো চেহারা ছিল না। আর আজ গোটা পৃথিবীতে আপনার চেহারাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহর কসম! গোটা পৃথিবীতে আমার কাছে আপনার ধর্মের চেয়ে অধিক অপ্রিয় কোনো ধর্ম ছিল না। আর আজ গোটা পৃথিবীতে আপনার ধর্মই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আমি উমরা করার ইচ্ছায় মক্কা যাচ্ছিলাম। আর সে অবস্থায় আপনার সওয়ারীরা আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুসংবাদ শোনালেন এবং তাকে উমরা করার অনুমতি দিলেন। সে যখন কুরাইশদের কাছে গেল তখন তারা তাকে বলল, সুমামা! বাপ-দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছ?

---

[৫৩৩] আস সীরাতুল হালবিয়্যাহ ২/২৯৭।

সে বলল, আল্লাহর কসম! তা কখনোই নয়; বরং আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! আজ থেকে ইয়ামামা হতে তোমাদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি ব্যতীত একটি গমের দানাও আসবে না! ইয়ামামা এতদিন ছিল মক্কার লোকদের ক্ষেত স্বরূপ। অতঃপর সুমামা রা. যখন নিজের দেশে ফিরে গেলেন তখন সেখান থেকে মক্কায় সবধরনের জিনিস আসার পথ বন্ধ করে দিলেন। এতে কুরাইশরা চোখে সর্ষে ফুল দেখল। তাদের দৈনন্দিন জীবন চরম সংকটের খাদে নিপতিত হলো। বাধ্য হয়ে তারা মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে চিঠি লিখল, যাতে তিনি সুমামা রা. এর কাছে মক্কায় খাবার-দাবার আসার পথ ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে চিঠি লেখেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন।[৫৩৪]

গাযওয়ায়ে বনু লাহইয়ান

বনু লাহইয়ান ছিল ঐ বিশ্বাসঘাতক কবীলা, যারা রজী' নামক স্থানে দশজন আসহাবে রাসূল রা. কে গাদ্দারী করে হত্যার পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এলাকা যেহেতু হিজাযের ভেতরে অনেক দূরে মক্কা সীমান্তের কাছাকাছি ছিল, আর তখন মুসলমান, কুরাইশ ও বেদুঈন জাতিগোষ্ঠীর মাঝে সম্পর্কের প্রবল টানাপড়েন চলছিল এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বড় দুশমন' এর ঘাঁটির একবারে কাছে গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু যখন দুশমন বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সাময়িক সময়ের জন্য হলেও তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল- তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক করলেন, বনু লাহইয়ানের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার এটাই সর্বোত্তম সময়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ষষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল কিংবা জুমাদাল উলা মাসে দুই শ' সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে তাদের দিকে যাত্রা করেন। মদীনার দায়িত্ব দিয়ে যান আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা. এর হাতে। কিন্তু যাহেরী অবস্থা দেখে সবাই মনে করল তিনি সিরিয়ার দিকে যাচ্ছেন। এরপর দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করে তিনি আমাজ ও উসফানের মধ্যবর্তী বাতনে গুরান নামক উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন, যেখানে তাঁর সাহাবীদের ওপর মরণ নামক বিপদ আপতিত হয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে পৌছে তাদের বিয়োগ-বেদনায় নিদারুণ মর্মাহত হলেন এবং তাদের জন্য দুআ করলেন। বনু লাহইয়ান তাদের সংবাদ পেয়ে

---

[৫৩৪] যাদুল মাআদ ২/১১৯। সহীহ বুখারী হাদীস নং ৪৩৭২ ইত্যাদি। ফাতহুল বারী ৭/৬৮৮।

পাহাড়ের চূড়ায় পালিয়ে আশ্রয় নিলো। এ কারণে তিনি সেখানে গিয়ে কাউকে পেলেন না। সেখানে দুই দিন অবস্থান করে চতুর্দিকে বিভিন্ন সারিয়া প্রেরণ করেন। তারাও তাদেরকে কোথাও খুঁজে পেল না। এরপর তিনি উসফানের দিকে চলে আসেন। সেখান থেকে দু'শ' জন অশ্বারোহীকে কুরাউল গামীমে পাঠিয়ে দেন, যাতে তাদের উপস্থিতির খবর কুরাইশদের কানে পৌঁছে যায়। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানের কারণে মদীনাতে তিনি চৌদ্দ দিন অনুপস্থিত থাকেন।

ধারাবাহিক সারিয়া ও সামরিক অভিযান

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দিকে একের পর এক সারিয়া পাঠাতে থাকেন এবং সামরিক অভিযান চালাতে থাকেন। নিম্নে আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি।

এক. ষষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল কিংবা রবীউস সানী মাসে গমরের দিকে প্রেরণ করেন সারিয়ায়ে উক্কাশা ইবনে মিহসান রা. কে। উক্কাশা রা. চল্লিশ জন সাহাবীর দলটি নিয়ে বনু আসাদের গমর নামক একটি কূপের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তারা সেখানে গেলে দুশমন পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের দুই শ' উট হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

দুই. ষষ্ঠ হিজরীর রবীউল আউয়াল কিংবা রবীউস সানী মাসে 'যুল কাস্‌সা' এর দিকে প্রেরণ করেন সারিয়ায়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. কে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. দশ জন সাহাবীর দলটি নিয়ে বনু সা'লাবাহ অঞ্চলে 'যুল কাস্‌সা' এর দিকে যাত্রা করেন। দুশমনরা তাদের জন্য লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তাদের সংখ্যা ছিল একশ' জন। অতঃপর যখন তারা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন তখন তারা বের হয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. ব্যতীত তাদের বাকী সবাইকে সেই নিদ্রার ঘোরেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়। ইবনে মাসলামা রা. আহত হয়ে তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে সক্ষম হন।

তিন. ষষ্ঠ হিজরীর রবীউস সানী মাসে যুল কাস্‌সার দিকেই প্রেরণ করেন সারিয়ায়ে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. কে। তাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. এর সঙ্গীদের ঘুমের ঘোরে নির্মমভাবে দুশমনের হাতে শাহাদাত বরণ করার পরে। চল্লিশ জন সাহাবীর একটি দল নিয়ে তারা যাত্রা করেন। সারা রাত পায়ে হেঁটে সফর করার পরে সকাল বেলা তারা বনু সা'লাবায় উপস্থিত হয়েই দুশমনের ওপর আক্রমণ করেন। কিন্তু বনু সা'লাবা এত দ্রুত পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় যে, মুসলমানরা তাদেরকে ধরতে সমর্থ হননি। কেবল এক ব্যক্তিকে ধরতে পেরেছিলেন এবং সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য অসংখ্য উট ও বকরী মুসলমানদের হস্তগত হয়।

চার. ষষ্ঠ হিজরীর রবীউস সানী মাসে জামূমের দিকে প্রেরণ করেন সারিয়ায়ে যায়দ বিন হারেসা রা. কে। জামূম ছিল মাররুয যাহরানে বনু সুলাইমের একটি কূপের নাম। যায়দ সেখানে গিয়ে মুযাইনার হালীমা নামক এক মহিলাকে গ্রেফতার করেন। সে তাদেরকে বনু সুলাইমের একটি মহল্লা দেখিয়ে দেয় সেখানে আক্রমণ করে তারা অসংখ্য উট, বকরী ও বন্দী নিয়ে আসেন। এগুলো নিয়ে যায়দ রা. যখন মদীনায় ফিরে আসেন তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মুযাইনী মহিলাকে আযাদ করে বিয়ে দিয়ে দেন।

পাঁচ. ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে ঈসের দিকে প্রেরণ করেন সারিয়ায়ে যায়দ রা. কে। তারা ছিলেন একশ' সত্তর জন অশ্বারোহী। এই অভিযানে কুরাইশদের একটি কাফেলার ধন-সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। কাফেলার নেতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জামাতা আবুল আস পালিয়ে সোজা মদীনায় স্ত্রী যয়নব রা. এর কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন এবং তাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলে কাফেলার সম্পদগুলি ফিরিয়ে দেন। যয়নব রা. তাই করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে সমস্ত মাল ফিরিয়ে দিতে বললেন। তবে তিনি এ জন্য কারও ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি করলেন না। তখন লোকজন ছোট-বড়, কম-বেশি সমস্ত মাল ফিরিয়ে দিলো। আবুল আস পরে সেগুলি নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। এরপর যার যার মাল তার হাতে অর্পণ করলেন। অতঃপর তিনি মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে যান। এতে করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় তিন বছর কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম সময় পরে যয়নব রা. কে আবার তার হাতে প্রথম বিবাহের মাধ্যমে তুলে দেন। সহীহ হাদীস[৫৩৫] দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। (তিনি তাকে প্রথম বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেন)। কেননা,কাফেরদের ওপর মুসলিম নারীরা হারাম হওয়ার আয়াত তখনো নাযিল হয়নি। আর যে হাদীসের বক্তব্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে তুলে দেন কিংবা ছয় বছর পর তাকে তুলে দেন- এগুলি অর্থ ও সনদ কোনো সূত্রেই বিশুদ্ধ নয়।[৫৩৬] আরও বিস্ময় জাগে তখন, যখন অনেকে এই যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে বলেন, আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন অষ্টম হিজরীর শেষের দিকে মক্কা বিজয়ের দিনকয়েক আগে। এরপর তারাই আবার বলেন যয়নব রা. ইন্তেকাল

[৫৩৫] দেখুন সুনানে আবী দাউদ এবং তার শরাহ আউনুল মা'বূদ: 'ইলা মাতা তারুদ্দু আলাইহি ইমরাআতুহু ইযা আসলামা বা'দাহু' অধ্যায়।

[৫৩৬] উভয় হাদীসের ওপর যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেগুলোর বিস্তারিত দেখুন তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১৯৫, ১৯৬।

করেছিলেন অষ্টম হিজরীর গোড়ার দিকে। তাদের কাছে প্রশ্ন, যয়নব রা. যদি অষ্টম হিজরীর গোড়ার দিকে ইন্তেকাল করে থাকেন তবে ঐ বছরের শেষের দিকে আবুল আসের ইসলাম গ্রহণের পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোত্থেকে এনে আবুল আসের হাতে তুলে দিয়েছিলেন? আমরা 'বুলূগুল মারাম' এর পাদটীকায়[৫৩৭] এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞ মূসা ইবনে উকবার বক্তব্য হলো, এ ঘটনাটি ঘটেছিল সপ্তম হিজরীতে আবু বাসীর ও তার সঙ্গীদের দ্বারা। কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তিনি এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত কীভাবে দিলেন? কেননা, এ সম্পর্কে বর্ণিত সহীহ ও যঈফ কোনো হাদীসের ভাষ্যই তার বক্তব্যকে সমর্থন করে না।

ছয়. ষষ্ঠ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে তারিফ কিংবা তারিকের দিকেও পাঠানো হয়েছিল সারিয়ায়ে যায়দ রা. কে। পনেরো জন সঙ্গীসহ যায়দ বনু সা'লাবার দিকে যান; কিন্তু দুশমন তাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে পালিয়ে যায়। তাদের ভয় ছিল স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে এসেছেন। কোনো লোক না পেলেও যায়দ রা. বিশটি উট পান। চার দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।

সাত. ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে ওয়াদীয়ে কুরার দিকেও পাঠানো হয় সারিয়ায়ে যায়দ রা. কে। বারো জন সঙ্গী নিয়ে যায়দ রা. কোনো দুশমন থাকলে তাদের অবস্থা জানার জন্য ওয়াদীয়ে কুরার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু ওয়াদীয়ে কুরার অধিবাসীরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে তাদের বারো জনের নয় জনই নিহত হয়। যায়দ বিন হারিসা রা. সহ কেবল তিনজন পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে সক্ষম হন।[৫৩৮]

আট. সারিয়ায়ে খাবাত : বলা হয়ে থাকে, এটি সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীর রজব মাসে। কিন্তু আগ-পাছের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের সামনে একেবারে স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, এটি সংঘটিত হয়েছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির আগে। জাবের রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তিনশ' জন অশ্বারোহী পাঠালেন। আমাদের আমীর ছিলেন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা.। আমরা কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় আমাদেরকে প্রচণ্ড ক্ষুধায় পেয়ে বসে। বাধ্য হয়ে আমরা খাবাত তথা ঘাস আর লতা-পাতা খেতে থাকি। এ কারণে

---

[৫৩৭] হাফিয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে ৭/৪৯৮ এটাকে ষষ্ঠ হিজরীর সারিয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

[৫৩৮] রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২২৬। এ সকল সারিয়ার বিস্তারিত জানার জন্য উক্ত গ্রন্থ দেখুন। আরও দেখুন যাদুল মাআদ ২/১২০-১২২। তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারির পাদটীকা পৃষ্ঠা ২৮,২৯।

তাকে সারিয়ায়ে খাবত বলা হয়ে থাকে। আমাদের একজন তিনটি উট যবাই করল, তারপর আবার তিনটি উট যবাই করল। তারপর আবারো তিনটি করল। পরক্ষণে সা'দ রা. তাদেরকে এমন করতে নিষেধ করে দিলেন। এ সময় সমুদ্র তীরে আম্বর নামের একটি বিশাল মাছ এসে আটকে গেল। আমরা দীর্ঘ অর্ধমাস সেটা খেয়ে থাকলাম এবং তাঁর তেল শরীরে মাখতাম। এতে আমাদের শরীর সুঠাম ও সুন্দর হয়ে গেল। আবু উবাইদা মাছটির একটি কাঁটা সোজা করে দাঁড় করালেন। এরপর পুরো বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটিকে তিনি উটের পিঠে করে কাঁটাটির নীচ থেকে যেতে বললেন। সে চলে গেল কিন্তু কাঁটায় উটের ছোঁয়াও লাগল না। আমরা স্মৃতিস্বরূপ কয়েক টুকরো মাছ নিয়ে ফিরে এলাম। মদীনায় ফিরে এসে আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পুরো ঘটনা তুলে ধরলাম। তখন তিনি বললেন, **এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রিযিক ছিল, তোমাদের কাছে এর কোনো টুকরা থাকলে আমাকেও একটু দাও তো দেখি।** তখন আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কিছু টুকরা পাঠিয়ে দিলাম।[৫৩৯]

হুদাইবিয়ার আগে এই সারিয়া সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো হুদাইবিয়ার পরে মুসলমানরা কোনো কুরাইশী কাফেলার জন্য কোথাও চুপটি মেরে এভাবে বসে থাকেনি।

---

৫৩৯ সহীহ বুখারী ২/৬২৫ ,৬২৬। সহীহ মুসলিম ২/১৪৫ ,১৪৬।

গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক বা গাযওয়ায়ে মুরাইসী'
(পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাস)

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ কোনো যুদ্ধ না হলেও এ সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা ইসলামী সমাজে ব্যাপক অস্থিরতা ও স্থবিরতার জন্ম দিয়েছিল। অল্প সময়ের জন্য হলেও তা ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দোকান খুলে বসেছিল। কিন্তু এর ফলাফলে একদিকে মুনাফিকদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়; অপরদিকে এমন কিছু শরয়ী বিধি-বিধান নাযিল হয়, মুসলিম সমাজে যাতে উত্তম আখলাক ও চরিত্র, ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং আত্মার শুচি-শুভ্রতা ও বিমলিনতা এক নব আঙ্গিকে রচিত হয়। আমরা আগে যুদ্ধের কাহিনী উল্লেখ করব। এরপরে ঐ সকল ঘটনার ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করব।

অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞদের নিকট এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে। কিন্তু প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে ইসহাকের মতে এটা সংঘটিত হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীতে।[৫৪০]

---

[৫৪০] ইবনে ইসহাকের মতের সমর্থনে দলীল হলো, ঘটনা প্রবাহ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটা ছিল পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আর পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছিল যয়নব রা. এর শানে। আর যয়নব রা. তখন রাসূলে কারীম সা. এর ঘরে ছিলেন। কারণ রাসূলে কারীম সা. যয়নবকে আয়েশা রা. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমি আমার চোখ ও কানকে এ ব্যাপার থেকে হেফাযত করব। আয়েশা রা. এর বর্ণনা, তিনিই নবীজীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে সমুন্নত করেছিলেন। আর এটা তো স্বত-প্রসিদ্ধ বক্তব্য যে, যয়নব রা. কে রাসূলে কারীম সা. বিবাহ করেছিলেন গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযার পরে পঞ্চম হিজরীর একেবারে শেষের দিকে তথা যুল কা'দ কিংবা যুল হজ্জ মাসে। আর এ গাযওয়া সকলের মতে শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। সুতরাং তা পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাস হতে পারে না; বরং সেটা ছিল ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাস। আর ইফকের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের ধারাবাহিকতায় সা'দ বিন মুয়ায ও সা'দ বিন উবাদা রা. এর মাঝে বিবাদের ঘটনারও উল্লেখ দেখা যায়। অথচ সা'দ বিন মুয়ায রা. পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে গাযওয়ায়ে বনু কুরাইযার পরেই ইন্তেকাল করেন। তাই এটা অলস কল্পনা ও রাবীর ধারণামাত্র। কারণ ইফকের ঘটনায় তার উপস্থিতি থাকতে পারেই না। আর এ কারণে ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা থেকে তিনি আয়েশা রা. থেকে যুহরী সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন সেখানে সা'দ বিন মুয়াযের কথা বলেননি; বরং বলেছেন উসাইদ বিন হুযাইরের কথা। আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযামও বলেন, এটাই সঠিক ও বিশুদ্ধ মতামত; এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ ঘটনায় সা'দ বিন মুয়াযকে উল্লেখ করা চরম বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা (আরও দেখুন যাদুল মাআদ ২/১১৫)

আর যারা বলেন এ গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে, তারা যয়নবের সঙ্গে রাসূলে কারীম সা. এর বিবাহ চতুর্থ কিংবা পঞ্চম হিজরী বর্ষের গোড়ার দিকে ঘটনা বলেন। তারা আরও বলেন, সা'দ বিন মুয়ায রা. এর উল্লেখ এখানে কেবল ধারণাপ্রসূত বক্তব্য নয়; বরং এটা প্রমাণিত বাস্তবতা।

ভাসাভাসা নজরে দৃষ্টিপাত করলে আমাদেরকে প্রথম দলের বক্তব্যকেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু যদি আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করি তবে দ্বিতীয় দলের বক্তব্যকেই আমাদের সমর্থন করতে হবে। কারণ, প্রথম দলের বক্তব্যের ভিত্তি হচ্ছে, রাসূলে কারীম সা. যয়নব রা. কে পঞ্চম হিজরীর শেষের দিকে বিবাহ

এ যুদ্ধের কারণ ছিল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সংবাদ এসে পৌঁছে যে, বনুল মুস্তালিকের গোত্রপতি হারেস ইবনে আবী যিরার তার কওম ও অন্যান্য কিছু আরব নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রওয়ানা দিয়েছে। সংবাদ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুরাইদা ইবনে হাসীব আসলামী রা. কে সংবাদের সত্যতা-অসত্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এসে হারিস ইবনে আবী যিরারের সঙ্গে কথা বললেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁকে বিস্তারিত জানালেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুত হতে বলেন এবং অতি দ্রুত মদীনা থেকে বের হয়ে যান। তিনি শা'বান মাসের দুই তারিখে যাত্রা করেন। তার সঙ্গে একদল মুনাফিকও শরীক হয়েছিল, যারা ইতঃপূর্বে কোনো গাযওয়াতে শরীক হয়নি। মদীনাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্থলাভিষিক্ত বানানো হলো যায়দ বিন হারেসা রা. কে। কারও মতে আবু যর রা. কে। আবার কেউ কেউ বলেন, নুমাইলা ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসী রা. কে। ওদিকে হারেস ইবনে আবী যিরার মুসলিম বাহিনীর সংবাদ জানার জন্য গুপ্তচর পাঠায়; কিন্তু মুসলমানরা তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করে দেয়।

যখন হারেস ইবনে আবী যিরার ও তার সঙ্গীরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আক্রমণাত্মক অগ্রযাত্রা আর তাদের গুপ্তচর নিহত হওয়ার সংবাদ জানতে পারে তখন এক প্রচণ্ড ভয়-ভীতি আর শঙ্কা তাদেরকে পেয়ে বসে। তাদের সঙ্গী আরবরা তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুদাইদের এক প্রান্তে উপকূলের দিকে তাদের একটি কূপের নিকট অবতরণ করেন এবং লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রা. কে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। মুহাজিরদের পতাকা ছিল আবু বকর রা. এর

করেছিলেন। আর আর এ ঘটনার সময় রাসুলে কারীম সা. এর অধীনে যয়নবের থাকাই প্রমাণ করে এটা পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসের ঘটনা হতে পারে না ; বরং এটা হবে ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসের ঘটনা। কারণ পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে যয়নব রা. রাসূলে কারীম সা. এর বিবাহে ছিলেন না। কিন্তু তাদের এ দাবির পক্ষে কিছু আলামত ও লক্ষণ ব্যতীত কোনো স্পষ্ট দলীল বিদ্যমান নেই। কিন্তু ইফকের ঘটনা সম্পর্কে ও সে সময়ে সা'দ বিন মুয়ায রা. এর উপস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যেগুলোকে কেবল ধারণা আখ্যা দেওয়া ভারি দুরূহ ব্যাপার। পাশাপাশি যয়নবের বিবাহ চতুর্থ হিজরীর শেষের দিকে কিংবা পঞ্চম হিজরীর গোড়ার দিকে হওয়ার বর্ণনাও বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল দিক বিবেচনা করলে ইফকের ঘটনা এবং গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত বলে বক্তব্য দেওয়া অসম্ভব কিংবা দূরের ব্যাপার নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হাতে। আর আনসারদের পতাকা ছিল সা'দ বিন উবাদা রা. এর হাতে। এরপর কিছুক্ষণ তাদের মধ্যে তীর বিনিময় চলল। এরপর মুসলিম বাহিনী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে একসঙ্গে দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হলো। শিরক-পূজারীরা পরাজিত হলো। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নারী ও শিশু, উট ও বকরীগুলি বন্দী করে ফেললেন। মুসলমানদের পক্ষে কেবল একজন শাহাদাত বরণ করেন। দুশমন মনে করে একজন আনসারী তাকে হত্যা করেন।

এটাই সীরাত ও মাগাযী বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কিন্তু আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, এটা নিছক একটা অনুমান ও ধারণাপ্রসূত কল্পকাহিনী মাত্র। কেননা, দু'দলের মাঝে তখন কোনো যুদ্ধ হয়নি। বরং কূপের নিকট রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর হামলা করে তাদের বাল-বাচ্চা ও ধন-সম্পদ কব্জা করে নেন। যেমন সহীহ বুখারীতে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বনুল মুস্তালিকের ওপর হামলা করেন তখন তারা এ ব্যাপারে চরম গাফেল ছিল।[৫৪১]

বন্দিনীদের মধ্যে বনুল মুস্তালিকের সরদার হারিসের কন্যা জুওয়াইরিয়াও রা. ছিলেন। তিনি সাবেত বিন কায়সের ভাগে পড়েছিলেন এবং সাবেত তাকে মুকাতাব বানিয়ে নিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পক্ষ থেকে সাবেতকে কিতাবাত চুক্তির পুরো অঙ্ক পরিশোধ করে নিজে বিবাহ করে নিলেন। বনুল মুস্তালিকের সঙ্গে এই বিবাহের কারণে মুসলমানরা বনুল মুস্তালিকের একশ' ঘরের লোকদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা বলতে শুরু করেছিলেন, এরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্বশুরালয়ের লোক।[৫৪২]

যেহেতু এই যুদ্ধে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল এর মূল হোতা ছিল রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল, সে কারণে প্রথমে আমরা মুসলিম সমাজে তার কর্মকাণ্ড কী ছিল তা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের আগে মুনাফিকদের ভূমিকা

আমরা আগেই কয়েক বার বলে এসেছি, মুনাফিক সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল একেবারে প্রথম দিন থেকেই ইসলমের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হিংসা আর বিদ্বেষ পোষণ করত। বিশেষতঃ সাহেবে রিসালত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর তার হিংসার কোনো শেষ ছিল না। কেননা, এক সময় মদীনার

---

[৫৪১] দেখুন সহীহ বুখারীঃ দাসমুক্তি পর্ব ১/৩৪৫। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৫/২০২ এবং ৭/৪৩১।

[৫৪২] যাদুল মাআদ

আউস ও খাযরাজ গোত্র তার নেতৃত্বের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল; তারা তাকে রাজ মুকুট পরিয়ে দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত পস্তুতি গ্রহণ করেছিল। ঠিক এমন সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম নিয়ে তাদের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তারা ইবনে উবাইর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ কারণে, সে মনে করত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন।

ইসলামের বিরুদ্ধে তার এ বিদ্বেষ ও জ্বলন হিজরতের শুরু থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। সে নিজ ইসলাম প্রকাশ করার আগেও এবং ইসলাম প্রকাশ করার পরেও। যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার গাধার ওপর সওয়ার হয়ে সা'দ বিন উবাদা রা. কে দেখতে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি একটি মজলিস অতিক্রম করলেন, যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলও ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখে সে নাক ঢেকে বলল, তোমরা আমাদের কাছে ধূলা উড়িও না! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেই মজলিসে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত শুরু করলেন, তখন সে বলল, ধুত্তোর! নিজের বাড়িতে গিয়ে পড়ো!! আমাদের মজলিসে আমাদেরকে জ্বালিও না!!![৫৪৩]

এটা ছিল তার ইসলাম প্রকাশ করার আগের ঘটনা। বদরের যুদ্ধের পরে যখন সে ইসলাম প্রকাশ করল, সেই থেকে সে সর্বদা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের শত্রুই রয়ে যায়। তার দিনরাতের ফিকির ছিল শুধু কী করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায়? কীভাবে ইসলামের কালিমাকে লাঞ্ছিত করা যায়? তাছাড়া ইসলামের দুশমনের সঙ্গে তার ছিল গভীর মিতালি। সে বনু কাইনুকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপও করেছিল, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। একইভাবে উহুদ যুদ্ধের সময় গাদ্দারী করে সে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস পেয়েছিল।

মুমিনদের সঙ্গে এই মুনাফিকের সবচেয়ে বড় ধোঁকা আর প্রতারণা ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণের পরে প্রত্যেক জুমুআর নামাযের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে আরোহণ করতেন, তখন সে সবার মাঝে দাঁড়িয়ে বলত, এই তোমাদের সামনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসা আছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা তোমাদেরকে ইয্যতওয়ালা ও সম্মানিত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাকে যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা করো। তাঁর কথা শোনো এবং মান্য করো। এই

[৫৪৩] ইবনে হিশাম ১/৫৮৪,৫৮৭। সহীহ বুখারী ২/৯২৪। সহীহ মুসলিম ২/১০৯।

কথাগুলো বলে সে বসে যেত। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। এই মুনাফিকের আরও বড় দুঃসাহস দেখা গিয়েছিল উহুদ যুদ্ধের পরে। উহুদ যুদ্ধে সে যে কত বড় গাদ্দারী করেছিল তা ছিল সবার জানা। তা সত্ত্বেও সে উহুদের পরের জুমুআর দিনে চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সেই কথাগুলি বলার জন্য দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মুসলমানরা চারদিক থেকে তার জামার প্রান্ত ধরে তাকে বসিয়ে দেন। সবাই মিলে তাকে বলতে থাকেন, আল্লাহর দুশমন! চুপ করে বসে থাকো! তুমি যা করেছো এরপরেও এ কাজের যোগ্য নও তুমি। তখন সে রাগে ও ক্ষোভে সকলের কাঁধ ডিঙিয়ে এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল: আমি উঠেছি তাঁর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে; অথচ মনে হয়েছে কী অপরাধের কথা না জানি বলে ফেলেছি। মসজিদের দরজায় এক আনসারীর সঙ্গে তার দেখা হলো। আনসারী বললেন, হতভাগা, কোথায় যাচ্ছ? ফিরে যাও! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে বলল, তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।[৫৪৪]

একইভাবে বনু নযীরের সঙ্গেও তার দোস্তি ছিল। সে তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত। এমনকি সে তাদেরকে বলেছিল :

لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ.......وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ .

তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব .... আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। [সূরা হাশর:১১]

গাযওয়ায়ে আহযাবের সময়ও সে ও তার সঙ্গীরা একই কাজ করেছিল। মুসলমানদের মাঝে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়া, মুমিনদের অন্তরে ভয়-ভীতি ও বিহ্বলতা ঢেলে দেওয়ার অপচেষ্টার ক্ষেত্রে সে মোটেও ত্রুটি করেনি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবে এ কুকর্মের কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঠিক এভাবে:–

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا........لَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠)

এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।...........তারা তোমাদের

---

৫৪৪ ইবনে হিশাম ২/১০৫।

মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। [সূরা আহযাব:১২-২০]

এগুলি ছাড়াও ইসলামের দুশমন গোটা আরবের সকল ইহুদি, মুনাফিক ও মুশরিকরা ভালো করেই জানত যে, প্রতিটি রণাঙ্গনে একের পর এক জয়মাল্য ছিনিয়ে নেওয়ার পেছনে মুসলমানদের সামরিক সমৃদ্ধি, জনবল কিংবা অস্ত্রবলের একটুকু কৃতিত্ব নেই। বরং এর পেছনে সবটুকু কৃতিত্ব ঐ সমুন্নত নৈতিক মূল্যবোধ আর আখলাকে হাসানার বিস্ময়কর কারিশমা, যা মুসলিম সমাজ ও প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়বাগে হরদম মোহনীয় সুরভী ছড়ায়। তারা আরও জানত যে, বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো ছুটে আসা এই প্রবল বিদ্রোহী ঢলের মূল কার্যকারণ আর উৎস হলেন স্বয়ং সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যিনি ছিলেন এই মূল্যবোধের সর্বোত্তম উদাহরণ। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অশ্বের পিঠে করে তপ্ত রণাঙ্গনের ধূলি উড়িয়ে তাদের সামনে ধীরে ধীরে আরও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অস্ত্র কিংবা হাতিয়ার দিয়ে চেপে ধরে এই দীনের দীপশিখা আর তার অনুসারীদের প্রাণ-প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া কোনোদিনও সম্ভব হবে না। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নতুন দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নিলো। তারা এবার মুসলমানদের চরিত্র ও ঐতিহ্যের দরজা দিয়ে আক্রমণ করবে বলে ঠিক করল। এ উদ্দেশ্যে তারা মুসলমানদের প্রাণবিন্দু ও আত্মার আত্মীয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিমল চরিত্র-মাধুরীকে তাদের প্রধান-লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিলো। এখন মুনাফিকরা যেহেতু ছিল মুসলিম সমাজের পঞ্চম সদস্য। আর তাদের ঘর-বাড়িও ছিল মদীনার অভ্যন্তরে; এ কারণে তারা নিঃসংকোচে মুসলমানদের গায়ে গা লাগিয়ে চলতে পারত। সময়-সুযোগ মতো তাদের অনুভূতিতে আঘাত হানতে পারত। এ কারণে এই নয়া রঙের ষড়যন্ত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনার যিম্মাদারি গিয়ে পড়ল এই মুনাফিকদের ওপর। আর তাদের ইমাম ছিল রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল।

তাদের এ নতুন ষড়যন্ত্র সে দিন সকলের সামনে বড় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল, যেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে যাহাশ রা. কে যায়দ বিন হারেসা রা.তালাক দেওয়ার পরে নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। সেকালে আরবরা পালিতপুত্রকে স্বীয় ঔরসজাত পুত্রের মতো মনে করত। এরই ওপর ভিত্তি করে তারা পালিতপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পালকপিতার জন্য বৈধ মনে করত না। (অথচ এটা ছিল সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ ও একটি জাহেলী প্রথা; সুতরাং, এ প্রথার আশু অবসান কল্পে) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যয়নব বিনতে জাহাশ রা. কে বিয়ে করেন, তখন মুনাফিকরা তাঁর বিমল নিশ্ছিদ্র চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের দু'টি সুড়ঙ্গ পথ পেয়ে যায়:

এক. যয়নব রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিয়ে করেছিলেন তখন তাঁর অধীনে আরও চার জন স্ত্রী ছিল। সুতরাং, তিনি ছিলেন তাঁর পঞ্চমা স্ত্রী। অথচ কুরআনে কারীমে একসঙ্গে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখতে নিষেধ করা হয়েছে! সুতরাং এ বিয়ে বিশুদ্ধ হবে কী করে?

দুই. যয়নব রা. এতদিন ছিলেন তার (পালক) পুত্রবধূ। সুতরাং, আরবীয় প্রথা আর ঐতিহ্য অনুসারে এখন তাকে বিয়ে করে নেওয়া ছিল মারাত্ম কবীরা গুনাহ। তাই এ পথে তারা প্রচারণা আর প্রোপাগান্ডার বন্যা বইয়ে দিলো। এ সওদা মূর্খ মানুষের বাজারে মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে তুলতে রাতারাতি কয়েকটি ঘটনা কাহিনী বানিয়ে নিলো। তারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হঠাৎ করে একদিন যয়নবকে দেখে ফেলেন। এতে তিনি যয়নবের রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়েন। যয়নব তাঁর হৃদয়ের একান্ত গহীনে জায়গা করে নেন। তার ছেলে যায়দ যখন এ সংবাদ জানতে পারে তখন সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পথ থেকে সরে দাঁড়ায় (নাউযুবিল্লাহ)। তাদের সাঁজানো এসব অলীক গল্প-কাহিনীর বাজার এতটা রমরমা হয়ে ওঠে যে, আজও পর্যন্ত এগুলির একটি বৃহদাংশ তাফসীর ও হাদীসের কিতাবাদিতে চোখে পড়ে। দুর্বল ঈমানদারদের সারিতে এই প্রচারণা এতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল যে, পরিশেষে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল- যাতে ঐ সকল রুগ্ন-হৃদয়ের মুমিনদের অন্তরের সব রকমের বীমারের (রুগ্নতার) ঔষধ ছিল। এই প্রচার প্রোপাগান্ডার পরিধি কতটা বিস্তৃত ছিল তা এভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাব শুরুই করেছেন নীচের আয়াতটি দ্বারাঃ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আহযাবঃ১]

এই ছিল গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিকের আগ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুনাফিকদের রামাচরণ-চালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। কিন্তু দয়ার নবী রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব কিছু মুখ বুজে নীরবে ধৈর্য, নম্রতা ও বিনয়ের সঙ্গে সয়ে যাচ্ছিলেন। আর সাধারণ মুসলমানগণ তাদের এ সকল কুকীর্তি থেকে দূরে থাকতেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলো বরদাশত করতেন। কেননা, তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল, মুনাফিকরা কুদরতে বারী তাআলার পক্ষ থেকে একের পর এক লাঞ্ছনার হোঁচট খেতেই থাকবে। যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا

يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. তারা কি লক্ষ্য করে না? প্রতি বছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে। অথচ, এরপরেও তারা তওবা করে না; কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। [সূরা তাওবাহ : ১২৬]

গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিকে মুনাফিকদের ভূমিকা

গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিকে যখন মুসলমানদের সঙ্গে মুনাফিকরাও বের হলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উদাহরণ দিলেন ঠিক এভাবে: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ. যদি তোমাদের সাথে তারা বের হতো, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। [সূরা তাওবাহ:৪৭]

দীর্ঘদিন পরে পাওয়া এই পরম কাঙ্খিত মুহূর্তে মুনাফিকরা একটি বিশাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল। তাই তারা বসে বসে হাওয়া খাওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের সারিতে সন্দেহ-ও সংশয়ের বিষ ঢুকিয়ে দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে আবারও মিথ্যা প্রচারণা শুরু করল। আমরা এখন সামান্য সবিস্তারে সেগুলো আলোচনা করব:

মদীনা থেকে নীচু শ্রেণীর লোকদেরকে বের করে দেওয়ার বক্তব্য:

গাযওয়ায়ে বনুল মুস্তালিক থেকে ফারেগ হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুরাইসী কূপের নিকট অবস্থান করছিলেন। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা কূপে পানি আনার জন্য গেল। তাদের মধ্যে উমর বিন খাত্তাব রা. এর এক মজুর জাহজাহ গিফারীরও ছিল। পানি আনতে গিয়ে তার ও সিনান ইবনে ওয়াবার জুহানীর মধ্যে প্রথমে ধাক্কাধাক্কি হয়ে শেষ পর্যন্ত মারামারিতে গড়াল। জুহানী তখন চিৎকার জুড়ে দিলো, হে আনসার সম্প্রদায়! সাহায্য করো!! জাহজাহও চিৎকার দিলো, হে মুহাজির সম্প্রদায়! সাহায্য করো!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘটনা জানতে পেরে বললেন, **আমি তোমাদের মাঝে থাকতেই তোমরা আবার জাহেলী যুগের ডাকাডাকিতে লিপ্ত হয়েছ? এগুলি ছেড়ে দাও! কেননা এগুলি নাপাক ও দুর্গন্ধময়।**

এ সংবাদ রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের কাছে পৌঁছলে সে রাগে ও ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তখন তার কাছে তার গোত্রের কিছু লোক ছিল। তাদের মধ্যে অল্প বয়সী যায়েদ ইবনে আরকামও ছিলেন। সে বলতে শুরু করে, তারা কি সত্যিই এমন করেছে। ঠিকই, এখন তাদের সংখ্যা তো আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে এবং তারা আমাদের এলাকায় অধিক হয়ে গেছে। তাদের আর আমাদের অবস্থা হয়েছে ঐ প্রবাদের মতো,'তোমার কুকুর

তোমারটা খেয়ে এখন তোমাকেই কাঁমড়াবে। এখন দেখো! আমরা যখন মদীনায় ফিরে যাব তখন উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সেখান থেকে নীচু শ্রেণীদেরকে বের করে দিবে। এরপর উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলল, এটা তো তোমাদের হাতের কামাই। তোমরাই তাদেরকে তোমাদের মাটিতে জায়গা দিয়েছ। তাদেরকে তোমাদের সম্পদে ভাগীদার বানিয়েছ। আল্লাহর কসম! যদি তখন তোমরা তোমাদের হাতে যা ছিল তা আটকিয়ে দিতে তাহলে তারা ঠিকই অন্য কোথাও চলে যেত।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন তরুণ সাহাবী যায়দ ইবনে আরকাম রা.। তিনি এসে তার চাচাকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। আর তার চাচা রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানিয়ে দিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে উমরও রা. ছিলেন। উমর রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আব্বাদ ইবনে বশীরকে বলে দিন তাকে হত্যা করতে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তখন কি অবস্থা হবে? যখন মানুষ বলবে মুহাম্মাদ নিজ সাথীদেরকে হত্যা করে। হত্যা করার প্রয়োজন নেই; বরং তুমি লোকদের মাঝে যাত্রা শুরু করার ঘোষণা দিয়ে দাও!** এটা ছিল এমন সময়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত যে সময় যাত্রা করতেন না। লোকজন চলতে শুরু করলে উসাইদ বিন হুযাইর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাকে সালাম করলেন। এরপর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অসময় যাত্রা শুরু করছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **তোমাদের সঙ্গী কী বলেছে তা শুনতে পাওনি?** তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তিনি বললেন, কেন সে কী বলেছে? তিনি বললেন, **তার ধারণা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পরে উঁচু শ্রেণীর লোকেরা সেখান থেকে নিচু শ্রেণীদেরকে বের করে দিবে।** তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি চাইলে তাকে মদীনা থেকে বের করে দিতে পারেন। আল্লাহর কসম! সে তো অপমানিত; আর আপনি সম্মানিত। অতঃপর তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তার সঙ্গে নরম ব্যবহার করুন। আল্লাহর কসম! তিনিই তো আপনাকে আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন। নতুবা তার কওম তাকে রাজমুকুট পরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। এ কারণে এখন তার ধারণা, আপনি তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটানা চললেন। কিন্তু একবারও না থেমে ভোর পর্যন্ত রাতভর একটানা চললেন; বরং পরের দিনের শুরুভাগে সূর্যের তাপ বেড়ে যাওয়া পর্যন্ত যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। এরপর এক জায়গায় তারা অবতরণ করলেন।

লোকজনের পা মাটি স্পর্শ করতেই সবাই বেঘোর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল। অর্থহীন কথা থেকে লোকদেরকে বিরত রাখার জন্যই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

অপরদিকে মুনাফিক ইবনে উবাই যখন জানতে পারল, যায়দ ইবনে আরকাম রা. তার সংবাদ নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছে দিয়েছে, তখন সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছুটে গিয়ে আল্লাহর কসম খেয়ে বলল : সে যা বলেছে, আমি তা বলিনি। এমন কথা আমি মুখেও আনিনি। উপস্থিত আনসার সাহাবীরা বললেন, যায়দ এখনো বালক। হয়তো সে ভুল কথা বলে ফেলেছে। লোকটা যা বলেছে, সে তা মনে রাখতে পারেনি। আপনি ইবনে উবাই এর কথা সত্য মেনে নিন! যায়দ ইবনে আরকাম রা. বলেন, তখন এতটা পেরেশানী আমাকে পেয়ে বসল, যা জনমেও কোনোদিন পায়নি। আমি ঘরে বসে থাকলাম। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করলেন,

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ...... هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا......... الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.

মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে........ তারাই বলেঃ আল্লাহর রাসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে।.........[সূরা মুনাফিকুন : ১০৮]

তিনি বলেন, এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমাকে আয়াতগুলো পড়ে শুনিয়ে বললেন, **আল্লাহ তোমাকে সত্যায়ন করেছেন।**[৫৪৫]

এই মুনাফিক নেতার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল রা. ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, সৎকর্মশীল ও মর্যাদাবান সাহাবী। তিনি ছিলেন বাপের সম্পূর্ণ বিপরীত। আপন বাপ থেকে নিজেকে নিষ্কলুষ ও মুক্ত ঘোষণা করে তিনি মদীনার রাজ তোরণে নাঙ্গা শমশীর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর পিতা এলো তিনি তাকে বলে দিলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি ব্যতীত তুমি এখান থেকে সামনে বাড়তে পারবে না। কেননা, তিনি হলেন সম্মানিত আর তুমি হলে লাঞ্ছিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে যখন তাকে মদীনায়

---

[৫৪৫] দেখুন সহীহ বুখারী ১/৪৯৯, ২/৭২৭-৭২৯। সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৫৮৪। তিরমিযী হাদীস নং ৩৩১২। ইবনে হিশাম ২/২৯০-২৯২।

প্রবেশের অনুমতি দিলেন তখন আব্দুল্লাহ রা. পিতার পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। একবার আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি তাকে হত্যা করতে চান তবে আমাকে শুধু বলুন! আল্লাহর কসম! আপনার আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তার মাথা কেটে আপনার কাছে এনে দিব।[৫৪৬]

দুই. ইফ্কের ঘটনা

এই গাযওয়াতেই ঘটে গিয়েছিল নবী জীবনের এক দুঃখজনক দুর্ঘটনা। এটা ছিল এমন এক দুর্ঘটনা, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আহলে বাইতের পুষ্প-বিমল চরিত্রের বাগিচায় কলঙ্কের ঝটিকা হয়ে সবকিছু তছনছ করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। ইফ্কের ঘটনা হলো:

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের মধ্য থেকে আয়েশা রা.এ যুদ্ধে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গী হয়েছিলেন। এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চিরাচরিত অভ্যাস। প্রত্যেক সফরের সময় তিনি তার স্ত্রীদের নামে লটারি করতেন। পরে লটারিতে যার নাম উঠে আসত, তাকে নিয়ে সফরে বের হতেন। তাই এবার আয়েশা রা.এর নাম উঠে এলে স্বভাবত তাকে নিয়েই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হন। গাযওয়া থেকে ফেরার পথে এক স্থানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করে। আয়েশা রা. তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে চলে যান। দুর্ঘটনাক্রমে সেখানে তিনি তার এক বোনের কাছ থেকে উধার করে আনা হারটি হারিয়ে ফেলে আসেন। এ কারণে, তিনি হারটির খোঁজে আবারও সেখানে ফিরে যান। এ সময় কাফেলা যাত্রা শুরু করে। কাফেলার ঐ লোকজন আসল, যারা তাঁর হাওদা উটের ওপর উঠিয়ে দিত। তারপর তাঁরা হাওদা উঠিয়ে দিলেন। তাদের ধারণা ছিল আয়েশা রা. ভেতরে আছেন। তিনি হালকা হওয়ার কারণে তাঁরা বুঝতে পারেননি। কেননা, আয়েশা রা. তখন ছিলেন অল্প বয়সের এক তরুণী। বয়সের ভারে তখনো তিনি ততটা ভারী হয়ে উঠেননি। তাছাড়া হাওদাটি কয়েকজন মিলে বহন করেছিলেন। যে কারণে তাদের কাছে ভারী মনে হয়নি। যদি একজন কিংবা দু'জন বহন করত তবে নিশ্চয়ই তাঁর অনুপস্থিতি তাদের উপলব্ধি হতো। হারটি পাওয়ার পর তিনি নিজ কাফেলার স্থানে ফিরে আসেন। কিন্তু এসে নির্জন মরু-বিয়াবানে চোখ যতদূর গেল কিছুই দেখতে পেলেন না। অল্প বয়সের এক তরুণী জনমানবহীন এ বালু-সাগরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ

[৫৪৬] ইবনে হিশাম ২/২৯২। শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ২৭৭।

হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, কাফেলা থেমে যখন তাঁর অনুপস্থিতি জানতে পারবে তখন নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজে লোক পাঠানো হবে। তাই তিনি কোথাও না গিয়ে যথাস্থানেই থাকলেন। মনে রাখতে হবে, ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটির নির্বাহী পরিচালক ছিলেন বিশ্ব পৃথিবীর মালিক স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। বিশাল আরশের প্রকৃত অধিকারী মহামহিম সেই সত্তা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। দুস্তর মরু-সমুদ্রে নিঃসঙ্গ এ তরুণীর ওপর বেঘোর নিদ্রা-তরঙ্গ একের পর এক আছড়ে পড়তে লাগল। এক সময় তিনি ডুবে গেলেন বিদ্রোহী সেই দরিয়ায়। হঠাৎ এক পুরুষ-কণ্ঠ তার কর্ণকুহরে আঘাত হানল, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী'? তিনি জেগে উঠলেন। দেখলেন রাসূলের সাহাবী সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা.। সফওয়ান ঘুমিয়ে ছিলেন কাফেলার সর্বশেষ প্রান্তে; তাছাড়া তিনি এমনিতেই ছিলেন একটু ঘুম-প্রিয় মানুষ। যেহেতু পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি আয়েশা রা. কে দেখেছিলেন এ কারণে এখন চোখ পড়া মাত্রই তিনি তাকে চিনে ফেললেন। ইন্না লিল্লাহ পড়ে সফওয়ান তার সওয়ারী আয়েশা রা. এর কাছে এসে বসালেন। তিনি তাতে আরোহণ করলেন। সফওয়ান আয়েশা রা. এর সঙ্গে একটি টু-শব্দ করলেন না। আয়েশা রা. সফওয়ানের মুখ থেকে ইন্না লিল্লাহ ব্যতীত আর কিছু শুনলেন না। অতঃপর সফওয়ান রা. উটের লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে আগে আগে চলতে লাগলেন। ঠিক দুপুরের সময় তারা কাফেলার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। কাফেলা দুপুর বেলায় একটু বিশ্রামের খোঁজে যাত্রা বিরতি করেছিল। লোকজন যখন তাদেরকে দেখল তখন যে যার মতো করে মন্তব্য করতে লাগল। আল্লাহর দুশমন খবীস ইবনে উবাইর জন্য এটা ছিল এক স্বর্ণ-সুযোগ। সে যেন এবার হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার ভেতরে জমে থাকা হিংসা আর নেফাকীর পুঞ্জীভূত বিষ এবার একটু ফাঁক পেয়ে চুপিসারে বেরিয়ে এসে গোটা পরিবেশ বিষাক্ত করে দিলো। সে জায়গায় বসে একটি নাটক রচনা করে ফেলল। ছলনা আর প্রতারণার রঙে রাঙিয়ে তাকে সবার কাছে লাবণ্যময়ী ও রূপবতী করে তুলল। চারদিকে বৃষ্টির মতো এ ঘটনা ছড়িয়ে দিলো। এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গীরাও ছিল সব সময়ের হাওয়ারী। তারা যখন মদীনায় এসে পৌঁছল তখন হাঁটু গেড়ে জমে বসে নিদারুণ প্রচার প্রোপাগান্ডা চালাতে লাগল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ; একটি কথাও ছিল না তাঁর মুখে। তারপরে যখন দীর্ঘদিন যাবত ওহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আয়েশা রা. কে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। আলী রা. ইঙ্গিতে তাকে আয়েশার পরিবর্তে অন্য মেয়ে গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। উসামা রা. সহ কয়েকজন পরামর্শ

দিলেন দুশমনের কথায় কান না দিয়ে আয়েশা রা. কে রেখে দিতে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কাছে তাকে আর কষ্ট না দেওয়ার আবেদন জানালেন। এতে আউস গোত্রের সরদার উসাইদ বিন হুজাইর রা. চরম ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। যেহেতু ইবনে উবাই খাযরাজের লোক ছিল এ জন্য খাযরাজের সরদার সা'দ বিন উবাদা রা. কে জাত্যভিমানে পেয়ে বসে। উভয়ের মধ্যে চলতে থাকে বিষবাক্য-বিনিময়। এক পর্যায়ে এ আগুন ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। ইসলামী সমাজ আরেকবার উপনীত হয় ধ্বংসের দোরগোড়ায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাদেরকে নিবৃত্ত করলে তারা নীরব হয়ে যায়। এরপর তিনি নিজেও সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যান।

ওদিকে আয়েশা রা. সফর থেকে ফিরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দীর্ঘ এক মাস ধরে লাগাতার চলতে থাকে তাঁর অসুখ। এ কারণে তিনি ইফকের ঘটনা জানতেই পাননি। তবে তিনি একটি পার্থক্য ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, আর তা হলো এ সফরের আগে তিনি কোনো সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতটা স্নেহ ও ভালোবাসার পরশ অনুভব করতেন এবার সে পরশ ততটা অনুভব করতে পারেননি। এতে তিনি খানিকটা বিচলিত ছিলেন বটে; প্রকৃত রহস্যের কূল-কিনারা তখনো করতে পারেননি। সুস্থ হওয়ার পরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়েশা রা. একবার উম্মে মিসতাহ কে সঙ্গে নিয়ে ময়দানের দিকে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ চাদরে পেঁচিয়ে মাটিতে পড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার পুত্রের ওপর বদদুআ করেন। আয়েশা রা. তাকে বারণ করলে তিনি আয়েশার কাছে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। তখন আয়েশা রা. ঘরে ফিরে এসে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট স্বীয় মা-বাবার কাছে ঘটনার সত্যতা জানার জন্য চলে যাওয়ার অনুমতি চান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমতি নিয়ে বাড়িতে এসে প্রকৃত ব্যাপার তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি অবিরল কান্নায় ভেঙে পড়েন। বাঁধভাঙা কান্নার অশ্রু-প্লাবন একটানা বইতে থাকে দুই রাত এক দিন। এ দীর্ঘ সময়ে দু'চোখের কপালে এক মুহূর্তের ঘুম জুটেনি। সামান্য সময়ের জন্য বিরাম পায়নি বিমল দু'টি চোখ। খানিকের জন্য মনে হয়েছিল কান্নার এ অবিরল বিদ্রোহ তাঁর কলিজা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে বললেন, **আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমি এমন এমন কিছু জানতে পেরেছি। যদি তুমি পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকো তবে আল্লাহ তাআলা অতি শীঘ্রই তোমাকে এ বিপদ থেকে মুক্ত করবেন। আর যদি**

সত্যিই গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করো। কেননা, বান্দা যখন নিজের অপরাধ স্বীকার করে আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথাগুলি তার অশ্রু-প্লাবনের সামনে কঠিন বাঁধ হয়ে দাঁড়িয়ে এর শ্রোতধারা থামিয়ে দিলো। তিনি কান্না বন্ধ করে মা-বাপ উভয়কেই তাঁর কথার জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তারা বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানতে পেরেছি, এ কথা আপনারা যখন শুনেছেন তখন তা আপনাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে। এমনকি আপনারা তা সত্য বলে স্বীকার করেছেন। এখন যদি আমি নিজেকে নির্দোষ বলি- আর আল্লাহই ভালো জানেন যে, আমি নির্দোষ- তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি মুখে বলি যে, আমি সে গুনাহে লিপ্ত হয়েছি- আর আল্লাহই ভালো জানেন যে, আমি তা থেকে নিষ্কলুষ ও পবিত্র- তবে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! এ অবস্থায় হযরত ইউসুফ আ. এর পিতা ইয়াকুব আ. এর একটি কথা ব্যতীত আমার আর কোনো পথ নেইঃ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ সুতরাং, এখন ছবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। [সূরা ইউসুফ:১৮]

এরপর তিনি অন্য দিকে কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওহী নাযিল হলো। খুশি আর আনন্দে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহাস্য বদনে বিমল আলোর ঝিলিক দেখা গেল। ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বপ্রথম তিনি যা বলেছিলেন তা হলো, **আয়েশা! আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন!!** তখন আয়েশা রা. এর মা তাকে বললেন, যাও! তাঁর কাছে যাও!! আয়েশা রা. স্ত্রী সুলভ অভিমান নিয়ে বললেন, না আমি তাঁর কাছে যাব না। আমি কেবল আল্লাহর প্রশংসা করব।

আল্লাহ তাআলা ইফ্কের ঘটনা সম্পর্কে إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ সূরা নূরের ১১ থেকে বিশ পর্যন্ত মোট দশটি আয়াত নাযিল করেন।

এই ইফ্কের প্রচারণায় মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা যোগদান করেছিল- মিসতাহ ইবনে আসাসা, হাস্সান বিন সাবিত, হামনা বিনতে জাহাশ- সবাইকে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। কিন্তু তাদের প্রধান গুরুঠাকুর ও ঘাগি শয়তান আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কিছুই করা হয়নি। হয়তো এ কারণে যে, এটা তার

কর্মের অনেক হালকা প্রতিদান হয়ে যাবে। অথচ, পরকালে আল্লাহ তাআলা তাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দিবেন। কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদের সেই কল্যাণের আশায়, যে কল্যাণের আশায় তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত বাদ দেওয়া হয়েছিল।[৫৪৭]

এভাবে দীর্ঘ এক মাস পরে মদীনার আকাশ থেকে ধীরে ধীরে সেই মেঘ কেটে গেল সন্দেহ-সংশয়, ভয় আর শঙ্কার যেই কালো মেঘ এতদিন তাকে ঢেকে রেখেছিল। মুনাফিকদের ঠাকুর ইবনে উবাই এবার এতটা লাঞ্ছিত হলো যে, এরপর আর জীবনে সে কোনো দিন মাথা উঁচু করার সাহস পায়নি। ইবনে ইসহাক বলেন, এরপর থেকে যে কোনো ঘটনা ঘটলেই লোকেরা চোখ বুজে বলে দিত এটা তাঁর কাজ; এরপর তাকে তারা লজ্জা দিতো, তিরষ্কার করত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উমরকে বললেন **কী মনে করো? উমর! শুনে রাখ, আল্লাহর শপথ! যদি তুমি তাকে ঐ দিন হত্যা করতে, যে দিন তুমি তাকে হত্যা করার কথা বলেছিলে; তাহলে তার অনেক হাত-পা হতো! কিন্তু যদি আজ ঐ হাত-পাগুলিকে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিই তাহলে তারাই তাকে হত্য করবে।** উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি ভালো করেই বুঝেছি, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মতৎপরতা আর আমার কর্মতৎরতার মাঝে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। আমার কাজের চেয়ে তাঁর কাজের মধ্যে অনেক বেশি বরকত নিহীত রয়েছে।[৫৪৮]

---

[৫৪৭] সহীহ বুখারী ১/৩৪৬, ২/৬৯৬-৬৯৮। যাদুল মাআদ ২/১১৩-১১৫। ইবনে হিশাম ২/২৯৭-৩০৮।
[৫৪৮] ইবনে হিশাম ২/২৯৩।

গাযওয়ায়ে মুরাইসী' পরবর্তী সারিয়া ও সামরিক অভিযান

সরিয়ায়ে আব্দুর রহমান ইবনে আউফকে পাঠানো হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে দাওমাতুল জান্দালের বনু কালবের বস্তিতে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের সামনে বসিয়ে মুবারক হাতে তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেন। যুদ্ধে তাকে দুশমনের সঙ্গে সর্বোত্তম যা হবে তা করার নির্দেশ দেন। এবং তাকে বলে দেন, যদি তারা তোমার আনুগত্য করে তাবে তাদের শাহজাদীকে তুমি বিয়ে করে নিবে। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ সেখানে পৌঁছে তাদেরকে টানা তিন দিন ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে পুরো কওম মুসলমান হয়ে যায়। আব্দুর রহমান তাদের গোত্রপতির দুলালী ও শাহজাদী তুমারিয বিনতে আসবাগকে বিয়ে করে নেন। তিনিই ছিলেন আব্দুর রহমান রা. এর সন্তান আবু সালামার জননী।

দুই. সারিয়ায়ে আলী ইবনে আবী তালিবকেও পাঠানো হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে ফাদাকের বনু সা'দ বিন বকর অঞ্চলে। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, তাদের একটি বিশাল দল ইহুদিদেরকে সাহায্য করতে যাচ্ছে। দুই শ' জনের একটি দলে আলী ইবনে আবী তালিবকে দলপতি করে তিনি এই বাহিনী প্রেরণ করেন। আলী রা. নিজ বাহিনী নিয়ে রাতভর পথ চলতেন আর দিনে কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। পথিমধ্যে দুশমনের এক গুপ্তচর তাদের হাতে গ্রেফতার হয়। তখন সে স্বীকার করে নেয় যে, তার কওম তাকে খাইবর পাঠিয়েছে' সেখানকার ইহুদিদেরকে এই প্রস্তাব দিতে যে, তারা তাদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে তবে বিনিময়ে তাদেরকে খাইবরের খেজুর দিয়ে দিতে হবে। এরপর গুপ্তচর তাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে গেল যেখানে বনু সা'দ সমবেত হয়েছিল। আলী রা. তাদের ওপর অতর্কিত হামলা করেন। পাঁচ শ' উট ও দুই হাজার বকরী মুসলমানদের হাতে এলো। কিন্তু বনু সাদের লোকেরা নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তাদের সরদার ছিল ওবার ইবনে উলাইম।

তিন. সারিয়ায়ে আবু বকর সিদ্দীক অথবা যায়দ বিন হারিসাকে পাঠানো হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে ওয়াদীয়ে কুরার দিকে। সেখানে বনু ফাযারার একটি শাখা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে প্রেরণ করেন। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, আমিও তাদের সঙ্গে সে যুদ্ধে বের হয়েছিলাম। ফজরের নামায পড়তেই আমরা লড়াই শুরু করার নির্দেশ

পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভোরের পৃথিবীর গুঞ্জরন শুরু হওয়ার আগেই আমরা হামলা করলাম। এরপর আমরা একটি কূপের কাছে গেলাম। আবু বকর সেখানে কিছু লোককে হত্যা করলেন। তখন আমি একটি শিশুদের দল দেখলাম। আমার সন্দেহ হলো, তারা হয়তো পালিয়ে পাহাড়ে চলে যাবে। তাই আমি তাদের পিছু নিলাম এবং তাদের ও পাহাড়ের মধ্যবর্তী খালি জায়গায় একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগলাম। তীর দেখে তারা থেমে গেল। তাদের মধ্যে মোটা বস্ত্রাবৃত উম্মে কেরফাহ নাম্নী এক মহিলা ছিল। তার সঙ্গে ছিল আরবের সবচেয়ে উর্বশী তরুণী তার যুবতী মেয়ে। আমি তাদেরকে আবু বকরের কাছে নিয়ে এলাম। আবু বকর তার মেয়েকে আমার হাতে 'নফল' হিসেবে তুলে দিলেন। আল্লাহর কসম! আমি কোনোদিন তার কাপড় খুলিনি। পরর্বতীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছ থেকে উম্মে কেরফার মেয়েকে চেয়ে নিয়ে মক্কায় বিক্রি করে দেন এবং তার বিনিময়ে সন্তোষজনক সংখ্যার মুসলিম বন্দীকে অযাদ করে নিয়ে আসেন। [৫৪৯]

উম্মে কিরফা ছিল এক পিশাচিনী। তার মনের সাধ ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গোপনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। সে একারণে তার পরিবারের ত্রিশ জন শাহসওয়ারকে প্রস্তুত করে রেখেছিল। তাই তাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হয়। আর ত্রিশজনের ত্রিশজনকেই হত্যা করা হয়।

চার. সারিয়ায়ে কুরয ইবনে জাবির ফিহরীকে[৫৫০] পাঠানো হয়েছিল ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে উরাইনীদের কাছে। তারা ছিল উকাল ও উরাইনার অধিবাসী। তারা বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে মদীনাতেই অবস্থান করতে লাগল। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হওয়াতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কয়েকটি উট দিয়ে চারণভূমিতে গিয়ে সেগুলোর দুধ ও পেশাব পান করতে বললেন। রোগীরা সুস্থ হওয়ার পরে তাদের সর্বপ্রথম আঘাতটি ছিল চিকিৎসকের ওপর। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাখালকে হত্যা করে উটগুলি নিয়ে পালিয়ে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশজন সাহাবীর একটি দল গঠন করে কুরয ফিহরী রা. কে সালার হিসেবে পাঠিয়ে দেন। তিনি উরাইনীদের জন্য বদ দুআ করেন, **হে আল্লাহ! তাদের ওপর আপনি**

---

[৫৪৯] দেখুন সহীহ মুসলিম ২/৯৮। কথিত আছে, এ সারিয়াটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরী সপ্তম বছরে।
[৫৫০] এ সেই লোক যে বদর যুদ্ধের পূর্বে গাযওয়ায়ে সফওয়ানের সময় মদীনার চারণভূমিতে হামলা চালিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলমান হন এবং মক্কা বিজয়ের দিন শাহাদাত বরণ করেন।

চলার পথ অন্ধ করে দিন! এবং কঙ্কনের চেয়েও অধিক সংকীর্ণ বানিয়ে দিন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআ কবুল হলো। আল্লাহ তাআলা তাদের চলার পথ অন্ধ করে দিলেন। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে ধরে ফেলল। তাদের দুষ্কর্মের প্রতিদান স্বরূপ হাত পা কেটে দেওয়া হলো। চক্ষু কোটর থেকে উঠিয়ে ফেলা হলো। এরপর হাররার এক পাশে তাদেরকে ফেলে রাখা হলো। এ অবস্থাতেই তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো।[৫৫১] সহীহ বুখারীতে তাদের ঘটনা আনাস রা. সূত্রে বর্ণিত।[৫৫২]

এ ঘটনার পরে সীরাত বিশেষজ্ঞগণ সারিয়ায়ে আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরীর একটি ঘটনা উল্লেখ করে থাকেন, যা সালামা ইবনে আবু সালামার সঙ্গে ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে ঘটেছিল। ঘটনার বিবরণে পাওয়া যায়ঃ তিনি আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার জন্য মক্কায় চলে যান। কেননা আবু সুফিয়ান ইতঃপূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করার জন্য এক বেদুঈনকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু উভয় পক্ষের- এরা কিংবা ওরা- কেউই তাদের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেনি। দুশমনরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যা করতে পারেনি। ওদিকে আবু সুফিয়ানকেও হত্যা করা যায়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, এ সফরেই আমর রা. তিনজন কাফেরকে হত্যা করেছিলেন এবং খুবাইব রা. এর লাশ উঠিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, খুবাইব রা. শহীদ হয়েছিলেন রজী' ট্র্যাজিডির কয়েক দিন পরে। আর রজী' ট্র্যাজিডি সংঘটিত হয়েছিল চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে। আল্লাহই ভালো জানেন, সীরাত ঐতিহাসিকগণ কি উভয় সফরকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, না কি ঘটনাক্রমে উভয় সফরই হয়েছিল চতুর্থ হিজরীর একই মাসে, কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বছর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভুল করে ফেছেলেন এবং চতুর্থ হিজরীর জায়গায় ষষ্ঠ হিজরী লিখে দিয়েছেন। আল্লামা সুলাইমান মনসূরপুরীও রহ.এটাকে কোনো যুদ্ধমূলক অভিযান কিংবা সারিয়া হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এই ছিল আহযাব ও বনু কুরাইযার অব্যবহিত পরে সংঘটিত গাযওয়া ও সারিয়াসমূহের বিবরণ। কিন্তু এগুলির কোনোটাতেই মারাত্মক কোনো লড়াই কিংবা সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি; বরং হালকা কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল। এ কারণে এগুলিকে যুদ্ধের পরিবর্তে দূতালি অভিযান কিংবা শায়েস্তামূলক আন্দোলন নামে অভিহিত করাই শ্রেয়। যেগুলির পেছনে উদ্দেশ্য ছিল একঘেয়ে ও ইতরপ্রাণ

---

[৫৫১] যাদুল মাআদ ২/১২২।
[৫৫২] সহীহ বুখারী ২/৬০২।

বেদুঈন বানরগুলোকে সোজা আর অন্যান্য দুশমনদেরকে ঠাণ্ডা করা, যারা তখনো লাফালাফি করছিল। চারদিকের পরিবেশ-পরিস্থিতিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে যে ব্যাপারটি বড়ই স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা হলো, গাযওয়ায়ে আহযাবের পরে পরিস্থিতির উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটছিল। পরিস্থিতির তরী ধীরে ধীরে মুসলমানদের কূলে এসে ভিড়ছিল। দুশমনের শক্তি-সামর্থ্য অবনতির গেরো-কলে আঁটকে পড়ে বিকৃত আওয়াজে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল। সফলতা আর উন্নতির সকল দরজা বন্ধ দেখে ঘরের বাইরে পড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পঁচে যাচ্ছিল। ইসলামের দাওয়াতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো কিংবা তার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার স্বপ্নগুলি একটা একটা ফুটা বেলুনের মতো চুপসে যাচ্ছিল। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধির আগ পর্যন্ত এটা খুব একটা ভালো করে বোঝা যায়নি। পরে যখন হুদাইবিয়ার সন্ধি সংঘটিত হলো তখন যেন দুশমনের মুখ থেকেই ইসলামের শক্তির স্বীকৃতি এসেছিল। গোটা জাযীরাতুল আরবের বুকের ওপর ইসলাম সুদৃঢ় কদমে দাঁড়িয়ে গেল।

হুদাইবিয়ার ঘটনা
(ষষ্ঠ হিজরীর যুল কা'দ মাস)

হুদাইবিয়ার সন্ধির কারণ

যখন জাযীরাতুল আরবের পরিবেশ-পরিস্থিতি মুসলমানদের অনেকটা অনুকূলে চলে এলো। যখন ইসলামী দাওয়াতের সফলতা আর এক বিশাল বিজয়ের ঝলমলে তারকারাজি ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীর আকাশে মেলা বসাতে শুরু করেছিল। যখন মসজিদে হারামে মুসলমানদের ইবাদত করার পাওনা অধিকারের স্বীকৃতি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-পর্ব সুসম্পন্ন হয়েছিল; আজ থেকে ছয় বছর আগে মুশরিকরা যেই মসজিদের দরজা ন্যক্কারজনক ইতিহাসের জন্ম দিয়ে মুসলমানদের ওপর বন্ধ করে দিয়েছিল।

মদীনায় থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখলেন, তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে হারাম প্রবেশ করেছেন; কা'বার চাবি হস্তগত করে তওয়াফ ও উমরা করেছেন। এরপর সাহাবায়ে কেরামের কারও মাথা মুণ্ডিয়ে দিয়েছেন আর কারও মাথার চুল ছেঁটে ছোট করে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এ স্বপ্নের কথা জানতে পেরে দারুণ আনন্দাপ্লুত হলেন। তাদের মনে আশার সঞ্চার হলো, এ বছর তাহলে ঠিকই তারা মক্কায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর কাছে তিনি উমরা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তারা যথারীতি প্রস্তুতি শুরু করেন।

মুসলমানদের যাত্রার ঘোষণা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা ও আশপাশের আবাদ বসতিগুলোতে ঘোষণা করে দিলেন, তিনি উমরা করার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই যাত্রা করছেন, তারাও যেন তাঁর সঙ্গে যাত্রা করার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু সিংহভাগ আরব বেদুঈন এ ক্ষেত্রে পেছনে থেকে যায়। অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামা-কাপড় ধুয়ে নিলেন। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম কিংবা নুমাইলা লাইসী রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করে ষষ্ঠ হিজরীর যুল কা'দ মাসের গোড়ার দিকে সোমবার দিন মদীনা থেকে যাত্রা করেন। এ সফরে স্ত্রীদের মধ্য থেকে তাঁর সঙ্গে ছিলেন উম্মে সালামা রা.। চৌদ্দ কিংবা পনেরো শ' সাহাবী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সফরসঙ্গী ছিলেন। কোষযুক্ত তরবারি ব্যতীত আর কোনো হাতিয়ার কিংবা যুদ্ধাস্ত্র তাদের সঙ্গে ছিল না।

মক্কার পথে মুসলমানদের অগ্রসর

মুসলমানরা মক্কার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর জন্তু হাদীকে মালা পরিয়ে ইশআর করে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে নিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লড়াইয়ের জন্য আসেননি। কুরাইশদের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য তিনি কাফেলার আগে বনু খুযায়ার এক গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন। এরপর কাফেলা যখন উসফানের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল তখন গোয়েন্দা ফিরে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জানালো, আমি কা'ব ইবনে লুয়াইকে আপনার বিরুদ্ধে হুবশীদেরকে[৫৫৩] সমবেত করতে দেখে এসেছি। ইতোমধ্যেই তারা এক পাতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও মসজিদে হারামের দিকে আপনার গতিরোধ করে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, **ঐ সকল লোকের ব্যাপারে তোমাদের মতামত কী? যারা কুরাইশদেরকে সাহায্য করার জন্য কোমর বেঁধে নেমেছে? আমরা তাদের নারী ও শিশুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদেরকে হস্তগত করে নিব; এরপর যদি তারা পরাজিত ও পলায়নোদ্যত হয়ে নিবৃত্ত হয় তবে তাও এ অবস্থায় হবে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরাজয়ের গ্লানি পান করিয়েছেন? না কি তোমাদের মতামত এই যে, আমরা সোজা বাইতুল্লাহর পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকবো; এরপর কেউ যদি আমাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় তবে আমরা কেবল তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাব?** রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রস্তাব শুনে আবু বকর সিদ্দীক রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বজ্ঞ। আমরা তো এসেছি কেবল উমরা করার নিয়তে। কারও বিরুদ্ধে কোনো লড়াই কিংবা যুদ্ধ করার মানসে আমরা আসিনি। তবে হ্যাঁ,এখন কেউ যদি আমাদের ও আল্লাহর ঘরের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় তবে তার মুকাবিলা আমরা অবশ্যই

---

[৫৫৩] তারা ছিল বনু কেননা ইত্যাদি কবীলার শাখা আরব জনগোষ্ঠী। হাবশী নয়; যেমনটা (আরবি) শব্দের প্রতিকৃতি দেখে যে কারও মনে হতে পারে। মক্কার নিম্নভূমি নুমানুল আরাকে অবস্থিত হুবশী নামক একটি পাহাড়ের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে হুবশী বলা হয়; হাবশী নয়। মক্কা থেকে এর দূরত্ব ছয় মাইল। তার পাদদেশে বনু হারিস ইবনে আবদে মুনাত ইবনে কিনানা, বনু মুস্তালিক, উলহিয়া ইবনে সা'দ ইবনে উমর, বনু হুন ইবনে খুযাইমা ইত্যাদি গোত্র সমবেত হয়ে কুরাইশের সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, যতকাল রাত অন্ধকার থাকবে, দিন আলোময় থাকবে আর হুবশী পাহাড় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে (অর্থাৎ চিরদিন) ততকাল আমরা আমাদের দুশমনের বিরুদ্ধে এক পথের পথিক থাকব। তখন সেই পাহাড়ের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে হুবশী কুরাইশ বলা হয়। (মু'জামুল বুলদান ২/২১৪। মুনযিক পৃষ্ঠা ৪৭৫)

করব। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তোমরা সামনে চলো! লোকজন চলতে শুরু করল।

বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার অপচেষ্টা

গোড়াতেই কুরাইশরা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনা থেকে বের হওয়ার খবর পেয়েছিল তখন থেকেই তারা যে কোনো উপায়ে মুসলমানদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার নিমিত্ত একটি পরামর্শ সভা কায়েম করেছিল। সুতরাং, সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কথা একটিই- মুসলমানদেরকে যে করে হোক এ পথে অগ্রসর হতে দেওয়া যাবে না। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুবশীদের সঙ্গে নিশ্চিত সংঘাতের পথ ছেড়ে আপন যাত্রা অব্যাহত রাখলেন তখন বনু কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এসে অবহিত করল যে, কুরাইশরা যু-তুয়া নামক স্থানে অবস্থান করছে। আর খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে দুই শ' অশ্বারোহী সেনা কুরাউল গামীম নামক স্থানে মক্কাগামী প্রধান সড়কের ওপর রণসাজে সেজে বসে আছেন। এরপর খালিদ মুসলমানদেরকে বাঁধা দেওয়ারও অপচেষ্টা চালালেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বাহিনী এমন স্থানে দাঁড় করালেন, যেখান থেকে একদল অপর দলকে দেখতে পেত। যোহরের ওয়াক্ত হলে খালিদ মুসলমানাদেরকে রুকু ও সিজদা করে নামায পড়তে দেখলেন। মুসলমানরা নামায থেকে ফারেগ হলে তিনি বলতে লাগলেন, আহ! কি একটা সুবর্ণ সুযোগ আমরা নষ্ট করে দিয়েছি। তাদের ওপর আক্রমণের এ ছিল এক মোক্ষম সময়! এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন- মুসলমানরা যখন আসরের নামায আদায় করতে থাকবে তখন তাদের ওপর একযোগে এক দারুণ হামলা চালানো হবে। আর ঠিক এ মুহূর্তেই আল্লাহ তাআলা 'সালাতুল খউফ' (তথা ভীতিকালীন মুহূর্তের এক বিশেষ নামায) অনুমোদন করলেন। এতে করে খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আক্ষেপে ঠোঁট কাঁমড়াতে থাকল।

পথ পরিবর্তন; রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়ানোর প্রয়াস

নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পথ এড়ানোর লক্ষ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোজা ও সমতল পথ ছেড়ে পার্বত্য উপত্যকার মাঝ দিয়ে এক শ্বাপদসংকুল বন্ধুর পথ বেছে নিলেন। তিনি আপন কাফেলা নিয়ে হামসের মধ্য দিয়ে ডান দিকে ঘুরে গেলেন। সেখান থেকে সানিয়াতুল মুরার হয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চল হুদাইবিয়ার উপকণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এভাবে তিনি তানঈম হয়ে হারাম শরীফগামী মূল পথকে ডান দিকে ফেলে রেখে গেলেন। খালিদ যখন মুসলমানদের এ ত্বরিৎ পথ পরিবর্তন দেখলেন তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাহিনী নিয়ে কুরাইশদের জন্য এক ভয়াল সংবাদের বাহক হয়ে ফিরতি পথে ছুটলেন।

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সফর অব্যাহত রাখেন। কিন্তু সানিয়াতুল মুরার গিয়ে পৌঁছার পরে তাঁর উষ্ট্রী বসে যায়। লোকজন তখন বলতে শুরু করে, ওঠ্! ওঠ্!! কিন্তু সে বসেই থাকে। লোকেরা তখন বলতে শুরু করে, কসওয়া থেমে গেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন, কসওয়া থেমে যায়নি; আর এটা তার অভ্যাসও নয়; বরং তাকে থামিয়ে দিয়েছেন সেই সত্তা যিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন হস্তিবাহিনীকে। অতঃপর তিনি বলেন, সেই সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, এ সকল লোক আমার কাছে যদি এমন কোনো বিষয় প্রার্থনা করে, যাতে আল্লাহর হুরুমাতসমূহের প্রতি ইয্যত ও শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তবে আমি তা অনুমোদন করব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে হাঁকালে সেটা আবার চলতে শুরু করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদিক সেদিক সামান্য পথের বাঁক নিয়ে পরিশেষে হুদাইবিয়ার উপকণ্ঠে একটি কূপের পাড়ে গিয়ে অবতরণ করেন। কূপটিতে পানি ছিল খুব সামান্য। এ কারণে লোকজন অল্প অল্প করে পানি নিচ্ছিল। তারপরেও স্বল্প সময়ের মধ্যে পানি ফুরিয়ে গেল। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিষয়টি জানাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন তূণীর থেকে একটি তীর বের করে কূপের ভেতরে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। নির্দেশমতো তাতে তীর ফেলা হলে কূপের তলদেশের মাটি চিরে বেরিয়ে আসে উচ্ছল উচ্ছ্বসিত উন্মাদ স্রোতধারা।

আল্লাহর রাসূল ও কুরাইশদের মধ্যস্থতাকারী বুদাইল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে এসে খানিকটা আরাম করে বসলে বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা খুযাঈ বনু খুযায়ার কয়েক ব্যক্তি সমভিব্যাহারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসে। তাহামার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র তারাই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মঙ্গল ও কল্যাণকামী। সে এসে বলল, আমি কা'ব ইবনে লুয়াইকে হুদাইবিয়ার কতিপয় কূপের পাড়ে অবস্থান করতে দেখে এসেছি। তার সঙ্গে নারী ও শিশুরাও রয়েছে। সে আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও বাইতুল্লাহর পথে আপনার কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। বুদাইলের কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিন্তু আমরা তো কারও সঙ্গে লড়তে আসিনি; আমরা এসেছি উমরা করতে। অপরদিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ কুরাইশদের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলেছে। এখন যদি তারা চায় তবে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট একটা সময় বেঁধে দিব আর তারা আমাদের ও অন্যান্য মানুষের মাঝখান থেকে সরে যাবে। আর যদি মানুষ যাতে দাখিল হয়েছে তারাও তাতে দাখিল

হতে চায় তবে তাও পারবে। নতুবা কমপক্ষে একটু আরাম তো পাবে। আর যদি এর বিপরীতে পুরনো যুদ্ধ-বিগ্রহ-নেশাই তাদের মন আর মগজের ওপর জেঁকে বসে তবে ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না আমার ধড় থেকে ঘাড় আলাদা হয়ে যায় কিংবা আল্লাহ তাঁর দীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

এ কথা শুনে বুদাইল বলল, আপনার বক্তব্য আমি তাদের কাছে পৌঁছে দিব। এরপর সে কুরাইশদের কাছে এসে বলল, আমি তোমাদের কাছে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। তাঁর কিছু বক্তব্য আমি শুনেছি। এখন তোমরা যদি চাও তবে তোমাদের সামনে আমি তা উপস্থাপন করতে পারি।

বুদাইলের কথার প্রতিউত্তরে তাদের রাম ছাগলগুলি বলে উঠল, তার সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে আমাদের শোনার কিছু নেই। এর বিপরীতে তাদের বিজ্ঞজনেরা বলল, তুমি যা শুনেছ বলো! বুদাইল বলল, আমি এমন এমন শুনেছি। কুরাইশরা তখন মিকরায ইবনে হাফসকে পাঠাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন, **এ তো এক গাদ্দার।** অতঃপর সে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এলো তখন তিনি বুদাইল ও তার সঙ্গীদেরকে যা বলেছিলেন হুবহু সে কথাগুলিই বললেন। এরপর মিকরায ফিরে গিয়ে কুরাইশদেরকে তা অবহিত করল।

কুরাইশদের প্রতিনিধিদল

কুরাইশদের বনু কেনানার হুলাইস ইবনে আলকামা নামক এক ব্যক্তি বলে উঠল, আমাকে একটু তাঁর কাছে যেতে দাও! তারা সকলে বলল, ঠিক আছে আপনি যান। সে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **সে অমুক। সে এমন কবীলার লোক, যারা হাদীর প্রাণীকে ভারি সম্মান করে; সুতরাং, তোমরা সেগুলিকে দাঁড় করিয়ে দাও!** সাহাবায়ে কেরাম সেগুলি দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং নিজেরাও লাব্বাইক ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন। সে এ দৃশ্য দেখে বলে উঠল, সুবহানাল্লাহ! এ সকল মানুষকে বাইতুল্লাহ থেকে বাঁধা দিয়ে রাখা কখনোই সমীচীন হবে না। অতঃপর সে নিজ সঙ্গীদের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, আমি হাদীর প্রাণীদেরকে মালা পরানো ও ইশআর অবস্থায় দেখে এসেছি। এ জন্য এখন আমি তাদেরকে বাইতুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখা সমীচীন মনে করছি না। এরপর তার ও কুরাইশের মাঝে যে পর্যালোচনা আর কথাবার্তা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করছি।

তখন উরওয়া ইবনে মাসঊদ সাকাফী আলোচনার ভেতরে প্রবেশ করে বলল, সে তোমাদের সামনে একটি সুন্দর পরিকল্পনা পেশ করেছে। সুতরাং তোমরা এটা মেনে নাও! আর আমাকেও এখন তাঁর কাছে যেতে দাও! তারা বলল, ঠিক আছে যাও! এরপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আলোচনা শুরু করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বুদাইলের কাছে বলা কথাগুলিরই পুনরুক্তি করলেন। তখন উরওয়া বলল, মুহাম্মাদ! আপনি বলুন তো, যদি আপনি নিজ হাতে নিজ কওমকে সমূলে বিনাশ করে দেন তবে গোটা আরবের কেউ ইতঃপূর্বে আপনার মতো নিজ কওমকে নিজের হাতে ধ্বংস করার এমন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে? আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে আল্লাহর কসম! এমন বহু চেহারা আর পোশাকের মানুষ দেখছি, যারা আপনাকে একাকী ফেলে রেখে আপন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচবে। এ কথা শুনে আবু বকর রা.তাকে বললেন, উল্লুক! লাতের লজ্জাস্থানের ঝুলানো চামড়া গিয়ে চুষতে থাক্! আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ছেড়ে পালিয়ে যাব তাই না? উরওয়া বলল, এ কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আবু বকর। উরওয়া বলল, আল্লাহর কসম! যদি এমন না হতো যে তুমি আমার ওপর একটি ইহসান করেছিলে আর এখনো পর্যন্ত আমি তার প্রতিদান দেইনি তবে আজ অবশ্যই আমি তোমার কথার জবাব দিতাম। এরপর সে আবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। কিন্তু সে যখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কোনো কথা বলত তাঁর দাড়ি মুবারকে হাত দিত। সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার হাতে ছিল তরবারি আর মাথায় ছিল মিগফার। সে যখনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ির দিকে হাত বাড়াচ্ছিল তিনি তার হাতের তরবারির বাট দিয়ে আঘাত করে বলতেন, আল্লাহর রাসূলের দাড়ি থেকে নিজ হাত দূরে রাখো! শেষমেশ উরওয়া মাথা উঁচিয়ে বলল, এ লোক কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, মুগীরা ইবনে শু'বা রা.। উরওয়া তখন বলল, গাদ্দার! আমি কি তোর গাদ্দারীর সময় দৌড়াদৌড়ি করিনি? প্রকৃত ব্যাপার হলো, জাহেলিয়াতের যুগে মুগীরা এক সফরে নিজ সঙ্গীদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ লুট করে নিয়ে এসে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **ইসলাম গ্রহণ তো আমি কবুল করেছি। কিন্তু সম্পদের ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।** আর তখন উরওয়া এর পেছনে দৌড়াদৌড়ি করেছিল। কারণ সম্পর্কে মুগীরা ছিলেন উরওয়ার ভাতিজা।

এরপর উরওয়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের গভীর সম্পর্ক আর পরম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের

অভাবিতপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। পরিশেষে সে আপন সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি পৃথিবীর বড় বড় সম্রাট আর রাজ্যপালদের দরবারে গিয়েছি। কায়সার, কিসরা আর নাজ্জাসী- কারোর দরবারেই আমরা যাওয়া বাকি নেই। আল্লাহর কসম! আজ পর্যন্ত আমি কোনো দরবারেই তাদের রাজা কিংবা বাদশাহকে ততটা ইয্যত ও সম্মান করতে দেখিনি, যতটা দেখিছি মুহাম্মাদের সঙ্গীদেরকে মুহাম্মাদকে করতে। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ যখন থুথু ফেলেন তখন তা কোনো না কোনো ব্যক্তির হাতে গিয়ে পড়ে, আর সে তখন তা আপন চেহারা আর শরীরে মুছে নেয়। আর যখন তিনি তাদেরকে কোনো আদেশ দেন তখন তারা তা পালনের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে। আর যখন তিনি উযূ করেন, তখন মনে হয় তারা তাঁর উযূর পানির জন্য যুদ্ধ শুরু করে দিবে। আর যখন তিনি কোনো কথা বলেন, তখন তারা নমিত লোচনে নির্বাক বদনে মনোযোগী হয়ে তাঁর কথা শোনে। পরম শ্রদ্ধাবোধের কারণে কেউ তাঁর দিকে চোখ উঁচু করে তাকায় পর্যন্ত না। আর তিনি তোমাদের সামনে একটি ভালো প্রস্তাব পেশ করেছেন। সুতরাং, তোমরা সেটি গ্রহণ করে নাও!

তিনিই তোমাদের হাতকে তাদের থেকে বিরত রেখেছেন

যুদ্ধের মদ খেয়ে মাতাল হওয়া রণোন্মাদ কুরাইশদের নওজোয়ান বাহিনী যখন তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরকে ধীরে ধীরে সন্ধির পথে অগ্রসর হতে দেখল তখন তাদের কাছে এ দৃশ্য বড় বেমানান মনে হলো। তারা এমন একটি দ্রুত পরিকল্পনা করে বসল, যাতে এ সন্ধি বাস্তবায়নের মুখ দেখতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে তারা নিশীথ রাতের অন্ধকারে নিশুতি প্রহরে মুসলিম শিবিরে আক্রমণের এবং এমন হাঙ্গামা বাঁধানোর সিদ্ধান্ত নিলো, যাতে উভয় শিবিরে যুদ্ধের প্রচণ্ড আগুন শতগুণ তেজ নিয়ে উথলে ওঠে। এরপর তারা তাদের এ দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের কার্যত পদক্ষেপ হাতে নিলো। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সত্তর কিংবা আশি জন নওজোয়ান সৈন্য এক ভয়ঙ্কর শর্বরীতে তানঈম পর্বত থেকে অবতরণ করে চুপিসারে মুসলিম শিবিরে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা চালালো। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর প্রহরীদের সালার মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. কৌশলে তাদের সকলকে বন্দী করে ফেললেন।

সন্ধির আশায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দিলেন। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ-

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ.

তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। [সূরা ফাত্‌হ : ২৪]

প্রতিনিধি হয়ে উসমান বিন আফফান রা.

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের কাছে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পদক্ষেপ আরও খোলসা করে তোলার জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণ সময়োচিত কর্তব্য বলে মনে করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি উমর বিন খাত্তাব রা. কে ডেকে পাঠালেন। উমর রা. এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! পুরো মক্কায় বনু আদী বিন কা'বের এমন কোনো লোক আমার নেই, যে আমাকে বিপদে একটুকু সাহায্য করতে পারবে। আপনি উসমান বিন আফ্‌ফানকে প্রেরণ করুন। কেননা, সেখানে তাঁর আত্মীয় স্বজন রয়েছে। তিনি আপনার বার্তা ভালোভাবেই তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উসমান রা. কে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাকে কুরাইশদের কাছে পাঠানোর সময় বলে দিলেন, **তুমি তাদেরকে বলে দিবে, আমরা কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আসিনি; বরং আমরা এসেছি উমরা আদায়ের জন্য। এরপর তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে।** পাশাপাশি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মক্কায় যে সকল মুমিন নারী-পুরুষ রয়েছে তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে নিকট ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুত বিজয়ের সুসংবাদ দিতে বললেন। তাকে আরও বলে দিলেন যেন তিনি তাদেরকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে দেন যে, আল্লাহ তাআলা অতি শীঘ্রই গোটা মক্কা ইসলামের জন্য বিজয় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি ঈমান নিয়ে তখন কাউকে কোনো নির্জনতা ও গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে না।

উসমান রা. দরবারে রিসালতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে রওয়ানা হলেন। বালদাহ নামক স্থানে পৌঁছলে কুরাইশরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ? তিনি উত্তর করলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এমন এমন বার্তা নিয়ে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল, তোমার কথা আমরা শুনেছি। এবার তুমি আপন কাজে যেতে পারো। ইতোমধ্যে আব্বান ইবনে সাঈদ ইবনুল আস উঠে এসে তাকে স্বাগত জানালো। এরপর ঘোড়ার ওপর জিন পরিয়ে তাকে নিজের সামনে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে আপন তত্ত্বাবধানে মক্কায় নিয়ে গেল। অতঃপর উসমান রা. কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বার্তা জানিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা তার কাছে বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করার প্রস্তাব পেশ করল। তিনি তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তাদেরকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূল বাইতুল্লাহ তওয়াফ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তওয়াফ করবেন না।

উসমান হত্যার গুজব ও বাইয়াতে রিদওয়ান

কুরাইশদের কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বার্তা পৌছে দেওয়ার পরে কুরাইশরা তাকে আটকে রাখল। এর পেছনে সম্ভবত তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের মধ্যে বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও চিন্তা ভাবনা করে কোনো নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে নিয়ে আসা বার্তার জবাব দিয়ে তাকে তারা বিদায় দিবে। কিন্তু এ আটকে রাখার সময়ের মুদ্দত স্বাভাবিকতার চেয়ে বেড়ে গেলে মুসলিম শিবিরে উসমান রা. এর নিহত হওয়ার গুজব রটে গেল। এ গুজব যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এসে পৌছল তখন তিনি বললেন, **তাদের সঙ্গে বোঝা-পড়া ব্যতীত এ স্থান থেকে এক কদমও আমরা হটব না।** অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বাইয়াতের আহ্বান জানালেন। সকলে বাইয়াতের প্রতি রুদ্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন যে, কোনো অবস্থাতেই তারা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবেন না। সাহাবায়ে কেরামের একটি বিশেষ জামাত এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে মৃত্যুর বাইয়াত হলেন। সর্বপ্রথম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ধরে বাইয়াত হয়েছিলেন আবু সিনান আসাদী। সালামা ইবনুল আকওয়া শুরুতে, মাঝে ও শেষে এভাবে মোট তিন বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে মৃত্যুর ওপর বাইয়াত হন। এক সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাত দিয়ে নিজের অন্য হাত ধরে বলেন, **এটা উসমানের বাইয়াত।** বাইয়াত পর্ব শেষ হওয়ার পর উসমান রা. ফিরে এসে তিনি বাইয়াত হন। গোটা মুসলিম শিবিরের কেবল একটা মুনাফিক ছাড়া আর কেউই এ বাইয়াত থেকে পিছু হটেনি। সেই মুনাফিকটা ছিল জাদ্দ ইবনে কায়স।

একটি গাছের নীচে বসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে এ বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। উমর রা. তখন তাঁর হাত ধরে ছিলেন। আর মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা. গাছটির কয়েকটি ছোট ছোট ডাল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর থেকে টেনে দূরে ধরেছিলেন। এটাই ইসলামের ইতিহাসে 'বাইয়াতে রিদওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। [সূরা ফাত্হ: ১৮]

সন্ধির ধারা

কুরাইশরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও তাদের বেহাল দশা আঁচ করতে পেরে সন্ধির জন্য দ্রুত সুহাইল ইবনে আমরকে পাঠিয়ে দিলো। যাওয়ার প্রাক্কালে যে বিষয়টি তাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দিলো তা হলো, আর যা-ই হোক কিন্তু এ বছর তাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে- যাতে করে আরবরা কোনো দিনও বলতে না পারে যে, তারা আমাদের শহরে জোর-জবরদস্তি করে শেষমেশ প্রবেশ করেই ছেড়েছে। এরপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে তাকে দেখেই বললেন, তোমার মিশন সহজ হয়ে গেছে। তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য একটিই- সন্ধি করা। এরপর সুহাইল এসে দীর্ঘক্ষণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করল। পরিশেষে নিম্ন লিখিত ধারাগুলির ওপর উভয় পক্ষের মাঝে সন্ধিচুক্তি সংঘটিত হলোঃ

এক. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানরা এখানে এসে তিন দিন অবস্থান করবে। এ সময় তাদের সঙ্গে থাকবে কেবল সফরের আত্মরক্ষার হাতিয়ার তথা কোষযুক্ত তরবারি। আর তাদেরকে কোনো ধরনের বাঁধা কিংবা গতিরোধ করা হবে না।

দুই. দুই শিবিরের মাঝে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত থাকবে। এ সময় মানুষ নিরাপদ থাকবে এবং উভয়ে পক্ষের হাত নিবৃত্ত থাকবে।

তিন. যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুক্তিতে দাখিল হতে চাইবে সে তার পারবে। আবার কেউ যদি কুরাইশদের চুক্তিতে দাখিল হতে চায় তবে সেও তা পারবে। আর যে কবীলাই তাদের কারও সঙ্গে সংযুক্ত হবে, সে কবীলা সে পক্ষের অঙ্গ বিবেচিত হবে। সুতরাং, এ ধরনের কোনো কবীলার ওপর যে কোনো ধরনের যুলুম ও বাড়াবাড়ি খোদ সে পক্ষের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি সাব্যস্ত হবে।

চার. যদি কুরাইশদের অনুমতি ব্যতীত কেউ পালিয়ে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দলে এসে যোগ দেয় তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে কেউ কুরাইশদের কাছে চলে আসে তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তিনামা লেখার জন্য আলী রা. কে ডাকলেন। আলী রা. কে তিনি লিখতে বললেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। সুহাইল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, রহমান কে? তা আমরা জানি

না; বরং তুমি লেখ 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এ কথাই লিখতে বললেন। এরপর তিনি তাকে লিখতে বললেন, **এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে সন্ধিপত্র।** সুহাইল বলে উঠল, যদি আমরা জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তবে তো আমরা আপনাকে বাইতুল্লাহ থেকে বাঁধা দিতাম না। আর আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না; বরং আপনি লিখুন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও আমি আল্লাহর রাসূল।** এরপর তিনি আলী রা. কে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যটি মুছে দিয়ে 'মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ' লেখার নির্দেশ দেন। আলী রা. এ বাক্যটি মুছতে অস্বীকৃতি জানান। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে তা মুছে দেন। এভাবে সন্ধিপত্র লেখার অধ্যায় সমাপ্ত হয়। সন্ধি সংঘটিত হওয়া শেষ হলে বনু খুযায়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ অবলম্বন করে। যেমনটি আমরা গ্রন্থের গোড়াতেই উল্লেখ করেছি যে, আব্দুল মুত্তালিবের সময় থেকেই বনু খুযাআ বনু হাশিমের মিত্র ছিল। এ কারণে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ চুক্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি মূলতঃ পুরনো বন্ধুত্বের নবায়নই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বনু খুযাআর বিপরীতে বনু বকর কুরাইশদের পক্ষ অবলম্বন করে।

আবু জান্দালকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো

সন্ধিপত্র লেখার সময় সুহাইলের ছেলে আবু জান্দাল শৃঙ্খল নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে এলো। সে মক্কার নিম্নাঞ্চল দিয়ে বের হয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সুহাইল বলল, সন্ধিপত্রের শর্ত অনুযায়ী তাকেই আপনারা সর্বপ্রথম আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এখনো তো আমরা সন্ধিপত্র লিখে শেষ করিনি।** সুহাইল বলল, তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে কোনো সন্ধি চুক্তিই করব না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তাহলে তাকে আমার জন্য ছেড়ে দাও!** সুহাইল বলল, এটাও আমি পারব না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **না! এটুকু তোমাকে করতেই হবে।** সুহাইল বলল, আমি পারব না। এরপর সে আবু জান্দালের মুখে প্রচণ্ড এক আঘাত বসিয়ে দিয়ে তার জামার কলার ধরে তাকে মুশরিকদের কাছে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল। আবু জান্দাল তখন উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগলঃ হে মুসলমানরা! এখন কি আমাকে আবার মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আর তারা আমার দীনকে বিনষ্ট করে ফেলবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **আবু জান্দাল! সবর করো**

ও আল্লাহর কাছে সওয়াবের প্রত্যাশা করো! অতি শীঘ্রই আল্লাহ তোমার জন্য তোমার সঙ্গে যে সকল দুর্বল মুসলমান রয়েছে তাদের জন্য একটা পথ বের করে দিবেন। আমরা তাদের ও আমাদের মাঝে সন্ধি করেছি। এ ব্যাপারে আমরা ও তারা পরস্পরে আল্লাহর নামে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছি। এ কারণে আমরা অঙ্গীকার ভাঙতে পারি না।

উমর রা. তখন লাফিয়ে উঠে আবু জান্দালের পাশাপাশি যেতে যেতে বললেন, আবু জান্দাল! সবর করো। এগুলি মুশরিক। এগুলির গায়ের রক্ত তো কুত্তার রক্ত! পাশাপাশি তিনি তার তরবারির বাট আবু জান্দালের পাশে রেখে চলছিলেন। উমর রা. বলেন, আমার আশা ছিল আবু জান্দাল তরবারি নিয়ে তার বাপকে ঠাণ্ডা করে দিবে। কিন্তু বেচারার এটা সাহস হলো না। এভাবে এখানেই বিষয়টি শেষ হয়ে গেল।

উমরা থেকে হালাল হওয়ার জন্য কুরবাণী ও মুণ্ডানী

সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, **এখন তোমরা কুরবানী করো!** আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত বাক্যটি তিন তিনবার বলা সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের একজনও দাঁড়ালেন না। এভাবে তিন বারের পরেও যখন তিনি কাউকে দাঁড়াতে দেখলেন না তখন নিজে উঠে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. এর কাছে চলে গেলেন। তাকে লোকদের আচরণের কথা খুলে বললেন। সবকিছু শুনে উম্মে সালামা রা. তাকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এমনটাই চান? তাহলে এবার আপনি গিয়ে কাউকে কিছু না বলে নিজের পশু নিজে কুরবানী করে দিন! এরপর আপনার মাথা মুণ্ডন করে দিতে বলুন! উম্মে সালামা রা. এর পরামর্শ মতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁবু থেকে বের হয়ে কারও সঙ্গে কোনো প্রকারের কথা বললেন না। তিনি সোজা গিয়ে তাঁর পশু কুরবানী দিয়ে মাথা মুণ্ডালেন। সাহাবায়ে কেরাম এ দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে তারাও সকলে দাঁড়িয়ে গিয়ে নিজ নিজ পশু কুরবানী করে ফেললেন এবং একজন অপর জনের মাথা মুণ্ডিয়ে দিতে লাগলেন। অবস্থা এমন হলো, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর আতিশয্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলার উপক্রম হলো। সাহাবায়ে কেরাম একেকটি উট ও গাভী সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জাহলের একটি উট জবাই করলেন। এর নাকে রূপার একটি আংটা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, যাতে করে মুশরিকরা উত্তেজিত থেকে যায়। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা মুণ্ডিতদের জন্য তিন বার আর চুল ছোটকারীদের জন্য এক বার আল্লাহ তাআলার কাছে মাগফিরাত কামনা করেন।

এই সফরেই আল্লাহ তাআলা কা'ব ইবনে উজরা রা. এর মাধ্যমে এই আইন অনুমোদন করেন যে, (ইহরাম অবস্থায়) যে ব্যক্তি মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলবে তাকে রোযা, সদক্বা কিংবা কুরবানী দ্বারা এর ফিদ্‌ইয়া আদায় করে দিতে হবে।

মুহাজির নারীদের প্রত্যার্পণে অস্বীকৃতি

অতঃপর মুমিন নারীদের পর্ব এলে তাদের মুশরিক আত্মীয় স্বজন ও অভিভাবকরা এসে সন্ধিচুক্তির শর্তধারা অনুযায়ী তাদেরকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ দাবি নাকচ করে দেন। তিনি তাদেরকে বলে দেন যে, সন্ধিচুক্তি হয়েছিল এ শর্তের ভিত্তিতে: **আমাদের কাছ থেকে যদি কোনো পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে আপনার কাছে চলে যায়, তবে তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।**[৫৫৪] সুতরাং, মুমিন নারীরা এ চুক্তির মধ্যে আদৌ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার ইরশাদ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.

হে মোমিনরা, যখন তোমাদের কাছে মোমিন নারীরা হিজরত করে আসবে তখন তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করো! আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভাল জানেন। যদি তোমরা তাদেরকে মোমিন জানো তাহলে তোমরা তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরৎ পাঠিও না! না তারা (ঐ সমস্ত মহিলা) তাদের জন্য হালাল। আর না তারা (ঐ সমস্ত পুরুষ) তাদের জন্য হালাল। আর তোমরা দাও তাদেরকে ঐ মাল যা তারা খরচ করেছে। আর তোমাদের ওপর কোনো গুনাহ নেই তাদেরকে বিবাহ করতে, যখন তোমরা দিবে তাদেরকে তাদের মোহর। আর তোমরা কাফেরদের সম্পর্ক বাকী রেখ না!–[সূরা মুমতাহানাহ : ১০]

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ তাআলার বাণী إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ (যখন মুমিন নারীরা এসে এ মর্মে বাইয়াত হয় যে তারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না) এর দ্বারা পরীক্ষা করলেন। যারা এ সকল শর্তে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, **আমি**

[৫৫৪] সহীহ বুখারী ১/৩৮০।

তোমাদেরকে বাইয়াত করে নিলাম। এরপর তিনি তাদেরকে মুশরিকদের হাতে আর ফিরিয়ে দিলেন না।

এদিকে কুরআনে কারীমের উল্লিখিত নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কেরাম তাদের কাফের স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দিলেন। এই ধারবাহিকতায় উমর রা.তখন তার দুই মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন, যারা কুফর অবস্থায় তাঁর স্ত্রী ছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের একজনকে বিয়ে করেছিলেন মুআবিয়া রা. আর অপরজনকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রা.।

সন্ধির সার-নির্যাস

এটাই হলো ইসলামের ইতিহাসে সবিশেষ প্রসিদ্ধ 'হুদাইবিয়ার সন্ধি'। কেউ যদি ইসলামের ইতিহাসের এই বিশেষ ঘটনাটির প্রতি তার উত্তরকালীন ফলাফলের ভিত্তিতে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তবে সন্দেহ নেই- সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, নিঃসন্দেহে এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য ছিল এক বিশাল বিজয়। কারণ ইতঃপূর্বে কুরাইশরা মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করত না। বরং তারা মুসলমানদেরকে মনে করত পথের পাশে পড়ে থাকা ধূলিকণা- মুখের সামান্য ফুঁক কিংবা দমকা হাওয়া যার অস্তিত্ব নাশের জন্য যথেষ্ট। এ কারণে তারা অহোরাহ মুসলমানদের গোড়া কেটে দেওয়ার প্রাণপণ দুরভিসন্ধিতে প্রলিপ্ত ছিল। দিন রাত তারা শুধু সেদিনের স্বপ্ন দেখত যেদিন এ পৃথিবী থেকে মুসলমানদের চিরতরে বিলোপ ঘটবে। ইসলামের দাওয়াত আর মানুষের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানোর জন্য গোড়া থেকেই তারা কোমর বেঁধে নেমেছিল। কারণ গোটা জাযীরাতুল আরবের ধর্মীয় কল-কজার তারা ছিল হর্তাকর্তা। দীনি আর ধর্মীয় সকল ব্যাপার ছিল তাদের কুক্ষিগত। গোটা আরব আর এর মানুষগুলি এ ক্ষেত্রে ছিল তাদের অন্ধভক্ত। কিন্তু হুদাইবিয়ার সন্ধি স্রোতের এ বাঁক ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এ সন্ধি যেন সবার সামনে ঘোষণা করে দিলো যে, মুসলমানরা আরবভূমির একটি বিশেষ শক্তি। আর কুরাইশরা এখন তাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। খোলা ময়দানে তাদের মুখামুখি হয়ে দাঁড়ানোর ভয়ে কুরাইশদের কোমর এখন ন্যুজ হয়ে পড়েছে। পাশপাশি এ সন্ধির তৃতীয় ধারাটি সকলের সামনেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুরাইশরা এতদিন আরবে যে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে এখন সে দিন ফুরিয়ে এসেছে; বরং তারা তাদের স্বপ্নময় সোনালি সেই অতীত ভুলে গেছে। এখন সে তার নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত; অন্যের প্রতি তার চোখ তুলে তাকানোর সময় কোথায়? এখন যদি জাযীরাতুল আরবের বাদবাকি লোক বরং গোটা পৃথিবীর পুরো মানব জাতি ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয় তবে কুরাইশরা তাতে একটুকও মাথা ঘামাবে

না। তারা এ দিকে ফিরেও তাকানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। কোনোদিন ভুলেও তারা এর মধ্যে বাম হাত ঢুকানোর চেষ্টা করবে না।

ইতিহাসের পাঠকদের কাছে এ এক সহজাত জিজ্ঞাসা- হুদাইবিয়ার সন্ধি কি তাহলে কুরাইশদের জন্য এক চরম লজ্জাকর পরাজয়, আর মুসলমানদের জন্য গৌরবময় এক বিশাল বিজয় ছিল না? শুরু থেকেই ইসলাম ও তার দুশমনদের মাঝে যে সকল রক্তক্ষয়ী সংঘাত আর সংঘর্ষ চলে এসেছিল এর কোনোটির পেছনে ধন-সম্পদ উপার্জন, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর সৃষ্টির বিনাশ সাধন কিংবা সুখী ও সমৃদ্ধ মানব জাতিকে ধ্বংস করা অথবা জোর করে কারও ঘাড়ে ইসলামের শৃঙ্খল চাপিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না; বরং এর সবগুলির পেছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করছিল, তা ছিল- আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনের প্রচার প্রসারের কাজে একচ্ছত্র স্বাধীনতা অর্জন করা ও মুক্তমনে আল্লাহর আকাশ ও মাটির মাঝে তাঁর বড়ত্বের জয়গান গাওয়া। فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (যার ইচ্ছা ঈমান আনবে আর যার ইচ্ছা কুফরী করবে) [সূরা কাহফ:২৯] এর পেছনে আরও উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে করে ইসলামের মূল শক্তি মুসলমান ও তাদের সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্যের মাঝে পৃথিবীর কোনো শক্তি বাম হাত ঢুকাতে না পারে কিংবা তাদের কোনো বিষয়ে নাক গলানোর সুযোগ লাভ না করে। আর হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের এ উদ্দেশ্য সর্বাঙ্গীনভাবে অর্জিত হয়েছিল। সংঘাত ও সংঘর্ষ বিমুক্ত এ শান্তিপূর্ণ সন্ধির মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানরা যতটা লাভবান হয়েছিল হয়তো বড় বড় রক্তক্ষয়ী লড়াই আর লাখো প্রাণের বিনাশ সাধন করে বড় বড় বিজয় অর্জনের মাধ্যমেও ততটা লাভবান হতো না। এই সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা গোটা পৃথিবী ব্যাপী ইসলামের দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার এক মহা সুযোগ ও ব্যাপক স্বাধীনতা লাভ করে। এরই স্পষ্ট ফলাফল ছিল এই যে, যেখানে সামান্য কয়েক মুহূর্তে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা মাত্র তিন হাজারের একজনও বেশি ছিল না, সেখানে মক্কা বিজয়ের মাত্র দুই বছরের মধ্যে তাদের সংখ্যা এসে দাঁড়ালো দশ হাজারের কোটায়।

আর এ সন্ধিচুক্তির দ্বিতীয় ধারাটি ছিল মুসলমানদের প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ। কারণ, এ সকল যুদ্ধ বিগ্রহের সূচনাকারী ও জনক মুসলমানরা ছিল না; বরং এ আগুন প্রথম জ্বালিয়েছিল কুরাইশরাই। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। [সূরা তাওবাহ:১৩]

এ কারণে এ সকল সামরিক অভিযাত্রার পেছনে মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল একটিই- যাতে করে কুরাইশরা তাদের দম্ভ-ভরা বেঘোর নিদ্রা থেকে খানিকটা

হুঁশ ফিরে পায় এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো থেকে বিরত থাকে। তাদের সঙ্গে সমান ও ন্যায়ানুগ পন্থায় আচরণ করে। এতে করে উভয় দলের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে নিজ নিজ পথে চলবে। সুতরাং, দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বন্ধের সন্ধিচুক্তি তাদের এই ঘাড়তেড়ামী আর আত্মম্ভরিতা বন্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং যারা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছিল তাদের পরাজয়, দুর্বলতা ও ভেঙ্গে পড়ার দলিল হয়ে দাঁড়ায়।

আর এ সন্ধি চুক্তির প্রথম ধারাটি কুরাইশদের মুসলমানদেরকে মসজিদে হারাম থেকে বাঁধা দেওয়ার দিন ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করে। এটা ছিল কুরাইশদের জন্য চরম একটি ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতায় কুরাইশদের জন্য এর থেকে বেশী কিছু সান্ত্বনা ছিল না যে, অন্ততঃ পক্ষে তারা ঐ বছরের জন্য মুসলমানদেরকে কা'বা থেকে বাঁধা দিতে সফল হয়েছিল।

এভাবে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে তিনটি বিশাল সুযোগ দান করেছিল। আর বিনিময়ে কপালপোড়ারা একটি সুযোগ রেখে দিয়েছিল। আর সেটা ছিল সন্ধিচুক্তির চতুর্থ ধারা। আর এটাও ছিল এমন এক পথ যাতে তাদের লাভের খাতা শূন্যই ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের জন্যও এটা ক্ষতিকর কিছু ছিল না। কারণ একজন মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও ইসলামের শহর থেকে সে পলায়ন করবে না। আর এ কাজটি সে ঠিক তখনই করবে যখন প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে সে মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। আর সে যখন মুরতাদ হয়ে যাবে তখন ইসলাম ও মুসলমানদের তাকে দিয়ে কোনো প্রয়োজন নেই। ওপরন্তু ইসলামী সমাজে থাকার পরিবর্তে তার মতো লোকের সে সমাজ থেকে বেরিয়ে আসাই ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অধিকতর উপকারী। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, **যে আমাদের কাছ থেকে বেরিয়ে তাদের দলে চলে গেল আল্লাহ তাআলা তাকে দূর করে দিন!**[৫৫৫] আর মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে মুসলমান হয়ে যাবে, যদিও সে মদীনায় আসতে পারবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যখন মদীনাবাসী ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না তখন কি হাবশা ভূখণ্ড মুসলমানদের জন্য প্রশস্ত ও উদারচিত্ত ছিল না? এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইরশাদঃ **তাদের মধ্য থেকে যে আমাদের দলে চলে আসবে অতি শীঘ্রই আল্লাহ তাদের জন্য একটা সুন্দর পথ ও বিস্তৃত দিগন্ত খুলে দিবেন।**[৫৫৬]

---

[৫৫৫] সহীহ মুসলিমঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি অধ্যায় ২/১০৫।
[৫৫৬] প্রাগুক্ত।

মুশরিকদের এ রক্ষণশীলতার কারণে বাহ্যত যদিও মনে হয় যে, তাদের ইযযত আর সম্মানের পাল্লাই ভারী ছিল। কিন্তু হাকীকী অর্থে এতে তাদের গোঁড়ামী, মূর্খতা, জাত্যভিমান আর তাদের পৌত্তলিক অবকাঠামোর অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের শঙ্কা আর ভীতির বেহাল দশাই ফুটে ওঠে। যেন তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের অস্তিত্ব আজ ভয়াল হুমকির মুখে অসহায় হয়ে পড়ে আছে। এখন এ রক্ষণশীলতাই তাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। অপরদিকে মুসলমানদের কাছ থেকে কুরাইশদের কাছে কেউ চলে গেলে তাকে ফিরিয়ে না আনার প্রস্তাব সমর্থনের মাধ্যমে বোঝা যায়, নিজেদের শক্তি আর সামর্থ্যের ওপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা ছিল। আর এ ধরনের শর্তের ক্ষেত্রে তিনি একটুকুও ভীত কিংবা পেরেশান ছিলেন না।

মুসলিম শিবিরে উদ্বেগের ঘনঘটা; রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে উমর রা. এর বহস

এগুলিই ছিল এই সন্ধিচুক্তির শর্তাবলির প্রকৃত অবস্থান ও হাকীকী রহস্য। নতুবা বাহ্যিকভাবে সেখানে এমন দু'টি অবস্থা বিরাজমান ছিল, যার কারণে গোটা মুসলিম শিবিরে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীর ঘনঘটা ছেয়ে গিয়েছিল।

এক. ইতঃপূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমরা বাইতুল্লাহতে হাযির হয়ে সেখানে তওয়াফ করব। তাহলে এখন কেন তাওয়াফ ব্যতীতই আবার ফিরে যেতে হচ্ছে?

দুই. তিনি ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ হক্বের ওপর। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনকে বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাহলে কেন কুরাইশদের ঘাড় তেড়ামী মেনে নিতে হবে এবং আগে বেড়ে সন্ধি করতে হবে।

উল্লিখিত দু'টি কারণে মুসলমানদের মাঝে যুগপৎ সংশয়-সন্দেহ আর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের অনুভূতি মারাত্মকভাবে আহত ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। এভাবে তারা সন্ধির ফলাফল ও তার প্রকৃত গভীরতা অন্বেষণের পরিবর্তে চিন্তা ও পেরেশানীর জগতে ডুব দেয়। তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পেরেশান ও উদ্বিগ্ন ছিলেন উমর রা.। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি হক্বের ওপর নই এবং তারা বাতিলের ওপর নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রা. বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাতে আর তাদের নিহতরা জাহান্নামে নয় কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রা. বললেন, তবে কেন আমরা মাথা নত করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করতে যাব? আল্লাহ আমাদের ও তাদের মাঝে ফয়সালা করার

আগেই কেন আমরা ফিরে যাব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ইবনে খাত্তাব! নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। আর আমি আল্লাহর অবাধ্য নই। তিনি সবসময় আমার সাহায্যকারী। কখনো তিনি আমার সর্বনাশ করবেন না।** উমর রা. বললেন, আপনি কি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেননি যে, আমরা বাইতুল্লাহ তওয়াফ করব? তিনি বললেন, **হাঁ আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি; কিন্তু আমি কি তোমাকে এ বছরের কথা বলেছি?** উমর রা. বললেন, না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তাহলে নিশ্চিন্ত থেকো! একদিন ঠিকই তুমি বাইতুল্লাহতে এসে কা'বা ঘর তওয়াফ করবে!!**

অতঃপর উমর রা. যুগপৎ কুপিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে আবু বকর রা. এর কাছে ছুটে এলেন। আবু বকরকে তিনি হুবহু তা-ই বললেন, যা বলেছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে। আবু বকর রা. তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো করে জবাব দিলেন। তিনি আরও বাড়িয়ে বললেন, মৃত্যু পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রেকাব আঁকড়ে ধরে থাকো; আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে তিনি হক্বের ওপর রয়েছেন।

অতঃপর আয়াত নাযিল হলো: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا.........الخ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি এক প্রকাশ্য বিজয়.........। [সূরা ফাত্হ:১...]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন উমর রা. কে ডেকে এনে তার সামনে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **হাঁ।** তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রশান্তমনে ফিরে গেলেন।

পরবর্তী সময়ে উমর রা. নিজের অক্ষমতা আর বাড়াবাড়ির কথা উপলব্ধি করে নিদারুণ লজ্জিত হয়েছিলেন। উমর রা. বলেন, আমি এর জন্য বহু আমল করেছি। সে দিন আমি যে কাজ করেছিলাম পরবর্তী সময়ে তার জন্য আমি বহু নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি, দান-সদক্বা করেছি, গোলাম আযাদ করেছি। কারণ, সেদিনের কথাবার্তা সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড ভীতি ছিল। এক পর্যায়ে আমার আল্লাহর নিকট ভালো কিছু প্রাপ্তির আশা জেগে ওঠে।[৫৫৭]

---

[৫৫৭] এ গাযওয়া ও সন্ধির বিস্তারিত বিবরণ দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৪৩৯-৪৫৮, সহীহ বুখারী ১/৩৭৮-৩৮১, ২/৫৯৮, ৬০০, ৭১৭, সহীহ মুসলিম ২/১০৪-১০৬, ইবনে হিশাম ২/৩০৮-৩২২, যাদুল মাআদ ২/১২২-১২৭, ইবনুল জাওযী প্রণীত তারীখে উমর ইবনুল খাত্তাব পৃষ্ঠা ৩৯ ,৪০।

দুর্বল ঈমানদারদের সংকট নিরসন

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় ফিরে গিয়ে খানিকটা প্রশান্তি লাভ করলেন তখন মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের মধ্য থেকে আবু বসীর রা. পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। তিনি ছিলেন কুরাইশদের মিত্র বনু সাকীফের লোক। তারা তার খোঁজে দুই ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তারা বলল, আমাদের ও আপনার মধ্যে যে চুক্তি রয়েছে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি অনুযায়ী আবু বসীরকে তাদের হাতে তুলে দেন। তারা তাকে নিয়ে যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করে। এরপর খেজুর খাওয়া শুরু করে। আবু বসীর তখন তাদের একজনকে বলল, হে অমুক! তোমার তরবারিটা তো খুব ভালো! সে তখন তরবারিটা কোষমুক্ত করে বলল, হাঁ এটা খুব ভালো তরবারি। আমার বার বারের পরীক্ষিত তরবারি। তখন আবু বসীর তাকে বলল, আমাকে এটা একটু দেখতে দিবে? সে তখন তরবারিটি আবু বাসীরের হাতে দিয়ে দেয়। তরবারি হাতে পেয়ে আবু বসীর বিদ্যুদ্বেগে তার ওপর কঠিন হামলা চালান। চোখের পলকে সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

অপরজন পালিয়ে মদীনায় চলে যায় এবং মসজিদে নববীর মধ্যে ইতস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন, **নিঃসন্দেহে সে বিপদাক্রান্ত**। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে সে বলল, আমার সঙ্গী নিহত হয়েছে। আমাকেও এখন হত্যা করা হবে। ইত্যবসরে আবু বসীর হাযির হয়ে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন। আপনি আমাকে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তাদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, কি আপদ দেখো না! এখন **যদি তার কোনো সঙ্গী জুটে যেত! সে তো উভয় শিবিরের মধ্যে যুদ্ধের আগুন ভড়কে দিবে**। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য শুনে আবু বসীর বুঝে ফেললেন, তাকে আবারও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এ কারণে তিনি দ্রুত মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রোপকূলে চলে এলেন। ইতোমধ্যে আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল মক্কা থেকে পালিয়ে আবু বসীরের সঙ্গে মিলিত হন। এভাবে কুরাইশদের যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসতেন তিনি আবু বসীরের দলে এসে ভিড়তেন। এতে তাদের ছোটখাটো একটি দল হয়ে গেল। এরপর তাঁরা কুরাইশদের যে কোনো কাফেলার সিরিয়া যাওয়ার সংবাদ পেতেন সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করতেন। পরিশেষে কুরাইশরা অতিষ্ঠ হয়ে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে সংবাদ পাঠালো, দয়া করে আপনি তাদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিন। আর এখন থেকে যে-ই আপনার কাছে যাবে সে নিরাপদ থাকবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডাকালেন। আবু বসীর তখন মদীনায় এসে দরবারে রিসালতে হাযিরা দিলেন।

কুরাইশের বড় বড় বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে সপ্তম হিজরীতে কুরাইশের বড় বড় সিপাহসালার আমর ইবনুল আস, খালিদ বিন ওয়ালিদ ও উসমান বিন তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে উপনীত হলেন তিনি বললেন, **মক্কা তার কলিজার টুকরো সন্তানগুলিকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।**[৫৫৮]

[৫৫৮] এ সাহাবায়ে কেরাম কোন্ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে চরম মতভেদ রয়েছে। তবে আসমায়ে রিজালের অধিকাংশ কিতাব অনুযায়ী তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হিজরী অষ্টম বছরে। কিন্তু এর বিপরীতে বাদশা নাজ্জাসীর নিকট সাহাবী আমর ইবনুল আস রা. এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সমধিক প্রসিদ্ধ হয়েই আছে। এটা ছিল সপ্তম বছরের ঘটনা। আর খালিদ বিন ওয়ালিদ ও উসমান বিন তালহা রা. ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আমর ইবনুল আস রা. হাবশা থেকে যখন ফিরে এসেছিলেন তখন। কেননা তিনি যখন হাবশা থেকে ফিরে সরাসরি মদীনার পথ ধরেছিলেন তখন পথে খালিদ ও তালহার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যায়। এভাবে ইসলামের এ তিন মহা সিপাহসালার একসঙ্গে দরবারে রিসালতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে প্রমাণিত হয় তাদের ইসলাম গ্রহণ ছিল সপ্তম বর্ষে; অষ্টম বর্ষে নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

দ্বিতীয় পর্ব

নয়া যমানার উদ্বোধন

হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের যিন্দিগিতে এক নয়া যমানার উদ্বোধন, এক নতুন যুগের সূচনা, এক নওল রঙের ইতিহাস। কারণ যে কুরাইশরা ছিল মুসলমানদের জনম কি জনমের দুশমন; মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি খড়গহস্ত ও বিদ্বেষভাবাপন্ন- সে-ই যখন যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ ছেড়ে দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বেছে নিতে রাযী হলো তখন ময়দানের অন্যান্য শত্রুও লেজ গুটিয়ে পেছনে দৌড় দিলো। এভাবে ইসলামের তিন প্রধান দুশমন- কুরাইশ, গাতফান ও ইহুদি- এদের ডানা ভেঙে গেল। বিদ্বেষ আর দুশমনির আকাশে উড়াল দেওয়ার দিন ফুরিয়ে এবার শক্ত মাটিতে আছড়ে পড়ে পাঁজর ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। পাশাপাশি যেহেতু কুরাইশরাই ছিল আরবের পৌত্তলিকতার জনক ও মূর্তি-পূজার গুরুঠাকুর; এ কারণে ঠাকুরেরই যখন মাথা কাটা গেল তখন মূর্তি-পূজার অন্যান্য উৎসাহী সমর্থকরাও নিমেষে ঘাড় নীচু করে সালাম ঠুকতে উদ্যত হলো। দুশমনির প্রবণতা কমিয়ে সে সকল ইতরপ্রাণীরা এবার লেজ নেড়ে আনুগত্য প্রকাশের চেষ্টা করল। এ কারণে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর বনু গাতফানকে আর বড় কোনো আস্ফালন করতে দেখা যায়নি; যেটুকু দেখা গিয়েছিল তা ছিল মূলত ইহুদি প্ররোচনার পরিণতি।

কিন্তু ইহুদিদের প্রসঙ্গে বলা যায়, ইয়াসরিব থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর যেদিন তারা খাইবরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সে দিন থেকেই খাইবর দুরভিসন্ধি আর কুটিল চক্রান্তের এক জীবন্ত অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল। সেটা হয়ে পড়েছিল ইহুদি ষড়যন্ত্রের নিরাপদ নীড়। সেখানে তাদের বড় বড় শয়তানগুলি এসে ডিম পেড়ে তা' দিয়ে রাতারাতি অগণিত বাচ্চা ফুটাতো। বিভিন্ন স্থানে ফেতনা ফাসাদের আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য দিয়াশলাই নিয়ে বসে থাকত। মদীনার আশপাশে ঘুরে বেড়ানো মাথা খারাপ যাযাবর বেদুঈনগুলিকে অহোরাহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলত। রাত কে রাত জেগে থাকত ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিভিন্ন কূট-কৌশলের মারপেঁচে আঁটকে ফেলে পৃথিবী থেকে গোপনে সরিয়ে ফেলার মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে। এ জন্য হুদাইবিয়ার সন্ধির পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিম বাহিনীর সর্বপ্রথম লক্ষ্য ছিল জনমের জন্য এ নীড়ের পতন।

পাশাপাশি হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে ইসলাম ও মুসলমানদের যিন্দিগিতে যে নয়া যমানার উদ্বোধন হয়েছিল এটা তাদেরকে জাযীরাতুল আরবের সীমানা পাড়ি দিয়ে গোটা পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডে আর প্রত্যন্ত অঞ্চলের অলিতে গলিতে

ইসলামের দাওয়াত ও এই সত্য আসমানী পয়গামের সাহসী ঘোষণা ছড়িয়ে দেওয়ার মহা সুযোগ দান করেছিল। এ কারণে তখন থেকে এ পথে মুসলমানদের কদম অতীতের চেয়ে অনেক বেশি জোরালো ছিল; এ পথে তাদের আসা-যাওয়া অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি ছিল; বরং সামরিক অভিযাত্রার চেয়ে এ অভিযাত্রা বহুগুণ তেজ নিয়ে জ্বলে উঠেছিল। এ কারণে এ পর্বটিকে দু'টি ভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা যায়:

এক. দাওয়াতী কর্মসূচী কিংবা পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্রলিখন।

দুই. সামরিক কর্মসূচী।

নবী জীবনের এ অধ্যায়ের সামরিক অভিযাত্রাগুলির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার আগে আমরা দাওয়াতী কর্মসূচী ও বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে তার পত্রবিনিময়ের ওপর আলোকপাত করব। কারণ সাহেবে রিসালতের যিন্দিগিতে সামরিক অভিযাত্রা নয়; বরং দাওয়াতই ছিল স্বভাবজাত মুখ্য বিষয় ; এটাই ছিল সেই সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা অর্জন করতে গিয়ে দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত মুসলিম মুজাহিদদের ঘোড়া কিংবা উটের পিঠে কাটাতে হয়েছে। পরিবার-পরিজন হাজার হাজার মাইল দূরে আল্লাহর হাওলা করে ভিনদেশের মাটিতে জীবনকে হাজারো বিপদের হিংস্র নেকড়ের ব্যাদান করা মুখে ঠেলে দিতে হয়েছে; নিতে হয়েছে জীবনের হাজারো বাঁক ও দুর্বিপাক।

রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার সঙ্গে পত্র-বিনিময়

ষষ্ঠ হিজরীর আখেরী মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদাইবিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এলেন তখন তিনি তাঁর দাওয়াতকে জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে গোটা পৃথিবীর দূর দূরান্তের বড় বড় রাজা-বাদশাহ আর আমীর উমারাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেন।

অতঃপর যখন তিনি তাদের কাছে পত্র লেখার ইচ্ছা চূড়ান্ত করেন তখন তাঁকে বলা হয়, তারা মোহরাঙ্কিত পত্র ব্যতীত অন্য কোনো পত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি রূপার আংটি গ্রহণ করেন। এতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উৎকীর্ণ ছিল। প্রথম লাইনে ছিল আল্লাহ। দ্বিতীয় লাইনে রাসূল তৃতীয় ও সর্বশেষ লাইনে মুহাম্মাদ।[৫৫৯]

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে বিচক্ষণ সাহাবীদেরকে

---

[৫৫৯] সহীহ বুখারী ২/৮৭২, ৮৭৩।

পত্রবাহক ও প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদেরকে সে সকল রাজা-বাদশাহর নিকট প্রেরণ করলেন। অপরদিকে বিশিষ্ট সীরাত ঐতিহাসিক আল্লামা সুলাইমান মনসূরপুরী র. পত্র-বিনিময়ের সময়কালকে ষষ্ঠ হিজরীর পরিবর্তে সপ্তম হিজরীর মুহাররমের শুরুর দিকে গাযওয়ায়ে খাইবরের দিন কয়েক আগের ঘটনা বলে দৃঢ়মত পোষণ করেছেন।[৫৬০] নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আমরা সে সকল পত্রের মূল বক্তব্য ও তার কিছু ফলাফল তুলে ধরছি:

এক. হাবশার রাজা নাজ্জাসী বরবার পত্র

তাঁর নাম ছিল আসহামা ইবনে আবজার। ষষ্ঠ হিজরীর শেষের দিকে কিংবা সপ্তম হিজরীর শুরুর দিকে মুহাররম মাসে সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. এর মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক তাবারী র. এ ক্ষেত্রে একটি পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর মূল বক্তব্য ও আগ-পরে গভীর বিচার-বিশ্লেষণ চালালে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটা হুদাইবিয়ার অব্যবহিত পরে প্রেরিত পত্র ছিল না; বরং এটা ছিল ইসলামের প্রথম দিকে মুসলমানরা যখন হাবশায় হিজরত করেছিল সে সময়ে জা'ফর রা. এর হাতে তুলে দেওয়া নাজ্জাসী বরাবর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র। কারণ সে পত্রের শেষাংশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সকল মুহাজিরের কথা উল্লেখ করেছেন হুবহু এ ভাষায়: **আমি আপনাদের নিকট আমার চাচাতো ভাই জাফর ও একদল মুসলমান পাঠিয়ে দিলাম। যখন তারা আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তখন তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবেন এবং তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি হতে বিরত থাকবেন।**

ইবনে ইসহাক সূত্রে ইমাম বাইহাক্বী র. নাজ্জাসী বরাবর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রের রূপরেখা উল্লেখ করেছেন ঠিক এমন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের প্রতি পত্র।

তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক যে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি এক আর তার কোনো শরীক নেই। তিনি কোনো স্ত্রী পুত্র গ্রহণ করেননি। আরও সাক্ষ্য দেয় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমি

---

[৫৬০] রহমাতুল্লিল আলামীন ১/১৭১।

আল্লাহর রাসূল। সুতরাং আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে মুক্তি পাবেন।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে এসো-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা তো অনুগত। [সূরা আলে ইমরান:৬৪]

আর যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে আপনার পুরো খ্রিস্টান জাতির দায়ভার আপনার কাঁধে গিয়ে বর্তাবে। [৫৬১]

অপরদিকে বিশিষ্ট সীরাত বিশেষজ্ঞ ড. হামীদুল্লাহ (প্যারিস) নিকট অতীতে আবিষ্কৃত একটি পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মাত্র একটি শব্দের বিভেদ ব্যতীত ইবুনল কাইয়্যিম রহ.এর যাদুল মাআদে উল্লিখিত পত্রের সঙ্গে মিলে যায়। ড. হামীদুল্লাহ এ পথের বিচার-বিশ্লেষণের পেছনে গভীর মেহনত ও শ্রম দিয়েছেন এবং আধুনিক যুগের বহু আবিষ্কার দ্বারা তার সত্যতা প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং নিজ গ্রন্থে তার রূপরেখা উল্লেখ করেছেন। তা ছিল এমন :-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাবশা রাজ নাজ্জাসী বরাবর পত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়াতের পথ অনুসরণ করেছে। পরকথা:

আমি আপনার কাছে ঐ আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই; তিনি পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি, পূত ও পবিত্র, শান্তিদাতা ও নিরাপত্তাদাতা, যিনি অসীম তত্ত্বাবধায়ক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা ইবনে মারইয়াম ছিলেন আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালিমা, যা তিনি সতী-সাধ্বী কুমারী মারইয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন। এভাবে তার রূহ ও ফুঁকের মাধ্যমে মারইয়াম ঈসাকে গর্ভধারণ করলেন। যেমন তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন আপন হাতে। আর আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি এক আল্লাহর দিকে, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তার ইবাদতের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাহায্য করার দিকে। আমি আরও দাওয়াত দিচ্ছি আপনি আমার আনুগত্য স্বীকার করা

[৫৬১] বাইহাক্বী প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ২/৩০৮। আরও দেখুন মুসতাদরাকে হাকিম ২/৬২৩।

এবং আমার কাছে যা কিছু এসেছে তার ওপর ঈমান আনার। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আপনাকে ও আপনার সেনাবাহিনীকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি। আমি আমার পয়গাম আপনার কাছে পৌঁছে দিয়েছি আর নসীহত সম্পন্ন করেছি। আপনি আমার নসীহত কবুল করে নিন। আর শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়াতের পথে চলে।[৫৬২]

মুহতারাম ড. হামীদুল্লাহ জোর দিয়ে বলেছেন, এটাই সেই পত্র, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার অব্যবহিত পরে হাবশার রাজা নাজ্জাসী বরাবর প্রেরণ করেছিলেন। বিভিন্ন দলীল-প্রমাণের প্রতি গভীর বিচার বিশ্লেষণ চালালে এর সঠিকতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় অবশ্যই নেই; কিন্তু এটাই যে হুদাইবিয়ার পরে প্রেরিত পত্র এর কোনো দলীল নেই। তা ছাড়া গ্রন্থে উল্লিখিত ইবনে ইসহাক সূত্রে ইমাম বাইহাক্বী র. যে পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন তা হুদাইবিয়ার পরে অন্যান্য খ্রিস্টান রাজা-বাদশাহ বরাবর প্রেরিত পত্রের সঙ্গে সুসামাঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেগুলির সবগুলিতেই কুরআনে কারীমের এ আয়াতটি উল্লেখ করা হয়েছে:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ......

কেবল এটির বিপরীতে প্রত্যেকটি পত্রেই একই বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া সেটিতে হাবশার রাজার নাম 'আসহামা' স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এ কারণে ড. হামীদুল্লাহ কর্তৃক উল্লিখিত পত্রটি আমার মতে সেই পত্রটির রূপরেখা, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাসী আসহামার মৃত্যুর পরে তার খলীফার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আর এ কারণেই সম্ভবত সেটিতে বাদশাহর কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এ সকল পত্রের অভ্যন্তরীণ বক্তব্য আর আগ-পরের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত ইশারা-ইঙ্গিত ব্যতীত নিজস্ব বক্তব্য ও মতামতের সমর্থনে আমার কাছে কোনো নিশ্চিত দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তবে যে বিষয়টি যুগপৎ বড় আশ্চর্য আর কৌতূহলের জন্ম দেয় তা হলো, ড. হামীদুল্লাহ সাহেবের বক্তব্যের ভাষা কিন্তু বড়ই সুদৃঢ় ও প্রত্যয়যুক্ত যে, ইবনে ইসহাক সূত্রে ইমাম বাইহাকী র. উল্লিখিত পত্রটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদশা নাজ্জাসীর ইন্তেকালের পরে তার খলীফার কাছে পাঠিয়েছিলেন। অথচ সে পত্রে কিন্তু

---

৫৬২ দেখুন 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দিগী' (উর্দু) পৃষ্ঠা ১০৮,১০৯। ১২২-১২৫। যাদুল মাআদে 'শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়েতের পথে চলে' এর পরিবর্তে রয়েছে 'আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন।' । দেখুন যাদুল মাআদ ৩/৬০।

স্পষ্টভাবে নাজ্জাসী আসহামার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চার অক্ষরের একটা বড়সড় নাম কীভাবে যে ড. সাহেবের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল এটাই কৌতূহলের প্রধান উপজীব্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[৫৬৩]

যাই হোক, সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র বাদশাহ নাজ্জাসীর কাছে পৌঁছে দিলেন তিনি সেটা নিজ হাতে নিয়ে দু'চোখের ওপর রাখলেন। সুউচ্চ রাজ সিংহাসনের শিখর দেশ ছেড়ে মাটিতে নেমে এলেন। জা'ফর ইবনে আবী তালিবের হাত ধরে তখনই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর এ সংবাদ জানিয়ে পত্র লিখেন। সে পত্রের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ :

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ বরাবর নাজ্জাসী আসহামার পক্ষ থেকে পত্র। হে আল্লাহর নবী! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার ওপর সালাম, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আল্লাহ সেই সুমহান সত্তা যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। পরকথা:

হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে আপনার পত্র এসে পৌঁছেছে। সেখানে আপনি ঈসা আ. সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তা আমি দেখেছি। আকাশ ও মাটির রবের কসম! আপনি সেই পত্রে ঈসা আ. সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তিনি তার চেয়ে বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণ বেশি ছিলেন না। আপনি যেমন বলেছেন তিনি হুবহু তেমনই ছিলেন। আর আপনি আমাদের কাছে যা কিছু প্রেরণ করেছেন আমরা তা জানতে পেরেছি। আপনার চাচাতো ভাই ও তার সাথীবর্গকে আমরা সসম্মানে বরণ করে নিয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর সত্য ও পবিত্র রাসূল। আমি আপনার কাছে বাইয়াত হয়েছি এবং আপনার চাচাতো ভাইয়ের কাছে বাইয়াত হয়েছি। আর আমি তার হাত ধরে গোটা বিশ্ব জগতের পালন কর্তা সমীপে আমার শির আনত করে দিয়েছি।[৫৬৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদশা নাজ্জাসীর কাছে জা'ফর রা. ও তার সঙ্গী মুহাজিরদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। এ কারণে তিনি তাদেরকে আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. এর সঙ্গে দু'টি জাহাজে করে পাঠিয়ে দেন। তারা যখন এসে উপস্থিত হয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খাইবরে ছিলেন।[৫৬৫]

---

[৫৬৩] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ড. হামীদুল্লাহ প্রণীত 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দিগী' (উর্দু) পৃষ্ঠা ১০৮-১১৪, ১২১-১৩১।

[৫৬৪] যাদুল মাআদ ৩/৬১।

[৫৬৫] ইবনে হিশাম ২/৩৫৯।

উল্লিখিত মুসলমান বাদশা নাজ্জাসী র. হিজরী নবম বর্ষের রজব মাসে তাবুক যুদ্ধের পরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের দিনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে দেন এবং তার ওপর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন।[৫৬৬] রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

তাঁর মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরেক জন বাদশা অধিষ্ঠিত হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বরাবরও একটি পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি মুসলমান হয়েছিলেন কি না তা জানা যায়নি।[৫৬৭]

দুই. মিসর রাজা মুকাওকিস বরাবর পত্র

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুকাওকিস উপাধিধারী মিসর রাজা জুরাইজ ইবনে মাত্তা[৫৬৮] বরাবর নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে কিবতী-রাজা মুকাওকিস বরাবর পত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়াতের পথে চলে। পরকথাঃ

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে নিরাপদে থাকবেন। আর আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দান করবেনঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

হে আহলে-কিতাবরা! একটি বিষয়ের দিকে এসো-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত। [সূরা আলে ইমরান : ৬৪] [৫৬৯]

---

[৫৬৬] বাদশাহ নাজ্জাসী র. এর ওপর গায়েবানা জানাযা ছিল রাসূলে কারীম সা. এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটা ছিল তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর সে কারণেই হানাফী মাযহাব মতে, গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয নেই।

[৫৬৭] এটা কখনো আনাস রা. সূত্রে ইমাম মুসলিমের বর্ণনা থেকেও সংগ্রহ করা হয় ২/৯৯।

[৫৬৮] এটা রহমাতুল্লিল আলামীন প্রণেতা আল্লামা মনসূরপুরী র. এর মত ১/১৭৮। এর বিপরীতে ড. হামীদুল্লাহ বলেন, তার নাম ছিল বিনইয়ামীন। দেখুন 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দিগী' পৃষ্ঠা ১৪১।

[৫৬৯] ইবনুল কাইয়্যিম র. যাদুল মাআদে এ পত্রটি উল্লেখ করেছেন ৩/৬১। আর ড. হামীদুল্লাহ যে নিকট অতীতে প্রাপ্ত এ পত্রের একটি কপির কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে এর সঙ্গে সামান্য কিছু শব্দের

এ পত্রের বাহক হিসেবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোনীত করলেন সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতা' রা. কে। হাতেব রা. মুকাওকিসের দরবারে গিয়ে বললেন, আপনার আগে এখানে এমন এক ব্যক্তি ছিল তার ধারণায় সে ছিল মহান প্রভু। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাত দুই ধরা এক সঙ্গে দিয়ে দেন। প্রথমত তার দ্বারা মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেন; এরপর স্বয়ং তাকে প্রতিশোধের নিশানা বানান। সুতরাং, অন্যের করুণ দশা দেখে শিক্ষা নিন; অন্যরা যেন আপনার দশা দেখে শিক্ষা নিতে না পারে।

মুকাওকিস বলল, আমাদেরও তো একটি ধর্ম আছে। সুতরাং, এর চেয়ে ভালো ও উত্তম কোনো ধর্ম ছাড়া আমরা কিছুতেই তা ছাড়তে পারি না।

হাতেব রা. বললেন, আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি। এটা এমন এক ধর্ম যাকে আল্লাহ তাআলা আপনাদের সকল ধর্মের পরিবর্তে যথেষ্ট বানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের নবী যখন মানুষকে এ পথে দাওয়াত দিতে থাকেন তখন তাঁর ওপর সবচেয়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল কুরাইশরা; আর তাঁর জানের দুশমন ছিল ইহুদিরা। খ্রিস্টানরা ছিল তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমার জীবনের কসম! মূসা আ. এর মুখে ঈসা আ. এর আগমনের সুসংবাদ যেমন ছিল ঈসা আ. এর মুখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সুসংবাদ হুবহু অনুরূপ। একইভাবে তাওরাতের অধিকারীদেরকে যেমন ইনজীলের দিকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল আমরাও আপনাকে কুরআনে কারীমের দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই যে কওমকে সামনে পান সে কওম তার উম্মত হয়ে যায়। এবং সে কওমের ওপর অবধারিত হয়ে যায় তার আনুগত্য। সুতরাং আপনাকে এ নবী সামনে পেয়েছেন। তা ছাড়া আমরা আপনাকে দীনে ঈসায়ী থেকে বারণ করছি না; বরং আমরা আরও আপনাকে সেদিকেই নির্দেশ দিচ্ছি।

মুকাওকিস বলল, আমি এ নবীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি দেখেছি তিনি কোনো অপছন্দনীয় জিনিসের প্রতি দাওয়াত দেন না এবং কোনো পছন্দনীয় জিনিস থেকে বারণ করেন না। তিনি কোনো ভণ্ড মানুষ কিংবা ভেল্কি-বাহাদুর নন। তিনি মিথ্যুক জ্যোতিষীও নন; বরং আমি তাঁর মধ্যে নবুওতের যে নিদর্শন দেখেছি তা হলো তিনি গোপন বিষয়ের সত্য সংবাদ প্রদান করেন এবং অজানা জগতের একটি সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে দিতে পারেন। এ ব্যাপারে আমার আরও চিন্তা-ভাবনা আছে।

ভেদাভেদ রয়েছে। সেখানে রয়েছে; **আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন! আল্লাহ আপনাকে ....**। এর পাশাপাশি সেখানে **ইসমু আহলিল কাবতি** এর পরিবর্তে রয়েছে **ইসমুল কাবতি**। দেখুন রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দিগী পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭।

অতঃপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র গ্রহণ করে সসম্মানে গজ-দন্ত-নির্মিত একটি বাক্সে রেখে তাতে সীলমোহর মেরে জনৈকা দাসীর হাতে সোপর্দ করে দেন। এরপর একজন আরবি লেখতে সক্ষম লেখককে ডেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরবার পত্র লেখেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কিবতী-রাজা মুকাওকিসের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বরাবর পত্র। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরকথা:

আমি আপনার পত্র পড়েছি। তাতে আপনার সকল বক্তব্য আমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছি। আপনি যে পথের দিকে আহ্বান করেছেন আমি তাও উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমার জানা ছিল এখনো পৃথিবীতে একজন নবীর আগমন বাকি রয়ে গেছে। তবে আমার ধারণা ছিল তিনি সিরিয়া থেকে বের হবেন। আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি। কিবতীদের কাছে বড় সম্মান ও মর্যাদার পাত্র দু'জন দাসী আমি আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছি। কিছু কাপড়-চোপড়ও আমি আপনার জন্য পাঠিয়েছি। পাশাপাশি আপনার আরোহণের জন্য একটি খচ্চর হাদিয়া পাঠিয়েছি। শান্তি বর্ষিত হোক আপনার ওপর।

বাদশাহ মুকাওকিস এর চেয়ে এক কদমও আগে বাড়েনি এবং ইসলাম গ্রহণও করেনি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর প্রেরিত তার দাসীদ্বয় ছিলেন মারিয়া ও সীরীন। খচ্চরটি ছিল দুলদুল। এটা হযরত মুআবিয়া রা. এর যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল।[৫৭০] মারিয়া কিবতিয়াকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাছে রেখে দেন আর তাঁর গর্ভ থেকেই রাসূলের পুত্র ইবরাহীম জন্ম নিয়েছিলেন। আর সীরীন কিবতিয়াকে তিনি হাসসান বিন সাবেত আনসারী রা. কে দিয়ে দিয়েছিলেন।

পারস্য সম্রাট বরাবর পত্র

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাট কিসরা বরাবর নিম্নোক্ত পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য রাজ কিসরা বরাবর পত্র।

শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে হেদায়াতের পথে চলে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে এবং সাক্ষ্য দেয় যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[৫৭০] যাদুল মাআদ ৩/৬১।

সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর পথের দাওয়াত দিচ্ছি। কেননা, আমি গোটা মানব জাতির কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। যাতে করে যে জীবিত (ও জাগ্রত) তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়। আর কাফেরদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণ করুন তাহলে নিরাপদে থাকবেন। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে গোটা অগ্নিপূজক জাতির দায়ভার আপনার ঘাড়ে গিয়ে পড়বে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পত্রের বাহক হিসেবে মনোনীত করলেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রা. কে। সাহমী রা. পত্রটি বাহরাইনের রাজার হাতে তুলে দেন। কিন্তু পরবর্তী সংবাদ আর জানা যায় না যে, বাইরাইনের রাজা পত্রটি দিয়ে তার নিজস্ব কোনো লোক প্রেরণ করেছিলেন, না কি স্বয়ং আব্দুল্লাহ সাহমী রা. কে প্রেরণ করেছিলেন। সে যাই হোক, পত্রটি যখন কিসরার দরবারে পাঠ করা হলো সে রাগে ও ক্ষোভে পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিলো এবং ঘাড়ের রগ মোটা করে বলল, আমার এ বিশাল রাজ্যের এক নগণ্য প্রজা হয়ে সে আমার নামের আগে তার নিজের নাম লেখার দুঃসাহস দেখিয়েছে! আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে এ সংবাদ গিয়ে পৌঁছলে তিনি বললেন, **আল্লাহ তার রাজত্বকে টুকরো টুকরো করে দিবেন!** যেমন তিনি বলেছিলেন পরবর্তী সময়ে হুবহু তাই হয়েছিল। কিসরা ইয়েমেনে নিযুক্ত তার প্রশাসক বাযানের কাছে পত্র মারফত জানিয়ে দিলো, হিজাযের এই লোকটির কাছে দু'জন শক্তিশালী বাহাদুর পুরুষ পাঠিয়ে তাকে পাকড়াও করে আমার কাছে এনে হাযির করো! সঙ্গে সঙ্গে বাযান হুকুম তামিল নিমিত্ত তার কাছের দু'জন বীর-বাহাদুরকে মনোনীত করল। তাদের একজন ছিল রাজ্যের হিসাবরক্ষক ও ফারসী লেখক কেহেরমান বানুবিয়া আর দ্বিতীয়জন ছিল পারস্যের খর খসরূ।[৫৭১] সে তাদের কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর একটি পত্র দিয়ে পাঠায় যেন তিনি তাদের সঙ্গে কিসরার দরবারে গিয়ে উপস্থিত হন। যখন তারা মদীনায় উপস্থিত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে দেখা করল তখন তাদের একজন বলল, শাহেনশাহ কিসরার রাজা বাযানের কাছে পত্র মারফত নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি লোক পাঠিয়ে আপনাকে কিসরার দরবারে হাযির করান। আর এ উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। পাশাপাশি তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কিছুটা হুমকি-ধমকি দেওয়ার চেষ্টা করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পরের দিন আসতে বললেন।

---

[৫৭১] তারীখে ইবনে খালদূন ২/৩৭।

ঠিক এ সময়ে কিসরার নিজের ঘরে আগুন লাগে। গোটা রাজ্যে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ আর টান টান উত্তেজনা বিরাজ করে। আর এ আগুনের উৎপত্তি ছিল মূলত কায়সারের বাহিনীর সামনে তার বাহিনীর লজ্জাকর আত্মসমর্পণ। বিদ্রোহের এই দমকা হাওয়া গিয়ে কিসরার ছেলে শিরওয়াহ এর গায়েও লাগে। সে আপন পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তাকে হত্যা করে নিজেই রাজসিংহাসন দখল করে। এটা ছিল হিজরী সপ্তম বছরের[৫৭২] জুমাদাল উলার দশ তারিখ মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আগাগোড়া পুরো ঘটনা জানিয়ে দেন। ভোর হলে তিনি উভয়কে ঘটনা জানিয়ে দেন। তখন তারা বলল, হুঁশ রেখে কথাবার্তা বলছেন তো? এর চেয়ে সহজতর ব্যাপারকেও আমরা আপনার জন্য অপরাধ মনে করি। আপনার এ কথা লিখে বাদশাহকে জানিয়ে দিব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার এ কথা তোমাদের বাদশাহকে জানিয়ে দাও। আর তাকে বলে দাও, আমার দীন ও আমার রাজত্ব অতি শীঘ্রই কিসরা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে; বরং তারও আগে বেড়ে ঐ জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে উট কিংবা ঘোড়ার খুর যা অতিক্রম করতে পারে না। আর তোমরা তাকে আরও বলে দাও, যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনার রাজত্ব আপনারই থাকবে। আর আপনাকে আপনার কওমের বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে বের হয়ে বাযানের কাছে এসে তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলে। কয়েক মুহূর্ত যেতে পারল না, ঠিক তখনই পারস্য থেকে বাযানের কাছে পত্র আসে পারস্য সম্রাট কিসরার নিজ পুত্র শিরওয়াইহ এর হাতে নিহত হওয়ার সংবাদ নিয়ে। পাশাপাশি শিরওয়াইহ পত্রে বাযানকে নির্দেশ প্রদান করে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আমার পিতা তোমাকে পত্র লিখেছিল তার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় নির্দেশ আসা পর্যন্ত সবর করো এবং তাকে কোনো প্রকার বিরক্ত করো না।

আর এ ঘটনার ফলাফল স্বরূপ বাযান ও ইয়েমেনে বসবাসরত তার কাছের পারসিক বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনরা ইসলাম গ্রহণ করে।[৫৭৩]

চার. রোম সম্রাট কায়সার বরাবর পত্র

ইমাম বুখারী র.- একটি দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বরাবর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রেরিত পত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। সে পত্রের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ:

---

[৫৭২] ফাতহুল বারী ৮/১২৭। তারীখে ইবনে খালদূন ২/৩৭।

[৫৭৩] খিযরী প্রণীত মুহযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ ১/১৪৭। ফাতহুল বারী ৮/১২৭, ১২৮।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র।

শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে হেদায়াতের পথে চলে। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দু'বার প্রতিদান দিবেন। আর যদি আপনি মুখ ফিরিয়ে নেন তবে আপনার প্রজাদের দায়ভারও আপনার কাঁধে বর্তাবে।

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

হে আহলে-কিতাবগণ। একটি বিষয়ের দিকে এসো-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান- যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আমাদের কেউ কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাকো আমরা তো অনুগত। [সূরা আলে ইমরান : ৬৪] [৫৭৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পত্রের বাহক হিসেবে দাহইয়া ইবনে খলীফা কালবী রা. কে মনোনীত করেন। অতঃপর তাকে তিনি এ পত্র বুসরার-রাজার হাতে তুলে দিতে বলেন, যাতে করে এটা তার মারফত রোম সম্রাটের কাছে গিয়ে পৌঁছে। ইবনে আব্বাস সূত্রে ইমাম বুখারী রহ.বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান তাকে বলেছেন যে, এক বার সিরিয়াগামী কোনো এক বাণিজ্যিক কাফেলায় থাকাকালে সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে রাজ দরবারে ডেকে পাঠান। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরের ঘটনা। তারা ইলিয়াতে (বাইতুল মুকাদ্দাস) সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৫৭৫] হিরাক্লিয়াস যখন তাকে রাজ দরবারে

---

[৫৭৪] সহীহ বুখারী ১/৪, ৫।

[৫৭৫] রোম সম্রাট কায়সার তখন পারস্যকে চূড়ান্ত পরাজয়ের বিস্বাদ আস্বাদন করাতে পেরে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য হিমসের- বাইতুল মুকাদ্দাস- ইলিয়াতে ছিলেন। (দেখুন সহীহ মুসলিম ২/৯৯) পারস্যরা তখন কিসরা আবরুঈযকে হত্যা করেছিল এবং তারা ইতঃপূর্বে তাদের দ্বারা দখলকৃত রোমের সমস্ত অঞ্চলগুলো ছেড়ে দেওয়ার ওপর সন্ধি করেছিল। পারস্যরা তাদেরকে সেই ক্রশকাষ্ঠ ফিরিয়ে দিয়েছিল তাদের ধারণা মতে যেই ক্রশকাষ্ঠে ঈসা আ. প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এ কারণে কায়সার ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে তথা সপ্তম হিজরীতে সেই ক্রশকাষ্ঠ নির্ধারিত স্থানে স্থাপন এবং এই অবিশ্বাস্য সফলতা ও বিজয়ের জন্য আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ইলিয়া তথা বাইতুল মুকাদ্দাসে আগমন করেছিলেন।

ডেকে পাঠালেন তখন তাঁর আশপাশে দরবারের বড় বড় কর্মকর্তা কর্মচারী আর সভাষদগণ উপস্থিত ছিলেন। ঠিক এমন অবস্থায় তিনি তাদেরকে ও একজন দোভাষীকে ডেকে বললেন, যে লোকটি নিজেকে নবী দাবি করে বংশীয় সূত্রে তোমাদের মধ্যে তার সবচেয়ে কাছের লোক কে আছে? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললাম আমি তার সবচেয়ে কাছের লোক। হিরাক্লিয়াস বললেন, তাকে আমার আরও কাছে নিয়ে এসো! আর তার সঙ্গীদেরকেও কাছাকাছি এনে তার পেছনে বসিয়ে দাও! অতঃপর সম্রাট দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি তাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করব। যদি সে আমাকে মিথ্যা বলে তবে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরিয়ে দিবে। আবু সুফিয়ান রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যদি মিথ্যুক সাব্যস্ত হওয়ার লজ্জা না থাকত তবে আমি নিশ্চিত সেদিন তার সঙ্গে মিথ্যা বলতাম।

আবু সুফিয়ান বলেন, সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশীয় মর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি উচ্চ বংশীয় মর্যাদাসম্পন্ন।

হিরাক্লিয়াস : তোমাদের মধ্যে আর কেউ এ দাবি কখনো করেছে?

আবু সুফিয়ান : না।

হিরাক্লিয়াস : তোমাদের সম্ভ্রান্তরা তাকে অনুসরণ করে, না কি দুর্বলরা?

আবু সুফিয়ান : দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা।

হিরাক্লিয়াস : তাদের সংখ্যা দিন দিন কমছে, না বাড়ছে?

আবু সুফিয়ান : বাড়ছে।

হিরাক্লিয়াস : এ ধর্মে দাখিল হওয়ার পর বিরক্তিভরে কেউ আবার আগের ধর্মে ফিরে আসছে?

আবু সুফিয়ান : না।

হিরাক্লিয়াস : এ দাবির পূর্বে তোমরা তাকে কখনো মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করেছ?

আবু সুফিয়ান : না।

হিরাক্লিয়াস : তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?

আবু সুফিয়ান : না। কিন্তু বর্তমানে তাঁর ও আমাদের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তির মেয়াদ চলছে। জানি না শেষ পর্যন্ত তিনি কী করেন? আবু সুফিয়ানের বর্ণনা, এ বাক্যটি ছাড়া অন্য কোনো কথা তার মধ্যে ঢুকানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

হিরাক্লিয়াস : তাঁর সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : জ্বী, হাঁ।

হিরাক্লিয়াস : সে সব যুদ্ধের ফলাফল কী হয়েছে?

আবু সুফিয়ান : জয়-পরাজয় সমান সমান। কখনো আমরা জয়ী হয়েছি আবার কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন।

হিরাক্লিয়াস : তিনি তোমাদেরকে কীসের আদেশ দেন?

আবু সুফিয়ান : তিনি বলেন, **তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো! তার সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করো না! তোমাদের বাপ-দাদারা যা বলে তা পরিত্যাগ করো!** এ ছাড়াও তিনি আমাদেরকে নামায, দান-খয়রাত, শুচি-শুভ্রতা আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস তখন দোভাষীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি তাকে বলে দাও যে, আমি তোমাকে তাঁর বংশীয় মর্যাদার কথা জিজ্ঞাসা করেছি। তুমি জবাবে বলেছ : তিনি উচ্চ বংশীয় মর্যাদা সম্পন্ন। আর আল্লাহর রাসূলগণ এমনই পুরো কওমের সবচেয়ে উচ্চ বংশে প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, ইতঃপূর্বে তোমাদের কেউ এ দাবি কখনো করেছে কি না? তুমি বলেছ : না। আমি বলব, যদি তাঁর পূর্বে অন্য কেউ এ দাবি করত, তবে আমি বলতাম এ লোক এমন এক দাবি নিয়ে এসেছে, তাঁর পূর্বে যে দাবি করা হয়েছে। অতঃপর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাঁর বংশের কেউ ইতঃপূর্বে রাজত্ব করেছে কি না? তুমি জবাব দিয়েছ : না। আমি বলব, যদি তার বাপদাদার কেউ রাজা-বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম : তিনি তাঁর বাপ-দাদার হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করার মিশন নিয়ে নেমেছেন। এরপর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি, এ দাবির পূর্বে তোমরা কোনোদিন তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছ কি না? তুমি বলেছ : না। এতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছে, যে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলেন না, তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি,সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থরা তাকে অনুসরণ করে না কি দুর্বলরা? তুমি জবাবে বলেছ : দুর্বলরা। আর রাসূলগণের অনুসারীরা সকল কালে দুর্বলই হয়ে থাকে। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, দিনে দিনে তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? তুমি বলেছ : বাড়ছে। এটাই হলো ঈমানের আসল রূপ, যতক্ষণ না তা পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কেউ তাঁর ধর্মে দাখিল হওয়ার পর বিরক্তিভরে আবার আগের ধর্মে ফিরে যায় কি না? তুমি জবাব দিয়েছ : না। মনের মণিকোঠায় যখন ঈমান প্রবেশ করে হৃদয়ের সঙ্গে একান্ত মিতালি গড়ে তোলে তখন ঈমানের অবস্থা এমনই হয়ে যায়। অতঃপর আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেন কি না? এর জবাবেও তুমি বলেছ : না। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণ এমনই হয়ে থাকেন। তারা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি কীসের আদেশ

দেন? তুমি বলেছ : তিনি এ মর্মে আদেশ দেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তার সঙ্গে কোনা কিছু শরীক করো না। আর তিনি মূর্তি পূজা থেকে নিষেধ করেন। তিনি নামায, দান-সদক্বা আর সংযমের আদেশ দেন। তোমার বক্তব্য যদি সত্য হয়ে থাকে তবে আমি দাঁড়ানোর মতো জায়গাও পাব না। আমার দু'পায়ের নীচের মাটিও তার মালিকানায় চলে যাবে। আমারও আগ থেকে ধারণা ছিল এখন পৃথিবীতে একজন নবীর আগমন ঘটবে। কিন্তু তাঁর আগমন যে তোমাদের মধ্য থেকে হবে এটা আমার জানা ছিল না। যদি আমার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকত যে, আমি তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারব, তবে আমি তাঁর কাছে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতাম। আর যদি আমি এখন তাঁর কাছে থাকতাম তবে আমি তাঁর চরণ দু'খানি ধুয়ে দিতাম।

এরপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রখানা নিয়ে পাঠ করলেন। পত্র পাঠ শেষ হলে দরবারে উচ্চ কোলাহল আর হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে দরবারের বাইরে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলে আমাদেরকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়। আবু সুফিয়ান বলেন, যখন আমাদেরকে বাইরে বের করে দেওয়া হলো তখন আমি আপন সঙ্গীদেরকে বললাম, আবু কাবশার[৫৭৬] ছেলের কদম দারুণ মজবুত হয়ে গেছে। বনু আসফার[৫৭৭] আজ তাকে ভয় পায়। আর তখন থেকেই আমার মনের মাঝে সুদৃঢ় বিশ্বাস জমে গিয়েছিল যে, বিজয় বরাবরই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনের পদ চুম্বন করতে থাকবে। অতঃপর এক পর্যায়ে আল্লাহ আমার নিজের মধ্যে ইসলামের বুঝ দান করেন।[৫৭৮]

এই ছিল আবু সুফিয়ানের দেখা কায়সারের ওপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রের প্রভাব। এর প্রভাবের আরও আলামত ছিল এই যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রবাহক দাহইয়া ইবনে খলীফা কালবী রা. কে বিভিন্ন মালামাল ও কাপড়-চোপড় হাদিয়া দেন। ফেরার পথে দাহইয়া কালবী রা. যখন হিসমা নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন জুযাম নামক এক গোত্রের লোকেরা তার ওপর হামলা চালিয়ে সবকিছু নিয়ে যায়।

---

[৫৭৬] আবু কাবশা ছিলেন ওহাব ইবনে আবদে মানাফের মাতামহ ওজয ইবনে গালিব খুযাঈ। আর ওহাব ছিলেন রাসূলে কারীম সা. এর মাতামহ। আবু কাবশা আগে মুশরিক ছিলেন। পরে তিনি সিরিয়ায় গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। যখন রাসূলে কারীম সা. কুরাইশ ধর্মের বিরোধিতা করলেন এবং আল্লাহর তাওহীদের ধর্ম নিয়ে এলেন তখন তারা তাঁর ধর্মকে আবু কাবশার সঙ্গে তুলনা দিতে লাগল এবং সহজে বোঝানোর জন্য তার দিকে নিসবত করতে শুরু করল (বাইহাক্বী প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ১/৮২, ৮৩। আবু হাতিম প্রণীত আস সীরাতুন নববিয়্যাহ পৃষ্ঠা ৪৪)

[৫৭৭] রোমানদের রাজা-বাদশাহদেরকে সেকালে বনু আসফার বলা হতো।

[৫৭৮] সহীহ বুখারী ১/4। সহীহ মুসলিম ১/৯৭-৯৯।

মদীনায় উপস্থিত হয়ে নিজ ঘরে যাওয়ার আগে তিনি সোজা দরবারে রিসালতে গিয়ে হাযির হন এবং তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলেন। ঘটনা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ শ' সাহাবীর একটি দল যায়েদ বিন হারেসার নেতৃত্বে হিসমা অভিমুখে পাঠিয়ে দেন। হিসমা ছিল ওয়াদিল কুরার পশ্চাদে। হিসমায় পৌঁছে যায়দ বিন হারেসা রা. জুযামের ওপর আক্রমণ করে গণহত্যা চালান। এভাবে তাদেরকে পাইকারী কচুকাটা করে তাদের গৃহপালিত পশু আর নারীদেরকে হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ছিল এক হাজার উট ও পাঁচ হাজার বকরী। আর বন্দীদের মধ্যে ছিল এক শ' নারী ও শিশু।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও বনু জুযামের মাঝে আগ থেকেই মৈত্রীচুক্তি চলে আসছিল। এ কারণে, সে কবীলার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যায়দ ইবনে রেফাআ জুযামী দরবারে রিসালতে ছুটে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সে বিভিন্ন অভিযোগ-আপত্তি পেশ করে। ইতোমধ্যে সে ও তার কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তারা দাহইয়া রা.কে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল যখন তার ওপর আক্রমণ করা হয়েছিল। এ কারণে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অভিযোগ কবুল করে নেন এবং চতুষ্পদ জন্তু ও বন্দীদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ উল্লিখিত সারিয়াকে হুদাইবিয়ার আগের ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু স্পষ্টতই এটা একটা স্থূল ভ্রান্তি। কেননা, রোম সম্রাট কায়সারের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল নিশ্চিতভাবেই হুদাইবিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরে। এ কারণে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন, সন্দেহাতীতভাবে এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা।[৫৭৯]

পাঁচ. মুনযির ইবনে সাওয়া বরাবর পত্র

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহরাইন শাসক মুনযির ইবনে সাবী বরাবর ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। সাহাবী আলা বিন হাযরমী রা. কে এ পত্রের বাহক মনোনীত করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্রের জবাবে মুনযির লিখে পাঠান:

পরকথা : হে আল্লাহর রাসূল! আমি গোটা বাহরাইনের অধিবাসীদেরকে আপনার পত্র পড়ে শুনিয়েছি। তাদের মধ্য থেকে অনেকে ইসলামকে ভালোবেসে সানন্দচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে অপছন্দ করে বিরত

---

[৫৭৯] দেখুন যাদুল মাআদ ২/১২২। তালকীহু ফুহুমি আহলিল আসারির পাদটীকা পৃষ্ঠা ২৯।

থেকেছে। তাছাড়া আমার এ অঞ্চলে অগ্নিপূজক ও ইহুদি বসতি রয়েছে। এ কারণে সে ব্যাপারে আপনার মতামত আমাকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনযিরকে লিখে পাঠালেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুনযির ইবনে সাওয়া বরাবর পত্র।

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার কাছে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। পরকথা:

আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। স্মরণ রাখবেন, যে কল্যাণ কামনা করে সে নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করে। আর যে আমার দূতগণকে মানে এবং তাদের নির্দেশের অনুসরণ করে সে আমাকে অনুসরণ করল। আর যে তাদের কল্যাণকামিতা করল সে আমারই কল্যাণকামিতা করল। আমার দূত আপনার খুব প্রশংসা করেছে। আর সে কারণে আমি আপনার কওমের ব্যাপারে আপনার সুপারিশ কবুল করে নিয়েছি। সুতরাং, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে ইসলামের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেন। আমি অপরাধীদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। সুতরাং আপনি তাদের থেকে তা কবুল করে নিন। আর আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার পদ থেকে আপনাকে চ্যুত করা হবে না। আর যে ইহুদি কিংবা অগ্নিপূজা ধর্মের ওপর অটল থাকতে চায় তাকে জিযিয়া (অমুসলিম প্রদত্ত ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ কর) প্রদান করতে হবে।[৫৮০]

ছয়. ইয়ামামা শাসক হাওযা ইবনে আলী বরাবর পত্র

ইয়ামামা শাসক হাওযা ইবনে আলী বরাবর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র লেখেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওযা ইবনে আলী বরাবর পত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর, যে হেদায়াতের পথে চলে। জেনে রাখুন! আমার দীন শীঘ্রই সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যেখানে উট কিংবা ঘোড়ার ক্ষুর পৌঁছতে পারে। সুতরাং, ইসলাম গ্রহণ করে নিন নিরাপদে থাকবেন। আপনার রাজত্ব আপনারই থাকবে।

৫৮০ যাদুল মাআদ ৩/৬১,৬২। আর ড. হামীদুল্লাহ উল্লিখিত প্রত্রটির মাঝে কেবল একটি শব্দের পার্থক্য রয়েছে। সেখানে লা ইলাহা ইল্লা হু এর পরিবর্তে রয়েছে লা ইলাহা গাইরুহু।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালীত ইবনে আমর আমেরী রা. কে এ পত্রের বাহক হিসেবে মনোনীত করলেন। সালীত যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীলমোহরকৃত এ পত্র নিয়ে হাওযার দরবারে উপস্থিত হলেন তখন হাওযা তাকে রাজকীয় অতিথির সম্মান দিয়ে সম্ভাষিত করলেন। সালীত তাকে পত্র পাঠ করে শুনালেন। হাওযা ডানে বামে না গিয়ে মধ্যম পন্থায় জবাব দিলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর লিখলেন:

আপনি যে পথে দাওয়াত দিচ্ছেন তা ভারি সুন্দর ও প্রশংসনীয়! আরবরা আমাদের বেজায় ভয় পায় তাই আপনি কিছু কাজ আমার যিম্মাদারিতে দিয়ে দিন, আমি আপনার অনুসরণ করব। এরপর তিনি সালীতকে কিছু উপঢৌকন দিলেন এবং হিজরের রেশমী কাপড় হাদিয়া দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সালীত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তার পত্র পাঠ করে শুনালেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পত্র পাঠ শেষ হলে বললেন, **সে যদি এক টুকরো মাটিও আমার নিকট দাবি করে আমি তাকে তা দিব না। সে নিজেও ধ্বংস হবে আর যা তার হাতে আছে তাও ধ্বংস হয়ে যাবে।** মক্কা বিজয় শেষে মদীনায় ফিরে আসার পরে জিবরাঈল আ. হাওযার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **শুনে রাখো! ইয়ামামা থেকে শীঘ্রই এক কায্যাব বের হবে; আমার পরে যাকে হত্যা করা হবে!।** তখন একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে কে হত্যা করবে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, **তুমি ও তোমার সাথীবর্গ।** পরবর্তী সময়ে তা-ই হয়েছিল।[৫৮১]

সাত. দামেশক শাসক হারিস ইবনে আবী শামির গাসসানী বরাবর পত্র

হারিস গাস্সানী বরাবর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লিখে পাঠান: **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।**

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনে আবী শামির বরাবর পত্র। শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়াতের পথে চলে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও সত্যায়ন করে। আর আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি

[৫৮১] যাদুল মাআদ ৩/৬৩।

এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনুন যার কোনো শরীক নেই। আপনার রাজত্ব আপনারই থাকবে।

দরবারে রিসালতের এ পত্রের বাহক মনোনীত হলেন বনু আসাদ ইবনে খুযাইমার শুজা' ইবনে ওহাব রা.। হারিস গাস্সানীর হাতে পত্র তুলে দেওয়া হলে সে তা দূরে ছুঁড়ে ফেলে এবং দম্ভভরে বলে, কে আমার রাজত্ব আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে? আমি এখনই তার বিরুদ্ধে বের হবো। এভাবে সে ইসলাম গ্রহণ হতে বিরত থাকে।[৫৮২] অতঃপর রোম সম্রাট কায়সারের দরবারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার অনুমতি চায়। কিন্তু কায়সার তাকে তার এ সংকল্প থেকে বিরত রাখে। হারিস শুজা' ইবনে ওহাব কে কাপড়-চোপড় ও খরচাদি দিয়ে ভালোভাবে বিদায় করে দেয়।

আট. ওমান রাজা বরবার পত্র

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমান রাজা জায়ফর ইবনে জুলান্দী ও তার ভাই আব্দ ইবনে জুলান্দী বরাবর একটি পত্র লেখেন। এর মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে জায়ফর ইবনে জুলান্দী ও তার ভাই আব্দ ইবনে জুলান্দী বরাবর পত্র।

শান্তি বর্ষিত হোক তার ওপর যে হেদায়াতের পথে চলে।

পরকথাঃ

আমি আপনাদের দু'জনকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। আমি গোটা বিশ্ব মানব জাতির নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। যাতে করে জীবিতদেরকে আমি ভীতিপ্রদর্শন করি, আর কাফেরদের ওপর আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। যদি আপনারা ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আপনাদের রাজত্ব আপনাদেরই থাকবে। আর যদি আপনারা ইসলামের স্বীকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তবে আপনাদের রাজত্ব শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমার অশ্বারোহী বাহিনী আপনাদের অঙ্গন মাড়াবে। আপনাদের জাগতিক সাম্রাজ্যের ওপর আমার নবুওতের সাম্রাজ্য বিজয় লাভ করবে।

এ পত্রের বাহক মনোনীত করলেন আমর ইবনুল আস রা. কে। আমর ইবনুল আস রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে ওমানে চলে আসি । সেখানে উপস্থিত হয়ে আমি

---

[৫৮২] যাদুল মাআদ ৩/৬৩। খিযরী প্রণীত মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ ১/১৪৬।

পত্র নিয়ে সর্বপ্রথম আব্দ এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ দু'ভাইয়ের মধ্যে সে ছিল অধিকতর দূরদর্শী ও বিনম্র চরিত্রের অধিকারী। আব্দ এর কাছে গিয়ে আমি বললাম, আমি আল্লাহর রাসূলের রাসূল (দূত) হয়ে আপনার ও আপনার ভাইয়ের কাছে এসেছি। আব্দ বললেন, বয়স ও রাজত্বের বিচারে আমার ভাই আমার অগ্রবর্তী। আমি বরং তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই তিনি তোমার পত্রটি পড়বেন। অতঃপর আব্দ বললেন, তুমি কীসের দাওয়াত নিয়ে এসেছ? আমি বললাম, আমি দাওয়াত এক আল্লাহর দিকে দিচ্ছি, যার কোনো শরীক নেই। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা পরিত্যাগ করবেন এবং সাক্ষ্য দিবেন : নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আব্দ বললেন, আমর! তুমি নিজেও তো তোমার গোত্রপতির সন্তান। তোমার আব্বাজান কোন্ পথ অবলম্বন করেছেন? কেননা এ ক্ষেত্রে তিনি তো আমাদের আদর্শ। আমি বললাম, তিনি ইন্তেকাল করেছেন; কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান এনে মরতে পারেননি। কিন্তু আমার হৃদয়ের একান্ত তামান্না ছিল তিনি ইসলাম গ্রহণ করুন এবং তাকে সত্যায়ন করুন। আগে আমিও ছিলাম তারই মতানুসারী কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাআলা আমাকে ইসলামের পথে হেদায়াত দান করেছেন।

আব্দ : তুমি কবে ইসলাম গ্রহণ করেছ?

আমর : কিছুদিন আগে।

আব্দ : কোথায় বসে ইসলাম গ্রহণ করেছ?

আমর : নাজ্জাসীর দরবারে। পাশাপাশি আমি তাকে বললাম, খোদ নাজ্জাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

আব্দ : প্রজাগণ তাঁর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছে?

আমর : তারাও তাঁর মত ও পথ অনুসরণ করেছে।

আব্দ : ধর্মীয় পণ্ডিত আর রাহেবগণও কী তাকে অনুসরণ করেছেন?

আমর : হাঁ।

আব্দ : আমর! হুঁশ রেখে কথা বলছ তো? মিথ্যার চেয়ে অধিক লজ্জা ও অপমানকর আর কোনো বস্তু নেই।

আমর : আমি একটি শব্দও মিথ্যা বলিনি। আর আমাদের দীনে এটাকে আমরা হালালও মনে করি না।

আব্দ : সম্রাট হিরাক্লিয়াস কি নাজ্জাসীর ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছেন?

আমর : হাঁ।

আব্দ : কীভাবে বুঝালে?

আমর : নাজ্জাসী আগে সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে কর প্রদান করতেন। এরপর যখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্যায়ন করেন তখন বলতে শুরু করেন, আল্লাহর কসম! আজ থেকে কেউ যদি (কর বাবদ) একটি দিরহামও আমার নিকট দাবি করে আমি তাকে দিব না। হিরাক্লিয়াসের দরবারে নাজ্জাসীর এ উক্তি সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়। তখন হিরাক্লিয়াসের ভাই ইয়ান্নাক তাকে বলে ওঠে, আপনার এক গোলাম আপনাকে কর দিবে না; আপনার ধর্ম ছেড়ে দিয়ে অন্য এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করবে আর এ অবস্থাতেই আপনি তাকে ছেড়ে দিবেন? হিরাক্লিয়াস বললেন, সে একটি ধর্মকে ভালোবেসে তা গ্রহণ করে নিয়েছে তাতে আমার কী আসে যায়? আল্লাহর কসম! যদি রাজত্ব নিয়ে আমার শঙ্কা না থাকত তবে আমিও তো সেই কাজ করে বসতাম যা সে করেছে!

আব্দ : আমর হুঁশ রেখে কথা বলো!

আমর : আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে সত্য বলেছি।

আব্দ : এবার আমাকে বলো তিনি কোন্ কোন্ কাজের আদেশ দেন আর কোন্ কোন্ কাজ থেকে বারণ করেন?

আমর : তিনি আল্লাহর আনুগত্যের আদেশ দেন আর তার নাফারমানি থেকে বারণ করেন। তিনি সৎকাজ করা, আর আত্মীয়তার বাঁধন ধরে রাখার আদেশ দেন। যুলুম আর অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, যিনা-ব্যভিচার, মদ্যপান ও পাথরপূজা, মূর্তি পূজা ও ক্রুশকাষ্ঠপূজা ইত্যাদি থেকে নিষেধ করেন।

আব্দ : এ তো ভারি সুন্দর পথের দাওয়াত! যদি আমার ভাই আমার অনুসরণ করত তবে আমি এখনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর ঈমান আনতাম এবং তাকে সত্যায়ন করতাম। কিন্তু রাজত্বের প্রতি আমার ভাইয়ের খানিকটা বেশি দুর্বলতা রয়েছে। তাই মনে হয় না, সে রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে যাবে।

আমর : যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার রাজত্বে বহাল রাখবেন। তখন তিনি ধনীদের কাছ থেকে ধন-সম্পদ উসূল করে গরীবদের পেছনে ব্যয় করবেন।

আব্দ : এটা তো ভারি সুন্দর ব্যবস্থা! বাকি সদক্বা কী?

আমর বলেন, তখন আমি তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ধন-সম্পদের ওপর যে সদক্বা ফরয করা হয়েছে তা খুলে বললাম। এক পর্যায়ে আমি উটের বর্ণনা পর্যন্ত চলে এলাম। তখন তিনি বললেন, আমর! আমাদের ঐ সকল প্রাণীর ওপরেও কি সদক্বা রয়েছে যেগুলি নিজে নিজে বিচরণ করে ও পানি পান করে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি

বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না আমার জনগণ তাদের দেশের বিস্তৃতি ও সংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও এটা মেনে নিবে!

আমর ইবনুল আস রা. এর বর্ণনা : আমি তার দরজায় কয়েকদিন অবস্থান করলাম। এ সময়ে তিনি আপন ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার সঙ্গে আলোচিত সব কথা খুলে বলতেন। এরপর একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালে আমি তার কাছে গেলাম। দরবারীরা আমার বাহু চেপে ধরলে তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও! এ কথায় তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। এরপর আমি বসতে চাইলে তারা আমাকে বসতে দিলো না। আমি চোখ তুলে বাদশাহর দিকে তাকালে তিনি বললেন, নিজের বক্তব্য পেশ করো! আমি তার কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মোহরাঙ্কিত পত্র পেশ করলাম। তিনি তার মোহর ভেঙে পত্রটি খুলে শেষ পর্যন্ত পড়লেন। এরপর তিনি তার ভাইয়ের হাতে পত্রটি দিলে তিনিও পুরো পত্র পড়ে নেন। কিন্তু তার ভাই ছিল তার চেয়ে খানিকটা বেশি প্রভাবিত ও বিনম্র। অতঃপর বাদশাহ বললেন, কুরাইশদের অবস্থা কি বললে না তো? আমি বললাম, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কিংবা তরবারির জোরে যে কোনোভাবে তারা তার অনুসরণ করেছে। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর সঙ্গে আর কারা আছে? আমি বললাম, সকল লোক তাঁর সঙ্গে আছে। মানুষ দলে দলে ইসলামের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। অন্য সবকিছু এর বিপরীতে তুচ্ছ জ্ঞান করছে। আল্লাহর হেদায়াত পাওয়ার পরে তাদের নিজেদেরই উপলব্ধি হয়েছে যে, এতদিন তারা গোমরাহী আর ভ্রষ্টতার পঙ্কিলতায় ডুবে ছিল। আমার মনে হয় না কেবল আপনারা ব্যতীত এ অঞ্চলে আর কেউ এতটা সংকীর্ণ প্রান্তরে অসহায় হয়ে পড়ে আছেন? আজ যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর আনুগত্য না করেন তবে তাঁর অশ্ব আপনাকে দলিত-মথিত করবে আর আপনার সুরম্য প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। সুতরাং, ইসলাম গ্রহণ করুন নিরাপদে থাকবেন। আপনাকেই আপনার জাতির নেতৃত্ব দেওয়া হবে। আপনার রাজ্যে কোনো অশ্বারোহী কিংবা পদাতিক বাহিনী আক্রমণের সাহস পাবে না। বাদশাহ বললেন, আজকের মতো এখানেই থাক। আগামী কাল তুমি আবার এসো!

এরপর আমি তার ভাইয়ের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, আমর! যদি রাজত্বের লোভ তার ওপর জেঁকে না বসে তবে নিশ্চিত সে ইসলাম গ্রহণ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন আমি আবার বাদশাহর কাছে যাই কিন্তু তিনি দরবারে ঢুকতে দিতে অস্বীকৃতি জানান। তখন আমি তার ভাইয়ের কাছে ফিরে আসি। তাকে সবকিছু খুলে বলি। তখন তিনি আমাকে তার দরবারে নিয়ে যান। বাদশাহ এবার আমাকে জানালেন, তুমি যে পথে আমাকে দাওয়াত দিয়েছ সে সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। আমি দেখেছি, যদি আমি আমার রাজত্ব এমন এক

ব্যক্তির হাতে তুলে দিই, যার ঘোড়ার ক্ষুর কোনদিন এ ভূখণ্ডের ধূলি উড়াতে পারবে না। তবে তো আমি আরবের সবচেয়ে দুর্বল ও কমযোর সাব্যস্ত হবো। আর যদি তার অশ্বারোহী বাহিনী কোনোদিন এখানে এসেও পড়ে, সেদিন সে এতটা বিষম যুদ্ধের সম্মুখীন হবে, যা জনমেও সে দেখেনি। আমি তাকে জানালাম, তাহলে আগামী কাল ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

যখন আমার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হলেন, তখন একান্তে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। তাকে তিনি বললেন, এই নবী যে সকল প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করেছেন, সে বিচারে আমরা কিছুই নই। আর তিনি যার কাছেই পত্র প্রেরণ করেছেন সে-ই তাঁর দাওয়াত কবুল করে নিয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় দিন ভোরের সূর্য উঠলে আমাকে দরবারে ডেকে পাঠানো হলো। এরপর বাদশাহ ও বাদশাহর ভাই উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওত ও রিসালতের স্বীকৃতি দিলেন। সদক্বা উসূল করা ও মানুষের মাঝে ফয়সালার ক্ষেত্রে তারা আমাকে আযাদী ও স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন। যারা আমার বিরোধিতা করেছে, তারা তাদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।[৫৮৩]

উল্লিখিত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের আগ-পরের ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টি দিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, তাদের কাছে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল সকলের পরে। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে, এটা ছিল মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা।

এভাবে এ সকল পত্রের মাধ্যমে দূর পৃথিবীর বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহর কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতী পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলেন। ফলাফলে কেউ কেউ ঈমান এনেছিল আবার কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু নিশ্চিত সফলতা যতটুকু এসেছিল তা হলো: গোটা পৃথিবীর সকলে তাঁর শাশ্বত মিশনের কথা জানতে পেরেছিল। দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর শহর নগরের অলিতে গলিতে ইসলামের আলোচনা ও চর্চার এক নয়া যমানার উদ্বোধন হয়েছিল।

---

[৫৮৩] যাদুল মাআদ ৩/৬২,৬৩।

হুদাইবিয়ার সন্ধি-পরবর্তী সামরিক পদক্ষেপ

গাযওয়ায়ে গাবা বা গাযওয়ায়ে যী কারাদ

এটা ছিল বনু ফাযারার একটি ছোট দলের বিরুদ্ধে পশ্চাদ্ধাবনমূলক অভিযান। নতুবা এটা কোনো স্বতন্ত্র গাযওয়া ছিল না। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চতুষ্পদ জন্তুর ওপর হামলা চালিয়ে ছিল।

হুদাইবিয়ার পরে খাইবরের আগে এটাই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বপ্রথম গাযওয়া। ইমাম বুখারী র. একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে রূপ দান করে লেখেন, এটা ছিল গাযওয়ায়ে খাইবরের তিন দিন আগের ঘটনা। ইমাম মুসলিমও রহ. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. এর হাদীসের বরাত দিয়ে এ মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সীরাত ঐতিহাসিকের নিকট এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির আগের ঘটনা। এতকিছুর পরেও সহীহ বুখারীর বর্ণনাই অধিকতর বিশুদ্ধ।[৫৮৪]

এ গাযওয়ার মূল নায়ক স্বয়ং সালামা ইবনুল আকওয়া রা.এর মুখের বর্ণনা : রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন সওয়ারীর উট নিজের গোলাম রাবাহ এর সঙ্গে বিচরণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমিও সেদিন আবু তালহার একটি ঘোড়া নিয়ে তার সঙ্গে ছিলাম। শান্ত ও সুন্দর সকালটিতে হঠাৎ আমাদের ওপর বিপদ চড়াও হলো। দেখলাম আব্দুর রহমান ফাযারী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সওয়ারী উটের ওপর আক্রমণ করে রাখালকে হত্যা করে সবগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছে। আমি ডাক দিলাম রাবাহ! এ ঘোড়াটি আবু তালহার কাছে পৌছে দাও! আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দ্রুত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করো! এরপর আমি নিজেও একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে মদীনার দিকে মুখ করে উচ্চস্বরে তিন বার ডাক দিলাম: ইয়া সাবাহাহ (হায় প্রাত-আক্রমণ)! এরপর আমি তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম। আমার মুখে তখন ঝড় তুলেছিল এই কবিতাটি:

خُذْهَا أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ......وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ،

---

[৫৮৪] দেখুন সহীহ বুখারী: গাযওয়ায়ে যাতু করদ অধ্যায় ২/৬০৩। সহীহ মুসলিম: গাযওয়ায়ে যী করদ অধ্যায় ২/১১৩-১১৫। ফাতহুল বারী ৭/৪৬০, ৪৬১, ৪৬৩। যাদুল মাআদ ২/১২০। এই গাযওয়া যে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে সংঘটিত হয়েছিল এর আরেকটি প্রমাণ হলো মুসলিম শরীফে আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীস: কিতাবুল হজ্জ ২/১০০১, হাদীস নং ১৩৭৪/৪৭৫।

'আমি আকওয়ার ছেলে! আজ হলো দুগ্ধ পানের দিন!! (অর্থাৎ, আজকেই জানা যাবে কে তার মায়ের দুধ কতটা খেয়েছে!)

এভাবে আমি নিরবচ্ছিন্ন তীর বৃষ্টি চালাতে লাগলাম আর তাতে তারা আহত হতে লাগল। তাদের পক্ষ থেকে যখনই কোনো শাহসওয়ার আমার দিকে ছুটে আসত আমি কোনো গাছের আবডালে লুকিয়ে পড়ে সেখান থেকে তীর মেরে তাকে যখমী করে ফেলতাম। এরপর তারা এক সংকীর্ণ পাহাড়ের মাঝখানে প্রবেশ করলে আমি সে পাহাড়ের ওপরে উঠে তাদের ওপর তীর ও পাথর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এভাবে তাদের পিছু নিতে নিতে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তাআলা যতগুলি সওয়ারী উট দিয়েছিলেন সবগুলিকে পেছনে ফেলে রেখে এলাম। এভাবে দুশমনরা আমার ও সেগুলির মাঝ থেকে সরে গেল। তারপরেও আমি তাদের পিছু ছাড়লাম না। আমি তীর বৃষ্টি অব্যাহত রাখলাম। এ কারণে হালকা হয়ে ছুটার জন্য তারা একে একে ত্রিশটির বেশি চাদর ও ত্রিশটি নেযা ফেলে রেখে গেল। তাদের ফেলে যাওয়া সবকিছুর ওপরই আমি পাথর দ্বারা একটু চিহ্ন দিয়ে রাখতাম, যাতে করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম তা দেখে চিনতে পারেন। এরপর তারা একটি উপত্যকার সংকীর্ণ ঘাঁটিতে ঢুকে দুপুরের আহার করতে বসল। আমিও তার সানুদেশে গিয়ে বসলাম। তখন তাদের মধ্য থেকে চারজন লোক আমার দিকে তেড়ে এলো। আমি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললাম, তোমরা আমায় চেন কি? আমি সালামা ইবনুল আকওয়া। তোমাদের যার পেছনেই আমি লাগব তাকে ধরে ফেলব। আর তোমরা কেউ যদি আমার পেছনে লাগো তবে কোনোদিনও আমার নাগাল পাবে না। আমার এ কথা শুনে তারা ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আমি লক্ষ্য করলাম ঘন গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অশ্বারোহী বাহিনী দেখা যাচ্ছে। তাদের সকলের আগে ছিলেন আখরাম রা.। আর তার পিছনে ছিলেন আবু কাতাদা রা.। আর আবু কাতাদার পিছনে ছিলেন মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা.। পথে আখরাম রা. ও আব্দুর রহমানের মধ্যে সংঘর্ষ হলো। আখরাম আব্দুর রহমানের ঘোড়ার পায়ে আঘাত করল। আর ঠিক তখন আব্দুর রহমান তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করে ফেলল এবং তার ঘোড়ার ওপর গিয়ে বসল। আর ঠিক তখনই আবু কাতাদা দৌড়ে গিয়ে আব্দুর রহমানের প্রতি বর্শা ছুঁড়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। তখন শত্রুবাহিনী পালাতে আরম্ভ করল। আমিও তাদের পেছনে দৌড়াতে লাগলাম। দৌড়াতে দৌড়াতে তারা একটি পাহাড়ের ঘাঁটিতে যূ কারাদ নামক কূপের দিকে ছুটল। তারা ছিল তৃষ্ণাতুর; এ কারণে পানি পানের উদ্দেশ্যে তারা এদিকটায় ছুটছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে সে কূপের ধারে কাছেও ভিড়তে

দিলাম না। সন্ধ্যার সূর্য তখন অস্তপাটে বসে পৃথিবীকে বিদায়ের হাতছানি দিচ্ছিল। এভাবে তারা এক ফোঁটা পানিও না পেয়ে চলে গেল। চারদিকে তখন রাত নেমে এসেছিল। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আমার কাছে এসে পৌঁছলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা ছিল চরম তৃষ্ণাতুর। যদি আমাকে আপনি এক শ' লোক দিতেন তবে তাদের চতুষ্পদজন্তুগুলি নিয়ে আসতাম। আর তাদের ঘাড় ধরে আপনার দরবারে এনে হাযির করতাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আকওয়ার বেটা! তুমি অনেক ক্লান্ত; এখন খানিকটা শান্ত হও!** অতঃপর তিনি বললেন, **তাদেরকে এখন বনু গাতফানের লোকেরা মেহমানদারি করছে।**

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পুরো গাযওয়ার প্রতি লক্ষ্য রেখে) বললেন, **আজকের দিনের সর্বোত্তম অশ্বারোহী হলো আবু কাতাদা আর সর্বোত্তম পদাতিক হলো সালামা।** যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল থেকে আমাকে তিনি দুই অংশ দান করলেন। এক অংশ পদাতিকের আরেক অংশ অশ্বারোহীর। এরপর তিনি আযবা নামক উটের পিঠে আমাকে নিজের পেছনে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে এলেন। (এটা ছিল আমার জন্য এক বিরল ও অভাবনীয় সৌভাগ্য)।

এ সময় মদীনাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নায়েব ছিলেন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রা.। আর পতাকা ছিল মিকদাদ বিন আমর রা. এর হাতে।[৫৮৫]

---

[৫৮৫] দেখুন সহীহ বুখারী ২/৬০৩। সহীহ মুসলিম ২/১১৩-১১৫। যাদুল মাআদ ২/১২০।

গাযওয়ায়ে খাইবর ও ওয়াদীয়ে কুরা

(সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাস)

মদীনা থেকে প্রায় আশি মাইল উত্তরে অবস্থিত বহুগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ আর খেজুর বাগান বেষ্টিত একটি বিশাল শহরের নাম ছিল খাইবর। বর্তমানেও এটা একটি জনপদ হয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে টিকে আছে। তবে এর আবহাওয়া খানিকটা রুক্ষ, শুষ্ক ও অস্বাস্থ্যকর।

গাযওয়ার কারণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে ইসলামের তিন প্রধান দুশমনের সর্বাপেক্ষা বড় আর উশৃঙ্খল দুশমন কুরাইশ থেকে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন হলেন। যখন মদীনায় প্রশান্ত জীবনের হীমেল হাওয়া তাঁর মন-প্রাণ কিছুটা শীতল করে তুলতে শুরু করল ঠিক তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাকি দুই দুশমনের ভাগ্য পরীক্ষার চূড়ান্ত পর্বটি এখনই সম্পন্ন হয়ে যাক। আর তারা হল ইয়াহুদী ও নাজদের গোত্রগুলো। এতে পুরো অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে। জন জীবনে নেমে আসবে জান্নাতী সুখের পরিমণ্ডল। সমৃদ্ধির সফেদ পারাবত ডানা মেলে উড়ে বেড়াবে মদীনার সুনীল আকাশের বিস্তৃত দিগন্তে। রক্তক্ষয়ী লড়াই আর সংঘাতের একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় পেরিয়ে মুসলমানরা এবার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে মনোযোগ দিতে পারবে। উপলক্ষের পর্ব সেরে এবার প্রকৃত লক্ষ্য পানে ছুটবে তাদের দুরন্ত অভিযাত্রা।

যেহেতু খাইবর ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদি ষড়যন্ত্রের প্রধান মারকায ও মূল কেন্দ্রবিন্দু; যেহেতু এখান থেকেই নিত্যনতুন জন্ম নিতো কুটিল চক্রান্ত আর বক্র দুরভিসন্ধির হাজারো জীবাণু, সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের বর্তমান লক্ষ্যস্থল ছিল এটিই।

খাইবরের অবস্থা যখন ছিল এমন। এর পাশাপাশি আমাদের এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে, তার অধিবাসীরাই ছিল ঐ লোকগুলি, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে গাযওয়ায়ে খন্দকের সময় এতগুলি গোত্র আর কওমকে লেলিয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে যারা বনু কুরাইযাকে গাদ্দারি, খেয়ানত আর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি প্রলুব্ধ করেছিল। এরপর তারাই মুসলিম সমাজের পঞ্চম স্তরের সদস্য মুনাফিকদের সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছিল; তারাই বনু গাতফান ও আরবের বেদুঈন জাতিগোষ্ঠীগুলিকে ইসলাম বিদ্বেষের মদ খাইয়ে মাতাল করে তুলেছিল। এদেরকে খেপিয়ে তোলার কথা বাদ দিলে তারা নিজেরাও

মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সশস্ত্র চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এভাবে এ সকল ইতরামি আর বাঁদরামির মাধ্যমে তারা দিনরাত মুসলমানদেরকে নিদারুণ পেরেশানী আর দুশ্চিন্তার ঘোলাপানিতে সাঁতরে বেড়াতে বাধ্য করছিল। আরও আগে বেড়ে এক পর্যায়ে তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ কারণে, মুসলমারা তাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক অভিযান প্রেরণে বাধ্য হয়েছিল। এ সকল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের প্রধান হোতাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। ইহুদি নেতা সাল্লাম ইবনে আবুল হুকাইক আর আসীর ইবনে যারিম ছিল এর জ্বলন্ত উদাহরণ। কিন্তু ইতরপ্রাণ এ সকল পাপাত্মাকে ঠাণ্ডা করতে মুসলমানদের কর্তব্য ছিল আরও বেশি। আরও বড় কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ তখনো বাকি ছিল। কিন্তু এতদিন তাদেরকে সবর করতে হয়েছিল শুধু একটি কারণে- কারণ তাদের সবচেয়ে বড় ও জানের দুশমন কুরাইশরা তখনো তাদের গতিরোধ করার জন্য, সামনের পথে তাদেরকে বিরামহীন বাঁধা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এ জন্য প্রকৃতির চাহিদা ছিল এই যে, সবচেয়ে ভয়াল ও বিষাক্ত এ সাপকে শেষ করে ফেলার আগ পর্যন্ত অন্যগুলির দিকে হাত বাড়ানো না হোক। সুতরাং, যখন তাকে শেষ করে দেওয়া হলো তখন মুসলমানদের সামনের পথ একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। পরিস্থিতিই তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল এবার নতুন এক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতি। এভাবে এ সকল অপরাধীর বিচারের আকাশ একেবারে নির্মেঘ আর পরিষ্কার হয়ে গেল। চূড়ান্ত বিচারের দিন ধীরে ধীরে তাদের দোরগোড়ায় এসে মাথা জাগালো।

খাইবরের দিকে যাত্রা

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক বলেন, হুদাইবিয়া থেকে ফিরে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো যুলহজ্জ মাস ও মুহাররম মাসের কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি খাইবরের পথে যাত্রা করেন।

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন, গাযওয়ায়ে খাইবর ছিল আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুত বিজয়ের একটি অংশ। নিম্নে আয়াতে তিনি এ গাযওয়া বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ

আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করবেন। [সূরা ফাত্হ:১২]

মুসলিম বাহিনীর পরিসংখ্যান

যেহেতু মুনাফিক ও ভীরুচিত্ত মুমিনরা গাযওয়ায়ে হুদাইবিয়ার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পিছুটান দিয়েছিল, এ কারণে

আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে–

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا.

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে : আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন : তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে : বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বোঝে। [সূরা ফাত্হ: ১৫]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খাইবরের পথে যাত্রা করতে মনোস্থ করলেন তখন ঘোষণা করে দিলেন, কেবল যারা যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক আছে তারাই যেন এ সফরে মুসলিম বাহিনীতে নাম লেখায়। ফলে যারা বাইয়াতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন কেবল তারাই এ সফরে যাত্রার জন্য পস্তুত হয়ে গেলেন। আর তাদের সংখ্যা ছিল ১৪০০ জন।

এ গাযওয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার যিম্মাদারি দিয়ে গিয়েছিলেন সিবা' ইবনে উরফুতা রা. এর হাতে। অপরদিকে ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি ছিলেন নুমাইলা ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসী রা.। কিন্তু সীরাত বিশেষজ্ঞবর্গের নিকট প্রথমটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।[৫৮৬]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা থেকে যাত্রা করার পরে বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরাইরা রা. ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসে উপস্থিত হন। সেখানে এসে সিবা' ইবনে উরফুতা রা. এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন ফজরের নামায আদায় করছিলেন।. নামায থেকে ফারেগ হলে আবু হুরাইরা রা. সিবা' রা. এর কাছে আসেন। সিবা' রা. তাকে সফরের পাথেয় যুগিয়ে দেন। এরপর তিনি সোজা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে চলে যান। খাইবর যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছিল। তারপরেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে আবু হুরাইরা রা. ও তাঁর সঙ্গীদেরকে গনীমতের মালের মধ্যে শরীক করেন।

---

[৫৮৬] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৪৬৫। যাদুল মাআদ ২/১৩৩।

ইহুদিদের সঙ্গে মুনাফিকদের আঁতাত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাত্রা দেখে মুনাফিকদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা ইহুদিদের সঙ্গে আঁতাতের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই খাইবরের ইহুদিদের কাছে সংবাদ পাঠায়ঃ মুহাম্মাদ তোমাদের দিকে যাত্রা করেছে। তাঁর লক্ষ্যস্থল তোমরাই হবে। সুতরাং, যুদ্ধাস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও! কিন্তু তাকে তোমরা ভয় পেও না। কেননা, সৈন্যসংখ্যা আর হাতিয়ারের দিক থেকে তোমরা তার চেয়ে বহু অগ্রে। আর মুহাম্মাদের বাহিনীর সংখ্যা গুটিকয়েক মাত্র। তা ছাড়া তারা সহায়-সম্বলহীন। হাতে গনা কয়েকটি অস্ত্র ও হাতিয়ার তাদের কাছে পাওয়া যাবে। খাইবরের ইহুদিরা যখন এ সংবাদ জানতে পারল, তখন বনু গাতফানের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তারা কেনানা ইবনে আবুল হুকাইক ও হাওযা ইবনে কায়সকে দ্রুত পাঠিয়ে দিলো। কেননা, বনু গাতফান ছিল খাইবরের ইহুদিদের মিত্র। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দুষ্কর্মের প্রধান সহযোগী। পাশাপাশি তারা যবান দিলো যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়ী হয় তবে খাইবরে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক পাবে তারা।

খাইবরের পথে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসর (অন্য ভাষায় আসর) নামক পাহাড়ী পথ ধরে খাইবরের দিকে অগ্রসর হলেন। এরপর তিনি সাহবার দিকে চললেন। সেখান থেকে রজী' নামক উপত্যকায় অবতরণ করলেন। এখান থেকে গাতফানের বসতির দূরত্ব ছিল এক দিন এক রাতের পথ মাত্র। ওদিকে গাতফান ইতোমধ্যেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ইহুদিদের সাহায্যের জন্য খাইবরের দিকে রওয়ানা হয়েছিল। কিছুদূর পথ অগ্রসর হওয়ার পরে তারা পেছনের দিকে দারুণ হট্টগোল আর চেঁচামেচি শুনতে পেল। তারা ধারণা করল মুসলমানরা হয়তো তাদের বসতিতে গিয়ে তাদের ধন-সম্পদ আর পরিবার-পরিজনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে বসেছে এ কারণে তারা ফিরে এলো। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাইবরের মাঝখান থেকে গাতফানী প্রাচীর শূণ্যে উড়ে গেল।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'জন পথপ্রদর্শককে ডেকে পাঠালেন। তাদের একজনের নাম ছিল হুসাইল। উদ্দেশ্য ছিল খাইবরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সবচেয়ে সুন্দর পথ আবিষ্কার করা। যাতে করে উত্তর তথা সিরিয়ার দিক হতে অগ্রসর হয়ে সে দিকে তাদের পালানোর পথ রোধ করা যায়। পাশাপাশি তাদের

ও বনু গাতফানের মাঝে প্রাচীর হয়ে তাদের পক্ষ থেকে যে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা প্রাপ্তির দুয়ার বন্ধ করে দেওয়া যায়।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে এমন পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর সে অগ্রসর হয়ে কতগুলি পথের সঙ্গমস্থলে পৌঁছে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ পথগুলির প্রত্যেকটি ধরে আপনি আপনার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি একটি করে সেগুলির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, একটির নাম 'হুযন'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথে যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। সে দ্বিতীয় আরেকটির নাম করল 'শাশ'। এ পথেও যেতে তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। অতঃপর তৃতীয় পথের নাম করা হলো 'হাতেব'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পথের কথাও না করে দিলেন। এবার হুসাইল বলল, আর মাত্র একটি পথ বাকি আছে। উমর রা. বললেন, সেটির নাম কী? সে বলল, 'মারহাব'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন চতুর্থ এ পথটি বেছে নিলেন।

পথে ঘটে যাওয়া বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী

এক. সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে খাইবরের পথে যাত্রা করলাম। নিশীথ রাতের অন্ধকার চিরে আমরা পথ চলছিলাম। তখন মুসলিম বাহিনীর একজন আমেরকে বলল, আমের! আমাদেরকে কিছু কবিতা শুনাও! আমের ছিলেন আরবের একজন খ্যাতিমান কবি। তখন তিনি সওয়ার থেকে মাটিতে অবতরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন:

اللّٰهُ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا .... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ...... اِنَّا اِذَا صِيْحَ بِنَا اَبَيْنَا

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا

'হে আল্লাহ যদি আপনিই না হতেন, তবে আমরা তো হেদায়াত পেতাম না, সদকা করতাম না, নামায আদায় করতাম না।

আমরা আপনার ওপর কুরবান; সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুসরণ করতে থাকি। যদি আমরা লড়াইয়ে অবতীর্ণ হই তবে আপনি আমাদেরকে দৃঢ়পা রাখেন।

আমাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করুন! যখন আমাদেরকে যুদ্ধের জন্যে ডাকা হয় তখন আমরা এড়িয়ে যাই।

আর তারা চিল্লিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়েছে'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতার ছন্দগুলি শুনে বললেন, **কে এই লাইনগুলোর আবৃত্তিকারী?** লোকজন জবাব দিলো, আমের ইবনুল আকওয়া। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **আল্লাহ তাকে রহম করুন!** তখন উপস্থিত লোকদের একজন বলে উঠল, হে আল্লাহর নবী! (তার শাহাদাত তো এখন) ওয়াজিব হয়ে গেছে। আপনি কেন তাকে দিয়ে আমাদেরকে আরও বেশি সময় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে দিলেন না?[৫৮৭]

কারণ তারা জানতেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তি বিশেষ নির্ধারিত করে যার জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন সে অবশ্যই শাহাদাতের সুধা পান করবে।[৫৮৮] গাযওয়ায়ে খাইবরেও এমনটিই হয়েছিল। আমের এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

দুই. খাইবরের কাছাকাছি 'সাহবা' নামক উপত্যকায় পৌঁছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে যার কাছে যা আছে নিয়ে আসাার নির্দেশ দেন। তখন তাঁর সামনে কেবল ছাতু নিয়ে আসা হয়। তিনি সেগুলোকে খামীরা করতে বলেন। এরপর তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম তা থেকে খাবার গ্রহণ করেন। এরপর তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম উযূর পরিবর্তে কেবল কুলি করেই (আগে উযূ থাকার কারণে) মাগরিবের নামায আদায় করেন।[৫৮৯] অতঃপর তিনি ইশার নামায (আগের উযূ দিয়েই) আদায় করেন।[৫৯০]

তিন. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে খাইবরের এতটা কাছাকাছি চলে গেলেন যে, সেখান থেকে খাইবরের দুর্গগুলি দেখা যাচ্ছিল তিনি নির্দেশ দিলেন, **তোমরা থেমে যাও!** মুসলিম বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তিনি তখন দুআ করলেন, **হে সাত আকাশ আর এগুলি যা ঢেকে রেখেছে সেগুলোর প্রতিপালক! হে সাত যমীন আর এগুলি যা বহন করে**

---

৫৮৭ সহীহ বুখারীঃ গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/৬০৩। সহীহ মুসলিম গাযওয়ায়ে যী করদ ইত্যাদি ২/১১৫।

৫৮৮ সহীহ মুসলিম ২/১১৫।

৫৮৯ সহীহ বুখারী ২/৬০৩।

৫৯০ ওয়াকেদী প্রণীত মাগাযীয়ে ওয়াকেদী (গাযওয়ায়ে খাইবর পৃষ্ঠা ১১২)

রেখেছে সেগুলোর প্রতিপালক! হে পাপাত্মা শয়তানের ও তারা যাদেরকে পথভ্রষ্ট করে তাদের প্রভু! হে বায়ুর ও যা কিছু সে উৎক্ষিপ্ত করে সেগুলোর রব! আমরা তোমার কাছে এ জনপদের কল্যাণ আর তার অধিবাসীদের এবং যা কিছু তাতে আছে তার কল্যাণ আর মঙ্গল কামনা করছি। আর এ জনপদের অনিষ্টতা ও তার অধিবাসীদের ও যা কিছু তাতে আছে তার অনিষ্টতা ও অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এবার তোমরা আল্লাহর নামে সামনে বাড়ো।[৫৯১]

খাইবরের দোরগোড়ায় মুসলিম বাহিনী

সর্বশেষ রাতটি মুসলমানরা অতিবাহিত করলেন খাইবরের একান্ত সান্নিধ্যেই। যে রাতের আখেরী প্রহর কেটে সূর্যোদয় হলেই শুরু হয়ে যাবে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। অথচ, ইহুদিরা তা টেরই পেল না। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল রাতের বেলা তিনি যে কওমের কাছে আসতেন ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের ওপর রাতের অন্ধকারে কাপুরুষোচিত হামলা চালাতেন না। সুবহে সাদিক হলে শেষ রাতের অন্ধকার বাকি থাকতেই সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর মুসলমানরা সওয়ারীতে উঠে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। ওদিকে খাইবরের অধিবাসীরা ভোরে নিজেদের কাস্তে-কোদাল সঙ্গে নিয়ে ক্ষেত-খামারের দিকে পা বাড়াচ্ছিল। কিন্তু তারা পুরো ঘটনার কিছুই জানত না। মুসলিম বাহিনী তাদের চোখ পড়লে তারা যেন ভূত দেখা দেখল। গায়ের জোরে চেঁচিয়ে উঠল, মুহাম্মাদ! আল্লাহর কসম মুহাম্মাদ বাহিনী নিয়ে এসে গেছে! এভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে দ্রুত পালিয়ে শহরের ভেতরে চলে গেল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আল্লাহু আকবার! খাইবর বিরান হয়ে গেছে। আল্লাহু আকবার! খাইবর বিরান হয়ে গেছে। যখন আমরা কোনো কওমের অঙ্গনে পা রাখি তখন ভীতিপ্রদর্শিত লোকদের ভোর অশুভ হয়ে যায়।**[৫৯২]

খাইবর দুর্গ

খাইবর জনপদ দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগে ছিল পাঁচটি বিশাল দুর্গঃ এক. নায়েম দুর্গ। দুই. সা'ব ইবনে মুয়ায দুর্গ। তিন. যুবায়ের দুর্গ। চার. উবাই দুর্গ। পাঁচ. নেযার দুর্গ।

প্রথম তিনটি দুর্গ যে অঞ্চলে অবস্থিত তার নাম ছিল 'নাতাহ'। আর শেষোক্ত দুর্গদু'টি অবস্থিত 'শাক্ব' অঞ্চলে।

---

[৫৯১] ইবনে হিশাম ২/৩২৯।

[৫৯২] সহীহ বুখারীঃ গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/৬০৩, ৬০৪।

খাইবর জনপদের দ্বিতীয় ভাগ পরিচিত ছিল 'কাতীবা' নামে। এ ভাগে মাত্র তিনটি দুর্গ ছিল:

এক. কামূস দুর্গ। (এটা ছিল বনু নযীরের বনু আবুল হুকাইকের দুর্গ)

দুই. ওতীহ দুর্গ।

তিন. সুলালিম দুর্গ।

উল্লিখিত আটটি ছাড়াও খাইবরে জনপদে আরও বহু দুর্গ ছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল ছোট। মজবুতি ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে এই আটটির সঙ্গে সেগুলোর কোনো তুলনা ছিল না।

যুদ্ধের সময় ভয়াল ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছে মূলত প্রথম ভাগেই। আর দ্বিতীয় ভাগে অগণিত যোদ্ধাপুরুষ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি শক্তিশালী দুর্গ থাকা সত্ত্বেও সেগুলো বিনা যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে বসেছিল।

মুসলিম শিবিরে

আরও সামনে এগিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীর জন্য একটি জায়গা বাছাই করে সেখানে শিবির স্থাপন করলেন। তখন হুবাব ইবনুল মুনযির রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি আল্লাহর নির্দেশ না কি কেবল রণ-কৌশল? রাসূলে কারী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, **বরং রণকৌশল মাত্র**! তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ জায়গাটি 'নাতাহ' দুর্গের খুব কাছাকাছি। অথচ, খাইবরের সকল সৈন্য রয়েছে সেখানেই। তারা আমাদের অবস্থা পুরোপুরি জানতে পারবে। অথচ, আমরা তাদের কিছুই জানতে পারব না। তারা তীর ছুঁড়লে আমাদের পর্যন্ত এসে পৌছবে। অথচ, আমাদের তীর তাদের পর্যন্ত পৌছবে না। আর তাদের নিশিহামলা থেকেও আমরা নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত নই। তা ছাড়া জায়গাটি খেজুর বাগান পরিবেষ্টিত শুষ্ক ও অনুর্বর স্থান। এ কারণে, উচিত হবে এ সকল সমস্যামুক্ত নির্ভেজাল ও পরিপাটি কোনো স্থানে শিবির স্থাপন করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তোমার মতামত সম্পূর্ণ সঠিক**। এরপর তিনি অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি ও বিজয়ের সুসংবাদ

খাইবরের সীমানায় প্রবেশের রাতে- কারও কারও মতে কয়েক দফা লড়াইয়ের পরে- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আগামী কাল এমন এক জনের হাতে আমি পতাকা তুলে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর**

রাসূলকে ভালোবাসে। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও যাকে ভালোবাসেন [আল্লাহ তার হাতে খাইবরের বিজয় দান করবেন]।

সকাল হলে সবাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছুটে গেল। কারণ, প্রত্যেকেরই দিলের তামান্না ছিল যেন পতাকা তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আলী ইবনে আবী তালিব কোথায়?** লোকজন জবাবা দিলো, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত। তিনি বললেন, **তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।** কিছুক্ষণ পরে তাকে নিয়ে আসা হলো। তিনি তার চোখে সামান্য থুথু মুবারক দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। পলকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। এমন হলো যেন কোনোদিন সে চোখে সামান্য ব্যাথা ছিল না। অতঃপর তার হাতে তিনি পতাকা তুলে দিলেন। আলী রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা আমাদের মতো হওয়ার আগ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব? তিনি বললেন, **ধীর-স্থিরতার সঙ্গে গিয়ে রণাঙ্গনে অবতরণ করবে। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। তাদেরকে জানিয়ে দিবে তাদের ওপর ইসলামে আল্লাহর যেসব অধিকার রয়েছে। আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলা কেবল এক ব্যক্তিকে যদি তোমার দ্বারা হেদায়াত দান করেন তবে তা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক দামী।** [৫৯৩]

লড়াই শুরু ও নায়েম দুর্গ বিজয়

মুসলিম বাহিনীকে দেখার পরে ইহুদিরা যখন দৌড়ে গিয়ে নগরে আশ্রয় নিলো তখনই তারা দুর্গে ঢুকে সুসংরক্ষিত হয়ে রইল। আর তখন এটা স্বাভাবিক ছিল যে, তারা যুদ্ধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিবে। খাইবরের দুর্গাষ্টকের মধ্য থেকে মুসলিম বাহিনী সর্বপ্রথম নায়েম দুর্গের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালালো। কেননা রণকুশলতা আর সামরিক অবস্থানের গুরুত্বের দরুণ এটা ইহুদিদের সর্বপ্রথম প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। পাশাপাশি এটা ছিল প্রসিদ্ধ ইহুদি বীর-বাহাদুর মারহাবের দুর্গ। এই মারহাবের অবস্থা ছিল একাই 'এক শ' নয়; বরং 'এক হাজার'।

আলী ইবনে আবী তালিব রা. মুসলিম বাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে দুর্গের দিকে এগিয়ে গেলেন। ইহুদিরেকে সর্বপ্রথম তিনি ইসলামের দিকে ডাকলেন। তারা এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল। উল্টো তাদের রাজা মারহাবের নেতৃত্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। মারহাব রণাঙ্গনে নেমে মুখামুখি যুদ্ধের আহ্বান জানালো। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, যখন আমরা খাইবরে গিয়ে পৌঁছলাম তখন

---

[৫৯৩] সহীহ বুখারী: গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/৬০৫, ৬০৬।

তাদের রাজা মারহাব নাঙ্গা শমশীর নিয়ে খোলা ময়দানে নেমে এসে হুঙ্কার দিতে লাগল:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

'গোটা খাইবর জানে, আমি মারহাব! অস্ত্রসজ্জিত অভিজ্ঞ রণবীর!!
যখন রণাঙ্গন উথলে উঠতে শুরু করে!!

তখন মুসলিম শিবির থেকে আমার চাচা আমের বের হতে হতে বললেন,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ ... شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

'গোটা খাইবর জানে আমি আমের! অস্ত্রসজ্জিত দুঃসাহসী সমরী!!

উভয়ের মাঝে আঘাত-পাল্টা আঘাত বিনিময় হলো। মারহাবের তলোয়ার আমার চাচা আমেরের ঢালের মধ্যে ঢুকে গেল। আমের তখন নীচের দিক থেকে ইহুদির পায়ের গোড়ালিতে আঘাত করতে গেলেন। কিন্তু তার তরবারি ছিল ছোট-খাটো। এ কারণে তরবারি ইহুদির পায়ে না লেগে এর ধারালো অংশ ফিরে এসে নিজের হাঁটুতে বসে গেল। আর এতেই তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, **তার জন্য দু'টি পুরস্কার রয়েছে**- তখন তিনি দুই আঙ্গুল একসঙ্গে মিলিত করলেন- **সে ছিল জানবায মুজাহিদ; তার মতো মানুষ পৃথিবীতে বড়ই দুর্লভ।** [৫৯৪]

আমের রা. এর শাহাদাতের পরে মারহাব আবারও উচ্চস্বরে কবিতা আবৃত্তি করে লড়াইয়ের প্রতি আহ্বান করল:.....গোটা খাইবর জানে, আমি মারহাব.....।

মুসলিম শিবির থেকে তখন বের হলেন আলী ইবনে আবী তালিব রা.। সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, আলী রা. সামনে অগ্রসর হয়ে আবৃত্তি করলেন

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ ... كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمُ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

'আমি সেই ব্যক্তি যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (সিংহ)! গহীন অরণ্যের সিংহের মতো হিংস্র ও ভয়াবহ।

---

৫৯৪ সহীহ মুসলিম: গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/১২২। গাযওয়ায়ে যী করদ ইত্যাদি ২/১১৫। সহীহ বুখারী: গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/৬০৩।

বাটখারার জায়গায় বর্শা দিয়েই আমি তার ওজন মেপে দেখব!!!

তিনি সামনে এগিয়ে সরাসরি মারহাবের মাথায় আঘাত করলেন। মারহাব দুই টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পরিশেষে আলী রা. এর হাত ধরেই খাইবর বিজিত হয়েছিল।[৫৯৫]

আলী রা. যখন ইহুদিদের দুর্গের নিকটে গিয়ে পৌঁছেন তখন এক ইহুদি দুর্গের ওপর থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? তিনি বললেন, আমি আলী (উচ্চ ও সমুন্নত) ইবনে আবী তালিব। ইহুদি বলল, ঐ কিতাবের কসম যা মূসা আ. এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা অবশ্যই সমুন্নত হয়েছ!

মারহাব নিহত হওয়ার পরে তার ভাই ইয়াসির সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, কে আছ আমার সঙ্গে লড়তে আসবে? যুবাইর রা. সামনে এগিয়ে গেলেন। তার মা সাফিয়্যাহ রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলে কি নিহত হবে? তিনি বললেন, **বরং তোমার ছেলে তাকে হত্যা করবে**। পরে দেখা গেল ঠিকই যুবাইর রা. তাকে হত্যা করে ফেলেছেন।

নায়েম দুর্গ ঘিরে উভয় শিবিরের মাঝে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে লাগল। তাতে ইহুদিদের সামনের কাতারের বহু নেতা নিহত হলো। এতে করে আস্তে আস্তে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়ে কোমর বাঁকা হয়ে এলো। মুসলমানদের ধেয়ে আসা ঢলের সামনে তারা অক্ষমতা প্রকাশ করে ছন্নছাড়া হয়ে বসে পড়ল। কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায়, এ লড়াই একটানা চলতে থাকে বেশ কয়েক দিন। এ সময়ে মুসলিম বাহিনী কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু ইহুদিদের মনোবল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না। একজন একজন করে তারা নায়েম দুর্গ ছেড়ে সা'ব দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এভাবে মুসলমানরা একসময় নায়েম দুর্গ অধিকার করে ফেলেন।

সা'ব ইবনে মুয়ায দুর্গ বিজয়

মযবুতি আর প্রতিরক্ষা সামর্থ্যের দিক থেকে সা'ব দুর্গ ছিল নায়েম দুর্গের পরে ঠিক দ্বিতীয় স্থানে। সাহাবী হুবাব ইবনে মুনযির আনসারী রা. এর নেতৃত্বে মুসলমানরা এ দুর্গের ওপর সাঁড়াশি হামলা পরিচালনা করেন। এক পর্যায়ে তারা দুর্গের চারদিকে অবরোধ বসান। অবরোধ চলতে থাকে টানা তিন দিন। তৃতীয়

---

[৫৯৫] মারহাবের হত্যাকারী কে ছিল, কোন্ দিন তাকে হত্যা করা হয়েছিল এবং এ দুর্গ কেন্ দিন পদানত হয়েছিল- এ ব্যাপারে ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে রয়েছে চরম মতভেদ। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতেও এ মতভেদ কিছুটা রয়ে গেছে। আমরা বুখারীর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেখান থেকে এ তথ্য সংগ্রহ করেছি।

দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ের জন্য আল্লাহর কাছে এক বিশেষ দুআ ও মুনাজাত করেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আসলাম গোত্রের বনু সাহমের লোকজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি। তা ছাড়া আমাদের হাতে এখন কিছুই নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **হে আল্লাহ! তুমি তো তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাদের হাতে এখন কিছুই নেই। আমার হাতেও এমন কিছু নেই, যা আমি তাদেরকে দিব। তুমি ইহুদিদের সবচেয়ে বেশি ধন-সম্পদ, খাদ্য ও চর্বি সমৃদ্ধ দুর্গটি তাদের হাতে জয় করে দাও।**

অতঃপর মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করে। আল্লাহ তাআলা সা'ব ইবনে মুয়ায দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দেন। পুরো খাইবরের আর কোনো দুর্গে এর চেয়ে বেশি খাবার ও চর্বি মজুদ ছিল না।[৫৯৬]

দুআ সম্পন্ন হওয়ার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ দুর্গ আক্রমণের জন্য কাতারবিন্যাস করছিলেন তখন বনু আসলামের লোকজনই ছিল আক্রমণের পয়লা কাতারে। দুর্গের সামনে দফায় দফায় ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক লড়াই সংঘটিত হলো। ঠিক সেদিনই সূর্যাস্তের আগ মুহূর্তে সা'ব দুর্গ মুসলমানদের হাতে চলে আসে। মুসলমানরা তার ভেতরে অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ও কামান লাভ করে।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে মুসলিম শিবিরের মাঝে প্রচণ্ড ক্ষুধাতুরতার যে মহামারীর ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা পাওয়া যায় এ সময় সেনাবাহিনীর অনেকে গাধা যবাই করে ফেলে। গোশ্ত কেটে সেগুলো চুলার ওপরও রাখে। আর ঠিক এ চরম মুহূর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানতে পেরে তাদেরকে পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দেন।

যুবায়ের কেল্লা দখল

নায়েম ও সা'ব দুর্গ মুসলমানরা দখল করে নেওয়ার পরে ইহুদিরা 'নাতাহ' ভাগের পুরো এলাকা ছেড়ে দিয়ে যুবাইর কেল্লায় এসে আশ্রয় নেয়। এটা ছিল বিশাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত একটি সুরক্ষিত দুর্গ। এখানে ওঠার রাস্তা এতটা কঠিন ও সমস্যাসংকুল ছিল যে, ঘোড়ার পিঠে করে কিংবা পায়ে হেঁটে- কোনো ভাবেই এখানে ওঠা সম্ভব ছিল না। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর অবরোধ আরোপ করলেন। এক নাগাড়ে তিন দিন অবরোধ

---

[৫৯৬] ইবনে হিশাম ২/৩৩২।

চলল। তখন এক ইহুদি এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, হে আবুল কাসেম! যদি আপনি এখানে এক মাসও বসে থাকেন তবুও তাদের একটুও ক্ষতি করতে পারবেন না। মাটির নীচ দিয়ে তারা কূপ ও পানির ব্যবস্থা করে রেখেছে। গভীর রাতের অন্ধকারে বের হয়ে পানি পান করে রাতারাতিই তারা আবার দুর্গে ফিরে যায়। তার চেয়ে বরং আপনি যদি তাদের পানির এ পথটি বন্ধ করে দেন তবে তাদের শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তড়িঘড়ি করে তাদের পানির পথ বন্ধ করে দিলেন। এতে তারা বাধ্য হয়ে দুর্গ থেকে বের হয়ে কঠিন লড়াই শুরু করে দিলো। এতে বেশ কিছু মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। আর ইহুদিদের প্রাণ হারায় প্রায় দশ জন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে এ দুর্গ বিজিত হয়।

উবাই কেল্লা বিজয়

যুবাইর কেল্লা মুসলমানদের হাতে বিজিত হওয়ার পরে ইহুদিরা সকলে মিলে উবাই কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমানরা এবার এ দুর্গের ওপর অবরোধ জারি করেন। ইহুদিদের দুই বীর একের পরে এক সম্মুখ যুদ্ধের জন্য মুসলিম শিবিরের প্রতি আবাহনী দেয়। মুসলিম বীর-প্রাণগণ বের হয়ে একে একে তাদের দু'জনকেই হত্যা করেন। দ্বিতীয় ইহুদি বীরকে হত্যা করেন ইসলামের ইতিহাসের প্রখ্যাত রণ-নায়ক লাল ফিতাওয়ালা নামে প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু দুজানা সিমাক ইবনে খারাশাতা আনসারী রা.। তাকে হত্যা করার পর আবু দুজানা রা. কেল্লার ভেতর দিকে ছুটে যান। মুসলমান মুজাহিদরাও তার সঙ্গে ছুটে যায়। এতে করে কেল্লার অভ্যন্তরে বেশ কিছু মুহূর্ত রক্তক্ষয়ী প্রাণপণ লড়াই চলতে থাকে। অতঃপর ইহুদিরা ধীরে ধীরে কেল্লা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। এখান থেকে বের হয়ে তারা যেতে থাকে প্রথম ভাগের সর্বশেষ 'নাযার' দুর্গে।

নাযার দুর্গ বিজয়

এটা ছিল এ অংশের সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ। ইহুদিদের প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মুসলমানরা যদি তাদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে তবুও তারা এ দুর্গের নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা-জাল ভেদ করে কখনোই ভেতরে ঢুকতে পারবে না। এ কারণে তারা এ দুর্গে নিজেদের নারী ও শিশুদেরকেও নিয়ে ঢুকেছিল। আর বাকি চারটি দুর্গ মুসলমানদের জন্য খালি করে দিয়েছিল।

মুসলমানরা এখানেও এসে অবরোধ জারি করে বসে এবং ইহুদিদের ওপর চরম কঠোরতা ও চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু সুউচ্চ পাহাড়ের শিখর দেশে সুরক্ষিত এক দুর্গ হওয়ার কারণে মুসলমানরা সে পর্যন্ত পৌছার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল

না। অপরদিকে ইহুদিরা যদিও দুর্গ থেকে বের হয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখাতে পারছিল না; কিন্তু তারা তীর ও পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে মুসলমানদের দারুণ প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল।

এ সময়ে আর বেশিক্ষণ অবরোধ চালিয়ে যাওয়া মুসলিম বাহিনীর পক্ষে নিদারুণ দুঃসহ ও অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে ক্ষেপনাস্ত্র থেকে গোলা-বারুদ নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। এতে করে মুসলমানরা তাদের প্রতি বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এভাবে আস্তে আস্তে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ-পাঁচিলে ফাটল ধরে এবং এ ফাটল দিয়েই মুসলিম বাহিনী দুর্গের ভেতরে ঢুকে পড়ে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এক সময় এ সংঘর্ষের ইতি ঘটে ইহুদিদের লজ্জাজনক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। কেননা, অন্যান্য দুর্গ থেকে তারা যেমনিভাবে চুপিসারে সরে যেতে পেরেছিল এখান থেকে তেমনিভাবে সরতে পারেনি; বরং তাদের পুরুষরা নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

এ সুরক্ষিত দুর্গ বিজয় করার মধ্য দিয়ে খাইবরের প্রথম অংশ মুসলমানদের পুরো দখলে চলে আসে। আর এটা ছিল 'নাতাহ' ও 'শাক্ব' প্রান্ত। খাইবরের এ অংশে যদিও আরও ছোট ছোট কয়েকটি দুর্গ ছিল কিন্তু এ সুরক্ষিত দুর্গ খুইয়ে বসার কারণে বাকিগুলি ইহুদিরা এমনিতেই মুসলমানদের জন্য খালি করে দেয় এবং খাইবরের দ্বিতীয় অংশের দিকে দিগ্‌বিদিক হয়ে পালিয়ে যায়।

খাইবরের দ্বিতীয় অংশ বিজয়

'নাতাহ' ও 'শাক্ব' প্রান্তের পতন ঘটার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবরের দ্বিতীয় অংশ তথা 'কাতীবাহ' প্রান্তের দিকে মনোযোগী হন, যে প্রান্তে অবস্থিত ছিল খাইবরের সুরক্ষিত ও প্রসিদ্ধ বনু নযীরের আবু হুকাইকের কামূস, ওতীহ ও সুলালিম দুর্গ। 'নাতাহ' ও 'শাক্ব' প্রান্তে পরাজিত ও মার খাওয়া সকল ইহুদি এসে এগুলিতে বাসা বেঁধেছিল।

এ পর্যন্ত ইতিহাস সুবিন্যস্ত ও সুন্দরভবেই চলে আসছিল। কিন্তু এখানেই এসে বেঁধে গেল যত গণ্ডগোল ও পেঁচগোঁচ। সীরাত বিশেষজ্ঞরা এ ক্ষেত্রে চরম মতানৈক্যের শিকার হয়েছেন- গাযওয়ায়ে খাইবরের দ্বিতীয় এ অংশে মুসলমান ও ইহুদিদের মাঝে সেখানের তিনটি দুর্গ নিয়ে কোনো ধরনের সংঘর্ষ কিংবা সংঘাত হয়েছিল কি না? ইবনে ইসহাকের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে মুসলমানদেরকে কামূস দুর্গ জয় করার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে; বরং তার আগ-পাছের বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়- এ দুর্গ মুসলমানদেরকে

যুদ্ধ করেই জয় করতে হয়েছিল। কোনো সন্ধি ইত্যাদির ওপর ভর করে ইহুদিরা এটাকে মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়নি।[৫৯৭]

ঐতিহাসিক ওয়াকেদী এ মতের চরম বিরোধী। তার মতে, মুসলমানরা খাইবরের দ্বিতীয় অংশের তিনটি দুর্গই আলোচনা-পর্যালোচনা ও সন্ধির মাধ্যমে বিজয় করেছিল। হতে পারে সামান্য কিছু ঠেলাঠেলি ও ঠোকাঠুকির পর কামূস দুর্গ মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সন্ধি হয়েছিল। কিন্তু বাদবাকি দু'টি দুর্গ নিশ্চিতভাবেই কোনো ধরনের সংঘাতে যাওয়া ব্যতিরেকে মুসলমানদের কাছে সমর্পণ করেছিল।

ঘটনা যাই থাক, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুসলিম বাহিনী নিয়ে খাইবরের এ অংশে এসে পৌঁছেন তখন তিনি সেখানে কঠোর অবরোধ জারী করেন। অবরোধ চলতে থাকে টানা চৌদ্দ দিন। ইহুদিরা এ দিনগুলিতে দুর্গ থেকে একবারও বের হওয়ার প্রয়োজন দেখায়নি। চৌদ্দ দিন পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের ওপর কামান দিয়ে গোলা নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন। তখন তারা তড়িঘড়ি করে সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

সন্ধি প্রস্তাব

আবুল হুকাইক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বার্তা পাঠালো যে, আমি দুর্গ থেকে অবতরণ করে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ঠিক আছে! তুমি নেমে আসতে পারো।** তখন সে নেমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ শর্তে সন্ধিচুক্তি করে যে, দুর্গে যুদ্ধোপযুক্ত যে সকল সৈন্য রয়েছে তাদের সকলের জানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাদের শিশুদেরকে তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা তাদের নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে খাইবর ত্যাগ করে চলে যাবে। আর কেবল তাদের পরনের কাপড় ব্যতীত[৫৯৮] আর সকল সহায়-সম্পত্তি, জায়গা-জমি, স্বর্ণ-রূপা, উট-ঘোড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দিয়ে যাবে। তার প্রস্তাব শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যদি তোমরা আমার কাছ থেকে কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা করো তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহ** ও তাঁর

---

[৫৯৭] ইবনে হিশাম ২/৩৩১, ৩৩৬, ৩৩৭।

[৫৯৮] কিন্তু আবু দাউদের রেওয়ায়েতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, খাইবরের ইহুদিদেরকে নির্বাসনকালে উটের ওপর যা কিছু তারা নিয়ে যেতে পারে তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। (দেখুন সুনানে আবী দাউদঃ খাইবর ভূখণ্ড প্রসঙ্গ অধ্যায় ২/৭৬)

রাসূল তোমাদের যিম্মাদারি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এরপর উভয় শিবিরের মাঝে সন্ধি হলো।[৫৯৯] এ সন্ধির পরে মুসলমানদের হাতে তাদের দুর্গ অর্পণের পালা সুসম্পন্ন হয়। আর এভাবেই খাইবর মুসলমানদের পদানত হয়।

চুক্তি ভঙ্গের কারণে আবুল হুকাইকের দুই পুত্রের হত্যা

এ চুক্তি সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও আবুল হুকাইকের দুই পুত্র অনেক ধন-সম্পদ লুকিয়ে ফেলে। তারা একটি চামড়া গায়েব করে ফেলে যাতে অনেক সম্পত্তি আর হুয়াই ইবনে আখতাবের অলঙ্কার ছিল। মদীনা থেকে বনু নযীরের নির্বাসনের সময় হুয়াই সেগুলি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট কেনানা ইবনে আবুল হুকাইককে নিয়ে আসা হলো। তার কাছে বনু নযীরের গুপ্ত ধনভাণ্ডার ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি অস্বীকার করে। তখন খোদ ইহুদিদের এক ব্যক্তি সামনে এসে বলে দেয়, আমি কেনানাকে প্রতিদিন ভোরে অমুক বিরান বধ্যভূমিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেনানাকে লক্ষ্য করে বললেন, **পরে যদি সেগুলো তোমার কাছে পাওয়া যায় তবে কিন্তু তোমাকে হত্যা করে ফেলা হবে!** সে বলল ঠিক আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সেই বিরানভূমি খনন করে সেগুলো তালাশের নির্দেশ দিলেন। খনন করা হলে কিছু খাজানা বেরিয়ে এলো। বাদবাকি সম্পত্তির কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে তখনোও অস্বীকৃতি জানালো। তখন তিনি তাকে যুবাইরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তার কাছে যা কিছু আছে আমাদের হাতে আসার আগ পর্যন্ত তাকে শাস্তি দিতে থাকবে। যুবাইর রা. অগ্নিশলাকা দিয়ে তার বুকের ওপর পিটাতেন এতে করে তার মৃত্যু ঘটার উপক্রম হলো। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. এর হাতে অর্পণ করে দিলেন। মুহাম্মাদ তাকে মাহমূদ বিন মাসলামার বদলে হত্যা করে দিলেন। (খাইবরে একদিন মাহমূদ নায়েম দুর্গের প্রাচীরের সঙ্গে হেলান দিয়ে ছায়া গ্রহণ করছিলেন। এ সময় সে তার ওপর জাঁতাকল নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করে ফেলে।)

ইবনুল কাইয়্যিম উল্লেখ করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তাদের মাল লুকানোর কথা বলে দিয়েছিল কেনানার চাচাতো ভাই।

---

[৫৯৯] যাদুল মাআদ ২/১৩৬।

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে বন্দী করেন। তিনি ছিলেন কেনানা ইবনে আবীল হুকাইকের অধীনে। সবেমাত্র তাদের বিয়ে হয়েছিল।

গনীমতের মাল বণ্টন

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইচ্ছা ছিল ইহুদিদেরকে খাইবর থেকে পূর্ণরূপে উৎখাত করে দেওয়া। কিন্তু তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবদার করল, মুহাম্মাদ! একটি বারের মতো আমাদেরকে এখানে থাকার সুযোগ দিন! আমরা এখানে ন্যায়সঙ্গত জীবন যাপন করব। আমরা এর দেখাশোনা করব। কেননা, আপনাদের চেয়ে এর সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ অবগতি রয়েছে। অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কেরামের কাছে এমন কোনো গোলাম ছিল না, যারা এর দেখাশোনা করবে। আর তারা নিজেরাও এর দেখাশোনার জন্য সময় করতে পারছিলেন না। এ কারণে তিনি তাদেরকে এ শর্তে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন যে, সেখানে উৎপাদিত ফল-ফসলের অর্ধেক তারা পাবে আর বাকি অর্ধেক মদীনায় পাঠিয়ে দিবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন চাইবেন তারা সেখানে ততদিন থাকতে পারবে (আবার যখন তিনি চাইবেন সেখান থেকে তাদেরকে উৎখাত করে দিবেন)। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. কে তাদের উৎপাদনের হিসাব রাখার জন্য নিযুক্ত করেন।

খাইবরের জমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বমোট ছত্রিশ ভাগে ভাগ করেন। এর প্রত্যেক এক অংশ ছিল একশ' অংশের সমষ্টি। এ হিসেবে মোট ভাগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ছত্রিশ শ' তে । রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিম মুজাহিদরা পেয়েছিলেন অর্ধেক তথা আঠারো শ' অংশ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অংশও ছিল একজন সাধারণ মুসলিম সেনার অংশের মতোই। বাকি অর্ধেক তথা আঠারো শ' অংশ মুসলমানদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা করে রাখা হলো। আর সৈন্যবাহিনীর জন্য মোট আঠারো শ' ভাগ করা হলো এ কারণে যে, এটা ছিল মূলত হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ও অনুপস্থিত মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রতিশ্রুত পুরস্কার। আর তারা ছিলেন চৌদ্দশ' জন। আর তাদের মধ্যে অশ্বারোহী ছিলেন দুই শ' জন। প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য দুই ভাগ। সুতরাং এতে প্রয়োজন হয় সর্বমোট আঠারো শ' ভাগ। এতে অশ্বারোহী মুজাহিদরা পেলেন মোট তিন অংশ আর পদাতিকরা পেলেন এক অংশ।[৬০০]

---

৬০০ যাদুল মাআদ ২/১৩৭, ১৩৮।

গাযওয়ায়ে খাইবরে কি পরিমাণ গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল? তা বোঝা যায় ইবনে উমর রা. এর বরাতে ইমাম বুখারী রহ.এর বর্ণনা দ্বারা। তিনি বলেন, খাইবর বিজয়ের আগ পর্যন্ত আমরা কোনো দিন পেট ভরে খেতে পারিনি। হযরত আয়েশা রা. এর সূত্রে বুখারী রহ. বর্ণনা করেন, যখন খাইবর বিজিত হলো তখন আমরা বলতে লাগলাম, এখন আমরা পেট ভরে খেজুর খেতে পারব।[৬০১] আর এই গাযওয়ায়ে খাইবর থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পরে মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম আনসারী সাহাবায়ে কেরামকে তাদের ঐ সকল খেজুর গাছ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যা তারা ইতঃপূর্বে তাদেরকে দিয়েছিলেন। কারণ, ধন-সম্পদ আর খেজুর গাছ রূপে তখন তাদের জীবনে সমৃদ্ধির ছায়া পড়তে শুরু করেছিল।[৬০২]

জা'ফর বিন আবী তালিব এবং আশআরী সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যাবর্তন

এই গাযওয়া চলাকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাতো ভাই জা'ফর বিন আবী তালিব রা. এবং তাঁর সাথীবর্গ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের সঙ্গে আশআরী সাহাবায়ে কেরাম তথা আবু মূসা আশআরী রা. ও তার স্বজনরাও ছিলেন।

আবু মূসা রা. বলেন, আমরা ইয়েমেনে থাকতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সংবাদ পাই। তখন আমি ও আমার দুই ভাই আমাদের কবীলার পঞ্চাশ জনের কিছু বেশি লোক সঙ্গে নিয়ে হিজরত করে তার দিকে রওয়ানা করি। এ সফরে আমরা সমুদ্র পথ অবলম্বন করে একটা কিশতীতে সওয়ার হই। কিন্তু কিশতী আমাদেরকে হাবশায় নাজ্জাসীর কাছে নিক্ষেপ করে। সেখানে তার দরবারে আমরা জা'ফর রা. ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দেখতে পাই। জা'ফর রা. আমাদেরকে বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং এখানে বসবাস করতে বলেছেন। তোমরাও আমাদের সঙ্গে এখানে থেকে যাও। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। এরপর আমরা খাইবর বিজয়ের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন আমাদেরকেও গনীমতের মালে অংশীদার করেন। তিনি একমাত্র জাফর রা. ও তাঁর সঙ্গীদের ব্যতীত গাযওয়ায়ে খাইবর থেকে অনুপস্থিত কারও জন্য গনীমতের

---

[৬০১] সহীহ বুখারী ২/৬০৯।

[৬০২] যাদুল মাআদ ২/১৪৮। সহীহ মুসলিম ২/৯৬।

মাল বণ্টন করেননি। তাদের সঙ্গে আমাদেরকেও তিনি অংশীদার করেন।[৬০৩]

জাফর রা. যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি স্নেহের আতিশয্যে তাকে স্বাগত জানান ও তাঁর দুই চোখের মাঝখান বরাবর চুম্বন করেন এবং বলেন, **আল্লাহর কসম! জানি না আজ আমি খাইবর বিজয়ে বেশি খুশি না জাফরের আগমনে?**[৬০৪]

জাফর রা. এর এ উপস্থিতি হয়েছিল আমর বিন উমাইয়্যা যমরী রা. কে রাজা নাজ্জাসীর দরবারে পত্র দিয়ে প্রেরণ করার পরে। যে পত্রে তিনি তাদের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নাজ্জাসী দু'টি জাহাজে করে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখন তাদের সংখ্যা ছিল ষোল জন পুরুষ। তাদের সাথে ছিল তাদের ঐ সমস্ত নারী ও সন্তানরা, যারা রয়ে গিয়েছিল। বাদবাকি সকলে আগেই মদীনায় চলে এসেছিল।[৬০৫]

সাফিয়্যার সঙ্গে বিবাহ

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি, যখন সাফিয়্যার স্বামী আবুল হুকাইককে বিশ্বাসঘাতকতার দরুন হত্যা করা হয় তখন তাকে বন্দী করা হয়। অতঃপর সকল বন্দীকে একত্র করা হলে সাহাবী দাহইয়া ইবনে খলীফা কালবী রা. এসে আরয করেন, হে আল্লাহর নবী! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **তোমার পছন্দ মতো একটিকে তুমি নিয়ে যাও!** তখন তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে বেছে নিলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, হে আল্লাহর নবী! বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের সর্দারিনী রাজকুমারী সাফিয়্যাকে দাহইয়ার হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সে তো কেবল আপনারই যোগ্য। তখন তিনি বললেন, **তাহলে দাহইয়াকে বলো তাকে নিয়ে আসতে!** দাহইয়া রা. নিয়ে এলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যার প্রতি একবার তাকিয়ে বললেন, **তুমি অন্য একটি বাঁদী নিয়ে যাও!** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফিয়্যার সামনে ইসলাম পেশ করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে নিজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁর দাসমুক্তিকেই বিয়ের দেনমোহর হিসেবে ধরা হয়। মদীনায় ফেরার পথে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সাহবা' বাঁধ পর্যন্ত

---

[৬০৩] সহীহ বুখারী ১/৪৪৩। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৪৮৪-৪৮৭।
[৬০৪] যাদুল মাআদ ২/১৩৯। তাবারানী প্রণীত মু'জামুস সগীর ১/১৯।
[৬০৫] খিযরী প্রণীত মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ ১/১২৮।

পৌঁছেন তখন সাফিয়্যাহ রা. হালাল হয়ে গেলেন। উম্মে সুলাইম তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য প্রস্তুত করে রাতের বেলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দিয়ে দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিয়ে মধু-চন্দ্রিমা রাত যাপন করেন। এরপর লোকদেরকে খেজুর, ঘি ও ছাতু দ্বারা ওলীমা খাইয়ে দেন। পথে তিন দিন তার সঙ্গে নয়া-দম্পতির বাসর উদযাপন করেন।[৬০৬]

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখে একটি সবুজ চিহ্ন দেখতে পান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, **এটা কী?** সাফিয়্যা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খাইবরে আসার আগে শুক্লপক্ষের এক চন্দ্রালোকিত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আকাশের চাঁদটি যেন নিজের স্থান থেকে সরে আমার কোলে এসে পড়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আপনার ব্যাপারে আমার তখনো কোনো কল্পনা ছিল না। আমি আমার স্বামীর কাছে যখন স্বপ্নটি বর্ণনা করলাম তখন তিনি আমার মুখে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় বসিয়ে বললেন, তোর হৃদয়ে মদীনার সেই বাদশাহর আকাঙ্খা লালন করছিস্ তাই না![৬০৭]

বিষ-মিশ্রিত বকরীর ঘটনা

খাইবর বিজয়ের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সেখানে খানিকটা বিরাম ও স্বস্তি লাভ করেন তখন সাল্লাম ইবনে মিশকামের স্ত্রী যয়নব বিনতে হারিস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি ভূনা বকরী হাদিয়া পাঠায়। আগে সে জিজ্ঞাসা করে নেয় বকরীর কোন্ অঙ্গ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেতে বেশি পছন্দ করেন? তাকে জানানো হলো রাণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিক পছন্দনীয়। সে তখন তাতে আরও বেশি করে বিষ মেশায়। অতঃপর পুরো বকরীতে বিষ মিশিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিয়ে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সেটা পরিবেশন করা হলে তিনি সর্বপ্রথম রাণ উঠিয়ে হাতে নিলেন। তাতে প্রথম কামড়টি দিয়ে তিনি না গিলে তা ফেলে দেন। এরপর বলেন, **এ হাড়টি আমায় বলে দিচ্ছে সে বিষাক্ত।** মহিলাটিকে ডাকা হলে সে সত্যতা স্বীকার করে নিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তুমি এ কাজ কেন করতে গেলে?** সে বলল, আমি আপনাকে পরীক্ষা করেছি। যদি আপনি নিছক

---

[৬০৬] সহীহ বুখারী ১/৫৪, ২/৬০৪, ৬০৬। যাদুল মাআদ /১৩৭।
[৬০৭] প্রাগুক্ত। ইবনে হিশাম ২/৩৩৬।

প্রতাপশালী বাদশাহ হন, তবে আমরা আপনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব। আর যদি নবী হন তবে তা আপনাকে বলে দিবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করে দেন।

এ সময় বশীর ইবনে বারা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি একটি লোকমা গিলে ফেলে ছিলেন। ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বর্ণনার মাঝে যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করেছিলেন, না হত্যা করেছিলেন? পরে এ মতপার্থক্যের সমাধান এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, প্রাথমিকভাবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। এরপর যখন সাহাবী বিশর রা. মারা যান, তখন কিসাস হিসেবে তাকেও হত্যা করা হয়।[৬০৮]

খাইবরের বিভিন্ন অংশে উভয় শিবিরের নিহতের পরিসংখ্যান

মুসলিম মুজাহিদদের মধ্য থেকে সর্বমোট শহীদ হন ষোলো জন। তাদের মধ্যে চার জন ছিলেন কুরাইশের, এক জন বনু আশজা', এক জন বনু আসলাম, এক জন খাইবরের, আর বাদবাকি সকলে ছিলেন আনসারী মুসলমান।

কোনো কোনো বর্ণনায় মুসলিম শিবিরে আঠারো জনের শাহাদাতের কথা জানা যায়।

প্রখ্যাত সীরাত ঐতিহাসিক আল্লামা সুলাইমান মনসূরপুরী র. মুসলমানদের মোট ঊনিশ জন শহীদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেন । অতঃপর বলেন, অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি তেইশটি নাম পেয়েছি। তাবারীতে তার মাত্র একটি নামের উল্লেখ রয়েছে। আর ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন তার একটি নাম। একজন মারা গিয়েছিলেন বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশত খেয়ে। আরেকজনের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তিনি কি বদরে নিহত হয়েছিলেন, না খাইবরে? বিশুদ্ধ মতে তিনি বদর রণাঙ্গনে প্রাণ হারিয়েছিলেন।[৬০৯]

আর ইহুদি নিহতদের সংখ্যা ছিল সর্বসম্মতিক্রমে তিরানব্বই জন পুরুষ।

ফাদাক বিজয়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবরে পৌঁছে মুহাইয়্যিসাহ ইবনে মাসউদ রা. কে ফাদাকের ইহুদিদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার

---

[৬০৮] দেখুন যাদুল মাআদ ২/১৩৯, ১৪০। ফাতহুল বারী ৭/৪৯৭। মূল ঘটনা বুখারী শরীফে বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত উভয় আকারেই রয়েছে: ১/৪৪৯, ২/৬১০, ৮৬০। আরও দেখুন ইবনে হিশাম ২/৩৩৭, ৩৩৮।
[৬০৯] রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২৬৮-২৭০।

জন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করে। পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের হাতে খাইবরের পতন ঘটে তখন আল্লাহ তাদের হৃদয় ও মনে প্রচণ্ড ভীতি ঢেলে দেন। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠায় হুবহু খাইবরের অধিবাসীদের মতো যে, বাৎসরিক উৎপাদনের অর্ধেক মুসলমানদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন । যেহেতু কোনো প্রকারের অভিযান-অভিযাত্রা ব্যতীত এমনিতেই ফাদাক বিজিত হয়েছিল। এ কারণে, এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্ধারিত সম্পত্তি। এটা গনীমত হিসেবে বণ্টিত হয়নি; এর 'খুমুস' তথা পঞ্চমাংশও বের করা হয়নি।[৬১০]

ওয়াদীয়ে কুরা

খাইবর বিজয়ের পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনোযোগ নিবদ্ধ হয় ওয়াদীয়ে কুরার দিকে। সেখানে একদল ইহুদি বাস করত। আরবদেরও একটা গ্রুপ তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

মুসলমানরা সেখানে গিয়ে অবতরণ না করতেই ইহুদিরা তীর বৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে বরণ করে নিলো! তারা আগ থেকেই সারিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত হয়ে ছিল। তাতে প্রথম চোটেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিদআম নামক একটি গোলাম প্রাণ হারায়। লোকজন বলল, তার জন্য জান্নাত মুবারক হো! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মন্তব্য শুনে বললেন, **কখনোই না! ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার জান, খাইবরের দিন গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার আগেই যে শালটি সে লুকিয়ে রেখেছিল এখন সেটা তার ওপর আগুন হয়ে জ্বলছে।** লোকজন যখন এ কথা শুনল তখন একজন জুতোর একটি কিংবা দু'টি ফিতাও নিয়ে এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এই একটি কিংবা দু'টি ফিতাও আগুনের ।**[৬১১]

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুতি হিসেবে সারিবদ্ধ করলেন। মুসলিম বাহিনীর প্রধান পতাকা দিলেন সা'দ বিন উবাদা রা. এর হাতে। আর কয়েকটি ছোট ছোট পতাকা ছিল যথাক্রমে হুবাব ইবনে মুনযির, সাহল ইবনে হুনাইফ ও আব্বাদ ইবনে বশীর রা. এর হাতে। অতঃপর নিয়মানুযায়ী তিনি তাদেরকে ইসলামের

---

[৬১০] ইবনে হিশাম ২/৩৩৭, ৩৫৩।
[৬১১] সহীহ বুখারী ২/৬০৮।

প্রতি আহ্বান করলেন; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। উল্টো তাদের সারি থেকে একজন বেরিয়ে খণ্ডযুদ্ধের আহ্বান করল। মুসলিম শিবির থেকে যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম রা. বেরিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এরপর দ্বিতীয় আরেকজন বের হলে যুবাইর রা. তাকেও ঠাণ্ডা করে দিলেন। এরপর তৃতীয় আরেকজন বের হলে আলী রা. গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। এভাবে একে একে তারা জায়গায় দাঁড়িয়ে এগারো জন বীর পুরুষকে খুইয়ে বসে। যখনই একজন নিহত হতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাদবাকিদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

সেদিন যখনই কোনো নামাযের সময় হতো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামায পড়ে নিতেন আর নামাযের পরে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে ডাকতেন। এভাবে সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। পরের দিন ভোরে যখন তাদের ওপর মুসলমানরা সাঁড়াশি আক্রমণ চালালো। সূর্য এক ধনুক ওপরে উঠতে না উঠতেই তাদের হাতের সবকিছু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দিলো। এভাবে শক্তি ও প্রভাবের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে জয় করে ফেললেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাদের ধন-সম্পদ গনীমত স্বরূপ দান করেন। সাহাবীগণ প্রচুর পরিমাণে সম্পদ ও আসবাবপত্র লাভ করেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদীয়ে কুরাতে চার দিন অবস্থান করেন। সেখানে যুদ্ধলব্ধ মাল তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করে দেন। কেবল জমিন আর খেজুর গাছ ইহুদিদের হাতে রয়ে যায়। তাদের হাতে তিনি সেগুলি (খাইবরের মতো) বর্গাস্বরূপ রেখে দেন।[৬১২]

তায়মা

যখন তায়মার ইহুদিদের কাছে প্রথমে খাইবর, পরে ফাদাক এবং সর্বশেষে ওয়াদীয়ে কুরার পরিণতি ও মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণের সংবাদ গিয়ে পৌঁছল তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারণ করল না; বরং তারা নিজেরাই আগে বেড়ে মুসলমানদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রস্তাব কবুল করে নিলেন। এভাবে এ সকল ইহুদিদের ধন-সম্পদ তাদের কাছেই রয়ে গেল[৬১৩]

[৬১২] যাদুল মাআদ ২/১৪৬, ১৪৭।
[৬১৩] প্রাগুক্ত ২/১৪৭।

পাশাপাশি তাদের কাছে তিনি একটি পত্র প্রেরণ করলেন যার সার-সংক্ষেপ এমন: এটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে বনু আদিয়া বরাবর পত্র। তাদের জন্য যিম্মা রয়েছে। আর তাদের ওপর জিযয়া আরোপিত থাকবে। তাদের ওপর কোনো যুলুম করা হবে না কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করাও হবে না। রাত বিনম্র হবে আর দিন কঠোর হবে (অর্থাৎ এ সন্ধি সবসময় বহাল থাকবে)। আর এ পত্র লিখেছিনে খালিদ বিন সাঈদ রা.।[৬১৪]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথ ধরলেন। ফেরার পথে সাহাবায়ে কেরাম যখন একটি উপত্যকার কাছে গিয়ে পৌঁছেন তখন উচ্চস্বরে তারা তাকবীর দিয়ে ওঠেন, আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, **নিজেদেরকে সংযত রাখো! তোমরা কোনো বধির কিংবা দূরের কাউকে ডাকছ না। তোমরা ডাকছ এমন এক জনকে যিনি সবকিছু শোনেন; যিনি তোমাদের একেবারেই কাছে রয়েছেন।**[৬১৫]

এ সফরেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতভর পথ চলে একেবারে রাতের শেষভাগে পথে কোথাও বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন। বেলাল রা.কে বলে দেন, **আমাদের জন্য রাতের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখো!** (অর্থাৎ সুবহে সাদিক হতেই আমাদেরকে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিও) বেলাল রা. পূর্ব দিকে মুখ করে তার সওয়ারীর সঙ্গে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। এক সময় নিদ্রার প্রচণ্ডতা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাতভর-পথক্লান্ত বেলাল নিমেষে চুপসে গিয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসেন। এক সময় তিনিও ঢলে পড়েন বেঘোর ঘুমের মায়াবী কোলে। এভাবে পুরো মুসলিম শিবিরের কেউ আর জাগ্রত রইলেন না। ভোরে চারদিকে যখন ঊষার আলো ছড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে সূর্য-রশ্মি প্রবল তেজোদ্দীপ্ত হয়ে তাদের গায়ে এসে পড়ল। তখন তাঁরা জেগে উঠলেন। সবার আগে সজাগ পেলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তিনি সেই উপত্যকা থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জামাআতের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করলেন। কারও কারও মতে, এ ঘটনা এই সফরের নয়; বরং অন্য কোনো সফরে ঘটেছিল।[৬১৬]

---

[৬১৪] ইবনে সা'দ ১/২৭৯।
[৬১৫] সহীহ বুখারী ২/৬০৫।
[৬১৬] ইবনে হিশাম ২/৩৪০। ঘটনাটি হাদীসের অধিকাংশ গ্রন্থসমূহে সমধিক প্রসিদ্ধ। দেখুন যাদুল মাআদ ২/১৪৭।

খাইবরের বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনা প্রবাহের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বোঝা যায়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এসেছিলেন সপ্তম হিজরীর সফরের শেষ কিংবা রবীউল আউয়াল মাসে।

সারিয়ায়ে আবান ইবনে সাঈদ

বিশ্বের যে কোনো সমরভিজ্ঞ ও রণকুশলী সিপাহসালারের চেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বিষয়ে বেশি সতর্কতা ও সচেতনতা ছিল যে, হারাম মাস শেষ হওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে দূর ভূখণ্ডে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামের মারকায মদীনাকে পুরোপুরি খালি করে ফেলা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অথচ, এ মদীনার আশপাশে অহর্নিশ ঘোরাঘুরি করছে কতগুলি সুযোগ সন্ধানী বেদুঈনী রক্তচক্ষু; যারা মুসলমানদের উদাসীনতার সুযোগ সন্ধানী ছিল মদনিার ওপর লুট-তারাজ, ছিনতাই ও ডাকাতি করার জন্য। এ কারণে ঐ সকল বেদুঈন ও যাযাবরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদের দিকে একটা সারিয়া প্রেরণ করেন আবান ইবনে সাঈদ এর নেতৃত্বে । অথচ, তিনি তখন ছিলেন মদীনা থেকে বহু দূরে খাইবরের রৌদ্র-তপ্ত রণাঙ্গনের সন্ধানে। আপন দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে আবান ইবনে সাঈদ নিজ বাহিনী নিয়ে খাইবরে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হন। ততক্ষণে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য খাইবর বিজয় করে দিয়েছিলেন।

অধিকাংশ সীরাত ঐতিহাসিকের মতে, এ সারিয়া প্রেরণ করা হয়েছিল সপ্তম হিজরীর সফর মাসে। সহীহ বুখারীতেও এর আলোচনা রয়েছে।[৬১৭] হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী র. লেখেন, এ সারিয়ার বিস্তারিত বিবরণ আমি জানতে পারিনি।[৬১৮]

---

[৬১৭] দেখুন সহীহ বুখারী : গাযওয়ায়ে খাইবর অধ্যায় ২/৬০৮, ৬০৯।
[৬১৮] ফাতহুল বারী ৭/৪৯১।

সপ্তম হিজরীর অবশিষ্ট গাযওয়া ও সারিয়াসমূহ

গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা'

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের শক্তিশালী বড় বড় শত্রুর মধ্যে হতে দুই শত্রুর বাহু ভেঙ্গে দিলেন, তখন তিনি পরিপূর্ণ ভাবে তৃতীয় শত্রুর বাহু ভাঙ্গার জন্য অগ্রসর হলেন। আর তারা হল ঐ সমস্ত বেদুইন ও জাযাবর, যারা নজদের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াত এবং বিভিন্ন সময় লুট-তারাজ ও ছিনতাই করে বেড়াত।

যেহেতু এ সকল বেদুঈন জনগোষ্ঠী কোনো শহর কিংবা নগরে সমাজবদ্ধ মানুষের মতো বসবাস করত না এবং তারা কোনো কেল্লা ও দুর্গেও অবস্থান করত না; বরং ছোট ছোট জটলা বেঁধে বন-জঙ্গল আর গিরি-কন্দরের এখানে ওখানে পশুর মতো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকত। এ কারণে, তাদের ওপর প্রভাবের নিশ্ছিদ্র জাল বিস্তার করা কিংবা তাদের অনিষ্টতার আগুনে পানি ঢেলে চিরতরে নিভিয়ে দেওয়া অনেক কঠিন ছিল মক্কা ও খাইবরের দুশমনদের তুলনায়। এ কারণে, তাদের শিক্ষা দেওয়া ও ভয়ভীতি দেখানোর জন্য আক্রমণ করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা উপকারে আসবে না। তাই মুসলমানরা এ ধরনের আক্রমণ একের পর এক করে গেছেন।

যে সমস্ত বেদুঈন মদীনার বিভিন্ন প্রান্তে আক্রমণের জন্য একত্রিত হত তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে একত্রিত করার জন্য অথবা তাদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শিক্ষামূলক হামলা পরিচালনা করেন। ইসলামের ইতিহাসেই এটাই 'গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

অধিকাংশ সীরাত ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে চতুর্থ হিজরীতে পরিচালিত গাযওয়া বলে চালিয়ে দিয়েছেন। অথচ এ গাযওয়াতে আবু মূসা আশআরী রা. ও আবু হুরাইরা রা. এই দুই সাহাবীর উপস্থিত থাকা সুস্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে আর যাই হোক এটা ছিল গাযওয়ায়ে খাইবরের পরের ঘটনা। আর গাযওয়ায়ে খাইবর সংঘটিত হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। তাই বিশুদ্ধ মতে, এটা ছিল সপ্তম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ঘটনা।

এ গাযওয়া সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের বর্ণনার সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ: রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বনু আনমার কিংবা গাতফানের দুই শাখা বনু সা'লাবা ও বনু মুহারিবের মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ার সংবাদ এসে পৌঁছে। তখন তিনি চারশ' কিংবা সাত শ'

সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে দ্রুত তাদের উদ্দেশে যাত্রা করেন। মদীনাতে নিজের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান সাহাবী আবু যর রা. কিংবা উসমান বিন আফ্‌ফান রা. কে। তিনি একটানা সফর করে তাদের নির্ধারিত এলাকার সীমায় ঢুকে গিয়ে মদীনা থেকে দুই দিনের দূরত্বে 'নাখল' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে তিনি গাতফানের একটি দলের মুখামুখি হন। উভয় বাহিনী মুখামুখি এবং একে অন্যকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এর বেশি কোনো সংঘাত কিংবা সংঘর্ষ হয়নি। তবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে সেদিন 'সালাতুল খওফ' নামায আদায় করেন।

ইমাম বুখারী র. বর্ণনা করেন, ইক্বামাত বলা হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দলকে নিয়ে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। এরপর এ দল পশ্চাদে চলে যায়। তিনি দ্বিতীয় দলকে নিয়ে বাকি দুই রাকাআত আদায় করেন। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায ছিল চার রাকাআত। আর সাহাবায়ে কেরামের হয়েছিল দুই রাকাআত।[৬১৯]

আবু মূসা আশআরী রা. সূত্রে ইমাম বুখারী র. রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এক অভিযানে বের হলাম। আমাদের প্রত্যেক ছয়জনের ভাগে পড়ল একটি করে উট- একজনের পর একজন তার পিঠে আমরা আরোহণ করতাম। এতে আমাদের পা ফেটে গেল। আমার নিজের দু'খানি পাও ফেটে গেল। এক সময় আমার নখগুলি খুলে খুলে পড়ে গেল। তখন আমরা আমাদের ফাঁটা ও আহত পায়ে পটি বেঁধে নিলাম। এ কারণে সে অভিযানের নাম হয়ে গিয়েছিল গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' (পটি অভিযান)।[৬২০]

বুখারী শরীফে জাবের রা. থেকে বর্ণিত আছে, আমরা যাতুর রিকা' অভিযানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। (আমাদের অভ্যাস ছিল এই যে,) যখনই কোনো ছায়াঘেরা স্থানে আমরা বিরতি নিতাম সে স্থানটি আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ছেড়ে দিতাম। একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দিলেন। লোকজন এদিক সেদিক ছায়াঘেরা স্থানগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও একটি গাছের ছায়ায় অবতরণ করে গাছটির সঙ্গে তরবারি ঝুলিয়ে রাখলেন (এবং শুয়ে পড়লেন)। জাবের রা. বলেন, আমরা খানিকটা সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় এক মুশরিক হঠাৎ কোত্থেকে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

[৬১৯] সহীহ বুখারী ১/৪০৭, ৪০৮, ২/৫৯৩।
[৬২০] সহীহ বুখারীঃ গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' অধ্যায় ২/৫৯২। সহীহ মুসলিম গাযওয়ায়ে যাতুর রিকা' অধ্যায় ২/১১৮।

এর তরবারি হাতে নিয়ে বলল, তুমি কি আমাকে ভয় করো? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, না। সে বলল, তাহলে এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, **আল্লাহ**। জাবের রা. বলেন, এ সময় আমরা হঠাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাক শুনে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তার সামনে এক বেদুঈন বসে আছে। তিনি বললেন, **আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আর সে আমার তরবারি নিয়ে উঁচু করে ধরেছে। অতঃপর আমি জেগে উঠি। তখনো তার হাতে নাঙ্গা তরবারি। সে আমাকে বলল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এখন এই তো সে আমার সামনে বসা আছে।** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোনো তিরষ্কার করলেন না।

আবু আওয়ানা রা. এর রেওয়ায়াতে আরও একটু বিস্তারিত এসেছে যে, তখন তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে তরবারি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, **এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?** সে বলল, আপনি যদি দয়া করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল?** বেদুঈন জবাব দিলো, আমি আপনার সঙ্গে অঙ্গীকার করছি, আর কোনো দিন আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। তাদের সঙ্গেও মিশব না যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আবু আওয়ানা রা. বলেন, তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে নিজ কওমের কাছে এসে বলল, আমি তোমাদের কাছে আজ পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এসেছি।[৬২১]

সহীহ বুখারীর আরেকটি রেওয়ায়েতে মুসাদ্দাদ আবু আওয়ানা থেকে আর তিনি আবু বিশর রা. থেকে বর্ণনা করেন, সে লোকটির নাম ছিল গাওরাস ইবনে হারিস।[৬২২] হাফিয ইবনে হাজার বলেন, ঐতিহাসিক ওয়াকেদী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলেন, সেই বেদুঈনের নাম ছিল দু'সূর। সে পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার বক্তব্যের যাহেরী রূপ দেখলে মনে হয় এটা ছিল দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গাযওয়াতে সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন দু'টি ঘটনা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[৬২৩]

---

৬২১ শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ২৬৪। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৪১৬।

৬২২ সহীহ বুখারী ২/৫৯৩।

৬২৩ ফাতহুল বারী ৭/৪২৮।

এই গাযওয়া থেকে ফেরার পথে সাহাবায়ে কেরাম এক মুশরিক নারীকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। তখন তার স্বামী মানত করে যে, মুহাম্মাদের সাহাবায়ে কেরামের কারও রক্তপাত ঘটানো ছাড়া সে ঘরে ফিরবে না। এ দুরভিসন্ধি নিয়ে সে রাতের অন্ধকারে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাদ বিন বিশর ও আম্মার বিন ইয়াসির রা. কে মুসলিম বাহিনীর রাতের প্রহরী নিযুক্ত করেছিলেন। সে যখন এলো আব্বাদ বিন বিশর রা. তখন নামায পড়ছিলেন। অসভ্য নামাযের মধ্যেই তার দিকে তীর ছুঁড়ল। তীর তার গায়ে এসে বিঁধলে তিনি নামায ছেড়ে না দিয়ে ঝটকা টানে তীর খুলে ফেললেন। এরপর সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আরও দু'টি তীর ছুঁড়ল। কিন্তু আব্বাদ বিন বিশর ছিলেন নামাযে বিভোর। এভাবে তিনি তীর নিয়েই নামায শেষ করেন। এ সময় তার সঙ্গী আম্মার বিন ইয়াসির রা. জেগে এ অবস্থা দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি কেন আমাকে জাগাননি? তার অবিচল জবাব, আমি একটি সূরা পড়ছিলাম। তাই সেটার মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে শেষ করে দিতে মন চাচ্ছিল না।[৬২৪]

অসভ্য ও বর্বর যাযাবর জাতি-গোষ্ঠীর মনের ভেতরে আতঙ্ক ও ত্রাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এ গাযওয়া দারুণ সফল ছিল। এ কারণে এ গাযওয়ার উত্তরকালে প্রেরিত সারিয়া ও সামরিক অভিযানগুলির প্রতি যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখতে পাব, এ গাযওয়ার পরে গাতফানের কবীলাগুলি আর কখনো মুসলমানদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস পর্যন্ত পায়নি। বরং ভেজা বিড়ালের মতো ধীরে ধীরে চুপসে যেতে যেতে এক সময় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে বসে পড়ে। আরও একটু সামনে বেড়ে এক সময় ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই মক্কা বিজয়ের সময় অনেকগুলি বেদুঈন কবীলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিল। গাযওয়ায়ে হুনাইনেও তারা অংশগ্রহণ করেছিল। যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালেও তারা অংশীদার ছিল। এরপর মক্কা বিজয়ের পরে তাদের জনপদে যাকাত-সদক্বা উসূল করার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে এবং তারাও নিয়মানুযায়ী সদক্বা আদায় করেছেন।

এভাবে একটি একটি করে ইসলামের প্রধান ও মূল তিন দুশমনেরই ডানা ভেঙে গিয়েছিল। গোটা ইসলামী ভূখণ্ডে শান্তি আর শৃঙ্খলার এক স্বর্গীয় আবহ নেমে এসেছিল। জীবন সংগ্রামের পথে পথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবীলা ইসলামের দুর্গে যে সকল ফাটল ও ছিদ্র সৃষ্টি করেছিল। এবার মুসলমানদের সামনে সুযোগ এসেছিল তাদেরকে নিয়েই সে সকল ছিদ্র ও ফাঁক-ফোঁকর বন্ধ করে দিয়ে সাঁজানো গোছানো একটি সুন্দর বাসন্তী উদ্যান সৃষ্টি করা। বর্বর

---

[৬২৪] যাদুল মাআদ ২/১১২। এ গাযওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন ইবনে হিশাম ২/২০৩-২০৯, যাদুল মাআদ ২/১১০-১১২, ফাতহুল বারী ৭/৪১৭-৪২৮।

পৃথিবীর তপ্ত মরু সমুদ্রের মাঝে সুন্দর একটি সবুজ শান্তি-সুখের মরূদ্যান রচনা করার সময় তাদের সামনে এসে গিয়েছিল। বরং এবার নিজেদের দেশের জাতীয় সীমারেখা মুসলমানদের কাছে সংকীর্ণ ও তুচ্ছ মনে হতে লাগল। তাই তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়তে লাগল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র আর সাম্রাজ্যগুলিতে। কেননা, দেশের অভ্যন্তরীণ সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতি মুসলমানদের সম্পূর্ণ অনুকূলে এসে গিয়েছিল; এবং সেটাই এবার তাদেরকে যেন কানে কানে বলে দিয়েছিল- আমরা তো রয়েছিই; এবার একটু বাইরের পৃথিবীর প্রতি তোমাদের নজর দেওয়ার সময় এসেছে!

এ গাযওয়া থেকে ফিরে আসার পর সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাস পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থান করেন। তবে এ সময়ে বিভিন্ন দিকে তিনি বেশ কয়েকটি সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন। নিম্নে আমরা সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি:

এক. সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসী রাঃ এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর সফর কিংবা রবীউল মাসে কুদাইদের বনু মুলাওয়াহর দিকে। বনু মুলাওয়াহ কবীলা ইতঃপূর্বে সাহাবী বশীর ইবনে সুওয়াইদ রা. এর সঙ্গীদেরকে হত্যা করেছিল। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এই সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন। রাতের অন্ধকারে তারা আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করল। আর তাদের চতুষ্পদজন্তুগুলিকে হাঁকিয়ে মদীনার দিকে নিয়ে চলল। ওদিকে দুশমনের এক বিশাল বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। তারা মুসলমানদের গলার কাছে পৌছে গিয়েছিল এমন সময় কুদরতে বারী তাআলার অনুগ্রহ নাযিল হতে শুরু করে। নীল আসমান ঘনঘোর বর্ষার চাদরে জড়িয়ে পড়ে কালো অন্ধকার হয়ে যায়। শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি আর বজ্রপাত। উভয় বাহিনীর ঠিক মাঝখানে তৈরি হয় বিশাল এক নালা। আর এই নালা-ই দুশমনের জন্য কাল্ হয়ে দাঁড়ায়। কুদরতের অপার কারিশমায় মুসলমানদের ছোট্ট দলটি নিরাপদে বিজয়ী ও সফলবেশে মদীনায় ফিরে আসে।

দুই. সারিয়ায়ে হিসমাঃ এই সারিয়াটি প্রেরণ করা হয়েছিল সপ্তম হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে। 'পত্র-বিনিময়' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. সারিয়ায়ে উমর ইবনে খাত্তাবঃ এ সারিয়াটি প্রেরণ করা হয়েছিল সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে তুরাবা নামক স্থানের দিকে। উমর রা. এর সফরসঙ্গী ছিলেন ত্রিশ জন। তারা রাতের বেলায় পথ চলতেন আর দিনের বেলায় কোথাও লুকিয়ে থাকতেন। তারপরেও যখন তাদের আগমনের সংবাদ হাওয়াযিনের কাছে পৌছল তারা সবাই পালিয়ে গেল। উমর রা. তাদের মহল্লায় এসে কাউকেই পেলেন না। অতঃপর তিনি মদীনায় ফিরে এলেন।

চার. সারিয়ায়ে বশীর বিন সা'দ আনসারীঃ এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর শা'বান মাসে ফাদাকের এক প্রান্তে অবস্থিত বনু মুররার দিকে। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। তাদের বসতিতে আক্রমণ করে সাহাবায়ে কেরাম বকরী ও চতুস্পদ জন্তু হাঁকিয়ে মদীনার দিকে ফিরতি পথ ধরলেন। আর তখনই রাতের বেলায় দুশমন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। বিশরের সঙ্গীগণ তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু এক পর্যায়ে তাদের সকল তীর শেষ হয়ে গেল। আর তখন দুশমন তাদের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে ফেলল। কেবল সারিয়ার নেতা বশীর রা. প্রাণে বেঁচে যান। তাকে আহত অবস্থায় ময়দান থেকে উঠিয়ে ফাদাকের এক ইহুদির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার ক্ষত শুকানোর পর মদীনায় ফিরে আসেন।

পাঁচ. সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ লাইসী : এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর রমযান মাসে মায়ফা' নামক স্থানে বনু উয়াল ও বনু আব্দ ইবনে সা'লাবার দিকে। কারও কারও মতে এটা পাঠানো হয়েছিল কবীলায়ে জুহাইনার শাখাগোত্র হুরকাতের দিকে। বাহিনীর সদস্য ছিল একশ' ত্রিশ জন। তারা তাদের ওপর গিয়ে একযোগে হামলা চালিয়ে তাদের বাছা বাছা সরদারগুলিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করলেন। এরপর তাদের বকরী ও চতুস্পদজন্তু হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। এই সারিয়াতেই নাহীক ইবনে মিরদাস 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পরেও উসামা ইবনে যায়দ রা. তাকে হত্যা করে ফেলেছিলেন। মদীনায় উপস্থিত হওয়ার পরে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ ঘটনা জানানো হয় তখন তার মন দারুণ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাঁর যবান মুবারকে বেদনাবিদ্ধ হালকা ধমক বেরিয়ে আসেঃ **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?** উসামা রা. জবাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এমনটি বলেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তুমি কি তার বুক চিরে দেখেছ, সে সত্য না মিথ্যা বলেছে?**

ছয়. সারিয়ায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাঃ এই সারিয়া পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে। সদস্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন। এটা পাঠানোর কারণ ছিল আসীর কিংবা বশীর ইবনে যারেম বনু গাতফানকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা আসীরকে তখন খাইবরের ক্ষমতা লাভের লোভ দেখিয়ে তার ত্রিশ জন সঙ্গীসহ নিজ লোকালয় থেকে বের করে আনে। কিন্তু পথিমধ্যে করকরা নিয়ার নামক স্থানে পৌঁছে উভয় দলের মধ্যে বদগুমানি ও বাজে ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সংঘাতের সূচনা হয়। ফলাফলে আসীর ও তার ত্রিশ জন সঙ্গীর ভবলীলা সেখানেই সাঙ্গ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক ওয়াকেদী এ সারিয়াকে খাইবর যুদ্ধের কয়েক মাস আগে হিজরী ষষ্ঠ বর্ষের ঘটনা

বলে উল্লেখ করেছেন।

সাত. সারিয়ায়ে বশীর ইবনে সা'দ আনসারী: এই সারিয়া পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু গাতফানের ইয়ামান ও জাবার নামক স্থানের দিকে (অবশ্য কারও কারও মতে ফাযারা ও উযরা নামক স্থানে)। সদস্য সংখ্যা ছিল তিন শ' মুসলমান। উদ্দেশ্য ছিল মদীনার ওপর আক্রমণের অভিসন্ধি নিয়ে এগিয়ে আসা বিরাট এক শত্রুবাহিনীর মুকাবিলা করা। তারা দিনের বেলায় লুকিয়ে থেকে আর রাতের বেলায় সফর করে পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। দুশমনরা যখন বশীর রা. এর আগমনের সংবাদ পেল তখন সবাই পিছু টান দিলো। অসংখ্য উট আর দুই বন্দীকে নিয়ে বশীর রা. তখন মদীনায় ফিরে এলেন। দরবারে রিসালতে নীত হওয়ার পর বন্দীদ্বয় মুসলমান হয়ে যায়।

আট. সারিয়ায়ে আবুল হাদরাদ আসলামী: এটা পাঠানো হয়েছিল গাবা অঞ্চলের দিকে। ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. এটাকে উমরাতুল কাযার আগে সপ্তম হিজরীর সারিয়াসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো: জুশাম ইবনে মুআবিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি বিশাল এক বাহিনী নিয়ে গাবার দিকে অগ্রসর হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বনু কায়সকে মুসলমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সমবেত করা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দুশমনের অবস্থান ও গতিবিধি জানার জন্য আবুল হাদরাদকে দু'জন সঙ্গীসহ প্রেরণ করেন। তারা যখন দুশমনের কাছাকাছি পৌঁছলেন ততক্ষনে দিনমণি পশ্চিমাশায় রঙিন আভা ছড়িয়ে বিদায়ের পালকিতে চড়ে বসেছিল। আবু হাদরাদ এক স্থানে দ্রুত লুকিয়ে পড়েন। আর তার দুই সঙ্গী অন্য এক স্থানে গিয়ে লুকালেন। তাদের রাখাল এদিন ফিরতে দেরি করে ফেলল। ততক্ষণে রাতের কালো চাদর সবকিছুকে জড়িয়ে ধরেছিল। এ কারণে তাদের নেতা একাই দাঁড়িয়ে গেলেন। আবুল হাদরাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তিনি তার বুক বরাবর তীর ছুঁড়লেন। একটি কথাও বলতে পারল না। চিরতরে ঠাণ্ডা হয়ে গেল এ দুশমন। আবু হাদরাদ তার মাথা কেটে শিবিরের দিকে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে দৌড়ে গেলেন। অপর প্রান্ত থেকে তার দুই সঙ্গীও তাকবীর দিয়ে দৌড়ে এলেন। দুশমন বাহিনীর তখন পলায়ন ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। বিশাল এক বাহিনী ভেবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই পালিয়ে গেল। এভাবে মাত্র তিন জন মুসলমান বিজয় কেতন দমকা হাওয়ায় তুলে রাতের পথে অসংখ্য উট আর বকরী-ভেড়া হাঁকিয়ে মদীনার পথে পা বাড়ালেন।[৬২৫]

---

[৬২৫] যাদুল মাআদ ২/১৪৯, ১৫০। ইবনে হিশাম ২/৬২৯, ৬৩০। তার মতে, তিনি ছিলেন ইবনে আবী হাদরাদ। এ সারিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২২৯-২৩১, যাদুল মাআদ

উমরাতুল কাযা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম হাকেম র. বলেন, একাধিক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মদীনার আকাশে সপ্তম হিজরীর যুল কা'দ মাসের নতুন চাঁদ উঁকি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে গত বছরের কাযা উমরা আদায় করার নির্দেশ দান করেন। তিনি তাদেরকে আরও বলে দেন, হুদাইবিয়ার সময় যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের কেউ যেন এ যাত্রা থেকে পেছনে না থেকে যায়। এ কারণে যারা ইতোমধ্যে শাহাদাত বরণ করেছিল তারা ব্যতীত সবাই বের হলো। অন্যান্য বেশ কিছু লোকও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল। এতে তাদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো দুই হাজার। নারী ও শিশুরা এ হিসাবের বাইরে ছিল।[৬২৬]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় উওয়াইফ ইবনে আসবাত দাইলী কিংবা আবু রুহম গিফারী রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান। ষাটটি উট নিয়ে তিনি বের হলেন এবং এগুলোর দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন নাজিয়া ইবনে জুন্দুব আসলামী রা. কে। যুল হুলাইফা পৌঁছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন এবং তালবিয়া (হজ্জ ও উমরার দুআ বিশেষ) পাঠ করেন। সমস্ত মুসলমান তার সঙ্গে তালবিয়া পাঠ করেন। কুরাইশদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারির আশঙ্কায় তিনি সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র ও হাতিয়ার নিয়ে বের হন। অতঃপর যখন ইয়াজুজ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-বল্লম আর তীর ধনুক সহ সব ধরনের হাতিয়ার রেখে সাহাবী আউস ইবনে খাওলী আনসারী রা. কে দুই শ' জন লোক সহকারে এগুলোর তত্ত্বাবধানে পেছনে রেখে গেলেন। কেবল সফরের হাতিয়ার তথা কোষবদ্ধ তরবারি সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।[৬২৭]

মক্কায় প্রবেশকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কসওয়া নামক উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। মুসলমানগণ তালবিয়া পাঠ করতে করতে খাপঅবিমুক্ত তরবারি নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে চলছিলেন।

মুশরিকরা মুসলামদের অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য কা'বার উত্তর দিকে অবস্থিত

২/১৪৮-১৫০, তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৩১, শাইখ আব্দুল্লাহ নজদী প্রণীত মুখতাসারু সীরাতির রাসূল পৃষ্ঠা ৩২২-৩২৪।

[৬২৬] ফাতহুল বারী ৭/৫০০।

[৬২৭] প্রাগুক্ত। যাদুল মাআদ ২/১৫১।

কুআইকিআন নামক পাহাড়ে চলে যায়। তারা পরস্পরে আলাপকালে বলতে থাকে, তোমাদের কাছে এমন একটি দল কা'বা ঘর তওয়াফ করতে আসবে ইয়াসরিবের জ্বর যাদেরকে কমযোর করে দিয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামকে কা'বা ঘর তওয়াফের সময় প্রথম তিন তওয়াফে রমল (বিশেষ ভঙ্গিতে বুক ফুলিয়ে চলা) করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, রুকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মাঝখান দিয়ে চলতে। তাদের ওপর শুধু দয়া ও স্নেহবশতঃ তিনি তাদেরকে সবগুলি চক্করে রমল করার নির্দেশ দেননি। যাই হোক, এই রমল করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল মুশরিকদেরকে দেখিয়ে দেওয়া যে, আসলে তাঁরা দুর্বল হয়ে যাননি; তাদের রগের পানি এখনো শুকায়নি।[৬২৮] ঠিক একই উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইজতেবা' (চাদরের উভয় প্রান্ত ডান বগলের নীচ দিয়ে ঢুকিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে ডান কাঁধ খোলা রেখে তওয়াফ) করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পাহাড়ী পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন, যা হুজুন পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে। মুশরিকরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক নজর দেখার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর তালবিয়া পড়তে পড়তে অগ্রসর হলেন এবং (হারামে পৌঁছে) হাতের ছড়ি দ্বারা হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। এরপর কাবা ঘর তওয়াফ করেন। মুসলমানরাও তাঁর সঙ্গে তওয়াফ করেন। তখন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. কোষবদ্ধ তরবারি নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে সামনে নিম্নের লাইনগুলি আবৃত্তি করতে থাকেন:

خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهِ ... خَلُّوا فَكُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِهِ

قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ فِي تَنْزِيلِهِ .... فِي صُحُفٍ تُتْلَى عَلَى رَسُولِهِ

يَا رَبِّ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِقِيلِهِ ..... إِنِّي رَأَيْتُ الْحَقَّ فِي قَبُولِهِ

بِأَنَّ خَيْرَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِهِ ... الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ ... وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ[629]

---

[৬২৮] সহীহ বুখারী ১/২১৮, ২/৬১০, ৬১১। সহীহ মুসলিম ১/৪১২।

[৬২৯] বিভিন্ন রেওয়ায়েতে কবিতার লাইনগুলোর বিন্যাস ও শব্দে চরম পার্থক্য রয়েছে। তাই আমরা বিভিন্ন স্থান থেকে বিক্ষিপ্তগুলোকে এক জায়গায় এভাবে বিন্যস্ত করেছি।

'কাফেরের বাচ্চারা! তাঁর রাস্তা ছেড়ো দাও!! ছেড়ে দাও! কেননা, তাঁর নবুওতের মধ্যেই সকল কল্যাণ রয়েছে।

পরম করুণাময় রহমান নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। অর্থাৎ এমন কতগুলো সহীফা যা তাঁর রাসূলের ওপর তেলাওয়াত করা হয়।

হে আল্লাহ! আমি তাঁর কথায় ঈমান রাখি!! আর তাকে কবুল করে নেওয়াকেই হক্ব মনে করি।

যে, সর্বোত্তম মৃত্যু হলো যা আল্লাহর পথে হয়। আজ আমরা তাঁর অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী

এমন আঘাতই করব যে, মাথার খুলি উড়ে যাবে; বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে'!

আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, উমরা রা. তখন আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, ইবনে রওয়াহা! হারাম শরীফের মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে তুমি কবিতা পড়ছো? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **উমর! তাকে বলতে দাও। কেননা, এটা তাদের ভেতরে তীর নিক্ষেপের চেয়ে বেশী দ্রুত কার্যকর।**[৬৩০]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানগণ তিন চক্করে রমল করলেন। মুশরিকরা যখন তাদের এ অবস্থা দেখল তখন বলতে লাগল, তোমরা এ সকল লোককে ভেবেছ যে, ইয়াসরিবের জ্বর এদেরকে দুর্বল করে ফেলেছে! এখন দেখো তো এরা অমুক অমুকের চেয়েও অধিক শক্তিশালী ও বলীয়ান।[৬৩১]

তওয়াফ শেষ করার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করলেন। যখন তিনি সাঈ থেকে ফারেগ হলেন ততক্ষণে কুরবানীর পশু মারওয়ার কাছে থেমে গিয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দিকে ইশারা দিয়ে বললেন, **এটা কুরবাণীর স্থান। আর মক্কার সকল পথই কুরবাণীর স্থান।** এরপর তিনি মারওয়ার সন্নিকটে কুরবাণী করলেন এবং সেখানেই মাথা মুণ্ডালেন। মুসলমানগণও তার দেখাদেখি তাকে অনুসরণ করলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোককে ইয়াজুজে পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল তারা গিয়ে হাতিয়ার পাহারা দিবে। আর যারা এতক্ষণ পাহারায় ছিল, তারা এসে কুরবাণী করবে। সুতরাং, সবকিছু সেভাবেই হলো।

---

[৬৩০] তিরমিযীঃ অনুমতি প্রার্থনা ও শিষ্টাচার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতা প্রসঙ্গ অধ্যায় ২/১০৭।
[৬৩১] সহীহ মুসলিম ১/৪১২।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন মক্কায় অবস্থান করলেন। চতুর্থ দিন ভোরে মুশরিকরা আলী রা. এর কাছে এসে বলল, মুদ্দত শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং, তোমার সঙ্গীকে এবার বেরিয়ে যেতে বলো! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বেরিয়ে সারিফ নামক স্থানে অবতরণ করে সেখানে যাত্রাবিরতি করলেন।

যখন তিনি মক্কা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে হামযা রা.এর মেয়ে মুসলমানদের পেছনে পেছনে ছুটে আসে। সে ডাকতে থাকে, চাচা! চাচা!! আলী রা. গিয়ে তাকে নিয়ে নিলেন। আর তখন জা'ফর ও যায়দ রা. আলীর সঙ্গে তাকে নেওয়ার জন্য বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জাফরের জন্য ফয়সালা দিলেন। কেননা, বালিকার খালা ছিল জাফর রা. এর স্ত্রী।

এই উমরা কালেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমূনা বিনতে হারিস আমেরিয়্যা রা. কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। ইতঃপূর্বে মক্কায় দাখিল হওয়ার আগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর ইবনে আবী তালিব রা. কে মাইমূনার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। তখন মাইমূনা তার ব্যাপারটি আব্বাস রা. এর হাতে ন্যস্ত করে। কারণ, মাইমূনার বোন উম্মে ফযল ছিলেন আববাস রা. এর স্ত্রী। তখন আব্বাস রা. তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহ দেন। যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বের হয়ে গেলেন, তখন আবু রাফে' রা. কে পেছনে রেখে গেলেন, যাতে তিনি তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। সুতরাং, তিনি যখন সারিফ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করছিলেন তখন মাইমূনা রা. কে তার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গে বাসর করেন।[৬৩২]

ইসলামের ইতিহাসে এই উমরা 'উমরাতুল কাযা' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, এতে হুদাইবিয়ার উমরার কাযা আদায় করা হয়েছিল কিংবা এটা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী (কাযা থেকে তাকাযা অর্থে, যার অর্থ হলো ফয়সালা অনুযায়ী) সম্পন্ন হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণটিই গবেষক ও বিশ্লেষকদের নিকট অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। ইতিহাসে এই উমরার মোট চারটি নাম পাওয়া যায়ঃ এক. কাযা। দুই. কাযিয়্যাহ তিন. কিসাস। চার. সুলহ তথা সন্ধি।[৬৩৩]

[৬৩২] দেখুন যাদুল মাআদ ১/১৭২। ফাতহুল বারী ৭/৫০০।

[৬৩৩] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৫০০।

এ উমরা থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকটি সারিয়া প্রেরণ করেন:

এক. সারিয়ায়ে ইবনে আবীল আউজা: এটা পাঠানো হয়েছিল সপ্তম হিজরীর যুলহজ্জ মাসে। বাহিনীর সদস্য ছিল পাঁচ জন। বনু সুলাইমকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারা বলল, তোমাদের দাওয়াতের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; এরপর তারা রাসূল প্রেরিত বাহিনীর সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করল। আবুল আউজা লড়াইয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আর শত্রুপক্ষের দুই জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিল।

দুই. সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ: এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল অষ্টম হিজরীর সফর মাসে বাশীর বিন সা'দ রা. এর সঙ্গীদের দুর্ঘটনাস্থল ফাদাকে । বাহিনীর সদস্য ছিলেন এক শ' জন। শত্রু বাহিনীকে কচুকাটা করে তাদের পশু হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

তিন. সারিয়ায়ে যাতে আতলাহ: এটা পাঠানো হয়েছিল অষ্টম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে। বনু কুযায়া মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্য এক বিশাল বাহিনী জমা করেছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন কা'ব ইবনে উমাইর আনসারী রা. কে পনেরো জন সঙ্গীসহ তাদের কাছে প্রেরণ করেন। দুশমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তারা তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাদের সে ডাকে সাড়া দিলো না; উল্টো তাদের ওপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে শুরু করল। এতে এক পর্যায়ে তারা একে একে সবাইকে শহীদ করে দেয়। কেবল একজন বেঁচে থাকে। তাকে যুদ্ধের ময়দানে শহীদদের মাঝ থেকে মারাত্মক আহত অবস্থায় উঠিয়ে নেওয়া হয়।[৬৩৪]

চার. সারিয়ায়ে যাতে ইর্‌ক: এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল অষ্টম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বনু হাওয়াযিনের দিকে। বনু হাওয়াযিন একের পর এক ইসলামের দুশমনদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছিল। এ কারণে এখনই তাকে শায়েস্তা করার যরুরত ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুজা' ইবনে ওহাব আসাদী রা. কে পঁচিশ জন সঙ্গী দিয়ে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। তাঁরা দুশমনদের অসংখ্য পশু ধরে নিয়ে আসেন। কিন্তু কোনো লড়াই কিংবা সংঘর্ষের মুখামুখি হননি।[৬৩৫]

---

[৬৩৪] রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২৩১।

[৬৩৫] প্রাগুক্ত। আল্লামা ইবনুল জাওযী প্রণীত তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারি ৩৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

গাযওয়ায়ে মূতা বা মূতার যুদ্ধ

এটা ছিল নবী জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী লড়াই আর সর্বাপেক্ষা সংকটঘন সংঘর্ষ। তথাপি এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসের এক নয়া দিগন্তের উন্মোচন। অভিমানী খ্রিস্টান দুনিয়া জয়ের এক বিরল পূর্বাভাস। এই শোণ-বহানিয়া সমর সংঘটিত হয়েছিল অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উলা মোতাবেক ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বর মাসে।

মূতা হলো সিরিয়ার বলকার নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। সেখান থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস দুই মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।

যুদ্ধের কারণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিস ইবনে উমাইর আযদী রা. কে বুসরা শাসকের নিকট পত্র দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। তখন রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত বলকার গভর্নর শুরাহবীল ইবনে আমর গাস্সানী তাকে বন্দী করে শক্ত করে বেঁধে নির্মম ভাবে শিরচ্ছেদ করে।

তৎকালীন সময়েও দূত হত্যাকে বিশাল অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। প্রকৃতপক্ষে এটা একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ। এক হিসেবে এটাকে যুদ্ধ ঘোষণাই বলা যেতে পারে পারে; বরং এটা তার চেয়েও আরও বেশি দুঃসাহসিকতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি দারুণ বেদনাহত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি তখন তার বিরুদ্ধে তিন হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন।[৬৩৬] এক গাযওয়ায়ে আহযাব ব্যতীত ইসলামের ইতিহাসে এত বড় বাহিনী আর কোনোদিনও প্রস্তুত করা হয়েছিল না।

বাহিনীর সিপাহসালার ও তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহর নসীহত

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন হারেসা রা. কে এ বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, **যদি যায়দ নিহত হয় তবে জাফর। আর যদি জাফর নিহত হয় তবে আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা সিপাহসালার হবে।**[৬৩৭] এরপর তিনি তাদের জন্য একটি সাদা পতাকা বেঁধে যায়দ বিন হারেসা রা. এর হাতে অর্পণ করেন।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নসীহত করলেন, যেন তারা হারিস ইবনে উমাইর রা. এর শাহাদাতের স্থানে উপস্থিত হন। এরপর সেখানকার অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। যদি তারা

---

[৬৩৬] যাদুল মাআদ ২/১৫৫। ফাতহুল বারী ৭/৫১১।

[৬৩৭] সহীহ বুখারী: সিরিয়ার মূতা যুদ্ধ অধ্যায় ২/৬১১।

সাড়া দেয় তবে ভালো। আর যদি এর বিপরীত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তারা যেন রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তিনি তাদেরকে আরও বলে দেন, তোমরা আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। গনীমতের মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে না। কোনো নারী কিংবা শিশুকে হত্যা করবে না। দুর্বল বৃদ্ধ কাউকে হত্যা করবে না। গির্জার মধ্যে দুনিয়াবিচ্ছিন্ন লোকদেরকে তোমরা মারবে না। খেজুর কিংবা অন্য কোনো গাছ কাটবে না। কোনো বাড়ি-ঘর ধ্বংস করবে না।[৬৩৮]

মুসলিম বাহিনীর বিদায় ও আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহার কান্না

যখন মুসলিম বাহিনী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো তখন সকলে এক জায়গায় সমবেত হয়ে রাসূলুল্লাহর সিপাহসালারদেরকে বিদায় সালাম জানাতে লাগল। ঠিক এ সময় এক সিপাহসালার আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. কাঁদতে লাগলেন। লোকজন বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! দুনিয়া কিংবা তোমাদের ভালোবাসার মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে আমি কাঁদছি না। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনেছি, যাতে জাহান্নামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথায় পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা। [সূরা মারইয়াম:৭১]

আমি জানি না তখন আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে? লোকজন তখন বলল, আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তার সঙ্গে আপনাদের সাথী হোন! সকল বালা-মুসিবত প্রতিহত করুন এবং আপনাদেরকে বিজয়ী ও সফলবেশে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা বললেন,

لَكِنَّنِي أَسْأَلُ الرَّحْمٰنَ مَغْفِرَةً ... وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْذِفُ الزَّبَدَا

أَوْ طَعْنَةً بِيَدَيْ حَرَّانَ مُجْهِزَةً ... بِحَرْبَةٍ تَنْفُذُ الأَحْشَاءَ وَالكَبِدَا

حَتَّىٰ يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَىٰ جَدَثِي ... أَرْشَدَكَ اللهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

'কিন্তু আমি রহমান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে শাণিত তরবারি কিংবা অভিজ্ঞ বর্শাধারীর এক আঘাত চাচ্ছি যা কলিজা ও নাড়িভুঁড়ি

---

৬৩৮ শাইখ আব্দুল্লাহ প্রণীত মুখতাসারুস সীরাহ পৃষ্ঠা ৩২৭। ঘটনার উল্লেখ ব্যতিরেকে কেবল হাদীসটি সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। অতঃপর পথিক যখন আবার কবরের পাশ দিয়ে যাবে তখন বলবে, হায় আল্লাহর পথের যোদ্ধা! আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিয়েছেন। আর তিনিও হেদায়াত পেয়ে গেছেন'।

অতঃপর মুসলিম বাহিনী রওয়ানা হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বিদায় জানাতে পেছনে পেছনে সানিয়াতুল বিদা' পর্যন্ত চলে যান। এরপর সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে শেষ বিদায় দেন।[৬৩৯]

মুসলিম বাহিনীর অগ্রসর : এক ভয়াল দুনিয়া অবলোকন

মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে এক সময় হিজাযের উত্তরাঞ্চল সংলগ্ন সিরিয়ার মাআন নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। ঠিক এ মুহূর্তে তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, স্বয়ং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলকার অন্তর্গত মাআব নামক স্থানে এক লাখ রোমান সৈন্য নিয়ে শিবির স্থাপন করেছেন। তার সঙ্গে আবার লাখম, জুযাম, বলকায়ন, বাহরা ও বালী থেকে আরও এক লাখ সৈন্য মিলিত হয়েছে।

পরামর্শ সভা

নিজেদের মাটি থেকে এই সুদূর অজানা-অচেনা ভূখণ্ডে এসে এমন এক মরণ ফাঁদে আঁটকে যেতে হবে, দানবীয় সংখ্যার এমন এক বিশাল বাহিনীর মুখামুখি হতে হবে, এমন হিসাব মুসলমানদের মাথায় কোনোদিনও কষা হয়েছিল না। এ অঙ্কের ফলাফল তাদের কোনোদিনও জানা ছিল না। মাত্র তিন হাজার সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী দুই লক্ষ সৈন্যের বিশাল এক মহাসমুদ্রের কীভাবে মুকাবিলা করবে? এমন ভাবনা তারা কোনোদিনও ভেবেছিল না। চরম পেরেশানী আর দুশ্চিন্তার কালো মেঘ গোটা মুসলিম শিবিরকে ছেয়ে ফেলল। হতাশা আর নিরাশায় তাদের মতিভ্রম ঘটার উপক্রম হলো। দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে তারা দুই দিন মাআনে অবস্থান করলেন। একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন। গভীর ভাবনার জগতে ডুবে গেলেন। অনেকে পরামর্শ দিলেন, আল্লাহর রাসূলকে আমরা পত্র লিখে পুরো ব্যাপারটি অবহিত করি। এরপর তিনি যদি আরও সৈন্য পাঠিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেন তো করবেন নতুবা আমরা সম্মুখপানে অগ্রসর হবো।

কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. এ মতের বিরোধিতা করলেন। তিনি সৈন্যদেরকে উত্তেজিত করে তুললেন। তাদেরকে তিনি বললেন, হে লোকসকল! মনে রাখবে, যে বস্তু থেকে তোমরা এখন ইতস্তত পিছুটান দিচ্ছ, এটাতো ঐ শাহাদাত, যার অন্বেষণে তোমরা বের হয়েছ। আমরা কোনোদিনও জনবল কিংবা অস্ত্রবলে যুদ্ধ করতে পারি না; আমরা তো যুদ্ধ করি ঐ ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে, যেই ঈমানের ধনে আল্লাহ আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ ও ধন্য করেছেন।

[৬৩৯] ইবনে হিশাম ২/৩৭৩, ৩৭৪। যাদুল মাআদ ২/১৫৬।

সুতরাং, তোমরা সামনে অগ্রসর হও! দু'টি কল্যাণের একটি তোমাদের কপালে অবশ্যই লেখা আছেঃ হয়তো বিজয় অর্জন, নয়তো শহীদী মরণ। দীর্ঘক্ষণ পরামর্শ শেষে সালার আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. এর মতের ওপর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

দুশমন অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর অগ্রসর

মাআনে দু'দিন অবস্থান শেষে মুসলিম বাহিনী ধীরে ধীরে দুশমন অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল। এক পর্যায়ে বলকার মাশারেফ নামক জনপদে গিয়ে তারা হিরাক্লিয়াসের বিশাল বাহিনীর মুখামুখি হয়। তাদেরকে দেখে দুশমন ত্রস্তপদে সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে এড়িয়ে ঐতিহাসিক মূতা প্রান্তরে চলে যায় এবং সেখানে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। মুসলিম বাহিনীর ডান ভাগের সালার নিযুক্ত হন কুতবা ইবনে আবী কাতাদা। আর বাম পাশের সালার নিযুক্ত হন উবাদা ইবনে মালিক আনসারী রা.।

যুদ্ধের সূচনা : শাহাদাতের অবিস্মরণীয় ধারাবাহিকতা

অতঃপর মূতার ময়দানে উভয় দল মুখোমুখি হল। উভয় বাহিনী ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে এলো। শুরু হলো এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াই। প্রচণ্ড লোহুস্রোতে সমরাঙ্গন ভেসে যেতে লাগল। তিক্ত সংঘাতের এক বিষম বিষাদে সৈন্যদের চোখ-মুখ নীল হয়ে যেতে লাগল। তিন হাজার সৈন্যের এক ক্ষুদ্র দীপালি দুই লক্ষের দানবীয় ঝঞ্ঝার মুখে অনির্বাণ শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ ছিল গোটা পৃথিবীর ইতিহাসের এক বিস্ময়কর কিংবদন্তী। পৃথিবীর আকাশ ও মাটি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছিল তার সূর্য সন্তানের সুমহান কীর্তি। গোটা পৃথিবী উপুড় হয়ে দেখছিল এ অভিনব দৃশ্য। কিন্তু তারা জানবে কী করে- যখন ঈমানের দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে তখন পৃথিবীতে কত কিছুই না ঘটে যায়!

সর্বপ্রথম রাসূলের প্রিয়পুরুষ যায়দ বিন হারেসা রা. মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে অগ্রসর হন এবং বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করেন। রণাঙ্গনে তার তরবারি একের পর এক এমন কারিশমা দেখাতে থাকে ইসলামের বীর পুরুষদের কীর্তিগাথা ইতিহাস ব্যতীত অন্য কোথাও যার নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এভাবে তিনি যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে দুশমনের বল্লমে গেঁথে যান। শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে জমিনে লুটিয়ে পড়েন ইসলামের এ মর্দে মুজাহিদ।

মুসলিম বাহিনীর পতাকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে পলকে জাফর ইবনে আবী তালিব রা. সামনে অগ্রসর হয়ে পতাকা হাতে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি শুরু করলেন অভাবিতপূর্ব রণ কুশলতা। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা যখন যৌবনের উদ্বেল তরঙ্গে উথলে উঠতে লাগল তিনি তখন নিজের লালকালো অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে

অবতরণ করে তার পা কেটে দিলেন। এরপর আবার বীর বিক্রমে যুদ্ধ শুরু করলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে তার ডান হাত কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পতাকা তিনি বাম হাতে নিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর তার বাম হাত কেটে গেল। এবার তিনি দু'বাহু দ্বারা পতাকা জড়িয়ে উঁচু করে ধরলেন। এরপর তিনি শাহাদাতের পেয়ালায় ঠোঁট লাগান। সে সুধায় বিভোর হয়ে পেছনের সবকিছু ভুলে যান। বর্ণিত আছে, এক রোমান সৈন্য তাকে এত জোরে আঘাত করে যে তিনি দুই ভাগ হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা তার দুই হাতের পরিবর্তে জান্নাতে দু'টি ডানা দান করেন। যার দ্বারা তিনি সেখানে যেথায় ইচ্ছা ঘুরে বেড়ান। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে তাঁর নামই হয়ে যায় 'জাফর তাইয়্যার' তথা শূন্যে ভেসে বেড়ানো জাফর এবং 'জাফর জুল জানাহাইন' দুই ডানা বিশিষ্ট জাফর।

নাফে' সূত্রে ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়েত করেন, ইবনে উমর রা. তাকে সংবাদ দিয়েছেন, মূতা যুদ্ধের দিন জাফর রা. যখন শহীদ হলেন তখন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর শরীরের যখমগুলি গণনা করলাম। গণে দেখলাম তাতে পঞ্চাশটি তরবারি ও বর্শার আঘাত রয়েছে। তন্মধ্যে একটিও পিঠে ছিল না।[৬৪০]

অপর এক রেওয়ায়েতে ইবনে উমর রা. বলেন, সেই যুদ্ধে আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জাফর ইবনে আবী তালিব রা. কে আমি নিহতদের মাঝে পেলাম। তার শরীরে নব্বইটিরও বেশি তীর ও বর্শার আঘাত বিদ্যমান ছিল।[৬৪১] নাফে' থেকে উমরীর রেওয়ায়েতে এতটুকু বেশি রয়েছে, এ সব আঘাত তার শরীরের সামনের দিকে ছিল।[৬৪২]

এভাবে যখন বীরত্ব আর সাহসিকতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে জাফর রা. শহীদ হলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা রা. ত্বড়িৎগতিতে সামনে অগ্রসর হয়ে পতাকা হাতে তুলে নিলেন। তিনি তখন ঘোড়ার পিঠে ছিলেন। তিনি সামনে বেড়ে নিজেকে নিজে যুদ্ধের প্রতি উত্তেজিত করতে লাগলেন। কিন্তু তার ভেতরে খানিকটা ইতস্ততবোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। একটু পেছনে সরে গিয়ে বলতে লাগলেন,

أَقْسَمْتُ يَا نَفْسُ لَتَنْزِلِنَّهْ ... كَارِهَةً أَوْ لَتُطَاوِعِنَّهْ

إِنْ أَجْلَبَ النَّاسُ وَشَدُّوا الرَّنَّةْ ... مَا لِي أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةْ

'হে আমার নফস! আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি রণাঙ্গনে অবতরণ করো-তাতে তোমার ইচ্ছা থাক বা না থাক!!

---

৬৪০ সহীহ বুখারী: সিরিয়ার মূতা যুদ্ধ অধ্যায় ২/৬১১।

৬৪১ প্রাগুক্ত।

৬৪২ দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৫১২। এই দুই হাদীসের মাঝে বাহ্যত সংখ্যার ক্ষেত্রে মতভেদ দেখা যায়। এর সমতা বিধান হলো, যে ক'টা ক্ষতের সংখ্যা বেশি বলা হয়েছে তা সম্ভবত তীরের আঘাত হবে। দেখুন উল্লিখিত কিতাবগুলোতে।

যদি অন্যরা যুদ্ধের ময়দান সরগরম রাখে আর বর্শা তাক করতে থাকে তবে তারপরেও একলা তোমাকে কেন আমি জান্নাত থেকে দূরে বসা দেখছি?

এরপর তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। ইতোমধ্যে তাঁর চাচাতো ভাই একটি গোশতওয়ালা হাড় নিয়ে এসে বলল, ভাইজান! এটা দিয়ে পিঠ শক্ত করে নিন। কেননা আজ আপনি কঠিন বেহাল দশার মুখামুখি হয়েছেন। তিনি হাত থেকে সেটি নিয়ে একবার নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে কামড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে তরবারি হাতে উঠিয়ে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এভাবে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

আল্লাহর এক তলোয়ারের হাতে পতাকা

এ সময় বনু আজলানের সাবেত ইবনে আকরাম নামক এক ব্যক্তি এগিয়ে এলো। সে মুসলিম বাহিনীর পতাকা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, হে মুসলমানগণ! এখন তোমরা নিজেরাই একজনকে সিপাহসালার মনোনীত করো! লোকজন বলল, আপনিই এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিন! তিনি বললেন, আমি এ কাজ করতে পারব না। অতঃপর লোকজন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার হিসেবে মনোনীত করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলিম বাহিনীর পতাকা নিজের হাতে তুলে নিয়ে ভয়াল লড়াই শুরু করলেন। ইমাম বুখারী রহ. খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তরবারি ভেঙেছিল। শেষমেশ আমার হাতে কেবল একটা ইয়েমেনী চাকু রয়ে যায়।[৬৪৩] অন্য ভাষায়, মূতা যুদ্ধের দিন আমার হাতে নয়টি তরবার ভেঙে যায়। কেবল একটি ইয়েমেনী চাকু আমার হাতে রয়ে গিয়েছিল।[৬৪৪]

অপরদিকে মূতা রণাঙ্গনের সংবাদ পৌছার আগেই মদীনায় বসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে মানুষের কাছে যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, **মুসলিম বাহিনীর পতাকা যায়দ হাতে তুলে নিয়েছে। আর সে শাহাদাত বরণ করেছে। এরপর জাফর তুলে নিয়েছে সেও শহীদ হয়েছে। অতঃপর রওয়াহা তুলে নিয়েছে এবং সেও শাহাদাত বরণ করেছে-** তাঁর চোখ দিয়ে তখন শ্রাবণধারা নেমেছিল- **অতঃপর আল্লাহর এক তরবারি পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে (এবং এত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যে,) আল্লাহ তাআলা তাঁর হাত ধরে বিজয় দান করেছেন।**[৬৪৫]

---

[৬৪৩] সহীহ বুখারী: সিরিয়ার মূতা যুদ্ধ অধ্যায় ২/৬১১।
[৬৪৪] প্রাগুক্ত।
[৬৪৫] সহীহ বুখারী ২/৬১১।

যুদ্ধের সমাপ্তি

এ রকম চরম বীরত্ব আর সাহসিকতার মাধ্যমে মুসলমানরা যে বিস্ময়কর সাড়াজাগানিয়া কাজটি সময় মতো করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা হলো তাদের ক্ষুদ্র এই বাহিনীটি রোমান সৈন্যদের বিশাল সামুদ্রিক উথলে ওঠা জোয়ারের সামনে অজেয় বাঁধ নির্মাণ করে অবিচল রয়ে গিয়েছিল। তাদের এ প্রচণ্ড বিদ্রোহী স্রোতধারাকে তারা হাতে ঠেলে ধরে রেখেছিল। এ সময় মুসলমানদেরকে সুনিপুণভাবে ও নিরাপদে এ দানবীয় বাহিনীর নখর থেকে সরিয়ে নেওয়ার খালিদ বিন ওয়ালিদের রণকুশলতা ও রণদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছিল।

এ যুদ্ধের শেষ পর্ব কী ছিল? এ নিয়ে ঐতিহাসিক আর সীরাত বিশেষজ্ঞদের মাঝে রয়েছে চরম মতানৈক্য। তবে সকল রেওয়ায়েতের প্রতি গভীর দৃষ্টি দেওয়ার পর, যে সার-নির্যাসটুকু বেরিয়ে আসে তা হলো, খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. মুসলিম বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের প্রথম দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুরো সময় সেই দানবীয় রোমান বাহিনীর স্রোতের সামনে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এ সময় তিনি উপলব্ধি করলেন, এখন এমন একটি সমর-কৌশল অবলম্বন সময়ের অনিবার্য দাবি হয়ে গেছে যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ময়দান থেকে ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া যাবে আবার দুশমনদেরকেও পশ্চাদ্ধাবনের কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর ভালো করেই জানা ছিল, যদি মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ভাগতে শুরু করে আর রোমানরাও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে আরম্ভ করে তবে তাদেরকে রোমানদের কবল থেকে বাঁচানো বড়ই দুঃসাধ্য কাজ হবে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন ভোরে তিনি বাহিনীর অবস্থানের মধ্যে বিস্তর পরিবর্তন আনলেন। নতুন করে বিন্যাস দিলেন মুসলিম বাহিনীকে। সামনের ভাগকে পেছনে নিয়ে গেলেন আর পেছনের ভাগকে সামনে নিয়ে এলেন। একইভাবে ডানের ভাগকে বামে আর বামের ভাগকে ডানে নিয়ে গেলেন। দুশমন তাদের মুখামুখি হলে মুসলিম বাহিনীর এ দৃশ্য তাদের কাছে নতুন মনে হলো। তাই তারা চেঁচাতে লাগল, মুসলমানদের সাহায্যকারী বাহিনী এসে গেছে। এভাবে তাদের হৃদয়ে ভীতি ঢালার উদ্বোধনী পর্ব সফল হলো। যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণ পরে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ধীরে ধীরে মুসলিম বাহিনী নিয়ে পিছু হটতে শুরু করলেন। কিন্তু বাহিনীর শৃঙ্খলা যাতে অটুট থাকে এ দিকে ছিল তাঁর কঠোর দৃষ্টি। কিন্তু রোমানদের ধারণা ছিল মুসলমানরা তাদেরকে ধোঁকা দেওয়ার কৌশল আবিষ্কার করেছে। কিংবা হয়তো তারা চেষ্টা করছে তাদেরকে এমন এক পেঁচে ফেলে দেওয়ার, যাতে করে তাদের এই তপ্ত মরু-রণ-প্রাঙ্গণে এই বিশাল বাহিনী জীবন্ত দাফন হয়ে যায়।

এভাবে এ বিশাল শত্রু বাহিনী ধীরে ধীরে নিজেদের মাটিতে ফিরে গেল। কিন্তু একটিবারের জন্যও মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনের কথা তারা চিন্তা করল না। মুসলিম বাহিনীও নিরাপদে মদীনায় এলো।[৬৪৬]

উভয় পক্ষের হতাহতের পরিসংখ্যান

মুসলিম শিবিরের সে দিন বারো জন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। কিন্তু রোমানদের হতাহতের পরিসংখ্যান জানা যায়নি। তবে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এ সংখ্যা খুব একটা লঘু ছিল না।

যুদ্ধের ফলাফল

এ যুদ্ধে মুসলমানদের কাঙ্খিত ফলাফল যদিও অর্জিত হয়েছিল না। তাদের সেই স্বপ্নের প্রতিশোধ যদিও নেওয়া হয়েছিল না। যদিও সেই জ্বলন্ত দগদগে ক্ষতে এখনো সঠিক মলম লাগানো সম্ভব হয়েছিল না, যে দুষ্ট ক্ষত বহু দিন যাবত তাদেরকে ভুগিয়ে এসেছিল। তথাপি এটা তাদের সুনাম আর সুখ্যাতি সৃষ্টিতে বহু সহায়ক ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছিল। ঈমানের যে বিস্ময়কর জয়গান মুসলমানরা সেই দিন মূতা প্রান্তরে গেয়েছিলেন, এতে সমগ্র আরব কবীলা হয়রান হয়ে গিয়েছিল। যুগপৎ বিস্ময় আর আশ্চর্যে তারা হতভম্ব হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কারণ, গোটা পৃথিবীর সবার জানা ছিল রোমানরা হলো ভূপৃষ্টের ওপর সবচেয়ে শক্তি আর ক্ষমতাধর বাহিনী। এ কারণে যুদ্ধের আগে আরবদের ধারণা ছিল, এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে সেই বিশাল শক্তিধর দানবীয় বাহিনীর মুকাবিলা করতে যাওয়ার মানে হলো নিজের হাতে নিজের যমদূত ঘরে ডেকে নিয়ে আসা। কিন্তু পরবর্তীতে তারা দেখতে পেয়েছিল যে, তিন হাজার সৈন্যের সেই ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীটি দুই লক্ষ রোমান বাহিনীর জোয়ারকে কেমনে হাতে ঠেলে ফিরিয়ে দিয়ে নিরাপদে মদীনায় ফিরে এসেছে! এ কারণে এটা ছিল স্মরণ কালের সবচেয়ে বিস্ময়কর কাহিনী। পাশাপাশি আরও যে দিকগুলি সকলের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল তা হলো, মুসলমানদেরকে তারা এতদিন যেমনটি ভেবে আসছিল, আসলে তারা ঠিক তেমনটি নয়; বরং তারা এক ভিন্ন প্রকৃতির জাতি। তারা জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্গনে বিশ্বের মালিক আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত। আর তাদের প্রাণবিন্দু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সত্য রাসূল। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, তখনো যে সকল আরব কবীলা মুসলমানদের জানের দুশমন ছিল এ যুদ্ধের পর তড়িঘড়ি করে তারা সকলে ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয় নেয়। বনু সুলাইম, আশজা', গাতফান, যুবায়ান ও ফাযারা ইত্যাদি ছিল এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

---

[৬৪৬] দেখুন ফাতহুল বারী ৭/৫১৩, ৫১৪। যাদুল মাআদ ২/১৫৬। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এদু'টি উৎস এবং পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে এ যুদ্ধ ছিল রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষের সূচনা-পর্ব। এটা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর অর্ধেক ভূখণ্ড দখলে নেওয়া বিশাল রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হওয়ার ঐতিহাসিক ভুমিকার প্রথম পর্ব। আর এ পর্বের মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলঃ অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল আর শক্তিধর ভূখণ্ডগুলি একদিন মুসলমানদের পদানত হবেই হবে।

সারিয়ায়ে যাতুস সালাসিল

এ যুদ্ধে সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী আরব কবীলাগুলি মুসলমানদের সঙ্গে দুশমনি ও বিশ্বাসঘাতকতা করে রোমানবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ সংবাদ জানতে পারলেন তিনি পরম প্রজ্ঞা দ্বারা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিলেন অতি দ্রুত সেখানে একটি বাহিনী প্রেরণ করতে হবে, যাদের কাজ হবে তাদের ও রোমানদের মাঝের সম্পর্কে ফাটল ধরানো এবং তাদেরকে বাগিয়ে মুসলমানদের দলে নিয়ে আসা। যাতে করে ঘরের শত্রু দ্বারা আর কখনো তাদেরকে আক্রান্ত না হতে হয়।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তিনি দূরদর্শী সাহাবী আমর ইবনুল আস রা. কে মনোনীত করলেন। কেননা, তাঁর দাদী ছিলেন কবীলায়ে বালীর মেয়ে। এ কারণে, সেখানে তাঁর স্বজনরা ছিল। সুতরাং, এ উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে মূতা যুদ্ধের পরপরই তাকে প্রেরণ করেন। কারও কারও মতে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ এসেছিল যে, বনু কুযাআ মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য একটি বিশাল দলবল নিয়ে ছুটে আসছে। আর তখন তিনি তাকে প্রেরণ করেছিলেন। হতে পারে এখানে উভয় কারণ বিদ্যমান ছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল আস রা. কে একটি সাদা পতাকা বেঁধে দিলেন। পাশাপাশি আরেকটি কালো পতাকা দিলেন। সঙ্গে মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের তিনশ' জনের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তাতে অশ্বারোহী ছিল ত্রিশ জন। আমর ইবনুল আস রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশনা প্রদান করলেন যে পথে কবীলায়ে বালী, উযরা কিংবা বলকায়নের যার সঙ্গেই সাক্ষাৎ হবে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করবে। অতঃপর এ বাহিনী মদীনা থেকে বের হয়ে দিনে লুকিয়ে থেকে আর রাতভর সফর করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন তারা সে কওমের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলেন তখন জানতে পারলেন যে, সেখানে বিশাল এক বাহিনী সমবেত আছে। তখন তিনি রাফে' ইবনে মাকীস জুহানী রা. কে সাহায্য প্রার্থনা করে দরবারে রিসালতে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. কে ডেকে এনে দুইশ' যোদ্ধার একটি বাহিনী সমভিব্যাহারে প্রেরণ করেন। তাকেও তিনি একটি

ঝাণ্ডা বেঁধে দেন। সে বাহিনীতে আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর মতো মুহাজির ও আনছারগণের শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন। উবায়দাকে তিনি আমর ইবনুল আসের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। উভয়ে সম্মিলিত অবস্থায় থাকবে কোনো সময়ই দুই দল যেন বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায় তিনি এ নির্দেশ পরম গুরুত্বের সঙ্গে দিলেন। উভয় বাহিনী মিলিত হওয়ার পরে আবু উবাইদা রা. নামাযের ইমামতি করতে চাইলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আস রা. তাকে বললেন, আপনি সাহায্যকারী বাহিনী নিয়ে এসেছেন। কিন্তু পুরো বাহিনীর সিপাহসালার আমি। তখন আবু উবাইদা রা. তাঁর আনুগত্য করেন। সুতরাং, আমর ইবনুল আস রা. ইমাম হয়ে নামায পড়াতে থাকেন।

অতঃপর মুসলমানরা সেখান থেকে যাত্রা করে কুযাযা জনপদে এসে পৌঁছেন। এরপর তার বুক চিরে সুদূর সীমান্ত পর্যন্ত চলে যান। শেষ প্রান্তে গিয়ে তারা একটি বড়সড় বাহিনীর মুখামুখি হন। মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করলে তারা শহরে ভেগে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

আমর ইবনুল আস রা. আউফ ইবনে মালিক আশজাঈ রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সার্বিক পরিস্থিতি লিখে পাঠান। পত্রে তিনি সেখানে তাদের নিরাপত্তা, প্রত্যাবর্তন ও যুদ্ধের অবস্থা উল্লেখ করেন।

যাতে সালাসিল বা সুলাসিল ওয়াদীয়ে কুরার আগে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম। মদীনা থেকে এর দূরত্ব দশ দিনের পথ। অপরদিকে ইবনে ইসহাক র. উল্লেখ করেন, মুসলমানরা জুযাম অঞ্চলে 'সালসাল' নামক একটি কূপের পাড়ে অবতরণ করেছিল। আর এ কারণে এ সারিয়ার নাম হয়ে যায় 'যাতে সালাসিল'।[৬৪৭]

সারিয়ায়ে আবু কাতাদা

এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসে খাযিরার দিকে। কেননা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সংবাদ এসেছিল যে, বনু গাতফানের একটি বাহিনী খাযিরাতে সমবেত হয়েছে। খাযিরা ছিল নজদের ভেতরে কবীলায়ে মুহারিব জনপদের একটি স্থানের নাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন পনেরো সদস্যের একটি বাহিনীতে আবু কাতাদা রা. কে আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। তারা দুশমনদের অনেককে হত্যা করেন; বন্দী করেন এবং গনীমতের মাল লাভ করেন। এ অভিযানে তিনি পনেরো দিন মদীনার বাইরে থাকেন।[৬৪৮]

---

৬৪৭ দেখুন ইবনে হিশাম ২/৬২৩-৬২৬। যাদুল মাআদ ২/১৫৭।
৬৪৮ তালকীহু ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৩৩।

মক্কা বিজয়

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. বলেন, এটাই ছিল সেই কাঙ্খিত গৌরবময় বিজয়, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর দীন, তাঁর রাসূল আর তাঁর একনিষ্ঠ বাহিনীকে গর্বিত ও সম্মানিত করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সেই শহর আর ঘরকে কাফের ও মুশরিকদের নাপাক করতল থেকে মুক্ত করেছিলেন, যেই ঘরকে তিনি গোটা বিশ্ব মানব জাতির হেদায়াতের মারকায রূপে মনোনীত করেছিলেন। এটা ছিল দুনিয়ার এমন এক ঐতিহাসিক বিজয়, যার দ্বারা সৃষ্টির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আকাশে খুশি আর আর আনন্দের লহরি খেলে গিয়েছিল। তার মর্যাদার রাজটিকা মহাশূন্যের সমুন্নত নক্ষত্রের উর্ধ্বে উঠে লেগেছিল। মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। পরম আনন্দ আর ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে পৃথিবীর মুখ আলোর রৌশনী মেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।[৬৪৯]

অভিযানের কারণ

হুদাইবিয়ার সন্ধির ধারা বিবরণীতে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, তার একটি ধারা ছিল- যে কওম এই সন্ধিচুক্তিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে সে মিলিত হতে পারবে। আবার যে কুরাইশদের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে সেও এ সুযোগ পাবে। আর উভয় পক্ষের যে শিবিরেই অন্য কোনো কবীলা ঢুকবে সে ঐ পক্ষের একটি অঙ্গ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং সে অঙ্গের ওপর কোনো ধরনের যুলুম কিংবা বাড়াবাড়ি খোদ সেই পক্ষের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি পরিগণিত হবে।

এ শর্ত অনুযায়ী বনু খুযাআ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ অবলম্বন করে। আর বনু বকর কুরাইশের পক্ষ অবলম্বন করে। এভাবে উল্লিখিত কবীলাদ্বয় একে অপরের থেকে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত হয়ে যায়। জাহেলিয়াতের যুগে তাদের মাঝে চরম দ্বন্দ্ব আর কোলাহল সবসময় লেগেই ছিল। এরপর যখন ইসলামের আগমন ঘটল। কুরাইশদের সঙ্গে তাদের এ সন্ধিচুক্তি সংঘটিত হলো এবং উভয় পক্ষ একে অপর থেকে নিরাপত্তা ও শঙ্কাহীনতার এক সুখময় জীবন লাভ করল। তখন বনু বকর এটাকে পুরনো দিনের প্রতিশোধ নেওয়ার একটি মোক্ষম সময় ও স্বর্ণ-সুযোগ হিসেবে হাতিয়ে নিতে চাইল। এরপর বনু বকরের নওফল ইবনে মুআবিয়া চরম বিশ্বাসঘাতকতার ওপর ভর করে স্বগোত্রীয় একটি দল নিয়ে অষ্টম হিজরীর শা'বান মাসের এক অন্ধকার রাতে বনু খুযাআর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে সেই রাতের অন্ধকারে জন্ম নিলো এক

---

৬৪৯ যাদুল মাআদ ২/১৬০।

নতুন ইতিহাস। এ সময় বনু খুযাআ ওতীর নামক একটি কূপের পাড়ে তাঁবু স্থাপন করে অবস্থান করছিল। তাদের অনেক লোক প্রাণ হারালো। এরপর উভয় পক্ষের মাঝে কিছু সংঘাত ও সংঘর্ষ হলো। কুরাইশরা হাতিয়ার দিয়ে এ যুদ্ধে বনু বকরকে সাহায্য করল। কিছু সুযোগ সন্ধানী কুরাইশী বর্ণচোরা রাতের আঁধারের সুযোগ নিয়ে সরাসরি বনু খুযাআর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। মারতে মারতে এক পর্যায়ে তারা বনু খুযাআকে হারামের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল। তারা হারাম শরীফে ঢুকে গেলে বনু বকর বলল, নওফল! আমরা তো হারামের মধ্যে ঢুকে গেছি। তোমার ইলাহ.........তোমার ইলাহ............। জবাবে নওফল একটি মারাত্মক শব্দ উচ্চারণ করল। সে বলল, হে বনু বকর! আজ কোনো ইলাহ নেই!! তোমরা ভালো করে তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নাও!!! আমার জীবনের শপথ! তোমরা হারামের ভেতরে চুরি করে বেড়াও তবে আজ তাতে প্রতিশোধ নিতে কেন দরবেশী দেখাচ্ছ?

মক্কায় প্রবেশ করে বনু খুযাআ বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা খুযাঈ এবং তাদের রাফে' নামক এক গোলামের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলো।

আমর ইবনে সালেম খুযাঈ তৎক্ষণাৎ দ্রুত মদীনার পথে রওয়ানা হলো। সে যখন মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে পৌছল, তখন তিনি মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। সেখানে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে এই কবিতাগুলি আবৃত্তি করতে লাগল:–

يَا رَبِّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدَا ... حِلْفَنَا وَحِلْفَ أَبِيهِ الْأَتْلَدَا

قَدْ كُنْتُمْ وَلَدًا أَبًا وَكُنَّا وَالِدَا ... ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِعْ يَدَا

فَانْصُرْ هَدَاكَ اللهُ نَصْرًا أَبَدَا ... وَادْعُ عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا

فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَدْ تَجَرَّدَا ... أَبْيَضَ مِثْلَ الْبَدْرِ يَسْمُو صُعُدَا

إِنْ سِيمَ خَسْفًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَا ... فِي فَيْلَقٍ كَالْبَحْرِ يَجْرِي مُزْبِدَا

إِنَّ قُرَيْشًا أَخْلَفُوكَ الْمَوْعِدَا ... وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَا

وَجَعَلُوا لِي فِي كَدَاءٍ رَصَدَا ......وَزَعَمُوا أَنْ لَسْتُ أَدْعُو أَحَدَا

وَهُمْ أَذَلُّ وَأَقَلُّ عَدَدَا .... هُمْ بَيَّتُونَا بِالْوَتِيرِ هُجَّدَا

وَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدَا

'হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদ সা. কে তাঁর চুক্তি ও অতীতে তাঁর পূর্বপুরুষের চুক্তির[৬৫০]দোহাই দিয়ে বলছি,

তোমরা ছিলে শিশু আর আমরা ছিলাম জন্মদাতা।[৬৫১] অতঃপর আমরা তোমাদের অনুগত হয়েছি এবং কখনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিনি।

আল্লাহ আপনাকে হেদায়াত দিন! আপনি পুরোপুরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। আর আল্লাহর বান্দাদেরকেও আহ্বান করুন তারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে।

যাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল থাকবে, হাতিয়ার মুক্ত, আকাশের বুকে উত্থিত পূর্ণ চাঁদের সুষমামণ্ডিত।

তখন যদি তাদের ওপর যুলুম ও অপমান করা হয় তবে চেহারা লজ্জা ও যিল্লতির ধূলায় ধূসরিত হয়। আপনি এমন এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসবেন যা তরঙ্গোত্তাল অম্বুধির মতো জোশে ফেনা ঠেলতে থাকবে।

নিঃসন্দেহে কুরাইশরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং আপনার সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি ভেঙে ফেলেছে।

তারা আমার জন্য জায়গায় জায়গায় পাহারা বসেছে এবং ভেবেছে আমি সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকতে পারব না।

অথচ তারা নিতান্তই লাঞ্ছিত এবং সংখ্যালঘু। রাতের অন্ধকারে তারা ওতীরের ওপর আক্রমণ করেছে।

আমরাদেরকে তারা রুকূ ও সিজদা অবস্থায় হত্যা করেছে। [অর্থাৎ আমরা মুসলমান হয়েছিলাম আর তখন আমাদেরকে হত্যা করা হয়েছে]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এ কথা শুনে বললেন, **আমর ইবনে সালিম! তোমাকে যথাযথ সাহায্য করা হবে।** ঠিক সেই মুহূর্তে গোটা আকাশ একখণ্ড কালো মেঘে ছেয়ে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এই মেঘ বনু কা'বকে সাহায্যের সুসংবাদ দিচ্ছে!**

অতঃপর বুদাইল ইবনে ওয়ারাকা খুযাঈ বনু খুযাআর একটি দল নিয়ে মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে হাযির হলো। দরবারে রিসালতে তারা তাদের মুসীবতের কথা তুলে ধরল। পাশপাশি তাদের বিরুদ্ধে বনু বকরকে কুরাইশদের সাহায্যের অন্যায়ের কথা তুলে ধরল। সবকথা শেষ করে তারা মক্কায় ফিরে গেল।

---

[৬৫০] আব্দুল মুত্তালিবের যুগ থেকে চলে আসা বনু হাশিম ও বনু খুযাআর চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত।

[৬৫১] উদ্দেশ্য আবদে মানাফের মা তথা কুসাইর স্ত্রী হুবাই ছিল খুযাআ গোত্রের মেয়ে।

সন্ধি নবায়নের জন্যে মদীনার পথে আবু সুফিয়ান

সন্দেহ নেই, কুরাইশ ও তার মিত্ররা যে কাজ করেছিল, তা ছিল মুসলমানদের সঙ্গে নিছক গাদ্দারি ও স্পষ্ট সন্ধিভঙ্গি । তার কোনো ধরনের বৈধ আপত্তি ও ওজর ছিল না। এ কারণে, কুরাইশরা দ্রুত তাদের এ গাদ্দারি ও তার ভয়াল পরিণতির কথা উপলব্ধি করল এবং সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শ সভা ডাকল। সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানকে সন্ধি নবায়নের জন্য তাদের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় পাঠাবে।

চরম এ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কুরাইশরা এখন এর পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য কী পন্থা অবলম্বন করবে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে আগেই জানিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, **আমি যেন আবু সুফিয়ানকে সন্ধিচুক্তি নবায়ন ও মেয়াদবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আসতে দেখছি।**

কুরাইশদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু সুফিয়ানের মক্কা থেকে বের হয়ে পথে বুদাইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। বুদাইল তখন মদীনা থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করল, বুদাইল! কোত্থেকে ফেরা হচ্ছে বলবে? তার ধারণা ছিল সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকেই ফিরছে। বুদাইল বলল, খুযাআর সঙ্গে আমি এই উপকূল ও উপত্যকীয় অঞ্চলে গিয়েছিলাম। আবু সুফিয়ান এবার তাকে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করল, তবে কি তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাওনি? বুদাইল বলল, না।

বুদাইল চলে যাওয়ার পরে আবু সুফিয়ান বলল, সে যদি মদীনা থেকে এসে থাকে তবে তার উটের লেদায় খেজুরের আঁটি পাওয়া যাবে। এ কারণে সে বুদাইল যেখানে তার উট বসিয়েছিল, সেখানে এসে উটের লেদা নেড়েচেড়ে তাতে খেজুরের আঁটি দেখতে পেয়ে বলল, আমি আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি, বুদাইল মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিল!

যাই হোক এরপর আবু সুফিয়ান মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো। প্রথমে সে নিজ মেয়ে উম্মুল মুমিনীন উম্মে হাবীবা রা. এর বাড়িতে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিছানার ওপর বসতে গেলে উম্মে হাবীবা সঙ্গে সঙ্গে বিছানার চাদর একদিকে গুটিয়ে নেন। আবু সুফিয়ান তখন বলে ওঠে, মা আমার! আমার প্রতি লক্ষ্য করে চাদরটি সরিয়ে নিয়েছ, না কি চাদরের প্রতি লক্ষ্য করে সেটা আমার থেকে সরিয়ে নিয়েছ? উম্মে হাবীবা রা. বললেন, এটা আল্লাহর রাসূলের বিছানার চাদর! তোমার মতো একটা নাপাক মুশরিক এ বিছানায় বসতে পারে না। আবু সুফিয়ান বলল, আল্লাহর কসম! আমার কাছ থেকে দূরে সরার পর তুমি খারাপ হয়ে গেছ।

অতঃপর সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আলোচনা শুরু করল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার জবাবে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। এতে আবু সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে আবু বকর রা. এর কাছে গিয়ে রাসূলের সঙ্গে তার ব্যাপারে আলোচনা করতে বলে। আবু বকর রা. তাকে বলে দেন, আমি এ কাজ করতে পারব না। এরপর আবু সুফিয়ান উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে গিয়ে তার ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করে। উমর রা. তাকে বলে দেন, তোমাদের জন্য আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ করব? আল্লাহর কসম! আমার কাছে যদি এক টুকরো লাকড়ী ছাড়া আর কিছু না থাকে তবে আমি সেটি দিয়েই তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব!! এরপর সে আলী রা. এর কাছে যায়। তখন তার কাছে ফাতেমা রা. ছিলেন। শিশু হাসান রা. উভয়ের সামনে খেলা করছিলেন। আবু সুফিয়ান বলল, আলী! তুমি আমার প্রতি সবার চেয়ে বেশি রহমদিল!! আমি একটা প্রয়োজনে মদীনায় এসেছিলাম। তাই খালি হাতে ফিরে যেতে মন চাচ্ছে না। আমার ব্যাপারে মুহাম্মাদের কাছে একটু সুপারিশ করে দিবে? আলী রা. বললেন, হায় আবু সুফিয়ান! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতোমধ্যেই এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, যা আমি তোমার কাছে খুলে বলতে অক্ষম। তখন আবু সুফিয়ান ফাতিমা রা. এর দিকে চেয়ে বলল, তুমি কি এটা পারবে যে, তোমার শিশুপুত্র সকলের মাঝে আমাদের নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে চিরদিনের জন্য আরবের বাদশা হয়ে থাকবে? তিনি বললেন, আমার এই ছেলের সে বয়সই এখন পর্যন্ত হয়নি। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্তমানে নিরাপত্তার ঘোষণা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।

তখন আবু সুফিয়ানের সামনে গোটা দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যায়। সে চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকে। আরও নরম হয়ে গিয়ে বিনম্র ও প্রশান্ত কণ্ঠে সে আলী রা. এর নিকট আরয করে, আবুল হাসান! পরিস্থিতি এখন বড় কঠিন ও সঙ্গিন হয়ে গেছে! এ মুহূর্তে কী করা যায় একটু বলবে? আলী রা. বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার কাজে আসে এমন কোনো কথা কিংবা পরামর্শ এ মুহূর্তে আমার জানা নেই। কিন্তু তুমি যেহেতু বনু কেনানার সরদার। তাই তাদের মধ্যে গিয়ে নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে দিতে পারো। এরপর নিজের ঘরে গিয়ে দেখতে পারো অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আবু সুফিয়ান বলল, এতে কি কোনো কাজ হবে তোমার মনে হয়? আলী রা. বললেন, তেমনটা তো মনে হয় না; কিন্তু এ ছাড়া আমি তোমার জন্য আর কী-ই বা করতে পারি? তখন আবু সুফিয়ান মসজিদে নববীতে গিয়ে সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলো, হে লোকসকল! আমি

তোমাদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দিচ্ছি। এরপর উটে সওয়ার হয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

কুরাইশের কাছে এসে পৌঁছলে তারা জিজ্ঞাসা করল, কেমন সুবিধে করতে পেরেছ? আবু সুফিয়ান বলল, আমি সর্বপ্রথম মুহাম্মাদের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু সে আমার কথার একটা জবাবও দেয়নি। এরপর আমি আবু কুহাফার পুত্রের কাছে গিয়েছি। কিন্তু তাঁর কাছেও কোনো ফায়েদা হয়নি। এরপর আমি উমর ইবনে খাত্তাবের কাছে গিয়েছি। তখন তাকে দেখেছি আমাদের সবচেয়ে কট্টর দুশমন। অতঃপর আমি আলীর কাছে গিয়েছি। তাকে দেখেছি সবার চাইতে নরম। সে আমাকে একটি পরামর্শ দিয়েছে এবং আমি সে মোতাবেক কাজ করে এসেছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! তাতে কোনো ফায়েদা হবে বলে মনে হয় না!! এ কথা শুনে নেতারা ভ্রুকুটি করল। কপালে ভাঁজ নামিয়ে তারা বলল, সেটা কী শুনি? আবু সুফিয়ান বলল, সে আমাকে লোকদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দিতে বলেছে। আর আমি ঘোষণা দিয়ে চলে এসেছি। তারা বলল, মুহাম্মাদ কি সেটা বহাল রেখেছে? আবু সুফিয়ান বলল, না। তারা বলল, হায়-হায়!! তবে সে তো তোমার সঙ্গে খেলা করেছে মাত্র! আবু সুফিয়ান বলল, এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

যুদ্ধের প্রস্তুতি : গোপন রাখার চেষ্টা

ইমাম তাবারানী র. এর রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় কুরাইশদের সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করার সংবাদ মদীনায় পৌঁছার তিন দিন আগে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. কে তাঁর আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু কেউ-ই জানত না কী ঘটতে যাচ্ছে। আবু বকর রা. মেয়ের কাছে এসে বললেন, বেটি! এ কীসের প্রস্তুতি? আয়েশা রা. বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কিছুই জানি না। আবু বকর রা. তখন বললেন, বনু আসফারের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তো এটা নয়! তাহলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথায় যাবেন? আয়েশা রা. বললেন, সেটাই তো এখনো জানতে পারিনি।

অতঃপর তৃতীয় দিন ভোরে আমর ইবনে সালেম খুযাঈ এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দাঁড়িয়ে يَا رَبِّ إِنِّيْ نَاشِدٌ مُحَمَّدًا এই কবিতাগুলো যখন আবৃত্তি করে তখন সাহাবায়ে কেরাম কুরাইশদের সন্ধিচুক্তি ভঙ্গের ঘটনা জানতে পারেন। আমর যাওয়ার পর আসে বুদাইল। বুদাইলের পর আসে আবু সুফিয়ান। তখন তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সফরের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন।

তাদেরকে তিনি জানিয়ে দেন, এবার তাঁর লক্ষ্য স্বপ্নের নগরী মক্কা। তাঁর যবান মুবারক থেকে মহান প্রভু সমীপে আরযী বের হয়ঃ **হে আল্লাহ! কুরাইশদের দোরগোড়ায় গিয়ে আচমকা আর্বিভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের গুপ্তচর কিংবা অবগতি থেকে আমাদেরকে দূরে রেখো!**

গোপনীয়তার এ পথ আরও সরু করার লক্ষ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর পয়লা রমযানে সাহাবী আবু কাতাদা ইবনে রিবয়ী রা. এর নেতৃত্বে আট জন সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী মদীনা থেকে ছত্রিশ আরবীয় মাইল দূরে অবস্থিত যু-খাশাব ও যুল মারওয়ার মধ্যবর্তী বাতনে ইযাম নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সবাই ভেবে নেয় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকেই যাত্রা করবেন। বাস্তবে দেখা গেল, এ সংবাদই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এরপর যখন সারিয়াটি তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছল তখন তারা জানতে পারল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পথে যাত্রা করেছেন। তখন তাঁরাও তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।[৬৫২]

অপরদিকে বদরী সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাত্রার সংবাদ জানিয়ে কুরাইশদের কাছে একটি পত্র লেখেন। এরপর তিনি পত্রটি কিছু বিনিময় সাপেক্ষে একটি মহিলার হাতে তুলে দিয়ে কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। পত্রটি মহিলা তার চুলের বেণির ভাঁজে লুকিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাতেবের কারবার সম্পর্কে আকাশ থেকে একটি ঝড়োবার্তা চলে আসে। তিনি সেই মহিলার খোঁজে আলী, মিকদাদ, যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম ও আবু মারসাদ গানাবী রা. কে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় তাদেরকে বলে দেন, **'রওযায়ে খাখ' নামক স্থান পর্যন্ত তোমরা একটানা সফর চালিয়ে যাবে! সেখানে হাওদা-আসীনা এক মহিলাকে পাবে। তার কাছেই**

---

[৬৫২] এই সারিয়াটির সামনেই পড়েছিলেন আমের বিন আজবাত। তিনি তখন সারিয়ার সদস্যদেরকে সালাম প্রদান করেন। কিন্তু মুহাল্লিম ইবনে জুসামা উভয়ের মাঝে যে কোনো দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে তাকে হত্যা করে ফেলেন এবং তার উট ইত্যাদি নিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করেন, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا –الآية. তখন সাহাবায়ে কেরাম মুহাল্লিমকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন যাতে তিনি তার জন্য ইসতেগফার করেন। মুহাল্লিম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়ালে তিনি বললেন, আল্লাহ! তুমি মুহাল্লিমকে ক্ষমা করো না। কথাটি তিনি তিন বার বললেন। মুহাল্লিম তখন দাঁড়িয়ে জামার আঁচল দিয়ে দরদর করে বয়ে যাওয়া চোখের পানি মুছে যাচ্ছিলেন। ইবনে ইসহাক বলেন, কথিত আছে পরবর্তী সময়ে রাসূলে কারীম সা. তার জন্য ইসতেগফার করেছিলেন। দেখুন যাদুল মাআদ ২/১৫০। ইবনে হিশাম ২/৬২৬-৬২৮।

রয়েছে কুরাইশদের কাছে লেখা সেই পত্র!! ইসলামের এই শ্রেষ্ঠ ঘোড়সওয়ার বাহিনী দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলেন মহিলার খোঁজে। তাকে ঠিক সেই জায়গাতেই পেয়ে গেলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুখে যে জায়গার নাম শোনা গিয়েছিল। তাঁরা মহিলাটিকে সওয়ারীর পিঠ থেকে নীচে নামার নির্দেশ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কোনো পত্র আছে? সে স্পষ্ট জানালো, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। তারা তার হাওদা তালাশ করে কিছুই খুঁজে পেলেন না। অতঃপর আলী রা. তাকে বললেন, আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিথ্যা বলেননি; আর আমরাও তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলছি না। সত্যি করে বলো পত্রটি কোথায়? তুমি যদি নিজে বের করে না দাও তবে আমরা তোমাকে বস্ত্রহীন করতে বাধ্য হবো! সে যখন তাদের দৃঢ়মনোবল দেখল তখন বলল, আচ্ছা ঠিক আছে আমি পত্র বের করে দিচ্ছি। আপনারা অন্যদিকে মুখ করে দাঁড়ান! সাহাবায়ে কেরাম অন্য দিকে মুখ ফেরালে সে তার চুলের বেণি খুলে তা থেকে পত্রটি বের করে তাদের হাতে অর্পণ করল। তারা পত্র হাতে পেয়ে দ্রুত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট চলে এলেন। পত্র খুলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে দেখতে পেলেন, (হাতেব ইবনে আবী বালতাআর পক্ষ থেকে কুরাইশ বরাবর পত্র......) কুরাইশদের কাছে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যাত্রার কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতেবকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী হাতেব? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার বিরুদ্ধে ত্বড়িৎ সিদ্ধান্ত নিবেন না!! আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান রাখি। আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি কিংবা এ দীন পরিবর্তন করিনি। ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, আমি কুরাইশ বংশের কোনো লোক নই। আমি কেবল তাদের সঙ্গে থাকতাম। আর এখন তাদের মাঝে আমার স্ত্রী-পরিজন ও আত্মীয় স্বজন রয়েছে। কিন্তু সেখানে আমার এমন কেউ নেই যে তাদের দেখভাল করবে। এর বিপরীতে আপনার অন্যান্য সঙ্গীদের সেখানে এমন বহু লোক রয়েছে, যারা তাদের পরিবারের দেখভাল করবে। এ কারণে, আমি চিন্তা করেছি যখন আমার এমন কেউ নেই, তখন তাদের প্রতি আমি যদি এই উপকারটুকু করে দিই; তবে হয়তো তারা আমার পরিবারের দেখভাল করবে। তার এ বক্তব্য শুনে উমর ইবনে খাত্তাব রা. বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন তার ঘাড় উড়িয়ে দিই!! সে তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করেছে। সে মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধীরকণ্ঠে বললেন, সে বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে। তোমার কি জানা আছে উমর? হয়তো আল্লাহ তাআলা বদরীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন- তোমাদের যা মনে চায় করো! আমি

তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে উমর রা.এর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে গেল। তিনি শুধু বলতে পারলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। [৬৫৩]

এভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে সব ধরনের গুপ্তচর থেকে বাঁচিয়ে রাখলেন। এতে করে মুসলমানদের মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি ও যাত্রার কথা কুরাইশরা টেরও পেল না।

মুসলিম বাহিনীর মক্কা অভিমুখে অগ্রসর

অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের দশ তারিখ দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা ছেড়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত রেখে যান আবু রুহম গিফারী রা. কে।

যখন তিনি জুহফা কিংবা আরও সামনে গিয়ে পৌঁছেন তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. এর সাক্ষাৎ হয়। আব্বাস রা. মুসলমান হয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মদীনায় হিজরত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবওয়া নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন তখন তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারিস ও ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাদেরকে দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ ইতঃপূর্বে তারা তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। তাঁর নামে কুৎসা রটনা করেছিল। তখন উম্মে সালামা বলে ওঠেন, আপনার এক চাচাতো ভাই আর এক ফুফাতো ভাই সবার চেয়ে হতভাগা হবে এমনটা হতে পারে না। ওদিকে আলী রা. আবু সুফিয়ান ইবনে হারিসকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও! তাকে গিয়ে তাই বলো ইউসুফ আ. এর ভাইয়েরা ইউসুফ আ. কে যা বলেছিল যে, قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ. তারা বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আর আমরা নিঃসন্দেহে অপরাধী ছিলাম। [সূরা ইউসুফ:৯১] আবু সুফিয়ান তখন তা-ই করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে তাকে বললেন, قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ তিনি বললেন, আজ

---

[৬৫৩] দেখুন সহীহ বুখারী ১/৪২২, ২/৬১২।

তোমাদের ওপর কোনো তিরস্কার নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান। [সূরা ইউসুফ:৯১] এরপর আবু সুফিয়ান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনায়। তন্মধ্যে কয়েকটি ছিল নিম্নরূপ:–

لَعَمْرُكَ إِنِّي حِينَ أَحْمِلُ رَايَةً ... لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّدِ

لَكَالْمُدْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُهُ ... فَهَذَا أَوَانِي حِينَ أُهْدِي وَأَهْتَدِي

وَهَدَانِي هَادٍ غَيْرَ نَفْسِي وَدَلَّنِي ... عَلَى اللهِ مَنْ طَرَّدْتُ كُلَّ مُطَرَّدِ

'আপনার জীবনের কসম! যখন আমি ঝাণ্ডা উত্তোলন করছিলাম এ উদ্দেশ্যে যে লাতের বাহিনী মুহাম্মাদের বাহিনীর ওপর বিজয় কেতন উড়াবে। তখন আমার অবস্থা ছিল ঐ নিশাচর পথিকের ন্যায় যে, গাঢ় অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আর এখন সময় এসে গেছে যে, আমাকে হেদায়াত করা হবে আর আমিও হেদায়াত পাবো। আমাকে আমার নিজের জায়গায় এমন এক ব্যক্তি হেদায়াত দিয়েছেন এবং আমাকে আল্লাহর পথের দিশা এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন যাকে আমি জীবনের জায়গায় কেবল উপেক্ষাই করেছি"।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার সীনার ওপর হাত রেখে বললেন, **সত্যিই কি তুমি সব জায়গাতেই আমায় উপেক্ষা করেছ?**[৬৫৪]

মাররুয যাহরানে মুসলিম বাহিনীর অবতরণ

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরের ধারাবাহিকতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তিনি ও সাহাবায়ে কেরাম সবাই রোযা রেখেছিলেন। এক পর্যায়ে কুদাইদ ও উসফানের মধ্যবর্তী 'কুদাইদ' নামক একটি কূপের কাছে পৌঁছলে সন্ধ্যা নেমে যায়। সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ইফতারী করেন।[৬৫৫] এরপর আবার সফর শুরু করেন

---

[৬৫৪] ইবনে হিশাম ৪/৪১, ৪২। বাইহাক্বী প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ ৫/২৮। পরবর্তী সময়ে এ আবু সুফিয়ান রা. এর ইসলাম সুন্দর প্রমাণিত হয়েছিল। কথিত আছে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে ওফাত পর্যন্ত কোনো দিন তিনি লজ্জায় রাসূলে কারীম সা. এর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাননি। রাসূলে কারীম সা. তাকে দারুণ ভালোবাসতেন এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন। তিনি আবু সুফিয়ান রা. সম্পর্কে বলতেন, আমার আশা তিনি আমার জন্য হামযার স্থলাভিষিক্ত হবেন। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য কান্নাকাটি করো না! কেননা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোনো গুনাহের কথা বলিনি।

[৬৫৫] মুসনাদে আহমদ ১/২৬৬। হাইসামী প্রণীত মাজমা' তে তিনি বলেন, এটা সর্বজন বিদিত মতামত যে, এ দলে লোকজন ছিলেন তারা বুখারীতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে ইসহাক উল্লিখিত ব্যক্তিরা নয়। ইবনে হিশাম ৪/৪০।

এবং রাতের প্রথম প্রহরে 'ওয়াদীয়ে ফাতেমা' নামক উপত্যকায় 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছে যান। তিনি সেখানে যাত্রাবিরতি করেন এবং বাহিনীকে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দেন। তখন সবাই একটা একটা করে মোট দশ হাজার জায়গায় আগুন জ্বালালেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে প্রহরার যিম্মাদারী তুলে দিলেন উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর হাতে।

রসূলুল্লাহর সামনে আবু সুফিয়ান

মাররুয যাহরানে মুসলিম বাহিনী যাত্রাবিরতি করলে আব্বাস রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল কোন কাঠকুড়ানী কিংবা অন্য কাউকে পেলে কুরাইশদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিবেন যেন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশের আগেই তাঁর কাছে এসে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের নিকট সংবাদ পৌঁছানোর সকল পথ অন্ধ ও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে এ সম্পর্কে তাদের অবগতির খাতা ছিল শূন্য। কিন্তু তারা হরহামেশা চরম ভীত আর শঙ্কাগ্রস্ত ছিল। আবু সুফিয়ান বার বার মক্কার বাইরে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা মুসলিম বাহিনীর খবরাখবর পেতে চেষ্টা করত। সুতরাং, সে ঐ সময়ও হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকাকে নিয়ে খবরের সন্ধানে বের হয়েছিল।

আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাদা খচ্চরের পিঠে চড়ে বের হয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ আমি আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারাকার কথাবার্তা শুনতে পেলাম। তারা তখন মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ানকে বলতে শুনলাম, গত রাতের মতো এত আগুন আর এত বড় বাহিনী আমি কোনো দিনও দেখিনি। তখন বুদাইল বলল, আমি নিশ্চিত যে,এটা বনু খুযাআর বাহিনী। ঘোর যুদ্ধোন্মাদনার আগুনে তারা দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরছে। আবু সুফিয়ান বলল, না! এত আগুন আর এত বিশাল বাহিনী খুযাআ জীবনেও যোগাড় করতে পারবে না।

আব্বাস রা. বলেন, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারলাম। ডাক দিয়ে বললাম, আবু হানযালা! সেও আমার আওয়াজ শুনে চিনতে পেরে বলল, কে আবুল ফযল! আমি বললাম, হাঁ। সে বলল, আমার পিতা মাতা তোমার জন্য কুরবান হোক! কী ব্যাপার!! আমি বললাম, সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এই তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে পড়েছেন। আল্লাহর কসম! কুরাইশদের বিপদ এক্ষণে মাথার ওপর এসে ঝুলছে।

আবু সুফিয়ান বলল, এখন উপায় কী ভাই বলো! আমি বললাম, আল্লাহর কসম! তিনি যদি তোমাকে হাতে পান তবে তোমার গরদান উড়িয়ে দিবেন। তাই

জলদি করে এই খচ্চরের পিঠে উঠে বসো! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে আমি তোমার ব্যাপারে নিরাপত্তা চেয়ে দেখি কি হয়? এরপর আবু সুফিয়ান আমার পেছনে উঠে বসল আর তার সঙ্গীদ্বয় মক্কায় ফিরে গেল।

আব্বাস রা. এর বর্ণনা : অতঃপর আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে চললাম। যখনই কোনো অগ্নির পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করতাম তখন তারা জিজ্ঞাসা করত, এই কে? এরপর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খচ্চর আর আমাকে তার পিঠের ওপর বসা দেখত তখন বলত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা রাসূলের খচ্চরের ওপর। অতঃপর যখন উমর ইবনুল খাত্তাবের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম তিনি বললেন, এই কে? এবং তিনি আমার দিকে ছুটে এলেন। আবু সুফিয়ানকে তিনি আমার পেছনে বসা দেখে বললেন, আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি কোনো রকমের ওয়াদা-অঙ্গীকার ব্যতীতই তোমাকে আমার মুখের সামনে এনে পরিবেশন করেছেন। অতঃপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে ছুটে গেলেন। আমিও আমার খচ্চর হাঁকালাম এবং তার আগেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট পৌঁছে গেলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আমি পৌঁছতেই উমরও রা. সেখানে পৌঁছে গেলেন। গিয়েই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু সুফিয়ান। তাকে আমার হাতে তুলে দিন! তার ঘাড়টা আমি ধড় থেকে আলাদা করে দিই। আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এরপর আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বসে তার মাথায় হাত রেখে বললাম, আল্লাহর কসম! আজ রাতের অন্ধকারে আমি ছাড়া অন্য কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। উমর রা. যখন একটু বাড়াবাড়ি শুরু করলেন তখন আমি তাকে বললাম, উমর চুপ করে বসো! যদি সে বনু কা'ব ইবনে আদীর কেউ হতো তবে তুমি এত দাপাদাপি করতে না! তখন তিনি আমাকে বললেন, আব্বাস! চুপ করুন। আল্লাহর কসম! আমার বাপ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়েও আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে প্রিয়তর ছিল। এর কারণ শুধু একটিই- কারণ আমি জানতাম, আপনার ইসলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আব্বাস! তাকে নিয়ে এখন নিজের তাঁবুতে ফিরে যান! সকালে আমার কাছে নিয়ে আসবেন! তখন আমি তাকে নিয়ে গেলাম। ভোর হলে তাকে আমি আবার রাসূলে

কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হাযির করলাম। তিনি তাকে দেখে বললেন, **আবু সুফিয়ান! তোমার ওপর বড়ই আফসোস হয়!! এখনো কি তোমার এ কথা জেনে নেওয়ার সময় আসেনি যে, আল্লাহ তাআলা এক?** আবু সুফিয়ান বললেন, আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি কতটা সহনশীল, কতটা মহান আর কতটা ভদ্রজন! আমার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। যদি আল্লাহর সঙ্গে আর কোনো ইলাহ হতো তবে অবশ্যই সে আমার কোনো কাজে আসত!

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আবু সুফিয়ান! তোমার ওপর আফসোস!! এখনো কি তোমার সময় আসেনি যে, তুমি জানবে, আমি আল্লাহর রাসূল!!!** আবু সুফিয়ান বললেন, আমার মাতা পিতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আপনি কতটা সহনশীল, মহান আর ভদ্রপ্রাণ! এ সম্পর্কে তো আমার অন্তরে এখনো কিছু খটকা রয়েই গেছে!! আব্বাস রা. তখন বলে উঠলেন, সর্বনাশ! ঘাড় হারানোর আগে জলদি ইসলাম গ্রহণ করো! আর সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হক্বের সাক্ষ্য দেন। রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আব্বাস রা. তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গর্ব আর পদমর্যাদার প্রতি আবু সুফিয়ানের একটু বেশি ঝোঁক; তাকে আপনি একটা কিছু দিয়ে দিন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ঠিক আছে! যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে, সে নিরাপদে থাকবে। যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবে, সে নিরাপদে থাকবে। আর যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদে থাকবে।**

মাররুয যাহরান ছেড়ে মক্কার পথে

অতঃপর ঠিক এ দিন তথা অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের সতেরো তারিখ মঙ্গলবার ভোরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররুয যাহরান ছেড়ে মক্কার পথে পা বাড়ান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রা. কে নির্দেশ দেন আবু সুফিয়ান রা. কে পাহাড়ের নাকের কাছে সংকীর্ণ এক উপত্যকায় দাঁড় করিয়ে রাখতে, যাতে করে তিনি সেখান থেকে অগ্রসরমান আল্লাহর বাহিনীকে দেখতে পান। আব্বাস রা.তা-ই করলেন। একে একে বিভিন্ন কবীলা তার সামনে দিয়ে যেতে লাগল। যখনই কোনো কবীলা পতাকা উঁচিয়ে আবু সুফিয়ান রা. এর সামনে দিয়ে যেত তিনি আব্বাস রা. কে জিজ্ঞাসা করতেন, এটা কোন্ কবীলা? আব্বাস রা. বলতেন- উদাহরণত- সুলাইম। আবু সুফিয়ান রা. তখন বলতেন, তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এরপর আবার যখন কোনো

কবীলা অতিক্রম করত তিনি জিজ্ঞাসা করতেন এরা কারা? আব্বাস রা. উত্তর করতেন, মুযাইনা। তিনি বলতেন, মুযাইনার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? এভাবে যে কবীলাই তাদের কাছে দিয়ে অতিক্রম করত আবু সুফিয়ান রা. সেই একই প্রশ্ন করতেন আর আব্বাস রা. জবাব দিতেন। এভাবে এক পর্যায়ে মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম নিয়ে গঠিত সবুজ বাহিনী নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সেখানে মানুষের পরিবর্তে কেবল লোহার হাতিয়ার দেখা যাচ্ছিল। তখন আবু সুফিয়ান রা. বললেন, সুবহানাল্লাহ! আব্বাস এরা কারা? আব্বাস রা. বললেন, মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরামের মাঝে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান রা.বললেন, পৃথিবীর কোনো বাহিনীর শক্তি নেই তাদের মুকাবিলা করার। অতঃপর তিনি বললেন, আবুল ফযল! আল্লাহর কসম!! আজ তোমার ভাতিজার রাজত্ব বিশাল আকার ধারণ করেছে। আব্বাস রা. বললেন, আবু সুফিয়ান! এটাই তো সেই নবুওতের রাজত্ব। আবু সুফিয়ান রা. বললেন, হাঁ। তাই তো বলতে হবে।

আনসারদের ঝাণ্ডা ছিল সা'দ বিন উবাদা রা. এর হাতে। তিনি আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে বলতে লাগলেন :

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ.......اَلْيَوْمُ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ

اَلْيَوْمَ اَذَلَّ اللهُ قُرَيْشًا.

'আজ রক্তপাত আর শোণপ্রবাহের দিন; আজ হারামকে হালাল করার দিন'। আজ আল্লাহ তাআলা কুরাইশকে লাঞ্ছিত করেছেন।

অতঃপর যখন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আবু সুফিয়ান রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি সাদের বক্তব্য শুনেছেন? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে কী বলেছে? আবু সুফিয়ান রা. বললেন, সে এমন এমন কথা বলেছে। তখন উসমান রা. ও আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রা. বললেন, আমরা তাঁর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত নই যে, সে কুরাইশদের ওপর আক্রমণ করে বসবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বরং আজ কাবাকে শ্রদ্ধা করার দিন। আজ কুরাইশকে আল্লাহর ইয্যত দানের দিন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে সাদের কাছ থেকে আনসারদের ঝাণ্ডা নিয়ে সেটা তার ছেলে কায়সের হাতে তুলে দেন। এভাবে যেন তাঁর হাত থেকে ঝাণ্ডা নিয়েও নেওয়া হয়নি। কারও কারও মতে পরে তিনি তা যুবাইরের হাতে তুলে দেন।

কুরাইশের মাথার ওপর মুসলিম বাহিনীর আবির্ভাব

স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলেন আব্বাস রা. তখন তাকে বললেন, এখন দৌড়ে নিজের কওমের কাছে চলে যান! তখন আবু সুফিয়ান দৌড়ে মক্কায় চলে গেলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করতে লাগলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! এই তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন এক বাহিনী নিয়ে চলে এসেছেন, যার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তোমাদের কারও নেই। কিন্তু এখন যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে। তখন তাঁর স্ত্রী হিন্দা উঠে তার গোঁফ ধরে বলল,তোমরা এই গোরা পা-সরু চর্বিওয়ালাকে হত্যা করো! সে কতই না খারাপ সংবাদদাতা!

আবু সুফিয়ান রা. তখন তাকে বললেন, সর্বনাশ তোমাদের! তোমাদেরকে যেন আজ কোনো প্রকারের ধোঁকায় না ফেলে। আজ তিনি এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছেন যে, পৃথিবীর কারও ক্ষমতা নেই সেই বাহিনীর সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কিন্তু যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে। তখন লোকজন বলল, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তোমার ঘর আমাদের কী উপকারে আসবে? তিনি বললেন, যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরে থাকবে সেও নিরাপত্তা পাবে। আর যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সেও নিরাপদে থাকবে। লোকজন তখন বিভিন্ন ঘরে ও মসজিদে হারামের দিকে ছুটল। তবে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার আগে তারা একদল গাধা সেনাকে প্রস্তুত করে বলল, আমরা তাদেরকে আগে পাঠিয়ে দিব। যদি তারা কিছুটা সুবিধা করতে পারে তবে আমরাও তখন গিয়ে তাদের সঙ্গ দিব। আর যদি তারা পরাজিত হয়, তবে তারা যা চাইবে আমরা তাদেরকে তা দিয়ে দিব। তখন কুরাইশের এই বলদ বাহিনী ইকরিমা বিন আবী জাহল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ও সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে খানদামা নামক স্থানে মুসলমানদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হলো। তাদের মধ্যে বনু বকরের হিমাস ইবনে কায়স নামক এক ব্যক্তি আগ থেকেই হাতিয়ার প্রস্তুত করে রেখেছিল। তখন তার স্ত্রী তাকে বলেছিল, এগুলো কীসের জন্য প্রস্তুত করছ? সে বলল, মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য। তার স্ত্রী বলল, আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে পৃথিবীর কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। তখন সে বলল, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস; আমি তাঁদের কাউকে তোমার খাদেম বানিয়ে দিব। এরপর সে বলতে লাগল:

إِنْ يُقْبِلُوا الْيَوْمَ فَمَا لِيْ عِلَّهْ...... هٰذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَأَلَّهْ

وَذُو غِرَارَيْنِ سَرِيعُ السَّلَّةْ

'যদি আজ তারা মুখামুখি হয় তবে আমার জন্য আর কোনো ওযর থাকবে না। এটা পরিপূর্ণ হাতিয়ার; সূঁচালো বর্শা আর দু'ধারী শাণিত শমশীর।

এই লোকও খানদামায় সমবেত লোকদের মধ্যে ছিল।

যূ তুয়াতে মুসলিম বাহিনী

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যূ তুয়া পর্যন্ত পৌছে গেলেন। এ সময় মহা গৌরবময় বিজয়ের বিস্ময়রকর দৃশ্য দেখে এক বিরল বিনম্রতায় সাহেবে রিসালত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শির অবনমিত হয়ে আসে। এক পর্যায়ে তাঁর দাড়ি মুবারক হাওদার কাষ্ঠদেশে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। এখানে পৌছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে সারিবদ্ধ করে সাঁজান। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে ডান ভাগের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এ ডান ভাগ গঠিত ছিল আসলাম, সুলাইম, গিফার, মুযাইনা, জুহাইনা ও অন্যান্য আরব কবীলা নিয়ে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ রা. কে তার বাহিনী নিয়ে মক্কার নিম্নাংশ দিয়ে শহরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। আর তাকে বলে দেন, **যদি কুরাইশের কেউ তোমাদের গতিরোধ করার চেষ্টা করে তবে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। অতঃপর সাফা পাহাড়ে আমার সঙ্গে এসে মিলিত হবে।**

বাম ভাগের নেতৃত্ব দেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. এর হাতে। তার কাছেই ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝাণ্ডা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি মক্কার উচ্চাংশ তথা কাদা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে হাজূনে পৌছে ইসলামী বাহিনীর ঝাণ্ডা মাটিতে স্থাপন করেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথায় পৌছার আগ পর্যন্ত সেখান থেকে এক কদমও এদিক সেদিক না সরেন।

আবু উবাইদা রা. পদাতিক ও নিরস্ত্র সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন, যেন তিনি বাতনে ওয়াদীর পথ ধরে চলেন, যাতে করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগেই মক্কায় অবতীর্ণ হন।

ইসলামী সেনা মক্কায় প্রবেশ করছে

মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেকটি ভাগ যে যার নির্দেশিত পথে মক্কা পানে অগ্রসর হতে লাগল। পথে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর বাহিনীর সামনে যেই পড়ল তিনি

তাকে এ জনমের মতো ঠাণ্ডা করে দিলেন। আর তার বাহিনীর মধ্যে কেবল কুরয ইবনে জাবের ফিহরী ও খুনাইস ইবনে খালিদ ইবনে রবীআ প্রাণ হারান। এ দু'জন মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ভিন্ন একটি রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। ফলে দু'জনের প্রাণ খোয়া যায়। মুসলিম বাহিনী খানদামায় পৌঁছলে কুরাইশী বলদগুলি তাদের মুখামুখি হলো। খানিকটা যুদ্ধ হয়েছিল মাত্র। আর তাতেই তাদের বারো জন শেষ হয়ে গেল। শুরু হলো পিছুটান। ভাগলপুরে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। নিমেষেই তাদের শিবির ফাঁকা হয়ে পড়ে রইল। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে মুসলিম বাহিনীর জন্য যে হাতিয়ার প্রস্তুত করেছিল, সেই হিমাস ইবনে কায়সও ভাগতে বাকি রইল না। সোজা গিয়ে বাড়িতে উঠে স্ত্রীকে বলল, প্রিয়ে! জলদি করে ঘরের দরজা-জানালাগুলি লাগিয়ে দাও! তার স্ত্রী বলল, এতদিন ধরে যা বলছিলে তা কোথায় গেল? সে বলল:

إِنَّكِ لَوْ شَهِدْتِ يَوْمَ الْخَنْدَمَهْ.... إِذْ فَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرِمَهْ

وَاسْتَقْبَلَتْنَا بِالسُّيُوفِ الْمُسْلِمَهْ..... يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهْ

ضَرْبًا فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَهْ..... لَهُمْ نَهِيتٌ خَلْفَنَا وَهَمْهَمَهْ

لَمْ تَنْطِقِي فِي اللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهْ

'যদি তুমি আজ খান্দামাতে উপস্থিত হয়ে দেখতে, যখন সফওয়ান আর ইকরিমা নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

যখন আমাদেরকে শাণিত তরবারি দ্বারা স্বাগত জানানো হয়েছিল, যা কনুই আর মাথার খুলিতে এমন আঘাত হানছিল যে,

কেবল বীর পুরুষদের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, যারা আমাদের পেছনে সিংহের মত গর্জন করছিল ও রণ হুংকার দিচ্ছিল।

তবে তুমি আমাকে একটুকু তিরষ্কার করতে না'।

এভাবে খালিদ বিন ওয়লিদ রা. নিজ বাহিনী নিয়ে মক্কায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হলেন।

ওদিকে যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা. অগ্রসর হয়ে মসজিদে ফাতহর সন্নিকটে হাজূন নামক স্থানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝাণ্ডা মাটিতে পুঁতলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এসে পৌঁছলেন।

রাসূল সা.মসজিদে হারামে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে পা বাড়ালেন। মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে কেরাম তার ডানে-বামে-সামনে-পেছনে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি আজন্ম লালিত স্বপ্নের সেই মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন। হজরে আসওয়াদের দিকে ধীর কদমে এগিয়ে গিয়ে তাকে চুম্বন করলেন। অতঃপর কাবা ঘর তওয়াফ শুরু করলেন। কাবা ঘরের চারপাশে তখনো শত বছরের ভেল্কি নিয়ে নির্জীব দাঁড়িয়েছিল নিষ্প্রাণ পাথরের তৈরি তিন শ' ষাটটি বিগ্রহ। তিনি সেগুলিকে ধনুকের মাথা দিয়ে সামান্য একটু গুঁতো দিতে লাগলেন আর বড় অসহায় হয়ে একটির পর একটি উপুড় হয়ে, কাত হয়ে, চিত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। তাঁর যবান মুবারক থেকে তখন বের হচ্ছিল,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا –الإسراء

সত্য এসেছে আর মিথ্যা পরাহত হয়েছে। আর মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। [সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১]

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনপ্রত্যাবর্তিত হতে। [সূরা সাবা:৪৯]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সওয়ারীর পিঠে চড়ে তওয়াফ করছিলেন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না। এ কারণে শুধু তওয়াফ করেই ক্ষান্তি দিলেন। তওয়াফ শেষ করার পর তিনি কাবার চাবি-বাহক উসমান বিন তালহাকে ডাকলেন। তার হাত থেকে কাবার চাবি নিলেন। অতঃপর তার নির্দেশে দরজা খোলা হলে তিনি কাবার ভেতরে প্রবেশ করলেন। ভেতরে ঢুকে তিনি দেখতে পেলেন অসংখ্য ছবি। সেখানে তিনি ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. এ মহান নবীদ্বয়ের দু'টি ছবিও দেখতে পেলেন। তাদের উভয়ের হাতে ভাগ্য-নির্ণায়ক তীর ছিল। তখন তিনি বললেন, **আল্লাহ তাদের সর্বনাশ করুন! আল্লাহর মহান এ দুই বান্দা কোনোদিনও এর দ্বারা ভাগ্য-নির্ণয় করেননি।** কাবার ভেতরে তিনি কাষ্ঠ নির্মিত একটি পায়রা দেখতে পেলেন। নিজের হাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটা ভেঙে ফেললেন। অতঃপর তার নির্দেশে কাবার ভেতরের ছবিগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়।

কাবার ভেতরে নামায আদায় : কুরাইশদের উদ্দেশে ভাষণ

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসামা বিন যায়দ ও বিলাল বিন রাবাহ রা. সহ ভেতরে থেকে কাবার দরজা বন্ধ করে দেন। এরপর

তিনি কাবার দরজা বরাবর বিপরীত দেয়ালের দিকে অগ্রসর হয়ে তিন হাত জায়গা ছেড়ে থেমে যান। কাবা ঘরে তখন ছয়টি খুঁটি ছিল। তিনি দু'টি খুঁটি বাম পাশে, একটি ডান পাশে আর তিনটি পেছনে রেখে সেখানে নামায আদায় করলেন। এরপর তার চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখলেন। প্রত্যেকটি কোণে কোণে গিয়ে তিনি তাকবীর দিলেন এবং তাওহীদের ঘোষণা দিলেন। অতঃপর তিনি দরজা খুললেন। ইতোমধ্যে কুরাইশরা মসজিদে কাতারবদ্ধ হয়ে ভরে গিয়েছিল। তারা অপেক্ষা করছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করেন? মসজিদে হারাম প্রাঙ্গণে তখন নেমে এসেছিল পিন-পতন-নীরবতা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার উভয় পাশ ধরে দাঁড়ালেন। কুরাইশরা নীরবে নীচে বসা ছিল। গোটা পৃথিবীর জন্য এ ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। আকাশ ও মাটি অপেক্ষা করছিল বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এ কঠিন মামলার রায় শোনার জন্য। আর ঠিক তখনই মুবারক যবান থেকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ভেসে এলো:

এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি আপন প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করেছেন। আপন বান্দাকে তিনি পরম সাহায্য করেছেন। তিনি একাই সব বাহিনীকে নাকানি-চুবানি দিয়েছেন। মনে রেখো! কা'বার চাবির রক্ষনাক্ষেণ আর হাজীরদেরকে পানি পান করানো ব্যতীত আর সকল ইয্যত ও কামালত, ধন-সম্পদ ও রক্ত আমার এই দুই পদতলে। মনে রেখো ভুলক্রমে হত্যা প্রায় স্বেচ্ছায় হত্যা, যা লাঠি কিংবা চাবুক দিয়ে হয়। এর জন্য সবচেয়ে কঠিন রক্তপণ দিতে হবে। যার পরিমাণ হলো এক শ' উট। তন্মধ্যে চল্লিশটি উষ্ট্রীর গর্ভে বাচ্চা থাকবে।

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! জাহেলী যুগের দর্প-অহঙ্কার আর বাপ-দাদা নিয়ে গর্ব করার দিন আল্লাহ শেষ করে দিয়েছেন। দুনিয়ার সকল মানুষ এক আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। অতঃপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন−

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

হে মানব সকল, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন। [সূরা হুজুরাত:১৩]

আজ কোনো নিন্দা-ভর্ৎসনা নেই

অতঃপর তিনি বললেন, **হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমাদের সঙ্গে আমার আজকের আচরণ সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা?** তারা বলল, ভালো। আপনি সুমহান ভাই! সুমহান ভাইয়ের সন্তান!! তিনি বললেন, **তবে আজ আমি তোমাদেরকে সে কথাই বলব আল্লাহর নবী ইউসুফ আ. আপন ভাইদের উদ্দেশে যা বলেছিলেন, لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তথা আজ তোমাদের ওপর কোনো নিন্দা-ভর্ৎসনা নেই। যাও তোমরা সবাই আযাদ ও মুক্ত!**

কা'বার চাবি

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে হারামে বসে গেলেন। আলী রা. এর হাতে ছিল কাবার চাবি। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে আরয করলেন, হাজীদের পানি পান করানোর পাশাপাশি চাবি বহনের সম্মানটুকুও আমাদেরকে দান করুন! আল্লাহ আপনার ওপর রহমত নাযিল করুন। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ কথা আলী নয়; আব্বাস রা. আরয করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **উসমান বিন তালহা কোথায়?** উসমানকে ডেকে আনা হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **উসমান! এই ধরো তোমার চাবি!! আজকের দিনটি সৎকর্ম আর প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন।** ইবনে সা'দ রহ. তার রচিত 'তাবাকাতে ইবনে সা'দ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান বিন তালহাকে ডেকে বললেন, **চিরদিনের জন্য তোমরা এ চাবি গ্রহণ করো! যালিম ব্যতীত আর কেউ তোমাদের কাছ থেকে এটা কোনোদিনও ছিনিয়ে নিতে পারবে না। উসমান! আল্লাহ তোমাদেরকে এ ঘরের রক্ষক বানিয়েছেন। সুতরাং, এর থেকে তোমরা যা কিছু পাবে সৎ ও ন্যায় পন্থায় তা ভক্ষণ করবে।**

কা'বা শিখরে তাওহীদের আযান ধ্বনিত হলো

নামাযের সময় ঘনিয়ে এলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে বেলাল রা. কাবার ওপরে উঠে আযান দিলেন। মূর্তি পূজার বাজার জমে থাকা তাওহীদের ঘরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। হাজার বছর পর কাবার শিখর দেশে ধ্বনিত হলো তাওহীদের আযান। এক নতুন গুঞ্জন; এক নতুন আলোড়ন; এক নতুন সুর; এক নতুন আবাহনী জেগে উঠল কাবার প্রতিটি কোণে কোণে। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আত্তাব ইবনে উসাইদ ও হারিস ইবনে হিশাম তখন কাবার আঙিনায় বসা ছিল। আত্তাব বলল, আল্লাহ তাআলা

উসাইদকে এই ইয্যত দান করেছেন যে, তাকে এটা শুনতে হয়নি; নতুবা তিনি যদি এটা শুনতেন তবে দারুণ মর্মাহতকর একটি আওয়াজ শুনতে হতো। হারিস তখন বলল, আল্লাহর কসম যদি আমি জানতাম, সে সত্যের ওপর রয়েছে তবে নিশ্চিতভাবেই আমি তাঁর অনসুরণ করতাম। আবু সুফিয়ান বলল, আমি কিছুই বলব না। কারণ আমি যদি টু- শব্দটিও করি তবে এ নুড়িগুলিও সে কথা তার কাছে বলে দিবে। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এসে বললেন, **তোমরা যা বলেছ, আমি তা সব জানতে পেরেছি।** অতঃপর তিনি তাদেরকে সবকিছু বলে দিলেন।

তখন হারিস ও আত্তাব বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসূল। কারণ, আল্লাহর কসম! আমাদের এ কথার ওপর কেউ অবগত হয়নি,যে আমাদের সাথে ছিল। যদি থাকত তবে না হলে বলতাম সে আপনাকে এ কথাগুলি পৌঁছিয়ে দিয়েছে।

শোকরানা নামায আদায়

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হানী বিনতে আবী তালিব রা. এর ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি গোসল করে আট রাকাআত নামায আদায় করেন। তখন চাশতের ওয়াক্ত ছিল। এ কারণে কেউ তাকে চাশতের নামায মনে করেছেন। তবে এটা চাশতের নয়; বিজয়ের শোকরানা নামায ছিল। উম্মে হানী র. তার দুই দেবরকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দিয়েছ আমরাও তাকে নিরাপত্তা দিলাম।** উম্মে হানীর ভাই আলী ইবনে আবী তালিব রা. তাদেরকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তাদেরকে ঘরে রেখে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এ জবাব দেন।

দাগী অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় জন দাগী অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন, কা'বার পর্দার নীচে পাওয়া গেলেও তাদেরকে হত্যা করে দিবে। তারা ছিল: আব্দুল উয্যা ইবনে খাতাল, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ, ইকরিমা ইবনে আবী জাহল, হারিস ইবনে নুফাইল ইবনে ওহাব, মাকীস ইবনে সুবাবা, হাব্বার ইবনে আসওয়াদ, ইবনে খাতালের দুই বাঁদী- যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে কুৎসা রটনা করে গান গাইত এবং আব্দুল মুত্তালিবের জনৈক বংশধরের বাঁদী সারা। এই সেই মহিলা যার কাছে হাতিব বিন আবী বালতাআ রা. এর পত্র পাওয়া গিয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবী সারাহ কে উসমান রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে তার ব্যাপারে সুপারিশ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তার মৃত্যুদণ্ড মওকূফ করে দেন এবং তার ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু এতে তিনি খানিকটা সময় নেন। কারণ তার আশা ছিল যদি সাহাবায়ে কেরামের কেউ এই ফাঁকে তাকে হত্যা করে ফেলত। ইতঃপূর্বে সে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেছিল। কিন্তু এরপর মুরতাদ হয়ে গিয়ে মক্কায় ফিরে আসে।

ইকরিমা বিন আবী জাহল পালিয়ে ইয়ামানের পথ ধরেছিল। কিন্তু তার স্ত্রী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এরপর সে ইকরামার পেছনে পেছনে ছুটে যায় এবং নিজে গিয়ে তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে নিয়ে আসে। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামে তাঁর অবস্থান অনেক সুন্দর হয়েছিল।

ইবনে খাতাল কা'বার পর্দাতলে আত্মগোপন করেছিল। তখন এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এ সংবাদ জানালে তিনি বললেন, **তাকে হত্যা করে ফেলো!** তখন সে তাকে হত্যা করে ফেলে।

মাকীস ইবনে সুবাবাকে হত্যা করেছিলেন সাহাবী নুমাইলা ইবনে আব্দুল্লাহ রা.। ইতঃপূর্বে মাকীস ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এরপর এক আনসারী সাহাবীকে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের দলে এসে ভিড়ে।

হারিস রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কায় চরম যুলুম নির্যাতন করত। আলী রা. তাকে হত্যা করে ফেলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কন্যা যয়নব রা. যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন হাব্বার ইবনে আসওয়াদ তখন তার গতিরোধ করে। সে তাকে এত জোরে গুঁতো দেয় যে, যয়নব রা. হাওদার ওপর থেকে একটি শক্ত পাথরের ওপর পড়ে যান। এতে তখনই তাঁর গর্ভপাত ঘটে। মক্কা বিজয়ের দিন হাব্বার পালিয়ে যায়। এবং পরবর্তী সময়ে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তার এ ইসলাম অনেক সুন্দর হয়েছিল।

ইবনে খাতালের বাঁদীদ্বয়ের একজন নিহত হয় আরেকজনের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। সারা'র জন্যও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে। (এক কথায় মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণাপ্রাপ্ত নয়জনের চার জনকে হত্যা করা হয় আর বাকী পাঁচজনের জীবন ভিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে)।

হাফিয ইবনে হাজার র. বলেন, যে সকল অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল আবু মা'শার তাদের মধ্যে হারেস ইবনে তুলাতিল খুযাঈর নামও উল্লেখ করেছেন। আলী রা. তাকে হত্যা করেন। ইমাম হাকেম র. তাদের মধ্যে কা'ব বিন যুহাইর রা. এর নামও উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে তার ঘটনা সমধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তী সময়ে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলের শানে প্রশংসামূলক কবিতা রচনা করে। ওয়াহশী ইবনে হরব রা. এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবাও রা. মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের তালিকায় ছিলেন। হিন্দা রা. পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনে খাতালের বাঁদী আরনাব এ তালিকায় ছিল এবং তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। উম্মে সা'দও এ তালিকায় ছিল এবং তাকেও হত্যা করা হয়। ইবনে ইসহাক র. এমনই উল্লেখ করেছেন। এতে করে তাদের সর্বমোট সংখ্যা এসে দাঁড়ায় আট জন পুরুষ এবং ছয় জন নারী। এখানে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে, আরনাব ও উম্মে সা'দ প্রথমে উল্লিখিত সেই দুই বাঁদীই ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে শুধু নাম, কুনিয়াত কিংবা উপাধির কারণে দু'জন থেকে তারা চার জন হয়ে গেছে।[৬৫৬]

সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা ও ফাযালা ইবনে উমাইরের ইসলাম গ্রহণ

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যার নাম ছিল না। কিন্তু কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন হওয়ার কারণে নিজেকে নিয়ে যথেষ্ট ভীতি ও শঙ্কা ছিল। আর এ কারণেই সে পালিয়ে গিয়েছিল। উমাইর ইবনে ওহাব জুমাহী রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমাইরের সে আবেদন মঞ্জুর করে তাকে নিরাপত্তা দেন এবং এর নিদর্শন স্বরূপ তিনি উমাইরকে সে পাগড়ি দিয়ে দেন, যে পাগড়ি মাথায় দিয়ে তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। সফওয়ান জেদ্দা হয়ে সমুদ্র পথে ইয়েমেন যাওয়ার সংকল্প করেছিল। আর ঠিক তখন উমাইর তার কাছে গিয়ে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দু' মাস সময় চায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, **তোমাকে চার মাস সময় দেওয়া হলো**। অতঃপর সফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করে। আর তার স্ত্রী তার আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রথম বিবাহ বহাল রাখেন।

---

[৬৫৬] ফাতহুল বারী ৮/১১, ১২।

ফাযালা ইবনে উমাইর ছিল চরম দুঃসাহসী ব্যক্তি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাবা তওয়াফ করার সময় সে তাঁকে হত্যা করার জন্য আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে ধরে তার মনের কথা বলে দেন। তখন সে মুসলমান হয়ে যায়।

বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে রাসূলের ভাষণ

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দেওয়ার জন্য লোকদের মাঝে দাঁড়ান। প্রথমে তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা ঘোষণা করেন। অতঃপর বলেন, **হে লোক সকল! যেদিন আল্লাহ পাক আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। আল্লাহর হারাম করার কারণে তা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে তার জন্য হালাল হবে না। তার সীমার ভেতরে রক্তপাত করা কিংবা কোনো বৃক্ষ কাটা। যদি কেউ এই অজুহাত পেশ করে যে, আল্লাহর রাসূল এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছেন তবে তাকে বলে দাও আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে এর অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। তথাপি আমার জন্য এটা দিনের কিছু অংশের জন্যে হালাল করা হয়েছিল। আজ তা আবার সেরূপ হারাম হয়ে গেছে যেরূপ গতকাল ছিল। তোমাদের উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এ ঘোষণা পৌঁছে দেয়।**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **এখানের কাঁটা তোলা যাবে না। প্রাণী শিকার করা যাবে না। এখানের পতিত জিনিস তোলা যাবে না; তবে ঐ ব্যক্তি তুলতে পারবে যে এটার ঘোষণা দিবে। আর এখানের ঘাস কাটা যাবে না।** আব্বাস রা. তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইযখির ছাড়া। কেননা,এটা আমাদের ঘর-বাড়ি ইত্যাদিতে কাজে আসে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ইযখির এই হুকুমের বাইরে থাকবে।**

বনু খুযাআ এ সময় জাহেলিয়াতের যুগে তাদের এক ব্যক্তি নিহত হওয়ার কিসাস স্বরূপ বনু লাইসের এক ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে প্রসঙ্গে বলেন, **হে খুযাআ সম্প্রদায়! হত্যা থেকে নিজেদের হাতকে দূরে রাখো! কারণ হত্যা যদি কোনো উপকারী বিষয় হতো তবে অনেক হত্যা-বিগ্রহ হতে পারত। তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, যার রক্তপণ আমাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। আমার পরে যে কেউ অন্য কাউকে হত্যা করবে তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের দু'টি অধিকার থাকবে- চাইলে তারা হত্যাকারীকে হত্যা করে ফেলবে নতুবা তার থেকে রক্তপণ আদায় করবে।**

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তখন আবু শাহ নামক ইয়ামানের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (এটা) আমাকে লিখিয়ে দিন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আবু শাহকে তোমরা লিখে দাও।**[৬৫৭]

আনছারদের মনে রাসূল সা. মক্কায় রয়ে যাওয়ার ভয়

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজের স্নেহময়ী জন্মভূমি, স্মৃতিমাখা শহর আর মমতাময়ী মাতৃভূমি মক্কা যখন তার হাতে বিজিত হলো, মদীনার আনসারদের মনের আকাশে তখন নতুন বিপদের ঘনঘটা দেখা গেল। সম্ভাব্য বেদনার নীল মেঘে হৃদয় ও মন ভারী হয়ে এলো। এক অজানা-বিরহ-শঙ্কায় তাঁরা কুঁকড়ে উঠলেন। একে অপরকে বলতে লাগলেন: কী মনে হয়? আল্লাহ তাআলা রাসূলের স্বপ্নভূমিকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন- তিনি কি এখন তাহলে এখানেই থেকে যাবেন? তিনি তখন সাফা পাহাড়ের শিখরে দাঁড়িয়ে দুআ করছিলেন। দুআ শেষ করে তিনি আনসারদের উদ্দেশে বললেন, **তোমরা কী বলেছ?** তারা বললেন, কিছু না ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পীড়াপীড়ির কারণে তারা আসল ব্যাপার খুলে বলতে বাধ্য হলেন। তাদের কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এখন বাঁচলেও তোমাদেরকে নিয়ে বাঁচব। আর মরলেও তোমাদের সঙ্গেই মরব।**

বাইয়াত গ্রহণ

যখন মক্কা নগরীকে আল্লাহ তাআলা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের পদানত করে দিলেন তখন মক্কা বাসীদের সামনে প্রকৃত সত্যের আলো দারুণভাবে ফুটে উঠল। তারা হক্ব ও হক্কানিয়্যাতকে চিনতে পারল। তারা এবার খুব ভালো করেই বুঝতে পারল, ইসলাম ব্যতীত মুক্তি ও নাজাতের আর কোনো পথ নেই। তখন ইসলামের সামনে এমনিতেই তাদের শির নত হয়ে এলো। বাইয়াতের জন্য সকলে সমবেত হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইয়াত নেওয়ার জন্য সাফা পাহাড়ের ওপর বসলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তার একটু নীচে দাঁড়িয়ে লোকদের থেকে ওয়াদা-অঙ্গীকার নিচ্ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে তাদের সাধ্য অনুযায়ী শোনা ও মানার ওপর বাইয়াত নিলেন।

---

[৬৫৭] দেখুন সহীহ বুখারী ১/২২, ২১৬, ২৪৭, ৩২৮, ৩২৯, ২/৬১৫, ৬১৭। সহীহ মুসলিম ১/৪৩৭-৪৩৯। ইবনে হিশাম ২/৪১৫, ৪১৬। আবু দাউদ ১/২৭৬।

এ প্রসঙ্গে তাফসীরে মাদারেকে একটি রেওয়ায়েত এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের বাইয়াত গ্রহণ সম্পন্ন করার পরে নারীদের বাইয়াত নিতে শুরু করলেন। তিনি তখন সাফা পাহাড়ের ওপর ছিলেন। উমর রা. তাঁর একটু নীচে বসা ছিলেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে নারীদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করছিলেন এবং তাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা রা. ছদ্মবেশে এলেন। কারণ হামযা রা. এর সঙ্গে আপন কৃতকর্মের দরুন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মুখ দেখাতে তিনি লজ্জাবোধ করছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আমি তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত নিচ্ছি এই শর্তে যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরীক করবে না**। তখন উমর রা. তাদের থেকে এ শর্তে বাইয়াত নিলেন যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কিছু শরীক করবে না। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আর তোমরা চুরি করবে না**। তখন হিন্দা রা. বললেন, আবু সুফিয়ান এমনিতেই একটু বখীল প্রকৃতির মানুষ। তাই যদি আমি তার মাল থেকে গোপনে কিছু নিয়ে নিই তবে? আবু সুফিয়ান রা. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি যা নিবে তা তোমার জন্য হালাল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে হেসে ফেললেন এবং তিনি হিন্দা রা. কে চিনতে পেরে বললেন, **তবে কি তুমি হিন্দা?** তিনি বললেন, হাঁ। আল্লাহর নবী! পেছনে যা কিছু চলে গেছে তা ক্ষমা করে দিন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আর তোমরা ব্যভিচার করবে না**। হিন্দা বললেন, স্বাধীন নারী কি কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়? অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না!** হিন্দা বললেন, আমরা তাদেরকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছি। আর বড় হওয়ার পরে তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলেছ। সুতরাং আপনি এবং তারাই ভালো জানেন। উল্লেখ্য হিন্দা রা. এর ছেলে হানযালা ইবনে আবী সুফিয়ান বদর প্রান্তরে প্রাণ হারিয়েছিল। তখন উমর রা. হাসতে হাসতে চিত হয়ে পড়ে গেলেন। রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে দিলেন।

তিনি বললেন, **আর কোনো অপবাদ লেপন করবে না!** হিন্দা রা. বললেন, আল্লাহর কসম! অপবাদ আরোপন নিকৃষ্ট কর্ম নিঃসন্দেহে। আর আপনি আমাদেরকে তো কেবল সত্য ও সুন্দর কাজ এবং উত্তম চরিত্রের দীক্ষা দেন।

অতঃপর তিনি বললেন, **আর সৎকাজে তোমরা আল্লাহর রাসূলের নাফারমানি করবে না!** হিন্দা রা. তখন বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদের মনের ভেতরে নাফারমানি নিয়ে আপনার এ মজলিসে আমরা কখনো বসিনি!!

বাইয়াত শেষ করে ঘরে ফিরে হিন্দা রা. নিজ হাতে নিজের স্বপ্ন-সাধের মূর্তিগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো করতে লাগলেন আর মুখে বলতে লাগলেন, তোমার ব্যাপারে আমরা চরম বোকার রাজ্যে বাস করতাম।[৬৫৮]

সহীহ বুখারীতে এসেছে, হিন্দা বিনতে উতবা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজকের দিনের আগে গোটা পৃথিবীতে এমন কোনো তাঁবু-বাসী ছিল না, যাদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়া আমার কাছে আপনাদের তাঁবুবাসীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। অথচ, আজ অবস্থা এমন হয়েছে যে, গোটা পৃথিবীতে এমন কোনো তাঁবুবাসী নেই, যাদের সম্মানিত ও ইয্যতওয়ালা হওয়া আপনাদের তাঁবুবাসীদের ইয্যতওয়ালা ও সম্মানিত হওয়ার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এখন আরও?** তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু সুফিয়ান আদতেই একটু কৃপণ প্রকৃতির; সুতরাং, তার মাল থেকে যদি আমি পরিবারের পেছনে ব্যয় করি তাতে কোনে সমস্যা আছে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ন্যায়ভাবে গ্রহণে কোনো সমস্যা নেই।**[৬৫৯]

মক্কায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থান

ইসলামের নিদর্শনাবলী নবায়নের লক্ষ্যে, সকল মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে দিক নির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঊনিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় আবু উসাইদ খুযাঈ রা. তাঁর নির্দেশে নবরূপে হারামের সীমারেখা-খুঁটি স্থাপন করেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জন্যে এবং ঐ সমস্ত মূর্তিগুলো ভাঙ্গার জন্যে, যেগুলো মক্কার আশেপাশে ছিল, বিভিন্ন যোদ্ধাদল পাঠালেন। সুতরাং, সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষণাকারী মক্কার প্রতিটি অলিতে গলিতে ঘোষণা করে দেন, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান আনে সে যেন তার ঘরের সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে।

সারিয়া ও সামরিক অভিযান

এক. দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক মেহনত আর লাগাতার পরিশ্রমের স্বপ্নের ফসল মক্কা বিজয়ের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খানিকটা বিরাম ও প্রশান্তি লাভ করলেন তখন অষ্টম হিজরীর রমযান মাসের পঁচিশ তারিখ

[৬৫৮] আল্লামা নাসাফী র. প্রণীত মাদারিকুত তানযীল: বাইয়াত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা।
[৬৫৯] সহীহ বুখারী হাদীস নং ৩৮২৫, ৭১৬১। ফাতহুল বারী ৭/১৭৫, ১৩/১৪৮।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে উয্যাকে ভূমিসাৎ করার জন্য প্রেরণ করেন। এই উয্যা মূর্তিটি ছিল নাখলা নামক স্থানে। এটা ছিল কুরাইশ ও গোটা বনু কেনানার সকল মূর্তির বড় ও গুরু। এক কথায় এটা ছিল তাদের মূর্তিরাজ। তার রক্ষণাবেক্ষণ করত বনু শায়বান। ত্রিশ জন অশ্বারোহী নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. সেখানে পৌঁছেন। তারপর সেটা ভূমিসাৎ করে ফিরে এলেন। মক্কায় ফিরে আসার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **তুমি কি কিছু দেখেছ?** খালিদ রা. বললেন, না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তাহলে তুমি তাকে ভাঙতে পারোনি! ফিরে গিয়ে ভেঙে এসো!!** খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. তখন রাগ আর ক্ষোভে ফেটে পড়লেন। নাঙ্গা তরবারি উঁচু করে ছুটে চললেন এক মৃত্যু-বিরাগ-বিনাশী-অভিযানে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছলে এলোকুন্তলী এক কৃষ্ণাঙ্গনা দিগম্বরী ছুটে এলো তার দিকে। প্রহরী তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। কিন্তু খালিদ রা. পলকে তরবারি হেনে তাকে দুই টুকরো করে ফেললেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে এসে তাকে অবহিত করেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **হাঁ। সে-ই উয্যা। এখন সে নিরাশ হয়ে গেছে যে, আর কোনোদিন তোমাদের এ মাটিতে তার পূজা করা হবে না।**

দুই. একই মাসে আমর ইবনুল আস রা. কে 'সুওয়া' মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। এটা ছিল মক্কা থেকে পূর্ব দিকে দেড় শ' কিলোমিটার দূরে রুহাত নামক স্থানে বনু হুযাইলের মূর্তি। আমর ইবনুল আস সেখানে পৌছার পরে মূর্তির সাদেন তাকে জিজ্ঞাসা করল, কীসের জন্য এসেছ? তিনি বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এ মূর্তি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন। সে বলল, তুমি এটা ভাঙতে পারবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন? সে বলল, তোমাকে বাঁধা দেওয়া হবে। আমর ইবনুল আস রা. তাকে বললেন, তাহলে এখনো তুমি বাতিলের ওপরই রয়ে গেছ? আফসোস তোমার ওপর! সে কি শুনতে কিংবা দেখতে পারে? তখন তিনি তার কাছে গিয়ে তাকে ভেঙে ফেলেন। এবং তিনি তার সঙ্গীদেরকে খাযানা-ঘর ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দেন। তারা ভেঙে ফেলে ভেতরে কিছুই দেখতে পেলেন না। অতঃপর তিনি সাদেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী- কেমন দেখলে? সে বলল, আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করলাম।

তিন. একই মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ বিন যায়দ আশহালী রা. কে বিশ জন অশ্বারোহী দিয়ে মানাত মূর্তি ভাঙার জন্য প্রেরণ করেন। এটা ছিল কুদাইদের সন্নিকটে মুশাল্লাল নামক স্থানে আউস, খাযরাজ ও গাতফান প্রমুখ গোত্রের মূর্তি। সা'দ রা. সেখানে পৌছলে প্রহরী তাকে বলল,

কেন এসেছ? তিনি বললেন, মানাতকে ধ্বংস করার জন্য। সে বলল, তুমিই ভালো জানো কী করতে যাচ্ছ! অতঃপর সা'দ রা. মূর্তির দিকে অগ্রসর হলে রুক্ষ ও এলোকেশী এক বস্ত্রহীনা কৃষ্ণাঙ্গী বেরিয়ে এলো। সে নিজের বুক চাপড়ে হায় হায় করছিল। প্রহরী তাকে বলল, মানাত! নিজের কিছু অবাধ্য দুরাচার দুশমনকে ধরে নাও! ইতোমধ্যে সা'দ রা. তার প্রতি তরবারি হেনে জনমের মতো ঠাণ্ডা করে ফেললেন। অতঃপর মূর্তির দিকে অগ্রসর হয়ে সেটি ভেঙে ফেলেন। এটার ধন-ভাণ্ডার ভেঙেও খুঁজে কিছুই পেলেন না।

চার. উয্যা ভাঙার অভিযান থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. যখন ফিরে এলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একই বছর তথা অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে বনু জাযীমার কাছে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ ছিল না; বরং তাবলীগে দীন ছিল এই সারিয়া প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। তিনি মুহাজির, আনসার ও বনু সুলাইমের মোট সাড়ে তিন শ মুসলমান নিয়ে মক্কা থেকে বের হন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা ভালো করে 'আসলামনা' (আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি- এ বাক্যটি) উচ্চাণ করতে পারল না। এ কারণে তারা 'আসলামনা' এর পরিবর্তে 'সাবা'না' 'সাবা'না' (আমরা ছাবি' হয়ে গেছি, আমরা ছাবি' হয়ে গেছি) বলতে লাগল। তখন খালিদ রা. তাদেরকে ধরে ধরে হত্যা ও বন্দী করতে লাগলেন। তার সঙ্গী প্রত্যেককে একটি করে বন্দী দান করলেন। অতঃপর একদিন সবাইকে তার বন্দীকে ধরে হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ইবনে উমর রা. ও তার সঙ্গীরা তার এ নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ফিরে এসে যখন তাঁর কাছে পুরো ঘটনা সবিস্তারে তুলে ধরা হয় তখন তিনি হাত উঠিয়ে দু'বার বলে ওঠেন, হে **আল্লাহ! খালিদ যে কাজ করেছে তা থেকে আমি তোমার কাছে দায়মুক্ত।**[৬৬০]

খালিদ রা. এর নির্দেশে কেবল বনু সুলাইমের লোকজন তাদের বন্দীদেরকে হত্যা করে ফেলেছিল। মুহাজির ও আনসারগণ এ কাজ থেকে বিরত ছিলেন। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রা.কে নিহতদের রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. ও আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. এর মাঝে কিছুটা কথা কাটাকাটি ও বিতর্ক-বিসংবাদ হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি খালিদের উদ্দেশে বলেন, **খালিদ! থেমে যাও!! আমার সাহাবীদেরকে কিছু বলা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর কসম! যদি উহুদ পাহাড়**

---

[৬৬০] সহীহ বুখারী ১/৪৫০, ২/৬২২।

পরিমাণ স্বর্ণও তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করো তবুও তা আমার কোনো সাহাবীর এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যার ইবাদতের সমান হবে না।[৬৬১]

এই ছিল মক্কা বিজয় অভিযান। এটা ছিল ইসলামের ইতিহাসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর যুদ্ধ ও এক বিশাল বিজয়। এ বিজয় জাহেলিয়াত আর পৌত্তলিকতার কোমর চিরদিনের জন্য ভেঙে দিয়েছিল। গোটা জাযীরাতুল আরবে তার সকল আড্ডার দোকান আর শুঁড়িখানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। কোনোদিনও সে দোকান আর সে বাজার আবার জমিয়ে বসার ক্ষীণ আশাটুকুও বাকি ছিল না। বছরের পর বছর ধরে পৌত্তলিক ঐতিহ্যের পতাকাবাহী আর মুসলমানদের মধ্যে যে বিভীষণ সংঘাত আর সংঘর্ষ চলে আসছিল এর শেষ ফলাফল কী হয়, পাল্লা শেষমেষ কোন্ শিবিরের দিকে ঝুঁকে পড়ে এ দৃশ দেখার জন্য আরবের তামাম কবীলা ছিল উদগ্রীব আর তিয়াসকাতর। কারণ তারা ভালোভাবেই জানত- হারাম শরীফ অধিকারের শর্তে আউয়ালই হচ্ছে হকের ওপর থাকা। বাতিলের ওপর থেকে এ ঘরের কৃর্তৃত্ব কেউই লাভ করতে পারবে না। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে যখন হস্তীবাহিনী এ ঘর ধ্বংস করার জন্য এসেছিল তখন তাদের এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই ভক্ষিত তৃণ সদৃশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আর হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল এই বিশাল বিজয়ের ভূমিকা ও পটভূমি। মানুষ তখন জান-মালের নিরাপত্তা পেল। একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পেল। ইসলাম নিয়ে ভাববার যথেষ্ট সময় মিলে গেল। মক্কায় সকলের অলক্ষিতে মনের গভীর কুঠুরিতে যারা ভীত সন্ত্রস্ত হৃদয়ে ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল তারা এবার সকলের সামনে তা প্রকাশ করে দেওয়ার সাহস পেল। অন্যকেও এ পথে ডাকতে লাগল। এর ফলাফলে এক বিশাল সংখ্যক বনী আদম মুসলমান হয়ে গেল। এ কারণে দেখা গিয়েছিল অতীতের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলিতে যেখানে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা তিন হাজারের কোটা কোনোদিন ছাড়িয়েছিল না এতক্ষণে তা দশ হাজার হয়ে গিয়েছিল।

পরিশেষে এ বিজয়ের বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দিয়েছিল। তাদের চোখের ছানি দূর হয়ে গিয়েছিল। ইসলাম সম্পর্কে তাদের চোখে যে মোটা একটা পর্দা পড়ে গিয়েছিল এখন তা সরে গিয়ে গোটা দিগন্তের সামনে তার চেহারা শত আলো নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। এ বিজয় গোটা জাযীরাতুল আরবের ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশাল এক রেনেসাঁর জন্ম দিলো। যে রেনেসাঁর ফলশ্রুতিতে

---

[৬৬১] আমরা এ গাযওয়ার বিস্তারিত তথ্য চয়ন করেছি ইবনে হিশাম ১/৩৮৯-৪৩৭, সহীহ বুখারীঃ আসহাবে রাসূলের শ্রেষ্ঠত্ব অধ্যায় হাদীস নং ৩৬৭৩, ফাতহুল বারী ৮/৩-২৭, সহীহ মুসলিম ১/৪৩৭-৪৩৯, ২/১০২, ১০৩, ১৩০, যাদুল মাআদ ২/১৬০-১৬৮ থেকে।

ক্ষমতার পালাবদল হলো। ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ময়দানে নেমে এলো ইসলাম ও মুসলিম জাতি।

সুতরাং, বলা যায়, সেই যে হুদাইবিয়ার সন্ধির মাধ্যমে চারপাশের পরিবেশ ও পরিস্থিতির জোয়ার মুসলমানদের কিছুটা অনুকূলে বইতে শুরু করেছিল তা পূর্ণাঙ্গ রূপ আর পরিণত বয়সে এসে পৌঁছেছিল এ বিজয়ের মাধ্যমে। এ বিজয়ের ফলে এখন আবার নতুন করে এমন এক নতুন দিনের উদ্বোধন হয়েছিল, যা ছিল পুরোটাই মুসলমানদের। ময়দানের শতভাগ ছিল এখন তাদের দখলে। অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর এখন কাজ ছিল শুধু দরবারে রিসালতে এসে ইসলাম কবুল করা। এরপর তা নিয়ে বিস্তৃত পৃথিবীর দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া। পরবর্তী দু' বছর জুড়ে তাই এ বিশাল লক্ষ্যেরই প্রস্তুতি ও আয়োজন চলছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

এটা ছিল নবী জীবনের সর্বশেষ অধ্যায়। দিনের পর দিন, আর রাতের পর রাত মেহনত ও পরিশ্রমের ঘাম ঝরিয়ে, চরম অভাব ও দরিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জিত হয়ে, দুঃখকে সুখ, আর কষ্টকে মিষ্ট হিসেবে মেনে নিয়ে ইসলামের দাওয়াতের বাগানে যে জীবনের বিশটি বছরেরও বেশি সময় ব্যয়িত হয়েছে এখন সে বাগানে বসন্তের আগমন শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে ফুল-ফলে ভরে যাবার ঋতুর আগমনী বার্তা। সময় হয়েছে নিজ হাতে রোপন করা চারা গাছে আজ ফল দেখে সুখের হাসি হাসার; নয়ন জুড়ানোর; মন ভরিয়ে তোলার।

এ সময় অর্জিত মুসলমানদের সবচেয়ে বড় আর সুবিশাল বিজয় ছিল মক্কা বিজয়। এটা ছিল ইসলামের এক মহান বিজয়- যে বিজয়ের প্রভাবের পরিধি আর ফলাফলের পরিসর ছিল সুদূর বিস্তৃত। এ বিজয়ের ফলে তৎকালীন পৃথিবীর দিবা-রাত্রির গতিধারা পাল্টে গিয়েছিল। গোটা আরবীয় জীবনধারার পটরেখায় বিস্তর পরিবর্তন এসেছিল। এ বিজয়ের ভূত ও ভবিষ্যৎকালের মাঝে বিশাল ব্যবধান তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এর অতীতের সঙ্গে উত্তরের মিলন সবসময়ের জন্যই অসম্ভব ছিল। কারণ গোটা আরবদের দৃষ্টিতে এতদিন কুরাইশরাই ছিল দীনের রক্ষাকর্তা ও তার সর্বাপেক্ষা বড় অভিভাবক। এ ক্ষেত্রে আরবদের মর্যাদা তাদের অনুসরণকারী ও অনুচরের চেয়ে বেশি ছিল না। সুতরাং, এখন ধর্মের গুরুঠাকুর সেজে বসা সেই কুরাইশরাই যখন মাথা নত করে বসল তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে জাযীরাতুল আরবে পৌত্তলিক ধর্মের ভোঁজবাজির দিনও ফুরিয়ে এলো।

নবী জীবনের এ অধ্যায়টি আমরা দু'টি পর্বে ভাগ করতে পারিঃ

এক. যুদ্ধ-জিহাদ পর্ব।

দুই. আরবীয় কবীলার ইসলাম গ্রহণের প্রতিযোগিতা পর্ব।

যদিও এ দু'টি পর্ব একটির সঙ্গে অপরটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তথাপি আমাদের কাজের সুবিধার্থে দু'টিকে স্বতন্ত্রভাবে বিন্যাস দিয়েছি। এতে করে আমরা যুদ্ধ-জিহাদ পর্বকে আগে এনেছি আর ইসলাম গ্রহণের পর্বকে পরে নিয়েছি। পেছনের অধ্যায়গুলোও এটাই দাবি করে।

গাযওয়ায়ে হুনাইন

মক্কা বিজয় এসেছিল অনেকটা এমন রূপরেখা নিয়ে যে, হঠাৎ কোত্থেকে একটি দমকা হাওয়া ছুটে এলো, মুহূর্তে সেটা বিশাল ঝটিকায় রূপ নিয়ে আরও আবেগ ও বেগঘন হয়ে আছড়ে পড়ল একটি জনপদে; পলকে সবকিছু তছনছ

করে দিয়ে চলে গেল। ঠিক সেভাবেই মক্কা বিজয় এতটা দ্রুত ঝটিকা অভিযান ছিল যে, আরবীয় কবীলাগুলির কেউ কিছু বোঝার আগেই সবকিছু শেষ হয়ে গেল। এ কারণে সে ঝড়ের মুকাবিলার কথা কারও মনে ঘুণাক্ষরেও উদিত হলো না। ফলাফলে দু'চারটি একঘেয়ে ও ঘাড়তেরা হিংস্র আরব কবীলা ছাড়া সকলেই নীরব আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেওয়াকেই শ্রেয় মনে করল। দলে দলে সবাই ইসলামের পথ ধরল। সেই একঘেয়েদের কাতারে সকলের শীর্ষে ছিল হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র । তাদের সঙ্গে এসে আবার মিলিত হলো নাসর, জুশাম, সা'দ বিন বকর ও বনু হেলালের কিছু লোক। কায়সে আয়লানের সঙ্গে তাদের সকলের সম্পর্ক ছিল। মুসলমানদের এ অভাবনীয় বিজয় তারা মুখ বুঁজে মেনে নিবে এবং তাদের এক সুখের দিনে তারা নীরব বসে থাকবে এটা ছিল তাদের আত্মমর্যাদাবোধের চরম পরিপন্থী। এ কারণে তারা সবাই মালেক ইবনে আউফ নসরীর কাছে সমবেত হলো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো।

শত্রু বাহিনীর অগ্রসর ও আওতাসে অবতরণ

শত্রু বাহিনীর সিপাহসালার মালিক ইবনে আউফ যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলো তখন সে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে তাদের ধন-সম্পদ, নারী ও শিশুদেরকেও নিয়ে নিলো। অতঃপর তারা সফর শুরু করে হুনাইনের নিকটবর্তী হাওয়াযিন জনপদের আওতাস নামক একটি উপত্যকায় অবতরণ করল। কিন্তু আওতাস আর হুনাইন অভিন্ন উপত্যকা নয়। হুনাইন উপত্যকা হলো যুল মাযাজ লাগোয়া একটি উপত্যকা। আরাফার দিক থেকে মক্কা ও হুনাইনের দূরত্ব দশ মাইলের খানিকটা বেশি হবে।[৬৬২]

রণভিজ্ঞ জনৈকের বিরোধিতা

আওতাস নামক উপত্যকায় অবতরণ করার পরে লোকজন তাদের সিপাহসালারের কাছে জড়ো হলো। তাদের মধ্যে এক জন ছিল দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ। সে ছিল এক বুড়ো লোক। কিন্তু সে ছিল দারুণ রণভিজ্ঞ এক লড়াকু সেনা। যৌবনের সে রণ-তরঙ্গ এখন বেচারার চোখ-মুখ থেকে হারিয়ে গেছে। কিন্তু তার বুদ্ধি-কৌশলে তখনো ভাটি লাগেনি। তাই দুরাইদ বলল, তোমরা এখন কোথায় রয়েছ? .লোকজন বলল, আওতাসে। ভালো কথা; এটা ঘোড়ার ভারি উপযুক্ত জায়গা; খুব একটা পাথুরে কিংবা বালুকাময় নয়; নিদারুণ শুষ্ক ও রুক্ষও নয়। কিন্তু আমার কানে উটের আওয়াজ, গাধার ডাক, বকরী- ভেড়ার ভ্যা ভ্যা আর শিশুদের চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে কোত্থেকে? তারা বলল, মালিক ইবনে আউফ বাহিনীর সঙ্গে তাদের ধন-সম্পদ, নারী ও শিশুদেরকেও নিয়ে

[৬৬২] দেখুন ফাতহুল বারী ৮/২৭, ৪২।

এসেছে। বৃদ্ধ তখন মালিককে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করল। মালিক বলল, আমার ইচ্ছা প্রত্যেক সৈন্যের পেছনে তার মালামাল ও পরিবার রেখে দিব, যাতে তারা সেগুলি রক্ষার জন্য হলেও যুদ্ধ করে। রণভিজ্ঞ বৃদ্ধ দুরাইদ বলল, ভেড়ার বাচ্চা! পরাজিতদের পরাজয় কি কেউ ঠেকাতে পারে। দেখো! যদি যুদ্ধে তোমরা বিজয়ী হও তবে সে ক্ষেত্রে তো তীর-তরবারি নিয়ে একজন সৈন্যই উপকারী ও দরকারী। আর যদি তোমরা পরাজিত হও তবে তো ধন-সম্পদ আর পরিবার পরিজনসহ লাঞ্ছিত হতে হবে। এরপর সে কয়েকটি কবীলা ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে আবার বলল, মালিক! তুমি বনু হাওয়াযিনের নারী ও শিশুদেরকে ঘোড়ার মুখের কাছে এনে রেখে দিয়ে ঠিক করোনি। দ্রুত তাদেরকে নিরাপদ স্থানে রেখে এসো। এরপর অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে ধর্মদ্রোহীদের মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়ো! যদি যুদ্ধে তুমি জয়ী হও তবে তারা পেছন থেকে এসে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবে আর যদি পরাজিত হও তবে নিদেনপক্ষে তোমাদের ধন-সম্পদ আর পরিবার-পরিজন তো নিরাপদে থাকল।

কিন্তু তাদের সিপাহসালার মালিক বৃদ্ধ দুরাইদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। সে বলল, আল্লাহর কসম! এমনটি আমি কখনোই করব না। যা করেছি তো করেছিই। তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার আকলও ভোঁতা হয়ে গেছে। হয় বনু হাওয়াযিন আমার কথা মানবে নতুবা আমি এখনই এ তরবারি আমার পেটে ঢুকিয়ে পিঠ থেকে বের করে নিব। তার ইচ্ছা ছিল- দুরাইদ তার কোনো ব্যাপারে নাক না গলাক। লোকজন তখন বলল, আমরা তোমার আনুগত্য করব। দুরাইদ বলল, জীবন আজ আমাকে এমন একটি দিনে ঠেলে দিলো, যে দিন আমি জীবনেও আর কখনো দেখিনি এবং আমার থেকে যা ছুটে যায়নিঃ

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعْ ... أَخُبُّ فِيهَا وَأَضَعْ

أَقُودُ وَطْفَاءَ الزَّمَعْ ... كَأَنَّهَا شَاةٌ صَدَعْ

'হায় আজ যদি আমি যুবক হতাম! তবে দৌড়ে চম্পট দিতাম।
লম্বা লম্বা লোমবিশিষ্ট এবং মধ্যম পর্যায়ের ঘোড়াগুলি নিয়ে যেতাম'।

দুশমনের গুপ্তচর

অতঃপর মালিকের কাছে তার কয়েকজন গোয়েন্দা ফিরে গেল। তাদেরকে সে মুসলিম বাহিনীর পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিল। তাদের প্রত্যেকের শরীরের জোড়া আলাদা হয়ে গিয়েছিল। মালিক তাদের উদ্দেশ্যে বলল, সর্বনাশ হোক! এ অবস্থা তোমাদের কী করে হয়েছে? তারা বলল, আমরা মাথায় চিতা বিশিষ্ট কিছু অশ্বপৃষ্ঠে কিছু সাদা মানুষ দেখেছি। আল্লাহর কসম! আর তাতেই আমাদের যে অবস্থা তা তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোয়েন্দা

শত্রুবাহিনীর যাত্রার সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হাদরাদ আসলামী রা. কে তাদের সার্বিক গতিবিধি জেনে নেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দুশমনের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের সঙ্গে অবস্থান করে সবকিছু জেনে তবেই ফিরে এসে তাঁকে সবকিছু সম্পর্কে অবহিত করেন।

হুনাইনের পথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসের ছয় তারিখ শনিবার দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ত্যাগ করে হুনাইনের পথে যাত্রা করেন। এটা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মক্কায় প্রবেশের উনিশতম দিন। মদীনা থেকে আসা দশ হাজার বাহিনীর সঙ্গে নব দীক্ষিত দুই হাজার মক্কী মুসলমানসহ মোট বারো হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি হুনাইনের পথে অগ্রসর হন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রা. এর কাছ থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল যন্ত্রপাতিসহ এক শ' লৌহ বর্ম ধার নেন। মক্কায় আত্তাব বিন উসাইদ রা. কে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন।

দুপুরের পর এক অশ্বারোহী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এসে জানালো, আমি অমুক অমুক পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলাম। সেখান থেকে আমি দেখেছি হাওয়াযিন তাদের ধন-সম্পদ, উট, ভেড়া, বকরী নিয়ে গোষ্ঠীসুদ্ধ হুনাইন প্রান্তরে এসে জমা হয়েছে। তার কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, **আল্লাহ চান তো আগামী কাল এ সবকিছু মুসলমানদের গনীমতের মালে পরিণত হবে**। যখন রাত নামতে শুরু করল। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসতে লাগল কোলাহলমুখর পৃথিবী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস ইবনে আবী মারসাদ গানাবী রা. কে তার সানন্দচিত্তে সান্ত্রীর দায়িত্বে নিযুক্ত করেন।[৬৬৩]

হুনাইন যাওয়ার পথে লোকজন একটি বিশাল সবুজ-শ্যামল বরই গাছ দেখল। তাকে বলা হতো যাতু আনওয়াত। জাহেলী যুগে আরবরা এ গাছে তাদের হাতিয়ার ঝুলিয়ে রাখত; এর কাছে তাদের পশু যবাই করত এবং এখানে বিভিন্ন দরগাহ পেতে বসত; মেলা বসাতো। তখন মুসলিম শিবিরের কয়েকজন সৈন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবদার করল, তাদের যেমন যাতে আনওয়াত আছে ; আমাদের জন্যও একটি যাতে আনওয়াত

---

৬৬৩ দেখুন সুনানে আবী দাউদ জিহাদ পর্ব: আল্লাহর পথে পাহারাদারির ফযীলত ২/১০।

বানিয়ে দিন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবার। ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, তোমরা তো সে আবদার করেছ, যে আবদার মূসা আ.এর কওম তার কাছে করেছিলঃ আমাদের জন্য একটি ইলাহ বানিয়ে দিন! যেমন তাদের ইলাহ রয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা তো মূর্খ সম্প্রদায়। এটাই মানুষের রীতি; তোমরা সেই রীতির ঘাড়েই চড়ে বসেছ![৬৬৪]

মুসলমানদের বিশাল সৈন্য সমাবেশ দেখে কোনো কোনো সেনা বলে ফেলল, আজ আমরা কিছুতেই পরাজিত হবো না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথায় দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন।

অতর্কিত হামলার শিকার

মুসলিম বাহিনী শাওয়াল মাসের দশ তারিখ মঙ্গল ও বুধ বারের মধ্যবর্তী রাতে হুনাইনে গিয়ে পৌঁছল। মালিক ইবনে আউফ মুসলিম বাহিনীর আগে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সে রাতেই তার বাহিনী নিয়ে হুনাইন উপত্যকায় ঢুকে বিভিন্ন উপত্যকা আর গিরি-কন্দরের ফাঁকে ফাঁকে দু'চার জন করে সেনা বসিয়ে দিলো। তাদের কাছে মালিকের কঠোর নির্দেশ ছিলো- প্রথম দেখাতেই মুসলিম বাহিনীর ওপর তীর বৃষ্টি শুরু করবে। এরপর সবাই একযোগে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সুবহে সাদিকের খানিকটা আগে নিশির শেষ প্রহরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনা বিন্যাস দিলেন। মুসলিম বাহিনীর বড় ও ছোট ঝাণ্ডাগুলিকে বণ্টন করে বিভিন্ন সৈন্যের হাতে তুলে দিলেন। সুবহে সাদিকের আলোকরেখা চতুর্দিকে না ছড়াতেই মুসলিম বাহিনী হুনাইন প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হলো। এই পাহাড়ী উপত্যকার প্রতিটি রগে রগে আর গিরি-কন্দরের সংকীর্ণ খাঁদে অসংখ্য শত্রুসেনা লুকিয়ে থাকতে পারে এ কথা ঘুণাক্ষরেও মুসলমানদের মনে উদিত হলো না। তাই তারা বেখবরীর দুনিয়ায় বেঘোর থেকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত মনে ময়দানে অবতরণ করলেন। হঠাৎ তারা অনুভব করলেন, কোত্থেকে মুষলধারায় তীর বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই চতুর্দিক থেকে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুসেনা। অতর্কিত এ অভাবিতপূর্ব আক্রমণে তারা হতচকিত ও ভড়কে গেলেন। ভাগতে আরম্ভব করলেন দিগ্বিদিকে। কেউ কারও প্রতি একটু তাকানোরও সময় পেলেন না। এটা ছিল তাদের জন্য একটি লজ্জাকর পরাজয়। এমনকি আবু সুফিয়ান রা.- যিনি সবেমাত্র

---

[৬৬৪] তিরমিযীঃ ফিতনা পর্বঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ঘাড়েই সওয়ার হবে অধ্যায় ৪/৪১২, মুসনাদে আহমদ ৫/২১৮।

মুসলমান হয়েছিলেন- বলে উঠলেন, তাদের এ ভাগা (লোহিত) সাগরের আগে কেউ থামাতে পারবে না। জাবাল কিংবা কালাদা ইবনে হাম্বল চিৎকার করে বলে উঠল, দেখো! আজ তাদের যাদু ধরা খেয়ে গেছে!!

মুসলিম সেনাদের পালানোর এ সময়টিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানদিক অবলম্বন করে ডাকতে লাগলেন, **হে লোক সকল! আমার কাছে চলে এসো! আমি আল্লাহর রাসূল!! আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ!!!** মাত্র কয়েকজন মুহাজির ও আনসার সৈন্য তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে তাদের সংখ্যা ছিল নয় জন। আর ইমাম নববী রহ. এর মতে, তাদের এ সংখ্যা ছিল বারো জন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো যা ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত হাদীসে ইমাম আহমদ ও হাকেম রহ. মুসতাদরাকে রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে মাসউদ রা. বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় সবাই পালাতে শুরু করল। কেবল আশি জন মুহাজির ও আনসার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ময়দানে অবিচল রয়ে গেলেন। আমরা পদাতিক ছিলাম আর পেছনের দিকেও ফিরতে পারছিলাম না। ইমাম তিরমিযী রহ. হাসান সনদে ইবনে উমর রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইবনে উমর রা. বলেন, হুনাইন প্রান্তরে আমি আমাদের সৈন্যদেরকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যেতে দেখলাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তখন একশ' জন সৈন্যও ছিল না।[৬৬৫]

এ সময় পৃথিবীর আকাশ ও মাটি আরেকটি অজানা নতুন বিস্ময় প্রত্যক্ষ করল। পরম লাজুকতার পর্দা সরিয়ে এবার সামনে ভেসে উঠল নববী বীরত্বের এক অবিশ্বাস্য চিত্র। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের দিকে স্বীয় খচ্চর হাঁকিয়ে অগ্রসর হলেন। তার যবান মুবারক থেকে তখন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নবী; মিথ্যুক নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান!

কিন্তু তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খচ্চরের লাগাম টেনে ধরলেন। আব্বাস রা. তার হাওদা টেনে রাখলেন। তারা উভয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সামনে অগ্রসর থেকে ধরে রাখলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খচ্চরের পিঠ থেকে মাটিতে অবতরণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা

---

[৬৬৫] মুসনাদে আহমদ ১/৪৫৩, ৪৫৪। হাকিম ২/১১৭। তিরমিযী জিহাদ পর্ব: যুদ্ধের সময় অবিচলতা অধ্যায় ৪/১৭৩, হাদীস নং ১৬৮৯। আরও দেখুন ফাতহুল বারী ৮/২৯, ৩০। মুসনাদে আবী ইয়া'লা ৩/৩৮৮, ৩৮৯।

করে হাত উঠিয়ে বললেন : **আল্লাহ! আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন।**

সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন : নব উদ্যমে বেজে উঠল রণ-দামামা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন চাচা আব্বাস রা. কে সাহাবায়ে কেরামকে ডাক দিতে বললেন। আব্বাস রা. ছিলেন সুউচ্চ আওয়াজের অধিকারী। তিনি বলেন, তখন আমি আমার সমুচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ দিলাম : হে বাবলা বৃক্ষওয়ালারা! ...(বাইয়াতে রেযওয়ানের সদস্যরা!)..............! তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তারা যখন আমার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন ঠিক সেভাবে এ দিকে ছুটে এলেন যেমন পেরেশান গাভী তার হারিয়ে যাওয়া বাচ্চার আওয়াজ শুনে ছুটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা জবাব দিলেন, লাব্বাইক! লাব্বাইক!![৬৬৬] আমরা আসছি!! আমরা আসছি!!! অবস্থা এমন হয়েছিল যে, কোনো সৈন্য তখন তার উটকে পেছনে ঘুরানোর চেষ্টা করে যদি না পারছিল, তখন সে নিজের লৌহবর্ম খুলে তার ঘাড়ে ছুঁড়ে মারছিল। এরপর ঢাল তলোয়ার নিয়ে উটকে ছেড়ে দিয়ে আওয়াজ অভিমুখী ছুটে আসছিল। এমনি করে যখন এক শ' জনের মতো সমবেত হলো তখন তারা দুশমনের দিকে ছুটে গিয়ে পূর্ণ উদ্যমে লড়াইয়ে লিপ্ত হলেন।

অতঃপর আনাসারদেরকে ডাকা শুরু হলো: হে আনসার সম্প্রদায়! হে আনসার সম্প্রদায়!! এরপর সে আওয়ায বনু হারিস ইবনে খাযরাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। যেভাবে যুদ্ধের ময়দান ছেড়েছিলেন ঠিক সেভাবেই তারা আবার একের পর এক ফিরে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে উভয় পক্ষের মাঝে শুরু হলো ভয়াল যুদ্ধ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃষ্টি উঠিয়ে রণাঙ্গনের দিকে চেয়ে দেখলেন ঘনঘোর আহবে গোটা রণক্ষেত্র সরগরম হয়ে উঠেছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন, **এবার রণক্ষেত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিন থেকে হাত মুবারকে এক মুষ্টি মাটি তুলে শত্রুবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, **شَاهَتِ الْوُجُوْهُ** তথা চেহারাগুলি **বিকৃত হয়ে যাক!**

এই এক মুষ্টি মাটি দিয়ে আল্লাহ তাআলা দুশমনের প্রতিটি সৈন্যের দুই চোখ ভরে দিলেন। এতে তাদের শাণ ভোঁতা হয়ে গেল। দিকভ্রান্ত হয়ে যে যেদিকে পারল ভাগতে শুরু করল।

---

৬৬৬ সহীহ মুসলিম ২/১০০।

চূড়ান্ত পরাজয়

সেই এক মুষ্টি মাটি হয়েই কুদরতের কারিশমা নীল আকাশ থেকে ধূলির ধরায় নেমে এসেছিল। ফলশ্রুতিতে দেখা গেল মাটি নিক্ষেপের পরে নিমেষেই পুরো ময়দান ফাঁকা হয়ে গেল। দুশমনদেরকে ধাওয়া করল লজ্জাজনক চূড়ান্ত পরাজয়। কেবল বনু সাকীফেরই মারা পড়ল সত্তর জন। আর তাদের সকল ধন-সম্পদ, অস্ত্র-শস্ত্র ও জন্তু-জানোয়ার মুসলমানদের হাতে এলো।

এই ছিল সেই ঐতিহাসিক পট পরিবর্তন যে সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (٢٥) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (٢٦)

এবং হোনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্তেও তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হলো কাফেরদের কর্মফল। [সূরা তাওবাহ:২৫-২৬]

পিছু ধাওয়া

শত্রু বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় নেমে আসার পরে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। এক দল পালিয়ে তায়েফে চলে গেল। একদল গিয়ে আশ্রয় নিলো নাখলাতে। আরেক দল ভেগে ছুটল আওতাসের দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আমের আশআরী রা. এর নেতৃত্বে আওতাসগামী সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। সেখানে উভয়ের মাঝে সামান্য সংঘর্ষ হয়। এরপর মুশরিক বাহিনী সেখানেও পরাজিত হয়। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু আমের আশআরী রা. শহীদ হয়ে যান।

মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর আরেকটি দল নাখলাগামী মুশরিক সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেখানে বৃদ্ধ দুরাইদ ইবনে সিম্মাহ মুসলমানদের হাতে ধরা খেয়ে যায় এবং রবীআ ইবনে রুফাই' রা. তাকে হত্যা করেন।

পরাজিত মুশরিক সৈন্যদের সিংহভাগ পালিয়ে তায়েফে চলে গিয়েছিল। তাই গনীমতের মাল বণ্টন করা শেষে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের পথে অগ্রসর হন।

গনীমত

গনীমতের মাল স্বরূপ মুসলিম বাহিনী ছয় হাজার বন্দী পেয়েছিল। উট ছিল চব্বিশ হাজার। বকরী ছিল চল্লিশ হাজারেরও বেশি। রৌপ্য ছিল চার হাজার উকিয়া (অর্থাৎ এক লক্ষ ষাট হাজার দিরহাম; যার পরিমাণ ছয় কুইন্টালের চেয়ে ছয় কিলো কম হয়)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের সব মাল জমা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তা জি'রানা নামক স্থানে মাসউদ ইবনে আমর গিফারী রা. এর তত্ত্বাবধানে রেখে তায়েফের পথে পা বাড়ান। তায়েফ থেকে ফিরে আসার পরেই তবে সেগুলি বণ্টন করেন।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ বোন শীমা বিনতে হারিস সা'দিয়া রা. ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাকে নিয়ে আসা হলে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিজের পরিচয় পেশ করেন। একটি চিহ্ন দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনতে পারেন এবং পরে তাকে খুব সম্মান করেন। তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর বসান। এরপর খুব অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তাকে নিজ কওমের কাছে ফিরিয়ে দেন।

গাযওয়ায়ে তায়েফ

হাকীকতে এটি স্বতন্ত্র কোনো গাযওয়া ছিল না; বরং এটা ছিল গাযওয়ায়ে হুনাইনের অংশবিশেষ এবং সে লড়াইয়ের সর্বশেষ পর্ব। তার কারণ হলো হুনাইন প্রান্তরে মারাত্মক পতন ঘটার পরে হাওয়াযিন ও সাকীফের সিংহভাগ লোকজন তাদের সিপাহসালার মালিক ইবনে আউফ নাসরীসহ তায়েফে পালিয়ে এসে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লড়াই শেষ করে যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মাল জি'রিনাতে একত্র করে রেখে ঠিক তখনই অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগে তায়েফের দিকে রওয়ানা দেন। এরপর নিজে যাত্রা করেন। পথে প্রথমে নাখলায়ে ইয়ামানীয়াহ, অতঃপর করনুল মানাযিল এবং সর্বশেষে লিয়্যাহ হয়ে গমন করেন। লিয়্যাতে শত্রু সরদার মালিক ইবনে আউফের একটি দুর্গ ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে সেটি ভূমিসাৎ করে দেওয়া হয়। এরপর তিনি একটানা সফর চালু রেখে তায়েফে এসে পৌঁছেন এবং শত্রু বাহিনীর দুর্গের অনতিদূরে শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর দুর্গের অধিবাসীদের ওপর আরোপ করেন অনির্দিষ্টকালীন অবরোধ।

একটানা অনেকদিন চলতে থাকে এ অবরোধ। ইমাম মুসলিম র. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তাদেরকে অবরোধ করে রাখার সময়সীমা ছিল চল্লিশ দিন। তবে সীরাত বিশেষজ্ঞরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের কারও মতে অবরোধের সময়সীমা ছিল বিশ দিন। কারও মতে বিশ দিন, কেউ বলেন দশদিনের চেয়ে একটু বেশি। কেউ বলেন, আটারো দিন। আবার কারও কারও মতে এর মুদ্দত ছিল পনেরো দিন।[৬৬৭]

অবরোধ চলাকালে উভয় বাহিনীর মধ্যে কিছু তীর মারামারি ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি হয়। বরং মুসলমানরা যখন সর্বপ্রথম অবরোধ শুরু করে তখন দুর্গের ভেতর থেকে এত পরিমাণে পাথর ও তীর বৃষ্টি হতে থাকে যে, মনে হচ্ছিল গোটা আসমান পঙ্গপালে ভরে গেছে। এতে মুসলমানদের বারো জন সেনা নিহত হন আর আহত হন আরও বেশকিছু লোক। তখন তারা শিবির থেকে বর্তমানে তায়েফ মসজিদ যেখানে অবস্থিত সেখানে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং সেখানেই পরে শিবির স্থাপন করেন।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে কামান স্থাপন করা হয় এবং তা দিয়ে দুর্গের দিকে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করা হয়। এতে করে দুর্গের পাঁচীলে ফাঁটলের সৃষ্টি হয় এবং মুসলমানদের একটি বাহিনী ট্যাংকের[৬৬৮] মধ্যে ঢুকে দুর্গের পাঁচিল পর্যন্ত পৌছে যায় সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুশমনরা তাদেরকে দেখে ফেলে এবং তাদের ওপর অগ্নি-তপ্ত আগুনের কড়া নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন তারা এর নীচ থেকে বের হয়ে যান। তখন তারা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে তাদের বেশকিছু সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জোর খাটানোর পরিবর্তে অভিনব রণ-কুশলতার পথ বেছে নিলেন। তিনি দুশমনকে সহজের আত্মসমর্পণের পথে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের আঙ্গুরের বাগান কেটে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরাম পুরো বাগান কেটে সাফ করে ফেললেন । বনু সাকীফের লোকেরা তখন আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তাদেরকে গাছ কাটা বন্ধ করার অনুরোধ জানায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিকে চেয়ে গাছ কাটা বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

---

[৬৬৭] ফাতহুল বারী ৮/৪৫।

[৬৬৮] সেই কামান বর্তমান কালের কামানের মতো ছিল না। বরং সেই কামান বানানো হতো কাঠ দিয়ে। তার মধ্যে সৈন্যরা ঢুকে থাকত। অতঃপর সেটা ঠেলে দুর্গের গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হতো। এভাবে তারা তখন সেটার ভেতরে থেকেই দুর্গে পাঁচীলে ছিদ্র করে দুর্গের ভেতরে ঢুকে যেতে পারত।

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘোষক ঘোষণা দিলেন, যে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে আযাদ করে দেওয়া হবে। এ ঘোষণা শুনে দুর্গ থেকে তেইশ জন লোক বেরিয়ে এলো।[৬৬৯] তাদের মধ্যে আবু বুকরা রা.ও ছিলেন। তিনি দুর্গের দেয়ালের ওপর ছিলেন। এ ঘোষণা শুনে নীচ পর্যন্ত লম্বা পানি সিঞ্চনের একটি চর্কিতে ঝুলে নীচে নেমে আসেন। (যেহেতু চর্কিকে আরবিতে বলা হয় 'বুকরা' তাই) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম দেন 'আবু বুকরা'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবাইকে আযাদ করে দেন এবং তাদের দেখাশোনার জন্য একেক জনকে একেকজন মুসলিম সেনার কাছে অর্পণ করেন। দুর্গবাসীদের জন্য এটা ছিল একটি চরম বেদনাদায়ক ঘটনা।

যখন অবরোধের সময় সীমা ক্রমে বেড়েই চলল। অপরদিকে দুর্গবাসীদেরকে কাঁবু করা ধীরে ধীরে দুঃসাধ্য হয়ে পড়তে লাগল। পাশাপাশি মুসলমানরা নিত্যদিন তীর বৃষ্টি ও উত্তপ্ত লৌহকদ্বড়া দ্বারা আহত হতে লাগলেন। তা ছাড়া দুর্গবাসীরা মোটামুটি এক বছরের প্রয়োজনীয় জীবিকার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওফল ইবনে মুআবিয়া দীলীর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, তারা গর্তে লুকিয়ে থাকা সাপের মতো। যদি তাদের ওপর ক্ষেপে যান তবে তাদেরকে ধরতে পারবেন আর যদি তাদেরকে ফেলে রেখে চলে যান তবে তারা আপনাকে কোনো ক্ষতি করতে যাবে না। এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ উঠিয়ে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা চূড়ান্ত করেন। উমর ইবনে খাত্তাব রা. কে মানুষের মধ্যে ঘোষণা দিতে বলেন যে, আল্লাহ চান তো আগামী দিন সূর্যোদয়ের পর আমরা এখান থেকে ফিরে যাচ্ছি। সাহাবায়ে কেরাম এ ঘোষণা শুনে নিদারুণ মর্মাহত হলেন। সকলে বলতে লাগলেন, বিজয় না নিয়েই আমরা ফিরে যাব? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ঠিক আছে তবে কাল যুদ্ধ শুরু করে দাও!** মুসলিম বাহিনী পরদিন ঠিক ভোর বেলায় দুশমনের দুর্গে হামলা চালালেন। কিন্তু কিছু মার-গুঁতো খাওয়া ব্যতীত ফলাফল ছিল শূন্য। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **আল্লাহ চান তো আগামী কাল ভোরে আমরা ফিরে যাচ্ছি।** এ ঘোষণায় সাহাবায়ে কেরামের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তারা সানন্দচিত্তে মেনে নিলেন এবং ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসতে

[৬৬৯] সহীহ বুখারী ২/৬২০।

লাগলেন। অতঃপর লোকজন যখন লাকড়ী-বাকড়ী উঠিয়ে প্রস্তুত হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমরা বলো: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. আমরা প্রত্যাবর্তনকারী; তওবাকারী; ইবাদতকারী আর আমাদের প্রভুর গুণকীর্তনকারী।

কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বনু সাকীফের ওপর বদদুআ করুন! তিনি বললেন, **হে আল্লাহ! সাকীফকে আপনি হেদায়াত দিন! তাদেরকে আপনি ফিরিয়ে আনুন!!**

জি'রানাতে গনীমতের মাল বণ্টন

তায়েফ থেকে অবরোধ উঠিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রানায় ফিরে এলেন। সেখানে তিনি দশ দিনেরও বেশি সময় অবস্থান করেন। কিন্তু গনীমতের মাল বণ্টন করলেন না। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যদি হাওয়াযিনের কোনো প্রতিনিধিদল তওবা করে ফিরে আসে তবে তিনি তাদেরকে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু এতদিন অপেক্ষার পরেও যখন কেউ এলো না তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল বণ্টন করতে শুরু করলেন। যাতে করে গোত্রপতি ও মক্কার বড় বড় নেতারা- যারা বড় বড় চোখে গনীমতের মালের দিকে চেয়েছিল- তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে 'মুআল্লাফাতুল কুলূব' এর বণ্টন সকলের আগে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে গনীমতের মালের বড় বড় অংশ দেওয়া হয়েছিল।

আবু সুফিয়ান ইবনে হরব রা. কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ উকিয়া রৌপ্য এবং এক শ' উট দিলেন। তখন তিনি বললেন, আমার ছেলে ইয়াযীদ? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াযীদকেও তার মতো দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমার ছেলে মুআবিয়া? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াবিয়াকেও তাই দিলেন। হাকীম বিন হিযাম রা. কে একশ' উট দিলেন। পরে তিনি আরও এক শ' চাইলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দিলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা রা. কে এক শ' উট দিলেন। এরপরে আরও একশ' , একশ' মোট তিনশ' উট দিলেন।[৬৭০] হারেস ইবনে হারিস ইবনে কালাদাকেও এক শ' উট দিলেন। এভাবে তিনি কুরাইশের ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে একশ' একশ' করে উট দিলেন আর অন্যদেরকে দিলেন পঞ্চাশটি বা চল্লিশটি করে। এক পর্যায়ে লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিসাব

[৬৭০] কাযী আয়ায প্রণীত শিফা বিতা'রীফি হুকুকিল মুস্তফা ১/৮৬।

ব্যতীরেকে দান করেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি দারিদ্র্যের কোনো পরওয়াই করেন না। তখন বেদুঈনরা মাল পওয়ার আশায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ভিড় জমালো এবং তাকে ঠেলতে ঠেলতে একটি গাছের গোড়ায় নিয়ে গেল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাদর গাছে আঁটকে রয়ে গেল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **হে লোকসকল! আমার চাদর দিয়ে দাও! ঐ সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ! যদি আমার কাছে তাহামার গাছগুলি পরিমাণ উট আসে তবে আমি সেগুলি তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিব। তারপরেও তোমরা আমাকে কৃপণ, কাপুরুষ কিংবা মিথ্যুক পাবে না।**

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ উটের কাছে গিয়ে তার কুঁজ থেকে কিছু পশম তুলে হাতে উঁচু করে ধরে বললেন, হে **লোকসকল! তোমাদের এ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমার নিজের তো কিছুই নেই এমনকি এই পশমও নেই। কেবল এক পঞ্চমাংশ আমার জন্য; আর তাও তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়।**

'মুআল্লাফাতুল কুলূব' দের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করে দেওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন সাবেত রা. কে গনীমতের মাল ও লোকজনকে জড়ো করার নির্দেশ দেন। সবাই জড়ো হলে তিনি গনীমতের মাল নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক পদাতিক সৈন্য চারটি করে উট কিংবা চল্লিশটি বকরী পেল আর প্রত্যেক অশ্বারোহী পেল বারোটি করে উট কিংবা একশ' বিশটি বকরী।

আনসারদের মনোকষ্ট

বিশেষ এক কৌশলী দৃষ্টিকোণ থেকে এই বণ্টন পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই তা বোঝা গিয়েছিল না। যার কারণে এ নিয়ে বিভিন্ন কথা ও গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছিল।

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কুরাইশ ও অন্যান্য আরবীয় কবীলাকে এভাবে গনীমতের মাল বণ্টন করে দিলেন এবং আনসাররা তা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হলেন আনসাররা মনে মনে দারুণ কষ্ট পেলেন। এক পর্যায়ে তাদের মুখে বিভিন্ন কথাবার্তা উঠতে শুরু করে। এমনকি তাদের একজন বলেও ফেলে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন নিজের কওমের লোকদেরকে পেয়ে গেছেন.....। তখন সা'দ বিন উবাদা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি আপনার আরব

কবীলাগুলিকে গনীমতের মাল এত পরিমাণ বণ্টন করে দিয়েছেন কিন্তু আনসারদেরকে আপনি কিছুই দেননি। এ কারণে তারা মনে কষ্ট পেয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এ ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সা'দ বিন উবাদা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো আমার কওমেরই একজন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে! তোমার কওমকে এ জায়গায় ডেকে নিয়ে এসো! তখন সা'দ রা. বের হয়ে সমস্ত আনসারকে ডেকে নিয়ে এলেন। কয়েকজন মুহাজির সাহাবী এগিয়ে এলে তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন। অতঃপর আরও কয়েকজন এলে তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। সবাই সমবেত হলে সা'দ রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললেন, আনসাররা সবাই একত্র হয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদের নিকট আগমন করলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। এরপর লোকদের উদ্দেশে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! তোমাদের এ কী কথাবার্তা আমার কানে এসেছে? আর তোমাদের এ কী মনোকষ্ট তোমরা আমার ওপর নিয়েছ? আমি কি তোমাদের নিকট এ অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট; অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সরল পথের দিশা দিয়েছেন? আমি কি তোমাদের নিকট এ অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা চরম দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন? আমি কি তোমাদের নিকট এ অবস্থায় আসিনি যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছেন? সকলে সমস্বরে বলল, হাঁ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সবচেয়ে দয়ালু, দাতা।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা আমার প্রশ্নের জবাব দিবে না? তারা বলল, আমরা কী জবাব দিব হে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহ ও তাঁরা রাসূলের বড় দয়া ও ইহসান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! যদি তোমরা চাও তবে বলতে পারো- আর তোমরা সত্যই বলবে এবং তোমাদের কথা সত্যায়নই করা হবে- আপনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় এসেছিলেন, যখন আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতো। অতঃপর আমরা আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আপনি লাঞ্ছিত অবস্থায় আমাদের কাছে গেছেন। আর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি বিতাড়িত অবস্থায় আমাদের কাছে গেছেন। আর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি মুহতাজ অবস্থায় আমাদের কাছে এসেছিলেন, আর আমরা আপনাকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি।

হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদের কারণে আমার প্রতি মনোকষ্ট নিয়েছ? যেই সম্পদ দিয়ে আমি একদল মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছি। যাতে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের হাতে তুলে দিয়েছি? হে আনসার সম্প্রদায়! তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা ঐ সকল বকরী-ভেড়া নিয়ে তাদের ঘরে ফিরে যাবে। আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে? ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি হিজরত না থাকত তবে তো আমি আনসারদেরই একজন সদস্য হতাম। যদি সমস্ত মানুষ এক পথে চলে আর আনসাররা চলে অন্য পথে তবে আমি আনসারদের পথই বেছে নিব। হে আল্লাহ আপনি আনসারদের উপর রহম করুন! আনসারদের সন্তানদের উপর রহম করুন! আনসারদের সন্তানদের সন্তানদের উপর রহম করুন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কেরাম এত পরিমাণ কাঁদলেন যে, চোখের অশ্রুতে সকলের দাঁড়ি অভিষিক্ত হলো। আর তারা বলতে লাগলেন, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। লোকজন যে যার কাছে চলে গেল।[৬৭১]

হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের আগমন

আল্লাহর কী কুদরত! গনীমতের মাল বন্টন করা শেষ হলে হাওয়াযিনের একটি প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আগমন করল। তাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। তাদের নেতা ছিলেন যুহাইর ইবনে সুরাদ। তাদের মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ সম্পর্কিত চাচা আবু বুরকান ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে বাইআত হয়ে গেলেন। অতঃপর তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনারা যাদেরকে বন্দী করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের মা, বোন, ফুফু ও খালারা রয়েছেন। আর এটা আমাদের অপমানের বিষয়:

امْنُنْ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ فِيْ كَرَمٍ ... فَإِنَّكَ الْمَرْءُ نَرْجُوْهُ وَنَنْتَظِرُ

امْنُنْ عَلَى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا ... إِذْ فُوْكَ يَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدِّرَرُ

'হে আল্লাহর রাসূল! দয়া করে আমাদের ওপর ইহসান করুন!! আপনি এমন মানুষ যার কাছ থেকে আশা করা যায়; অপেক্ষাও করা যায়।

[৬৭১] ইবনে হিশাম ২/৪৯৯, ৫০০। বুখারী ২/৬২০, ৬২১।

আপনি ঐ সকল নারীর ওপর ইহসান করুন একদিন আপনি যাদের দুধ পান করেছিলেন। যাদের দুধের মুক্তোদানায় একদিন আপনার মুখ ভরে যেত'।

উল্লেখ্য মা, বোন, খালা, ফুফু দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ সম্পর্কিত মা, বোন, খালা ও ফুফু। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, আমার সঙ্গে যে লোক রয়েছে তাদেরকে তো তোমরা দেখছই। আর আমার কাছে সত্য কথা সবচেয়ে প্রিয়। তাই বলো, নিজেদের নারী ও শিশু তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় না কি ধন সম্পদ? তারা বলল, বংশীয় মর্যাদার চেয়ে আর কোনো জিনিস আমাদের কাছে অধিক দামী ও ইয্যতের নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন আমি যোহরের নামায আদায় করব তখন তোমরা দাঁড়িয়ে লোকদের মাঝে বলবে, আমরা আল্লাহর রাসূলকে মুমিনদের কাছে সুপারিশ বানাচ্ছি এবং মুমিনদেরকে আল্লাহর রাসূলের কাছে সুপারিশ বানাচ্ছি যেন তিনি আমাদের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে দেন। পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়ে শেষ করলেন তখন তারা দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আমার আর বনু আব্দুল মুত্তালিবের ভাগে যা পড়েছে, তা তোমাদেরকে দেওয়া হলো। লোকদের কাছেও আমি তোমাদের ব্যাপারে চেয়ে দেখব। তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবায়ে 'কেরাম সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, আমাদের কিছুই নেই। সবকিছু আল্লাহর রাসূলের । কিন্তু তখন আকরা' বিন হাবেস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, আমার ও বনু তামীমের ভাগে যা পড়েছে তা আপনার নয়। উয়াইনা ইবনে হিসন দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ও বনু ফাযারার ভাগে যা পড়েছে তা আপনার নয়। আব্বাস ইবনে মিরদাস দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ও বনু সুলাইমের ভাগে যা পড়েছে, তাও আপনার নয়। কিন্তু তখন বনু সুলাইম বলল, আমাদের সবকিছু আল্লাহর রাসূলের জন্য। আব্বাস ইবনে মিরদাস বলল, তোমরা তো দেখি আমার ইয্যত মেরে দিয়েছ!

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো! তারা মুসলমান হয়ে এসেছে। আর (এ উদ্দেশ্যেই) আমি তাদের বন্দীদের বণ্টনের ক্ষেত্রে বিলম্ব করেছিলাম। আমি তাদেরকে ইচ্ছাধিকার দিয়েছিলাম কিন্তু তারা বন্দীদের বিপরীতে অন্য কিছু নিতে রাযি হয়নি। সুতরাং, কারও কাছে যদি কোনো বন্দী থাকে, আর সে স্বেচ্ছায় তাকে দিয়ে দেয় তবে তো ভালো। আর যে নিজের হক্ব রেখে দিতে চায় তাকেও সে বন্দীকে দিয়ে দিতে হবে। তবে সামনে সর্বপ্রথম যে বিজয় অর্জিত হবে তখন আমরা তাকে একজনের বদলে ছয়জন দিব। তখন লোকজন বলল, আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম কে স্বেচ্ছায় দিতে প্রস্তুত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি জানি না তোমাদের কে সন্তুষ্ট চিত্তে দিচ্ছে আর কে সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছ না। সুতরাং, তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের যার যার নিয়োজিত ব্যক্তিরা আমাদের সামনে তোমাদের অবস্থা পেশ করবে।

অতঃপর লোকজন সবাই তাদের হাতে তাদের নারী ও শিশুদেরকে তুলে দিলেন। কেবল উয়াইনাহ ইবনে হিসন দিতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু শেষমেষ তিনিও ফিরিয়ে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল বন্দীকে একটি করে কিবতী কাপড় দান করে তাদের কাছে ফিরিয়ে দেন।[৬৭২]

চিরচেনা সেই মদীনার পথে

জি'রানাতে গনীমতের মাল বন্টন শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকেই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি মক্কায় এসে উমরা আদায় করেন। তারপর আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করে চিরচেনা সেই মদীনার পথে পা বাড়ান। অষ্টম হিজরীর যুল কা'দ মাসের চব্বিশ তারিখ তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন।[৬৭৩]

---

৬৭২ দেখুন বুখারীর হাওয়াযিনের বন্দীদের ঘটনা ৫/২০১।

৬৭৩ তারীখে ইবনে খালদূন ২/৪৮। মক্কা বিজয়, গাযওয়ায়ে হুনাইন ও গাযওয়ায়ে তায়েফের আরব বিস্তারিত বিবরণের জন্য পড়ুনঃ যাদুল মাআদ ২/১৬০-২০১। ইবনে হিশাম ২/৩৮৯-৫০১। সহীহ বুখারীর মক্কা বিজয়, হুনাইন, আওতাস ও তায়েফ ইত্যাদি অধ্যায় ২/৬১২-৬২২। ফাতহুল বারী ৮/৩-৫৮।

মক্কা বিজয় পরবর্তী সারিয়া ও সামরিক অভিযান

রিসালতের যিন্দিগির সবচেয়ে বিস্ময়কর আর অবিশ্বাস্য সাফল্যে ঘেরা মক্কা বিজয় অভিযান শেষ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে গেলেন। তখন তাঁর কাজ হলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধি দল বরণ; যাকাত-সদক্বা উসূলকারী কর্মচারী প্রেরণ; ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার আন্দোলন। পাশাপাশি তার গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ ছিল,অহঙ্কার আর দম্ভ এখনো যাদেরকে আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ করে রেখেছিল, পরম বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে এখনো যারা ইতস্তত করছিল- যে বাস্তবতা গোটা আরব হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পেরেছে- তাদেরকে চিরতরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

যাকাত উসূলকারীগণ

একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি মক্কা বিজয় অভিযান শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এসেছিলেন অষ্টম হিজরীর একেবারে শেষের দিনগুলিতে। অতঃপর নবম হিজরীর মুহাররমের নতুন চাঁদ উঠতেই তিনি আরবের বিভিন্ন কবীলার কাছে যাকাত উসূল করার জন্য কর্মচারীদেরকে পাঠিয়ে দেন। যাদের তালিকা নিম্নরূপঃ

কর্মচারীর নাম	যে কবীলার কাছে পাঠানো হয়েছিল
এক. উয়াইনা ইবনে হিসন	বনু তামীম
দুই. ইয়াযীদ ইবনুল হুসাইন	আসলাম ও গিফার
তিন. আব্বাদ বিন বশীর আশহালী	সুলাইম ও মুযাইনা
চার. রাফে’ বিন মাকীস	জুহাইনা
পাঁচ. আমর ইবনুল আস	বনু ফাযারা
ছয়. যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান	বনু কিলাব
সাত. বশীর ইবনে সুফিয়ান	বনু কা’ব
আট. ইবনে লুতবিয়াহ আযদী	বনু যুবইয়ান
নয়. মুহাজির ইবনে আবী উমাইয়্যা	সানআ (তিনি থাকতেই আসওয়াদ আনাসী সেখানে তার বিরুদ্ধে বের হয়েছিল)।
দশ. যিয়াদ ইবনে লাবীদ	হাযরা মাউত
এগারো. আদী ইবনে হাতেম	তাঈ ও বনু আসাদ
বারো. মালিক ইবনে নুওয়াইরাহ	বনু হানযালা

তেরো. যিবরিকান ইবনে বদর	বনু সাদের (একটি শাখা)
চৌদ্দ. কায়স ইবনে আসেম	বনু সাদের (আরেকটি শাখা)
পনেরো. আলা বিন হাযরমী	বাহরাইন
ষোলো. আলী ইবনে আবী তালিব	নাজরান (সদক্বা ও জিযয়া উভয়টি উসূল করার জন্য)

উল্লিখিত উম্মালদের সবাইকে নবম হিজরীর মুহাররম মাসে এক সময় প্রেরণ করা হয়নি; বরং অনেককে সে কবীলা মুসলমান হওয়ার আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়। পরে মুসলমান হলে তখন উম্মাল পাঠানো হয়। হাঁ, এত গুরুত্বের সঙ্গে উম্মাল পাঠানোর কাজ মূলতঃ নবম হিজরীর মুহাররম মাসেই জোরেশোরে চালু হয়েছিল। এর দ্বারাই বোঝা যায় হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ইসলামের দাওয়াতের সফলতার পরিধি কতটা বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়েছিল।

আর মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় প্রসঙ্গে বলতে হয়, লোকজন তো তখন দলে দলে ইসলাম গ্রহণের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল।

সারিয়াসমূহ

যাকাত-সদক্বা উসূল করার উদ্দেশ্যে যেমনিভাবে উম্মাল পাঠানোর দরকার হয়েছিল, ঠিক একইভাবে আরবের সিংহভাগ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজমান থাকার পরেও বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সারিয়া পাঠাতে হয়েছিল। এ সকল সারিয়ার তালিকা নিম্নরূপ:

এক. সারিয়ায়ে উয়াইনা ইবনে হিসন ফাযারী: এটা পাঠানো হয়েছিল নবম হিজরীর মুহাররম মাসে বনু তামীম অঞ্চলে। বাহিনীর সদস্য ছিল পঞ্চাশ জন শাহসওয়ার। এ বাহিনীতে কোনো মুহাজির কিংবা আনসার সাহাবী ছিলেন না। এ সারিয়া পাঠানোর কারণ ছিল: বনু তামীম বিভিন্ন কবীলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছিল এবং তাদেরকে জিযয়া আদায় করতে বারণ করছিল।

দিনে লুকিয়ে থেকে আর রাতে পথ চলে উয়াইনা ইবনে হিসন রা. পথ চলতে লাগলেন। এক পর্যায়ে খোলা মরুভূমিতে বনু তামীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুসলমানদের অতর্কিত এ হামলার মুখে তারা ভেবাচেকা খেয়ে যে যার মতো পালিয়ে গেল। তাদের এগারো জন পুরুষ, একুশ জন নারী ও ত্রিশটি শিশু বন্দী করে মদীনায় হাঁকিয়ে নিয়ে আসা হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তাদেরকে রমলা বিনতে হারেসের ঘরে রেখে দেওয়া হয়।

তখন বনু তামীমের জন দশেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মদীনায় এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরজায় গিয়ে ডাকতে থাকে, মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে বেরিয়ে আসুন!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বের হলেন। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গায়ে মিশে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। তিনি তাদের সঙ্গে থেকে গেলেন। অতঃপর যোহরের নামাযের সময় হলে তিনি নামায আদায় করেন। নামায শেষে তিনি মসজিদের আঙিনায় বসে গেলেন। তখন তারা গর্ব আর অহঙ্কার প্রকাশের নিমিত্ত তাদের খতীব উতারিদ ইবনে হাজেবকে সামনে পেশ করল। সে তখন বক্তব্য দিতে শুরু করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'খতীবুল ইসলাম' খ্যাত সাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস রা. কে আগে বেড়ে তাদের জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তারা তাদের কবি যিবরিকান ইবনে বদরকে সামনে ঠেলে দিলো এবং সে গর্ব ও বড়াইমূলক বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। 'ইসলামের কবি' হাসসান বিন সাবিত রা. বিচক্ষণতার সঙ্গে তার জবাব দিতে লাগলেন।

খতীব ও কবিদ্বয় ফারেগ হলে আকরা' ইবনে হাবেস বলতে লাগলেন, তাদের খতীব আমাদের খতীবের চেয়ে বলীয়ান আর তাদের কবি আমাদের কবির চেয়ে শক্তিমান। তাদের কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠের চেয়ে উঁচু। তাদের বক্তব্য আমাদের বক্তব্যের চেয়ে উন্নত। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেকে উত্তম পুরস্কার দিলেন এবং তাদের নারী ও শিশুদেরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন।[৬৭৪]

দুই. সারিয়ায়ে কুতবা ইবনে আমের: এটা পাঠানো হয়েছিল নবম হিজরীর সফর মাসে তুরাবার নিকটবর্তী তাবালা সীমান্তবর্তী কবীলায়ে খাসআমের একটি শাখাগোত্রের নিকট। বাহিনীর সদস্য ছিল বিশজন। তাদের কাছে উট ছিল মোট দশটি। তাই প্রতি দু'জন একটি উটে ধারাবাহিকভাবে আরোহণ করতেন। নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তারা কঠিন হামলা করে বসলেন। উভয় শিবিরের মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই চলল দীর্ঘক্ষণ। ক্রমশ দুই দলের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর সালার কুতবাও নিহত হন। জীবিতরা বহু উট, বকরী ও নারী-শিশু বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন।

তিন. সারিয়ায়ে যাহ্হাক ইবনে আবী সুফিয়ান কিলাবী: এটা পাঠানো হয়েছিল নবম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে বনু কিলাবের দিকে। বনু কিলাবকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল।

[৬৭৪] এভাবে মাগাযী বিশেষজ্ঞবর্গ এ সারিয়ার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন নবম হিজরীর মুহাররম মাস। কিন্তু এটা প্রশ্ন ও বিবেচনাসাপেক্ষ। কেননা ঘটনার আগপাছ দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় আকরা' বিন হাবিস রা. এ সারিয়ার আগে মুসলমান ছিলেন না। অথচ, তাদের মতে রাসূলে কারীম সা. হাওয়াযিনের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন আমি এবং বনু তামীম ফিরিয়ে দিব না। এর চাহিদা হলো তিনি এ সারিয়ার আগেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারা সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। লড়াইয়ে মুসলমানরা তাদেরকে পরাজিত করেন এবং তাদের এক জনকে হত্যা করেন।

চার. সারিয়ায়ে আলকামা ইবনে মুজাযযির মুদলিজীঃ এটা পাঠানো হয়েছিল নবম হিজরীর রবীউস সানী মাসে জেদ্দার উপকূলীয় অঞ্চলে। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল তিনশ' জন। তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল কিছু হাবশী লোককে শায়েস্তা করতে। তারা জেদ্দার উপকূলের কাছাকাছি মক্কাবাসীদের ওপর লুটতরাজ চালানোর জন্য সমবেত হয়েছিল। আলকামা বাহিনী নিয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেন। মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তারা চোখ কান বন্ধ করে পালিয়ে যায়। [৬৭৫]

পাঁচ. সারিয়ায়ে আলী ইবনে আবী তালিবঃ এ সারিয়া পাঠানো হয়েছিল নবম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে তাঈ জনপদে 'ফুল্‌স' নামক একটি মূর্তি ভাঙার উদ্দেশ্যে। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল দেড় শ' জন। সওয়ারী হিসেবে তাদের কাছে ছিল একশ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া। একটি কালো ঝাণ্ডা আর সাদা পতাকা ছিল। ঊষার আগে ঠিক ফজরের সময় তারা হাতেম তাঈ মহল্লায় আক্রমণ চালালেন। গোটা জনপদ ধ্বংস কর দিয়ে অসংখ্য বন্দী, উট ও বকরীতে মুসলিম সৈন্যদের হাত ভরে যায়। বন্দীদের মধ্যে আদী ইবনে হাতেম রা. এর বোন ছিলেন। আদী সিরিয়ায় পালিয়ে যান। মুসলমানরা 'ফুল্‌স' মূর্তির ধনভাণ্ডারে তিনটি তরবারি ও তিনটি লৌহবর্ম পান। ফেরার পথেই তারা গনীমতের মাল বন্টন করে নেন। তথাপি গনীমতের নির্বাচিত অংশ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য পৃথক করে রেখে দেন এবং হাতেম তাঈ এর পরিবারকে বণ্টন করা থেকে বিরত থাকেন।

তারা মদীনায় উপস্থিত হলে আদী বিন হাতেম এর বোন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিটক অনুগ্রহ প্রার্থনা করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখানে যে আসতে পারত সে লাপাত্তা হয়ে গেছে। গর্ভের সন্তান ছেড়ে চলে গেছে। আর আমিও বৃদ্ধা হয়ে গেছি। কাউকে সেবা করার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নেই। আপনি আমার ওপর রহম করুন! আল্লাহ আপনার ওপর রহম করবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এখানে কে আসতে পারত?** তিনি বললেন, আদী বিন হাতেম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে?** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন আদীর বোন আগের মতো আরয করল। রাসূলে কারীম

[৬৭৫] ফাতহুল বারী ৮/৫৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গতকালের কথাগুলিই বললেন। পরের দিন সে আবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আরয করল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দয়া করে আযাদ করে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন- সম্ভবত তিনি আলী রা. হবেন- তিনি তাকে বললেন, তার কাছে আপনি সওয়ারী চান! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সওয়ারী দান করার আদেশ দিলেন।

অতঃপর আদী বিন হাতেম এর বোন সিরিয়ায় ভাই আদীর কাছে চলে যান। সেখানে আদীর সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বললেন, তিনি যে মহান উদারতার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তোমার বাপ হাতেমও তা দেখাতে পারত না। তুমি ভয় কিংবা ভালোবাসা যে কোনো একটা নিয়ে তার কাছে যাও! তখন আদী বিন হাতেম কোনো ধরনের নিরাপত্তা কিংবা লিখিত পত্র ব্যতীত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। সে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে বসে পড়ে তখন তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করেন। অতঃপর বললেন, কোন জিনিস **থেকে তুমি পালিয়েছ? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থেকে পালিয়েছ? আল্লাহ ছাড়া কি আর কোনো ইলাহের কথা তোমার জানা আছে?** তিনি বললেন, না। অতঃপর কিছুক্ষণ কথা বলে তিনি বললেন, **'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এ থেকে পালিয়েছ? আল্লাহর চেয়ে বড় ও মহান কোনো কিছু কি তোমার জানা আছে?** তিনি বললেন, না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ইহুদিদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ অবতীর্ণ হয়েছে। আর খ্রিস্টানরা গোমরা ও পথভ্রষ্ট।** তিনি বললেন, তাহলে আমি হানীফ তথা একনিষ্ঠ মুসলমান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারায় তখন মুচকি হাসির এক বিমল ঝিলিক খেলে গেল। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে তাকে এক আনসারী ব্যক্তির ঘরে রাখা হলো। তিনি প্রতি সকাল-সন্ধ্যা দরবারে রিসালতে আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।[৬৭৬]

আদী রা. থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ঘরে তাকে নিজের সামনে বসিয়ে বললেন, এসো!. .... আদী **বিন হাতেম!! তুমি কি রুকূসী[৬৭৭] ছিলে না?** আদী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, **তুমি কি নিজ কওমের মধ্যে গনীমতের চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে না?** তিনি বলেন, আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, **কিন্তু এটা** তো তোমাদের ধর্মে হালাল

---

৬৭৬ যাদুল মাআদ ২/২০৫।
৬৭৭ নাসারা ও সাবেয়ী ধর্মের মাঝামাঝি একটি ধর্ম।

নয়। তিনি বলেন, আমি বললাম আল্লাহর কসম! আপনি ঠিক বলেছেন। তিনি বলেন, আর তখনই আমি বুঝে নিলাম তিনি আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল। কেননা, তিনি এমন জিনিসও জানেন, যা জানার কথা নয়।[৬৭৮]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদী বিন হাতেম রা. কে বললেন, **আদী! ইসলাম গ্রহণ করে নাও, নিরাপদে থাকবে!** আমি বললাম, আমি তো একটি দীনের অনুসারী। তিনি বললেন, **আমি তোমার চেয়ে তোমার দীন সম্পর্কে অধিক অবগত।** আমি বললাম, আপনি কি আমার চেয়ে আমার দীন সম্পর্কে অধিক অবগত? তিনি বললেন, হাঁ। **তুমি কি রুকূসী নও? তারপরেও কি তুমি তোমার কওমের গনীমতের এক চতুর্থাংশ খাও না?** আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, **এটা তো খোদ তোমার ধর্মেও তোমার জন্য হালাল নয়।** আদী বলেন, যখন তিনি সর্বশেষ কথাটি বললেন তখন আমি বিনম্রতায় তার সামনে আমার শির নুইয়ে দিলাম।[৬৭৯]

আদী বিন হাতেম রা. থেকে ইমাম বুখারী র. রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বসা ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে এক ব্যক্তি এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করল। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে সওয়ারী না থাকার অভিযোগ করল। তখন তিনি বললেন, **আদী! তুমি কি হীরা (নগরী) দেখেছ? যদি তুমি দীর্ঘ হায়াত লাভ করো তবে দেখতে পাবে, হীরা থেকে হাওদায় বসে নারী মক্কায় এসে কাবা ঘর তওয়াফ করবে; অথচ এ দীর্ঘ পথে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবে না! যদি তুমি দীর্ঘ হায়াত লাভ করো তবে তুমি কিসরার ধনভাণ্ডার বিজয় করবে!! যদি তুমি দীর্ঘ হায়াত লাভ করো তবে দেখতে পাবে মানুষ রাস্তায় বের হয়ে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যভর্তি হাতে দান করার জন্য লোক খুঁজবে কিন্তু দেওয়ার মতো কাউকে পাবে না!!!** উল্লিখিত হাদীসের শেষে আদী রা. বলেন, আমি দেখেছি হীরা থেকে হাওদায় বসে নারী মক্কায় এসে কাবা ঘরে তওয়াফ করে যায়। অথচ, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায় না। কিসরা ইবনে হুরমুযের ধনভাণ্ডার যে বাহিনী বিজয় করেছিল আমিও তাদের মাঝে ছিলাম। যদি তোমরা সুদীর্ঘ হায়াত লাভ করো তবে নবী আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলে গেছেন, **মানুষ হাত ভর্তি করে....** সে দৃশ্যও তোমরা অবশ্যই দেখতে পাবে।[৬৮০]

---

[৬৭৮] ইবনে হিশাম ২/৫৮১।
[৬৭৯] মুসনাদে ইমাম আহমদ ৪/২৫৭, ২৭৮।
[৬৮০] সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৪১৩, ১৪১৭, ৩৫৯৫, ৬০২৩, ৬৫৩৯, ৬৫৪০, ৬৫৬৩, ৭৪৪৩, ৭৫১২।

গাযওয়ায়ে তাবুক

(নবম হিজরীর রজব মাস)

আগেই আমরা বলে এসেছি, মক্কা-বিজয় অভিযান ছিল হক্ব ও বাতিলের মাঝে নিষ্পত্তিকর এক চূড়ান্ত লড়াই। এই লড়াইয়ের পরে আরবদের জন্য 'রিসালতে মুহাম্মাদী'র মধ্যে সন্দেহ-সংশয় পোষণের আর কোনো সুযোগ ছিল না। তাই পরিস্থিতি পুরোপুরি মুসলমানদের অনুকূলে চলে আসে। বাতাসের গতিবেগ মানব-তরীর পাল এবার ইসলামের দিকে টেনে আনে। মানুষ দলে দলে ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নিতে দৌড়ে আসতে থাকে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে 'প্রতিনিধি আগমনের অধ্যায়' আর বিদায় হজ্জে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা দেখে ব্যাপারটি যে কারও কাছে পরিষ্কার হতে বাধ্য এভাবে অভ্যন্তরীণ যে সকল গোলযোগ চলছিল ধীরে ধীরে তার প্রত্যেকটি রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুসলমানরা এবার গোটা মানব জাতিকে আল্লাহ প্রেরিত শরীয়ত শিক্ষা দেওয়ার এবং গোটা পৃথিবীতে তাঁর দীন প্রচার প্রসারের কাজে পূর্ণ মনোযোগ নিবিষ্ট করার এক সুমহান সুযোগ লাভ করেন।

যুদ্ধের কারণ

কিন্তু তখনো একটা দুর্জেয় শক্তি মুসলমানদের পথে কাঁটা হয়েছিল। হর হামেশার জন্য সে মুসলমানদের গায়ে ফুঁটার জন্য আস্ফালন করত। ইসলাম ও মুসলমানদের যে কোনো ক্ষতির জন্য তার লম্বা জিহ্বাটা সব সময় লকলক করত। সেটা ছিল রোমান সাম্রাজ্য- তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সামরিক শক্তিধর সাম্রাজ্য। পূর্বেই আমরা বলে এসেছি- এ দুশমনির সূত্রপাত হয়েছিল তাদের পক্ষ থেকেই। রোমান সম্রাট কায়সার হিরাক্লিয়াসের গভর্নর শুরাহবীল ইবনে আমর গাস্‌সানী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দূত হারিস ইবনে উমাইর আযদারী রা.কে নির্মমভাবে শহীদ করে দিয়েছিল। হারিস রা. বুসরার শাসকের নিকট রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দ বিন হারিসা রা. এর নেতৃত্বে একটি সারিয়া প্রেরণ করেছিলেন। মূতা প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মাঝে চরম সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু সেদিন অহঙ্কারী সেই জালিমদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল না। মনের আগুন মনেই দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তবে আরবের নিকট ও দূরের কবীলাগুলির ওপর সেই সারিয়া দারুণ প্রভাব ফেলেছিল।

রোম সম্রাট কায়সার মূতা প্রান্তরের সেই ঘটনা সহজে ভুলতে পারেনি। দিন রাত সেই দুঃস্বপ্ন তাকে শুধু যন্ত্রণা দিয়ে বেড়াত। এ যুদ্ধ মুসলমানদের যতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছিল ঠিক ততটুকুই মুসলমানদের প্রতি তার অন্তরে প্রজ্বলিত আগুনে ঘি ঢালছিল। এ কারণে সেই ঘটনা কালের বহু উত্থান-পতন সত্ত্বেও তার মনের খাতা থেকে তিনি মুছে দেওয়ার কোনো রাবার যোগাড় করতে পারেননি। পাশাপাশি এ যুদ্ধের পর কিছু আরবীয় কবীলা যে স্বাধীনতার জন্য লাফালাফি শুরু করেছিল তাতে তার মাথায় বিস্ময়ের আকাশ ভেঙে পড়েছিল। এ সকল দুঃস্মৃতি সে কোনো ভাবেই ভুলতে পারছিল না। অধিকন্তু এ বিপদটি ধীরে ধীরে আরও বড় আকার ধারণ করছিল। আস্তে আস্তে সেটা এ দিকে এগিয়ে আসছিল। আরবের পার্শ্ববর্তী সিরীয় সীমান্তের জন্য এটা মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিল। সুতরাং, তা অপরাজেয় বিপদের রূপ ধারণ করার আগেই গলা টিপে হত্যা করে ফেলাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। রোমান সাম্রাজ্য লাগোয়া আরবীয় অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়াই ছিল সময়ের যথাযথ দাবি।

এ সকল দিকে লক্ষ্য রেখে কায়সার হিরাক্লিয়াস মূতা যুদ্ধের মাত্র এক বছর পূর্ণ না হতেই রোমান ও তার অনুসারী গাস্সান ইত্যাদির আরবীয় সৈন্যদের এক বিশাল বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করতে শুরু করল। দিন গণতে লাগল এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের।

রোমান ও গাস্সানীদের প্রস্তুতির ব্যাপক সংবাদ

সময় অসময় প্রতিটি মুহূর্তে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমানদের এক চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতির সংবাদ মদীনায় আসছিল। এতে করে হরহামেশার জন্য ভীতি যেন তাদের কাঁধে চড়ে বসল। অবস্থা এমন হলো, কেউ অপরিচিত কিংবা অনভ্যস্ত কোনো আওয়াজ শুনলেই রোমানদের আক্রমণের সংবাদ ধরে নিত। উমর ইবনে খাত্তাব রা. এর ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। এ সময় (নবম হিজরীতে) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের সঙ্গে ঈলা করেছিলেন এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। ঘটনার প্রথমদিকে সাহাবায়ে কেরাম আগা-গোড়া বুঝতে না পেরে ধারণা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছেন। তখন তাদের মধ্যে এক নিদারুণ পেরেশানী ও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। উমর ইবনুল খাত্তাব রা. -এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার এক আনসারী বন্ধু ছিল। আমি যখন কোথাও থেকে গায়েব থাকতাম তখন সে আমার কাছে সকল সংবাদ দিয়ে দিত। আবার সে যখন

গায়েব থাকত তখন আমি তাকে সকল সংবাদ দিয়ে দিতাম। তারা উভয়ই বাস করতেন মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এবং ধারাবাহিকভাবে একের পরে অন্যজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে যেতেন- আমাদের ওপর এক গাস্‌সানী রাজার আক্রমণের ভয়ে আমরা দিন-রাত ভীত ছিলাম। প্রচণ্ড ভয় আর শঙ্কায় আমাদের হৃদয় ও মন সর্বদা শঙ্কিত ছিল। এমন সময় হঠাৎ একদিন আমার সঙ্গী এসে আমার দরজায় হাঁক ছাড়লেন- উমর! দরজা খুলুন! দরজা খুলুন! আমি তাকে বললাম, গাস্‌সানী বাহিনী এসে পড়েছে? তিনি বললেন, না। তবে এর চেয়েও বড় বিপদ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। ....[৬৮১]

অন্য শব্দে হাদীসটি এসেছে এভাবে: (উমর রা. বলেন,) গাস্‌সানী বাহিনীর প্রস্তুতির কথা আমাদের মুখে মুখে চর্চা হচ্ছিল। আমরা দিনরাত আলোচনা করছিলাম যে, গাস্‌সানী বাহিনী এখন তাদের ঘোড়ার ক্ষুর প্রস্তুত করছে। সে দিন ছিল আমার সঙ্গীর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে যাওয়ার পালা। তিনি দিনের শুরুতে বের হয়ে রাতের বেলা ফিরে এলেন। এসে প্রচণ্ডভাবে আমার দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার কাছে ছুটে এলাম। তিনি বললেন, একটা ভীষণ সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি বললাম, কী? গাস্‌সানীরা কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন, না। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন।[৬৮২]

এ ঘটনার দ্বারাই খুব সহজে বোঝা যায়, রোমানদের পক্ষ থেকে মুসলমানরা তখন কতটা সর্বনাশা ও ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখামুখি হয়েছিলেন। পরিস্থিতি তাদের জন্য কতটা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রোমানদের প্রস্তুতির খবর মদীনায় আসার পরে মুনাফিকরা যে পথ অবলম্বন করল তাতে এ ভয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল। জীবনের প্রতিটি ময়দানে এই মুনাফিকগুলি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিস্ময়কর বিজয় আর সাফল্যের চিত্রগুলো তারা খুব ভালো করে কাছ থেকে দেখে আসছিল। তারা দেখছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখন পৃথিবীর বুকে আর কোনো সম্রাট কিংবা সাম্রাজ্যকে ভয় করেন না- চাই তা কত বড়ই হোক না কেন। বরং যে শক্তিই তার গতিরোধ করতে সামনে দাঁড়াবে তা জ্বলে একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু এতকিছুর পরেও এই ইতরগুলি কোনো দিন মুসলমান ও তাদের আত্মার প্রিয়তম আত্মীয়

---

[৬৮১] সহীহ বুখারী ২/৭৩০।
[৬৮২] সহীহ বুখারী ১/৩৩৪।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একটুখানি আপন ভাবতে পারেনি। বরং তাদের সর্বনাশ আর বিলুপ্তির যে চিত্র তাদের মনের খাতায় এঁকেছিল তা বাস্তবায়নের নেশায় দিনরাত মাতাল ছিল। অতঃপর যখন তারা দেখলো, ধীরে ধীরে তাদের বহুদিনের সেই লালিত স্বপ্ন আর মনের তামান্না বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তারা একে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে মসজিদের পোশাক পরিয়ে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রের এক নতুন নীড় রচনা করল। আর এটাই ছিল সেই মসজিদে যিরার। এ মসজিদ প্রতিষ্ঠিতই হয়েছিল কুফরীর ওপর ভিত্তি করে। মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য যারা যুদ্ধ করে তাদেরকে সর্বনাশ ডেকে আনার লক্ষ্যে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তারা আবদার জানালো, যেন তিনি সেখানে নামায আদায় করে উদ্বোধন করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানদের কাছে বসে মসজিদ নামক এ কুকর্মের কারখানার ভেতরে ষড়যন্ত্রের নিশ্ছিদ্র জাল বোনা হবে। অথচ, তারা তা টেরও পাবে না। এখানে কে আসা যাওয়া করবে সে ব্যাপারে তারা খবরও রাখবে না। আর তখন এটা সেই মুনাফিক আর তাদের বাইরের দোসরদের জন্য একটা নিরাপদ ও শান্তি নিকেতনে পরিণত হবে। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকার কারণে গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত সেখানে নামায আদায় থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়ে যায়। আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনার গ্লানির মধ্যে নাকানি-চুবানি খাওয়ান। যার কারণে গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফিরে আসার পর নামাযের পরিবর্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদরূপী এ ইবলীসী কারখানাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

রোমান ও গাস্‌সানীদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশেষ সংবাদ

এ রকম এক চরম নাযুক ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখামুখি হচ্ছিলেন মুসলমানরা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। আর ঠিক সেই সময়ে সিরিয়া থেকে তেল নিয়ে মদীনায়া আসা নাবতী আরবদের কাছে তারা শুনতে পেলেন, কায়সার হিরাক্লিয়াস চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক দানবীয় বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করেছেন। আর এ বাহিনী পরিচালনার দয়িত্ব দিয়েছেন তিনি বড় বড় রোমান সালার আর রণভিজ্ঞদের কাঁধে। তা ছাড়া তাদের সঙ্গে লাখম, জুযাম সহ আরবের অন্যান্য খ্রিস্টান কবীলাও রয়েছে। তাদের অগ্রগামী বাহিনী এতক্ষণে বলকা পর্যন্ত পৌছে গেছে। এভাবে একটি বিশাল মুসীবত মুসলমানদের গতিরোধ করে সামনে এসে দাঁড়ালো।

পরিস্থিতির চরম প্রতিকূলতা

এর পাশাপাশি যে জিনিসটি মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতি চরম প্রতিকূল আর ঘোলাটে বানিয়ে রেখেছিল তা হলো, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড তাপ আর দাবদাহে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল আরবের মাটি। মরু আরবের রুক্ষ প্রকৃতিতে আগুনের ফুলকিমালা ঝরে পড়ছিল। শত বছরের বার্ধক্যের চোটে তার শরীরের চামড়াগুলি ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন বালা-মুসিবত ও সওয়ারীর দীনতাসহ হাজারো সংকটে উষর হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের জীবন-মাটি। অপরদিকে ফল কাটার মৌসুমও কাছে চলে এসেছিল। এ কারণে তখন এ ধরনের কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে গাছের ছায়ায় আর ফলের মায়ায় মদীনায় থাকাই তাদের কাছে অধিক প্রিয় ছিল। ওপরন্তু, যে পথে যুদ্ধে যেতে হবে সে পথ ছিল এক সুদীর্ঘ, প্রলম্বিত পথ। যে পথের প্রতিটি পদে পদে আর বাঁকে বাঁকে ছিল চড়াই-উতরাই; সংকুলতার এক প্রচণ্ড লুকানো ভীতি।

আক্রমণাত্মক জিহাদের পরিকল্পনা

কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল পরিবেশ-পরিস্থির চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখলেন, এই চরম নাযুক পরিস্থিতিতে যদি তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা থেকে অলসভাবে বসে থাকেন, আর তাদেরকে ইসলামের প্রভাবাধীন অঞ্চলে অবাধ মস্তানীর বাজার সরগরম রাখতে দেন, আর তার ফলাফলে যদি রোমানরা মদীনা আক্রমণ করে বসে, তবে ইসলামের দাওয়াতের ইতিহাসের ওপর সেটা সবচেয়ে খারাপ প্রভাব ফেলবে; মুসলমানদের সামরিক সুখ্যাতি ধূলোয় মিশিয়ে দিবে। সর্বশেষ হুনাইন প্রান্তরে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখামুখি হয়ে হাজার বছরের যেই জাহেলিয়াত এখন মৃত্যুর বিছানায় শুয়ে জীবনের আখেরি মুহূর্তগুলিতে ছটফট করছে তা আবার আগের মতো যিন্দা ও তরতাজা হয়ে উঠবে। আর মুনাফিকরা যারা মুসলমানদের ওপর দিনরাত যে কোনো আপদ পতিত হওয়ার অপেক্ষায় বসে ছিল, যারা ফাসেক আবু আমেরের সঙ্গে আঁতাত করে রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দুস্তী পাতিয়েছিল, তারা সেই সঙ্গিন মুহূর্তে পেছনের দিক থেকে মুসলমানদের পিঠে খঞ্জর বসিয়ে দিবে। আর রোমানরা সামনের দিক থেকে তাদের ওপর চালাবে সর্বনাশা এক যুদ্ধ। এতে করে বছরের পর বছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মেহনত করে ইসলামের যে একটুখানি বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে, মুহূর্তে তার সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে। দিনের পর দিন আরামের বিছানা খালি রেখে তপ্ত সমরে অশ্বপৃষ্ঠে কাটিয়ে যা কিছু অর্জিত হয়েছে, সারা জীবনের মেহনতের সে কামাইটুকু খুইয়ে বসতে হবে।

চোখের সামনে দেখে দেখে হারিয়ে ফেলতে হবে সারা জীবনের সবটুকু অর্জন।

এ সকল বিষয় খুব ভালো করেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন। আর সে কারণেই তিনি পরিস্থিতির চরম প্রতিকূলতা আর জীবনের নানা সংকট সত্ত্বেও রোমানদের বিরুদ্ধে তাদের ভূখণ্ডে গিয়ে এক কঠিন লড়াইয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভালো করে বলে দিলেন, রোমানরা যেন মদীনায় এসে আক্রমণ করার সুযোগ না পায়।

প্রস্তুতির ঘোষণা

এ পদক্ষেপ গ্রহণের পরপরই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। আরবের অন্যান্য কবীলা ও মক্কাবাসীদেরকে প্রস্তুত হওয়ার সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোনে গাযওয়াতে যেতেন তখন লোকদেরকে অন্যদিকের কথা বুঝাতেন। কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা সাফ সাফ ভাষায় ঘোষণা দিলেন। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলমানদের সামনে তিনি তাদের করণীয় স্পষ্ট করে দিলেন। তাদেরকে তিনি যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করলেন। যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতঃ এ সময় কুরআনে কারীমের সূরা বারাআতের (সূরা তওবা) একটি অংশ নাযিল হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের মালের শ্রেষ্ঠ অংশ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার প্রতি অনুপ্রাণিত করলেন।

এক বিরল প্রতিযোগিতা

রোমানদের বিরুদ্ধে রাসূলে কারীম এর মুখে লড়াইয়ের ঘোষণা শোনা মাত্রই সাহাবায়ে কেরাম প্রস্তুতির জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। তারা তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত সম্পন্ন করে নিলেন। মদীনার চারদিক থেকে বিভিন্ন আরবী কবীলার ছোট বড় বাহিনী আসতে থাকে। যাদের অন্তরে ব্যাধি আর ব্যারাম ছিল, তারা ছাড়া আর কেউ এ রণপ্রস্তুতি থেকে পিছুটান দিলো না- তবে কেবল তিন জন খাঁটি মুমিন পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি চরম দীন ও দরিদ্ররাও এসে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সওয়ারী প্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নিরুপায় নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন এভাবে: لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা

ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে চলছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। [সূরা তওবা:৯২]

একইভাবে আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে লাগলেন। উসমান ইবনে আফ্‌ফান রা. পালান ও হাওদাসহ সিরিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দুই শ' উট এবং দুইশ' উকিয়া (প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ কিলোগ্রাম) চাঁদি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু এ সব কিছু তখন তিনি সদক্বা করে দেন। এরপর তিনি এমন আরও একশ' উট সদক্বা করেন। অতঃপর এক হাজার দীনার এনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে তুলে দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলি গ্রহণ করছিলেন আর বলছিলেন, **আজকের দিনের পর থেকে যদি উসমান কোনো আমলও না করে; তবুও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।**[৬৮৩] অতঃপর তিনি একটার পর একটা সদক্বা করতেই থাকলেন। এক পর্যায়ে তাঁর সদক্বার পরিমাণ এসে দাঁড়ালো নয় শ' উট ও এক শ' ঘোড়া। স্বর্ণ-রৌপ্য এই হিসাবের বাইরে ছিল।

আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. দুই শ' উকিয়া (প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ কিলোগ্রাম) স্বর্ণ নিয়ে এলেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. কেবল আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে ঘরের সবকিছু নিয়ে এলেন। এর পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। আর তিনিই সর্ব প্রথম সদক্বা নিয়ে এসেছিলেন। উমর রা. তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলেন। আব্বাস রা. অনেক সম্পত্তি নিয়ে এলেন। তালহা, সা'দ বিন উবাদা, মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. সকলেই আসার সময় সদক্বা সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। আসেম বিন আদী রা. নব্বই ওসক (প্রায় সাড়ে তেরো টন) খেজুর নিয়ে এলেন। অন্যান্য লোকজন একের পর এক কম বেশি, যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সদক্বা নিয়ে এলেন। এমনকি যে কিছুই দিতে পারল না সেও এক মুদ দুই মুদ খাবার সদক্বা নিয়ে এলো। মুসলিম নারীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বালা, কঙ্কণ, বাহুবন্ধনী, পায়ের মল, কানের দুল, নাকের ফুল, আংটি ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলো।

কেউই সম্পূর্ণ বিরত থাকেনি। একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া আর কেউই কৃপণতা কিংবা কৃচ্ছতা দেখায়নি :

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ.

---

৬৮৩ তিরমিযী: মানাকিবে উসমান ইবনে আফ্‌ফান ২/২১১।

সে সমস্ত লোক যারা ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি, যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি, যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ছাড়া। [সূরা তওবা:৭৯]

তাবুকের পথে

এভাবে মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। কারও মতে, সিবা' বিন উরফুতা রা. কে। আর পরিবারের দেখভালের জন্য রেখে যান আলী ইবনে আবী তালিব রা. কে। তাকে তিনি তাদের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলে মুনাফিকরা তাকে বিভিন্নভবে খোঁচা মারতে শুরু করে। তখন তিনি বের হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আবার ফেরত পাঠিয়ে দেন। আসার সময় বলে দেন, **তুমি কি আমার পক্ষ থেকে তেমন হতে চাও না যেমন ছিলেন হারুন আ. মূসা আ. এর পক্ষ থেকে? তবে হাঁ, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।**

বৃহস্পতিবার রাসূলে কারীম স. মদীনা থেকে তাবুকের উদ্দেশে উত্তর দিকে যাত্রা করেন। মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। ইতঃপূর্বে মুসলমানরা এমন বিশাল বাহিনী নিয়ে আর কখনো বের হয়েছিল না। এ কারণে যেহেতু এটা একটা বড়সড় বাহিনী ছিল, তাই তার খরচাদি ও ব্যয়ও বেশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাথেয় ও সরওয়ারীর দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা বিবেচনায় তাদের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ ছিল না। বরং এ দিক থেকে তখনো তারা চরম দৈন্যের শিকার ছিলেন। আঠারো জন সৈন্য একের পর এক একটি উটে উঠতেন। ক্ষুধার তাড়নায় কখনো বাধ্য হয়ে গাছের পাতা খেতেন। এর ফলে অনেকের ঠোঁট ফুলে যায়। কখনো কখনো উটের দারুণ দৈন্য থাকা সত্ত্বেও পানির চরম অভাবে উট যবাই করে তার ভেতরে সঞ্চিত পানি পান করা হতো। এ কারণে ইসলামের ইতিহাসে এটি 'জায়শে উসরাহ' (সমস্যাসংকুল বাহিনী) নামে পরিচিত।

তাবুকের পথে যেতে যেতে এক সময় মুসলিম বাহিনী সালেহ আ. এর অহঙ্কারী ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের পাশ দিয়ে গমন করেন। সেই কওম পাহাড় কেটে কেটে অনিন্দ্যসুন্দর ঘরবাড়ি নির্মাণ করত। সেখানের একটা কূপ থেকে লোকজন পানি পান করার জন্য থামলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **এই জনপদের পানি তোমরা কেউ পান করো না! আর এখানের পানি দিয়ে নামাযের জন্য উযূ করো না! আর যে পানি দিয়ে তোমরা খামীরা তৈরি**

করেছ তা উটকে দিয়ে দাও। তা থেকে তোমরা কিছুই খেও না। তিনি তাদেরকে সেই কূপ থেকে পানি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন সালেহ আ. এর উটনী যেই কূপ থেকে পানি পান করত।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজর জনপদ অতিক্রম করেন তখন তিনি বললেন, **যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে, তোমরা তাদের বসতিতে প্রবেশ করো না। কারণ হতে পারে তাতে তোমাদের ওপর সেই বিপদ চলে আসবে, যা তাদের ওপর এসেছিল। হ্যাঁ তবে কাঁদতে কাঁদতে যেতে পারো।** অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় দ্বারা নিজের মাথা ঢেকে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।[৬৮৪]

রাস্তায় পানির প্রচণ্ড প্রয়োজন হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সাহাবায়ে কেরাম অভিযোগ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দুআ করেন। আল্লাহ তাআলা তৎক্ষণাৎ একটি বারিবহ মেঘ পাঠিয়ে দেন। মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। মুসলমানগণ পরিতৃপ্ত হয়ে যান এবং পরবর্তী সময়ের জন্য পানি রেখে দেন।

তাবুকের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য বললেন, **আগামী কাল আল্লাহ চান তো তোমরা তাবুক প্রান্তরে পৌঁছে যাবে। কিন্তু দ্বিপ্রহরের আগে কেউই সেখানে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং, যে ব্যক্তি সেখানে পৌঁছে যাবে, আমি আসার আগ পর্যন্ত সেখানের পানি কেউ স্পর্শ করবে না।** মুআয রা. বলেন, আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম দুই ব্যক্তি আগেই পৌঁছে গেছে। কূপ থেকে অল্প অল্প করে পানি বের হচ্ছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, **তোমরা কি এখানের পানি স্পর্শ করেছ?** তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তাদেরকে যা মনে চাইল বললেন। এরপর অঞ্জলি ভরে ভরে সামান্য কিছু পানি জমা করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে চেহারা ও হাত ধুয়ে নিলেন। অতঃপর সে পানি আবার কূপে নিক্ষেপ করলেন। তখন কূপ থেকে বিদ্যুৎগতিতে তীব্রবেগে পানি উৎসারিত হতে লাগল। সবস্ম মানুষ পরিতৃপ্ত হলো। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **মুয়ায! তুমি যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করো তবে তুমি এ জায়গা অসংখ্য বাগ-বাগিচায় সমৃদ্ধ দেখবে।**[৬৮৫]

---

[৬৮৪] সহীহ বুখারী: হিজার জনপদে রাসূলে কারীম সা. এর অবতরণ ২/৬৩৭।
[৬৮৫] মুয়ায বিন জাবাল রা. সূত্রে মুসলিমের রেওয়ায়েত।

পথিমধ্যে কিংবা তাবুক প্রান্তরে পৌঁছার পরে- রেওয়ায়েতের বিভিন্নতা রয়েছে- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ রাতে **তোমাদের ওপর দিয়ে প্রবল দমকা হাওয়া বয়ে যাবে। সুতরাং, তখন তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে না থাকে। আর যার উট রয়েছে সে যেন তার উটকে শক্ত করে বেঁধে রাখে।** সত্যি সত্যিই রাতে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল। এক ব্যক্তি তখন দাঁড়িয়েছিল; প্রবল সে হাওয়া তাকে উড়িয়ে তাঈর দুই পাহাড়ের কাছে নিয়ে ফেলল।[৬৮৬]

রাস্তায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভ্যাস ছিল তিনি যোহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করতেন। এতে তিনি 'জময়ে তাকদীম' ও 'জময়ে তা'খীর' উভয়টিই করতেন। ['জময়ে তাকদীম' হলো, যোহর ও আসর উভয় নামাযকে যোহরের ওয়াক্তে এবং মাগরিব ও ইশা উভয়কে মাগরিবের ওয়াক্তে আদায় করা। আর 'জময়ে তা'খীর' হলো, যোহর ও আসর উভয়কে আসরের ওয়াক্তে আর মাগরিব ও ইশা উভয়কে ইশার ওয়াক্তে আদায় করা]

তাবুক প্রান্তরে

মুসলিম বাহিনী তাবুক প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করলেন। তারা যুদ্ধের জন্য তখন পুরোপুরি প্রস্তুত আর উন্মুখ হয়ে ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। সেখানে তিনি অল্প কথায় মানুষকে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন। লোকদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলেন আবার সুসংবাদও শুনালেন। এতে মুসলিম বাহিনীর আত্মিক শক্তি ও মনোবলের মধ্যে দারুণ সমুন্নতি ঘটল। পার্থিব সরোসামান ও সফরের পাথেয়ের স্বল্পতাসৃষ্ট যে ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও খুঁত তাদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল এতক্ষণে তা সব দূরীভূত হয়ে গেল।

অপরদিকে রোমানরা যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সফরের কথা শুনতে পেল তখন প্রচণ্ড ভীতি তাদেরকে সাপের মতো জড়িয়ে ধরল। এটা তাদেরকে এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে দিলো না। বরং তারা তাদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল।

রোমানরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা শুনল তখন তাদেরকে ভয়ভীতি পেয়ে বসল। তারা সামনে অগ্রসর হওয়া এবং

---

৬৮৬ প্রাগুক্ত।

মুসলমানদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাল না। বরং তারা নিজেদের সীমানার মধ্যে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। মুসলমানদের সামরিক সুখ্যাতির জন্যে এটা ছিল আরব ভূখণ্ড ও তার দূর দূরন্ত অঞ্চলের জন্যে সুন্দর একটা প্রভাব। এর মাধ্যমে মুসলমানরা মস্ত বড় সামরিক অর্জন হাছিল করেছিল। যদি উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হত তাহলে হয়তঃ এই অর্জন হাছিল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না।

আইলা শাসক ইউহান্না ইবনে রুবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে সন্ধি করল এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিযয়া প্রদান করল। জারবা ও আযরাহের অধিবাসীরাও এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে জিযয়া তুলে দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি পত্র লিখে দিলেন যেটা তাদের কাছেই ছিল। মীনা শাসক বাৎসরিক উৎপাদিত ফলের এক চতুর্থাংশ প্রদানের ওপর সন্ধি করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইলার শাসক ইউহান্নাকেও নিম্নলিখিত পত্রটি দিয়েছিলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আল্লাহ ও তাঁর নবী ও রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ইউহান্না ইবনে রুবা ও আইলা অধিবাসীদের জন্য শান্তির স্মারক। জলে ও স্থলে তাদের কিশতী ও কাফেলার জন্য আল্লাহ ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিম্মাদার। একই যিম্মা ঐ সকল সিরিয়াবাসী ও উপকূলীয় লোকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ইউহান্নার সঙ্গে থাকবে। হ্যাঁ, যদি কেউ উল্টা-পাল্টা করে তবে তার জানের আগে তার মাল গিয়ে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে কেউ যদি তা গ্রহণ করে, তবে এমন সুযোগ তার জন্য থাকবে। তাকে কোনো কূপের পাড়ে অবতরণ কিংবা জলে স্থলে কোনো পথ সফর থেকে বাঁধা দেওয়া যাবে না।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে চার শ' বিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে দুওয়ামাতুল জান্দাল শাসক উকাইদারের কাছে প্রেরণ করেন। যাওয়ার সময় তিনি খালিদকে বলে দেন, **তুমি তাকে নীল গাই শিকার করতে দেখবে।** খালিদ রা. রওয়ানা হলেন। যখন দূর থেকে খালিদের চোখে উকায়দারের প্রাসাদের দৃশ্য চোখে পড়তে শুরু করেছিল এমন সময় হঠাৎ সেখানে একটি নীল গাই বের হলো এবং তার প্রাসাদ তোরণে শিং ঘষতে লাগল। উকাইদার তখন সেটা শিকারে বের হলো। সেটা ছিল চন্দ্রালোকিত এক মধুর রাত। খালিদ রা. তাকে শিকাররত দেখে ধরে ফেললেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এনে হাযির

করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। তার সঙ্গে তিনি দুই হাজার উট, আট শ' শিরস্ত্রাণ, চার শ' লৌহবর্ম, চার শ' বর্শার ওপর সন্ধি করলেন। পাশাপাশি সে জিযয়া প্রদানের স্বীকারোক্তি দিলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইউহান্নার সঙ্গে দূমা, তাবুক, আইলা ও তাইমার শর্তের ওপর চুক্তি সম্পাদন করলেন।

যে সকল কবীলা এতদিন রোমানদের পা চেটে জীবন ধারণ করত। তাদের গোলামীর ভারী জিঞ্জির টেনে টেনে যাদের কোমর ন্যুজ হয়ে এসেছিল তারা এখন খুব ভালো করেই বুঝতে পারল তাদের পুরনো প্রভুর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এ কারণে তারা দিক পরিবর্তন করল। রোমানদের ঘাট ছেড়ে মুসলমানদের ঘাটে এসে এবার তাদের কিশতী নঙ্গর করতে আরম্ভ করল। এভাবে ইসলামী রাজ্যের মধ্যে দারুণ বিস্তৃতি ঘটল। এমনকি ইসলামী রাজ্য- সীমা সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছল এবং স্বয়ং রোমান কর্মকর্তাদের বড় একটা অংশ তাদের দিন ফুরিয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করছিল।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

সফলতার এক মহান বার্তা নিয়ে, এক বিশাল বিজয়ের কেতন উড়িয়ে মুসলিম বাহিনী তাবুক প্রান্তর থেকে মদীনায় ফিরে এলো। আল্লাহ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়েছিলেন। যার কারণে তাদের কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীনও হতে হয়নি। কিন্তু মদীনায় ফেরার পথে একটি ঘাঁটির নিকট বারো জন মুনাফিক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার চক্রান্ত করেছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সে স্থান অতিক্রম করছিলেন তখন আম্মার বিন ইয়াসির রা. রাসূলের উটনীর লাগাম ধরে সামনে থেকে টানছিলেন। আর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রা. পেছনে থেকে তাকে হাঁকিয়ে নিচ্ছিলেন। বাদবাকি সাহাবায়ে কেরাম দূরবর্তী এক উপত্যকা দিয়ে পথ চলছিলেন। মুনাফিকরা এ স্বর্ণ-সুযোগ একশ' তে একশ' কাজে লাগানোর চেষ্টা করল। যখন আম্মার ও হুযাইফা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিয়ে চলছিলেন তখন হঠাৎ পেছনে তাদের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। তারা তাদের মুখ-কান সবকিছু ঢেকে এসেছিল। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এসে আঘাত করেই বসত এমন সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রা. কে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। হুযাইফা রা. গিয়ে তার হাতের একটি ঢাল দ্বারা তাদের সওয়ারীকে সজোরে আঘাত করেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে কুদরতি ভীতি ঢেলে দেন। তারা দ্রুত পালিয়ে গিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে ঢুকে

যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা রা. কে তাদের নামগুলি একে একে বলে দেন এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল তাও জানিয়ে দেন। আর এ কারণেই হুযাইফা রা. কে 'সাহিবু সিররির রাসূল' তথা রাসূলের গোপন তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا তারা এমন কাজের ইচ্ছা করেছিল যা তারা করতে পারেনি। [সূরা তাওবা: ৭৪]

মদীনার কাছাকাছি এসে পৌঁছলে দূর থেকে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে মদীনার দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল তখন তিনি ইরশাদ করেন, **এই তো তাবা! এই তো উহুদ!! এটা এমন এক পাহাড় যে আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও তাকে ভালোবাসি**। এদিকে মদীনায় লোকদের মাঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের সংবাদ বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ল। নারী, শিশু, বালক-বালিকা সবাই দলে দলে তাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানোর জন্য ছুটে এলো। সকলের মুখে ধ্বনিত হচ্ছিল:[৬৮৭]

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا ... مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعْ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا ... مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعْ

'সানিয়াতুল বিদা থেকে আমাদের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে।

যতদিন পর্যন্ত কেউ আল্লাহকে ডাকবে ততদিন পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের কর্তব্য'।

তাবুক থেকে ফিরে এসে তিনি মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন নবম হিজরীর রজব মাসে।[৬৮৮] এ গাযওয়াতে মোট সময় ব্যয়িত হয়েছিল পঞ্চাশ দিন। তার মধ্যে বিশ দিন অবস্থান করেন তাবুক প্রান্তে। আর বাকি ত্রিশ দিন লেগেছিল আসা-যাওয়াতে। এটাই ছিল নবী জীবনের সর্বশেষ গাযওয়া।

---

৬৮৭ এটা ইবনুল কাইয়্যিম র. এর বক্তব্য। এ ব্যাপারে আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি।

৬৮৮ এটাই বিশুদ্ধ মত। আর ইবনে ইসহাকের বক্তব্য অনুযায়ী তিনি মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন রমযান মাসে। কিন্তু ইবনে ইসহাকের মত বিশুদ্ধ নয়। কেননা তাতে রাসূলে কারীম সা. এর তাবুক যাত্রা পড়ে রজব মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার। আর সেই বৃহস্পতিবার হবে অক্টোবর মাসের পঁচিশ তারিখ। আর এই অক্টোবর মাস নাতিশীতোষ্ণ হলেও মূলত শীতের পাল্লাই খানিকটা ভারী থাকার কথা। বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যায় কিছুটা ঠাণ্ডা ও শীত পড়বেই। আর সেটা হবে খেজুর কাটার কিছুদিন পরের কথা। অথচ প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতে রাসূলে কারীম সা. প্রচণ্ড গরমের দিনে খেজুর কাটার মৌসুমে তাবুকের পথে বের হয়েছিলেন। তা ছাড়া এ বছর শা'বান মাসে রাসূলে কারীম সা. মদীনায় উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁর কন্যা উম্মে কুলসূম রা. ইন্তেকাল করেন। সুতরাং বিশুদ্ধ বক্তব্য হলো তিনি রজব মাসে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন। আর তিনি মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন পঞ্চাশ দিন আগে তথা জুমাদাল উলা মাসে।

পিছুটান যারা দিয়েছিল

এক বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে এ গাযওয়াকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য একটি বিশাল পরীক্ষা বলাও চলে। এর দ্বারা খাঁটি মুসলমানদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলা হয়েছিল। এ ধরনের সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর শাশ্বত রীতি এমনই- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ. আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছ, যতক্ষণ না তিনি নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দিবেন। [সূরা আলে ইমরান:১৭৯]

সুতরাং, যারা খাঁটি ও একনিষ্ঠ ঈমানদার ছিলেন তারা সবাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ডাকে সাড়া দিয়ে এ গাযওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং, এ গাযওয়া থেকে পিছুটান দেওয়াই ছিল মুনাফিকীর অন্যতম বড় আলামত। তাই যারা পিছুটান দিয়েছিল সাহাবীগণ রা. যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তাদের কথা উল্লেখ করলেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলে দিলেন, **বাদ দাও! যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ থাকে তবে অতি শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করে দিবেন। আর যদি এমন না হয় তবে আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন!**

ঐ সময় দুই শ্রেণীর লোক পিছুটান দিয়েছিল। এক শ্রেণী ছিল, যারা ওযর-আপত্তির কারণে যেতে পারেননি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিল মুনাফিক। যারা আল্লাহ ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। যারা মিথ্যামিথ্যি অনুমতি নিয়ে পিছুটান দিয়েছিল অথবা কোনো অনুমতির ধার না ধেরে পেছনে রয়ে গিয়েছিল। তবে হাঁ, এরা ছাড়াও তিন জন খাঁটি ঈমানদার সাহাবী এ গাযওয়া থেকে বৈধ ওযর ছাড়া পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন। আসলে আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমানের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। অতঃপর পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করে নিয়ে কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

মদীনায় প্রবেশ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। অতঃপর লোকদের জন্য বসে যান। আশি জনেরও বেশী মুনাফিক সকলেই একের পর এক বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করতে লাগল। এমনকি এর ওপর তারা শপথ করতেও লাগল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহ্যত তাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণ করে নেন। তাদেরকে বাইয়াত করেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা

প্রার্থনা করেন। আর তাদের মনের প্রকৃত অবস্থার বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন।

আর মুমিন তিনজন- তারা ছিলেন কা'ব ইবনে মালিক, মুরারা ইবনে রবী' ও হেলাল ইবনে উমাইয়্যা রা.। তারা সত্যের পথ অবলম্বন করেন। তারা স্বীকার করেন, কোনো ওজর ব্যতীত আমরা এ গাযওয়াতে শরীক হইনি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সাহাবীকে এই তিন জনের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। এভাবে তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো। মানুষের অবস্থা তাদের কাছে পরিবর্তন হয়ে গেল। সবাই তাদের কাছে অপরিচিত মনে হলো। গোটা পৃথিবী তাদের কাছে অচেনা অজানা লাগল। দুনিয়ার প্রশস্ত বুক তাদের জন্য অতি সংকীর্ণ হয়ে গেল।

তাদের প্রতি কঠোরতা এ পর্যায়ে পৌঁছল যে, তাঁদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার শুরু থেকে নিয়ে চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর তাঁদেরকে তাঁদের স্ত্রীগণ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। এভাবে তাদের বিচ্ছিন্নতা পঁঞ্চাশ দিন পূর্ণ হল। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদের তওবা কবুল করে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করলেন:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

আর অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। [সূরা তওবা: ১১৮]

তখন সবার জীবনে এক আনন্দ হিল্লোল দোলা দিয়ে গেল। উল্লিখিত সাহাবী তিনজনের জীবনে সেদিন বসন্ত নেমে এসেছিল। তাদের সুখ আর শান্তির পরিধি নির্ণয় করা আধুনিক পৃথিবীর কোনো যন্ত্র দ্বারাও সম্ভব ছিল না। মনে হচ্ছিল, সেদিন তাদের নতুন করে জন্ম হয়েছিল। তারা সে দিন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছিলেন। তারা একে অপরকে খুশির বার্তা শুনাতে লাগলেন। প্রচুর দান-সদক্বা করলেন আল্লাহর পথে। আর বিভিন্ন অপরাগতা ও শারীরিক সমস্যা যাদেরকে ধরে রেখেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

দুর্বল, রুগ্ন, এবং ঐ সমস্ত লোকদের উপর কোনো অসুবিধা নেই, যারা ঐ জিনিস পায় না, যা তারা খরচ করবে, যখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কল্যাণকামিতা করবে। [সূরা তওবা:৯১]

মদীনার কাছাকাছি পৌঁছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন, **মদীনাতে এমন কিছু লোক রয়েছে- তোমরা যে পথই অতিক্রম করেছ, যে উপত্যকা-ই তোমরা পাড়ি দিয়েছ, তারা সব সময় তোমাদের সঙ্গে ছিল। ওযর তাদেরকে সেখানে ধরে রেখেছে।** সাহাবায়ে কেরাম রা. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা মদীনায় থেকেও (আমাদের সঙ্গে রয়েছে)? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **হাঁ, মদীনায় থেকেও!**

গাযওয়ার ফলাফল

গোটা জাযীরাতুল আরবে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের ক্ষেত্রে এ গাযওয়ার দারুণ প্রভাব ছিল। এখন সকল জাতির সকল ধর্মের মানুষের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আরবের বুকে এখন ইসলামের শক্তি ব্যতীত আর কোনো শক্তির বেঁচে থাকার সুযোগ ও অধিকার নেই। কিছু কিছু মূর্খ মানব ও মুনাফিক তখনো যে তাদের মনের অন্ধকার কুঠরিতে ইসলামের সর্বনাশের দিন ঘনিয়ে আসার স্বপ্ন দেখত, যারা তাদের মনের গহীনে জাহেলিয়াতের জেগে ওঠার টিমটিমে কয়েকটি প্রদীপ হাতে নিয়ে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ এক দমকা হাওয়া এসে তাদের সে প্রদীপগুলিও নিভিয়ে দিয়ে যায়। তাদের চোখের সামনে নেমে আসে এক আকাশ অন্ধকারের জটলা। কেননা তাদের এ সকল স্বপ্নের নায়ক ছিল রোমানরা। অতঃপর এখন যখন তাদের ভরাডুবি ঘটল তখন তাদের সামনের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে এলো। জীবনের পরম এক বাস্তবতার কাছে তারা আত্মসমর্পণ করে বসল- যে বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাওয়ার আর কোনো পথ খোলা ছিল না।

এ অবস্থায় আর এটার প্রয়োজন ছিল না যে, মুসলমানরা মুনাফিকদের সঙ্গে এখনো বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে যাবে। ভেতরে ভেতরে তারা দাদাগিরি করতে থাকবে আর মুসলমানরা তা দেখেও না দেখার ভান করে থাকবে। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে রুক্ষতা ও কঠোরতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। এমনকি তাদের সদক্বা কবুল করতে নিষেধ করেন। তাদের মৃতের ওপর জানাযা নামায

পড়তে বারণ করে দেন। তাদের কবরের কাছে গিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনার পথ বন্ধ করে দেন। মসজিদের নামে তারা যে ইবলীসের বিশাল কারাখানা খুলে বসেছিল তাতে নামায আদায়ের পরিবর্তে ভূমিসাৎ করার নির্দেশ দেন। তাদের ব্যাপারে এমন কতগুলি আয়াত নাযিল করেন যেখানে তাদের চরম নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়। এখন তাদেরকে চিনে নিতে আর কোনো সমস্যা ছিল না। তাদের মুখের ওপর এখন আর কোনো পর্দা ছিল না। মদীনার কোন্ জায়গায় কোন্ মুনাফিক বাস করত নাম ধরে ধরে যেন তা মুসলমানদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এই গাযওয়ার প্রভাব আরও একটি ব্যাপার থেকে অনুধাবন করা যায় যে, দরবারে রিসালতে প্রতিনিধিদলের আগমন যদিও মক্কা বিজয়ের পরে কিংবা আরও আগে শুরু হয়েছিল। কিন্তু দলে দলে একের পর এক প্রতিনিধিদলের আগমন ও মদীনায় তাদের ভীড় জমতে শুরু হয়েছিল গাযওয়ায়ে তাবুকের পরেই।[৬৮৯]

গাযওয়ায়ে তাবুক সম্পর্কে কুরআনে কারীমের বক্তব্য

গাযওয়ায়ে তাবুক সম্পর্কে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। তন্মধ্যে কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল গাযওয়াতে বের হওয়ার পূর্বে, কিছু নাযিল হয়েছিল সফরের হালতে আর বাদবাকিগুলি নাযিল হয়েছিল গাযওয়া শেষে মদীনায় ফিরে আসার পরে। এ সকল আয়াতে যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি, মুনাফিকদের লাঞ্ছনা ও অপমান, মুখলিস মুজাহিদ ও মুমিনদের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্বের জয়গান, যারা যুদ্ধে শরীক হয়েছিল এবং যারা হয়েছিল না তাদের সকলের প্রকৃত ও সত্য তওবা কবুলের ঘোষণা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোকপাত করা হয়।

[৬৮৯] আমরা এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেছি ইবনে হিশাম ২/৫১৫-৫৩৭, যাদুল মাআদ ৩/২-১৩, সহীহ বুখারী ১/২৫২, ৪১৪, ২/৬৩৩-৬৩৭ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। সহীহ মুসলিম ও শরহে ইমাম নববী র. ২/২৪৬। ফাতহুল বারী ৮/১১০-১২৬।

নবম হিজরীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

এ বছর ইসলামের ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সংক্ষেপে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটির তালিকা পেশ করছি:

এক. গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পরে উয়াইমির আজলানী ও তার স্ত্রীর মাঝে লিআন সংঘটিত হয়।

দুই. গামেদিয়া মহিলাটিকে হত্যা করা হয়। সে নিজে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে ব্যভিচারের অপরাধ করার কথা স্বীকার করে। গর্ভের সন্তানকে দুধ ছাড়ানোর পরে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়েছিল।

তিন. এ বছর রজব মাসে হাবশার মুসলমান বাদশাহ নাজ্জাসী র. ইন্তেকাল করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওপর গায়েবানা জানাযা নামায আদায় করেন।[৬৯০]

চার. এ বছর শা'বান মাসে নবী নন্দিনী উম্মে কুলসূম রা. ইন্তেকাল করেন। এতে তিনি দারুণ ভারাক্রান্ত হন। জামাতা উসমান রা. কে লক্ষ্য করে বলেন, **আমার কাছে এখন যদি তৃতীয় আরেকটি মেয়ে থাকত, তবে আমি তাকেও তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতাম।**

পাঁচ. তাবুক থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফিরে আসার পরে রঈসুল মুনাফিকীন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূল মৃত্যুবরণ করে। উমর রা. তাকে বারণের চেষ্টা করার পরেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার নামায পড়েন এবং তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। পরে উমর রা.এর সিদ্ধান্তের সমর্থনে কুরআনে কারীমের আয়াত নাযিল হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো মুনাফিকের জানাযার নামায আদায় কিংবা তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়।

---

[৬৯০] ইতঃপূর্বেও আমরা বলেছি, এটা ছিল সরদারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; যা সাধারণ উম্মতের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই হানাফী মাযহাব অনুসারে কোনো গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা যাবে না- অনুবাদক।

হজ্জে আবু বকর রা.

এ বছরই তথা নবম হিজরীর যুলকা'দ কিংবা যুলহজ্জ মাসে আবু বকর রা. কে হজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে নিয়ে তিনি হজ্জের বিধি-বিধান কায়েম করবেন।

এর কয়েকদিন পরে মুশরিকদের সঙ্গে ইসলামের চুক্তির দিন খতমের ঘোষণা নিয়ে কুরআনে কারীমের সূরা তওবার প্রাথমিক আয়াতগুলি নাযিল হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তা তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত আলী ইবনে আবী তালিব রা. কে প্রেরণ করেন। এটা ছিল তৎকালীন আরবীয় রীতি। (যে কোনো ধরনের রক্ত কিংবা ধন-সম্পদ সম্পর্কিত ওয়াদা অঙ্গীকার চুক্তি ভঙ্গ করতে হলে তখন চুক্তিকারী নিজে কিংবা নিজের বংশীয় কাউকে পাঠাতে হতো) আলী রা. মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আর্‌জ কিংবা যজনান নামক স্থানে গিয়ে আবু বকর রা. এর সঙ্গে মিলিত হন। আবু বকর রা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীর না কি মা'মূর? আলী রা. বললেন, মামূর। অতঃপর তারা সামনে এগিয়ে চললেন। আবু বকর লোকদেরকে হজ্জ করালেন। যখন যুলহজ্জের দশ তারিখ তথা কুরবানীর দিন এলো তখন আলী ইবনে আবী তালিব দাঁড়িয়ে মানুষের মধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ শুনিয়ে দেন। যাদের সঙ্গে ওয়াদা-অঙ্গীকার ছিল তা ফিরিয়ে দেন। তাদেরকে মোট চারমাসের সময়সীমা বেঁধে দেন। যাদের সঙ্গে কোনো ওয়াদা-অঙ্গীকার ছিল না তাদেরকেও একই সময় সীমা বেঁধে দেন। তবে যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনোদিন চোখ তুলে তাকায়নি কিংবা তাদের ভালো-মন্দে কোনো মাথা ঘামায়নি তাদের সঙ্গে চুক্তি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বহাল থাকার ঘোষণা দেন।

অতঃপর আবু বকর রা. কিছু লোক মনোনীত করে মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা দিতে বলেন: হে লোক সকল শুনে রাখো! এ বছরের পর আর কোনো মুশরিক কোনোদিন হজ্জ করতে পারবে না!! উলঙ্গ হয়ে কেউ আর কোনোদিন কাবাঘর তওয়াফ করতে পারবে না!!!

সত্যি কথা বলতে কি, এ ঘোষণা গোটা জাযীরাতুল আরবে চিরদিনের জন্য পৌত্তলিক সভ্যতার কবর রচনা করেছিল। সে বলে দিলো- এরপর আর এ সভ্যতাকে কোনোদিনও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। তার আসা-যাওয়ার পথ কোনোদিনও মুক্ত-স্বাধীন-দিল আযাদ ছেড়ে দেওয়া হবে না।[৬৯১]

---

[৬৯১] সহীহ বুখারী /২২০, ৪৫১, ২/৬২৬, ৬৭১। যাদুল মাআদ ৩/২৫, ২৬। ইবনে হিশাম ২/৫৪৩-৫৪৬।

গাযওয়ায়ে রাসূল সা.এর ওপর এক ঝলক

যখন আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গাযওয়া, সারিয়া ও সামরিক অভিযানগুলির প্রতি গভীর ও গবেষণাধর্মী দৃষ্টি নিক্ষেপ করব তখন আমাদের; বরং বিশ্বের সামরিক ইতিহাস, যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে খবর রাখেন এমন যে কাউকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে:

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে রণভিজ্ঞ সিপাহসালার। বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে সতর্ক, সচেতন ও সমরকুশলী সর্বাধিনায়ক। নবুওত ও রিসালতের ময়দানে মানবাত্মার এ মহান আশ্চর্য রত্ন যেমন ছিলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আর মুরসালীনের প্রধানপুরুষ; একইভাবে সমরাঙ্গন ও লড়াইয়ের ময়দানেও তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ও বিস্ময়কর বিজয়ের মুকুটধারী সম্রাট। জীবনে যখনই তিনি কোনো লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন পরিবেশ ও পরিস্থিতি আর লড়াইয়ের রঙ ও ঢঙ দেখলেই তাঁর সতর্কতা, কুশলতা আর বীরত্ব ও অবিচলতার কাছে যে কারও নতি স্বীকার করতে হবে। এ কারণে জীবনের কোনো যুদ্ধের ময়দানে তাঁর রণকৌশল, সেনাবিন্যাস কিংবা সমরবিদ্যায় ভুল করার কারণে পরাজয় বরণ করতে হয়নি। ব্যর্থ হননি জীবন-যুদ্ধের কোনো ময়দানে। বরং প্রতিটি যুদ্ধের ময়দানে তাকে দেখা যায় প্রতিপক্ষের পরে হাযির হয়েও রণাঙ্গনের সবচেয়ে সুন্দর যুদ্ধোপযুক্ত জায়গাটি ঠিক বেছে নিতে। যুদ্ধ পরিচালনার নিখুঁত কারিশমা প্রদর্শন করতে। এ সকল দিকের প্রতি নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ আরও সামনে বেড়ে যে সত্যটি মনের আকাশে ভেসে ওঠে তা হলো, নবী জীবনের প্রতিটি রণাঙ্গনে ভিন্নমাত্রার রণকুশলতার যে বিস্মরয়কর পথ ও পদ্ধতি দেখা যায় এগুলি ছিল পৃথিবীর সমরেতিহাসের এক অবিস্মরণীয় সংযোজন। এর আগে আর কোনো দিন কারও মাঝে দুনিয়ার এ কুশলতা দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আর উহুদ ও হুনাইন প্রান্তরে মুসলমানদের যে সামরিক পরাজয় নেমে এসেছিল তা কোথাও হয়তো ছিল মুসলিম বাহিনীর কিছু সেনার দুর্বলতার ফলাফল। আবার কোথাও ছিল রণাঙ্গনে তিনি তাদের ওপর যে বিশাল দায়িত্ব ও নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন তা অমান্য করার পরিণতি।

এটা ছিল নিছক সামরিক কুশলতা আর রণ দক্ষতার ময়দানে তাঁর অভিনব নেতৃত্বের কথা। কিন্তু এর পাশাপাশি যদি আমরা আরেকটি দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখতে পাব- নবী জীবনে ঘটে যাওয়া এ সকল লড়াই আর সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ-অনল-দাহিত গোটা জাযীরাতুল আরবে শান্তি আর

শৃঙ্খলার এক নতুন রাজ্য জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সব ধরনের ফিতনা আর ফাসাদের আগুন নিভিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার সংঘাতের বধ্যভূমিতে শত্রুবাহিনীর প্রতিপত্তির বিশাল ও সমুন্নত ধ্বজা ভেঙে দলামোচা করে মাটির উদরে পুরে দিয়েছিলেন। তাদেরকে সন্ধির পথে টেনে আনতে বাধ্য করেছিলেন। ইসলামের দাওয়াত দিগন্তব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার পথ সম্পূর্ণ জঞ্জাল আর কাঁটামুক্ত করেছিলেন। এর দ্বারা পাশাপাশি মুখলিস ও একনিষ্ঠ ঈমানদারদের কাতার থেকে তিনি ভেঁজাল ও খাদযুক্ত ঈমানদার তথা মুনাফিকদেরকে কান ধরে টেনে বের করে সবার সামনে উলঙ্গ করে ছেড়েছিলেন।

সশস্ত্র সংগ্রামের এ সরগরম ময়দানে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে রাতের পর রাত, আর দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়ার দুর্লভ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন একটি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা তাঁর পরে আরব ভূখণ্ড থেকে শত শত মাইল দূরে ইরাক ও সিরিয়ার তপ্ত রণাঙ্গনে তৎকালীন পৃথিবীর বৃহত্তম দুই পরাশক্তি রোম আর পারস্য বাহিনীর মুখামুখি হয়ে তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছিলেন। সমরকৌশল আর যুদ্ধ পরিচালনায় যাদের চেয়ে শতগুণে বেশি উন্নতি, আধুনিকতা আর উঁচুতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। এভাবে তারা তাদেরকে নিজেদের বাড়ি-ঘর আর বাপ-দাদার বাস্তু-ভিটা থেকে বের করে কোণঠাসা এক সংকীর্ণ জীবনে ঠেলে দিয়েছিলেন। তাদেরকে তাদের সাধের ক্ষেত-খামার, ঝরনা-নহর আর বাগ-বাগিচা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাদের মর্যাদাময় বাসস্থান আর সুবিশাল প্রাচুর্য থেকে, যেখানে তারা দিন-রাত হাস্যরসে লিপ্ত ছিল। (তবে তাতে কোনো ধরনের যুলুম কিংবা অন্যায়-অত্যাচারের সুযোগ ছিল না)

পাশাপাশি এ সকল গাযওয়া ও সরিয়ার বদৌলতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা-জমি, বাসস্থান আর পেশার ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছিলেন। আশ্রয়প্রার্থী আর শরণার্থীদের সমস্যার সুন্দর সমাধান পেশ করতে পেরেছিলেন। হাতিয়ার, ঘোড়া, বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এগুলোর ব্যবস্থা করতে গিয়ে আল্লাহর কোনো বান্দা বনী আদমের ওপর তাকে অন্যায়ভাবে হাত উঠাতে হয়নি।

এগুলোর পাশাপাশি এ প্রথমবারের মতো পৃথিবীতে তিনি এক নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। দুনিয়াকে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, ভালো আর কল্যাণের জন্যও যুদ্ধ-বিগ্রহ হতে পারে। তার আগে জাহেলিয়াতের যুগে দিনের পর দিন যে তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে যুদ্ধ আর বিগ্রহের যে দামামা বেজে উঠত, সে সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের উপাদান থাকত নিছক অন্যায়, মারামারি, কাটাকাটি, হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি, বাটপারি, যুলুম ও অত্যাচার। পূর্ব হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ, কঠোরতা,

দুর্বলদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে মারা, আবাদ ও জনবহুল নগরী জনশূন্য ও বিরান করে ফেলা, বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে ফেলা, নারীদের ইয্যত-আব্রু বিনষ্ট করা, দুর্বল ও শিশুদের ওপর চরম অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করা, ক্ষেত-খামার ও সুন্দর ফসল আর ফুলের বাগান নষ্ট করে ফেলা। এক কথায় গোটা পৃথিবীতে অন্যায় আর অরাজকতা ছড়িয়ে দেওয়া। অতঃপর এই যুদ্ধ-বিগ্রহই যখন ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ও তার তত্ত্বাবধানে চলে এলো তখন এর পেছনে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল একের পর এক সুমহান লক্ষ্য উদ্দেশ্য, বিশ্ব মানব জাতির শাশ্বত কল্যাণ আর সার্বিক মঙ্গলের বাহন। যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আগে মানুষের ওপর যুলুম আর নির্যাতনের আকাশ ভেঙে ফেলত। এখন সেই যুদ্ধ-বিগ্রহই জুলুম আর নির্যাতন থেকে মানবতাকে বাঁচানোর প্রধান অস্ত্র আর হাতিয়ারে পরিণত হলো। এক সময় যে সংঘাতের উপাদান ছিল বেইনসাফি ও অবিচার। এখন সেই সংঘাতই গড়তে লাগল ইনসাফ আর সুবিচারের বিস্ময়কর ইতিহাস। যেই সংঘর্ষ আর সংগ্রামের মাধ্যমে এক সময় শক্তিশালীরা দুর্বলদের রক্ত চুষে খেত। এখন সেই সংঘর্ষ আর সংগ্রামের মাধ্যমেই শক্তিশালীকে দুর্বল করে দিয়ে তার অধিকার ফিরিয়ে নেওয়া শুরু হলো। এখন জিহাদ ঐ সকল দুর্বল নারী-পুরষ আর শিশুদের জন্য নাজাত আর মুক্তির একমাত্র পয়গাম হয়ে গেল (কুরআনে কারীমের ভাষায়) যারা বলে, **হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে দিন, যার অধিবাসীরা যালিম!! আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন কার্যনির্বাহী বানিয়ে দিন। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের একজন সাহায্যকারী প্রস্তুত করুন।** [সূরা নিসা:৭৫] জিহাদ এখন গাদ্দারি, খেয়ানত আর বিশ্বাসঘাতকতা থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করে শান্তি ও নিরাপত্তা, আমানত ও পবিত্রতা, রহমত ও বরকতে পৃথিবীর বুক ভরিয়ে দেওয়ার চাবিকাঠি হয়ে গেল।

একইভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তিনি অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সমরনীতি ও যুদ্ধ-আইন প্রণয়ন করেন। যেগুলি তিনি তার নিজের বাহিনীতে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতেন। সামান্য মুহূর্তের জন্য যে বিধানের গণ্ডির বাইরে যেতে তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে কখনোই অনুমতি দেননি। সালমান ইবনে বুরাইদা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাউকে কোনো বাহিনী কিংবা সারিয়ার আমীর বানিয়ে দিতেন তখন তাকে তিনি বিশেষ করে আল্লাহর তাকওয়ার ওসীয়ত করতেন। আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, **আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে! যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। যুদ্ধ করবে কিন্তু খেয়ানত করবে না। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বিপক্ষের লোকদের অঙ্গবিকৃতি করবে না। কোনো**

শিশুকে হত্যা করবে না। ....। যুদ্ধের ময়দানে সব সময় তিনি সহজ করার নির্দেশ দিতেন আর বলতেন, **সহজ করো! কঠিন করো না! লোকদেরকে প্রশান্ত করো তাদেরকে বিরক্ত ও বিদ্বেষভাবাপন্ন করে তুলো না।**[৬৯২]

তা ছাড়া তিনি যখন কোনো দুশমনের জনপদে রাতের বেলা পৌঁছে যেতেন সহজ বিজয়ের একটি স্বর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি কাপুরুষের মতো ঘুমের ঘোরে তাদের ওপর হামলা করে বসতেন না। কাউকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে তিনি কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। শক্ত করে বেঁধে হত্যা করতে তিনি বারণ করতেন। নারী কিংবা শিশু হত্যা ও লুণ্ঠন থেকে তিনি বিরত থাকতে বলতেন। এমনকি তিনি বলেছেন, **লুণ্ঠনের সম্পত্তি মৃত জানোয়ারের চেয়ে বেশি হালাল নয়!** ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা নষ্ট করা থেকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। হ্যাঁ, তাতে যদি কোনো সামরিক ফায়েদা থাকে কিংবা তা ছাড়া উপায় না থাকে তবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বলেছিলেন, **আহতের ওপর তোমরা তরবারি চালাবে না! পলায়নরত কারও পশ্চাদ্ধাবন করবে না! কোনো বন্দীকে হত্যা করবে না!** আজ পৃথিবীতে রাষ্ট্রদূত হত্যা করা আন্তর্জাতিক অপরাধ বিবেচিত হয়। বলুন তো এ কার দান! সরদারে কায়েনাত সাইয়েদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃথিবীর বুকে প্রচলিত এ বিধান ইসলাম সমর্থিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। যিম্মিদেরকে হত্যা করতে তিনি কঠিনভবে নিষেধ করেছেন। এমনকি এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেন, **যে কোনো যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না; অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।**

এভাবে তিনি পৃথিবীতে প্রথমবারের মতো যুদ্ধ-বিগ্রহের ক্ষেত্রে এমন কিছু সুন্দর সুন্দর নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন, যে নীতিমালার ওপর ভর করে তার যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি জাহেলিয়াতের নাপাকী ও ময়লা-আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকে মহা পবিত্র জিহাদের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।[৬৯৩]

---

[৬৯২] সহীহ মুসলিম ২/৮২, ৮৩। তাবারানীর মু'জামুস সগীর ১/১২৩, ১৮৭।
[৬৯৩] বিস্তারিত দেখুন যাদুল মাআদ ২/৬৪-৬৮।

দলে দলে মানুষ আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে

যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মক্কা বিজয় ছিল ইসলামের ইতিহাসের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকর যুদ্ধ। এ যুদ্ধ একদিকে যেমন ইসলামের শাশ্বত বিজয় ঘোষণা করেছিল। অপরদিকে এটা পৌত্তলিক সভ্যতার ঠিক কপাল বরাবর 'পতনের' মোহর মেরে দিয়েছিল। তখন আরবরা সত্যিকার অর্থে হক্ব আর বাতিল চিনতে পারল। হেদায়েত আর গোমরাহী সম্পর্কে তাদের সকল সন্দেহ আর সংশয়ের ভূত ছেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং তারা তখন দলে দলে ইসলামের দিকে ছুটে আসতে থাকে। শুরু হয় ইসলাম গ্রহণের এক অপূর্ব প্রতিযোগিতা। আমর ইবনে সালামা রা. বলেন, আমরা মানুষের চলাচলের পাশে একটি কূপের পাড়ে বসবাস করতাম। আমাদের পাশ দিয়ে বিভিন্ন কাফেল যেত আর আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কী হলো? মানুষের কী হলো? এ ব্যক্তি তথা নবী কে? তারা বলত, সে মনে করে আল্লাহ তাকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তার প্রতি এমন এমন ওহী পাঠিয়েছেন। তখন আমি সেই কথাগুলো মুখস্থ করে নিতাম। এগুলি যেন আমার হৃদয়ে একেবারে বসে যেত। অপরদিকে আরবরা তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করত। তারা বলত, তাকে ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি তাদের ওপর জয়ী হন তবে তিনি সত্য নবী। অতঃপর যখন মক্কা বিজয় হলো দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করল। আমার পিতা তার কওমের আগে মুসলমান হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কাছে সত্য নবীর কাছ থেকে ফিরে এসেছি। তিনি বলেছেন, তোমরা অমুক সময় অমুক নামায আদায় করো! আর অমুক সময় অমুক নামায আদায় করো। অতঃপর যখন নামাযের সময় উপস্থিত হয় তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয়, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কুরআন যার বেশি মুখস্থ সে যেন ইমামতি করে ....।

এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় তামাম আরবের সার্বিক পরিস্থিতি ইসলামের অনুকূলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এবং ইসলামের সামনের পথ পরিষ্কার ও কাঁটামুক্ত রাখতে, আরবদের জন্য সময়ের গতিবিধি নির্ণয় করে দিতে; সর্বোপরি ইসলামের কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করে বসে যেতে মক্কা বিজয়ের কতখানি প্রভাব ছিল। তাবুক যুদ্ধের মাধ্যমে এটা আরও মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। এ কারণে আমরা নবম ও দশম হিজরীতে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহের পরিবর্তে মানুষকে শুধু দলে দলে ইসলামের দিকে দৌড়ে আসতে দেখি। সুতরাং, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়

যেখানে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার যোদ্ধা। সেখানে নবম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধে মুসলিম বাহিনার সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ত্রিশ হাজারে। অথচ মক্কা বিজয়ের তখনো এক বছর পূর্তি হয়ে সারেনি। এরপর বিদায় হজ্জের সময় আমরা মানুষের এক মহা সমুদ্র দেখতে পাই। সেখানে এক লক্ষ কিংবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মুসলমান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চারপাশে উত্তাল উর্মীমালার মতো তালবিয়া, তাকবীর, তাসবীহ আর তাহমীদে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। সুনীল আসমানের দিগ-দিগন্তে সে ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছিল। গোটা পৃথিবীকে নিয়ে আকাশ ও মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল।

প্রতিনিধি দলের আগমন

সীরাত ঐতিহাসিক ও মাগাযী বিশেষজ্ঞগণ এ ক্ষেত্রে যতগুলি প্রতিনিধি দলের কথা বর্ণনা করেছেণ তাদের সংখ্যা সত্তরের চেয়েও বেশি। কিন্তু সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা আমাদের পক্ষে একদিকে যেমন সম্ভব নয়; অন্যদিকে তা সম্মানিত পাঠকবর্গের জন্যও খুব একটা উপকারী বলে মনে হয় না। তাই আমরা তন্মধ্য থেকে শুধু সেগুলিই উল্লেখ করব, ইতিহাসে যেগুলির বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। পাশাপাশি যেগুলো পড়তে, জানতে এবং শুনতেও ভালো লাগবে। কিন্তু সম্মানিত পাঠকবর্গের এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে- যদিও ব্যাপকভাবে প্রতিনিধি দলের আগমন হয়েছিল মক্কা বিজয়ের পরেই; কিন্তু এখানে আমরা এমন কিছু প্রতিনিধিদলের আগমনের ঘটনাও বর্ণনা করব, যাদের আগমন ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের আগে।

এক. আব্দুল কায়সের প্রতিনিধিদল

এ কবীলা থেকে মোট দু'টি প্রতিনিধি দলের আগমন হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথমটি এসেছিল হিজরতের পঞ্চম বছরে কিংবা তারও আগে। তাদের মধ্যে একজন ছিল মুনকিয ইবনে হাইয়্যান। তিনি মদীনায় ব্যবসা করতে আসতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনায় আগমনের পরে সে যখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারলেন তখন ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে একটি পত্র নিয়ে তার কওমের নিকট যান এবং তাঁর কওমের সবাই ইসলাম কবুল করে নেয়। এরপর হারাম মাসে তাদের তেরো কিংবা চৌদ্দজনের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে হাযির হয়। আর তখনই তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ঈমান ও শরাব সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। তাদের মধ্যে সকলের বয়োবৃদ্ধ ছিল আশাজ আসরী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার সম্পর্কে বলেছিলেন, **তোমার মাঝে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, আল্লাহ তাআলা যাকে পছন্দ করেন- ধীর-স্থিরতা ও সহনশীলতা।**

তাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলটি দরবারে নববীতে এসে হাযির হয় প্রতিনিধি আগমনের বছর। এ সময় তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ জন পুরুষ। তখন তাদের মধ্যে একজন ছিল জারূদ ইবনে আলা আবদী। সে প্রথমে খ্রিস্টান ছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলমান হয় এবং তার ইসলাম গ্রহণ অনেক সুন্দর হয়।[৬৯৪]

---

[৬৯৪] আল্লামা নববী র. কর্তৃক শরহে সহীহ মুসলিম ১/৩৩। ফাতহুল বারী ৮/৮৫,৮৬।

দুই. দাওসের প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল হিজরী সপ্তম বছরের গোড়ার দিকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খাইবরে ছিলেন। পূর্বে আমরা তুফাইল বিন আমর দাওসী রা. এর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী উল্লেখ করেছি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় থাকতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর নিজ কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু তাদের ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে তাদের ওপর বদ দুআর অনুরোধ করেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **হে আল্লাহ! কওমে দাওসকে আপনি হেদায়েত দান করুন!** রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুআর বরকতে তারা সবাই মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর সপ্তম হিজরীর গোড়াতে তার কওমের সত্তর কিংবা আশিটি পরিবার নিয়ে প্রতিনিধি দল হিসেবে রওয়ানা করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন খাইবরে থাকার কারণে তারা খাইবরে গিয়েই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মিলিত হন।

তিন. ফারওয়া ইবনে আমর জুযামীর প্রতিনিধি

জীবনের প্রাথমিক দিনগুলিতে ফারওয়া রা. ছিলেন রোমান বাহিনীর নামীদামী আরবী সালার। রোমানদের পক্ষ থেকে তিনি রোম সীমান্তবর্তী আরব কবীলাগুলোর গভর্নর ছিলেন। তার শাসনকেন্দ্র ছিল মাআন নগরী। আর সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় তার শাসন ছিল। অষ্টম হিজরীতে মূতা প্রান্তরে মুসলিম বাহিনীর অসীম বীরত্ব, সাহসিকতা আর সত্যোন্মুখিতা দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। সঙ্গে আল্লাহর রাসূলের জন্য একটি সাদা খচ্চর পাঠিয়ে দেন। রোমানরা তার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে পেরে তাকে বন্দী করে ফেলে। অতঃপর তাকে মুরতাদ কিংবা মৃত্যু দু'টি পথের কোনো একটি বেছে নিতে বলে। মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ওপর তিনি মৃত্যুকে প্রাধান্য দেন। ফিলিস্তীনের আফরা নামক স্থানে বর্বর রোমানরা তাকে প্রথমে শূলিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং পরে তার শিরশ্ছেদ করে। এভাবে তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে যান।[৬৯৫] রহমাতুল্লাহি আলাইহি।

---

[৬৯৫] যাদুল মাআদ ৩/৪৫।

চার. সুদার প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলটি অষ্টম হিজরীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জি'রানা থেকে মদীনায় ফিরে এলে আগমন করে। তার কারণ ছিল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার শ' সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করে তাকে নির্দেশ দিলেন ইয়েমেনের এক প্রান্তে যে সুদা জনপদ রয়েছে তাতে গিয়ে হামলা করতে। মুসলমানদের এ বাহিনী যখন সদরে কানাত নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিল তখন যিয়াদ ইবনুল হারিস সুদাঈ এ সংবাদ জানতে পেরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আরয করে, আমি আমার পেছনে আমার কওমের প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি নিজ বাহিনী ফিরিয়ে আনুন! আমি আপনার কাছে আমার কওমের যিম্মাদার। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সদরে কানাত থেকে মুসলিম বাহিনী ফিরিয়ে আনেন। ওদিকে সুদাঈ তার কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আসতে উৎসাহিত করে। তার উৎসাহে পনেরো জন লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে হাযির হয় এবং ইসলাম গ্রহণের শর্তে তিনি তাদেরকে বাইয়াত করেন। অতঃপর তারা তাদের কওমে ফিরে যায়। সেখানে গিয়ে তারা দাওয়াতী মেহনত করলে অল্প কিছুদিনেই তাদের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। বিদায় হজ্জের সময় তাদের এক শ' জন লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে হাযির হয়।

পাঁচ. কা'ব বিন যুহাইর বিন আবী সালমার আগমন

বংশ আর জন্মসূত্রেই কা'ব বিন যুহাইর ছিলেন কবি। তিনি ছিলেন আরবের খ্যাতনামা ও বড় মাপের কবিদের একজন। প্রথমে তিনি রাসূলে কারীম সা এর বিরুদ্ধে নানা কুৎসামূলক কবিতা রচনা করতেন । অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অষ্টম হিজরীতে গাযওয়ায়ে তায়েফ থেকে ফারেগ হয়ে মদীনায় ফিরে যান তখন কা'ব বিন যুহাইরের ভাই বুজাইর বিন যুহাইর তার কাছে পত্র লেখেন, যারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো এবং তাকে কষ্ট দিত তাদের অনেককে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর হত্যা করেছেন। কুরাইশের বাদবাকি কবিগুলি যে যেদিকে পেরেছে ভেগে গেছে। তাই যদি নিজের জীবনের মায়া থাকে তবে দ্রুত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে হাযিরা দাও। কারণ তওবা করে কেউ তাঁর দরবারে গেলে তিনি তাকে হত্যা করেন না। আর যদি তা না হয় তবে যেখানে মন চায় সেখানে চলে

যাও! অতঃপর দু'ভাইয়ের মধ্য আরও কতগুলি পত্র বিনিময় হতে থাকে। এতে করে ধীরে ধীরে গোটা পৃথিবীর কা'ব বিন যুহাইরের কাছে সংকীর্ণ হয়ে যায়। আস্তে আস্তে তিনি চোখে ধোঁয়া দেখতে শুরু করেন এক পর্যায়ে পার্থিব জীবনের ওপর তাঁর বড় মায়া ধরে যায়। তখন তিনি সোজা মদীনায় গিয়ে জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির ঘরে গিয়ে ওঠেন। তার সঙ্গেই ফজরের নামায আদায় করেন। নামায শেষ করার পর জুহাইনী ইঙ্গিতে তাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখিয়ে দেয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বসে পড়েন। নিজের হাত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে রাখেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আগে চিনতেন না। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কা'ব বিন যুহাইর তওবা করে মুসলমান হয়ে আপনার কাছে এসেছে নিরাপত্তা চাওয়ার জন্য। যদি আমি তাকে নিয়ে আসি তবে কি আপনি তার তওবা কবুল করবেন? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমিই কা'ব বিন যুহাইর! ঠিক এই মুহূর্তে এক আনসারী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধড় থেকে তার ঘাড় আলাদা করে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করতে লাগলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **তাকে ছেড়ে দাও! কেননা সে অতীতের সবকিছু থেকে হাত ঝেড়ে তওবা করে এসেছে।** আর এ সময়ই কা'ব বিন যুহাইর রা. তাঁর প্রসিদ্ধ কাসীদা পাঠ করেন। যার সূচনা হয়েছে এভাবে:

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُوْلُ ... مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُوْلُ

'সুআদ চলে গেছে। অতঃপর আমার অন্তর আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার পিছনে বেড়ী আবদ্ধ বন্দী অবস্থায়। যাকে মুক্ত করা হয়নি'।

এ ক্বাসীদায় তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অতীত কৃতকর্মের ওযর-আপত্তি পেশ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশস্তিগীত গাইতে থাকেন এভাবে:

نُبِّئْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ أَوْعَدَنِيْ ... وَالْعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ مَأْمُوْلُ

مَهْلًا هَدَاكَ الَّذِيْ أَعْطَاكَ نَافِلَةَ ... الْقُرْآن فِيهَا مَوَاعِيظٌ وَتَفْصِيلُ

لَا تَأْخُذَنِّي بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ ... أُذْنِبْ وَلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الْأَقَاوِيلُ

لَقَدْ أَقُومُ مَقَامًا لَوْ يَقُومُ بِهِ ... أَرَى وَأَسْمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الْفِيلُ

لَظَلَّ يُرْعَدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ ... مِنَ الرَّسُولِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَنْوِيلُ

حَتَّى وَضَعْتُ يَمِينِي مَا أُنَازِعُهُ ... فِي كَفِّ ذِي نَقِمَاتٍ قِيلُهُ الْقِيلُ

فَلَهُوَ أَخْوَفُ عِنْدِي إِذْ أُكَلِّمُهُ ... وَقِيلَ إِنَّكَ مَنْسُوبٌ وَمَسْئُولُ

مِنْ ضَيْغَمٍ بِضَرَاءِ الْأَرْضِ مُخْدَرُهُ ... فِي بَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دُونَهُ غِيلُ

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ... مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ

'আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল আমাকে ধমক দিয়েছেন। অথচ তাঁর কাছ থেকে কেবল ক্ষমারই আশা করা যায়।

আপনি দাঁড়ান! ঐ সত্ত্বা আপনাকে হেদায়েত দিয়েছেন, যিনি কুরআন আপনাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছেন। যাতে উপদেশ ও সবিস্তারে দীক্ষা রয়েছে।

আপনি চোগলখোর আর পরনিন্দুকদের কথা শুনতে যাবেন না। যদিও আপনার কাছে আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো অপরাধ করিনি।

এখন আমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছি আর যে সকল কথা শুনছি ও দেখছি, যদি হাতিও সেখানে দাঁড়াত আর সে কথা শুনত ও দেখত

তবে সে থরথর করে কাঁপতে থাকত। কিন্তু পার্থক্য শুধু এখানেই যে, এতে আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর রাসূলের ইহসান রয়েছে।

এ কারণে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই তাঁর হাতের ওপর আমার হাত রেখে দিতে পেরেছি যিনি প্রতিশোধ নিতে পূর্ণ সক্ষম। আর যার কথাই কথা।

এখন আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। অথচ, আমাকে আগে বলা হয়েছে যে, তোমার নামে এমন এমন কথা তাঁর কাছে বলা হয়েছে এবং তোমাকে সেগুলো সম্পর্কে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

তখন তিনি আমার কাছে সেই ব্যঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর ও হিংস্র মনে হচ্ছিলেন পদে পদে ধ্বংসের ফাঁদ পাতা কোনো শ্বাপদসংকুল ঘন উপত্যকার পেটের ভেতরে যার অভয়ারণ্য; যার আগেও বহু ধ্বংসকর খাদ আর ফাঁদ পাতা আছে।

নিশ্চয়ই রাসূল সা. একটি আলো যার থেকে আলো গ্রহণ করা যায়। আল্লাহর এক নাঙ্গা শাণিত তরবারি'।

অতঃপর তিনি কুরাইশ মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করেন। কেননা কা'ব

আসার পর থেকে তাদের একজনও ভালো ব্যতীত তার সঙ্গে কথা বলেনি। আর সেই প্রশংসার মাঝে তিনি আনসারদের সমালোচনা করেন। কেননা তাদের একজন তার ঘাড় আলাদা করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন,

يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمَالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ ... ضَرْبٌ إِذَا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ

'তারা (কুরাইশরা) দৃষ্টিনন্দন উটের মতো সুন্দর করে চলে আর তরবারির হামলা তাদেরকে রক্ষা করে। অথচ বেঁটে আর কালুর দলেরা রাস্তা ছেড়ে দূরে ভাগতে থাকে'।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করার পরে যখন তার ইসলাম সুন্দর হয়ে ওঠে তখন নিজের একটি ক্বাসীদায় তিনি আনসারদের প্রশংসা করেন এবং তাদের শানে অতীতে কৃত ত্রুটিটুকু চুকিয়ে নেন। সেই ক্বাসীদায় তিনি বলেন,

مَنْ سَرَّهُ كَرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَزَلْ ... فِي مِقْنَبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ

وَرِثُوا الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ ... إِنَّ الْخِيَارَ هُمْ بَنُو الْأَخْيَارِ

"মহৎ ও সুন্দর জীবন যার ভালো লাগে। সে যেন সর্বদা আনসারদের শিবিরে থাকে। তারা এ সৌন্দর্য তাদের বাপ-দাদা থেকেই মীরাস সূত্রে পেয়েছে। সত্যি কথা কি, ভালো লোকের সন্তান ভালোই হয়ে থাকে"।

ছয়. উযরার প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়েছিল নবম হিজরীর সফর মাসে। সংখ্যায় তারা ছিলেন বারো জন পুরুষ। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হামযা ইবনে নু'মান। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা কোন্ কওমের লোক? তাদের প্রতিনিধি বললেন, আমরা বনু উযরার লোক। কুসাইর বৈপিত্রেয় বোন। আমরাই কুসাইর হাতকে শক্তিশালী করেছিলাম। আমরাই খুযাআ ও বনু বকরকে মক্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। এখানে আমাদের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাদেরকে স্বাগত জানান এবং তাদেরকে সিরিয়া জয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। জ্যোতিষীদের কাছে যেতে তাদেরকে বারণ করেন। তাদেরকে তিনি সেই সব পশু যবাই করতে নিষেধ করেন, যা তারা যবাই করত। অতঃপর তারা ইসলাম গ্রহণ করে কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করার পরে ফিরে যায়।

সাত. বালীর প্রতিনিধিদল

এ প্রতিনিধি দলটি নবম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে আগমন করে। ইসলাম গ্রহণ করার পরে মদীনায় তিন দিন অবস্থান করে। তাদের সরদার আবু

যুবাইব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মেহমানদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তাতে কোনো সওয়াব আছে কি না? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, হাঁ। **ধনী কিংবা দরিদ্র যার প্রতিই তুমি কোনো ভালো কাজ করবে সেটাই তোমার জন্য সদক্বায় পরিণত হবে।** অতঃপর তিনি মেহমানদারির মুদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, **তিন দিন।** অতঃপর তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুড়িয়ে পাওয়া বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **সেটা তোমার জন্য অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য কিংবা নেকড়ের জন্য।** অতঃপর তিনি কুড়িয়ে পাওয়া উট সম্পর্কে সুওয়াল করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দেন, **তার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তাকে তুমি ছেড়ে দিবে, যাতে করে তার মালিক তাকে পেয়ে যায়।**

আট. সাকীফের প্রতিনিধি দল

তাদের প্রতিনিধি দলটি এসেছিল নবম হিজরীর রমযান মাসে। তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা হলো: অষ্টম হিজরীর যুল কা'দ মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাযওয়ায়ে তায়েফ থেকে ফিরে মদীনায় পৌঁছার আগেই সাকীফ গোত্রের সরদার উরওয়া ইবনে মাসঊদ সাকাফী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে হাযির হন এবং ইসলাম গ্রহণ করে স্বীয় কওমের কাছে ফিরে যান। উরওয়া রা. এর ধারণা ছিল লোকজন তার অনুসরণ করবে। কেননা, তিনি ছিলেন কওমের গণ্যমান্য সরদার। তা ছাড়া কওমের লোকেরা নিজেদের স্ত্রী ও মেয়েদের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবাসত। এ কারণে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। উরওয়ার ধারণা চরম ভুল ছিল। তার মুখে ইসলামের কথা শোনা মাত্রই সবাই চতুর্দিক থেকে তার প্রতি তীর বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করল। এক পর্যায়ে তাকে তারা হত্যাই করে ফেলল। উরওয়াকে হত্যা করার কয়েক মাস পরে তারা পরামর্শ করে দেখল তাদের আশপাশের তামাম আরব কবীলার মুকাবিলা করা একার পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব নয়। কারণ, সে সব কবীলা ইতোমধ্যেই ইসলাম গ্রহণ করে বাইয়াত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তারা কাউকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরামর্শের পরে তারা আবদে ইয়ালীল ইবনে আমরের কাছে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরবারে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি সরাসরি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তার ভয় ছিল তার সঙ্গেও তারা সেই আচরণ করতে পারে, যা করেছিল উরওয়ার সঙ্গে।

অতঃপর তিনি বললেন, আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক দেওয়া ব্যতীত আমি এ কাজ কখনো করতে পারব না। তখন তারা বনু আহলাফের দুই জন ও বনু মালিকের তিন জন মোট পাঁচজনকে তার সঙ্গে দেয়। এতে তাদের সর্বমোট সংখ্যা হয় ছয় জন। তাদের মধ্যে উসমান ইবনে আবুল আস সাক্বাফীও রা. ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের সর্বকনিষ্ঠ।

যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে গিয়ে হাযির হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য মসজিদে নববীর এক পাশে একটি তাঁবু স্থাপন করে দিলেন। যাতে করে তারা সেখানে বসে কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত শুনতে পায় এবং মুসলমানদের নামায আদায়ের দৃশ্য দেখতে পায়। সেখানে থেকে তারা বারবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ আসা-যাওয়া করতে থাকে। আর তিনিও তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকতেন। এক পর্যায়ে তাদের নেতা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে নিবেদন করে যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করতে রাযি আছে যদি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন, যাতে বনু সাকীফকে যিনা, মদ্যপান ও সুদ খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। তাদের জন্য লাতকে ভাঙা থেকে বিরত থাকা হবে। তাদের ওপর থেকে নামায মাফ করে দেওয়া হবে। আর তারা তাদের হাত দ্বারা নিজেদের মূর্তি ভাঙতে পারবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সবগুলি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কোনো গত্যন্তর পেল না। শেষমেশ তারা আত্মসমর্পণ করে ইসলাম গ্রহণ করল। তবে তারা শর্ত ঝুলিয়ে দিলো যে লাতকে ধ্বংস করার দায়িত্ব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিজের নিতে হবে। বনু সাকীফ নিজের হাতে লাতকে কখনো ধ্বংস করতে পারবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ শর্ত মেনে নিলেন। তাদের জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পত্র লিখে দিলেন এবং উসমান ইবনে আবুল আস সাক্বাফী রা. কে তাদের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। কেননা, তাদের সবার চেয়ে তিনিই ছিলেন ইসলামের গভীর জ্ঞান অর্জনের প্রতি বেশি আগ্রহী এবং দীন ও কুরআন শিখতে সর্বাধিক উৎসাহী। তার অর্থ হলো, এই প্রতিনিধি দলটি যতদিন মদীনায় ছিল প্রতিদিন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যেত এবং উসমান ইবনে আবুল আসকে তাদের তাঁবুতে রেখে যেত। এ কারণে যখন তারা ফিরে এসে দ্বিপ্রহরের পর বিশ্রাম নিত উসমান ইবনে আবুল আস রা. তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গিয়ে কুরআন পড়তেন। দীন সম্পর্কে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। আর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নিদ্রায় দেখতেন তখন একই উদ্দেশ্যে আবু বকর রা. এর কাছে চলে যেতেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরে গোটা আরবে যখন ইরতিদাদের তুফান বয়ে চলল। সেই ইরতিদাদের যুগে তার এই আসা যাওয়া পরম বরকতময় প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ বনু সাকীফ যখন সেই তুফানে ভেসে যাওয়ার উপক্রম করেছিল তখন উসমান ইবনে আবুল আস রা. তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে সাকীফ সম্প্রদায়! তোমরা সকলের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলে। তাই এখন সকলের আগে মুরতাদ হয়ে যেও না! তখন তারা মুরতাদ হওয়া থেকে বিরত থাকল এবং ইসলামের ওপর অটল রইল।

অতঃপর প্রতিনিধি দলটি স্বীয় কওমের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু তাদেরকে প্রকৃত ব্যাপার খুলে বলল না। উল্টো তাদেরকে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে ভয় দেখাল। তাদের সামনে চরম দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ প্রকাশ করল। তাদেরকে তারা বলল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছেন। পাশাপাশি তিনি তাদেরকে যিনা, মদ্যপান ও সুদ বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। নতুবা তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। আর ঠিক তখনই মূর্খ যুগের বর্বরতার অভিমান তাদের ওপর জেঁকে বসল। দুই তিন দিন তারা যুদ্ধের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করতে লাগল। কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ তাআলা তাদের হৃদয়ে প্রচণ্ড ভীতি ঢেলে দিলেন। তখন তারা প্রতিনিধি দলকে বলতে লাগল, তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ফিরে যাও! অতঃপর তাকে তাঁর দাবি মেনে নেওয়ার কথা জানিয়ে দাও!! আর তখন প্রতিনিধি দলটি তাদের কাছে প্রকৃত ব্যাপার খুলে বলল। যে ব্যাপারে রাসূলের সঙ্গে তাদের সন্ধি হয়েছে তা প্রকাশ করেন। তখন বনু সাক্বীফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়।

অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে আমীর বানিয়ে লাতকে ধ্বংস করার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। লাতের কাছে এসে মুগীরা ইবনে শুবা রা. একটি গদা নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, বন্ধুগণ! আল্লাহর কসম! এবার আমি তোমাদেরকে সাকীফের ওপর একটু হাসাবো। অতঃপর তিনি গদা দিয়ে লাতের ওপর আঘাত হানলেন। তখন নিজেই ইচ্ছা করে পড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলেন। এই কৃত্রিম দৃশ্য দেখে তায়েফবাসী দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহ মুগীরাকে ধ্বংস করে দিন! দেবী তাকে মেরে ফেলেছে!! তাদের এ কথা শুনে মুগীরা ইবনে শুবা

গা ঝাড়া দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, আল্লাহ তোমাদের খারাপ করুন! এটা তো মাটি আর পাথরের খেলা মাত্র!!! অতঃপর তিনি দরজায় আঘাত করে ফেলে দিলেন। অতঃপর সবচেয়ে উঁচু দেয়ালের ওপর আরোহণ করলেন। তার সঙ্গীরাও তার সাথে উঠলেন। এরপর সেটা ভাঙতে ভাঙতে মাটির সমান করে দিলেন। এরপর তার গোড়ার মাটিও খুঁদতে শুরু করলেন। সেখান থেকে বিভিন্ন অলঙ্কার ও কাপড়-চোপড় বের করেন। সাক্বীফের লোকজন এ দৃশ্য দেখে হতভম্ভ হয়ে যায়। খালিদ রা. সেই অলঙ্কার আর কাপড়-চোপড়সহ ছোট দলটি নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে ফিরে আসেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিনই ওগুলি তাদের মাঝে বণ্টন করে দেন এবং আল্লাহ তাঁর নবীকে সাহায্য ও তাঁর দীনকে সম্মান দান করার কারণে প্রশংসা করেন।[৬৯৬]

নয়. ইয়েমেন-রাজন্যবর্গের পত্র

তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হিময়ারের রাজন্যবর্গের পত্র আসে। তারা ছিলেন হারিস ইবনে আবদে কুলাল, নাঈম ইবনে কুলাল, নু'মান, কাইলু যী রুআইন, হামদান এবং মুআফির প্রমুখ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট তাদের দূত হিসেবে এসেছিল মালিক ইবনে মুররাহ রাহাবী। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের ইসলাম গ্রহণের এবং শিরক ও শিরক পূজারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদ লিখে পাঠিয়েছিল। জবাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি তাদের কাছে একজন মুমিনের কী কী করণীয় আর কী কী বর্জনীয় তা উল্লেখ করেন। তাতে তিনি যিম্মীদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মাহ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন যদি তারা তাদের জিযয়া ঠিকভাবে আদায় করে। তা ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি ক্ষুদ্র জামাত ইয়েমেন পাঠিয়ে দেন। তাদের আমীর ছিলেন মুয়ায বিন জাবাল রা.। মুয়ায বিন জাবাল রা. কে তিনি সাকূন ও সাকাকিকের মধ্যবর্তী আদানের উচ্চভূমিতে নিযুক্ত করেন। সেখানে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ফয়সালা করতেন। সদক্বা-জিযয়া উসূল করতেন। সেখনকার লোকজনকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াতেন। অপরদিকে আবূ মূসা আশআরী রা. কে নিম্নভূমি তথা যুবাইদ, মা'রিব, যামা' ও সাহেলের দিকে প্রেরণ করেন। তাদেরকে তিনি বলে দেন, **তোমরা সহজ করবে! কঠোর করবে**

---

[৬৯৬] যাদুল মাআদ ৩/২৬-২৮। ইবনে হিশাম ২/৫৩৭-৫৪২।

না! সুসংবাদ দিবে! বিরক্ত করবে না! ঐক্যের ওপর থাকবে! মতবিরোধে লিপ্ত হবে না! মুয়ায বিন জাবাল রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত পর্যন্ত ইয়েমেনে এ পদে বহাল থাকেন। কিন্তু আবূ মূসা আশআরী রা. বিদায় হজ্জের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে গিয়ে উপস্থিত হন।

দশ. হামদানের প্রতিনিধি দল

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে নবম হিজরীতে এই প্রতিনিধি দলটি আগমন করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি পত্র লিখে দেন। সে পত্রে তাদের সকল আবদার তিনি অনুমোদন করেন। মলিক ইবনে নামাত কে তাদের আমীর বানিয়ে পাঠান এবং তাঁর কওমের মুসলমানদের জন্য তাকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। পরে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. কে তাদের সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেন। খালিদ রা. দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দিকে ডাকলেন কিন্তু তাদের কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দিলো না। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইবনে আবী তালিব রা. কে প্রেরণ করেন। তাকে তিনি খালিদ রা. কে সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আলী রা. হামদানে এসে সেখানের জনগণের কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র পাঠ করে শুনালেন অতঃপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি ডাকলেন। তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এরপর আলী রা. তাদের ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদের কথা জানিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পত্র লিখলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রা. এর প্রেরিত পত্র পড়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন, **হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হামদানের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!!**

এগারো. বনু ফাযারার প্রতিনিধি দল

তাবুক থেকে ফিরে আসার পরে নবম হিজরীতে এই প্রতিনিধি দলটির আগমন হয়েছিল। তাদের সদস্যসংখ্যা ছিল দশজনের চেয়ে একটু বেশি। তারা মুসলমান হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে তাদের দেশের অনাবৃষ্টির ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করে দুই হাত আল্লাহর কাছে তুলে বৃষ্টি প্রার্থনা করলেন এবং বলতে লাগলেন, **হে আল্লাহ! আপনি আপনার রাজ্যের ওপর ও আপনার জন্তু-জানোয়ারের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।** **আপনার রহমতের ডানা**

ছড়িয়ে দিন। আপনার মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করে তুলুন। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করুন যা আমাদের সাহায্যকারী হবে। প্রশান্তি সৃষ্টি করবে। সবুজ-শ্যামল চমৎকার হবে। তাড়াতাড়ি আসবে দেরি করবে না। উপকারী হবে; ক্ষতিকর নয়। হে আল্লাহ! রহমতের বৃষ্টি; গযবের বৃষ্টি নয়। ধ্বংসকারী; নিমজ্জিতকারী কিংবা বিলুপ্তকারী বৃষ্টি নয়। হে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন! আর দুশমনের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন![৬৯৭]

বারো. নাজরানের প্রতিনিধি দল

মক্কা থেকে ইয়েমেনের দিকে সাত মঞ্জিল দূরে অবস্থিত নাজরান। এখানে তিয়াত্তরটি বসতি ছিল। পুরো অঞ্চলটি একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী এক দিনে ঘুরে আসতে পারত।[৬৯৮] সেখানে এক লক্ষ যোদ্ধা পুরুষ ছিল; যাদের সবাই ছিল খ্রিস্টান।

নাজরানের প্রতিনিধি দলটির আগমন ঘটেছিল নবম হিজরীতে। এই প্রতিনিধিদলে ছিল ষাট জন পুরুষ; তাদের মধ্যে চব্বিশ জন ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। আর তিন জন ছিল প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তিন জনের এক জন ছিল আকেব-নেতৃত্ব আর শাসন ক্ষমতা ছিল তার হাতে। এ ব্যক্তির নাম ছিল আব্দুল মাসীহ। দ্বিতীয় জন ছিল সাইয়েদ- সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হতো। তার নাম ছিল আইহাম বা শুরাহবীল। তৃতীয় জন ছিল আসকাফ-ধর্মীয় নেতৃত্ব আর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের চাবি ছিল তার কাছে। তার নাম ছিল আবু হারেসা ইবনে আলকামা।

এ প্রতিনিধি দলটি যখন মদীনায় এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মুলাকাত করল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কিছু প্রশ্ন করলেন। আর তারাও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু প্রশ্ন করল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তাদেরকে কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করে শুনালেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রইল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চাইল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন অপেক্ষা করলেন অতঃপর তাঁর ওপর নিম্নের আয়াতগুলি অবতীর্ণ হলোঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٩)
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ (٦٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ

---

৬৯৭ যাদুল মাআদ ৩/৪৮।
৬৯৮ ফাতহুল বারী ৮/৯৪।

الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (٦١)

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমেরই মতো। তাকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তুমি সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই কাহিনী সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তাহলে বলো- এসো, আমরা ডেকে নেই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের এবং আমাদের স্ত্রীদের ও তোমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদেরকে। তারপর চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আলে ইমরান:৫৯-৬১]

পরদিন ভোরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলোর আলোকে তাদের সামনে ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. সম্পর্কে নিজের মতাদর্শ পেশ করেন। এরপর তাদেরকে এ বিষয়ে একদিন ভেবে দেখার সময় দেন। কিন্তু তারা ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. সম্পর্কে এ মতাদর্শ মেনে নিতে রাযি হয় না। পরদিন ভোরে যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের প্রত্যাখ্যানের সংবাদ জানানো হলো এবং তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রইল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'মুবাহালা'র প্রতি আহ্বান করলেন এবং নিজে প্রিয় দুই দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন রা. কে নিয়ে তাশরীফ আনলেন। নবী নন্দিনী ফাতেমা রা. তাঁর পেছনে পেছনে চলছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই উদ্যোগ আর আয়োজন লক্ষ করল তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে নির্জনে শলা-পরামর্শে বসল। আকিব এবং সাইয়েদ প্রত্যেকের একে অপরকে বলল, এমনটা করতে যেও না! আল্লাহর কসম! তিনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন আর একে অপরকে অভিসম্পাত করেন তবে আমরা আর আমাদের বংশধরদের সফলতার কোনো কায়দা নেই। আমাদের একটি চুল কিংবা নখও পৃথিবীর বুকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিলো তাদের ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে 'হাকীম' তথা ফয়সালাকারী বানাবে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল, আপনি যা চেয়েছেন তা আপনাকে আমরা দিতে রাযি আছি। এই আবদারের পরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে জিযয়া কবুল করে নিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই হাজার জোড়া কাপড় (এক হাজার জোড়া রজব মাসে আর দ্বিতীয়

হাজার জোড়া সফর মাসে প্রদেয়) এবং প্রত্যেক জোড়াার সঙ্গে এক উকিয়া (তথা একশ' বায়ান্ন তোলা রৌপ্য) প্রদানের শর্তে তাদের সঙ্গে সন্ধি করলেন। এর বিনিময়ে তাদেরকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা প্রদান করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে একটি পত্র লেখেন। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠানোর আবদার জানায়। তিনি তখন 'আমীনুল উম্মাহ' নামে খ্যাত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা. কে সন্ধির মাল গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেন।

অতঃপর ইসলামের আলো ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সীরাত বিশেষজ্ঞজনের বর্ণনায় পাওয়া যায়, নাজরানে ফিরে যাওয়ার পর সাইয়েদ ও আকেব উভয়ে মুসলমান হয়ে যান। তা ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিযয়া ও সদক্বা উসূল করার জন্য আলী রা. কে প্রেরণ করেন। যদি তারা মুসলমান না-ই হয়ে থাকে তবে তাদের কাছে সদক্বা উসূলের জন্য লোক পাঠানো সম্ভব কী করে? [৬৯৯]

তেরো. বনু হানীফার প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলটি এসেছিল নবম হিজরীতে। তাতে সদস্য সংখ্যা ছিল সতেরো জন। একজন ছিল 'মুসাইলামাতুল কায্যাব'[৭০০]। এই ছিল বনু হানীফার সেই মুসাইলামা ইবনে সুমামা ইবনে কাবীর ইবনে হাবীব ইবনে হারিস। তারা মদীনায় এসে একজন আনসারীর ঘরে ওঠে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। মুসাইলামাতুল কায্যাব সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। তবে সবগুলির মিলনে যে নির্যাসটুকু বের হয় তা হলো, শুরু থেকেই মুসাইলিমার মধ্যে গর্ব, অহঙ্কার, বড়াই আর নেতৃত্বের দারুণ খায়েশ ছিল। আর সে অন্যান্য প্রতিনিধি সদস্যের সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির হয়নি। প্রথমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে ভালো কথা ও কাজের মাধ্যমে তার দিলজুয়ীর চেষ্টা করেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন বুঝতে পারলেন তাতে আদৌ কোনো ফায়েদা হবে না তখন তিনি তার ইতরামি ধরে ফেললেন।[৭০১]

---

[৬৯৯] ফাতহুল বারী ৮/৯৪-৯৫। যাদুল মাআদ ৩/৩৮-৪১। কিন্তু নাজরান প্রতিনিধি দলের আগমনের অবস্থা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারও কারও মতে, তারা মোট দু'বার এসেছিল। তথাপি আমাদের নিকট যেটি অগ্রাধিকার পেয়েছে আমরা আমাদের গ্রন্থে সেটিই লিখে দিয়েছি।

[৭০০] ফাতহুল বারী ৮/৮৭।

[৭০১] দেখুন সহীহ বুখারীঃ বনু হানীফা প্রতিনিধি দল অধ্যায় এবং আসওয়াদ আনাসীর ঘটনা অধ্যায় ২/৬২৭, ৬২৮। ফাতহুল বারী ৮/৮৭-৯৩।

ইতঃপূর্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, পৃথিবীর সকল ধন ভাণ্ডার তাঁর পদতলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দু'টি স্বর্ণবালা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে এসে পড়ে। এতে তিনি দারুণ ভারীত্ব ও বোঝা অনুভব করলেন। তখন তাঁর কাছে ওহী এলো- এ দু'টির ওপর ফুঁক দিন! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুঁক দিলে অমনি তা উড়ে যায়। তখন তিনি এর তা'বীর করলেন, তাঁর পরে দু'জন কায্যাব বের হবে। অতঃপর যখন মুসাইলিমাতুল কায্যাব থেকে চরম বিরক্তি প্রকাশ পেল আর সে বলতে লাগল, যদি মুহাম্মাদ তার পরে এ আসন আমাকে দেওয়ার কথা দেয়, তবে আমি তাঁর অনুসরণ করব। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে এলেন। এ সময় রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতে খেজুরের একটি ডাল ছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল 'খতীবে ইসলাম' সাবেত বিন কায়স বিন শাম্মাস রা.। মুসাইলিমা ও তার সঙ্গীদের কাছে এসে তিনি থেমে গেলেন। অতঃপর মুসাইলিমা তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, যদি আপনি চান তবে আমরা আপনার সামনে নেতৃত্বের পথ থেকে সরে দাঁড়াবো। তবে শর্ত হলো, আপনার পরে এটা আমার হাতে তুলে দিতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **যদি তুমি আমার কাছে খেজুরের এই শাখাটিও চাও, তাও আমি তোমাকে দিব না! আর তোমরা তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে কখনো উঠতে পারবে না!! আর যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আল্লাহ তোমাকে পঙ্গু বানিয়ে রেখে দিবেন। আল্লাহর কসম! তোমাকে তো আমার সেই লোকই মনে হচ্ছে- যাকে আমি স্বপ্নে দেখেছি। আর এ হলো সাবেত, আমার পক্ষ থেকে সে তোমার জবাব দিবে।** অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন।

পরিশেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণাই সত্য প্রমাণিত হলো। ইয়ামামা ফিরে যাওয়ার পরে মুসাইলিমা নিজের ব্যাপারে বহু চিন্তা-ভাবনা করল। এক পর্যায়ে সে দাবি করে বসল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে নবুওতের দায়িত্বে তাকেও শরীক করা হয়েছে। অতঃপর সে নবুওতের দাবি করল এবং বিভিন্ন অন্ত্যমিল বিশিষ্ট কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। সে তার কওমের জন্য মদ্যপান ও ব্যভিচারকে হালাল ঘোষণা করল। কিন্তু পাশাপাশি সে এই সাক্ষ্যও দিত যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর নবী। এই স্থূল চক্রান্তের জালে তার কওমের লোকেরা আটকা পড়ে গেল এবং তাঁর অনুসরণ করে উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলো। দিনে দিনে তার ব্যবসা দারুণ জমজমাট হয়ে উঠল। এক পর্যায়ে সম্মানের আতিশয্যে তাকে বলতে শুরু

করল, 'রহমানুল ইয়ামামা' তথা ইয়ামামার রহমান। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরাবর একটি পত্র লিখল, নবুওতে আমাকে আপনার সঙ্গে শরীক করা হয়েছে। তাই অর্ধেক প্রশাসন আমার আর বাকি অর্ধেক প্রশাসন কুরাইশের। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জবাবে লিখলেন, **এ জমিন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। আর উত্তম পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যই।**[৭০২]

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, ইবনে নাওয়া ও ইবনে উসাল মুসাইলামার দূত হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে উপস্থিত হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, **তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল?** তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, মুসাইলিমা আল্লাহর রাসূল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, **আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনলাম। যদি আমি কোনো দূতকে হত্যা করতাম তবে আজ তোমাদের দু'জনকে হত্যা করে দিতাম।**[৭০৩]

মুসাইলামা নবুওতের দাবি করেছিল হিজরী দশম বছরে। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরে আবু বকর রা. এর খেলাফতকালে হিজরী দ্বাদশ বছরে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা প্রাণ হারায়। তাকে হত্যা করেছিলেন হামযা রা. এর হত্যাকারী ওয়াহ্‌শী রা.। আর ইয়েমেনে বসবাসকারী আরেক ভণ্ড নবী ছিল আসআদ আনাসী। তাকে হত্যা করেছিলেন ফাইরূয রা.। এটা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের মাত্র এক দিন এক রাত আগের ঘটনা। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এটা জানতে পেরে সাহাবায়ে কেরামকে সংবাদ দিয়েছিলেন। অতঃপর নবীজীর ওফাতের পরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আবু বকর রা. এর কাছে ইয়েমেন থেকে এ সংবাদ এসে পৌঁছে।[৭০৪]

চৌদ্দ. বনু আমের বিন সা'সা'র প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলে আল্লাহর দুশমন আমের বিন তুফাইল, লাবীদের বৈপিত্রেয় ভাই আরবাদ ইবনে কায়স, খালিদ বিন জা'ফর ও জাব্বার ইবনে আসলাম প্রমুখ ছিল। এরা সবাই ছিল নিজেদের কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোড়া শয়তান। আল্লাহর দুশমন এই আমের বিন তুফাইল বীরে মাউনার সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে

[৭০২] যাদুল মাআদ ৩/৩১,৩২।
[৭০৩] মুসনাদে আহমদ। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৩৪৭।
[৭০৪] ফাতহুল বারী ৮/৯৩।

বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। যখন তারা মদীনায় আসার সিদ্ধান্ত নিলো তখন আমের ও আরবাদ শলা পরামর্শ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করল। প্রতিনিধি দলটি এলে আমের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকে। আর আরবাদ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। এক পর্যায়ে সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাথার মাঝ বরাবর সজোরে নাঙ্গা তরবারি চালায়। কিন্তু আল্লাহ তার হাতকে থামিয়ে দেন। ফলে মাথার এক বিঘত দূরে থাকতে তরবারি থেমে যায়। আল্লাহ পাক এভাবে তাঁর নবীকে রক্ষা করেন। তিনি তাদের জন্য তখন বদ দুআ করলেন। ফলে ফেরার পথে আরবাদ উটসুদ্ধ বজ্রপাতে ভস্মিভূত হয়ে যায়। আর আমের গিয়ে এক সালূলী মহিলার ঘরে ওঠে। আর সেই মুহূর্তে তার ঘাড়ে একটি ফোঁড়া ওঠে। সে তখন এ কথা বলতে থাকে, উটের মতো ফোঁড়া..........!..........সালূলীয়া মহিলার ঘরে মৃত্যু.........!! এ অবস্থায় এ ইসলাম বিদ্বেষীর মৃত্যু হয়।

সহীহ বুখারী শরীফে এসেছে, আমের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, আমি আপনাকে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি- এক. আপনার জন্য উপত্যকাবাসী আর বসতিবাসী আমার জন্য। দুই. আপনার পরে আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত হবো। তিন. নতুবা আমি এক হাজার ঘোটক আর এক হাজার ঘোটকী নিয়ে বনু গাতফানকে সঙ্গে করে আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামব। তখন সে এক মহিলার ঘরে প্লেগাক্রান্ত হয়। সে আফসোস করে বলতে থাকে, উটের মতো ফোঁড়া! অমুক গোত্রের এক মহিলার ঘরে আশ্রয়!! তোমরা আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। তারপর সে ঘোড়ায় চড়লে তার পিঠেই মরে রইল।

পনেরো. তুজীবের প্রতিনিধি দল

এই প্রতিনিধি দলটি তাদের দরিদ্র লোকদেরকে দেওয়ার পর উদ্বৃত্ত সদকা নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে হাযির হয়েছিল। তাদের সদস্য ছিল ১৩ জন। তারা কুরআন ও সুন্নাতই শেখার জন্য বিভিন্ন সুওয়াল করত। অন্যান্য বিষয় নিয়েও তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তা লিখে দেন। তারা মদীনায় বেশি দিন অবস্থান না করেই ফিরে যায়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে উপঢৌকন দিলেন তখন তারা তাঁবুতে থাকা একটি যুবককেও পাঠিয়ে দিলো।

যুবকটি এসে দরবারে নবুওতে আরয করল, আল্লাহর কসম! আমি আমার শহর থেকে এ জন্যই এসেছি যে, আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করবেন যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন, আমার ওপর রহমত করেন এবং আমার সমৃদ্ধি আমার হৃদয়ের মাঝে রেখে দেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য সে দুআ করলেন। ফলে সে-ই মানুষের মাঝে সবচেয়ে অল্পেতুষ্টে পরিণত হয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরে যখন গোটা আরবে ইরতিদাদের তুফান বইতে ছিল তখন যুবক সেই তুফানে নিজের কিশতী তো ডুবতে দিলোই না; উল্টো নিজের কওমকে ওয়ায-নসীহত করতে লাগল। ফলে তারাও নিজেদের ইসলামের ওপর অটল রইল। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় তারা দ্বিতীয় বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে মুলাকাত করে।

ষোলো : তাঈর প্রতিনিধি দল

এ প্রতিনিধি দলটি যখন আসে তখন তাদের মধ্যে যায়দ খাইল নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে কথা বলল এবং তিনি তাদের সামনে ইসলাম পেশ করেন তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং তাদের ইসলাম অনেক সুন্দর হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়দের প্রশংসা করতে গিয়ে একবার বললেন, **যে আরব সম্পর্কেই আমার কাছে প্রশংসা করা হয়েছে, এর পর সে আমার কাছে এসেছে, তখন আমি তার মধ্যে কিছু ক্রুটি দেখতে পেয়েছি। তবে যায়দ খায়লই একমাত্র ব্যক্তিত্ব, যার সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল তার থেকে আরও বেশি কিছু ছিল।** তিনি যায়দ খাইল (ঘোড়া) এর নাম পরিবর্তন করে যায়দ খাইর (সর্বোত্তম) দিয়েছিলেন।

এভাবে নবম ও দশম হিজরীতে একের পরে এক প্রতিনিধি দলের আগমন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। সীরাত ঐতিহাসিকগণ এতে আহলে ইয়েমেন, উযদ, কুযায়ার বনু সা'দ হুযাইম, বনু আমের ইবনে কায়স, বনু আসাদ, বাহরা, খওলান, মুহারিব, বনু হারিস বিন কা'ব, গামেদ, বনু মুনতাফিক, সালামান, বনু আবস, মুযাইনা, মুরাদ, যুবাইদ, কিন্দা, যু মুররাহ, গাস্সান, বনু ঈস ও নাখআর প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করেন। নাখ' ছিল সর্বশেষ প্রতিনিধি দল। একাদশ হিজরীর মুহাররমের মাঝামাঝি সময়ে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে হাযির হয়। তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল এক শ' জন। এই প্রতিনিধি দলের সিংহভাগ আগমন করেছিল নবম ও দশম হিজরীতে। হাতে গনা কয়েকটি এসেছিল সর্বশেষ একাদশ হিজরীতে।

এভাবে একের পর এক প্রতিনিধি দলের আগমন দ্বারাই বোঝা যায় ইসলাম তখন কতটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও কবুলিয়াত লাভ করেছিল। গোটা জাযীরাতুল আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিধি কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তখন গোটা আরব মদীনার দিকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে তাকাতো। এক পর্যায়ে তারা এর সামনে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত পালানোর আর কোনো ফাঁক ফোঁকরই খুঁজে পেল না। মদীনা গোটা জাযীরাতুল আরবের রাজধানী শহরে পরিণত হয়েছিল। এ থেকে এখন আর চোখ কিংবা মুখ ফিরিয়ে রাখার সুযোগ ছিল না কারোরোই। এত কিছুর পরেও আমরা এ কথা বলতে পারব না যে, ইসলাম তখন এ বিশাল জনগোষ্ঠীর সবার অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সবার হৃদয়ের গভীরে স্থান লাভ করেছিল। কেননা, এ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে অনেক বর্বর বেদুঈন ছিল, যারা তাদের সরদারের ইসলামের অনুবর্তী হয়ে মুসলমান হয়েছিল। নতুবা মারামারি আর কাটাকাটির প্রতি যে জন্ম থেকে জন্মান্তরের তাদের এক গভীর ঝোঁক ছিল তা থেকে তারা তখনো মুক্ত হতে পেরেছিল না। আর ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা তখনো তাদেরকে পুরোপুরি সভ্য ও সংস্কৃতিমান করে তুলতে পেরেছিল না।

কুরআনে কারীম তাদের এক দলের দশা বর্ণনা করছে ঠিক এভাবে–

ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٩٧) وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফিকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুত আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। আবার কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে, যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কি না সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। [সূরা তাওবাহ:৯৭-৯৮]

আর অপর এক দলের প্রশংসা করছে এভাবে:

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

আর বেদুঈনদের মধ্যে থেকে কিছু লোক এমন আছে, যারা ঈমান আনে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো রেখ! তাই হল তাদের জন্যে নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। [সূরা তাওবাহ:৯৯]

তবে মক্কা, মদীনা, সাক্বীফ এবং ইয়েমেন ও বাহরাইনের অধিকাংশ নগরীর অধিবাসীসের মধ্যে ইসলাম সুদৃঢ় আসন লাভ করেছিল। তাদের হৃদয় ও মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আর এ কারণে তাদের মধ্যেই বড় বড় সাহাবী ও ইসলামের ইতিহাসের সুযোগ্য সিপাহসালার তৈরি হয়েছিলেন।[৭০৫]

দাওয়াতের সফলতা ও তার ফলাফল

নবী জীবনের আখেরী দিনগুলো দেখার জন্য যাত্রা শুরুর আগে আমরা এখন সংক্ষিপ্তভাবে তাঁর ঐ অম্লান কীর্তি আর বিশ্ব সভ্যতার মঞ্চে তাঁর গৌরবময় অবদানের প্রতি আরেকবার নজর বুলিয়ে নিব, যা ছিল তাঁর মুবারক হায়াতের সার-নির্যাস। তাঁর পবিত্র যিন্দিগির প্রধান অর্জন; আর এটাই ছিল সেই বস্তু, যার দ্বারাই তিনি সকল নবী ও রাসূলের চেয়ে ভিন্ন এক শোভা-সৌন্দর্যে বিভূষিত ছিলেন। যার বদৌলতেই আল্লাহ তাআলা তাকে গোটা মানব জাতির নেতৃত্বের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

নবুওতের ময়দানে নেমে আসার প্রাথমিক দিনগুলোতে তাকে বলা হয়েছিল, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে..... এবং يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন.......। আর তখনই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। একটানা বিশ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে নবুওতের পুরো জীবন ভরে দাঁড়িয়েই ছিলেন। গোটা

---

৭০৫ মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়া গ্রন্থে খিযরীর বক্তব্য ১/১৪৪। দরবারে রিসালতে আগত এ সকল প্রতিনিধি দলের বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন: সহীহ বুখারী ১/১৩, ২/৬২৬-৬৩০। ইবনে হিশাম ২/৫০১-৫০৩, ৫১০-৫১৪, ৫৩৭-৫৪২, ৫৬০-৬-১। যাদুল মাআদ ৩/২৬-৬০। ফাতহুল বারী ৮/৮৩-১০৩।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আমানতের বোঝাটি কাঁধে তুলে নিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন যিন্দিগির প্রতিটি দিন আর রাত। তা ছিল গোটা মানব সভ্যতার বোঝা; বিশ্বাসের বোঝা; জীবনের বিভিন্ন মঞ্চে আর ময়দানে সংগ্রাম আর সমরের বোঝা।

সর্বপ্রথম তিনি মানব মনের ঐ ময়দানে মেহনত আর সংগ্রামের সাধনা শুরু করেছিলেন, জাহেলিয়াতের কুসংস্কার আর ভ্রান্ত দর্শনের বধ্যভূমিতে পড়ে যা পচে গলে দিনে দিনে শেষ হয়ে যাচ্ছিল। ভূপৃষ্ঠ ও তার উষর আবেদনের মুখে যাতে দিনে দিনে শেওলা জন্মে ভারী আস্তরণের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। নেতিবাচক বাসনার নিগড়ে আটকে পড়ে যা মাথা নীচু করে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল। যার গলায় শাহওয়াতের ফাঁস লেগে জিহ্বা বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর যখন তিনি জাহেলিয়াতের আবর্জনার এ স্তূপ ঠেলে, ক্লেদাক্ত জীবনের পুঞ্জীভূত অভিশাপ থেকে কিছু মনকে পাক-সাফ ও সুনির্মল করে তুললেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাকে জীবনের আরেক ময়দানে নয়া রঙের আরেক সংগ্রামে; বরং সংগ্রামের পর সংগ্রামে জড়িয়ে যেতে হয়েছিল।

এ ময়দানে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল আল্লাহর দাওয়াতের ঐ সব দুশমন- যারা তাঁর নিজের ও তাঁর অনুসারীদের পেছনে না খেয়ে লেগেছিল। যারা সুন্দর স্বপ্নভরা ও সম্ভাবনাময় এ ভবিষ্যৎটুকু অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে হামেশা খড়্গহস্ত ছিল। যারা কোনোমতেই চাইত না সম্ভাবনার এ চারাটি বড় হোক, মাটির শূন্য বুক এর শিকড় ভরে ফেলুক, এর শাখা-প্রশাখা সুনীল দিগন্তে বিস্তৃত হোক, এর ফুলে ফলে ও শান্তির ছায়ায় গোটা পৃথিবী পূর্ণ ও সমৃদ্ধ হোক।

অতঃপর যখন জাযীরাতুল আরবের প্রতিটি ময়দানে কৃত দায়িত্ব সম্পন্ন করে তিনি হাত ঝেড়ে ঘরমুখী হয়েছিলেন, ঠিক সেই সময় রোমানরা জেগে উঠে জীবনের ময়দানে নেমে এসেছিল। তাঁর এই নতুন উম্মতের বিরুদ্ধে একটা ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। তার উত্তর সীমান্তের শাখাগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য সব ধরনের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছিল।

এত কিছুর মাঝেও জীবনের প্রাথমিক দিনগুলির কথা কিন্তু তিনি ভুলতে পারেননি। আর তাই তাঁর সেই ময়দানের সংগ্রাম ও সাধনাও এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকেনি। সেটা ছিল এক শাশ্বত সংগ্রাম। ইবলীস সবসময়ই সে ময়দানে দুষ্কর্মের খুটি দিচ্ছিল। মানব মনের গহীন তলদেশে ঢেউ ভাঙার কাজ থেকে সে কোনোদিনও বিরত থাকতে পারছিল না। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেখানে আল্লাহর দাওয়াতের অতন্দ্র প্রহরী। তার বিভিন্ন ময়দানের নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ। গোটা দুনিয়া উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়েছিল। কিন্তু তিনি তার প্রতি ফিরেও তাকাননি। সংকীর্ণ জীবনের সরু গলিই

তার কাছে পৃথিবীর বড় প্রশস্ত ময়দান মনে হতো। মুমিনরা তাঁর চারপাশে শান্তি আর নিরাপত্তার সবুজ গালিচা বিছিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু মেহনত আর পরিশ্রমের কঠোর মাটিই তাঁর কাছে এই পেলব গালিচার তুলনায় অধিক প্রিয় ছিল। দিন-রাত টানা মুজাহাদা করতেন। কিন্তু এ সবে ধৈর্য ধরতেন অতি সুন্দরভাবে। গভীর রাতের আঁধারে সুখময় সুকোমল বিছানা ছেড়ে আপন মালিকের সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। আপন রবের ইবাদতে বিভোর হয়ে যেতেন। থেমে থেমে হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে প্রভুর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। গোটা পৃথিবী থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে পরম প্রিয়ের প্রতি আত্মনিবেদনের সরোবরে ডুবে থাকতেন- ঠিক যেমনটি তাঁর প্রভুর নির্দেশ ছিল।[৭০৬]

এভাবে টানা বিশ বছরেরও বেশি সময় জীবন যুদ্ধের ময়দানে সমরে সংগ্রামে সাধনা করেছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে জীবনের অন্য কোনো আহ্বান তাকে এ ময়দান বিমুখ করতে পারেনি। এতে করে একসময় ইসলামী দাওয়াত এতটা বিস্ময়কর সফলতা লাভ করে যে, মানবীয় বিবেক তার সামনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। গোটা জাযীরাতুল আরব তার সামনে মাথা নত করে সালাম ঠুকতে ছিল। আরবের আকাশ থেকে জাহেলিয়াতের ধূলি-মেঘ কেটে গিয়েছিল। অসুস্থ আর ব্যারাম-ভোগা প্রাণগুলি শিফা ও সুস্থতা লাভ করেছিল। এতদিনের পূজিত মূর্তিগুলি শুধু ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলো না; বরং সেই বেকুবির ক্ষতিপূরণ হিসেবে সেগুলির হাড়গোড় ভেঙে ঘরের বাইরে ফেলে দিয়েছিল। নীল আসমানের সুনীল দিগন্ত তাওহীদের ঘোষণায় থেকে থেকে শিহরিত হয়ে উঠছিল। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় প্রতিটি মসজিদের মিনারা থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল আযানের মিষ্টি-মধুর সুর; মহাশূণ্যের বুক চিরে দুস্তর মরু-সমুদ্রের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিল। নতুন এ ঈমান হাজার বছরের মৃত এ মরু-মাতাকে আবার জীবিত করে তুলেছিল। ক্বারীগণ কুরআনে কারীমের আয়াত তেলাওয়াত করতে এবং আল্লাহর আহকাম প্রতিষ্ঠা করতে উত্তর ও দক্ষিণের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছিল।

যূথভ্রষ্ট গরু-ছাগলের মতো বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ জাতি-গোষ্ঠীগুলি ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। মানুষের গোলামি থেকে মানুষ আল্লাহর গোলামির দিকে দিশা পেয়েছিল। সুতরাং, তাদের কে জয়ী আর কে পরাজিত তা দেখার সুযোগ ছিল না। কে মনিব আর কে গোলাম তার প্রতি তাকানোর সময় ছিল না। কে রাজা আর কে প্রজা তার বাছ-বিচার করার উপায় ছিল না। কে যালিম আর কে মযলুম তা নির্ধারণ করার কোনো পদ্ধতি ছিল না। বরং সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা; সবাই ভাই ভাই; তারা একে অপরকে ভালোবাসে; সবাই মিলে

---

[৭০৬] তাফসীরে যিলালুল কুরআনে সাইয়েদ কুতুব শহীদ র. এর বক্তব্য ২৯/১৬৮, ১৬৯।

তাঁর বিধান মেনে চলে। জাহেলিয়াতের অসার জাত্যভিমান আর বাপ-দাদাদের নিয়ে বুক ফুলিয়ে গল্প বলার দিন আল্লাহ তাআলা শেষ করে দিয়েছিলেন। আরবের ওপর আজমের কিংবা আজমের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বাকি ছিল না। কালোর ওপর লালের কোনো ফযীলত ছিল না। হাঁ তাকওয়াই ছিল সব ফযীলত আর শ্রেষ্ঠত্বের সঠিক মানদণ্ড। সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরি।

এভাবে এ দাওয়াতের বদৌলতে জাযীরাতুল আরব এক হয়ে গিয়েছিল। বরং গোটা বিশ্ব মানব সভ্যতা এক প্লাটফরমে চলে এসেছিল। সামাজিক ইনসাফ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। দুনিয়ার মুশকিল আর আখেরাতের মাসআলার সমাধানের ক্ষেত্রে মানবতার কপাল খুলে গিয়েছিল। সময় আর কালের স্রোতে দারুণ এক বিপ্লব এসেছিল। পৃথিবীর চিত্র ও মানচিত্র পাল্টে গিয়েছিল। ইতিহাসের বাঁক ঘুরে গিয়েছিল। বুদ্ধি আর বিবেকের মাপকাঠি বদলে গিয়েছিল।

এ দাওয়াত প্রচারের আগে গোটা বিশ্বের ওপর জাহেলিয়াতের রাজত্ব ছিল। গোটা পৃথিবীর কল-কব্জা মূর্খতার জালে আটকা পড়েছিল। তার ভেতরের সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার রূহে পচন ধরেছিল। তার দাঁড়িপাল্লার দাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল। যুলুম আর উবূদিয়্যত সবকিছুর ঠাকুর হয়ে বসেছিল। একদিকে নাজায়েয বিলাসিতার বিকৃত হাসি অপরদিকে চরম বঞ্চনার হাহাকার প্রচণ্ড ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে তার পাঁজরের হাড়গুলি ভেঙে দিচ্ছিল। কুফর, গোমরাহী আর অন্ধকার তাকে দশদিক থেকে পেঁচিয়ে ধরেছিল। অথচ, তখনো পৃথিবীর বুকে বহু আসমানি ধর্ম বিদ্যমান ছিল। থাকলে কী হবে- বিকৃতির মরণ দশা সেগুলিকে বহু আগেই পেয়ে বসেছিল। দুর্বলতার মহামারী সেগুলির প্রতিটি অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। মানবাত্মার ওপর তাদের সমস্ত প্রভাব হারিয়ে সেগুলি নির্জীব প্রথা-পার্বণে পরিণত হয়েছিল- যার ভেতরে জীবনের কোনো গুঞ্জন ছিল না; যাতে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

অতঃপর এই দাওয়াত যখন জীবনের ময়দানে নেমে এসে তার কারিশমা দেখাতে শুরু করল, তখন মানুষের রূহ আর আত্মাগুলিকে সে কুসংস্কার ও বদগুমানি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। উবূদিয়্যত আর গোলামীর নিগড় থেকে নাজাত দিয়েছিল। পচে গলে শেষ হয়ে যাওয়া থেকে রেহাই দিয়েছিল। ধ্বংস আর অধঃপতন থেকে বেকসুর খালাস দিয়েছিল। একইভাবে সে মানব সমাজকে যুলুম ও অত্যাচার থেকে, বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা থেকে, বিভিন্ন শ্রেণীর দলাদলি থেকে রক্ষা করেছিল। বর্বর শাসকদের খামখেয়ালী, ধাপ্পাবাজি থেকে মুক্তি দিয়েছিল। শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত ছিল না। এর বিপরীতে সে পবিত্রতা ও নির্মলতা,

নিপুণতা ও সৃজনশীলতা, আযাদী ও স্বাধীনতা, মারেফাত ও ভরসা, ঈমান ও আস্থা, আদালত ও মহানুভবতার ওপর ভিত্তি করে এমন একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেখানে সর্বদা উন্নত জীবনের জয়গান শোনা যেত। যেখানে প্রত্যেককে প্রত্যেকের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হতো।[৭০৭]

এভাবে এ সকল ইতিবাচক বিবর্তনের বদৌলতে জাযীরায়ে আরাবিয়্যা এমন একটি মুবারক রেনেসাঁর সুনির্মল দৃশ্য দেখতে সক্ষম হয়েছিল, সৃষ্টির সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত জনমেও যা সে কোনোদিন দেখেনি। জীবনের অবিস্মরণীয় এই দিনগুলিতে তার ইতিহাস যতটা ঝলমলিয়ে উঠেছিল, এর আগে আর কোনোদিন তা এতটা ঝলমলিয়ে উঠেনি।

[৭০৭] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র. প্রণীত মা- যা খাসিরাল আলামু বিনহিতাতিল মুসলিমীন গ্রন্থে সাইয়েদ কুতুব শহীদ র. লিখিত ভূমিকা।

বিদায় হজ্জ

দাওয়াতের কাজ শেষ হলো। দুনিয়াবাসীর কাছে রিসালত পৌঁছানোর দায়িত্ব সুসম্পন্ন হলো। আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালতের ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্ব সমাপ্ত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তে কোত্থেকে যেন এক অজানা আর অজ্ঞাত গুঞ্জন ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। সে ধ্বনি নিঃশব্দে যেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে কানে বলে দিচ্ছিল- পৃথিবীতে আপনার মুবারক অবস্থানের মুদ্দত প্রায় শেষ হয়ে এলো; এবার বিদায় যাত্রার আয়োজন করুন! এমনকি দশম হিজরীতে তিনি যখন মুয়ায রা. কে ইয়েমেনে প্রেরণ করছিলেন তখন তিনি তাকে প্রদত্ত ওসীয়তের মধ্যে এমন একটি কথা বলেছিলেন- **মুয়ায! এ বছরের পর সম্ভবত তুমি আমাকে আর দেখবে না! বরং সম্ভবত আমার এই মসজিদ আর আমার এই কবরের পাশ দিয়ে গমন করবে!!** রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে বিরহ বেদনায় মুয়ায রা. তখন ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন।

এ সময় আল্লাহ তাআলার ইরাদা হলো আপন নবীকে তাঁর দাওয়াতের ফল দেখিয়ে নয়ন জুড়িয়ে দিবেন। দীর্ঘ কুড়ি বছরেরও বেশি সময় যে পথে শত প্রকারের কষ্ট ও মুসিবত সহ্য করেছেন সে পথের ব্যাপ্তি বুঝিয়ে দিবেন। তখন আরবের প্রত্যেকটি কবীলা থেকে মক্কার চারপাশে লোক জড়ো হবে। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে শরীয়ত ও দীনের আহকাম শিখবে। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সাক্ষ্য নিবেন যে, তিনি নিজের আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। রিসালতের যিম্মাদারি পালন করেছেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে তাঁর এই ঐতিহাসিক হজ্জে মাবরূর আদায় করার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন। ঘোষণা শুনতে পেয়ে দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত-অসংখ্য মানুষ রাসূলের নকশে কদম অনুসরণের তামান্না নিয়ে দলে দলে এসে সমবেত হতে শুরু করে।[৭০৮] যুল কা'দ মাসের পঁচিশ তারিখ শনিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ঐতিহাসিক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।[৭০৯] তিনি মাথা চিরুনি করেন, তেল ব্যবহার করেন। নিজের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন। অতঃপর কুরবানীর জন্তু সাঁজিয়ে

---

[৭০৮] জাবের রা. সূত্রে মুসলিম র. এটা রেওয়ায়েত করেন: হজ্জে রাসূল সা অধ্যায় ১/৩৯৪।

[৭০৯] তাহকীকের জন্য দেখুন ফাতহুল বারী ৮/১০৪।

যোহরের নামাযের পরে যাত্রা শুরু করেন। আসরের আগেই যুল হুলাইফা নামক স্থানে আসরের আগে পৌঁছে যান। সেখানে তিনি আসরের নামায দুই রাকাআত আদায় করেন। অবশিষ্ট দিন এবং রাত সেখানেই অবস্থান করেন। ভোর হলে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে লক্ষ্য করে বললেন, **আজ রাতে আমার কাছে আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একজন বার্তা বাহক এসে বলেছেন, এই মুবারক উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন হজ্জের সাথে উমরা।**[৭১০]

অতঃপর যোহরের নামায আদায় করার আগে ইহরামের জন্য গোসল করেন। গোসলের পরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. তাঁর শরীর ও মাথা মুবারকে নিজ হাতে যারীরা ও মেশকের খুশবু লাগিয়ে দেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাড়ি মুবারক এবং মাথার সিঁথায় খুশবুর চমক দেখা যেতে লাগল। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা না ধুয়ে রেখে দেন। অতঃপর তিনি লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করেন। তারপর যোহরের দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। নামাযের পরে জায়নামাযে বসেই হজ্জ ও উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর তিনি বের হয়ে কসওয়া উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন এবং আবারও উচ্চনাদে লাব্বাইক পাঠ করলেন। উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে মরুভূমিতে পৌছে আবারও লাব্বাইক আওয়াজ বুলন্দ করেন।

অতঃপর সফর একটানা জারী রেখে মক্কার কাছাকাছি গিয়ে পৌছে যু তুয়া নামক স্থানে রাত যাপন করেন। এরপর সেখানে ফজরের নামায ও গোসল সেরে দশম হিজরীর ছাব্বিশে যুলকা'দ মক্কায় প্রবেশ করেন। রাস্তায় তিনি সর্বমোট আট দিন ব্যয় করেন। স্বাভাবিক গতিতে পথ চললে এটাই হলো এ পথের দূরত্ব। মক্কায় পৌছে মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন এবং কাবা ঘর তওয়াফ করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করেন। কিন্তু ইহরাম থেকে হালাল হলেন না। কেননা, তিনি হজ্জে কিরানের নিয়ত করেছিলেন। আর সে উদ্দেশ্যে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর মক্কার উচ্চভূমি হাজূনে গিয়ে অবস্থান করেন। হজ্জের তওয়াফ ব্যতীত অন্য কোনো তওয়াফ থেকে বিরত থাকেন।

অপরদিকে যে সকল সাহাবায়ে কেরামের কাছে হাদী ছিল না তাদেরকে তিনি তাদের ইহরাম উমরার মধ্যে বদল করে, কাবাঘর তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। যেহেতু রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো হালাল হচ্ছিলেন না এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনি তখন তাদেরকে বললেন, **পরে যা হয়েছে যদি আমি আগেই জানতে পারতাম তবে কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে**

[৭১০] উমর রা. সূত্রে ইমাম বুখারী র. এর রেওয়ায়েত ১/২০৭।

আসতাম না। আর যদি এ কুরবানীর জন্তু আমার সঙ্গে না থাকত তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। তখন যাদের কাছে হাদী (কুরবানীর জন্তু) ছিল না তারা হালাল হয়ে গেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা শুনলেন এবং তাঁর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।

যুলহজ্জের অষ্টম তারিখে- ইয়াওমে তারবিয়া- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা অভিমুখে গেলেন। সেখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। অতঃপর সামান্য অবস্থান করার পর যখন সূর্যোদয় হলো তখন তিনি আরাফার ময়দানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর তাঁবু নামিরাতে স্থাপন করা হয়েছে। তখন তিনি তাতে অবরতণ করলেন। অতঃপর দুপুরের সূর্য যখন ঢলে পড়ল তিনি কসওয়াকে প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিলেন এবং বাতনে ওয়াদীতে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন এক লাখ চব্বিশ হাজার কিংবা এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের এক বিশাল তরঙ্গভঙ্গের মহা সমাবেশ কায়েম হয়েছিল। সেখানে তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করলেন। দুনিয়ার ইতিহাসে সেই দিন তিনি সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতায় বিশ্ব সভ্যতাকে দান করে গিয়েছিলেন কতগুলি শাশ্বত সনদ। সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছরের পরে আজও যা অম্লান; অক্ষয়:

হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা শুনে রাখো! কারণ আমি জানি না এরপর আমি তোমাদের সঙ্গে এখানে সম্ভবত কখনো মিলিত হতে পারব না![৭১১]

নিশ্চয়ই তোমাদের জান ও মাল তোমাদের ওপর হারাম; যেমন হারাম তোমাদের আজকের এই দিন, আজকের এই মাস, আজকের এই শহর। মনে রেখো! জাহেলিয়াতের সবকিছু আমার পায়ের নীচে কবর দেওয়া হয়েছে। জাহেলিয়াতের রক্ত বাতিল হয়ে গেছে। আর আমি সর্বপ্রথম রবীআ ইবনে হারিসের- সে বনু সাদে দুধ পান করত আর তখনই বনু হুযাইল তাকে হত্যা করেছিল- রক্ত বাতিল ঘোষণা করছি। জাহেলিয়াতের সমস্ত সুদ বাতিল। আমি সর্বপ্রথম আব্দুল মুত্তালিবের ছেলে আব্বাসের সুদ বাতিল ঘোষণা করছি। এখন এ সকল সুদ বাতিল।

তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো! কেননা, তোমরা আল্লাহর আমানতের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে হালাল করে নিয়েছ। তাদের ওপর তোমাদের যে হক্ব রয়েছে তা হলো, তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে না দেয় যাদেরকে তোমরা সহ্য করতে পারো না। যদি তারা এমন করে তবে

[৭১১] ইবনে হিশাম ১/৬০৩।

তাদেরকে শাস্তি দিতে পারো। তবে তা লঘু শাস্তি। আর তোমাদের ওপর তাদের রয়েছে ন্যায়ভাবে খাদ্য ও বস্ত্র পাওয়ার অধিকার।

আর আমি তোমাদের মাঝে এমন একটি জিনিস রেখে যাচ্ছি- যদি তোমরা তাকে আমার পরে শক্ত করে ধরে রাখো, তবে কখনো গোমরাহ হবে না। সেটা হলো আল্লাহর কিতাব।[৭১২]

হে লোকসকল! জেনে রেখো- নিশ্চয়ই আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তোমাদের পরে আর কোনো উম্মত নেই। সুতরাং, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করবে। তোমাদের নামাযগুলো আদায় করবে। রমযান মাসে রোযা রাখবে। সন্তুষ্টচিত্তে তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করবে। আর তোমাদের রবের ঘরের হজ্জ পালন করবে। তোমরা তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে মান্য করবে। আর তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৭১৩]

আর তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তখন তোমরা কী জবাব দিবে? সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিব- আপনি আপনার রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার যিম্মাদারি পালন করেছেন। আপনি আমাদেরকে নসীহত করেছেন।

তখন তিনি আপন শাহাদাত আঙ্গুল সুনীল দিগন্ত অভিমুখী করে তুলে জনতরঙ্গের দিকে খানিকটা ঝুঁকিয়ে তিন বার বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো![৭১৪]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঐতিহাসিক ভাষণের অমূল্য এই ইরশাদগুলি যিনি সুউচ্চ কণ্ঠে গোটা ময়দানের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন তিনি ছিলেন রবীআ ইবনে উমাইয়্যা ইবনে খলফ রা.।[৭১৫]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ থেকে ফারেগ হতেই আসমান থেকে ওহী নেমে এলো- اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জীবনবিধানরূপে ইসলামকে মনোনীত করলাম। [সূরা মায়িদাহ:৩]

---

[৭১২] সহীহ মুসলিম: হজ্জে রাসূল সা. ১/৩৯৭।

[৭১৩] ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির র. এর রেওয়ায়েত। দেখুন মা'দানুল আ'মাল হাদীস নং ১১০৮, ১১০৯।

[৭১৪] মুসলিম ১/৩৯৭।

[৭১৫] ইবনে হিশাম ২/৬০৫।

এ আয়াত নাযিল হলে উমর রা. অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, **তুমি কাঁদছ কেন?** তিনি বললেন, পূর্ণ হওয়ার পরে এখন অপূর্ণতা ব্যতীত আর তো কিছুই বাকি নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **তুমি সত্য বলেছ।**[৭১৬]

খুতবা শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে বেলাল রা. আযান ও ইক্বামাত দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রা. কে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর বেলাল রা. আবার ইক্বামাত দিলেন আর তিনি মানুষকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করলেন। আর উভয়ের মাঝে অন্য কোনো নামায আদায় করলেন না। অতঃপর তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করে মাওকিফে চলে এলেন এবং কসওয়া উষ্ট্রীর পেট পাথরের ওপর রেখে মুশাত পাহাড়কে (পদাতিক লোকদের চলার পথে উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি) সামনে রেখে ক্বিবলার দিকে ফিরে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এক পর্যায়ে দিবারাজ অস্তপটে ঢলে পড়ল। বিদায়ের হাতছানি দিয়ে ধীরে ধীরে তার হলদে আভা লুপ্ত হলো। এক সময় তার টিকিটিও সাঁঝের অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

অতঃপর তিনি উসামা রা. কে পেছনে বসিয়ে মুযদালিফায় এলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দুই ইক্বামাতে মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করলেন। উভয় নামাযের মাঝে আর কোনো নফল নামায আদায় করলেন না। অতঃপর তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ঘুমালেন। সুবহে সাদিক উদিত হলে তিনি আযান ও ইক্বামাত দিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর কসওয়ায় আরোহণ করে মাশআরুল হারামে এলেন। সেখানে এসে ক্বিবলামুখী হয়ে দুআ করলেন। তাকবীর দিলেন। তাহলীল পড়লেন। তাওহীদের ঘোষণা দিলেন। চারদিকে খুব ফর্সা হওয়ার আগ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।

অতঃপর সূর্যোদয়ের আগেই মুযদালিফা থেকে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। ফযল ইবনে আব্বাসকে পেছনে বসিয়ে বাতনে মুহাসসির পর্যন্ত এসে সওয়ারীকে খানিকটা দ্রুত ছুটালেন। অতঃপর মাঝের রাস্তাটি বেছে নিয়ে জামরায়ে কুবরাতে চলে এলেন। তখনকার সময়ে সেখানে একটি গাছ ছিল। আর এ জামরার নাম ছিল জামরায়ে আকাবা বা জামরায়ে উলা। সেখানে তিনি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ

---

[৭১৬] ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে জারীর তাবারীর রেওয়ায়েত। দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/১৫। দুররুল মানসূর ২/৪৫৬।

করলেন। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর দিতেন। কঙ্করগুলি ছিল ছোট নুড়ি পাথরের মতো। আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে তা নিক্ষেপ করা যেত। কঙ্করগুলি তিনি বাতনে ওয়াদী থেকে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতঃপর তিনি পশু কুরবানীর জায়গায় এলেন এবং নিজের হাতে তেষট্টিটি জন্তু কুরবানী করলেন। অতঃপর যা কিছু বাকি ছিল সেগুলি যবাই করার জন্য আলী রা. কে নির্দেশ দিলেন। বাকি ছিল সাইত্রিশটি। এই ছিল মোট একশ' জন্তু। আলী রা. কে তিনি হাদীর (কুরবানীর জন্তু) মধ্যে শরীক করেছিলেন। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশে প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরা করে গোশত কেটে পাকানো হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলী রা. কিছু গোশত ও ঝোল খেলেন।

অতঃপর সওয়ারীতে চড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় চলে এলেন। কাবা ঘর তওয়াফ করলেন। এটা 'তওয়াফে ইফাযা' নামে পরিচিত। মক্কাতেই যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি যমযম কূপের পাড়ে বনু আব্দুল মুত্তালিবের লোকদের কাছে গেলেন। তারা তখন হাজীদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা পানি উঠাতে থাকো! যদি আমার এ আশঙ্কা না হতো যে, লোকেরা পানি ওঠানোর ক্ষেত্রে তোমাদেরকে পেছনে ঠেলে দিবে তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে পানি উঠাতাম। (অর্থাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি পানি ওঠানো শুরু করেন তবে সাহাবায়ে কেরামও ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে পানি উঠাতে থাকবেন। আর তখন বনু আব্দুল মুত্তালিবের যে এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ফযীলত ছিল এত লোকদের মাঝে তাকে আর তারা ধরে রাখতে পারবে না। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতে পানি ওঠানো থেকে নিবৃত্ত থাকলেন) বনু আব্দুল মুত্তালিব তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক বালতি পানি দিলো তিনি তা থেকে প্রয়োজনমতো পান করলেন।[৭১৭]

আজ ছিল যুল হজ্জের দশ তারিখ তথা কুরবানীর দিন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজও চাশতের সময় সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশে একটি ভাষণ দিলেন। এ সময় তিনি একটি খচ্চরের ওপর সওয়ার ছিলেন। আলী রা. তাঁর কথা সাহাবায়ে কেরামের কাছ পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের অনেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন আবার অনেকে ছিলেন বসা।[৭১৮] গত কাল তিনি আরাফার ময়দানে যা বলেছিলেন আজকের ভাষণেও সেই কথাগুলিরই পুনরুক্তি করলেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. আবু বুকরা রা. থেকে রেওয়ায়েত করেন

---

[৭১৭] জাবের রা. সূত্রে মুসলিমের রেওয়ায়েত। হজ্জে রাসূল অধ্যায় ১/৩৯৭-৪০০।

[৭১৮] আবু দাউদ: কুরবানীর দিন কোন্ সময় খুতবা দিবে অধ্যায় ১/২৭০।

যে, তিনি বলেন, কুরবানীর দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশে প্রদত্ত খুতবায় বলেছিলেনঃ **আল্লাহ তাআলা যেদিন আসমান আর যমিন সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন থেকেই আপন স্বভাব অনুযায়ী কালের বিবর্তন চলছে। এক বছরে রয়েছে বারোটি মাস। তার মধ্যে চারটি হলো হারাম। তিনটি ধারাবাহিক তথা যুল কা'দ, যুল হজ্জ ও মুহাররম। আর জুমাদাল উখরা ও শা'বানের মাঝে রজবে মুযার।**

তিনি আরও বললেন, **এটা কোন্ মাস?** আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এ মাসের অন্য কোনো নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, **এটা কি যুল হজ্জ মাস নয়?** আমরা বললাম হাঁ। তিনি বললেন, **এটা কোন্ শহর?** আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম তিনি হয়তো এ শহরের অন্য কোনো নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, **এটা কী (মক্কা) নগরী নয়?** আমরা বললাম, হাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, **এটা কোন' দিন?** আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। আমাদের ধারণা হলো তিনি এর অন্য কোনো নাম দিবেন। অতঃপর তিনি বললেন, **এটা কি কুরবানীর দিন নয়?** আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বললেন, **তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের ধন-সম্পদ পরস্পরের ওপর ঠিক তেমন হারাম, যেমন হারাম তোমাদের আজকের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস!**

আর অতি শীঘ্রই তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাযির হবে। আর তখন তিনি তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। তাই সাবধান! আমার পরে তোমরা গোমরাহীতে ডুবে যেও না! এমন যেন না হয় তোমাদের একজন আরেকজনের মাথা কাটতে শুরু করে দিয়েছ।

আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, **আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেকো! উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট (আমার এ বাণী) পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ, অনেক সময় যার কাছে পৌঁছানো হয় সে (উপস্থিত) শ্রোতার চেয়ে আরও সুন্দর করে বুঝতে পারে।**[৭১৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি সেই খুতবায় আরও বলেন, **প্রত্যেক অপরাধী তার নিজের বিরুদ্ধেই অপরাধ করে** (অর্থাৎ অপরাধের দায়ভার স্বরূপ এর খেসারত তার নিজেকেই দিতে হয়) **আর জেনে রেখো! কেউ তার পুত্রের**

---

[৭১৯] সহীহ বুখারীঃ মীনা দিবসের খুতবা অধ্যায় ১/২৩৪।

বিরুদ্ধে কিংবা কোনো পুত্র তার বাপের বিরুদ্ধে অপরাধ করে না (অর্থাৎ পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না)। **মনে রেখো! শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এ ভূখণ্ডে আর কোনোদিনও তার পূজা করা হবে না।** কিন্তু (তার একটি আশা রয়ে গেছে যে,) **তোমরা তুচ্ছ মনে করে এমন কিছু কাজ করবে, যাতে তার আনুগত্য হয়ে যাবে। আর তখন সে পরিতৃপ্তি লাভ করবে।**[৭২০]

আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলি তিনি মিনায় কাটালেন। এ সময় তিনি হজ্জের আহকাম পালন করেন, লোকেরদেরকে শরীয়তের শিক্ষাদীক্ষা দান করেন। আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেন। মিল্লাতে ইবরাহীমীর সুন্নাতগুলো আদায় করেন। শিরকের ধ্বংসাবশেষ আর রয়ে যাওয়া চিহ্নগুলি মিটিয়ে দেন। ইমাম আবু দাউদ র. হাসান সনদে সাররা বিনতে নাবহান রা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে রুউসের দিন তথা ১২ ই যিলহজ্জ একটি খুতবা দেন। সেই খুতবায় তিনি বলেন, **এটা কি আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিন নয়?**[৭২১] এদিন তিনি কুরবানীর দিনের খুতবার কথাগুলোই আবার বলেছিলেন। এই খুতবার আগেই সূরা নসর অবতীর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় ইয়াওমুন নফর তথা যুল হজ্জের তেরো তারিখ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনা থেকে যাত্রা করেন। সেখান থেকে তিনি আবতাহ উপত্যকায় খাইফে বনু কেনানায় অবতরণ করেন। সেদিনের বাকি সময়টুকু ও রাত তিনি সেখানেই কাটান। সেখানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। এরপর খানিকটা নিদ্রা গ্রহণ করেন। অতঃপর উঠে বাইতুল্লাহর দিকে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি বিদায়ী তওয়াফ করেন। মানুষদেরকেও তিনি বিদায়ী তওয়াফের নির্দেশ দেন।

একে একে হজ্জের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা হয়ে গেল। সাহেবে রিসালতকে নিয়ে সওয়ারী এবার মদীনা মুনাওয়ারার পথে পা বাড়ালো। উদ্দেশ্য নিজের ঘরে গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম গ্রহণ কিংবা একটুখানি শান্তির পরশ খোঁজা ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর জন্য সংগ্রামের এক নতুন পথে ধাবিত হওয়া। ফী সাবীলিল্লাহর এক নয়া দিগন্তে অশ্ব নিয়ে ছোটা।[৭২২]

---

[৭২০] তিরমিযী ২/৩৮, ১৩৫। ইবনে মাজাহ হজ্জের অধ্যায়ে। দেখুন মিশকাতুল মাসাবীহ ১/২৩৪।

[৭২১] আবু দাউদ: মীনায় কোন্ খুতবা দিবে অধ্যায় ১/২৬৯।

[৭২২] হজ্জে রাসূলের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন সহীহ বুখারী: কিতাবুল মানাসিক ১ম খণ্ড ও ২/৬৩১। সহীহ মুসলিম: হজ্জে রাসূল অধ্যায়। ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড, কিতাবুল মানাসিকের ব্যাখ্যা ও ৮/১০৩-১১০। ইবনে হিশাম ২/৬০১-৬০৫। যাদুল মাআদ ১/১৯৬, ২১৮-২৪০।

সর্বশেষ সামরিক অভিযান

অসম অহঙ্কারের প্রচণ্ড ধোঁয়ায় রোমান সাম্রাজ্যের চোখ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আদালতের রায় ছিল- যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান নিয়ে আসবে তাদের এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তার পুরষ্কার হবে মৃত্যুদণ্ড। যেমন সে মাআনের গভর্নর ফারওয়া ইবনে আমর জুযামীর ব্যাপারে এই রায় কার্যকর করেছিল।

তার এই অহঙ্কারের সমুচিত শাস্তি দেওয়ার নিমিত্ত একাদশ হিজরীর সফর মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর আমীর বানিয়ে দেন উসামা বিন যায়েদ বিন হারেসা রা. কে। তাকে তিনি নির্দেশ দেন বলকা আর ফিলিস্তীনের দারূমের মাটিতে অশ্বক্ষুরের প্রচণ্ড ধূলিঝড় আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে আসতে। যাতে রোমানদের অন্তরে মুসলিম ভীতির সৃষ্টি হয়। রোমান সীমান্তবর্তী আরবকবীলাগুলির আস্থা ফিরে আসে। যাতে করে কেউ এ ধারণা করে না বসে যে, গির্জার হুমকি-ধমকি আর অন্যায় জারির সম্মুখে দুনিয়ার কারও দাঁড়িয়ে কথা বলার সাহস নেই। আর ইসলাম গ্রহণের অর্থ কেবল নিজের মৃত্যুর পথ সুগম করা নয়।

সাহাবায়ে কেরামের অনেকে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার উসামা বিন যায়দের তারুণ্য ও বয়সের অপরিপক্কতা নিয়ে বিভিন্ন কথাকথি করলেন এবং এ অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বিলম্ব করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, **যদি তোমরা তার আমীর হওয়ার ব্যাপারে আমার কাছে প্রশ্ন তুলে থাকো তবে তোমরা তো তার বাপ যায়দের আমীর হওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলে! আল্লাহর কসম! নিশ্চিতভাবেই সে আমীর হওয়ার যোগ্য ছিল। সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের মানুষের একজন। আর তার পরে (তার ছেলে) সেও আমার প্রিয় মানুষদের একজন।**[৭২৩]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বক্তব্য শুনে সাহাবায়ে কেরাম উসামা রা. এর চারপাশে দৌড়ে আসতে লাগলেন। দ্রুত তারা প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা করেন এবং মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে জুরুফ নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরম অসুস্থতার সংবাদ তাদেরকে সামনে অগ্রসর হতে দিলো না। তাই তারা সেখানেই আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় বসে থাকলেন। আর আল্লাহর ফয়সালা ছিল এই যে, এটা হবে আবু বকর সিদ্দীক রা. এর খেলাফত কালের সর্বপ্রথম সামরিক অভিযান।[৭২৪]

---

[৭২৩] সহীহ বুখারী: রাসূলে কারীম সা. কর্তৃক উসামাকে প্রেরণ অধ্যায় ২/৬১২।
[৭২৪] প্রাগুক্ত এবং ইবনে হিশাম ২/৬০৬, ৬৫০।

হায়াতে তাইয়্যিবার আখেরী পর্ব
মহান বন্ধু সমীপে যাত্রা

বিদায়ের পূর্বাভাস

যখন আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ মিশন সফলভাবে সম্পন্ন হলো। গোটা পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর ইসলামের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ঠিক তখনই দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এ মিশনের কেন্দ্রবিন্দু এ মহা নায়কের পবিত্র জীবনে ধীরে ধীরে বিদায়ের লক্ষণ ভেসে উঠতে শুরু করল। তাঁর অনুভূতি, তাঁর চলা-ফেরা, তাঁর কথা-বার্তা সবকিছু থেকে চির বিরহের একটা অস্ফুট আর্ত হাহাকার বেরিয়ে আসতে লাগল। যেন তিনি এখন সবকিছুতে তার সারা জীবনের সঙ্গীদেরকে চির বিয়োগের এক দুঃখময় বার্তা হাতে গুজে দিচ্ছিলেন।

দশম হিজরীর রমযান মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন ইতেকাফ করলেন। অথচ সচরাচর ও সাধারণত প্রতি বছর রমযানে তিনি দশ দিন ইতেকাফ করতেন। এ রমযানে জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে দুই বার কুরআন শরীফ দাওর করলেন। অথচ এর আগে প্রতিবছর এক বার করতেন। তা ছাড়া রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, **আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এ জায়গায় আমি আর তোমাদের সঙ্গে কখনো মিলিত হবো না।** জামারায়ে আক্বাবায় তিনি বলেছিলেন, **আমার কাছ থেকে তোমরা হজ্জের বিধানাবলী শিখে নাও! সম্ভবত এ বছরের পরে আমার আর হজ্জ করা হবে না।** হজ্জের সময়ই আইয়্যামে তাশরীকে মাঝের দিনে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল সূরা নসর। তখন এর দ্বারা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এখন তাঁর দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আর এটা তাঁর ওফাতের আগাম বার্তা।

একাদশ হিজরীর সফর মাসের গোড়ার দিকে একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ প্রান্তরে গেলেন। সেখানে তাদের জন্য তিনি এমনভাবে দুআ করলেন, যেন তিনি জীবিত ও মৃতদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছিলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে মিম্বরে তাশরীফ নিয়ে বললেন, **আমি তোমাদের অগ্রের প্রেরণ; আর আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর কসম! এখন আমি আমার হাউয (হাউযে কাওসার) দুচোখে দেখতে পাচ্ছি। ভূপৃষ্ঠের সকল ধনভাণ্ডারের** (অপর এক বর্ণনায় ভূপৃষ্ঠের) **চাবিসমূহ আমার হাতে তুলে**

দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ভয় হয় না যে, তোমরা আমার পরে শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, দুনিয়ার পেছনে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।[৭২৫]

এই মুহাররম মাসের মাঝের দিকে এক রাতে তিনি ঘর ছেড়ে জান্নাতুল বাকী' গোরস্তানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি কবরবাসীদের জন্য মাগফিরাতের দুআ করলেন। অতঃপর তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, **হে কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক!! মানুষ যে অবস্থায় আছে তার চেয়ে তোমাদের ঐ অবস্থা মুবারক হোক যে অবস্থায় তোমরা আছো। ঘনঘোর নিশার মতো একটার পর একটা ফিতনা পৃথিবীতে ধেয়ে আসছে। আর তার আগেরটির চেয়ে পরেরটি হচ্ছে আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ।** অতঃপর তাদেরকে তিনি সুসংবাদ জানালেন: **অতি শীঘ্রই আমি তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হচ্ছি!**

অন্তিম যাত্রার সূচনা

একাদশ হিজরীর সফর মাসের আটাশ কিংবা উনত্রিশ তারিখ সোম বার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকীতে একটি জানাযায় উপস্থিত হন। জানাযা শেষে যখন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন তখন পথিমধ্যেই তাঁর মাথা ব্যথা শুরু হয়। ধীরে ধীরে তাঁর শরীরের উত্তাপ সহ্যসীমা অতিক্রম করে যেতে থাকে। এমনকি মাথার ওপর রাখা ভেজা পটির ওপর দিয়েও প্রবল উত্তাপ অনুভূত হতে থাকে। মূলত এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁর অন্তিম যাত্রা।

অসুস্থ অবস্থাতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারো দিন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করেন। অসুস্থতার সর্বমোট মুদ্দত ছিল তেরো কিংবা চৌদ্দ দিন।

আখেরী সাত দিন

ধীরে ধীরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতার প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পেল। তখন তিনি নিজ স্ত্রীদেরকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, **আগামী কাল আমি কোথায় থাকব? আগামী কাল আমি কোথায় থাকব?** তখন স্ত্রীগণ পরম বিচক্ষণতার প্রমাণ দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তামান্না বুঝতে পারলেন। সবাই তাকে যেখানে ইচ্ছা থাকার অনুমতি দিলেন। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস এবং আলী ইবনে আবী তালিব রা. এর কাঁধে ভর করে মাথা মুবারকে

---

[৭২৫] বুখারী ও মুসলিম। সহীহ বুখারী ২/৫৮৫। ফাতহুল বারী ৩/২৪৮, হাদীস নং ১৩৪৪, ৩৫৯৬, ৪০৪২, ৪০৮৫, ৬৪২৬, ৬৫৯০। মুসলিম: ফাযাইল, নবীজীর হাউযে কাওসার ও তাঁর গুণাবলী সাবেতকরণ অধ্যায়- ৪/১৭৯৫, হাদীস নং ২২৯৬।

পটি বাঁধা অবস্থায় পা মাটিতে টেনে টেনে আয়েশা রা. ঘরে গেলেন। অতঃপর আয়েশা রা. এর ঘরেই জীবনের আখেরী সপ্তাহটি কাটালেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

আয়েশা রা. এ দিনগুলিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছ থেকে আগে যে সকল দুআ আর তাসবীহ মুখস্থ করেছিলেন সেগুলি পড়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকে ফুঁক দিতেন এবং বরকতের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতই তাঁর দেহ মুবারকে বুলাতেন।

ওফাতের পাঁচ দিন আগে

ওফাতের পাঁচ দিন আগে বুধবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে জ্বরের তাপ-উত্তাপ পূর্বের চেয়ে আরও বেড়ে গেল। মারাত্মক ব্যথা আর বেদনায় তিনি অবচেতন হয়ে পড়ার উপক্রম করলেন। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, **বিভিন্ন কূপ থেকে সাত মশক পানি এনে আমার ওপর ঢালো! আমি লোকদের কাছে গিয়ে কয়েকটি অসীয়ত করব!!** তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে একটি তশতরিতে বসানো হলো। অতঃপর তাঁর ওপর পানি ঢালা শুরু হলো। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, **যথেষ্ট হয়েছে! যথেষ্ট হয়েছে!!**

এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থতা বোধ করতে লাগলেন। তখন তিনি মসজিদের দিকে এগিয়ে গেলেন। মাথায় তখনো পটি বাঁধা ছিল। মসজিদে গিয়ে তিনি মিম্বরে বসে পড়লেন। এটাই ছিল নবী জীবনের সর্বশেষ মজলিস। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তিনি বললেন, **হে লোকসকল! তোমরা আমার আরও কাছে চলে এসো!** সাহাবায়ে কেরাম দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন যা ইরশাদ করেছিলেন তন্মধ্যে কিছু বাণী ছিল এই: **ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত; কেননা তারা তাদের আম্বিয়ায়ে কেরামের কবরকে সেজদার স্থানে পরিণত করেছে!** অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **ইহুদি ও নাসারাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিন! তারা তাদের নবীদের কবরকে সেজদার স্থান বানিয়ে নিয়েছে!!**[৭২৬] অতঃপর তিনি আরও বললেন, **তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানাবে না- যার পূজা করা হবে।**[৭২৭]

অতঃপর তিনি নিজেই নিজেকে কিসাসের জন্য পেশ করে বললেন, যদি

---

[৭২৬] সহীহ বুখারী ১/৬২। মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃষ্ঠা ৩৬০।
[৭২৭] মুয়াত্তা ইমাম মালিক পৃষ্ঠা ৬৫।

আমি কারও পিঠে চাবুক মেরে থাকি, তবে এই আমার পিঠ উপস্থিত; সে তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয় যেন! যদি আমি কারও ইয্যত-আবরু নষ্ট করে থাকি তবে এই তো আমার ইয্যত-আবরু; সে যেন তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়!!

অতঃপর তিনি মিম্বর থেকে অবতরণ করে যোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে আবার মিম্বরে তাশরীফ নিলেন। দুশমনি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্ত কথাগুলিরই আবার পুণরোক্তি করলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আপনার কাছে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **ফযল! তার পাওনা মিটিয়ে দাও!!** অতঃপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আনসারদের সম্পর্কে ওসীয়ত করলেন:

আমি তোমাদেরকে আনসারদের সম্পর্কে ওসীয়ত করছি। কেননা, তারা আমার কলব ও কলিজা। তারা তাদের যিম্মাদারি যথাযথভাবে পালন করেছে। কিন্তু তাদের পাওনা এখনো দেওয়া বাকি রয়ে গেছে। সুতরাং তাদের সৎকর্মশীলদেরকে গ্রহণ করবে আর তাদের অসৎকর্মশীলদেরকে ক্ষমা করে দিবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে তিনি বলেন, **মানুষ বাড়তে থাকবে। আর আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে। এক পর্যায়ে তারা খাবারের ভেতরে লবণের মতো হয়ে পড়বে। সুতরাং, তোমাদের যে কেউ কোনো কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের কাজের দায়িত্বে নিয়ুক্ত হও তখন তাদের সৎকর্মশীলদেরকে কবুল করে নিবে আর অসৎকর্মীদেরকে ক্ষমা করে দিবে।**[৭২৮]

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বান্দাকে ইখতিয়ার দিয়েছেন, সে চাইলে দুনিয়ার চাকচিক্য ও শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে পারে কিংবা তাঁর কাছে যা আছে তা বেছে নিতে পারে, তখন আল্লাহর সেই বান্দা তাঁর প্রভুর কাছে যা আছে তাকেই বেছে নিয়েছে।** আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ কথা শুনে আবু বকর রা. কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, আমার পিতামাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আমরা তখন দারুণ বিস্ময়বোধ করলাম। লোক জন বলতে লাগল, এই বৃদ্ধের অবস্থা দেখো- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো এক বান্দা সম্পর্কে বলছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার জাঁকজমক আর তাঁর কাছে যা কিছু রয়েছে এ দু'টির কোনো একটি বেছে নিতে বলেছেন। অথচ, সে বলছে, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক। (কিন্তু কয়েক দিন পরে স্পষ্ট হয়ে গেল যে,) সেই বান্দা ছিলেন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর তখন

---

[৭২৮] সহীহ বুখারী ১/৫৩৬।

আমরা বুঝতে পারলাম যে, আবু বকর রা. ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি জ্ঞানী।[৭২৯]

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **বন্ধুত্ব আর ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে আবু বকর আমার ওপর সকল মানুষের চেয়ে বড় অনুগ্রহশীল। আমার রব ব্যতীত আর যদি কাউকে আমি পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তবে আবু বকরকে সেই পরম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু (তার সঙ্গে) আমার ইসলামের ভ্রাতৃত্ব আর মহব্বত রয়েছে। মসজিদে যতগুলি দরজা রয়েছে সবগুলি দরজা যেন অবশ্যই বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবল আবু বকরের দরজাটিই যেন খোলা থাকে।**[৭৩০]

ওফাতের চার দিন আগে

ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা আবার বেড়ে গেল। তিনি বললেন, **এসো! আমি তোমাদেরকে কিছু লিখে দিই- যার পরে তোমরা কখনো গোমরা হবে না।** ঘরে তখন অনেক সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে উমরও রা. ছিলেন। উমর রা. তখন লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেদনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব কুরআন আছে। আল্লাহর কিতাবই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তখন ঘরে যারা ছিল তাদের মধ্যে চরম মতবিরোধ ও বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল, তোমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও! তিনি তোমাদেরকে লিখে দিবেন। আবার কেউ কেউ উমর রা. এর কথা বলতে লাগল। এভাবে যখন তাদের বাকবিতণ্ডা আরও বেড়ে গেল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **আমার কাছ থেকে সবাই চলে যাও!**[৭৩১]

ঐ দিন আরও তিনটি ওসীয়ত করলেন: প্রথমে তিনি ইহুদি, নাসারা ও মুশরিকদেরকে জাযীরাতুল আরব থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি মদীনায় আগত প্রতিনিধিদলকে সেভাবে উপঢৌকন দিতে বললেন যেভাবে তিনি দিতেন। আর তৃতীয়টির কথা বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন। সম্ভবত তা ছিল আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতকে মজবুতির সঙ্গে আকড়ে ধরার নির্দেশ অথবা উসামা বাহিনী প্রেরণ কিংবা তা ছিল **নামায ও তোমাদের দাস-দাসী!** অর্থাৎ নামায ও দাস-দাসীর প্রতি লক্ষ্য রেখো!

---

৭২৯ বুখারী ও মুসলিম। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫৪৬।

৭৩০ সহীহ বুখারী ১/৫১৬।

৭৩১ সহীহ বুখারী ১/২২, ৪২৯, ৪৪৯, ২/৬৩৮।

আরও কয়েকদিন আগ থেকেই মারাত্মক অসুস্থতা সত্ত্বেও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়মিত মসজিদে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম রা. কে নিয়ে জামাতে নামায আদায় করতেন। এ ধারাবাহিকতা চলল আজকের দিন তথা ওফাতের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। এ দিন তিনি মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ান এবং তাতে সূরা মুরসালাত তেলাওয়াত করেন।[৭৩২]

ইশার সময় অসুস্থতা আরও বেড়ে যায়। অবস্থা এমন হয়, উঠে মসজিদে যাওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন জিজ্ঞাসা করেন, **লোকজন কি নামায পড়ে ফেলেছে?** আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! না। তারা আপনার অপেক্ষা করছে। তিনি বললেন, **তশতরিতে আমার জন্য পানি দাও!** তখন আমরা তাতে পানি দিলাম। তিনি তখন গোসল করলেন। অতঃপর তিনি উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন কিন্তু অবচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। খানিক পরে হুঁশ ফিরে এলে তিনি বললেন,**লোকজন কি নামায পড়ে ফেলেছে?** তখন আমরা একই জবাব দিলাম। তিনি গোসল করে উঠতে গিয়ে দ্বিতীয় বার পড়ে গেলেন। তৃতীয়বারও একই অবস্থা হলো। তখন তিনি আবু বকর রা. এর কাছে সংবাদ পাঠালেন তিনি যেন লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ান। তখন আবু বকর রা. নামায পড়ালেন। এরপর থেকে আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় মোট সতেরো ওয়াক্ত[৭৩৩] নামাযের ইমামতি করেন। বৃহস্পতিবারের ইশার নামায। সোমবারের ফজরের নামায। মাঝখানে শুক্র, শনি ও রবি এই তিন দিনের পাঁচ ওয়াক্ত করে পনেরো ওয়াক্ত নামায।[৭৩৪]

এদিকে আয়েশা রা. আবু বকর রা. কে ইমামতি থেকে বিরত রাখতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তিন থেকে চার বার আবেদন করলেন। যাতে মানুষ তাঁর সম্পর্কে বদগুমানী না করে।[৭৩৫] কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আবেদন নাকচ করে দিয়ে বলেন, **তোমরা তো সবাই ইউসুফের সেই মহিলাগুলো! আবু বকরকে লোকদের নিয়ে নামায পড়ার নির্দেশ দাও!**।[৭৩৬]

---

[৭৩২] উম্মে ফযল থেকে বুখারী র. রেওয়ায়েত করেছেন এ হাদীসটিঃ রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায়- ২/৬৩৭।

[৭৩৩] বুখারী ও মুসলিম। মিশকাতুল মাসাবীহ ১/১০২।

[৭৩৪] বুখারী, ফাতহুল বারী ২/১৯৩, হাদীস নং ৬৮১। মুসলিমঃ নামায পর্ব ১/৩১৫, হাদীস নং ১০০। মুসনাদে আহমদ ৬/২২৯।

[৭৩৫] দেখুন বুখারী, ফাতহুল বারী ৭/৭৪৭, হাদীস নং ৪৪৪৫। মুসলিমঃ নামায পর্ব ১/৩১৩, হাদীস নং ৯৩, ৯৪।

[৭৩৬] সহীহ বুখারী ১/৯৯।

ওফাতের তিন দিন আগে

জাবের রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ওফাতের তিন দিন আগে বলতে শুনেছি, **সাবধান! তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।**[৭৩৭]

ওফাতের এক দিন বা দুই দিন আগে

শনি বা রবিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা শারীরিক সুস্থতা ও আরামবোধ করেন। তখন দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদের দিকে তাশরীফ নিয়ে যান। আবু বকর রা. তখন লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখামাত্রই আবু বকর রা. পেছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইঙ্গিতে পিছু হটতে বারণ করে দিলেন। তিনি বললেন, **তোমরা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দাও!** তখন তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আবু বকর রা. এর বাম পাশে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর আবু বকর রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামাযের ইক্তেদা করলেন এবং পেছনের মুসল্লীদেরকে জোরে জোরে তাকবীর শুনিয়ে দিতে লাগলেন।[৭৩৮]

ওফাতের এক দিন আগে

ওফাতের এক দিন আগে তথা রবিবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল গোলাম-বাঁদীকে আযাদ করে দেন। তাঁর কাছে তখন ছয় কিংবা সাতটি দিনার ছিল সেগুলিও তিনি সদক্বা করে দেন।[৭৩৯] তাঁর সকল হাতিয়ার মুসলমানদেরকে দান করে দেন। রাতে আয়েশা রা. কূপি জ্বালানোর জন্য এক প্রতিবেশী মহিলার কাছে একটুখানি তেল চেয়ে পাঠান।[৭৪০] ত্রিশ সা' (প্রায় পঁচাত্তর কিলো) যবের বিনিময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লৌহবর্ম তখন এক ইহুদির কাছে বন্ধক ছিল। [৭৪১]

---

[৭৩৭] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৫৫। মুসনাদে আবু দাউদ ত্বয়ালেসী পৃষ্ঠা ২৪৬, হাদীস নং ১৭৭৯। মুসনাদে আবু ইয়া'লা ৪/১৯৩, হাদীস নং ২২৯০।

[৭৩৮] সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী ২/১৯৫, ২৩৮, ২৩৯, হাদীস নং ৬৮৩,৭১২,৭১৩।

[৭৩৯] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৩৭। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় এগুলি তিনি সদকা করেছিলেন সোম বার রাতে বা দিনে অর্থাৎ জীবনের সর্বশেষ দিনে।

[৭৪০] তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৩৯।

[৭৪১] দেখুন সহীহ বুখারী হাদীস নং ২০৬৮, ২০৯৬, ২২০০, ২২৫১, ২২৫২, ২২৮৬, ২৫০৯, ২৫১৩, ২৯১৬, ৪১৬৭। কিতাবুল মাগাযীর সর্বশেষে রয়েছে, রাসূলে কারীম সা. লৌহবর্মটি বন্ধক রাখা

নবী জীবনের আখেরী দিনটি

আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন, সোমবার দিন মুসলমানগণ যখন আবু বকর রা. এর ইমামতিতে ফজরের নামায পড়ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে আয়েশা রা. এর হুজরার পর্দা সরিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তারা তখন নামাযের কাতারে ছিলেন। বিমল হাসির খানিকটা ঝলকানি তাঁর চন্দ্রবদনে পুষ্পিত ছিল। তখন আবু বকর রা. পেছনের কাতারে চলে যাওয়ার জন্য সরে যেতে লাগলেন। কারণ তিনি ধারণা করছিলেন, হয়তো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে আসতে চাচ্ছেন। আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জোৎস্নাস্নিগ্ধ আলোকিত বদনখানি দেখে খুশি আর আনন্দে মুসলমানগণ নামাযের মধ্যেই গণ্ডগোল বাঁধানোর উপক্রম করলেন (অর্থাৎ রাসূলের অবস্থা জানার জন্য নামায ভেঙে দেওয়ার উপক্রম করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হাতের ইশারায় বললেন, তোমরা তোমাদের নামাযকে পূর্ণ করে নাও! অতঃপর তিনি হুজরায় প্রবেশ করে পর্দা নামিয়ে দেন।[৭৪২]

এরপর নবী জীবনে আর কোনো নামাযের ওয়াক্ত আসেনি।

চাশতের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণপ্রতিম দুহিতা ফাতেমা রা. কে ডেকে পাঠালেন। ফাতেমা রা. এলে তিনি তাঁর সঙ্গে কানেকানে বিভিন্ন কথাবার্তা বলতে লাগলেন। তখন ফাতেমা রা. কাঁদতে লাগলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করলেন। এরপর কানেকানে আরও কিছু কথা বললেন তখন ফাতেমা রা. হেসে ফেললেন। আয়েশা রা. বলেন, আমরা- পরবর্তী সময়ে- ফাতিমা রা. কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রথমবার কানাকানির সময় তিনি আমাকে জানালেন যে, অসুস্থতাতেই তাঁর ওফাত হবে। তখন আমি কেঁদে উঠলাম। অতঃপর দ্বিতীয় কানাকানিতে তিনি আমাকে বললেন, পৃথিবী থেকে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হবো।[৭৪৩]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা রা. কে ওফাতের আগে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন যে, তিনি গোটা বিশ্ব জগতের নারীদের নেত্রী।[৭৪৪]

অবস্থাতেই ইন্তেকাল করেন। আর মুসনাদে আহমদে রয়েছে, সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসার মতো কোনো কিছু তখন তাঁর কাছে ছিল না। (ফাতহুল বারী ৫/১৬৯)

[৭৪২] দেখুন সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ২/১৯৩, হাদীস নং ৬৮০, ৬৮১, ৭৫৪, ১২০৫, ৪৪৪৮।

[৭৪৩] সহীহ বুখারী ২/৬৩৮।

[৭৪৪] কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের মধ্যকার এ আলোচনা নবী জীবনের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয়নি; বরং এটা ছিল সর্বশেষ সপ্তাহের ঘটনা। রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৮২।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচণ্ড বেদনা দেখে ফাতিমা রা. আচমকা বলে উঠলেন, হায়! আব্বাজানের কত কষ্ট হচ্ছে!! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, **আজকের দিনের পর তোমার আব্বাজানের আর কোনো কষ্ট থাকবে না।**[৭৪৫]

অতঃপর তিনি হাসান, হুসাইন রা. কে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন। তাদেরকে কল্যাণের ওসীয়ত করলেন। অতঃপর নিজের স্ত্রীদেরকে ডেকে তাদেরকে নসীহত করলেন এবং আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থতা ও বেদনা আরও বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তা অসহনীয় মাত্রায় উপনীত হতে লাগল। এক পর্যায়ে তাঁর শরীরে সেই বিষের আলামত ফুটে উঠতে লাগল যা তিনি খাইবরে খেয়েছিলেন। এমনকি তিনি আয়েশা রা. কে বলতেন, **খাইবরে আমি যে খাবার খেয়েছিলাম, বরাবরই তার যন্ত্রণা আমি অনুভব করে এসেছি। কিন্তু এতক্ষণে আমার মনে হচ্ছে, সেই বিষ আমার শরীরের সব কিছু কেটে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।**[৭৪৬]

এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চেহারা মুবারকের ওপর একটি চাদর টেনে রেখেছিলেন। যখন শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে আসত তখন তিনি সেটা সরিয়ে ফেলতেন। আর ঠিক সে অবস্থাতেই বিশ্ববাসীর জন্য তাদের সর্বশেষ নবীর মুখ থেকে সর্বশেষ কথাটি বেরিয়ে এলো। শেষ নবীর সর্বশেষ ইরশাদে তিনি মানুষদেরকে এক চরম অভিশাপ থেকে সতর্ক ও সচেতন করে দিয়ে গেলেন- **ইহুদি ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক! তারা তাদের নবীদের কবরগুলিকে সেজদার স্থানে পরিণত করেছে। আরবের মাটিতে দুই ধর্ম কখনো একসঙ্গে থাকতে পারে না।**[৭৪৭]

সাহাবায়ে কেরামকে কয়েকবার তিনি বললেন, **নামায!.......নামায!! .....আর তোমাদের দাস-দাসী..........!!!** [৭৪৮]

অন্তিম যাত্রা

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তিম যাত্রার পরম ক্ষণটি ঘনিয়ে এলো। আয়েশা রা. তাঁকে নিজের শরীরের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখলেন। তাঁর বর্ণনা, আমার প্রতি এটা

---

[৭৪৫] সহীহ বুখারী ২/৬৪১।
[৭৪৬] প্রাগুক্ত ২/৬৩৭।
[৭৪৭] সহীহ বুখারী ও ফাতহুল বারী ১/৬৩৪, হাদীস নং ৪৩৫, ১৩৩০, ১৩৯০, ৩৪৫৩, ৩৪৫৪, ৪৪৪১, ৪৪৪৩, ৪৪৪৪, ৫৮১৫, ৫৮১৬। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৫৪।
[৭৪৮] সহীহ বুখারী ২/৬৩৭।

ছিল আল্লাহ তাআলার একটি বিশাল অনুগ্রহ যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে, আমার দিনে এবং আমারই বুক ও চিবুকের মধ্যে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় তিনি আমার ও তাঁর (রাসূলের) লালা একত্র করে দিয়েছিলেন। তখন আবু বকর রা. এর ছেলে আব্দুর রহমান রা. একটি মিসওয়াক নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। আমি লক্ষ করলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারলাম তিনি মিসওয়াকটি চাচ্ছেন। আমি তাকে বললাম, আপনার জন্য কি ওটা নিব? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন, হাঁ। তখন আমি সেটা তাকে দিলাম। কিন্তু তাঁর কাছে শক্ত মনে হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার জন্য ওটা নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন, হাঁ। তখন আমি সেটা নরম করে দিলাম। তখন তিনি খুব ভালো করে মিসওয়াক করলেন। তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিল। তিনি তখন সে পানিতে দু'হাত দিয়ে দিয়ে চেহারা মুবারক মুছতে ছিলেন আর বলে যাচ্ছিলেন, **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মৃত্যু বড়ই কষ্টদায়ক।**[৭৪৯]

মিসওয়াক শেষ করেই তিনি তাঁর হাত কিংবা আঙ্গুল ওপরে উঠালেন। তাঁর দৃষ্টি তখন ছাদের ওপর গিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তাঁর ঠোঁট কেঁপে উঠল। আয়েশা রা. কান লাগিয়ে শুনতে পেলেনঃ **সে সকল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মীর সঙ্গে যাদেরকে আপনি নেয়ামত দান করেছেন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন!! আমার ওপর রহমত নাযিল করুন!! আর সর্বোত্তম বন্ধুর সঙ্গে আমায় মিলিত করুন!!! হে আল্লাহ! সুমহান বন্ধু!!**[৭৫০]

শেষোক্ত বাক্যটি তিনি তিন বার বললেন। অতঃপর তাঁর হাত এক দিকে ঝুঁকে গেল। তিনি সর্বোত্তম বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন............।

সূর্য ততক্ষণে মাথার ওপর উঠে গিয়েছিল। দিনটি ছিল একাদশ হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ সোমবার। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর চার দিন।

বে-ক্বারার দিলের অস্ফুট আর্তনাদ

মুহূর্তে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও বিয়োগান্তক এ দুঃসংবাদ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। নির্মল, নির্মেঘ সুনীল আসমান আর

---

[৭৪৯] সহীহ বুখারীঃ রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায় ২/৬৪০।

[৭৫০] সহীহ বুখারীঃ রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায়, রাসূলে কারীম সা. এর সর্বশেষ ইরশাদ অধ্যায় ২/৬৩৮-৬৪১।

আলোকোজ্জ্বল দিগ-দিগন্ত মদীনাবাসীদের ওপর ভয়াল অন্ধকারঘন কালো হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়গুলো দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে গেল। আনাস রা. বলেন, যেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসেছিলেন সেদিনের চেয়ে সুন্দর ও আলোকিত দিন আমি জীবনেও দেখিনি। আর সেদিনের চেয়েও কোনো অসুন্দর ও ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিন আমি জনমেও দেখিনি, যেদিন তিনি আমাদের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছিলেন।[৭৫১]

ওফাতের পরে ফাতিমা রা.বললেন,আব্বাজান! যিনি তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস যার ঠিকানা। আব্বাজান! জিবারাঈল আ. কে আপনার ওফাতের খবর দিচ্ছি।[৭৫২]

অবচেতন উমরের অস্থিরতা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে উমর রা. দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু মুনাফিকের ধারণা আল্লাহর রাসূলের ওফাত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেননি; বরং মূসা ইবনে ইমরান আ. যেভাবে তাঁর রবের কাছে গিয়েছিলেন একইভাবে তিনিও তাঁর রবের কাছে গেছেন। তখন মূসা আ. তাঁর কওম থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তাদের কাছে ফিরে এসেছিলেন। অথচ, তারা বলেছিল, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আল্লাহর কসম! রাসূলে কারীমও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই ফিরে আসবেন!! তাই যারা বলবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন আমি তাদের হাত-পা কেটে ফেলব।[৭৫৩]

আবু বকর: সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক

আবু বকর রা. সেদিন সুনাহ নামক স্থানে অবস্থিত তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠে করে ফিরে এসে অবতরণ করলেন। অতঃপর মসজিদে নববীতে ঢুকে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে সোজা গিয়ে আয়েশা রা. এর হুজরায় হাযির হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক তখন

---

[৭৫১] দারেমী। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫৪৭। আনাস রা থেকে আরও বর্ণিত আছে তিনি বলেন, যেদিন রাসূলে কারীম সা. হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন সেদিন গোটা মদীনা আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আবার যেদিন তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন সেদিন তাঁর বিদায়ে গোটা মদীনা আবার আগের মতো অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আর যখন আমরা তাকে দাফন করে আমাদের হাত ঝাড়ছিলাম তখন আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছিল। (তিরমিযী ৫/৫৮৮,৫৮৯)

[৭৫২] সহীহ বুখারী: রাসূলে কারীম সা. এর পীড়া অধ্যায় ২/৬৪১।

[৭৫৩] ইবনে হিশাম ২/৬৫৫।

ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা ছিল। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্রবদনখানি থেকে চাদরখানা সরিয়ে চুমু খেলেন এবং কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, আমার পিতা মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! আল্লাহ আপনাকে দু'বার মৃত্যু দিবেন না!! যে মৃত্যু তিনি আপনার জন্য লিখে রেখেছিলেন আপনি সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছেন!!!

অতঃপর আবু বকর রা.আয়েশা রা. এর হুজরা থেকে বের হলেন। উমর রা. তখন মানুষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বললেন, উমর! বসে যাও! উমর রা. বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবু বকর রা. কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলেন। ইতোমধ্যে সাহাবায়ে কেরাম উমর রা. কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রা. এর কাছে জড়ো হয়ে গেলেন। আবু বকর রা. তাদের উদ্দেশে বললেনঃ

হামদ ও সালাতের পরে! তোমাদের মধ্য থেকে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পূজা করত (তারা যেন জেনে নেয়) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তোমাদের যারা আল্লাহর ইবাদত করত (তারা যেন জেনে নেয়,) নিশ্চয়ই আল্লাহ চিরঞ্জীব; তিনি কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না!! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

আর মুহাম্মাদ একজন রসূল বৈ তো নয়! তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। [সূরা আলে ইমরান:১৪৪]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, আল্লাহর কসম! আবু বকর রা. এর তেলাওয়াতের আগ পর্যন্ত মানুষ যেন এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার কথা জানতই না!! তখন সবাই তাঁর থেকে আয়াতটি শিখে নিলো। অতঃপর আমি প্রত্যেককেই এই একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে দেখলাম।

ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণিত, উমর রা. বলেন, আল্লাহর কসম! যখন আমি আবু বকর রা. মুখে সেই আয়াতটি শুনতে পেলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন। তখন আমার পা ভেঙে পড়ল। সে আমার শরীরের ভার নিতে পারল না। আবু বকরের মুখে এ আয়াত শুনে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। কারণ

ততক্ষণে আমি বুঝে ফেললাম, বাস্তবিকই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাত লাভ করেছেন।[৭৫৪]

দেহ মুবারকের বিদায় ঘনঘটা

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফন-দাফনের আগেই খেলাফতের বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। সাকীফায়ে বনু সাআদায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে এ নিয়ে চরম বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, দ্বন্দ্ব আর মতপার্থক্য চলতে লাগল দীর্ঘ সময়। পরিশেষে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু বকর রা.খেলাফতের প্রধান নিযুক্ত হলেন। এতে করে সোমবার দিন কেটে রাত নেমে এলো। অতঃপর লোকজন রাতভর একটানা সুবহে সাদিক পর্যন্ত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাফনের কাজে রইল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারক তখনো ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা আয়েশা রা. এর হুজরায় ছিল। পরিবারের সদস্যরা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

মঙ্গলবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গোসল করানো হলো। গোসলের সময় তাঁর শরীর থেকে জামা-কাপড় খোলা হলো না। তাকে গোসল করিয়েছিলেন আব্বাস, আলী, আব্বাস রা. এর দুই ছেলে ফযল ও কুসাম, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোলাম শুক্বরান, উসামা বিন যায়দ এবং আউস ইবন খাওলা রা. প্রমুখ। আব্বাস রা. ও তার দুই পুত্র ফযল ও কুসাম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশ বদলে দিচ্ছিলেন আর উসামা ও শুক্বরান তাঁর দেহ মুবারকের ওপর পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। আলী রা. তাকে গোসল দিচ্ছিলেন আর আউস রা. তাকে বুকের সঙ্গে হেলান দিয়ে রেখেছিলেন।[৭৫৫]

পানি ও বরই পাতা দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মোট তিন বার গোসল দেওয়া হয়। কুবাতে অবস্থিত সা'দ বিন খাইসামা রা. এর 'গার্স' নামক কূপ থেকে পানি আনা হয়। জীবদ্দশায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কূপের পানি পান করতেন।[৭৫৬]

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তিনটি সাদা ইয়েমেনী চাদর দ্বারা কাফন দেওয়া হয়। তাতে কোনো জামা কিংবা পাগড়ি ছিল

---

[৭৫৪] সহীহ বুখারী ২/৬৪০, ৬৪১।
[৭৫৫] দেখুন ইবনে মাজাহ ১/৫২১।
[৭৫৬] বিস্তারিত দেখুন তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৭৭-২৮১।

না।[৭৫৭] সেই চাদরই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফনের জায়গা নিয়ে খানিকটা মতানৈক্যের সৃষ্টি হলো। আবু বকর রা. বললেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, **যে নবীরই ওফাত হয়েছে তাকে সেই ওফাতের স্থানে দাফন করা হয়েছে।** এরপর আবু তালহা রা. রাসূলে কারীম. যে বিছানায় ওফাত লাভ করেছিলেন তা একপাশে সরিয়ে ফেলেন। বিছানার নীচের মাটি খনন করেন এবং বগলী কবর বানান।

এরপর মানুষ দলে দলে দশজন দশজন করে হুজরায় প্রবেশ করতে লাগল। এভাবে নিজে নিজে সকলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জানাযার নামায আদায় করেন। রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযায় কেউ ইমাম হননি। প্রথমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবার ও আত্মীয় স্বজন নামায আদায় করেন। অতঃপর মুহাজিরগণ জানাযা পড়েন। এরপর পড়েন আনসারগণ। অতঃপর যথাক্রমে শিশু ও নারীরা কিংবা নারী ও শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন।[৭৫৮]

এভাবে কাফন ও জানাযার কাজে মঙ্গলবার পুরো দিন এবং বুধবার রাতেরও অধিকাংশ সময় কেটে যায়। আয়েশা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাফন সম্পর্কে আমরা প্রথমে কিছুই জানতাম না। অতঃপর যখন বুধবার রাতের[৭৫৯] মাঝপ্রহরে- অপর এক বর্ণনায় শেষ প্রহরে- মাটিতে কোদাল মারার আওয়াজ শুনতে পেলাম তখন আমরা বুঝতে পারলাম, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দাফন করা হচ্ছে।

[৭৫৭] দেখুন সহীহ বুখারী: জানাযা পর্ব: কাফনের জন্য সাদা কাপড় অধ্যায়, ফাতহুল বারী ৩/১৬২, ১৬৭, হাদীস নং ১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩, ১৩৮৭। সহীহ মুসলিম: জানাযা পর্ব ৪৬৩, মৃতের কাফন অধ্যায় হাদীস নং ৪৫।

[৭৫৮] দেখুন মুয়াত্তা ইমাম মালিক: জানাযা পর্ব, মৃতের দাফন সম্পর্কে যা এসেছে অধ্যায় ১/২৩১। তাবাকাতে ইবনে সা'দ ২/২৮৮-২৯২।

[৭৫৯] মুসনাদে আহমদ ৬/৬২, ২৭৪, সর্বোত্তম বন্ধুর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ মিলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বুখারী: রাসূলের পীড়া অধ্যায় এবং ফাতহুল বারীতে এর পরবর্তী আরও কিছু অধ্যায়। সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ নবীজীর ওফাত অধ্যায়। ইবনে হিশাম ২/৬৪৯-৬৬৫। তালকীহে ফুহূমি আহলিল আসারি পৃষ্ঠা ৩৮,৩৯। রহমাতুল্লিল আলামীন ১/২৭৭-২৮৬। এ অধ্যায়ে উল্লিখিত বিভিন্ন সময়ের অধিকাংশই শেষোক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

আহলে বাইত

এক. হিজরতের পূর্বে মক্কায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের সদস্য ছিলেন মাত্র দু'জন। তিনি ও তাঁর প্রেয়সী স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন মহিয়সী নারী **খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রা.**। তাঁকে বিবাহের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর খাদীজা রা. এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তিনিই ছিলেন নবী জীবনের প্রথম স্ত্রী। তাঁর জীবদ্দশায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভ থেকেই জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু তাঁর কোনো পুত্র সন্তান বেঁচে থাকেনি। কন্যাগণ ছিলেনঃ যয়নব, রুকাইয়্যা, উম্মে কুলসূম ও ফাতিমা রা.। যয়নবকে হিজরতের আগেই তার খালাতো ভাই আবুল আস ইবনে রবী' বিয়ে করেছিলেন। রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসূম রা. কে উসমান বিন আফ্ফান রা. একজনের পর অপরজনকে বিয়ে করেছিলেন। আর ফাতিমা রা. কে আলী ইবনে আবী তালিব রা. বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বিয়ে করেছিলেন। আর ফাতিমা রা. এর গর্ভ থেকেই হাসান, হুসাইন, যয়নব ও উম্মে কুলসূম রা. জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

উল্লেখ্য, বিশাল এক কল্যাণ আর ব্যাপক হিকমতের কারণে একমাত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য চারের অধিক বিবাহ জায়েয ছিল। এটা ছিল কেবল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মোট তেরো জন নারীর সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহের আকদ হয়েছিল। তন্মধ্যে তাঁর ইন্তেকালের সময় নয় জন জীবিত ছিলেন। আর বাকি দু'জন তাঁর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন খাদীজা রা. আর অপরজন ছিলেন উম্মুল মাসাকীন যয়নব বিনতে খুযাইমা রা.। আর দু'জনকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আনেননি। নিম্নে আমরা তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ করছিঃ

দুই. সাওদা বিনতে যামআ রাঃ খাদীজা রা. এর ওফাতের মাস খানেক পরে নবুওতের দশম বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বিয়ের পূর্বে তিনি তার চাচাতো ভাই শুকরান ইবনে আমরের স্ত্রী ছিলেন। শুকরান মারা গেলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। চুয়ান্ন হিজরীর শাওয়াল মাসে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

তিন. আয়েশা বিনতে আবী বকর সিদ্দীক রাঃ সাওদা রা. কে বিবাহ করার এক বছর পরে নবুওতের একাদশ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেছিলেন। এটা ছিল হিজরতের আড়াই বছর আগের ঘটনা। বিবাহের সময় আয়েশা রা. এর বয়স ছিল ছয় বছর। অতঃপর হিজরতের সাত মাস পরে শাওয়াল মাসে মদীনায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘরে উঠিয়ে আনেন। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। তিনিই ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। তিনি ব্যতীত আর কোনো কুমারী নারীকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করেননি। তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গোটা সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। এই উম্মতের সবচেয়ে বড় ফকীহ, জ্ঞানী ও বিদুষী নারী। গোটা নারী জাতির ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তেমন, যেমন সকল খাবারের ওপর সারীদের শ্রেষ্ঠত্ব। সাতান্ন কিংবা আটান্ন হিজরীর সতেরো রমযান তিনি ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে সমাহিত করা হয়।

চার. হাফসা বিনতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তার স্বামী খুনাইস বিন হুযাফা সাহমীর কাছ থেকে বিধবা হয়েছিলেন। হালাল হওয়ার পরে তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। পয়তাল্লিশ হিজরীর শা'বান মাসে ষাট বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

পাঁচ. যয়নব বিনতে খুযাইমা রাঃ তিনি ছিলেন বনু হেলাল বিন আমের বিন সা'সা' কবীলার মেয়ে। গরীব ও দুঃখীজনদের প্রতি উদারতা ও দরদের কারণে তিনি উম্মুল মাসাকীন নামে তিনি অভিহিত হতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের বিবাহে ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে চতুর্থ হিজরীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। কিন্তু চতুর্থ হিজরীর রবীউস সানীর শেষের দিকে বিয়ের মাত্র মাস তিনেক পরে তিনি ইন্তেকাল করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তিনি সমাহিত হন।

ছয়. উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়্যা রাঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঘরে আসার আগে তিনি আবু সালামার স্ত্রী ছিলেন। আবু সালামা থেকে তাঁর ছেলেমেয়েও হয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ হিজরীর জুমাদাল উখরা মাসে আবু সালামা মৃত্যু বরণ করলে একই বছরে শাওয়াল মাসের কয়েকদিন বাকি থাকতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসেন। তিনি ছিলেন নারী জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। উনষাট কিংবা বাষট্টি হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চুরাশি বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

সাত. যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রিবাব রাঃ তিনি ছিলেন বনু আসাদ ইবনে খুযাইমা কবীলার মেয়ে। আত্মীয়তার সূত্রে তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফাতো বোন। প্রথমে যায়দ বিন হারেসা- যাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র মনে করা হতো- তাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণে যায়দ তাকে তালাক দিয়ে দেন। ইদ্দত শেষ হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে – فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا (الأحزاب:৩৭)। তার সম্পর্কেই পরে সূরা আহযাবের বেশ কতগুলো আয়াত নাযিল হয়, যাতে তাকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ ও অন্যান্য আলোচনা করা হয়- সামনে আমরা এ ব্যাপারে আলোচনা করব- হিজরতের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম বছরের যুল কা'দ মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা ইবাদতগুযার ও সদক্বাকারিনী মহিলা। হিজরী বিশ সালে তিপ্পান্ন বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে উম্মুল মুমিনীনদের মধ্য তিনিই সর্বপ্রথম ইন্তেকাল করেন। উমর ইবনে খাত্তাব রা. তার জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

আট. জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস রাঃ তিনি ছিলেন বনু খুযাআর শাখা বনু মুসতালিককের সরদার হারিসের কন্যা । বনু মুসতালিকের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। প্রথমে তিনি সাবে বিন কায়স বিন শাম্মাস রা. এর ভাগে পড়েছিলেন। শাম্মাস তার সঙ্গে 'মুকাতাবা' (ইসলামী শরীয়তে মনিব ও দাসের মধ্যে সংঘটিত এক ধরনের চুক্তিবিশেষ; যাতে মনিব কর্তৃক ঘোষিত অর্থ দানে দাস নিজেকে আযাদ করে নিতে পারে) চুক্তি করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কিতাবতের অর্থ আদায় করে পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বিবাহ করে নেন। মুসলমানরা তখন বনু মুসতালিকের এক শ' পরিবারকে আযাদ করে দেন। তাদেরকে তারা বলতেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্বশুরালয়ের লোক। এ কারণে জুওয়াইরিয়া রা. ছিলেন তাঁর কওমের সবচেয়ে মুবারক নারী। পঞ্চান্ন কিংবা ছাপ্পান্ন হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে পয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

নয়. উম্মে হাবীবা রমলা বিনতে আবী সুফিয়ান রাঃ প্রথমে তিনি উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন। উবাইদুল্লাহ থেকে হাবীবা নামের একটি মেয়ে জন্ম

গ্রহণ করলে তিনি উম্মে হাবীবা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। পরে উবাইদুল্লাহর সঙ্গে হিজরত করে হাবশায় চলে যান। কিন্তু হাবশা গিয়ে উবাইদুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপরদিকে উম্মে হাবীবা রা. আপন দীন ও হিজরতের ওপর বহাল থাকেন। পরবর্তীতে সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পত্র নিয়ে আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রা. নাজ্জাসীর কাছে যান। তখন বাদশাহ নাজ্জাসী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে উম্মে হাবীবাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং তাঁর সম্মতিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাকে বিবাহ দেন। বিবাহের মোহরানা স্বরূপ চার শ' দীনার নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন এবং শুরাহবীল ইবনে হাসানার সঙ্গে তাকে মদীনায় প্রেরণ করেন। খাইবর থেকে ফিরে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘরে উঠিয়ে নিয়ে আসেন। হিজরী বিয়াল্লিশ বা চুয়াল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

দশ. সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব রাঃ তিনি ছিলেন বনু ইসরাঈলের বনু নযীর বংশের সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। খাইবরের বন্দিনী হয়ে এসেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তার সামনে ইসলাম পেশ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে আযাদ করে দেন এবং সপ্তম হিজরীতে খাইবরের পরে তাকে বিবাহ করে নেন। মদীনায় ফিরে আসার পথে খাইবর থেকে বারো মাইল দূরে 'সাহবা' বাঁধের কাছে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গে বাসর রাত যাপন করেন। পঞ্চাশ কিংবা বায়ান্ন কিংবা ছত্রিশ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

এগারো. মাইমুনা বিনতে হারিস রা : তিনি ছিলেন আব্বাস রা. এর স্ত্রী উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতে হারিসের বোন। বিশুদ্ধ মতে, সপ্তম হিজরীর যুলকা'দ মাসে উমরাতুল কাযা থেকে হালাল হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করেন। মক্কা থেকে নয় মাইল দূরে সারিফ নামক স্থানে তাঁর সঙ্গে বাসর করেন। ঘটনাক্রমে সেই সারিফ নামক স্থানেই একষট্টি কিংবা তেষট্টি অথবা আটত্রিশ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়। তাঁর কবরস্থানটি আজও সেখানে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

এই ছিল মোট এগারো জন স্ত্রী, যাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেছিলেন এবং যাদের সঙ্গে তাঁর ঘরও হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে দু'জন- খাদীজা ও উম্মুল মাসাকীন যয়নব- রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। বাকী ন'জন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের সময় জীবিত ছিলেন।

আর যে দু'জনের সঙ্গে তার ঘর হয়নি তাদের একজন ছিলেন বনু কিলাবের মেয়ে। আরেক জন ছিলেন বনু কিন্দার। আর তিনিই জুনিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিভিন্ন মতামত ও মতানৈক্য রয়েছে আমরা সেগুলোর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করে নিবৃত্ত রইলাম।

আর দাসীদের মধ্য থেকে দু'জন দাসী রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাছে রেখেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন মারিয়া কিবতিয়া রা.। মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়া রাজ মুকাওকিস তাকে রাসূলে কারীম এর জন্য হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর গর্ভে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র সন্তান ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশাতেই দশম হিজরীর শাওয়াল মাসের আটাশ কিংবা ঊনত্রিশ তারিখ মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারী শৈশবেই মদীনাতে ইন্তেকাল করেন।

আর তাদের দ্বিতীয়জন ছিলেন রায়হানা বিনতে যায়দ নাযরিয়্যা বা কুরযিয়্যা। তিনি বনু কুরাইযার বন্দিনী ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন। কারও কারও মতে, দাসী নন; বরং তিনি ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদের একজন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম র. প্রথম মতটিকেই সমর্থন করেছেন। আবু উবাইদা আরও দু'জন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের একজন হলেন জামীলা। কোনো এক যুদ্ধে তিনি বন্দিনী হয়ে এসেছিলেন। আর দ্বিতীয় জন হলেন যয়নব বিনতে জাহাশ কর্তৃক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হাদিয়াস্বরূপ প্রদত্ত এক দাসী।[৭৬০]

অপূর্ব শোভা-সুষমায় ভাস্বর নবী জীবনের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করলে অতি সহজেই সেখানে সে দেখতে পাবে, জীবন-যৌবনের সিকি শতাব্দী এক বৃদ্ধার সঙ্গে কাটিয়ে দিয়ে যৌবনের প্রায় ত্রিশটি বসন্ত যখন পেরিয়ে গিয়েছিল, জীবন সূর্য সবচেয়ে তাপ-উত্তপ্ত আর সমৃদ্ধ সময়গুলি পেরিয়ে গিয়ে যখন অস্তমুখী হচ্ছিল ঠিক তখনই এ সকল নারীর সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। এগুলি ছিল জীবনের গোধূলি বেলার ঘটনা। যে কোনো পাঠক খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এ সকল বিবাহ কখনো

---

[৭৬০] দেখুন যাদুল মাআদ ১/২৯।

প্রবৃত্তি-তাড়িত ছিল না। এ কারণে ছিল না যে, জীবনের সন্ধ্যা বেলায় হঠাৎ তাঁর ভেতরে যৌবনের এমন এক প্লাবন-প্রলয় সৃষ্টি হলো, যা বাঁধ দিয়ে আটকে রাখা তাঁর পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব ছিল না। আর এ কারণে সে চাহিদা পূরণ করতে তাকে এতগুলি বিবাহ করতে হয়েছিল। বরং মানব জীবনে বিবাহের যে সাধারণ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং বিবাহের মাধ্যমে যে সকল সাধারণ প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব হয়ে থাকে নবী জীবনের এ সকল বিবাহে সেগুলির চেয়েও বড় বড় আরও অনেক উদ্দেশ্য ও হিকমত লুকানো ছিল।

এ কারণে আমরা দেখতে পাই আবু বকর রা. ও উমর রা. এর এক এক মেয়ে- আয়েশা ও হাফসা রা.- কে বিয়ে করার মাধ্যমে, স্বীয় দুই মেয়ে রুকাইয়্যা অতঃপর উম্মে কুলসূম রা. কে উসমান রা. এর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার মাধ্যমে এবং ফাতিমা রা. কে আলীর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্য ঐ চারজন ব্যক্তির সঙ্গে গভীর ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা, যারা ইসলামের ওপর আপতিত প্রতিটি সংকটকালে, তার প্রতিটি বাঁকে বাঁকে সাহায্য সহযোগিতার হাত কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন গোটা পৃথিবী তা দেখেছিল।

একইভাবে শ্বশুর গোষ্ঠীকে সম্মান করা ছিল তৎকালীন আরবের একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। এরই ওপর ভিত্তি করে বিবাদমান ও দ্বন্দ্বমুখর বিভিন্ন কবীলার মাঝে মিলনের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম ছিল এদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। পাশাপাশি শ্বশুর গোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘাত কিংবা সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া তাদের নিকট কাপুরুষতা এবং কলঙ্কের প্রমাণ ও পরিচয়বাহী ছিল। এ কারণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন এ পন্থায় শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দিতে। তাদের বিদ্বেষ ও দুশমনির আগুন সম্পর্কের পানি দিয়ে নিভিয়ে ফেলতে। উদাহরণত উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা. ছিলেন আবু জাহল ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. এর কবীলা বনু মাখযূমের মেয়ে। এ কারণে দেখা যায় তাকে বিবাহ করার পরে খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. আর কোনোদিনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেই কঠোরতা ও হিংস্রতা নিয়ে দাঁড়াননি, যে কঠোরতা ও হিংস্রতা দেখা গিয়েছিল উহুদের ময়দানে। বরং দিন কয়েক পরে স্বেচ্ছায় এবং সানন্দচিত্তে নিজেই দরবারে রিসালতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। একইভাবে উম্মে হাবীবা রা. কে বিবাহ করার পরে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ানও রা. কখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে আর নামেননি। এমনিভাবে ইহুদি কবীলা বনু মুসতালিক ও বনু নযীর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে নিত্যদিনের আস্ফালন ছেড়ে দিয়েছিল, যখন তিনি তাদের মেয়ে

জুওয়াইরিয়া ও সাফিয়্যা রা. কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। বরং জুওয়াইরিয়া রা. তাঁর কওমের সবচেয়ে মুবারক রমণী প্রমাণিত হয়েছিলেন। কারণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার পরে সাহাবায়ে কেরাম তাদের এক শ' বন্দী পরিবারকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আর তারা বলতেন, তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্বশুরালয়ের মানুষ। পরবর্তী সময়ে এটা তাদের অন্তরে কত বড় ও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল তা কারো অজানা নয়।

এ সব কিছু থেকে আগে বেড়ে সেখানে আর যে একটি পবিত্র স্বার্থ ও মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কাজ করছিল তা হলো, এ বিশ্ব ভুবনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করা হয়েছিল অসভ্য ও বর্বর মানবতাকে সভ্যতা ও শান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অসংস্কৃত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে সংস্কৃতিমনা সুস্থ ও সুন্দর জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। ঐ সকল মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য যারা সভ্যতা, সংস্কৃতি আর নগরজীবনের নামও কোনোদিন শুনেছিল না। এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি, যে সমাজ পৃথিবীতে ছিল একটি নয়া রঙের ও নতুন আদলের সমাজ। যে সমাজের অবকাঠামো আর সৃষ্টিকৌশল সম্পর্কে এ পৃথিবীর কোনো পূর্বজ্ঞান ছিল না।

অথচ নতুন এই ইসলামী সমাজের প্রধান প্রধান নীতিমালা অনুসারেই নারীর সঙ্গে পুরুষের মেলা-মেশার কোনো সুযোগ ছিল না। সে কারণে এ নীতিমালার প্রতি চোখ রাখতে গেলে সরাসরি তাদেরকে বিশুদ্ধ ও সুনির্মল করার কোনো পথ ছিল না। অথচ পুরুষদের ঠিক করার চেয়ে নারীদেরকে ঠিক করার কাজটি কিন্তু খুব সহজসাধ্য ছিল না; বরং সেটা ছিল আরও কঠিন, দুঃসাধ্য ও দুরূহ।

তাহলে কি সৃষ্টির এ অর্ধাংশ অন্ধকারেই পথ হাতড়ে বেড়াবে? মানবতার এ অর্ধেক জনগোষ্ঠী জাহেলিয়াত ও বর্বতার পাঁকে তলিয়ে থাকবে? কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? আর এ কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন এলাকার, বিভিন্ন কবীলার এ সকল নারীকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে নিজের একান্তে এনে সরাসরি তাদের শুদ্ধ করেছেন, তাদেরকে ইসলামের মহলে লালন করে আসমানী দীন ও শরীয়তের নীতিমালার শিক্ষা ও দীক্ষা দান করেছেন। তাদেরকে ইসলামের সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিমনা করে তুলেছেন। এভাবে দিনে দিনে তাদেরকে দাওয়াতী ময়দানের যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। এভাবে নারী জাতির মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের প্রচার-প্রসারের কাজ তারাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

একইভাবে নবীজীর ঘরোয়া যিন্দিগী ও তাঁর পারিবারিক জীবনের সিংহভাগ চিত্রই উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে উম্মতের হাতে এসেছে। বিশেষ করে তাদের

মধ্যে যারা তাঁর পরে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, তারা হযরতের ব্যক্তি জীবনের অজানা এক বিশাল ভুবন উম্মতের জন্য রচনা করে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান আয়েশা রা.। তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অসংখ্য হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিবাহ ছিল আরব সমাজে জাহেলিয়াতের একটি বদ্ধমূল প্রথা ও কুসংস্কার কান ধরে উপড়ে ফেলার নিমিত্ত। আইয়ামে জাহেলিয়াতে আরবরা স্বীয় ঔরসজাত সন্তানের ক্ষেত্রে যে সকল অধিকার ও বিধান প্রয়োগ করত পালকপুত্রের ব্যাপারেও সকল অধিকার ও বিধান তারা সমান ভাবত। এটা ছিল একটি চরম ভুল ধারণা ও অন্ধকার কুসংস্কার। অথচ, এই কুসংস্কারটি সকলের হৃদয়ে মজবুত আসন গেড়ে বসেছিল। তাদের বিশ্বাস আর কর্মের সঙ্গে এটা এতটা অসঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল যে, সহজে তার বিলোপ সাধন সম্ভব ছিল না। অথচ, ইসলামের বিবাহ, তালাক ও মীরাস ইত্যাদি বিধি-বিধান ও নীতিমালার ক্ষেত্রে আরবীয় এ জাহেলী কুসংস্কারের সরাসরি সংঘাত ছিল। পাশাপাশি এ কুসংস্কার ও দাদা-যুগীয় ঐতিহ্য এমন বহু সামাজিক অপরাধ ও ফিতনার পথ খুলে রেখেছিল, যে পথ বন্ধ করার মিশন নিয়েই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধামে এসেছিলেন।

আর মহাকৌশলী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলমীনের ইচ্ছা ছিল বর্বর এই জাহেলী প্রথার বিলোপ সাধন স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতেই হোক। তাই পরবর্তীতে এমনই হয়েছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশে রা. তাঁর পালকপুত্র যায়দ বিন হারেসা রা. এর সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। যায়দ বিন হারেসাকে আরবের লোকেরা তাদের প্রথা অনুসারে যায়দ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকত। যাই হোক বিবাহের মধ্যে যায়দ ও যয়নবের মধ্যে মিল-তাল না হওয়ার কারণে যায়দ বিন হারেসা রা.তাকে তালাক দিতে মনোস্থ করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ ব্যাপারে তিনি কথা বললেন। এদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জানতে ও বুঝতে পেরেছিলেন যে, যায়দ বিন হারেসা কর্তৃক তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যয়নবের সহিত বিবাহ করার নির্দেশ দিবেন। এ সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন সফরের এক সংকীর্ণ ও শ্বাপদসংকুল পথ মাড়াচ্ছিলেন। আরবের মুশরিকরা হাজার হাজার সাপের রূপ ধারণ করে চতুর্দিক থেকে সেই সংকীর্ণ পথে তাদেরকে ঠোকর মারতে ফনা ধরে ছিল। এ কারণে

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শঙ্কা ছিল জীবনের এই চরম নাযুক মুহূর্তে আবার যদি তাঁর দ্বারা এমন একটি বিবাহ হয়ে যায়। তবে ইহুদি, মুশরিক ও মুনাফিকরা তাকে একযোগে ছোবল দিবে। সর্বনাশা শত কামড় বসিয়ে দিবে তাঁর এ দুর্বল স্থানে। তাঁর বিরুদ্ধে গোটা জাযীরাতুল আরব জুড়ে গুজব আর কুৎসার ঝড় বয়ে যাবে। এটা তাঁর এতদিনের সাঁজানো গোছানো ও প্রায় বাস্তবায়নের পথে চলা সবগুলি স্বপ্নের ডেরা ভেঙে তছনছ করে দিবে। দুর্বল মুমিনদের হৃদয়গুলির ওপর এটা এমন এক নিদারুণ প্রভাব ফেলবে, যার ফলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। এ কারণে যায়দ বিন হারেসা রা. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে যখন যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন তিনি যায়দ র. কে সরাসরি তালাক না দেওয়ার নির্দেশ দেন। যাতে করে তাকে সেই খতরনাক ও সঙ্গিন মুহূর্তে এ ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখামুখি না হতে হয়।

কিন্তু বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার এটা পছন্দ হলো না। তাঁর রাসূল মানুষের নিন্দা ও চক্ষুলজ্জাকে ভয় করবেন এটা তিনি মেনে নিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে হালকা ধমকের সুরে ওহী নাযিল করলেন,

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ.

আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন। অথচ, আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। [সূরা আহযাব:৩৭]

পরিশেষে যায়দ রা. তাকে তালাক দিয়ে দেন। তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পরে বনু কুরাইযার অবরোধ চলাকালে রাসূলে কারীম তাকে বিবাহ করে নেন। আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবীবের ওপর এ বিবাহ ওয়াজিব করে দিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাকে তিনি কোনো ইচ্ছাধিকার প্রদান করেননি; এমনকি স্বয়ং রাব্বুল আলামীন নিজে এ বিবাহের যিম্মাদারি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا.

অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের

স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে। [সূরা আহযাব:৩৭]

উদ্দেশ্য পালকপুত্র সম্পর্কিত জাহেলী আরবীয় প্রথাটি যেন বাস্তবই উঠে যায়। আগে যাকে নির্দেশ ও কথার মাধ্যমে উঠিয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছিল:

আল্লাহ ইরশাদ করেন–

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার দিকে সম্বন্ধ করো! এটা আল্লাহর কাছে অধিক ন্যায় সঙ্গত।

আরও ইরশাদ হয়েছিল:

.مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। [সূরা আহযাব:৪০]

এভাবে কোনো সমাজে যখন কোনো প্রথা কিংবা কুসংস্কার জেঁকে বসে, সেখানে তা যখন তার শক্ত আসন গেঁড়ে নেয়, তখন তাকে শুধু কথা কিংবা দাওয়াতের মাধ্যমে ঝেঁটিয়ে দেওয়া যায় না; বরং এর জন্য সে ময়দানে সেই দাওয়াতের কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদের কর্মপদ্ধতির ফলাফল দেখিয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই তাড়ানো সম্ভব। এ জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের ঘটনাটি। সেখানে ইসলামের প্রথম যুগের ঐ সকল স্বর্ণ-মানব মুসলমানগণ ছিলেন, যাদেরকে কুরাইশ দূত উরওয়া ইবনে মাসউদ দেখেছিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কফ ও নাকের পোঁটা ফেললেও তারা তা হাতে নিয়ে নিচ্ছিল। উরওয়া তাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উযূর পনির জন্য প্রতিযোগিতা বরং মারামারি বাঁধানোর উপক্রম হতে দেখছিল। হাঁ, এরাই ঐ সমস্ত লোক ছিলেন, যারা ঐতিহাসিক গাছের নীচে মরে যাওয়া এবং ময়দান থেকে না ভাগার ওপর বাইয়াত হওয়ার জন্যও প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উমর রা. এর মতোও মানুষ ছিলেন। তাঁর জন্য এ সকল প্রাণোৎসর্গী সাহাবীকেই যখন তিনি সন্ধিচুক্তি হওয়ার পরে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ কুরবানীর পশু কুরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন সত্যের সোনালী পথের এ অগ্রগামী সূর্য-পথিকদের একজনও সেদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ মানার জন্য দাঁড়ালেন না। এ অবস্থা দেখে তখন তিনি দারুণ উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণে যখন উম্মে সালামা রা. তাকে কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী দিতে বললেন এবং তিনি দিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অনুসরণের জন্য

দৌড়ে গেলেন। পুরো ময়দান জুড়ে তখন দ্রুত পশু কুরবানীর এক অভিনব প্রতিযোগিতা চলছিল। এ ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, সমাজের গভীরে শেকড় গেড়ে বসা পুরনো কোনো কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রে কেবল দাওয়াত আর কর্মের ময়দানে তাঁর প্রকৃত বাস্তবায়নের মাঝে কি বিশাল ফারাক রয়েছে!

যয়নব রা. এর সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবাহ হলো। মুনাফিকদের জন্য এটা ছিল একটা স্বর্ণ-সুযোগ। অধরা যেই সোনার হরিণের পেছনে তারা এতদিন ধরে ছুটছিল, এখন সেটা একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাজারো গুজব আর অপ্রীতিকর উক্তির ধোঁয়া তুলে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পেলো। কিছু কিছু দুর্বল মুমিনের অন্তরে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা কৃতকার্যও হলো। বিশেষ করে তাদেরকে যে ব্যাপারটি দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল তা হলো যয়নব রা. ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঞ্চমা স্ত্রী। অথচ, চারের অধিক বিবাহ বৈধ হওয়ার কথা মুসলমানরা তাদের নবীর মুখে কোনোদিনও শুনতে পাননি। অপরদিকে যায়দ বিন হারেসা রা. কে রাসূল পুত্র মনে করা হতো। আর পুত্রবধূকে বিবাহ করা ছিল বিশাল এক সর্বনাশা অপরাধ ও কবীরা গুনাহ। তখন আল্লাহ তাআলা সূরা আহযাবে এ বিষয় দু'টির ওপর সবিস্তারে আলোকপাত করেন। সেখানে তিনি এমনভাবে এ দু'টির সমাধান দিয়ে দেন, যাতে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ-সংশয় বাকি থাকে না। সাহাবায়ে কেরাম তখন বুঝতে পারলেন, ইসলামে পালকপুত্রের এ ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব নেই। পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা প্রিয় হাবীবের জন্য বিবাহের ক্ষেত্রে যতটা ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি রেখেছেন অন্য কারও জন্য রাখেননি। কারণ এর পেছনে লুকিয়ে আছে এমন কতগুলো মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, যা গোটা সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর।

এ সব কিছুর পাশাপাশি উম্মাহাতুল মুমিনীনের সঙ্গে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পারিবারিক জীবন ছিল পৃথিবীর সব ধরনের পূত-পবিত্রতা, শুচি-শুভ্রতা, সম্ভ্রম ও শ্রেষ্ঠত্ব, মহানতা ও সৌন্দর্যের সুষমায় মণ্ডিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতো উম্মাহাতুল মুমিনীনও ছিলেন শারাফাত ও কানাআত, ধৈর্য ও বিনয়, সেবা ও সহযোগিতা, খেদমত ও বৈবাহিক জীবনের অধিকার ও দাবি আদায়ে নিবেদিতপ্রাণ। অথচ, রাসূলের ঘরে তখন আসবাব ছিল না। পেটে খাবার ছিল না। কঠিন জীবনের দমকা হাওয়ায় জীবনের হালকা ঝুপড়িটি ছিল সদাকম্পিত। আনাস রা.বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আমি কোনোদিন ময়দার নরম রুটি খেয়েছেন কি না জানি না। এ অবস্থাতেই তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

তেমনিভাবে তিনি ভুনা বকরী কোনো দিন নিজ চোখে দেখেননি। [৭৬১]আয়েশা রা. বলেন, আমরা চাঁদের দিকে চেয়ে থাকতাম। কখনো কখনো দুই চাঁদ শেষে আমাদের ওপর তিন চাঁদ চলে আসত; কিন্তু এ সময়ে রাসূলের কোনো ঘরের চুলায় আগুন জ্বলত না। উরওয়া রা. তাকে তখন বললেন, তবে আপনারা কী খেয়ে থাকতেন? তিনি বললেন, কেবল দু'টি কালো বস্তুঃ খেজুর আর পানি। [৭৬২]এ প্রসঙ্গে হাদীসের গ্রন্থগুলোতে শত শত হাদীস ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু এত ঝঞ্ঝা আর দেয়াঘেরা কঠোর জীবন সত্ত্বেও এ সকল মহীয়সী নারী থেকে এমন কিছু কোনোদিনও প্রকাশ পায়নি, যার কারণে তাদেরকে তিরষ্কার করা যেতে পারে। হাঁ, একবার এ ধরনের সামান্য একটু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এটা তো ছিল মানবিক চাহিদা। তা ছাড়া তাতে ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন আইন প্রণয়নের পথও খুলেছিল। আল্লাহ তাআলা তখন নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

হে নবী, আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা করো, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদের বিদায় দেই। পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সৎকর্মপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সূরা আহযাব:২৮-২৯]

আর এখানেই তাদের মনের সৌন্দর্য আর আত্মার শুদ্ধতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল যে, তারা সকলেই তখন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বেছে নিয়েছিলেন।

একইভাবে দুই সতিনের মাঝে পারিবারিক জীবনে বরাবর যে সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এতজন স্ত্রীগণের মাঝে তা কোনোদিনও হয়নি। হাঁ, কয়েক জনের কাছ থেকে যদিও মানবিক চাহিদার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ এক বার প্রকাশ পেয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে তিরষ্কার ও ধমক দিলেন। ফলে দ্বিতীয় বার কোনোদিনও আর এমন হয়নি। এ প্রসেঙ্গ সূরা তাহরীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছিলেন:

---

[৭৬১] সহীহ বুখারী ২/৯৫৬।
[৭৬২] প্রাগুক্ত।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ অর্থাৎ, হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা আপনি কেন হারাম করছেন? .... পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত।

শেষ কথাঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একাধিক স্ত্রীর ব্যাপারে এখানে আমি দীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা নবী চরিত্রের এ দিকটি নিয়ে যাদের মুখ হরদম সরগরম, এ বিষয়টি যাদেরকে সবচেয়ে বেশি কাতুকুতু দেয়; এক কথায় যারা এর চরম বিদ্বেষী- সেই ইউরোপীয় খ্রিস্টান দুনিয়ার প্রতি একটুখানি নজর বুলিয়ে দেখুন! প্রতিটি কদমে কদমে জীবন তাদেরকে লাথি মারছে। যিন্দিগির প্রতিটি ধাপে ধাপে হাজারো লাঞ্ছনার স্তূপ তাদের মাথার ওপর ঝুলে পড়ছে। পোড়াকপালগুলি কলুষময় জীবনের ধূলা-বালি শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলার যত চেষ্টা করছে, সেগুলি তাদের শরীরে তত শক্ত হয়ে জমাট আস্তর তৈরি করছে। পারিবারিক জীবনের অস্থিরতা আর উদ্বেগের সমুদ্রে পড়ে তারা অহোরাত্র হাবুডুবু খাচ্ছে। কেননা তারা 'কারণ' ছেড়ে 'কেন'র পেছনে ছুটছে। একাধিক বিবাহের এ মহা মূলনীতি ছেড়ে অন্য পথে চোরা কারবারীর চেষ্টা করছে। তাই পশ্চিমা সভ্যতার জীবন-ধারাই একাধিক বিবাহ যথাযথ হওয়ার সবচেয়ে বড় ও জ্বলন্ত উদাহরণ। 'নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল ও ভাবুকদের জন্য মহা শিক্ষা'।

সৌন্দর্যের অনন্যতায় ভাস্বর তুমি

সৃষ্টির নিরুপমতা আর চরিত্রের পরিপূর্ণতার এমন এক অনন্য ভূষণে বিভূষিত ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যা মানবীয় ভাষায় কলমের কালি দিয়ে কাগজের পিঠে অঙ্কন করা কোনো দিনও সম্ভব নয়। জামাল আর কামালের অনন্য শোভায় ভূষিত মানবতার এ মহা গৌরবময় মহা নায়কের অবস্থা ছিল এই যে, মানুষের হৃদয়গুলো তার শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় উচ্ছল তরঙ্গধারার মতো সদা বহমান ছিল। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ আর তাঁর পরিচর্যায় লোকজন সদা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ছিল। এ ছিল এমন এক ইতিহাস পৃথিবীর মানুষেরা কোনো দিন আর কোনো মানুষের ব্যাপারে যে ইতিহাস শুনেনি। আর নিশ্চিতভাবেই কোনো দিন শোনার কপালও হবে না। যারা এ মানুষটির সঙ্গে থেকেছিল,কাছ থেকে তাকে দেখেছিল, তাদের হৃদয় আর মনগুলো তাঁর জন্য শাশ্বত দিওয়ানা ছিল। তাঁর মহব্বত আর ভালবাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছিল। এ ছিল এমন এক মহব্বত ও ভালবাসা; কমনীয় কুমারী তন্বীর প্রেম যার কাছে বড় তুচ্ছ আর নগণ্য ছিল। তাদের জীবন চলে যায় যাবে- তাতে কোনো আফসোস নেই! কিন্তু এ মানুষটির গায়ে একটি নখের আঁচড়ও লাগতে দেওয়া যাবে না! এই ছিল সেই মহব্বতের উদাহরণ। তাদের এই যে মহব্বত আর ভালোবাসা- তার কারণ কী ছিল? কারণ ছিল- এ মহান মানুষটি দৈহিক ও চারিত্রিক কামালের এমন শোভায় সুশোভিত ছিলেন, যা মানুষকে এমনিতেই চুম্বকের মতো কাছে টেনে আনে। এ ছিল এমন এক শোভা, যা তাঁর মতো পৃথিবীর আর কোনো বনী আদমের কপালে জুটেনি। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা সেই শোভা-সৌন্দর্যের অপূর্ব ফল্গুধারার খানিকটা চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পাবো। পাশাপাশি এটা কিন্তু আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি- এ চাঁদের সৌন্দর্য-সুষমা পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

সৃষ্টি সৌন্দর্য

হিজরতের সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে গমন করেন, তখন চলে যাওয়ার পরে উম্মে মা'বাদ খুযাঈ নিজ স্বামীর কাছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছিলেন এভাবে: চন্দ্রালোকিত বদন আর অপরূপ আলোকিত মুখায়বের সৌন্দর্যে ভূষিত ছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য ছিল সুষমামণ্ডিত। উদরের স্থূলতা কিংবা মাথার ক্ষুদ্রতা আর বিশালতার কলুষতা তাঁর ভেতরে ছিল না। তিনি ছিলেন অতি সুন্দর, মহা রূপবান। তাঁর নয়ন-মণি ছিল ঘন কালো। আর পাপড়িমালা ছিল বিলম্বিত। তাঁর আওয়াজ ছিল সহজবোধ্য

মধুময়। আর গণ্ডদেশ ছিল উজ্জ্বল। তাঁর শুভ্র নয়ন কোটরে ঘন কালো মণি জ্বলজ্বল করছিল। তিনি ছিলেন টানা টানা কাজলকালো লোচনের অধিকারী। তাঁর ভ্রুযুগল ছিল ঈষৎ সূঁচালো। দুই নয়নের মাঝখানে এ যুগলের মিলন হয়েছিল। তাঁর কেশরাশি ছিল কৃষ্ণকালো। যখন তিনি চুপ থাকতেন গাম্ভীর্যের এক বিশাল মণ্ডল তাকে ঘিরে রাখত। আর যখন তিনি কথা বলতেন তখন এক প্রখর দীপ্তি তাঁর ওপর ছড়িয়ে পড়ত। দূর থেকে তিনি ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রদীপ্ত। আর কাছ থেকে সবচেয়ে মোহনীয় ও সুমিষ্ট। তিনি ছিলেন প্রিয়ভাষিণী। অতিভাষী ছিলেন না। আবার লঘুভাষীও ছিলেন না। তাঁর মুখের কথাগুলো সুবিন্যস্ত মুক্তোদানার মতো ঝরে পড়ত। তিনি দীর্ঘকায় ছিলেন না। আবার খর্বকায়ও ছিলেন না। এমন বেঁটে ছিলেন না যে, দেখা যায় না। আবার এত লম্বাও ছিলেন না যে, দৃষ্টিকটু মনে হয়। দু'টি ডালের মাঝে একটি ডাল; যা তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজীব, তরতাজা ও প্রাণবন্ত। তাঁর সঙ্গীরা তাকে পরিবেষ্টিত করে রাখেন। যখন তিনি কোনো কথা বলেন তখন তারা অভিনিবেশ সহকারে শ্রবণ করেন। কোনো নির্দেশ দিলে, সে নির্দেশ পালনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন অনুকরণীয়, মজলিসের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি রুষ্ট কিংবা বাচাল নন।[৭৬৩]

আলী রা. বলেন, তিনি খুব লম্বা ছিলেন না। আবার একেবারে খাটোও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সবার চেয়ে মাঝ গড়নের। চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না আবার একেবারে খাড়া খাড়াও ছিল না। কপোলদেশ প্রচুর মাংসময় ছিল না। আবার অতি শুকনোও ছিল না। তাঁর মুখাবয়ব গোলাকার ছিল। শরীরের বর্ণ ছিল শ্বেত-শুভ্র গোলাপী। কাজলকালো চোখ, প্রলম্বিত পাপড়ি। হাঁটু, কনুই কাঁধ ঈষৎ মোটা ছিল । বক্ষদেশ থেকে নাভীদেশ পর্যন্ত হালকা লোমের সরু একটি রেখা ছিল। শরীরের বাকী অংশ ছিল লোমমুক্ত। হাতের তালু ও পায়ের গোছা মাংসপূর্ণ ছিল। যখন চলতেন তখন ঈষৎ দ্রুত কদম উঠাতেন এবং মনে হতো কোনো ঢালু জমিনে অবতরণ করছেন। কোনো দিকে তাকালে পূর্ণ চেহারা নিয়ে তাকাতেন। তাঁর দুই স্কন্ধদেশের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুওত। তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দানবীর। সর্বাপেক্ষা সাহসী। সবচেয়ে সত্যভাষী। সবার চেয়ে বেশি অঙ্গীকার পূর্ণকারী। সবচেয়ে বেশি বিনম্র আর সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত। হঠাৎ কেউ তাকে দেখলে ভয় পেয়ে যেত। আর যে জেনে-শুনে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হতো সে তাকে ভালোবেসে ফেলত। তাঁর প্রশংসাকারী এটাই বলতে পারে, তাঁর আগে ও তাঁর পরে আমি তাঁর মতো কোনো মানুষ দেখিনি।[৭৬৪]

---

[৭৬৩] যাদুল মাআদ ২/৫৪।
[৭৬৪] ইবনে হিশাম ১/৪০১, ৪০২। জামেউত তিরমিযী এবং তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩০৩।

অপর এক বর্ণনায় আলী রা. বলেন, তাঁর মাথা বড় ছিল। জোড়ার অস্থিগুলো ভারী ছিল। বক্ষদেশ থেকে নাভীদেশ পর্যন্ত হালকা লোমের সরু একটি রেখা ছিল। যখন তিনি পথ চলতেন তখন খানিকটা ঝুঁকে চলতেন। মনে হতো কোনো ঢালু স্থানে অবতরণ করছেন।[৭৬৫]

জাবের বিন সামুরা রা. বলেন, তাঁর মুখ প্রশস্ত ছিল। আর নয়নজোড়া ছিল লালিমাভ। পায়ের গোড়ালি ছিল চিকন। [৭৬৬]

আবু তুফাইল রা. বলেন, তিনি ছিলেন শ্বেত-শুভ্র। লাবণ্যময় মুখাবয়ব এবং মাঝারি গড়নের।[৭৬৭]

আনাস বিন মালিক রা. বলেন, তাঁর হাতের তালু প্রশস্ত ছিল। তিনি আরও বলেন, তিনি ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের। পুরো শ্বেত-শুভ্র নয় আবার পুরো গৌর বর্ণেরও নয়। ওফাতের মুহূর্ত পর্যন্ত মাথা ও মুখাবয়বয়ের কুড়িটি চুল বা দাঁড়িও সাদা হয়েছিল না।[৭৬৮]

তিনি আরও বলেন, কেবল কানের লতির লোমগুলোতে শ্বেতিমা চলে এসেছিল। অপর এক বর্ণনায়, মাথার কয়েকটি চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল।[৭৬৯]

আবু জুহাইফা রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধরদেশের নীচের কয়েকটি লোম (নিমদাড়ি) সাদা হতে দেখেছি।[৭৭০]

আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র রা. বলেন, তাঁর কয়েকটি নিমদাড়ি পেকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। [৭৭১]

বারা রা. বলেন, তাঁর মুখাবয়ব মাঝারি গড়নের ছিল। দুই কাঁধের মাঝখানে বেশ প্রশস্ত জায়গা ছিল। মাথার কেশরাশি কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল। আমি তাকে একটি লাল চাদর পরিহিত দেখেছি। আমি কোনোদিন তাঁর চেয়ে সুন্দর আর কিছু দেখিনি। [৭৭২]

আহলে কিতাবের মতো তিনি প্রথমে মাথায় সিঁথি করতেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সিঁথি করতেন।[৭৭৩]

---

[৭৬৫] জামেউত তিরমিযী ও তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩০৩।
[৭৬৬] সহীহ মুসলিম ২/২৫৮।
[৭৬৭] প্রাগুক্ত।
[৭৬৮] সহীহ বুখারী ১/৫০২।
[৭৬৯] প্রাগুক্ত। সহীহ মুসলিম ২/২৫৯।
[৭৭০] সহীহ বুখারী ১/৫০১,৫০২।
[৭৭১] প্রাগুক্ত ১/৫০২।
[৭৭২] প্রাগুক্ত।
[৭৭৩] সহীহ বুখারী ১/৫০৩।

বারা রা. বলেন, তাঁর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর আর তাঁর চরিত্র ছিল সর্বোত্তম।[৭৭৪]

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁর চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? তিনি বললেন, না। বরং তাঁর চেহারা ছিল পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদের মতো। অপর এক বর্ণনায়, তাঁর চেহারা ছিল গোলাকার।[৭৭৫]

রুবাইয়্যি বিনতে মুআওইয বলেন, যদি তুমি তাঁকে দেখতে তবে তোমার মনে হতো, তুমি উদীয়মান সূর্যকে দেখছ।[৭৭৬]

জাবের বিন সামুরা রা.বলেন,চন্দ্রালোকিত এক রাতে আমি তাঁকে দেখেছি। তাঁর গায়ে তখন একটি লাল চাদর ছিল। আমি তখন একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে, আরেক বার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তখন আমার কাছে তাঁকে চাঁদের চেয়েও সুন্দর মনে হলো।[৭৭৭]

আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে খুবসুরত পৃথিবীর কোনো কিছু দেখিনি। মনে হতো, সূর্য তাঁর মুখাবয়বে ছোটাছুটি করছে। আর আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে দ্রুত হাঁটতে আর কাউকে দেখিনি। মনে হতো মাটি তাঁর জন্য সঙ্কুচিত হয়ে আসত। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। অথচ, তিনি থাকতেন সম্পূর্ণ বেপরওয়া।[৭৭৮]

কা'ব বিন মালিক রা. বলেন, যখন তিনি আনন্দবোধ করতেন তখন তাঁর মুখচ্ছবি দীপ্তিময় হয়ে উঠত। যেন ঠিক এক টুকরো চাঁদ![৭৭৯]

এক বার তিনি আয়েশা রা এর কাছে ছিলেন। আয়েশা রা. সুতা কাটছিলেন। আর তিনি জুতো সেলাই করছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন। তখন তাঁর মুখচ্ছবির রেখাগুলো ঝলমলিয়ে উঠতে লাগল। এ দৃশ্য আয়েশা রা. এর নজরে পড়া মাত্রই তিনি হতবিহ্বল হয়ে বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আবু কাবীর হুযালী যদি আপনাকে দেখত তবে সে জানত আপনার চেয়ে আর কেউ তার এই কবিতার অধিকতর যোগ্য নয়:

وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى أَسِرَّةِ وَجْهِهِ ... بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ[780]

---

[৭৭৪] সহীহ বুখারী ১/৫০২। সহীহ মুসলিম ২/২৫৮।
[৭৭৫] সহীহ বুখারী ১/৫০২। সহীহ মুসলিম ২/২৫৯।
[৭৭৬] দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫১৭।
[৭৭৭] শামায়েলে তিরমিযী পৃষ্ঠা ২। দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ২/৫১৮।
[৭৭৮] তিরমিযী ও তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩০৬। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫১৮।
[৭৭৯] সহীহ বুখারী ১/৫০২।
[৭৮০] ইবনুল আসকির প্রণীত তাহযীবে তারীখে দিমাশক ১/৩২৫।

'যদি তুমি তাঁর মুখচ্ছবির রেখাগুলোর প্রতি চোখ বুলাও- তবে দেখতে পাবে তাতে প্রখর বিজলীর প্রদীপ্ত ঝলকানি'।

আবু বকর রা. যখনই তাকে দেখতেন তিনি বলতেন,

أَمِينٌ مُصْطَفًى لِلْخَيْرِ يَدْعُو ... كَضَوْءِ الْبَدْرِ زَايَلَهُ الظَّلَامُ

"তিনি বিশ্বস্ত ও মনোনীত; তিনি কল্যাণের পথে ডাকেন। যেন ঠিক পূর্ণিমার চাঁদের রোশনী; যার আলোতে আঁধার বিলুপ্ত হয়"।

উমর রা. সেই কবি যুহাইরের সেই কবিতা আবৃত্তি করতেন হারিম ইবনে সিনান সম্পর্কে যাতে বলা হয়েছিল:

لَوْ كُنْتَ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الْبَشَرِ * كُنْتَ الْمُضِيَّ لِلَيْلَةِ الْبَدْرِ

"মানুষ ব্যতীত যদি তুমি ভিন্ন কিছু হতে তবে পূর্ণিমার রাত তুমিই আলোকিত করতে"।

অতঃপর বলতেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনই ছিলেন।[৭৮১]

যখন তিনি রাগ করতেন তখন তাঁর চেহারা রক্তিমাভ হয়ে উঠত। মনে হতো, যেন তাতে আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।[৭৮২]

জাবের বিন সামুরা রা. বলেন, তাঁর পায়ের গোড়ালি ছিল হালকা। সব সময় তিনি মুচকি হাসতেন। যদি তুমি তাকে দেখতে তবে বলতে, তিনি চোখে কাজল দিয়েছেন। অথচ, তিনি কাজল দেননি।[৭৮৩]

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, তাঁর দাঁত ছিল সবার চেয়ে সুন্দর।[৭৮৪]

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, তাঁর সামনের দাঁত দু'টি ছিল আলাদা আলাদা। যখন তিনি কথা বলতেন তখন তাঁর দন্তরাজির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত মুক্তোর প্রভা।[৭৮৫]

তাঁর গ্রীবাদেশ ছিল রৌপ্য-বাঁধানো পুতুলের গ্রীবাদেশের মতো। তাঁর চোখের পাপড়ি ছিল লম্বা। দাড়ি ছিল ঘন। ললাট ছিল প্রশস্ত। ভ্রুযুগল ছিল মিলিত-বিচ্ছিন্ন। নাসিকা ছিল উন্নত। কপোল হালকা। বক্ষদেশ থেকে নাভীদেশ পর্যন্ত ছুরির মতো সরু লোমের রেখা ছিল। তা ছাড়া তার পেট কিংবা বুকের কোথাও লোম ছিল না। তবে বাহু ও কাঁধের ওপর লোম ছিল। পেট এবং সীনা ছিল

---

[৭৮১] প্রাগুক্ত।

[৭৮২] মিশকাতুল মাসাবীহ ১/২২। তিরমিযী: তাক্বদীর পর্ব: তাক্বদীর সম্পর্কে ঘাটাঘাটির ওপর যে ধমক এসেছে ২/৩৫।

[৭৮৩] তিরমিযী ও তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩০৬।

[৭৮৪] সহীহ মুসলিম: তালাক পর্ব। ঈলা অধ্যায় ৩/১১০৭, হাদীস নং ১৪৭৯।

[৭৮৫] দারেমী। মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫১৮।

সমান। সীনা মুবারক ছিল চওড়া ও প্রশস্ত। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। দেহের গড়ন ছিল খাড়া। হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল বড় বড়। যখন পথ চলতেন তবে ঈষৎ ঝাঁকুনি দিয়ে চলতেন। খানিকটা ঝুঁকে সামনে বাড়তেন এবং ধীর-স্থির হয়ে চলতেন।[৭৮৬]

আনাস রা. বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতের তালুর চেয়ে নরম কোনো রেশমী কাপড় (বারিক কিংবা পুরু) স্পর্শ করিনি। আর আমি কোনো দিন গন্ধ বা ঘ্রাণ নেইনি অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমি কখনো মেশক বা আম্বর কিংবা অন্য কোনো সুগন্ধির ঘ্রাণ নেইনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুগন্ধির চেয়ে উত্তম।[৭৮৭]

আবু জুহাইফা রা. বলেন, আমি তাঁর হাত ধরে আমার মুখমণ্ডলে রাখলাম। আমি অনুভব করলাম, তাঁর হাত মুবারক বরফের চেয়েও শীতল। মেশকের চেয়েও সুগন্ধ।[৭৮৮]

জাবের বিন সামুরা রা- যিনি ছোট বালক ছিলেন- বলেন, তিনি আমার গাল স্পর্শ করলেন তখন আমি তাঁর হাত এতটা শীতল আর সুঘ্রাণময় অনুভব করলাম, যেন তিনি সেটা আতরদানি থেকে বের করে এনেছেন।[৭৮৯]

আনাস রা. বলেন, তাঁর স্বেদধারা ছিল ঝলমলে মুক্তোর মতো। উম্মে সুলাইম রা. বলেন, এই স্বেদধারাই সর্বোত্তম খুশবু হতো। [৭৯০]

জাবের র. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন তার পরে কেউ এলে তাঁর ঘ্রাণের দ্বারা বুঝে নিতো তিনি এ পথে হেঁটে গেছেন।[৭৯১]

তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের মতো মোহরে নবুওত ছিল। এটা শরীরের মতোই ছিল। মোহরে নবুওতটি বাম কাঁধের নরম হাড়ের কাছে ছিল। তার ওপর আঁচিলের মতো ছোট ছোট তিলক ছিল। [৭৯২]

তোমার চরিত্র মধুরিমায় আজও মধুময় পৃথিবী

ভাষার বিশুদ্ধতা আর অলঙ্কারিত্বে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সকলের শীর্ষে। স্বভাবের

---

[৭৮৬] খুলাসাতুস সিয়ার পৃষ্ঠা ১৯, ২০।
[৭৮৭] সহীহ বুখারী ১/৫০৩। সহীহ মুসলিম ২/২৫৭।
[৭৮৮] সহীহ বুখারী ১/৫০২।
[৭৮৯] সহীহ মুসলিম ২/২৫৬।
[৭৯০] প্রাগুক্ত।
[৭৯১] দারেমী, মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫১৭।
[৭৯২] সহীহ মুসলিম ২/২৫৯, ২৬০।

সুস্থতা, বাকপটুত্বের মহিমা, বাণীর যথার্থতা, অর্থের শুদ্ধতা ও সকল প্রকারের ভণিতা থেকে দূরাবস্থানের পাশাপাশি 'জাওয়ামেউল কালিম' (তথা সর্বময় বাণী) এর অধিকারী ছিলেন। দুর্লভ প্রজ্ঞা আর আরবের সকল ভাষার জ্ঞান তাকে দান করা হয়েছিল। তিনি প্রত্যেক কবীলার মানুষের সঙ্গে তাদের নিজস্ব ভাষা আর পরিভাষায় কথা বলতেন। গ্রামীণ ভাষার শক্তি ও যথার্থতা আর শহুরে শব্দের গরীমা ও রওনক তাঁর মধ্যে মহামিলনের মেলা বসিয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নির্ভর মদদ ছিল এ হিসাবের বাইরে।

ধৈর্য, সহনশীলতা, প্রতিশোধের শক্তি থাকতেও ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, বালা-মুসীবতে সহ্য ও স্থিরতা ছিল আখলাকে নববীর এমন এক ভূষণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুরু থেকেই যে ভূষণে সতত বিভূষিত রেখেছিলেন। প্রত্যেক ধৈর্য ও সহনশীল মানুষের জীবন কাহিনী তলিয়ে দেখলে তাতে একটা না একটা স্খলন ও ফাঁক-ফোঁকর পাওয়া যাবে অবশ্যই। কিন্তু এর বিপরীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র-মাধুরী ছিল এতটা নিশ্ছিদ্র, এতটা সুনির্মল যে, দুশমনদের পক্ষ থেকে তাঁর ওপর জুলুম ও অত্যাচারের মাত্রা যতটা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর ধৈর্য আর স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠাও ততটা বিরল ইতিহাসের জন্ম দিয়ে যাচ্ছিল। আরবের মূখ-মানবগুলোর সীমালঙ্ঘণের পরিধি যতটা বেড়েছিল তার সহনশীলতার পরিমণ্ডলও ততটা বিস্তৃত হয়েছিল। আয়েশা রা. বলেন, যে কোনো ক্ষেত্রে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে যখন দু'টি পথ খোলা থাকত তখন তিনি বরাবর সহজ পথটিই অবলম্বন করতেন-যতক্ষণ না গুনাহের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। কারণ যে কোনো গুনাহের কাজ থেকে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে দূরে। নিজের ক্ষেত্রে তিনি কারও থেকে কোনোদিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত করা হলে সে ক্ষেত্রে তিনি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধায় ভুগতেন না।[৭৯৩] রাগ আর ক্রোধ থেকে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে দূরে আর রাযী ও সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে সবার চেয়ে আগে।

উদারতা আর বদান্যতার ক্ষেত্রে তাকে মাপার যন্ত্র পৃথিবীতে আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তিনি এমন মানুষের মতো দান করতেন দরিদ্র্যতাকে যিনি কখনো ভয় পান না। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দানবীর। আর রমযান মাসে যখন জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করতেন তখন তাঁর দানের দরিয়ায় প্রমত্ত জোয়ারের উত্তাল জোশ সৃষ্টি হতো। আর রমযানের প্রতি রাতে জিবরাঈল আ. তাঁর সঙ্গে মুলাকাত করতেন এবং দু'জনে কুরআনে কারীম দাওর করতেন। এ কারণে রমযানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দান বহমান

[৭৯৩] সহীহ বুখারী ১/৫০৩।

বাতাসের চেয়েও বেশি ছিল।[৭৯৪] জাবের রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখনই কোনো কিছুর প্রার্থনা করা হয়েছে তিনি কখনো 'না' বলেননি।[৭৯৫]

বীরত্ব, সাহসিকতা আর প্রবল বিক্রমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ছিলেন জগতের সবচেয়ে বড় বাহাদুর। জীবনের সবচেয়ে সঙ্গিন আর খতরনাক সমরাঙ্গনে যেখানে বড় বড় নামকরা বীর আর সাহসী যোদ্ধাদের স্খলন ঘটেছে; সবকিছু ভুলে গিয়ে 'চাচা! আপন প্রাণ বাঁচা' হয়ে ভাগার রাস্তা ধরেছে, সেখানে তিনি ছিলেন অটল, অবিচল। এ নাযুক মুহূর্তে তিনি পিছুহটার পরিবর্তে আজীবন সৎসাহসের সঙ্গে শুধু সামনেই এগিয়ে গেছেন। কোনো দিনও সামান্য মুহূর্তের জন্য তাঁর কদম বিচলিত হয়নি। পৃথিবীতে যত বড় বড় বীরপুরুষ আর সমর নায়ক রয়েছে তাদের ইতিহাস পাঠ করে দেখুন! সামান্য হলেও ভাগাভাগি আর পিঠ দেখানোর দৃশ্য সেখানে চোখে পড়বে!! কেবল মুস্তফা চরিত্রই এ কলঙ্ক থেকে থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত; পূর্ণ নিষ্কলুষ। আলী রা. বলেন, যখন রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠত আর জোশের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চতুর্দিকে বাহিত হতো তখন আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আড়াল করার চেষ্টা করতাম; কিন্তু আমাদের মধ্যে রাসূলে কারীমই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকতেন দুশমনের সবচেয়ে নিকটবর্তী।[৭৯৬] আনাস রা. বলেন, এক রাতে মদীনাবাসী দারুণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। লোকজন ভেসে আসা শব্দ অভিমুখে দৌড়াতে লাগল। পথিমধ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে তাদের দেখা হলো। তিনি তখন ফিরে আসছিলেন। তিনি সবার আগেই সেখানে গিয়ে হাযির হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন আবু তালহার একটি উলঙ্গ ঘোড়ার পিঠে। তার গ্রীবাদেশে তরবারি ঝুলছিল। তিনি বলছিলেন, **ভয় পেও না! ভয় পেও না!!**[৭৯৭]

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন দুনিয়ার সবচেয়ে লজ্জাশীল মানুষ। আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, পর্দার আবডালে কুমারী রমণীর চেয়েও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কোনো জিনিস অপছন্দ করতেন সর্বপ্রথম তাঁর চেহারাতেই সে লক্ষণ ফুটে উঠত।[৭৯৮] কারও প্রতি তিনি কখনো এক দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন না। তাঁর দৃষ্টি সবসময় হতো নমিত। আকাশের তুলনায় মাটির প্রতি তাঁর

---

[৭৯৪] প্রাগুক্ত ১/৫০২।
[৭৯৫] প্রাগুক্ত।
[৭৯৬] দেখুন কাযী আয়ায প্রণীত শিফা ১/৮৯।
[৭৯৭] সহীহ মুসলিম ২/৩৫২। সহীহ বুখারী ১/৪০৭।
[৭৯৮] সহীহ বুখারী ১/৫০৪।

নয়নযুগল বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো। স্বভাবতই তিনি অবনত চোখে তাকাতেন। তাঁর লজ্জাশীলতা আর গাম্ভীর্যের দুনিয়ার হালত ছিল এই, কেউ অপছন্দ করে এমন কথা কভু মুখেও আনতেন না। আর কারও ব্যাপারে যদি কখনো কোনো অপছন্দনীয় কাজের কথা জানতে পারতেন তবে তিনি মুখে তার নাম নিতেন না; কেবল বলতেন, **ঐ সমস্ত লোকদের কি হলো যারা এমন কাজ করে?**

কবি ফারাযদাকের কবিতার পঙক্তির সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি ছিলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কবিতার পঙক্তিটি নিম্নরূপ–

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ ... فَمَا يُكَلَّمُ إِلا حِينَ يَبْتَسِمُ

তথা 'পরম লজ্জাশীলতার কারণে নয়ন হতো আনত; আর তাঁর গাম্ভীর্যে অন্যদের চোখও নমিত হয়ে যেতো। তাঁর কথার সঙ্গে লেগে থাকত সতত মিষ্টি হাসির এক অমলিন বিভা'।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ইনসাফগার মানুষ। সবচেয়ে পূত ও পবিত্র। সবচেয়ে বড় সত্যবাদী ও আমানতদার। তাঁর আশপাশের মানুষ এমনকি তাঁর দুশমনরাও কৃতজ্ঞচিত্তে এ কথা স্বীকার করে নিয়েছিল। নবুওতের পূর্বে তাকে তারা 'আমীন' (তথা বিশ্বস্ত) বলে ডাকত। ইসলাম-পূর্ব অন্ধকার যুগে তাকে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব মীমাংসার জন্য ডাকা হতো। আলী রা. থেকে ইমাম তিরমিযী র. বর্ণনা করেন, আবু জাহল একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলেছিল, আমরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি না; বরং তুমি যা নিয়ে এসোছো তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। [সূরা আনআম:৩৩][৭৯৯]

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ান রা. (তখন তিনি মুসলমান হননি) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে যা দাবি করছে এ দাবির পূর্বে তোমরা কখনো তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছ? তিনি জবাব দিয়েছিলেন না।

তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বিনয়ী ও বিনম্র মানুষ। বড়াই ও অহঙ্কার থেকে তিনি ছিলেন সবচেয়ে দূরে। দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের সম্মানার্থে তাদের সভাষদবর্গ ও চাকর-নওকররা দাঁড়িয়ে যায় কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য সাহাবায়ে কেরামকে দাঁড়াতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তিনি ফকীর মিসকীনকে দেখতে যেতেন। হতদরিদ্র আর পার্থিব সুখ ও সমৃদ্ধবঞ্চিত মানবতার

---

[৭৯৯] মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫২১।

দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের সঙ্গে বসতেন। নগণ্য এক গোলামের দাওয়াতও তিনি কবুল করতেন। সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জীবনের প্রত্যেকটি মজলিসে তাদের মতোই একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে বসতেন। আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, তিনি তাঁর জুতো ঠিক করতেন। কাপড় সেলাই করতেন। নিজের হাতে নিজের কাজ করতেন যেমন তোমাদের একজন মানুষ করে। তিনিও মানুষের মধ্য থেকেই একজন মানুষ ছিলেন। কাপড় ঠিক করতেন। বকরীর দুধ দোহন করতেন। নিজের কাজ নিজেই আঞ্জাম দিতেন।[৮০০]

অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সকলের আগে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখার ময়দানেও তিনি ছিলেন আগে। মানুষের ওপর তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা দয়া, অনুগ্রহ ও মমতাময়। দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিনম্র ও পরিশীলিত। তাঁর চরিত্র-মাধুরী ছিল সবচেয়ে প্রশস্ত। দুশ্চরিত্র থেকে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বেশি দূরে। তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না। কৃত্রিমতা করেও অশ্লীল কথা বলতেন না। কারও ওপর তিনি অভিসম্পাত করতেন না। বাজার কিংবা রাস্তা-ঘাটে তিনি চেঁচামেচি করতেন না। খারাপের প্রতিদান তিনি কোনোদিন খারাপ দিয়ে দিতেন না। বরং তিনি মাফ ও ক্ষমা করে দিতেন। কাউকে তিনি তাঁর পেছনে হাঁটতে দিতেন না। দাস-দাসীদের চেয়ে কখনো ভালো খাবার খেতেন না। তাদের চেয়ে কখনো ভালো কাপড় পরতেন না। যারা তাঁর খেদমত করত তিনিও সময়ে সুযোগে তাঁর খেদমত করতেন। জীবনে কোনোদিন খাদেমকে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলেননি। কোনো কাজ করা কিংবা না করার কারণে কখনো তাদেরকে তিরস্কার করেননি। তিনি গরীব-মিসকীনদেরকে ভালোবাসতেন। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। তাদের জানাযায় শরীক হতেন। কোনো দরিদ্রকে তিনি দারিদ্র্যের কারণে ঘৃণা করতেন না। একবার তিনি এক সফরে ছিলেন। তখন বকরী যবাই করে তা রান্না করার পরামর্শ করা হলো। সাহাবায়ে কেরামের একজন বললেন, যবাই করার দায়িত্ব আমার। দ্বিতীয় জন বলল, চামড়া ছাড়ানোর যিম্মাদারি আমার। তৃতীয় আরেকজন বলল, রান্না করার দায়িত্ব আমার। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, **লাকড়ি সংগ্রহের দায়িত্ব আমার।** সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, আমরা থাকতে আপনি কাজ করবেন তা হয় না। তিনি বললেন, **আমি জানি। কিন্তু তোমাদের চেয়ে আমি বড় হয়ে যেতে চাই না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে বড় সাজতে চায় আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না।** অতঃপর তিনি লাকড়ি সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন।[৮০১]

---

[৮০০] মিশকাতুল মাসাবীহ ২/৫২০।
[৮০১] খুলাসাতুস সিয়ার পৃষ্ঠা ২২।

সম্মানিত পাঠক! এবার চলুন হিন্দ ইবনে আবী হালা রা. এর মুখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গল্প শুনি- হিন্দ রা. বলেন, আজীবনই এ মানুষটি দুশ্চিন্তা আর পেরেশানীর মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছেন। দিন-রাত তিনি ভাবনার গভীর সাগরে ডুবে থাকতেন। এ ময়দানে তিনি কোনোদিন একটুকু বিরাম লাভের সুযোগ পাননি। প্রয়োজন ছাড়া কখনো তিনি কিছু বলতেন না। দীর্ঘ সময় তিনি চুপ থাকতেন। মুখের পাশ দিয়ে তিনি কথা বলতেন না। শুরু ও শেষে সব সময় তিনি পুরো মুখেই কথা বলতেন। তিনি কথা বলতেন 'জাওয়ামেউল কালিম' হিসেবে। তিনি প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতেন। বেশি কথা বলতেন না। আবার কমও করতেন না। তিনি কথা বলতেন নরম-কোমল ভাষায়। শক্ত কথা বলতেন না; কারও মনে আঘাত করে এমন শব্দ কখনো উচ্চারণ করতেন না। মা'মুলী নিয়ামত হলেও তিনি সেটা সম্মান করতেন। কোনো কিছুকে তিনি কখনো তুচ্ছজ্ঞান করতেন না। খাবারের দোষ ধরতেন না। আবার তার প্রশংসাও করতেন না। হক্বের পথে বাধার সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে তাঁর ক্রোধ প্রতিহত করার ক্ষমতা কারও ছিল না। আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে যেমন তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ছাড়তেন না, ঠিক তেমনি নিজের স্বার্থে কারও থেকে তিনি কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। যখন কিছুর ইশারা করতেন পুরো হাতের তালু দ্বারা ইশারা করতেন। যখন কিছুতে বিস্মিত হতেন তখন হাতের তালু উল্টে দিতেন। যখন কারও ওপর রাগ করতেন তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। যখন কিছুতে আনন্দিত হতেন অমনিতেই তাঁর দৃষ্টি অবনমিত হয়ে আসত। সব সময়ই তিনি মুচকি হাসি দিতেন। হাসির সময় তাঁর মুখ-গহ্বর থেকে শুভ্র মুক্তোদানা বেরিয়ে আসত।

কোনোদিনও একটা অর্থহীন কথা তাঁর মুখ থেকে বের হয়নি। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মিলনের সেতু বন্ধন রচনা করতেন। কখনো তাদেরকে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ করে দিতেন না। প্রত্যেক কওমের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে তিনি সম্মান করতেন। তাদেরকেই সেই কওমের অভিভাবক বানিয়ে দিতেন। তিনি মানুষকে (দুষ্কর্ম থেকে) ভয় দেখাতেন এবং তা থেকে দূরে থাকতেন। মানুষের একটুকু ক্ষতি হয় এমন কাজ তিনি কখনো করতেন না।

তিনি সাহাবায়ে কেরামের খোঁজখবর নিতেন। মানুষের অবস্থা জানার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি ভালোর প্রশংসা করতেন এবং সঠিক হিসেবে আখ্যা দিতেন। আর খারাপের নিন্দা ও অপমান করতেন। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থার মানুষ। কখনো মতানৈক্যের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না। তিনি কখনো কোনো কিছু থেকে গাফেল হতেন না। কারণ, ভয় ছিল তাতে অন্যরাও গাফেল ও বিরক্ত হয়ে পড়বে। সবসময়ে সকল পরিস্থিতির জন্য তিনি

প্রস্তুত থাকতেন। হক্ব থেকে কখনো ত্রুটি করতেন না। হক্ব ছেড়ে না-হক্বের পথেও কখনো যেতেন না।

যে মানুষগুলো তাঁর কাছে ছিলেন তারা ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আর তাদের মধ্য থেকে তাঁর নিকট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল সে ব্যক্তি, যে সবচেয়ে কল্যাণকামী। তাদের মধ্য থেকে তাঁর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান ছিল সে ব্যক্তি যে ছিল সবচেয়ে বেশি ভ্রাতৃপ্রতীম, সমবেদনা জ্ঞাপনকারী।

তিনি উঠতে বসতে সবসময় আল্লাহ তাআলার যিকির করতেন। তিনি জায়গা নির্দিষ্ট করতেন না। অর্থাৎ, তাঁর নিজের জন্য কোনো জায়গা নির্ধারিত ছিল না। যখন কোনো সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তখন মজলিসের যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। সাহাবায়ে কেরামকে এর তাগীদ দিতেন। তিনি তাঁর প্রত্যেক সতীর্থকে প্রাপ্য অংশ দান করতেন। অবস্থা এমন হয়েছিল, তাতে কেউ মনে করতে পারত না যে, অমুক ব্যক্তি রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে তার চেয়ে প্রিয় ও সম্মানিত। সবাই মনে করত তিনি তাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যদি কেউ কোনো প্রয়োজনে তাঁর নিকট বসত কিংবা দাঁড়িয়ে থাকত তবে তিনি পরম ধৈর্যের সঙ্গে সময় দিতেন যে, এক পর্যায়ে সে-ই আগে ফিরে যেত। জীবনে যখনই কেউ তাঁর কাছে কিছু চেয়েছে, তিনি হয়তো সেটা দিয়ে দিতেন; কিংবা বিনম্র ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দিতেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখচ্ছবি আর চরিত্র মধুরিমার দ্বারা তিনি সকলের হৃদয় ও মন জয় করে নিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সকলের পিতার মর্যদায় ভূষিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের সবাইকে তিনি নিজ ঔরসজাত সন্তানের মতো এক চোখে দেখতেন। শ্রেষ্ঠত্বের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মাপকাঠি ছিল তাক্বওয়া। তাঁর মজলিসগুলো ছিল লজ্জা, সহনশীলতা, ধৈর্য ও আমানাতের মজলিস। সেখানে গলার আওয়াজ উঁচু করা হতো না। কোনো হারাম বিধি লঙ্ঘিত হতো না অর্থাৎ কারও মানহানি হতো না। তাক্বওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এক নৈসর্গিক ভালোবাসার বাঁধনে সকলের মন প্রাণ বাঁধা ছিল। তারা বড়দের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকারী। আর ছোটদের প্রতি ছিলেন পরম মমতাময়। মুখাপেক্ষী মানুষের প্রতি তারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। আর অচেনা পথচারীকে তারা বিরল প্রীতির উষ্ণ ছোঁয়ায় পুলকিত করে তুলতেন।

মিষ্টি হাসির এক ফালি চাঁদ তাঁর মুখাকাশ সর্বদা আলোস্নাত করে রাখত। তিনি অত্যন্ত সরল সহজ আর সাদা মনের একটি মানুষ ছিলেন। রুক্ষতা আর বদ মেযাজ থেকে তিনি থাকতেন অনেক দূরে। ফালতু চেঁচামেচি আর অযথা বকবকানি ছিল তাঁর তবীয়তের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি অশ্লীলভাষী ছিলেন না। কারও নিন্দা করতেন না। আবার কারও খুব প্রশংসাও করতেন না। যাতে তাঁর

কোনো প্রয়োজন না থাকত ইচ্ছা করেই সেটা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত থাকতেন। আশাহত আর ভগ্নমনোরথ হওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে সীরাতে মুহাম্মাদী ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ ও পবিত্র-রিয়া বা লোক-দেখানো, যে কোনো বিষয়ের আতিশয্য,অনর্থক বিষয়। মুসলমানদেরকেও তিনি তিনটি বিষয় থেকে মাহফূয রেখেছিলেন- তিনি কারও নিন্দা করতেন না। কাউকে লজ্জা দিতেন না। কারও গোপন বিষয় তালাশ করতেন না। তিনি কেবল সে কথাই বলতেন, যাতে সওয়াবের আশা করা যেত। যখন তিনি কথা বলতেন তখন সাহাবায়ের কেরাম অবনত শিরে বসে থাকতেন- যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে থাকত। আর যখন তিনি চুপ থাকতেন তখন তারা কথাবার্তা বলতেন। তাঁর কাছে বসে সাহাবায়ে কেরাম বাদানুবাদ বা গল্পগুজব করতেন না। যখন তাদের কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন তখন অন্যরা চুপ করে সে কথা শুনতেন। সেই প্রথম ব্যক্তির কথাই হতো তাদের সকলের কথা। যখন সাহাবায়ে কেরাম রা. হাসতেন তখন তিনিও হেসে ফেলতেন। যখন সবাই বিস্ময় প্রকাশ করতেন তখন তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত বেদুঈন এসে রুক্ষ ভাষায় কথা বলত, সবর হতো তখন তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী। তিনি বলতেন, তোমরা যখন কাউকে কিছুর মুখাপেক্ষী দেখবে তখন তাকে সেটা দিয়ে সাহায্য করবে। ইহসানের বদলা ব্যতীত আর কারও থেকে প্রশংসা খুঁজতে যেতেন না।[৮০২]

খারিজা ইবনে যায়দ রা. বলেন, মজলিসের মধ্যে তিনি হতেন সবার চেয়ে গম্ভীর ও শ্রদ্ধার পাত্র। শরীরের কোনো অঙ্গ তিনি বাইরে বের করতেন না। প্রায় সময়ই তিনি চুপ থাকতেন। প্রয়োজন ব্যতীত কথা বলতেন না। কেউ অসুন্দর কথা বললে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তাঁর হাসি হতো মুচকি-মিষ্টি। তিনি কথা বলতেন স্পষ্ট ভাষায়; বাড়তি কথা বলতেন না। প্রয়োজনীয় কথাও সংক্ষেপে আধাআধি বুঝিয়ে দিতেন না। তাঁর সম্মান আর শ্রদ্ধার্থে সাহাবায়ে কেরামও রা. মুচকি হাসতেন।[৮০৩]

এক কথায়, মুস্তফা চরিত ছিল পৃথিবীর সব নিরুপম গুণ আর সৌন্দর্য বিভায় প্রস্ফুটিত মানবতার এক মহা আশ্চর্য। তাঁর সুমহান রব তাকে বেনযীর ভূষণে বিভূষিত করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজে তাঁর প্রশংসায় বলেছেন, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ তথা নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। [সূরা কলম:৪]

এগুলো ছিল এমন অসাধারণ ভূষণ, যা মানুষকে তাঁর নিকট টেনে নিয়ে এসেছিল। মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি প্রবল অনুরাগ, আকর্ষণ, ভক্তি আর

---

৮০২ দেখুন কাযী আয়ায প্রণীত শিফা ১/১২১-১২৬। আরও দেখুন শামায়েলে তিরমিযী।
৮০৩ শিফা ১/১০৭।

ভালোবাসার জন্ম দিয়েছিল। তাঁকে মানবতার এমন এক মহাধিনায়ক বানিয়ে দিয়েছিল, যার জন্য হাজারো জীবন মুহূর্তে উৎসর্গীত হওয়ার প্রতিযোগিতা লেগে যেত। এগুলো তাঁর কওমের রুক্ষ ও পাষাণ হৃদয়গুলোকে মোমের মতো গলিয়ে ফেলেছিল। আর তখন উত্তরঙ্গ সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জোয়ার বানের মতো সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল ইসলামের ঘাটে। এ সৌন্দর্য বিভায় অভিভূত হয়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এ ছিল সেই অপূর্ব রূপ-লাবণ্য আর স্নিগ্ধ সুষমাভরা পূর্ণ চাঁদের একটুখানি ঝিলিক মাত্র। নতুবা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা, তাঁর সৃষ্টি-সৌন্দর্যের প্রকৃত দৃশ্য আর তাঁর চরিত্র মধুরিমার বাস্তব কারিশমার সমুন্নতি ছিল ঠিক এতটা- যার পূর্ণ চিত্রায়ণ কোনোদিনও সম্ভব হবে না। যার গভীরতার কখনো অনুমানও করা যাবে না।

সত্যি কথা কি- গোটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এ মহান মানুষটির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার কে করতে যাবে, যিনি সকল সৌন্দর্য আর পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যিনি আপন রবের দীপ্তিতে এতটা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, স্বয়ং আল্লাহর কিতাবকে তাঁর চরিত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ،

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ"

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
আল জামিয়াতুস সালাফিয়া, বেনারস, ভারত

অনুবাদঃ মীযান বিন হারুন
জামিআ মুহাম্মাদিয়া
ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১২ রমযান, ১৪৩১ হিজরী।
২৩ আগস্ট, ২০১০ ঈসায়ী।

গ্রন্থপঞ্জি

١- إتحاف الورى بأخبار أم القرى
٢- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان
٣- إخبار الكرام بأخبار المسجد الحرام
٤- الأدب المفرد
٥- الاستيعاب
٦- أسد الغابة في معرفة الصحابة
٧- الإصابة في تمييز الصحابة
٨- الأصنام
٩- أسباب الأشراف
١٠- البداية والنهاية
١١- تاريخ أرض القرآن (أردو)
١٢- تاريخ الأمم والملوك
١٣- تاريخ ابن خلدون (العبر وديوان المبتدأ والخبر)
١٤- التاريخ الصغير
١٥- تاريخ عمر بن الخطاب
١٦- تاريخ اليعقوبي
١٧- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي
١٨- تفسير الطبري (جامع البيان)
١٩- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)
٢٠- تفسير ابن كثير
٢١- تلقيح فهوم أهل الأثر
٢٢- تهذيب تاريخ دمشق
٢٣- جامع الترمذي
٢٤- جمهرة أنساب العرب
٢٥- جمهرة النسب
٢٦- خلاصة السير
٢٧- دراسات في تاريخ العرب
٢٨- الدر المنثور
٢٩- دلائل النبوة (إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني)
٣٠- دلائل النبوة (أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني)
٣١- دلائل النبوة (أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي)

٣٢– رحمة للعالمين (القاضي محمد سليمان سلمان المنصورفوري)
٣٣– رسول أكرم كى سياسي زندگى (أردو)
٣٤– الروض الأنف
٣٥– زاد المعاد
٣٦– سبائك الذهب
٣٧– سفر التكوين
٣٨– سنن أبي داود
٣٩– السنن الكبرى
٤٠– سنن ابن ماجه
٤١– السنن المجتبى للنسائى
٤٢– السيرة الحلبية
٤٣– السيرة النبوية (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التيمي البستي)
٤٤– السيرة النبوية (أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى)
٤٥– شرح السنة
٤٦– شرح صحيح مسلم
٤٧– شرح المواهب اللدنية
٤٨– الشفا
٤٩– شمائل الترمذي
٥٠– صحيح البخاري
٥١– صحيح مسلم
٥٢– صحيفة حبقوق
٥٣– الطبقات الكبرى
٥٤– العقد الفريد
٥٥– عون المعبود شرح سنن أبي داود
٥٦– فتح الباري
٥٧– فتح القدير
٥٨– قلائد الجمان
٥٩– قلب جزيرة العرب
٦٠– الكامل في التاريخ
٦١– كنز العمال
٦٢– اللسان
٦٣– مجمع الزوائد
٦٤– محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية
٦٥– مختصر سيرة الرسول

٦٦- مدارك التتريل
٦٧- مروج الذهب ومعادن الجوهر
٦٨- المستدرك على الصحيحين
٦٩- مسند الإمام أحمد
٧٠- مسند البزار
٧١- مسند خليفة بن خياط
٧٢- مسند الدارمي
٧٣- مسند أبو داود الطيالسي
٧٤- مسند أبي يعلى
٧٥- مشكاة المصابيح
٧٦- المصنف لابن أبي شيبة
٧٧- المصنف لعبد الرزاق
٧٨- المعارف
٧٩- المعجم الأوسط
٨٠- المعجم الصغير
٨١- معجم البلدان
٨٢- مغازي الواقدي
٨٣- المنمق في أخبار قريش
٨٤- المواهب اللدنية
٨٥- موطأ الإمام مالك
٨٦- نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام
٨٧- نسب قريش
٨٨- نسب معد واليمن الكبير
٨٩- نهاية الأرب في معرفة قبائل العرب
٩٠- وفاء الوفاء
٩١- اليمن عبر التاريخ

সমাপ্ত

দারুল হুদা কুতুবখানা

বাংলাবাজার, ঢাকা

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

আল্লাহ তাআলা নিজেই যদি কারও কপালে সফলতার রাজটিক লাগিয়ে দিতে চান, তবে তাকে অসফল করার সাধ্য কার? আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে প্রকাশ করতে চান, তবে তাকে ঢেকে রাখার সামর্থ্য কার? একদিন হিন্দুস্তানের এক মাদ্রাসার সংকির্ণ চৌহদ্দিই ছিল যার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সীমারেখা, আজ তার সবগুলি ছাঁপিয়ে উঠে গোটা পৃথিবীর মঞ্চে তিনি বরেণ্য, আলোচিত ও সমাদৃত। আজ তাঁর পরিচয় কালজয়ী সীরাতগ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' প্রণেতা শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপূরী রহ.।

সীরাতে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইতিহাসে 'আর রাহীকুল মাখতূম' কি যে এক বিস্ময়কর আন্দোলন ও আলোড়নের ঢেউ তুলেছিল তার সঙ্গে আজ কাউকেই আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বস্তুত এটা ছিল বিশ্ব সীরাত ভাণ্ডারে বর্তমান সময়ের এক অনুপম ও অনবদ্য সংযোজনা। আর এ ক্ষেত্রে সকল কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত মালিক হলেন মহান আল্লাহ তাআলা।

গ্রন্থকার মাওলানা সফিউর রহমান মুবারকপূরী রহ. জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৩ সনের ৬ জুন ভারতের উত্তর প্রদেশের মুবারকপূরের হুসাইনাবাদ নামক গ্রামে। কথিত আছে, তিনি ছিলেন ছাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী রা. এর বংশধর।

আপন পল্লী গাঁয়ে কুরআনে কারীমের মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবনের অভিষেক হয়েছিল। পরবর্তীতে এক সুদীর্ঘ কাল পরে ১৯৭৬ সনে আরবি সাহিত্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করার মধ্য দিয়ে উপসংহার টেনেছিলেন।

এরই মাঝে ১৯৭৬ সনের মার্চ মাসে রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর উদ্দ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগিতায় 'আর রাহীকুল মাখতুম' নিয়ে তিনি বিশ্বের নাট্য মঞ্চে আবির্ভূত হন। এরপর জীবনে আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। দাওয়াত, তাবলীগ ও তাসনীফাতের মধ্য দিয়ে খুব দ্রুতই অতিক্রম করে গিয়েছেন জীবনের প্রতিটি মনযিল। আরবি ও উর্দু ভাষায় তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ত্রিশোর্ধ্ব। কর্মজীবনে তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও সর্বশেষ রিয়াদের মাকতাবায়ে দারুস সালামে গবেষণার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

দল ও মত, মাযহাব ও দর্শনের বিবেচনায় যত মত-পার্থক্যই থাক, মানুষ হিসেবে একান্ত জীবনে তিনি ছিলেন সত্যিই উদার, সরল ও সাদা মনের একটি মানুষ। কারও সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক কখনোই সাংঘর্ষিক ছিল না। আর তাঁর অমর গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' অধ্যয়ন করলেও বোঝা যায়, ব্যক্তিগত জীবনের দর্শনের লেশমাত্র ছাপও তিনি পড়তে দেননি। বরং ইলম ও ইখলাসের সবটুকু রস ও মাধুরী মিশিয়ে তিনি সীরাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়া সাল্লাম কে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

নিরবিচ্ছিন্ন মেহনত ও পরিশ্রমের ফলে জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি মারাত্মক ভগ্নস্বাস্থ্য ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সনের মাঝামাঝি সময়ে ধীরে ধীরে তিনি আরও নেতিয়ে পড়েন। পরিশেষে একই বছর পয়লা ডিসেম্বরে পবিত্র জুমুআর দিন বেলা ২ টার সময় তিনি মাওলা পাকের সান্নিধ্যে পরপারে পাড়ি জমান। পৃথিবীতে আপন কীর্তির স্বাক্ষর স্বরূপ রেখে যান কালজয়ী অমর গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম'।

দারুল হুদা কুতুবখানা
বাংলাবাজার, ঢাকা